চতুরঙ্গ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার ৩

বিষ্ণু দে ॥ চেনা দেশ ৯

অরুণ মিত্র ॥ একই তৃষ্ণায় ১০

অশোকবিজয় রাহা ॥ নিঃসঙ্গ ১২

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ॥ সংসার বৈরাগ্য ১৩

অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর পুনর্বিচার ১৪

অমিয়ভূষণ মজুমদার ॥ চাঁদবেনে ২১

অমলেন্দু বসু ॥ সমালোচনার পদ্ধতি ৮২

নীহাররঞ্জন রায় ॥ আধুনিক সাহিত্য ৯৩

সমালোচনা—বিনয় ঘোষ, সরোজ আচার্য,
নৃপেন্দ্র সান্যাল, চিদানন্দ দাশগুপ্ত ৯৬

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

সুবিধা ভাড়ায় বৃত্তাকার পরিভ্রমণ টিকিট এবং আনন্দ-ভ্রমণের জন্য বিশেষ ট্রেন

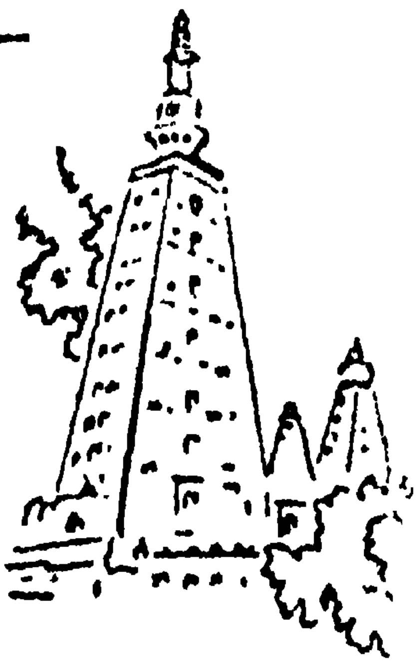

বৃত্তাকার পরিভ্রমণ টিকিট—বিভিন্ন ভ্রমণ পথে সাধারণ ভাড়ার তিন চতুর্থাংশ ভাড়ায় (দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে মেল ট্রেনের ভাড়া প্রযোজ্য) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য তিন মাসের মেয়াদী সুলভ টিকিট বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত বিভিন্ন ভ্রমণ পথে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও শিল্পপ্রধান স্থান এবং বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যনিবাসে ভ্রমণ করতে পারা যাবে। কোন ভ্রমণকারী নিজস্ব কোন ভ্রমণপথ যদি ঠিক করেন তা'হলে এই টিকিটের অন্যান্য বিভিন্ন সর্ত প্রতিপালিত হলে তাঁকে তাঁর এই নিজস্ব ভ্রমণ-পথের জন্যও সুলভ ভাড়ায় বৃত্তাকার পরিভ্রমণ টিকিট দেওয়া হবে।

তীর্থযাত্রীদের জন্য বা আনন্দ-ভ্রমণের জন্য বিশেষ ট্রেন।

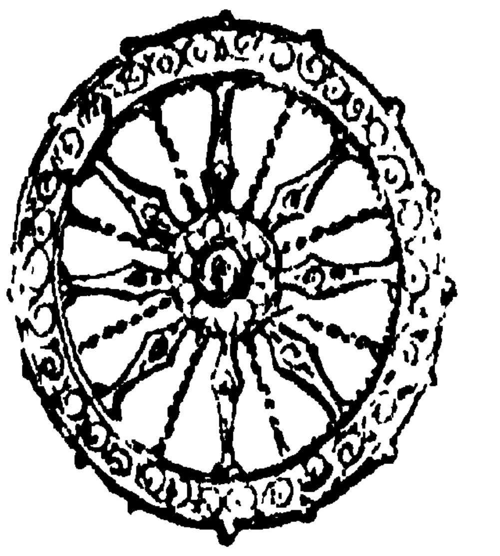

অনুরুদ্ধ হলে তীর্থযাত্রীদের জন্য বা আনন্দ-ভ্রমণের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এতে নীচে উল্লিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে :

(ক) রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক ট্রেনে বিনা ভাড়ায় একটা গাড়ী দেওয়া হবে ;

(খ) একজন পরিচালক এবং চারজন পাচক বা ভৃত্য এই ট্রেনে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারবেন ;

(গ) কয়েকটী সর্তে ১৫০০ বা ততোধিক মাইল ব্যাপী বৃত্তাকার ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের সাধারণ ভাড়ার তিন চতুর্থাংশ ভাড়ায় সুলভ টিকিট দেওয়া হবে কিন্তু ন্যূনতম ভাড়া হিসাবে প্রতি মাইল পিছু ১২৲ টাকা হারে ব্রডগেজ ট্রেনের জন্য এবং ১০৲ টাকা হারে ন্যারোগেজ ট্রেনের জন্য ভাড়া তাঁদের দিতেই হবে। এই ভ্রমণ বৃত্তাকারে হওয়া চাই, একই বা অনুরূপ পথে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

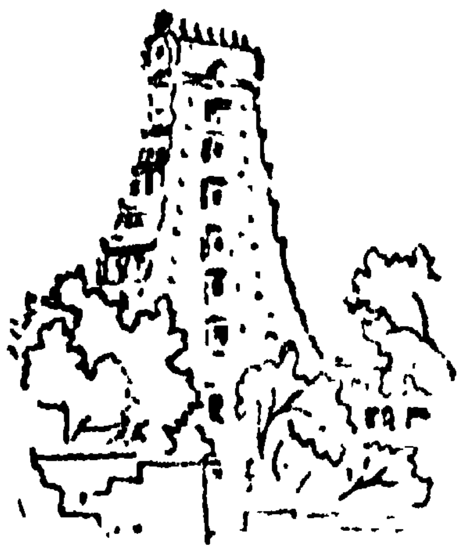

বিভিন্ন ভ্রমণপথের এবং উপরিউক্ত উভয় সুলভ ভাড়ার টিকিট সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম ও সর্তাদির বিস্তারিত বিবরণ কলকাতার ১১নং গার্ডেন রীচ রোডে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেন্ট এর ঠিকানায় অথবা ৩নং কয়লা-ঘাট ষ্ট্রীটে পূর্ব রেলওয়ের চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেন্ট-এর ঠিকানায় কিংবা উভয় রেলের বিভিন্ন ডিভিশনাল বা ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্টদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

পূর্ব রেলওয়ে • দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

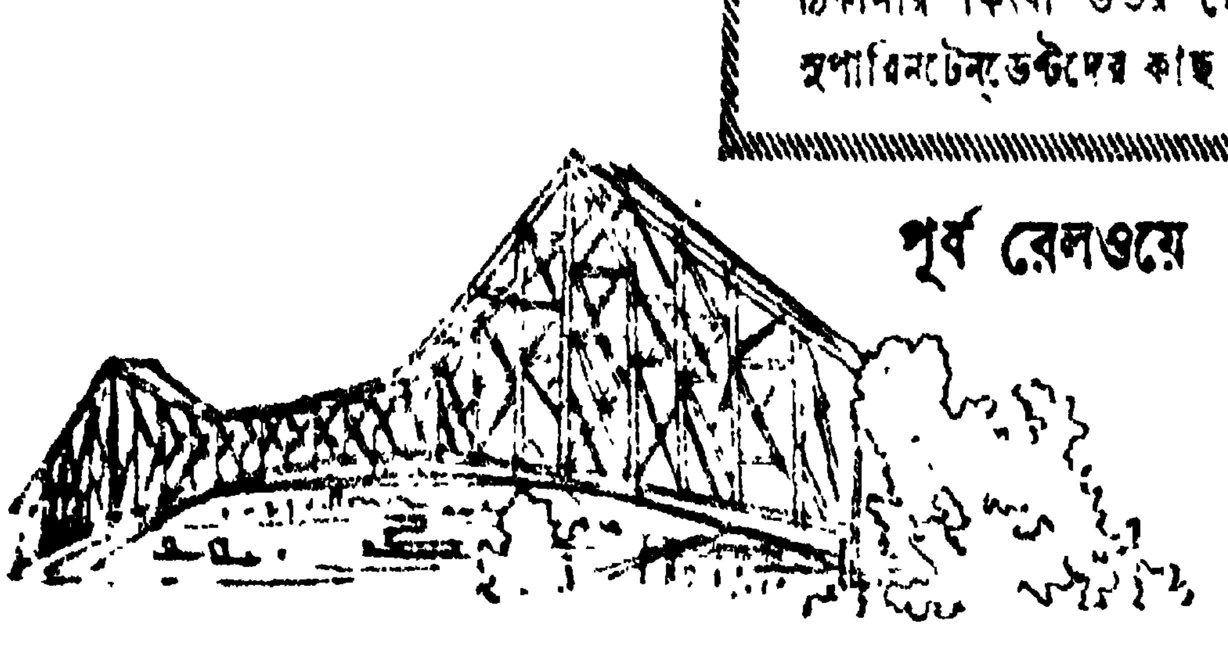

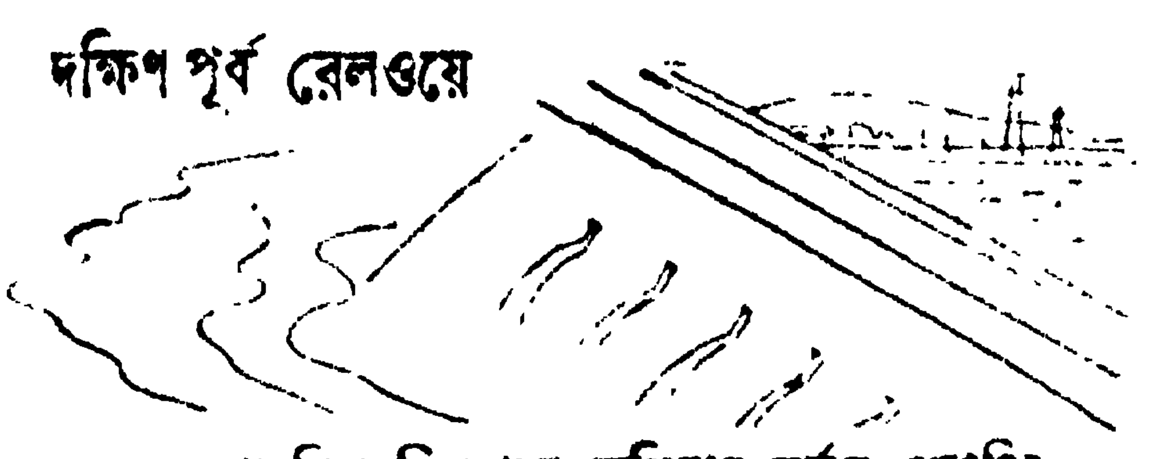

রেলওয়ে পাবলিক রিলেশন্‌স্‌ অফিসার কর্তৃক প্রচারিত

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ আমেরিকার চিঠি ১০৯

অসায়াছু, তোশিয়ুকি, আকাহিতো, এমো, মিচিৎসুনার জননী,

শিকিবু, তাদামিনে, হিতোমারো, তোশিনারি, উদা, মোরোতাদা,

ইয়াকামোচি ॥ জাপানী কবিতা ১১৬

অমলেন্দু দাশগুপ্ত ॥ শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু ১২২

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ॥ নটি ১৩০

আবু সয়ীদ আইয়ুব ॥ সমাজবাদী পরিকল্পনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ১৬২

চিদানন্দ দাশগুপ্ত ॥ চলচ্চিত্র ১৭২

অমলেন্দু বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব ॥ আধুনিক সাহিত্য ১৭৪

সমালোচনা—বিনয় ঘোষ, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, বিষ্ণু দে,

হরপ্রসাদ মিত্র, অশোক মিত্র ১৯৫

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

* চিত্তে স্ফূর্তি
উত্তম লিভারের লক্ষণ

যত গোলযোগ লিভার থেকেই শুরু। আহার্যের সঙ্গে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লিভারের উপর এর পীড়ন বড় কম নয়, ক্রমশঃ অচল করার পক্ষে যথেষ্ট। এর ফলে আপনার পাকস্থলী নানা বিষে জর্জরিত হয়ে পড়ে। মুখে রুচি নেই, চোখে ঘুম নেই, মেজাজ-মর্জি খারাপ, স্বভাবের যত সংগুণ যেন বিলুপ্ত হয়ে আসে। এমন অবস্থায় অবিলম্বে ভালো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। লিভারজেন্-এর কথা

লিভারজেন

এখন ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যাচ্ছে

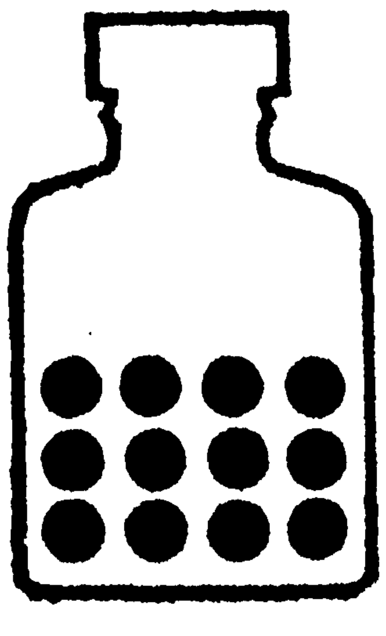

একবার জিগগেস করে দেখবেন। লিভারজেন্ এখন ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবহারে বা বহনে এখন সুবিধে অনেক বেশি। খরচও অনেক কম।

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, কলকাতা ১৪

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

চতুরঙ্গ

কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ আমেরিকার চিঠি ২১৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ এখন ভাবনা ২২২

দিনেশ দাস ॥ মরা ফেনা ২২৪

হরপ্রসাদ মিত্র ॥ সত্যি মশাই ২২৬

আবুল হোসেন ॥ দেবো, সব দেবো ২২৮

অম্লান দত্ত ॥ সোভিয়েত কম্যুনিজম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ২২৯

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ॥ নটি ২৩৯

আঁন্দ্রে জিদ্ ॥ সাহিত্যিক স্মৃতি ও বর্তমান সমস্যা ২৯৮

আলোচনা ॥ মোহিতকুমার হালদার, অমলেন্দু দাশগুপ্ত ৩০৮

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ আধুনিক সাহিত্য ৩১৩

সমালোচনা—অতীন্দ্রনাথ বসু, লীলা মজুমদার, সরোজ আচার্য,
নরেশ গুহ, হরপ্রসাদ মিত্র ৩১৫

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

মামুলি চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করতে পারে, এমন একখানি বাংলা ব
'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'। বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেক বাঙালীর পঠনযো

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বিনয় ঘোষ

প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ থেকে বৈদিক-হিন্দু-বৌদ্ধযুগ, পাঠান-মোগল ও বৃটিশযুগ পর্যন্ত বাংলার সমাজ-সং
ধারাবাহিক ইতিহাস সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে, প্রায় দুই শত গ্রামের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের আলোকে বি
করা হয়েছে। বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের সমাবেশ ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের অভিনবত্ব এ-বইয়ের প্রধান বৈ
কেবল পুঁথিনির্ভর গবেষণার গতানুগতিক ধারার বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। পরিশেষে ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপ
ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসরসীকুমার সং
শ্রীধরণী সেন প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাংলার সংস্কৃতির বিভিন্ন বিতর্কাধীন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

—'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন' নামে প্রকাশিত রচনাবলীর পরিবর্ধিত ও পুনর্বিন্যস্ত গ্রন্থরূপা

৫৬খানি আর্টপ্লেটে প্রায় ১৫০ হাফটোন চিত্র, যা পূর্বে অধিকাংশই প্রকাশিত হয়নি, বহু মানচিত্র ও রেখাচিত্রসহ, ৮১৬ পৃষ্ঠার বই, রেক্সিন বাঁধাই। মূল্য ১৮৲ টাকা।

পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠাগারিকরা বিস্ত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। গ্রামাঞ্চ ক্রেতারা স্থানীয় পুস্তক-বিক্রে অর্ডার দিন অথবা অগ্রিম মূল্য ও রে ডাকখরচ পাঠান।

সকলের পঠনযোগ্য ও সংগ্রহযোগ্য বই

॥ পুস্তক প্রকাশক ॥ ৮।১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** মাঘ চৈত্র ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ আমেরিকার চিঠি ৩৩১

মণীন্দ্র রায় ॥ উদ্যোগের ইতিহাস ৩৩৮

মণীন্দ্র রায় ॥ দেখব, কী বাণী ৩৩৯

শামসুর রহমান ॥ কথার জন্যে ৩৪০

শামসুর রহমান ॥ খাদ ৩৪১

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ কবিতার বোঝাপড়া ৩৪২

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ॥ নটি ৩৫৫

অশোক মিত্র ॥ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা ৪০০

চিদানন্দ দাশগুপ্ত ॥ চলচ্চিত্র ৪০৬

প্রমথনাথ বিশী ॥ আধুনিক সাহিত্য ৪০৮

সমালোচনা—অমলেন্দু দাশগুপ্ত, লীলা মজুমদার,

নৃপেন্দ্র সান্যাল, সুনীলকুমার নন্দী ও

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৪১৩

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

নিখুঁত
মূর্তি
গড়তে
হলে

ভালো ভাস্করের খোঁজ পড়ে। তেমনি, কোনো
কারণে স্বাস্থ্য যদি ভেঙে পড়ে, চিকিৎসার
জন্য ভালো ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন।
আজকাল ভগ্নস্বাস্থ্যের একটি প্রধান কারণ
দৈনিক জীবনসংগ্রামে যে পরিমাণ শক্তি
ক্ষয় হয়, সেই অনুপাতে সঞ্চয়ের ভাগ কম।
উত্তম আহার্যও এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়,
কারণ শক্তিক্ষয়ের চেয়ে
শক্তিসঞ্চয়ে সময় লাগে অনেক বেশি।
এরই ফলে জীবন অবসাদক্লিষ্ট, দেহ
নানা রোগের আধার হয়ে ওঠে।
এমন অবস্থায় চিকিৎসক অনেক সময়
একটি সারবান তেজোবর্ধক টনিক
গ্রহণের উপদেশ দিয়ে থাকেন।
ভিনকোলার কথা তাঁকে জিগগেস
করে দেখবেন। সাধারণ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ—
এই দুই প্রকার ভিনকোলা পাওয়া যায়।

ভিনকোলা

সারবান তেজোবর্ধক টনিক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ কলকাতা-১৪

অষ্টাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ আষাঢ় ১৩৬৩

চতুরঙ্গ

"চতুরঙ্গ" আঠারো বছরে পা দিল।

আঠারো বছরে মানুষের যৌবন সাময়িক পত্রিকার আরো বেশী কিছু।

অনেক দুর্যোগ কাটিয়ে আসার স্থৈর্য, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হওয়ার দূরদৃষ্টি। বৈশিষ্ট্যের সাধনার সঙ্গে অসংকীর্ণ দৃষ্টি, পরীক্ষার দুঃসাহসের সঙ্গে বিচারবোধের সংযম।

আঠারো বছরে অনেক কিছু ঘটে গেছে, বিশেষ এই অবিস্মরণীয় সাম্প্রতিক অতীতে।

বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে তার চতুর্থ দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত একরকম নির্বিঘ্ন নিরবচ্ছিন্ন আমাদের জীবনের একটা ধারাবাহিকতা। স্বদেশী আন্দোলন দুলিয়েছে সত্য কিন্তু আমাদের মনের ভিৎ নাড়ায়নি। প্রথম মহাযুদ্ধ বলতে গেলে স্পর্শই করেনি আমাদের জীবনদর্শনের ভঙ্গি। পথ হয়'ত ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য প্রায় স্থির। সেই ধ্রুব লক্ষ্যের পানে তরণীর মুখ নিবদ্ধ করে বিভিন্ন কূল থেকে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আমরা যাত্রা করেছি। সমুদ্র হোক তরঙ্গসঙ্কুল, গন্তব্য সম্বন্ধে কোন সংশয় আমাদের নেই।

তারপর ইউরোপের দাবানল দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল, আমাদের পায়ের তলার শক্ত মাটি যেন গেল সরে। জীবনের অভ্যাস আমাদের চালাচ্ছে, যান্ত্রিক প্রগতি আমাদের টানছে, কিন্তু কেন ও কোথায় ভাববার খেই-ই বুঝি হারিয়ে ফেলেছি।

বাংলা দেশের ওপর দিয়ে এই ক'টা বছর অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মত পার হয়ে গেল। বিশ্বযুদ্ধের আঁচ ভালো করেই তার গায়ে লেগেছে, দেশজোড়া মুমূর্ষু ক্ষুধিতের হাহাকার এখনও বুঝি তার আকাশ থেকে মেলায়নি, কত বৃষ্টি বন্যায় যে তার বুকের রক্তের দাগ ধুয়ে যাবে জানি না।

"চতুরঙ্গ" এই সব কিছুর ভেতর দিয়েই পার হয়ে এসেছে। জাতির

জীবনের সমস্ত বিপর্যয় বিপ্লব বিকার বিকাশের সাক্ষীস্বরূপ।

না শুধু সাক্ষী নয়, সঙ্গী, সহায় ভাষ্যকার।

এই বিশৃঙ্খল যুগের বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত মননকে যথাসাধ্য সংহতরূপে ধরবার চেষ্টা সে করেছে, সংস্কৃতিক জীবনের সমস্ত দিকে জাগ্রত দৃষ্টি মেলে রেখে।

বিবেকী পত্রিকার স্বেচ্ছান্যস্ত দায়ই তাই।

সে দায় কতখানি পালন করতে পেরেছে তার বিচার পাঠকদের হাতে। শুধু তার আন্তরিকতাটুকু স্বীকৃত হলেই "চতুরঙ্গ" কৃতার্থ।

"চতুরঙ্গ" আশাবাদী, আঠারো বছরের যাত্রারম্ভে নবীন আশা ও সংকল্প নিয়ে সে দাঁড়িয়ে।

পত্রিকা প্রকাশের জগতে ইতিমধ্যে ভালোমন্দ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। কয়েকটি সার্থক নতুন প্রবর্তনের কৃতিত্ব হয়ত "চতুরঙ্গ" সবিনয়ে দাবী করতে পারে। কিন্তু সে প্রবর্তনের সম্মান পাওয়া না পাওয়া তার কাছে বড় কথা নয়। বর্তমান ও আগামীকালের যথার্থ দিগ্দর্শনের সহায় হওয়াই তার ব্রত।

সময়ে পরিবর্তনের সঙ্গে "চতুরঙ্গে"র আকৃতি প্রকৃতিরও কিছু অদল-বদল এবার দেখা যাবে। এককালে বিভাগীয় আলোচনা "চতুরঙ্গের"ই বিশেষত্ব ছিল। ভিন্ন ভিন্ন দিকের সংস্কৃতিগত আলোচনা বিভাগের বন্ধনে সংকীর্ণ রাখার প্রয়োজন আর বোধ হয় নেই।

ত্রুটি অক্ষমতা বিশৃঙ্খলা এখনো আমাদের অনেক দিকে, তবু জাতির জীবনের নতুন ছাঁচ তৈরী হচ্ছে বলে "চতুরঙ্গ" বিশ্বাস করে। এই বিভ্রান্ত যুগেও ধ্যানভ্রষ্ট যাঁরা হননি "চতুরঙ্গ" সেই সব স্রষ্টা ও মনীষীদের সাদর আহ্বান জানায়।

ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার

হুমায়ুন কবির

ছাত্রসমাজে অসন্তোষ ও অনুশাসনহীনতার যে সব কারণের আলোচনা এ পর্যন্ত করেছি, তার সামাজিক পশ্চাদপটের দিকেও বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক জগতে বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র যে ভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনো তা ঘটেনি। পুরাকালে বিভিন্ন আদর্শ বা বিশ্বদৃষ্টির এ রকম সমাবেশ কখনো হয়নি, হতে পারত না, কাজেই বিভিন্ন সমাজ নিজ নিজ ধর্ম, আচার বা আদর্শ অনুসারে ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্দেশ করেছে। আজ আর তা সম্ভব নয়। বিভিন্ন আদর্শ ও জীবনদর্শনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অস্বীকার করতে চাইলেও তার প্রতিক্রিয়া এড়াবার উপায় নেই। আজ তাই দেশে দেশে ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে নতুন অনিশ্চয়তা ও লক্ষ্যভ্রান্তির পরিচয় মেলে। সমাজ যেখানে দিশাহারা, সেখানে যে সমাজের যুবমানসও বহুক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

বর্তমানে ছাত্রসমাজের মধ্যে যে আদর্শহীনতা মাঝে মাঝে দেখা দেয়, সমাজের আদর্শহীনতা ও লক্ষ্যভ্রান্তির অঙ্গ হিসাবেই তাকে বুঝতে হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ছাত্র ও যুবসমাজ বোধ হয় সবচেয়ে বেশী সচেতন ও সংবেদনশীল। শৈশবে বা যৌবনান্তে পৃথিবীর দ্বন্দ্বসংঘাত মনকে তত গভীরভাবে স্পর্শ করে না। শিশুমন নিজের স্বপ্নজগতে বাস করেই তৃপ্তি পায়। যৌবনশেষে পৃথিবীর নানা ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্তের সূক্ষ্ম অনুভূতি পূর্বের মত তীক্ষ্ণ থাকে না, অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সহনশীলতা ও পৃথিবীকে বোঝার শক্তি বাড়ে কিন্তু সংবেদনার শক্তি কমে আসে, তা না হলে মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাও কঠিন হত। যৌবনের চেতনায় তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও আবেগের তীব্রতা এত প্রবল বলেই যৌবন এত সহজে নতুনের আহ্বানে সাড়া দেয়, তাই চিরদিন সমস্ত বিপ্লব ও পরিবর্তনে যুবসম্প্রদায়ই অগ্রদূতের ভূমিকায় দেখা দিয়েছে।

ছাত্রসমাজের মধ্যে আদর্শহীনতার প্রকাশ তাই সাম্প্রতিক সমাজের আদর্শচ্যুতির প্রত্যক্ষ ফল। সমাজে যদি অর্থের লোভ প্রবলভাবে দেখা দেয়, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা যদি অভিজ্ঞ বিজ্ঞজনকেও বিভ্রান্ত করে তবে সে দূষিত আবহাওয়ায় তরুণ মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখবে কি করে? সমাজকে বাদ দিয়ে ছাত্রসমাজকে উন্নত করবার চেষ্টা তাই বাতুলতা। বস্তুতপক্ষে সামাজিক পরিবেশেই শিক্ষা বা শিক্ষার্থীর বিকাশ। শিক্ষা যে কি তার বর্ণনা দেবার নানা চেষ্টা হয়েছে, তার পরিপূর্ণ বিবরণ সহজে দেওয়াও যায় না, কিন্তু সকলেই বোধ হয় স্বীকার করবেন যে সমাজের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার দ্বারা ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে সমস্ত পৃথিবী একই সমাজের অঙ্গ, তাই বিশ্বমানবের অভিজ্ঞতা আজ প্রতি ব্যক্তির শিক্ষণীয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার এ বিরাট সমাবেশের মধ্যে যদি আদর্শের ঐক্য খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে জীবনযাত্রার পথে শিক্ষা আলো এনে দেবে না, বরং জীবনপথে এক দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানের যুব ও ছাত্রসম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি ও লক্ষ্যহীনতা দূর করতে হলে তাই আজ সমাজের প্রত্যেক অঙ্গে এবং প্রত্যেক স্তরে নতুন ভাবে মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

পূর্বেই বলেছি যে শিক্ষাবৃত্তির অনাদর বর্তমান জগতের মূল্যবিভ্রান্তির অন্যতম লক্ষণ। সাম্প্রতিক সমাজ যে শিক্ষকবৃত্তিকে অবহেলার চোখে দেখে, শিক্ষকের অর্থহীনতা তার প্রধান কারণ। একথা আমরা হয়ত স্বীকার করতে চাই না, কিন্তু এই মনোভাবের পিছনে অর্থের প্রতি যে মোহ, ভারতবর্ষে আজ তা প্রবল হয়ে উঠেছে। আমরা আজকাল প্রায়ই বলে থাকি যে ভারতবাসী আধ্যাত্মিক, এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতি বা সমাজের তুলনায় এদেশে মূল্যবোধ ও আদর্শবাদ প্রবল। শিক্ষক ও শিক্ষাবৃত্তির প্রতি আমাদের যে মনোভাব তাতে কিন্তু এ দাবী মানা কঠিন। বস্তুতপক্ষে ইংলণ্ডে অথবা ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে আজও শিক্ষকের যে মর্যাদা ও সম্ভ্রম, তার সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের আধ্যাত্মিকতার দাবি টেঁকে না। অর্থ ও বিত্ত দিয়ে আজ আমরা সামাজিক মর্যাদার বিচার করি, এবং তার ফলে যে কেবল শিক্ষকের ইজ্জত কমেছে তা নয়, সমস্ত সমাজে আদর্শ-হীনতা ছড়িয়ে পড়েছে। শৈশব থেকে শিক্ষার্থী শোনে এবং পড়ে যে অর্থ দিয়ে মানুষের বিচার করা চলে না, বিভিন্ন বৃত্তির মর্যাদা বা ইজ্জত অর্থাগমের উপর নির্ভর করে না, গুরু দরিদ্র হলেও সমাজের শীর্ষস্থানীয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তারা দেখে যে গুরু বা শিক্ষকের স্থান সমাজের নিচু কোঠায়। কথা ও কাজের মধ্যে যেখানে এতখানি তফাৎ, সেখানে তরুণের বিশ্বাসের ভিত্তি অটল থাকবে কি করে? ফলে তারা শৈশব থেকেই দৈনন্দিন জীবনের দাবি এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের আহ্বানকে স্বতন্ত্র করে দেখতে শেখে, ভাবে যে এসব বড় বড় বুলি সময় ও সুবিধামত মন্ত্র উচ্চারণের জন্য, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনের শত শত ছোটখাট কাজে তাদের কোন প্রয়োজন নেই।

বিক্ষুব্ধ ও আদর্শভ্রষ্ট শিক্ষকের ব্যবহারে আদর্শ ও বাস্তবের অন্তর আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষার্থী স্বভাবতই শিক্ষককে গুরু বলে শ্রদ্ধা করতে চায়, সমাজে শিক্ষকের যে অনাদর তার ফলে তার সে স্পৃহা প্রথম ধাক্কা খায়, কিন্তু শিক্ষক যদি এ প্রতিকূল অবস্থায়ও নিজের আদর্শবোধ বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, তবে শিক্ষার্থীও তার আদর্শবোধ বাঁচিয়ে রাখতে পারে বরং শিক্ষকের চারিত্রবল ও ধনমানের প্রতি নিস্পৃহতা তার মনে আরো বেশী দাগ কাটে। এরকম একাগ্রচিত্ত ও নির্লোভ শিক্ষকের অভাব আজও নেই, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করার ফলে সকল শিক্ষকের পক্ষে এ আদর্শ পুরোপুরি বজায় রেখে চলা কঠিন। লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের মধ্যে ভালো মন্দ সব রকম লোকেরই পরিচয় মেলে। কিন্তু যদি শিক্ষক সম্প্রদায়ে আদর্শহীন লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়, তবে তার ফলে যে কেবল শিক্ষার ক্ষতি হয় তা নয়, সমস্ত সমাজের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হয়ে উঠে। শিক্ষার ফল সুদূরপ্রসারী কিন্তু অপাতদৃষ্ট নয় বলেই সমাজ এ সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন নয়। আজ যদি শিক্ষকের চরিত্র ও শিক্ষার মান কমে যায়, তবে তার বিষময় ফল পুরোপুরি দেখা দেবে বিশ ত্রিশ বৎসর পরে। তেমনিভাবে আদর্শবান ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষকের সেবায় সমাজের যে মহৎ লাভ, তাও বহুদিন স্পষ্টভাবে ধরা দেবে না, শিক্ষার ফল দীর্ঘদিন পরে বোঝা যায় বলেই সমাজ শিক্ষককে অবহেলা করতে পারে, কিন্তু একদিন এ অনাদরের দাম সমাজকে দিতে হয়।

শিক্ষকের মর্যাদা ফিরিয়ে আনবার যে সব উপায়ের কথা আগে উল্লেখ করেছি, সেগুলি অবলম্বন করলে যে কেবল শিক্ষকের আত্মসম্ভ্রম ফিরে আসবে তা' নয়, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-সমাজের আদর্শভ্রষ্টতার একটি প্রধান কারণ লুপ্ত হবে। নিষ্ঠাবান শিক্ষকের ছাত্র তাঁর জীবনের উদাহরণ দেখে নিষ্ঠা শিখবে। এ কথাও বলা চলে যে, সাধারণত খানিকটা আদর্শবাদ

না থাকলে কেউ শিক্ষক হতে চায় না। সমাজের অন্য পরিবর্তন যতই হোক না কেন, সাম্প্রতিক জগতে অর্থ বা ক্ষমতার বিচারে শিক্ষক খানিকটা পিছিয়ে থাকতে বাধ্য। তাই যারা অর্থপ্রিয় বা ক্ষমতালোভী, তারা স্বেচ্ছায় শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে না। বর্তমানে যে শিক্ষক সম্প্রদায় বহুক্ষেত্রে আদর্শভ্রষ্ট তার মুখ্য কারণ অভাবের তীব্রতা, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে মনুষ্যধর্মকে পুরোপুরি বাঁচিয়ে রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং জাতীয় শিক্ষাধারার প্রবর্তনের ফলে যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা লক্ষের কোঠায় পেঁছিয়, সেখানে অধিকাংশ শিক্ষক সাধারণ মানুষ হতে বাধ্য। অভাবের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে তাঁরা শিক্ষক-সুলভ আদর্শবাদ ফিরে পাবেন, এ আশা করা তাই অন্যায় হবে না।

পূর্বেই বলেছি যে ছাত্রজীবনে ব্যক্তি সমাজের কাছে ঋণী। ভারতবর্ষে প্রতি ব্যক্তির মাথা পিছু আয় বৎসরে তিনশ' টাকাও নয়, অথচ স্কুলের ছাত্রেরও বাৎসরিক খরচ প্রায় পাঁচশ' ছয়শ' টাকা, কলেজে ইউনিভার্সিটীতে প্রতি ছাত্রের সমস্ত খরচ হাজার টাকা বা তারো বেশী। অথচ ছাত্রাবস্থায় কিশোর বা যুবক সমাজকে কিছুই দেয় না, তাই অন্যের পরিশ্রম ও অর্জিত অর্থের দ্বারাই ছাত্রাবস্থার দাবি মেটাতে হয়। ছাত্রাবস্থার শেষে যদি কিশোর বা যুবক সমাজকে অধিক সেবা করতে পারে, তবেই ছাত্রজীবনে সমাজের গড়পড়তা খরচের দ্বিগুণ বা তিনগুণ এ খরচকে সার্থক মনে করা চলে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বলা হ'ত যে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ছাত্রাবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে তৈরী করে গার্হস্থ্য জীবনে সমাজের সেবা করতে হবে, এবং যে এ ভাবে সমাজকে সেবা করেনি, তার মুক্তির অধিকার নেই।

সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সমাজ-সেবার মনোভাব ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করতে হ'লে শিক্ষকের কেবল উপদেশ দিলে চলবে না- কথায় এবং কাজে, আদর্শে এবং ব্যবহারে, বিশ্বাসে এবং আচারে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। শিক্ষক যেদিন নিজের জীবনে এ সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, সে দিন ছাত্রসমাজের বিভ্রান্তি ও অনুশাসনহীনতার মূল উৎপাটিত হবে সমাজের বর্তমান আদর্শহীনতা দূর হয়ে যাবে। যেখানে ছাত্রসংখ্যা অল্প এবং শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সহজ, সেখানে সমাজ-চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজকাল ছোট ছোট গ্রাম ভেঙে বড় সহর তৈরী হচ্ছে, ছোট ছোট স্কুল পাঠশালা একত্রিত করে বিরাট বহুমুখী স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তাই এ অবস্থায় ছাত্রদের মনে সমাজ-চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষে আজ মানব-সমাজকে নতুন করে ঢালবার চেষ্টা চারিদিকেই দেখা যায়, পুরাতন সামাজিক অন্যায় ও অসাম্য দূর করে নতুন সমাজ-তান্ত্রিক গণ-আদর্শ স্থাপিত করবার প্রয়াসে গ্রাম ও সহর নতুনভাবে গড়ে উঠছে। কিশোর ও তরুণের সামনে আজ যে মহৎ মানবিক আদর্শ, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীতে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নয় বরং সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য জনগণমন অধিনায়কের যে উদ্দীপ্ত উদ্বোধন, সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারলে মনের সমস্ত গ্লানি এবং কালিমা মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে। আদর্শবাদী তরুণ স্বভাবতই এ আহ্বানে সাড়া দিতে চায়, কিন্তু নানা সামাজিক বাধা ও নিষেধের ফলে কখনো কখনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাই বৃহত্তর কর্মের মধ্যে আত্ম-নিবেদনই যে মানব-জীবনের সার্থকতা এ কথা ছাত্রসমাজের মনে গেঁথে দেওয়াই আজ শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য।

কৈশোরের ধর্ম আত্মোৎসর্গ। শৈশবের শেষে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উল্লেখ-যোগ্য, কিন্তু তার চেয়েও বেশী উল্লেখযোগ্য আবেগের আকস্মিক বিকাশ। নিজের স্বার্থকে

অতিক্রম করে সমাজের জন্য ব্যক্তির আত্মদান, আদর্শের প্রেরণায় জীবনের সুখ স্বপ্ন বিসর্জন একান্তভাবে কৈশোর ও যৌবনের লক্ষণ। দেশে দেশে যুগে যুগে তরুণ নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছে, নতুন সমাজ সৃষ্টির সাধনায় অকুণ্ঠ উৎসাহে আত্মদান করতে এগিয়ে এসেছে। মহাযুদ্ধের ফলে সমাজের আদর্শচ্যুতির কথা আগে বলেছি, কিন্তু যুদ্ধের কালো মেঘের মধ্যে তরুণের আত্মদানস্পৃহা বিদ্যুৎশিখার মতন ঝলসে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে তরুণ-চিত্ত ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে বিশ্বশান্তির স্বপ্ন দেখেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দেশে দেশে তরুণ চায় যে মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে সকল দেশের সকল মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম করে এক সম্মিলিত বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে তুলুক। হৃদয়কে স্পর্শ করে, চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং উৎসাহকে উদ্দীপ্ত করে, এ রকম আদর্শ তরুণের সামনে তুলে ধরলে তরুণ চিরদিন তাতে সাড়া দিয়েছে, সাড়া দেবে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ বহু যুগের বহু গ্লানি, বহু অসাম্য ও অন্যায়কে দূর করে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নতুন গণতন্ত্র গড়ে তুলবার সাধনায় মগ্ন-সেই সাধনার আগুন যদি একবার তরুণ সম্প্রদায়ের মনকে স্পর্শ করে, তবে তাদের জড়তা, আলস্য এবং অনুশাসন-হীনতা মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের শিক্ষকের পক্ষে তাই ছাত্রসমাজের অসন্তোষ বা অনুশাসনহীনতা নিয়ে অনুযোগ করা সাজে না, তাদের পক্ষে এ অভিযোগ করার অর্থ যে তাঁরা তরুণসমাজের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেননি, নিজের কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ বা অসার্থক হয়েছেন।

দুঃখকষ্টের ভয়, এমনকি মৃত্যুভয়ও তরুণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না, বরং তরুণ বয়সে বিপদের মোহ হৃদয়কে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে যে গুপ্ত-সমিতি বা কঠিন কর্তব্যসাধনে তরুণ ও কিশোরই প্রথম এগিয়ে আসে। তরুণ মনের এ স্বাভাবিক ধর্মকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারলে কিশোর ও যুবককে কঠিন তপস্যায় ব্রতী করা কঠিন নয়। কৈশোরের শেষে এবং যৌবনের প্রারম্ভে অনেকের মনে যে ধর্মবোধ প্রবলভাবে জেগে ওঠে, তাও কৈশোরের এই অসাধ্যসাধনের প্রয়াসের অঙ্গ। ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশে নানা প্রভেদ বলে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্মকে আমরা পৃথক মনে করি, এমন কি আচার ও সংস্কারের বিভিন্নতার জন্য মানুষে মানুষে সংঘাতও লেগে যায়, কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করলে দেখা যাবে যে বিরাট বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য সাধনই সমস্ত ধর্মের মর্মকথা। নিজেকে অতিক্রমণের এই সাধনায় সমস্ত ছোট ছোট স্বার্থ, ছোট ছোট প্রয়াসকে বর্জন করতে হয় বলে ধর্ম ব্যক্তিকে বিরাট মুক্তি এনে দেয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লাভ-ক্ষতির হিসাব, আগু-পিছুর বিচার আমাদের কর্মপ্রেরণাকে সংকীর্ণ এবং বহুক্ষেত্রে ব্যর্থ করে তোলে। ধর্মের বিরাট আহ্বানে ব্যক্তিত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় বলে মানুষ একই সাথে কর্মপ্রেরণা ও শান্তি খুঁজে পায়। সমাজ বা পৃথিবীর স্বার্থের প্রয়োজনে যে নিজের স্বার্থকে বিসর্জন করতে পারে, সে চিরদিনই শক্তিমান-ধর্মের আহ্বানে যে বিশ্বশক্তির মধ্যে নিজেকে বিলীন করতে পারে, সে কেবল শক্তিমান নয়, সার্থক এবং সিদ্ধপুরুষ।

কিশোর বয়সে ছাত্রদের মধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা প্রবল, তাই ধর্মজীবনের এ শাশ্বত সত্য কিশোর বয়সেই তাদের মনে সঞ্চারিত করতে হবে। এ কথার অর্থ এ নয় যে বিভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠান বা আচার নিয়ে কিশোর সম্প্রদায় তৎপর হয়ে উঠবে—আচার বা অনুষ্ঠান বহুক্ষেত্রে মুক্তির বদলে নতুন বাধা-নিষেধের বন্ধন নিয়ে আসে—এ কথার অর্থ যে ধর্মের বিরাট আত্মোৎসর্গের সাধনা কিশোরচিত্তের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক

ধর্মের মূলে যে মানবিক আদর্শ, যে শাশ্বত সত্য যুগে যুগে সত্যদ্রষ্টা ঋষি নবী পয়গম্বরদের উদ্বুদ্ধ করেছে, কিশোর বয়সে যদি ছাত্রসমাজ সেই সমস্ত আদর্শ, সেই মহাসত্যের সন্ধান পায়, তবে তাদের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। পৃথিবীর কঠিন পথে এ সমস্ত আদর্শের চেয়ে উপযুক্ত পাথেয় কিছুই নেই।

নানাভাবে ছাত্রসমাজের মনে এই ধর্মবোধ উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। অনেক স্কুল কলেজে প্রতিদিন নিয়মিত পাঠক্রম সুরু হবার আগে সমস্ত ছাত্রছাত্রী একত্র সম্মিলিত হয়। অধ্যক্ষ বা কোন শিক্ষক, বা কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে কেউ কোন ধর্মগ্রন্থ বা মহৎ সাহিত্য থেকে কিছু পাঠ করার পরে সবাই খানিকক্ষণ নীরবে আত্মসমাহিত হবার চেষ্টা করে। এ ধরনের সমাবেশের সুফল নানা ভাবে দেখা দেয়। প্রতিদিন একত্র হয়ে পাঠ বা চিন্তার ফলে সকলের মনে গোষ্ঠিবোধ সজাগ হয়ে উঠে, মহৎ ব্যক্তির মহৎ চিন্তার সাহচর্যে প্রত্যেকের মন ও হৃদয় উদার হয়। যদি পাঠক্রম যথাযথভাবে বেছে নেওয়া যায়, তবে এ ধরনের প্রতিদিনের সমাবেশের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য দিনে দিনে প্রত্যেক ছাত্রের কাছে বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠবে।

সকল মানুষের ঐক্য ও সাম্যকে স্বীকার করার প্রয়োজন আজ যত প্রবল হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনদিন তা হয়নি। পুরাকালে বিশ্বসাম্য বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব কবি ও আদর্শবাদীর কল্পনার বিষয় মাত্র ছিল কিন্তু বর্তমান যুগে তার স্বীকৃতি মানুষের বাঁচবার একমাত্র উপায়। ছাত্রবয়সে যদি এই বিশ্বসাম্য ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ তরুণের মনে সঞ্চারিত না হয় তবে সংঘাতের ফলে বর্তমান সভ্যতার বিনাশ বোধ হয় অনিবার্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতিহাস ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলাতে হবে, মানুষের ইতিহাসে প্রতিযোগিতা ও সহযোগের কি ফল সে বিষয়েও নতুন করে বিচার করতে হবে। এ পর্যন্ত প্রায় সকল দেশেই জাতীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে অন্য জাতির প্রতি খানিকটা বিরাগ বা অবহেলা ইতিহাসের অঙ্গ মনে করা হত। আজ বিভিন্ন জাতির পরস্পরের সম্বন্ধকে এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে হবে। এ কথার অর্থ ইতিহাসের বিকৃতি নয় সত্যকে অস্বীকার বা বিলুপ্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য- এ-কথার অর্থ শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। পূর্বে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গীতে যে ঘটনার বিচার হয়েছে, আজ পৃথিবীর বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে তার বিচার করতে হবে। তার ফলে আমাদের অনেক ধারণা বদলে যাবে, পুরাতন অনেক মূল্যবিচারে পরিবর্তন আসবে। সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে প্রকাশ করবার ভঙ্গীরও খানিকটা বদল হবে। সত্য এবং নিভুল সত্যকে প্রকাশ করাই ঐতিহাসিকের কাজ, কিন্তু সমস্ত সত্যকে একেবারে সকলের কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা বহুক্ষেত্রে মূঢ়তা। বর্তমানেও সকল কথা সকলকে আমরা সর্বত্র বলি না। শিশুর জন্য লিখিত ইতিহাসে হিংসা দ্বেষ বা দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলে কোন লাভ নেই, বড় হয়ে বৃহত্তর পরিবেশে এ সমস্ত দ্বন্দ্ব সংঘাতের ইতিহাসও তাকে পড়তে হবে। কিন্তু শৈশবে মানুষের মহৎ ঐক্য সাধনার ইতিহাসই যেন তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বস্তুতপক্ষে, মানুষের সমগ্র ইতিহাসে দ্বন্দ্বের চেয়ে সহযোগই প্রবলতর শক্তি। মানুষের ইন্দ্রিয় দুর্বল, অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় মানুষ জীবন-যুদ্ধের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী, তবুও যে মানুষ সমস্ত প্রাণীজগতের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে, পারস্পরিক সহযোগ তার একমাত্র কারণ। মানুষের ভাষা বোধ হয় এ সহযোগের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর কোন প্রাণীই মানুষের মত ভাষা বিকশিত করতে পারেনি এবং ফলে মানুষের কাছে হার

মেনেছে। মানব-সমাজের এই অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সহযোগ ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করতে না পারলে শিক্ষকের কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পূর্বেই বলেছি যে সমাজে আদর্শবোধ জাগ্রত না হলে কেবল ছাত্রদের মধ্যে আদর্শবোধ সঞ্চারিত করা কঠিন। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে যদি ছাত্রজীবনেও আদর্শবাদ প্রবল না থাকে, তবে পরবর্তী জীবনে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তারা আদর্শবাদী রইবে এ কল্পনা আরো সুদূর পরাহত। প্রথম দৃষ্টিতে হয়ত মনে হতে পারে যে এ বিষচক্র ভাঙবার উপায় নেই—আদর্শচ্যুত সমাজে তরুণ সম্প্রদায়ও আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং যদি তরুণ বয়সেই আদর্শচ্যুতি ঘটে তবে পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসহীনতা অনাচার ও সাংসারিক সংকীর্ণবুদ্ধি আরো প্রবল হতে বাধ্য কিন্তু তরুণ মনের মধ্যে আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের যে প্রেরণা, বৃহত্তর আদর্শ ও সত্যের মধ্যে আত্মবিলোপের যে সাধনা, বিপদ ও কঠিন পথে চলবার যে দুর্নিবার আকর্ষণ, সে কথা স্মরণ রাখলে এ বিষচক্র ছেদ করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। যুগ যুগান্ত মানুষের যে মহৎ সাধনা সহযোগের পথে মানুষকে নতুন নতুন বিজয়ের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, নতুন নতুন সত্যের সন্ধানে মহামনা মানবের যে কঠিন ও বিরাট প্রয়াস, শিক্ষক যদি তরুণ সম্প্রদায়ের মনে তার আহ্বান সঞ্চারিত করতে পারেন, তবে তরুণ হৃদয় তাতে সাড়া দেবেই। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক যদি একথাও স্পষ্ট করে তুলতে পারেন যে সে সাধনার শেষ হয়নি, কোনদিন তার সমাপ্তি নেই, আজো অলব্ধ সত্য দুর্লভ গিরিশিখরে তরুণ তপস্বীর প্রতীক্ষায় রূপকথার রাজকন্যার মত মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন, তবে অসাধ্যসাধনার সাধক তরুণ নতুন অভিযানে যাত্রা করবেই। শিক্ষকের মনে আগুন না থাকলে ছাত্রদের মনে আগুন জ্বালাবে কে? তাই সমস্ত শিক্ষা সংস্কারের গোড়ার কথা আদর্শবাদী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ শিক্ষক। যেদিন নতুন ভারতবর্ষ এই নতুন যুগের উপযুক্ত শিক্ষক সম্প্রদায় গড়ে তুলবে, সেদিন শিক্ষা প্রণালীর সমস্ত নিন্দা, অনুশাসনহীনতার সমস্ত অভিযোগ স্বভাবতই মিটে যাবে। শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সাধক ও তপস্বীর আবির্ভাব আসন্ন, এই আশা আজ প্রত্যেক শিক্ষকের জীবনে নতুন আলো, নতুন উৎসাহ এনে দিক।

॥ সমাপ্ত ॥

চেনা দেশ

বিষ্ণু দে

তোমাতে পাহাড় আর সমুদ্রের বালুবেলা মেশে,
স্পষ্ট সুগঠিত রূপে কোমল সোনালি বিস্তারের
আদিগন্ত অসীমতা। আমার অন্বেষা এই দেশে
অবিরাম, অন্তহীন আকর্ষণে খুঁজে ফিরি ফের
যা পেয়েছি বহুবার—যেন কেউ নিজে তৃপ্তি পায়
নিজের সত্তাকে পেয়ে চৈতন্যের নিঃসঙ্গ আশ্লেষে!
এ যেন বাতাসে খোঁজা আকাশের সীমান্ত কোথায়,
যেন অগণিত সূর্য তারা ছোটে আকাশের শেষে
মৃত্যুর বিশ্রাম চেয়ে!
এ দেশ আমার চেনা দেশ,
আমারই আপন সত্তা, অফুরন্ত এর গাছে ঘাসে
আমার চোখের মুক্তি, প্রত্যহ টিলায় আনাগোনা,
ঝিরিঝিরি বালুকায় সর্বাঙ্গের নিত্য চেনাশোনা,
স্বচ্ছ ঝরণায় মুখ, পান করি নিশ্বাসে নিশ্বাসে
আকণ্ঠ যে সুধা তাতে দিনরাত্রি মুক্ত, নিরুদ্দেশ
নিঃসঙ্গের মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত শরীরে শরীরে।

আমার পৃথিবী তুমি বিচিত্রার মানস গভীরে॥

একই তৃষ্ণায়

অরুণ মিত্র

বারম্বার একই তৃষ্ণায়।

করুণ বিদায় নিয়েছিলাম শৈশবের কাছে
সেই শৈশব
যখন আমার উচ্ছ্বাস নিয়ে সবুজ পাতা
আমার অবাক চোখ নিয়ে আকাশ
আমার কণ্ঠ নিয়ে নদী
যখন প্রত্যেক অন্ধকার থেকে আমার জন্ম
বিস্ময়ের মধ্যে
এই পৃথিবীকে এক শিশু
জুড়ে জুড়ে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছে
তার স্তব্ধ কথা আর অনর্গল নিশ্বাসের ভিতরে
তার অস্থির ঘুমের ভিতরে
কিন্তু ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে তা ছোঁয়া যায়নি
মানুষের আকাঙ্ক্ষার তপ্ত লোহা
তার স্নায়ুর উপর থেকে গেছে।

যৌবনের শরীর যেন সমুদ্রে জরোজরো
জলের ঝর্ঝর শুধু আমার জোয়ান বুকের মধ্যেই শুনেছি
কেবলই মনে হয়েছে অন্ধকার বুঝি বাজবে বর্ষার মতো
আর আমি সেখানে আমার শুকনো ঠোঁট পাতব
মনে হয়েছে আমার রক্তের কোরক থেকে
আশ্চর্য ফুল ফুটবে
উদ্দাম আলোয় ভেবেছি রাত্রিকে জুড়ব
সব প্রখরতা যে চূড়ায় উঠে ভেঙে জুড়িয়ে যায়
সেখানে পৌঁছব
চেয়েছি
রোদের প্রণয়ে যেন সব তারা ফুটে ওঠে
যেন সব কিছু চেনা যায় আমার প্রগাঢ় চোখে
কিন্তু দিন অথবা রাত থেকে বেরিয়ে এসে
যত মুখ দেখেছি তারা জ্বলন্ত
আমার চোখের জ্বালায় তারা গড়া।

জীবনের মহড়ায় আমার পদক্ষেপ
একই অংগারে
কোনো সেতুর দিকে তা এগোয় না
আমার সামনে
সমস্ত মেয়েপুরুষের মেলায় মিলবার পথ
প্রত্যেক প্রত্যূষ আর গোধূলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

নিঃসঙ্গ

অশোকবিজয় রাহা

দিন নিভে আসে,
পাহাড়ের গায়ে
সন্ধ্যার ছায়ারা নামে,
হ্রদের উপরে
মিলায় রঙের খেলা,
আকাশের কোণে
একসারি বক উড়ে যায়।

খাঁড়ির ওদিক থেকে শোনা যায় হরিণের ডাক—
তারপর চুপ,
থমথম সেগুনের বন,
চারদিক থেকে
গাছেরা নিশ্বাস ফেলে।

ধীরে-ধীরে অন্ধকার নামে,
মনের আকাশে
স্মৃতি ভিড় করে :
ভেসে আসে কত চেনা-মুখ
পরিচিত হাসি-কোলাহল
নগর বন্দর
জীবনের উজ্জ্বল মিছিল।

হঠাৎ চমক ভাঙে পেঁচার চীৎকারে
স্বপ্ন ছিঁড়ে যায়,
চারদিকে পাহাড়ের রাত
ওদিকে রবারগাছে পাতার আড়ালে
উঁকি দেয় পঞ্চমীর চাঁদ,
হ্রদের মসৃণ জল এককোণে চকচক করে।

মন বলে নিশ্বাস ফেলে
শেষ হল আরো এক দিন,
চেতনার শেষপ্রান্তে একটি বাষ্পের রেখা কাঁপে।

সংসার বৈরাগ্য

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আত্ম-অপ্রত্যয় হেতু নির্বিলাপ আত্মপ্রবঞ্চনা
অসন্দিগ্ধ চিত্তে আনে সুস্থির সন্তোষ,
জড়দেহে নিষ্প্রাণের কিসের আপশোষ
মিথ্যা আত্মপ্রসাদের নিরন্তর গঞ্জনা।

সূর্যালোক হতে চক্ষু ধূলায় আনত
আকাশ রয়েছে থাক শূন্যের উপর,
জনশূন্য তেপান্তরে বেলা দ্বিপ্রহর;
নানা দিক দেশ হতে পক্ষী সমাগত
শাল্মলী বৃক্ষের ঘন শাখায় শাখায়
ব্যাধের বন্ধুত্ব লেখা তাদের পাখায়।

বিতর্ক বিচার কিম্বা সিদ্ধান্ত সংকটে
ব্যক্তির স্বতন্ত্র মত চিত্তচমৎকারী
আত্মনাম ঘোষণারে যাই বলিহারি,
মানসাঙ্কে দেখা যায় বুদ্ধি নাই ঘটে।
তথাপি উৎকণ্ঠা বাড়ে জন্মমৃত্যুহারে,
আত্মপর ভেদাভেদ অদ্বৈত বিজ্ঞান
পরীক্ষা ও নিরীক্ষায় ব্যর্থ হতমান
কিছুটা সাশ্রয় করে দ্বন্দ্ব সমাহারে।

কিন্তু যার মাথা ব্যথা তিনি নিদ্রা যান
সংসার বৈরাগ্য? সেত শাস্ত্রের বিধান।

ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর পুনর্বিচার

[illegible]প্রবোধ বসু

দ্বন্দ্ব-সমাধানে ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌

একদা হেগেলের নির্বিকল্প প্রজ্ঞানবাদ দিগ্বিজয়ী হয়ে পাশ্চাত্য ভাববাদী দর্শনের শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিল। সেদিন বিদগ্ধসমাজে দর্শন বলতে বোঝাত জার্মান ভাববাদ এবং জার্মান ভাববাদ বলতে বোঝাত হেগেলের প্রজ্ঞানবাদ। হেগেলের যুক্তিধারা ও মতবাদ অবলম্বন করে অগ্রসর হোত দর্শনের যাবতীয় সমীক্ষা। তার সেই অসপত্ন প্রতিষ্ঠার দিনে ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর বিচারধারা সত্যজিজ্ঞাসার অকাট্য প্রণালী বলে গণ্য হয়েছিল। তারপর হেগেলের গৌরবরবি অস্তমিত হোল, প্রজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করে সমাজবিপ্লবের তূর্য বাজিয়ে এল মার্ক্‌স্‌-এর বস্তুবাদ। তথাপি ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হোল না। বরং ভাববাদ ও বস্তুবাদ উভয়ের স্বাক্ষর নিয়ে ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর ন্যায়শাস্ত্র সুধীজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হোল।

সমস্যা হতে দার্শনিক ভাবনার উৎপত্তি। ঘটনার অভ্যন্তরে চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য লক্ষ্য করে কৌতূহলী মনীষা তার সমাধান খুঁজেছে। পুরাকালে তথাগত বিশ্বের মূলগত এই রহস্যটি তুলে ধরেছিলেন শিষ্য কচ্চানের কাছে। যখন চোখ মেলে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকাই দেখি সবই আছে, মনে হয় কেবল 'অস্তি', কোথাও 'নাস্তি'র অবকাশ নেই। আবার যখন দেখি সমস্তই নশ্বর, সমস্তই অমোঘ নিয়মে প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তখন বোধ হয় সকলই 'নাস্তি', কোথাও 'অস্তি'র লেশমাত্র নেই। তথাগত 'অস্তি' ও 'নাস্তি'র বৈপরীত্যের সমাধান পেয়েছিলেন অচ্ছেদ বিবর্তনের মধ্যে। 'অস্তি' অবিরাম 'নাস্তি'র মধ্যে লীন হচ্ছে, আবার 'নাস্তি' থেকে নিরন্তর উদ্ভব হচ্ছে 'অস্তি'র। ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের সন্তানবাদ।

দৃষ্টির বৈপরীত্য সমাধানের পদ্ধতি বিস্তারিত হয়েছে জৈনশাস্ত্রের সপ্তভঙ্গী ন্যায়ে। বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন হতে ঘটে দৃষ্টির ও বোধের পার্থক্য। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে একই বস্তু অস্তি, নাস্তি, অস্তি-নাস্তি, অনির্বচনীয়, ইত্যাদি সপ্তপ্রকারে জ্ঞাত হতে পারে। কোন বস্তুই একান্ত নয়, সকল বস্তুই অনেকাত্মক, অর্থাৎ অপর বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত, অপর বস্তুর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বস্তুজ্ঞানমাত্রই আপেক্ষিক, বিভিন্ন সম্পর্কে ও পটভূমিতে তার জ্ঞানও ভিন্ন। তাই দেখা যায় বস্তু কখনো আছে কখনো নেই কখনো থেকেও নেই, কখনো অনির্বচনীয়, কখনো আছে কিন্তু অনির্বচনীয়, কখনো নেই এবং অনির্বচনীয়, কখনো থেকেও নেই এবং অনির্বচনীয়। জৈনদর্শনের স্যাদ্‌বাদ এই প্রকারে ভেদাভেদ ও অসঙ্গতির বিচার করেছে।

যবন দার্শনিক জেনো বৈপরীত্যের হেঁয়ালিটি উত্থাপন করেছিলেন গতিশীল তীরের দৃষ্টান্ত দিয়ে। গতিশীল তীর যদি থাকে তবে তাকে নির্দিষ্ট ক্ষণে কোন এক স্থানে থাকতে হবে। তাহলে তীর হয় অবস্থিত, অচল। তীর যদি গতিশীল হয় তবে কোন ক্ষণেই তা এক স্থানে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাহলে তীর কোথাও নেই, তার অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং অস্তিত্ব থাকলে গতি নেই, গতি থাকলে অস্তিত্ব নেই। ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর যুক্তিতে তীরের এই অন্তর্বিরোধ অর্ধদর্শিতার বিভ্রান্তি। তীর ও গতিকে

স্বতন্ত্র করে দেখবার ফলে এই বিচার-বিভ্রম ঘটে। গতিশীল-তীর এক অভিন্ন বস্তু, যার জন্যে তীর এক স্থানে থেকেও নেই —অর্থাৎ আছে কিন্তু অস্থির ভাবে।

বিরোধী প্রস্তাব ও বিপরীত ধর্মের সমাধান কোরল ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর বিচার-পদ্ধতি। ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ অর্থ তর্কবিজ্ঞান। প্রস্তাব, খণ্ডন ও প্রতিষ্ঠা তর্কের এই ত্রিপাদতত্ত্ব হোল যাবতীয় ভৌতিক ও নৈতিক ক্রিয়ার অবধারিত বিধান। গতি ও বিবর্তনের ব্যাখ্যানে তর্কবিজ্ঞানকে সর্বপ্রযুজ্য বিশ্বনিয়মের রূপ দিলেন হেগেল, তাকে গ্রহণ করলেন মার্ক্‌স্‌। অতিবিস্তারের স্বাভাবিক পরিণাম হোল বহুল হেত্বাভাস দোষ।

ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর হেত্বাভাস

ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর প্রতিপাদ্য বিষয় হোল যে গতি ও বিবর্তন দ্বন্দ্বসাপেক্ষ। ভাব ও প্রতিভাবের দ্বন্দ্বে ওঠে বিবর্তনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস, প্রতিভাবের বীজ ভাবের গর্ভেই লুক্কায়িত থাকে এবং প্রসবকালে ভাব হতে নিষ্কাশিত হয়। প্রতিভাব ভাবকে গ্রাস করে পরিণত হয় সদ্‌ভাবে, সমাধানে। সদ্‌ভাব আবার নূতন ভাবরূপ গ্রহণ করে, জন্ম দেয় তার প্রতিভাবের এবং ঐ প্রকারে চলে দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি। এই সূত্রটিকে প্রমাণ করবার জন্যে ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌বাদীরা প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে বহু নজিরের উল্লেখ করেছেন, যথা, চুম্বকের বিপরীতধর্মী মেরুদ্বয়, বিদ্যুতের সাত্মক ও অনাত্মক কণা, গ্রহনক্ষত্রের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, প্রজননে পুরুষ ও স্ত্রী। এর কোন ক্ষেত্রেই প্রতিভাব ভাব থেকে উপজাত হয় না, এবং সদ্‌ভাবও পুনরায় ভাবরূপে উপস্থিত হয়ে নূতন প্রতিভাবের জন্মদান করে না। এখানে দ্বন্দ্বমান বস্তুদ্বয় স্ব স্ব রূপে ও গুণে অবস্থিত।

ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ এর ত্রিপাদতত্ত্ব থেকে হেগেল তিনটি সূত্র উপপাদন করেছেন: (১) বিপরীতের মূলগত ঐক্য। (২) বিনশনের বিনশন। (৩) পরিমাণের পরিবর্তন হতে গুণের পরিবর্তন। কী বাস্তব, কী মানস কোন দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যানেই এই তিন সূত্র পর্যাপ্ত নয়।

প্রথম সূত্র মূলগত ঐক্য। পূর্ব ও পশ্চিম, দেনা ও পাওনা, এই বৈপরীত্যের পিছনে যে ঐক্য আছে তা বোধগম্য। কিন্তু পুরুষ ও নারী, সাত্মক ও অনাত্মক বিদ্যুৎকণা এদের মূলগত ঐক্য অবধার্য নয়। দর্শনের রাজ্যে বস্তুবাদ ও ভাববাদ, মুক্তসঙ্কল্পবাদ ও নির্দেশ-বাদ উভয়ের মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র ও একতন্ত্র, এই দ্বিবিধ ব্যবস্থা আমূল বিরোধী।

দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য এই যে এক বস্তু হতে যখন অপর বস্তুর উদ্‌গম হয় তখন প্রথম বস্তুর বিনাশ ঘটে। দ্বিতীয় বস্তু হতে আবার তৃতীয় বস্তুর উদ্‌গম হয়, তখন দ্বিতীয় বস্তুর বিনাশ ঘটে। তৃতীয় বস্তুতে প্রথম বস্তুরই পুনরাবর্তন হয় বৃহত্তর ও উন্নততর ভাবে। দৃষ্টান্ত, বীজ-গাছ-বীজ। গাছ উৎপন্ন হোল বীজকে নাশ করে, বীজ উৎপন্ন হোল গাছকে নাশ করে, কিন্তু এক বীজের জায়গায় এলো বহু বীজ। দুই বিনশনের ফলে ব্যাপক ও উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রথম বস্তুর পুনরাগমন হোল। এই সূত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নয়। উন্নততর জীবের প্রজনন ও প্রসার বিনশনের দ্বারা হয় না। প্রজ্ঞানের মৌলিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে প্রগতি সকল সময়ে বিরোধ ও খণ্ডনের পথে চলে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দর্শনের ভাবনা অগ্রসর হয় সংশোধন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে। হেগেলের দ্বান্দ্বিক প্রজ্ঞানবাদ পূর্ণাবয়ব পেয়েছিল ফিক্‌টে ও শেলিংকে খণ্ডন করে নয়, পরিমার্জনা ও

পরিবর্ধন করে। মার্ক্স্-এর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্যাঁ সিম' ও ফয়েরবাককে বিনাশ করে নয়,—সংস্কার করে, বিস্তার করে।

তৃতীয় সূত্রের তাৎপর্য এই যে বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে এক সন্ধিক্ষণে তার গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এ সম্পর্কে হেগেলের প্রখ্যাত দৃষ্টান্ত, তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে জলের তুষার ও বাষ্পে পরিণতি। শূন্য ডিগ্রী তাপে জল হয় তুষার, এক'শ' ডিগ্রী তাপে হয় বাষ্প। জীবজগতে নূতন প্রজাতির উৎপত্তি, জড়বস্তু থেকে প্রাণীর উদ্ভব, প্রাণী হতে বুদ্ধির বিকাশ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়ের নিরাকরণে এই সূত্র প্রযুক্ত হয়েছে। এর কোন ক্ষেত্রেই উদ্ভবের সন্ধিক্ষণে পরিবর্তনের কোন পরিমাণ নিরূপিত হয়নি। এক'শ' ডিগ্রী তাপমাত্রায় জল বাষ্পে পরিণত হয়। কী পরিমাণ রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে প্রাণের এবং কতসংখ্যক স্নায়ুতন্ত্রীর সঞ্চয়ে বুদ্ধির উন্মেষ হয় যাবৎ তার পরীক্ষা না হবে, তাবৎ এ সূত্র অসিদ্ধ এবং এর বাস্তবতা জলের তাপশৈত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

হেগেলীয় দর্শনের কূটাভাস

হেগেল ও মার্ক্স এই হেত্বাভাসগুলিকে এড়িয়ে গেলেও তাঁদের দর্শনের অনিবার্য অর্থাপত্তি থেকে নিষ্কৃতি পাননি। ডায়লেক্‌টিক্‌স্-এর দ্বন্দ্বসমাধানের মধ্যে গুপ্ত ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব, উভয়েই এর জালে জড়িয়ে পড়লেন।

বস্তুত কূটাভাস ও আত্মখণ্ডনের কলঙ্ক প্রতিভার অঙ্গীভূত। কারণ প্রতিভার লক্ষ্য থাকে অনায়ত্ত সত্যের দিকে। তার নাগাল পেতে গিয়ে সে মননশক্তির সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে দর্শনে প্রবেশ করে স্ববিরোধী প্রত্যয়। তার কূটাভাস ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমে শিষ্য-প্রশিষ্যদের টিকাভাষ্যে মুখর হয়ে ওঠে।

হেগেলের দর্শনে এই কূটাভাস প্রথম প্রকট হোল সত্তা ও বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর স্ববিরোধী সিদ্ধান্তে। তিনি প্রতিপাদন করলেন যে সত্তা এক এবং অদ্বিতীয়। সে হোল নির্বিকল্প প্রজ্ঞান, অমূর্ত, অখণ্ড যার মধ্যে হয়েছে সকল দ্বন্দ্বের নিরসন। অথচ প্রজ্ঞান চিরচঞ্চল, তার গতিতরঙ্গ দ্বন্দ্ব-সমাধানের ডায়লেক্‌টিক্‌স্। সত্তার নির্বিকল্প অখণ্ডতা এবং বিবর্তনের অস্থির চঞ্চলতা, উভয়ের অসঙ্গতি হেগেলের শিষ্যদের কাছে এক দুরূহ জটিলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, যার মীমাংসা তাঁরা করে উঠতে পারেননি।

হেগেলের ইতিহাস ব্যাখ্যানে এই কূটাভাস প্রতিফলিত হয়ে তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর এক তুমুল বিভেদ সৃষ্টি কোরল। হেগেল বলেছেন, ইতিহাস প্রজ্ঞানের মুক্তি-অভিযান,—বিধাতার প্রকাশমান অভিপ্রায়। সুতরাং ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে আছে বিধাতার স্বাক্ষর, প্রজ্ঞানের সমর্থন, প্রতিটি যুগব্যবস্থা নীতি-ও যুক্তিসম্মত। হেগেল আরও বলেছেন যে রাষ্ট্র হোল প্রজ্ঞানের সামাজিক রূপায়ন এবং রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে প্রজ্ঞান মুক্তিলাভ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিধানের দ্বারাই ন্যায়ের মানদণ্ডে ব্যক্তি ও সমাজের অধিকারে সামঞ্জস্য সাধন হয় এবং মানুষ যথার্থ মুক্তির স্বাদ লাভ করে। অতএব রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যই পরম নাগরিক ধর্ম। রক্ষণশীল দল, যাঁরা যুগধর্মকে অস্বীকার করে স্থিতাবস্থাকে অটুট রাখতে চান, তাঁরা এই যুক্তির পিছনে দুর্গ নির্মাণ করলেন।

পক্ষান্তরে হেগেল এও বলেছেন যে ইতিহাসের পদক্ষেপ হয় দ্বান্দ্বিক নিয়মে। প্রতিটি রাষ্ট্র-ও সমাজবিন্যাসের মধ্যে গোপনে লালিত হচ্ছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী,—যে কাল পূর্ণ হলে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে, বর্তমান বিন্যাসকে আত্মসাৎ করে আনবে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ।

সুতরাং কিছুই স্থায়ী নয়। বিশ্বপ্রজ্ঞান নিরন্তর আপন সৃষ্টিকে বিনাশ করে চলেছে অমোঘ দ্বান্দ্বিক নিয়মে, যুগ যায় যুগান্তর আসে। এই তত্ত্বের ভিতর বিদ্রোহী পেলেন ধ্বংসের আমন্ত্রণ এবং সমাজ বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি।

হেগেলীয় তত্ত্বের আর একটি অসঙ্গতি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনর্থ সৃষ্টি করেছিল। হেগেলের মতে ঈশ্বরতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্ব সত্তাকে জানবার দুই ভিন্ন প্রণালী। এর কোনটিই অসত্য নয়। ঈশ্বর নির্বিকল্প প্রজ্ঞানের ব্যক্তিরূপ। প্রজ্ঞান নির্গুণ, অরূপ, ঈশ্বর সকল গুণ ও রূপের আধার। ঈশ্বরতত্ত্বে সত্তাজ্ঞান স্বাভাবিক অন্তর্বীক্ষণবলে স্বতঃলব্ধ, ইহা ভক্তিমান অন্তরে মূর্তি পরিগ্রহ করে ধর্মীয় বিশ্বাসে। দর্শনতত্ত্বে সত্তাজ্ঞান যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগে পরিশুদ্ধ। দর্শন বিচার-ব্যাখ্যানের দ্বারা ধর্ম-বিশ্বাসকে রূপান্তরিত করে ন্যায়ের প্রতিজ্ঞায়। যথা, 'যীশুখৃস্ট ঈশ্বরের পুত্র,' বাইবেলের এই বিশ্বাস ন্যায়শাস্ত্রের বিশ্লেষণে এই তত্ত্বে পরিণত হয় যে, মানুষ মাত্রেই আছে যীশুর মত ঐশ্বরিক গুণ, কেবল অভিব্যক্তির অপেক্ষা। 'দেহের অবসান হলেও ব্যক্তির আত্মা থাকে অমর' এই বিশ্বাসের নৈয়ায়িক রূপ হোল যে মানুষের দেহ ও চিন্তাভাবনা যতই ক্ষণস্থায়ী হোক তার উৎস যে প্রজ্ঞান সে চিরজীবী। অতএব দর্শন ধর্মেরই পরিমার্জিত সংস্করণ। এখন প্রশ্ন হোল যে ধর্মবিশ্বাস দর্শনতত্ত্বে উত্তীর্ণ হবার পর কি বিবর্জিত হবে না সুরক্ষিত হবে? ধর্ম কি দর্শনের দ্বারা খণ্ডিত হোল না সমর্থিত হোল? আস্তিক ঈশ্বরবাদীরা হলেন রক্ষণধর্মী, নাস্তিক প্রজ্ঞানবাদীরা হলেন বর্জনকামী। এই প্রকারে হেগেলতত্ত্ব হোল দুই বিবদমান সন্তানের জনক, একদিকে ধর্মপ্রাণ খৃস্টান, অন্যদিকে অবিশ্বাসী নাস্তিক।

উত্তরকালে হেগেলতত্ত্বের দুই দ্ব্যর্থাভাস মিলিত হয়ে দুটি আমূল বিরোধী শিবিরে দলবদ্ধ হোল, রক্ষণশীল ধর্মনিষ্ঠ দক্ষিণ শিবির এবং বিপ্লবী ধর্মদ্রোহী বাম শিবির। অবশ্য হেগেলের ঝোঁক ছিল প্রথম পক্ষের দিকে। মতে ও প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন ভাব-প্রধান, রাষ্ট্রানুগত, রক্ষণশীল এবং একনিষ্ঠ খৃস্টান। কিন্তু তাঁর ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এ ছিল বিপ্লবের বীজ। এই বীজ থেকে উদ্‌ভূত হোল ফয়েরবাকের বস্তুবাদ, স্টার্নারের নৈরাজ্যবাদ এবং বাওয়ারের নাস্তিক্য ও নাশকতা। হেগেলের দর্শন যেন তার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যই আত্মনাশা প্রতিবাদের জন্ম দিল।

মার্ক্‌স্‌বাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌ প্রতিবাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ কোরল মার্ক্‌স্‌বাদে। কার্ল মার্ক্‌স্‌ প্রথমে ছিলেন হেগেলের শিষ্য। তারপর তিনি গুরুভ্রাতা ফয়েরবাকের গুরুঘাতী বিদ্যায় দীক্ষিত হয়ে ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর অস্ত্র দিয়ে গুরুর প্রজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করলেন। কিন্তু এ এমনি অস্ত্র যে আহতকে ভূপাতিত করে ফিরে আসে ধারকের উপর। ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর সর্বভুক দ্বন্দ্ব থেকে মার্ক্‌স্‌বাদও নিস্তার পেল না। হেগেল হতে চেয়েছিলেন রক্ষণশীল, তাঁর ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ নিয়ে এল বিপ্লব। মার্ক্‌স্‌ হতে চেয়েছিলেন গণতন্ত্র-বাদী, তাঁর ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ নিয়ে এল একতন্ত্র।

মার্ক্‌স্‌ বললেন যে শুধুমাত্র শ্রমই মূল্য সৃজন করে এবং শ্রমিকের পূর্ণ অধিকার থাকবে তার শ্রমমূল্যে। এই বাণী চলতি উদারনীতির সংকীর্ণ ক্ষেত্রকে প্রসারিত কোরল। বহুবিধ ব্যক্তি-অধিকারের সঙ্গে মার্ক্‌স্‌ সংযুক্ত করলেন যেটি সর্বপ্রধান,—শ্রমমূল্যে ব্যক্তি-

অধিকার; ব্যক্তির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করলেন আর্থিক স্বাধীনতা। মার্ক্স্ আরও বললেন যে ধনতন্ত্রের পতন আসন্ন, তিনি শোষিত শ্রমিক-শ্রেণীকে আহ্বান করলেন এই পতন ত্বরান্বিত করবার জন্য। সেদিন এ বাণী হয়েছিল গণতন্ত্রের চরমতম শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার তূর্যধ্বনি। এমন কি মার্ক্স্ যখন প্রস্তাব করেছিলেন যে বিপ্লবের পরাক্ষে সর্বহারার একতন্ত্র স্থাপিত হবে, তখন সে বাণীও ছিল গণ-অধিকারেরই পরিপূরক। কারণ এ একতন্ত্র বহুর উপরে মুষ্টিমেয়র স্বৈরশাসন নয়, এ একতন্ত্র বহুল-সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমচারী নাগরিকের আধিপত্য মুষ্টিমেয় পরভৃত শোষক শ্রেণীর উপর,—সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজে যাদের কোন স্থান থাকবে না।

কিন্তু যখন মার্ক্স্ বললেন যে সকল তত্ত্বকথাই শ্রেণীভাবপ্রসূত এবং রাষ্ট্রদর্শন মাত্রই শ্রেণীস্বার্থপর তখন তিনিও হেগেলের মত এক কূটাভাস সৃষ্টি করে তার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। মার্ক্স্ সর্বনিয়ন্তা দ্বন্দ্বকে প্রজ্ঞানের বিতণ্ডা থেকে নিয়ে এলেন সমাজের মল্লভূমিতে। সমাজগতির এবার্থ ডায়লেক্‌টিক্স্ অনুসারে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক শ্রেণীর থাকে নিজ নিজ দর্শন, রাষ্ট্রমত ও দল। ধনতন্ত্রের যুগে শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন হবে কম্যুনিজ্‌ম্, রাজনীতি হবে সর্বহারার বিপ্লব ও একতন্ত্র এবং দলীয় সংগঠন হবে কম্যুনিস্ট পার্টি। মার্ক্স্ এর সিদ্ধান্তকে 'বৈজ্ঞানিক' ভাবে প্রয়োগ করলে এবং সর্বহারার একতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখলে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দর্শন, বিপ্লব ও দলের কাল-সঙ্গত রূপ দেবে আপামর শ্রমিকসাধারণ, স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে আপন শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী; মার্ক্স্ এংগেল্স্, লেনিন অথবা স্টালিনের মত কেহ সর্বদা সব কিছু উপর থেকে নির্ধারণ করে দেবে না। লেনিন সর্বহারার একতন্ত্রকে বলেছিলেন গণতান্ত্রিক একতন্ত্র। যদি এ বচন অন্তঃসারশূন্য স্তোকবাক্য না হয় তা হলে এর একমাত্র অর্থ দাঁড়ায় এই যে শ্রমিকশ্রেণী অবাধে স্থির করবে তাদের দর্শন ও বিপ্লবপ্রণালী, নির্বাচন করবে তাদের দল ও নেতা। বাকুনিন ও মার্ক্স্, কাউট্‌স্কী ও লেনিন, ট্রট্‌স্কী ও স্টালিন, বেরিয়া ও ক্রুশ্চেভ্ আপন আপন মত ও পথ উপস্থিত করবেন শ্রমিক সাধারণের কাছে। তাঁদের বাক্‌বিতণ্ডার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে শ্রমিক দরবারে। কারণ কম্যুনিজ্‌ম্ শ্রমিক শ্রেণীর বাইরে একতন্ত্রবাদী, পরন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী; কম্যুনিজ্‌ম্ বিশ্বাস করে যে শ্রমিক হবে আপন ভাগ্যনিয়ন্তা।

কিন্তু মার্ক্স্‌বাদীদের হাতে এই গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হোল। মার্ক্স্ বনিয়াদি উদারনীতির রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে সেখানে ব্যক্তির আর্থিক অধিকারকে প্রবেশ করিয়েছিলেন। তিনি রচনা করেছিলেন প্রকৃত গণতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি, বিস্তার করেছিলেন এর বাস্তব সম্পদ্ এবং এর মিলন ঘটিয়েছিলেন সমাজসাম্যের সঙ্গে। আর তাঁর শিষ্যরা গুরুদত্ত শ্রেণীবাদকে অনুসরণ করে ও তার বিকৃতি ঘটিয়ে শ্রমাধিকার ভিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর অন্য সকল স্বার্থকে সংহার করলেন। শ্রমিকশ্রেণীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও বিচারের স্বাধীনতা হরণ করে তাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টিকে সর্বহারার একমাত্র দল বলে ঘোষণা করলেন, সর্বহারার একতন্ত্র পর্যবসিত হোল কম্যুনিস্ট পার্টির একনায়কত্বে। অবশেষে কম্যুনিস্টদলের ভিতর থেকেও দূর হোল গণতন্ত্র, মত-পোষণের স্বাধীনতা। এইরূপে হোল ব্যক্তি-অধিকারের সঙ্কোচন ও গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ।

লেনিনের সময় হতে কম্যুনিজ্‌ম্ মার্ক্স্‌বাদ থেকে মুক্ত হতে হতে বর্তমানে এক অভিনব কার্যক্রম ও বন্দোবস্তের সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্ক্স্ বলেছিলেন যে ধনতান্ত্রিক

দেশে শিল্পস্ফীতির পশ্চাতে আসবে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের নেতৃত্বে ঘটবে গণবিপ্লব। প্রথম মহাসমরের ডামাডোলে বিপ্লব এল স্ফীতশিল্প দেশে নয়, অর্ধ-ধনতান্ত্রিক অবনতশিল্প রুশদেশে বলশেভিক্‌ দলের নেতৃত্বে। প্লেখানভ্‌ প্রমুখ প্রাচীনের দল সেদিন চেয়েছিলেন যে রুশ কিছুকাল ধনিকশাসনে শিল্পোন্নত হোক, শ্রেণীসচেতন বহুতর সর্বহারার আগমন হোক, তারপর সম্ভব হবে সর্বহারার বিপ্লব। আর লেনিন চাইলেন অবিলম্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দলের করায়ত্ত করে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং নবজাত শ্রমিক গোষ্ঠীর সমর্থনের উপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপনা। স্টালিন এই নীতিকেই দৃঢ়ভাবে পালন করলেন। আর্থিক শ্রেণীশক্তি দ্বারা রাজনৈতিক কার্যক্রম নিরূপিত হোল না, রাজনৈতিক কার্যক্রম নির্ধারণ কোরল আর্থিক বিন্যাস। একদা হেগেল-দর্শনের পাদমস্তক উলটিত করে মার্কস্‌ স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবার মার্কস্‌বাদের উলটন হোল তার শিষ্যবর্গের হাতে।

দ্বিতীয় মহাসমরে ও সমরোত্তর কালে কম্যুনিজম্‌ এই পন্থাকেও অতিক্রম করে গেল। সমাজবাদের পরীক্ষা শুরু হোল সোভিয়েত রুশের প্রতিবেশী সামন্ততান্ত্রিক কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে। মার্কসীয় ডায়লেকটিক্‌স্‌-এ সামন্ততন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝখানে ধনতন্ত্র ও শিল্পায়নের যে ঐতিহাসিক যুগ অবশ্যম্ভাবী, তার বিলোপন হোল। এমন কি সমাজ-বাদের পরীক্ষা গণবিপ্লবেরও অপেক্ষায় রইল না। সোভিয়েত সেনা-ও রাষ্ট্রবলে কম্যুনিস্টদল শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করে প্রতিদ্বন্দ্বী বামদলগুলিকে উৎসাদন কোরল, তারপর হোল শিল্পায়ন ও সমাজবাদের প্রবর্তন। আর কৃষিসর্বস্ব চীনে কম্যুনিস্ট-নেতৃত্বে ঘটল 'শ্রমিক কৃষক বুর্জোয়ার মিলিত বিপ্লব' যা 'শান্তিপূর্ণভাবে' সমাজবাদে পরিসমাপ্ত হতে চলেছে! বাস্তবপক্ষে মার্কস্‌বাদ খণ্ডিত হোল শিষ্যদের দ্বারা নয়, ইতিহাসের দ্বারা। কিন্তু ইতিহাস যে নূতন রাষ্ট্রকৌশল ও গঠনশৈলীর সূচনা কোরল তা সর্বত্র কম্যুনিজম্‌-এর সীলমোহর নিয়ে কায়েম হচ্ছে। এর কারণ মার্কস্‌বাদের দিন ফুরিয়ে এলেও তার ঐতিহ্য এখনও জীবিত এবং অনুপেক্ষণীয়।

ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর পরবর্তী অধ্যায়

হেগেলের দর্শন ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর সত্যতা প্রমাণ করেছিল মার্কস্‌বাদকে জন্ম দিয়ে এবং তার দ্বারা পরাভূত হয়ে। মার্কস্‌-এর ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-ও যদি সত্য হয় তবে তার প্রতিষ্ঠা হবে মার্কস্‌বাদের বিনাশের দ্বারা। হেগেলের ভূয়োদর্শনে যেমন শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত রয়েছে পরম প্রজ্ঞান, যার মধ্যে সকল দ্বন্দ্ব সমাহিত হয়েছে, মার্কস্‌-এর সমাজ-দর্শনের সীমায় তেমন আছে এক সত্যযুগ, যেখানে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্বিরোধ থাকবে না, সুতরাং শ্রেণীসংঘর্ষও থাকবে না, যে সমাজে পূর্ণ সমতা বিরাজ করবে। সেই সত্যযুগে ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর দ্বন্দ্ব সমর্পিত হবে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে, প্রকৃতিকে জয় করে সমাজ হয়ে উঠবে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী। এখানেই মার্কস্‌বাদের চরম হেত্বাভাস ও ধ্বংসবীজ। ডায়লেক্‌টিক্‌ প্রতিভাব উৎপন্ন হয় ভাব থেকে, ভাব-প্রতিভাবের সদ্‌ভাব পুনরায় পরিবর্তিত হয় নূতন ভাব রূপে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমাধানের এই চক্র-পরিক্রমা কোথায়? মার্কস্‌-এর শ্রেণীবাদ বা সমাজ-ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ এইখানে নিজ প্রমাদদোষে অচল হয়ে যায় এবং তার ধ্বংসবীজ উদ্‌ভিন্ন হতে শুরু করে নূতন এক সমাজদর্শন রূপে। মার্কস্‌-এর ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ যদি সত্য হয় তা হলে এই

দর্শন একদিন মার্ক্‌স্‌বাদের উপর ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর মারণাস্ত্র হানবে। ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর অব্যর্থ নিয়মে হয় হেগেল ও মার্ক্‌স্‌-এর সমন্বয় হবে নতুবা মার্ক্‌স্‌বাদ তার প্রতিভাব ক্ষেপন করবে এক নূতনতর দর্শনে। ইতিহাসের সম্মুখে এর বিকল্প পথ কিছু নেই। মার্ক্‌স্‌বাদ শোষিত সর্বহারার শ্রেণীদর্শন। নূতন শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান শ্রেণী ও শ্রেণীদর্শন দূর হয়ে যাবে,—মার্ক্‌স্‌বাদেরও অবসান হবে। যেদিন মার্ক্‌স্‌-বাদ পরাস্ত হবে নূতন দর্শনের দ্বারা, কিংবা অবলুপ্ত হবে উন্নততর সমন্বয়ের দর্শনে, সেদিনই প্রমাণিত হবে মার্ক্‌স্‌বাদের যাথার্থ্য, কারণ ইহাই ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌-এর অটুট বিধান! এবং ইহাই ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ এর নির্মম পরিহাস!!

এই নূতন দর্শন কি আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদ?—মানবের আত্যন্তিক বিকাশে স্বপ্রতিষ্ঠ সচল সমাজ, যেখানে রাষ্ট্রের উদ্যত দণ্ডের পরিবর্তে সহজ নীতির শাসন শান্তি, সমতা ও সহযোগিতা রক্ষা করবে, যার উপান্তে এসে মার্ক্‌স্‌-এর ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ ক্ষান্ত হয়েছে,—সেই চির আরাধ্য সত্যযুগের সমাজচিত্র?

চাঁদবেনে

অমিয়ভূষণ মজুমদার

অষ্টবসুর একজন ছিল ব'লেই তার নামের শেষে পদবী হিসাবে 'বসু' যোগ করা হয়—এমন জনশ্রুতি আছে। নতুবা চন্দ্রশেখর বসুকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাঁদবেনে ব'লে উল্লেখ করার কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি কখনো কখনো এমন ভ্রান্তি ঘটেছে যে তাকেই কেউ কেউ চাঁদসদাগরের কাহিনীর মূল চরিত্র মনে করেছে।

চন্দ্রশেখর সমতটের অধিবাসী ছিল। এই বন্দর-নগরের সঙ্গে প্রায় কাল্পনিক কিন্তু অতি প্রসিদ্ধ বাংলাদেশের সমতটের কোনো সম্বন্ধ নেই। এখন যাকে সিংহল দ্বীপ বলে তখনও তাকে সিংহলই বলা হ'ত। এই সিংহল দ্বীপ থেকে বেরিয়ে প'ড়ে একদল সিংহ-বংশীয় বাঙাল বর্তমান বিশাখাপত্তনের কিছু উত্তর-পূর্বে একটি ছোট উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

তাদের বাঙাল বলেছি ব'লে তাদের সঙ্গে কাউকে স্বাজাত্য বোধ করতে অনুরোধ করছি না, কারণ বর্তমান দিনের ব্রিটিশ গায়েনার ভারতীয়রা যে অর্থে যতখানি ভারতীয় তারা সেই অর্থে এবং ততখানিও বাঙাল ছিল না।

তাদের উপনিবেশটি ছোট ছিল কিন্তু কতগুলো কারণে কিছু প্রাধান্যলাভ করেছিল যেমন একটা গুরুত্ব পেয়েছে পঁদিচেরি। এবং পঁদিচেরির সঙ্গে নগরটির আরও কিছু মিল খুঁজে বা'র করা যায়। উপনিবেশটির একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি ছিল। যার ফলে মূল ভূখণ্ডের আদিবাসীরা যখন এই উপনিবেশে নানা উপজীবিকা অবলম্বন ক'রে বসবাস করতে সুরু করল তখন আদিবাসীদের একাংশ ঔপনিবেশিকদের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার গ্রহণ করল, কৃষ্টিকে বিমিশ্র করল। কেউ কেউ বলে তামিল-ভাষীদের অনাবিষ্কৃত সেই দেশে এই সমতট নগরকে রাজধানী ক'রে তাম্রলিপ্ত নামে এক রাষ্ট্রের পত্তন হ'য়েছিল। সেই রাষ্ট্রের বা পত্তনের মধ্যদিনে এই নিয়ম ছিল, ঔপনিবেশিকদের এবং আদিবাসীদের মধ্যে থেকে পর্যায়-ক্রমে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হবে। এরকম সংবাদ পাওয়া গেছে, এই প্রথা রাষ্ট্রের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত মর্যাদা পেয়েছে। তবে ব'লে রাখা ভালো আদিবাসী বলতে সত্যিকারের আদিবাসীকে বোঝাতো না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিশি-বাঙালরাই নির্বাচনের সৌভাগ্যলাভ করেছে। তারপর অবশ্য ক্রীতদাসদের দিন এল।

এই উপনিবেশের তখনকার আটজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অষ্টবসু বলা হ'ত। প্রতাপ ও মহিমায় আটজনই সমান ছিল কিম্বা গোণাগুণতি আটজনই ছিল, বললে বোধহয় ভুলই বলা হবে। জনতার খুব একটা ঝোঁক আছে মিলের উপরে। বিষয়ের অভিনবত্বের কিম্বা সত্তার পার্থক্যের অনুভবটা তার সহজে হয় না, কাজেই ধারণা যদি কখনো হয় সেটা তার মনে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিছু বুঝতে বা বোঝাতে হ'লে পার্থক্য লোপ ক'রে দিয়ে পুরানো কোনো ব্যাপারের ফ্রেমে সে পুরে দেয় অভিনবকে। অষ্টবসুর পুরাণ জানা ছিল কাজেই জন পাঁচ ছয় সম্পদ ও প্রতাপযুক্ত নাগরিকের একই কালে অভ্যুদয় হ'তেই তারা আরও জন কয়েককে এদের তুল্য কাল্পনিক বিত্ত ইত্যাদিতে সংযুক্ত ক'রে অষ্টবসুর

লোককথার সূচনা করল। একথা বলার বিশেষ যুক্তি, এই গোষ্ঠীর দু'তিনজনের অবস্থা অন্যদের তুলনায় অত্যন্ত হীনই ছিল; এরা অষ্টবসুর মতো পরস্পরের সুহৃদও ছিল না : রাজনীতিগত, এবং অর্থনীতিগত দ্বন্দ্ব ছিল; ব্যক্তিগত বিদ্বেষও ছিল না এমন নয়।

চন্দ্রশেখর এদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু সে দুর্লভ সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী ছিল। পিতৃপিতামহের সঞ্চিত বিত্ত ছিল, দেহে দর্শনীয় স্বাস্থ্য ছিল, রূপসী এবং প্রেমময়ী স্ত্রী স্বর্ণকায়া ছিল। এর চাইতেও বড় কথা : তাদের বংশের যে বাণিজ্যতরীগুলি হারিয়ে যাওয়াতে তার বাবা মরিয়া হয়ে নতুন চারখানি বাণিজ্যপোতের নির্মাণ সুরু করেছিলেন, এবং যাদের শোকে তার বাবা আশাভগ্ন হয়ে অকালে গত হয়েছিলেন; চাঁদ গদিতে বসতে না বসতে সেই হারানো তরণীগুলো যেন সমুদ্রোত্থ গজলক্ষ্মীর মতো দিগন্তে দেখা দিল। তরণীগুলিই শুধু ফিরে আসেনি, তাদের পুরাতন নাবিকদেরও অধিকাংশ ফিরেছিল এবং দেখা গেল সেই নাবিকরা অনেক বৎসর ধরে শুধু অকূল সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়নি, ব্যবসা করেছে, স্বর্ণ ও অনেক কিছু অভিনবকে সংগ্রহ করে এনেছে। তারা সেই সম্পদের একটা অংশ চাঁদকে তার প্রাপ্য হিসাবে দিতে চাইল। চাদ এখানে একটা বুদ্ধিমানের কাজ করল, সম্পদের অংশ না নিয়ে সে জাহাজ কয়েকখানা ফিরিয়ে নিল শুধু; এবং এই লেনদেনের মাধ্যমে কাজদক্ষ নাবিকদলের কাছে থেকে দুটি বিষয় নিজের দখলে আনল, প্রথমটি তাদের অন্তরে পৌঁছানোর পথ, দ্বিতীয়টি তারা ভাগ্য বিপর্যয়ে যে নতুন বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করেছিল সেগুলিতে চলার অবাধ অধিকার।

দুই

চাঁদ ইতিমধ্যে কয়েকবার সমুদ্র যাত্রা করেছে। দ্বিতীয়বার সে দীর্ঘদিন সমতট থেকে অনুপস্থিত ছিল। প্রথমবারের সমুদ্রযাত্রায় সে স্বর্ণদ্বীপে গিয়েছিল এবং খাস বাঙলা থেকে রেশমী কাপড়ও এনেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার সুদীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকবার পর যখন সাত সাতখানা বাণিজ্যপোতের মাত্র দু'খানা নিয়ে ফিরে এসেছিল তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে প্রবাদ এই, 'চাঁদ বলেই সইতে পারে'। নিজের অষ্টবসুত্বের প্রমাণস্বরূপ দান-ধ্যান বিলাস-বাসন করা সেই অবস্থায় অসাধারণত্বেও সম্ভব নয়। অবশ্য, এ বিষয়ে তাকে একটি ঘটনা সাহায্য করেছিল। যে ঝড়ে তার দুর্দশা সেটা যেমন আকস্মিক পূর্বোক্ত ঘটনাটিও তেমনি।

সাগর বলতে বঙ্গোপসাগর। এর একদিকে স্বদেশ অন্যদিকে বাণিজ্যের স্বর্ণদ্বীপ, পথে কল্পনারাজ্য বাংলা দেশ। কিন্তু এমন ভয়াল ভয়ঙ্করও আর কেউ নেই। মৃত্যুনীল জল। আকাশে ও জলে চিরন্তন মিতালি। জলের সব রকমের মনোভাব আকাশে প্রতিধ্বনিত। বঙ্গোপসাগর এখন যেমন সেকালেও তেমনি অস্থিরমতি ছিল। বিশেষ করে পদ্মা যেখানে উভয় বাহুতে তার কণ্ঠলগ্না হয়েছে সেখানে পৌঁছে বহু-অভিজ্ঞ নাবিকরাও উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করে। খাস বাংলার এক মহাজনের সঙ্গে চাঁদের কথা দেওয়া ছিল—দু'জাহাজ দ্রাক্ষাসার ও মাধ্বী পৌঁছে দিতে হবে যদি চাঁদ দু'জাহাজ কার্পাসবস্ত্র চায়।

সাত-সাতখানা জাহাজ চলছে পাঁচশ' সামুদ্রিক গজ ব্যবধানে থেকে। সবগুলো

জাহাজের আকার এক নয় কিন্তু সবগুলোই বিশ-হাজারমনী, সবগুলোতেই তিনটি মাস্তুল-দণ্ডে তিনটি ক'রে নয়টি পালের ব্যবস্থা আছে, দু'টি জাহাজে চল্লিশটি ক'রে দাঁড় আছে, অন্যগুলোতে বিশটি ক'রে দাঁড়ের ব্যবস্থা। চল্লিশদাঁড়ী জাহাজ দু'টির একটিতে চাঁদ সস্ত্রীক চলেছে; এই জাহাজেই তার কোষাগার; অন্যখানিতে আছে চাঁদের আত্মীয় এবং দেহ-রক্ষীর দল তার বাণিজ্য অধিকর্তার তত্ত্বাবধানে। এই দু'খানি পোত সমুদ্রের সঙ্গে খেলা করতে পারে, পবনের তাণ্ডবনৃত্যের আসরে যোগ দিতে ভয় পায় না। সাধারণ নাবিকেরা বিস্মিত হ'য়ে লক্ষ্য করে আপন আয়তনের মাত্র দ্বিগুণ পরিসর জায়গায় এই দু'খানি পোত উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে দিক পরিবর্তন করতে পারে।

প্রথম দু'খানা জাহাজ তখন মধুমতীর খাড়ির মুখে, তৃতীয়খানায় চাঁদ। সময় দুপুরের কিছু আগে। চন্দ্রশেখরের পাশে ছিল তার স্ত্রী স্বর্ণকায়া। তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে মধ্যমাস্তুলের পালের ছায়া। মাস্তুলের মাথায় যে পতাকা উড়ছিল তার ছায়া চাঁদ ও স্বর্ণকায়ার মুখের উপরে একবার পড়ছে, আর একবার স'রে যাচ্ছে। আকাশ ও সমুদ্রে আলস্যবিজড়িত স্থিরতা। কখনো একখানি সাদা মেঘ রৌদ্রোদ্ভাসকে স্নিগ্ধ ক'রে ছায়া ফেলে যাচ্ছে। সাগর যেন তার চক্ষু নিমীলিত ক'রে মধুমতীকে লক্ষ্য না করার ভান করছে ক্ষণে ক্ষণে। পেছনের জাহাজগুলিতে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হওয়ার তাগিদ নেই। নাবিকরা ঢোল বাজিয়ে ঝাঁঝর পিটিয়ে গান করছে। সমুদ্র স্থির ব'লে বায়ুতরঙ্গ অভগ্ন এবং তাদের গানের সুর মাঝে মাঝে চাঁদের জাহাজে ভেসে আসছে। চাঁদের জাহাজে যে জল মাপছে তার গলা শোনা যাচ্ছে, মাস্তুলের দড়িদড়া টানবার হুকুম দিচ্ছে কাণ্ডারি কখনো। চাঁদ অভিনয়ের কায়দায় গল্প বলছিল। সে গল্প বলাতে সুদক্ষ। স্বর্ণকায়ার এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা। চাঁদ তাকে এক উড়ন্ত দ্বীপের গল্প বলছিল। সনকা কখনো বিস্মিত হচ্ছিল কখনো খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠছিল। সকাল থেকে এলোমেলো বাতাস বইছিল এখন সেটা সনকার জরোয়ার ফুল বসানো দামী এবং ভারি চীনাংশুক স্পাটীর আঁচল উড়িয়ে চাঁদের গায়ে ফেলে দিচ্ছিল। কখনো দমকা হাওয়া একটি পালকে ফাঁপিয়ে দিয়ে পরক্ষণে চুপসে দিচ্ছিল। কিন্তু চাঁদের সেই প্রকাণ্ড জাহাজের গতিপথে একটি দোলার বেশী কোনো প্রভাব পড়ছিল না। বরং হুঁসিয়ার কাণ্ডারী সেটা কাজে লাগাচ্ছিল। একবার একটা বড় ঝাঁকুনি লাগল। জাহাজের পাটাতন শুধু নয়, জলের নিচে জাহাজের বুকও যেন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। উল্লম্ফনশীল হরিণ যেমন মাঝ-পথে গতি পরিবর্তন করতে পারে তেমনি ক'রে একটু কাৎ হয়ে জাহাজ তার অগ্রগতির পথে আবার খাড়া হ'ল। সনকা প'ড়ে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে তাকে ধ'রে চাঁদ তার কাণ্ডারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল,--কি খবর, শ্রীমন্ত? শ্রীমন্তর জবাব শুনবার জন্য সে অবশ্য অপেক্ষা করল না, সনকার ভয়কে লক্ষ্য ক'রে হেসে সে আবার তার গল্প সুরু করল।

তারপরই সেই আকস্মিক ব্যাপারটা ঘটল। জলের বুকে এক মুহূর্তের জন্য একটি অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ল। একটি প্রচণ্ড হল চালনায় জলের বুক শতধা হ'য়ে যাচ্ছে, মন্থনমৈনাকের তাড়নায় নীলাভ জল দৈএর মতো সাদা হ'য়ে গেল। মুহূর্তে সেই ধ্বংসশক্তি জাহাজের উপরে এসে পড়ল। একটা বড় পালের একাংশ ছিঁড়ে তার দড়ির বাঁধন খুলে গেল। জাহাজ বাঁদিকে ঝুঁকে গেল। দাঁড়ীদের কয়েকজন জলে পড়ে গেল। রাখ রাখ করতে করতে জাহাজটা তাদের উপর দিয়ে চলে গেল। আবর্ত ঝড় যেন এক গ্রাসে চাঁদের জাহাজকে আত্মস্থ করল। সেই অবস্থায় স্বর্ণকে এবং নিজেকে জাহাজের পাটাতনের

উপরে আছড়ে পড়া ঢেউএর টান থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা ছাড়া চাঁদের আর কিছু করার ছিল না। জাহাজের তখনকার অবস্থাকে মাতালের সঙ্গে তুলনা দেওয়া ঠিক হবে না। সেটা যেন অজগর-গ্রাসে আর্তপ্রাণীর মতো আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। সনকাকে নিকটতম কক্ষতে রেখে এসে চাঁদ পাটতনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। কিন্তু আবার একটা দমকা হাওয়া এসে জাহাজকে জল থেকে তুলে ফেলল। পাটাতনের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল চাঁদের। বিস্ফোরণের মতো আকাশ বিদীর্ণ ক'রে ঝড়বৃষ্টি-শিলা সেই আশ্বিনের দিনকে গ্রাস করল। তখন তার মনের অবস্থা এই রকম হ'য়েছিল :

"কান্ডার ভাই, রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
নাই জানি দিবা রাতি ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি
ঝলকে ঝলকে লয় জল॥
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক কান্ডার জীবন রাখ
নাই জানি কোন গ্রহফল।
না জানি দৈবের লীলা ঝড়বৃষ্টি অতি শিলা
সম্মুখে নির্গত বহে জল॥
শিল যেন পড়ে গুলি ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি
বেগে জল বাজে যেন কাঁড়।
দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িয়া বৃক্ষ পাড়ে
কান্ডার ধরিতে নারে দাঁড়॥
দেখহ নায়ের পাশে হাঙ্গর কুমীর ভাসে
দুকূল হানিয়া বহে খানা।
আট দিগে বহে বায়ু পর্বত সমান ঢেউ
রাশি রাশি করে বহে ফেনা॥"

দিবারাত্রি বোঝবার উপায় ছিল না। উঠে বসতেই চাঁদের মনে হল কয়েকটি দিনরাত্রি পার হ'য়ে যাবার পর এই আর একটি দিনের দুপুর আসছে। একবার মনে হ'ল ঝড়টা গত দুপুরে হ'য়েছে অন্য আর একবার মনে হ'ল সেটা দিন পনর আগেকার ব্যাপার। কয়েকটি কথা তার মনে পড়ল : (স্তব্ধ দুপুরে জাহাজ একটা মৃদুস্রোতের মুখে কাঠের গুঁড়ির মতো ভেসে চলেছে। একটি পাল নেই, একটি দাঁড়ের শব্দ নেই।) সে সনকাকে খুঁজতে চেষ্টা করছিল কিন্তু সিঁড়ির ধারে এই এখানেই তার গায়ে অর্ধউন্মুক্ত-কুন্ডলী অজগরের মতো মধ্যমাস্তুলের দড়ি এসে পড়েছিল। সেই আঘাতের পর নিজেকে সে এই আবিষ্কার করছে। তার মনে পড়ল জাহাজের গতি সহসা বিপরীতমুখী হ'য়ে গিয়েছিল এবং অবশিষ্ট দুটি মাঝারি পালকে ঝড়ের মুখে খাড়া রেখে কান্ডারীই জাহাজকে পবন দেবতার পায়ে সমর্পণ করেছিল। চাঁদ যেন দেখতে পেয়েছিল তার যে জাহাজ দুখানা মধুমতীর খাঁড়িতে ঢুকে পড়েছিল তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে করতে পরস্পরকে আঘাত ক'রে দড়িদড়ায় হালে দাঁড়ে জড়িয়ে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেল। চাঁদ দাঁড়ানোর চেষ্টা ক'রে দেখল ততটুকু শক্তি তার নেই। সনকা এই জাহাজের কোথাও আছে, এই অবিশ্বাসভঙ্গুর আশাকে আকড়ে ধ'রে চাঁদ ভেসে চলল।

তিন

মৃত্যুকে আস্বাদ ক'রে চাঁদ ফিরে এসেছে।

প্রায় দু'বছর পরে তার আশ্রয়দাতা সেই অজ্ঞাত দেশের রাজার কাছে বিদায় নিয়ে চাঁদ তার একটিমাত্র জাহাজ নিয়ে স্বদেশের দিকে যাত্রা করল। পুরানো জাহাজের ভগ্নস্তূপ থেকেই তার এই নতুন জাহাজটিকে তৈরী করা হ'য়েছে। কিন্তু স্বদেশে ফেরা খুব সহজ কথা নয়। অশ্রুমলিন দৃষ্টিতে আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চাঁদ একটা ধারণা করতে পেরেছে, তার স্বদেশ এই দ্বীপময় দেশ থেকে উত্তর-পশ্চিমে কোথাও হবে। কিন্তু তার সেই কাণ্ডারী নেই, দাঁড়ীমাল্লাদের দু'একজন মাত্র আছে। আর তার জীবনের আধখানা নেই : স্বর্ণকায়া সনকা নেই।

যাত্রার সময়ে দ্বীপের রাজা নিজে সমুদ্রতীরে এসেছিলেন এবং তাঁর মন্ত্রী শেষবারের মতো চাঁদকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, ভালো কার্পাসের বীজ অন্তত ত্রিশ ঘনহাত এবং তাঁতী অন্তত দশবার ঘর আনতে হবে ফেরবার সময়ে। এই সঙ্গেই এ রাজ্যের বিশজন নৌসেনা চাঁদের জাহাজ চালিয়ে অনির্দিষ্ট সমুদ্রপথে প্রায় আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে।

দুর্ভাগ্য বিধ্বস্ত চাঁদের ক্ষেত্রে স্বদেশে ফেরবার এই সুযোগকে ভাগ্যের শান্তিস্থাপনের চেষ্টা বলা যায় না। সে নিজেও তা মনে করেনি। এ ঘটনার মূলে বরং দাঁতিয়ালি ক'রে একটি বিদেশী রাষ্ট্রকে নিজের অনুকূলে আনার পটুতা এবং বিদেশী অপটু নৌসেনার সাহায্যে অজ্ঞাত সমুদ্রের পথে বেরিয়ে পড়ার সাহসকে সূচিত করছে।

কিন্তু সৌভাগ্যই তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। তিনচার মাস উত্তর-পশ্চিমের চাইতে কিছু উত্তর লক্ষ্য ক'রে জাহাজ চালিয়ে বনাচ্ছন্ন এক তীরভূমি চাঁদের চোখে পড়ল। একটি অতি সংকীর্ণ নদীমুখের কাছে জাহাজ ভিড়িয়ে দু'জন নৌসেনা নিয়ে সে দেশটাকে চিনবার কিম্বা আবিষ্কার করার জন্য নামল। তখন তাদের দেখে আশ্রয়প্রার্থী ব'লে মনে হচ্ছিল না, বরং যেন শত্রুসৈন্যদলের অগ্রচারী কেউ।

বন্দর থেকে অনেক দূরে নামায় দেশটাকে চিনতে পারেনি চাঁদ। এগিয়ে যেতে যেতে সে বুঝতে পারল সৌভাগ্যক্রমে সে বাংলাদেশেরই কোথাও এসে পড়েছে। চাঁদ আবিষ্কার করল এর পরে স্বদেশে পোঁছানো আর অনিশ্চয়ের ব্যাপার নয়। পবনের প্রতিকূলতার ভয় সব সময়েই আছে, কাজেই সেটা উল্লেখযোগ্য নয়।

জাহাজে ফিরে চাঁদ চিন্তা করতে বসল : দশ-বার ঘর তাঁতী তাকে সংগ্রহ করেত হবে। তা যদি করতেই হয় তবে চন্দ্রদ্বীপের তাঁতীদের মধ্যে থেকেই সেটা করতে হবে। তারা অবশ্য খুব ভালো কারিগর নয় কিন্তু সে রকম কারিগর কি আর চাইবামাত্র পাওয়া যায়! তাদের খোঁজে তাহ'লে আরও উত্তরে এগিয়ে যেতে হয় শ্রীপুরে কিম্বা গৌড়ে। কিন্তু সে সব সহরে অনেক ভালো কারিগর থাকলেও সেখান থেকে দশ-বার ঘর তাঁতী সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে চাঁদের জানা ছিল চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিম কোণে কোন্নগর। এই বন্দরটি বিদেশীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। প্রকৃতপক্ষে নগরটি যেন ক্লান্ত বণিকদের সেবা-শুশ্রূষার জন্যই স্থাপিত হ'য়েছিল। লীলাকুশলা নৃত্যগীত-পটিয়সী নাগরিকারা সেই নগরের আকর্ষণীয় সম্পদ, এবং তারাই সেই নগরের সম্পদ আকর্ষণ ক'রে আনে। কোন্নগরে তারা শ্রেষ্ঠীদের চাইতে ধনবতী। কিন্তু নগরে যেমন হয়, অন্যান্য উপজীবিকা আশ্রয় করেও দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে অনেক লোক এসে জনসংখ্যাকে সংবর্ধিত করেছে। সেখানে

ভাঁড়ী পাওয়া যায়, এবং সেখানে আরক্ষা ব্যবস্থারও তেমন কড়াকড়ি নেই।

জাহাজ নিয়ে চাঁদ কোন্নগরের কাছে পৌঁছাতেই ছোট ছোট নৌকা ক'রে অনেক লোক তার জাহাজের দিকে এগিয়ে এল। জাহাজ কূলে ভিড়বে না, কাজেই এই সব নৌকায় জাহাজের লোকদের জন্য পণ্য আনা হয়েছিল। নৌকার আরোহীদের বেশভূষায় এবং পণ্যে যেমন বৈচিত্র্য ছিল তেমনি ছিল তাদের জাতীয়তায়। তাদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা যত প্রায় তত সংখ্যক ছিল চম্পা, ব্রহ্ম, সুহ্ম এবং আরবের অধিবাসী। চাঁদ তার স্বদেশের লোকও দেখতে পেল একটি নৌকায়। কানের ঝকঝকে পাথর বসানো ফুল দেখে দূর থেকেই চাঁদ ওদের চিনতে পেরেছিল। চাঁদ জানত চম্পার অধিবাসীদের সহজে বিশ্বাস করতে নেই, তেমনি সে জানত অন্য যারাই সুরা বিক্রী করুক এই আরবদের মতো সারবিশিষ্ট সুরা অন্য কেউ বিক্রী করে না। স্বচ্ছ চামড়ার আধারে নানা রঙের যে সব সুরা এরা বিক্রী করে সেগুলি যেমন সুগন্ধ তেমন সুস্বাদু। এদের হাসি যেমন আকর্ষণীয় অর্থহীন, ভাষাও তেমনি সুশ্রাব্য দুর্বোধ্য। চাঁদ তার জাহাজের নৌসৈন্যদলের নায়ককে বিভিন্ন ধরনের নৌকার বিচিত্রবেশ আরোহীদের সম্বন্ধে যা জানা ছিল তা বলল। প্রয়োজন না হ'লেও এইসব নৌদোকানিদের কাছ থেকে পণ্য আহরণ করা একটি প্রথা। চাঁদ তার জাহাজের নাবিকদলে কিছু অর্থ বণ্টন করল এবং টুকিটাকি নিরর্থক পণ্য কিনতে উৎসাহিত করল। চাঁদ নিজেও কিছু খেলনা, কয়েকটি পাখী, কিছু শঙ্খের গহনা এবং কয়েক পাত্র শ্বেত সুরা কিনল। হায়! সনকা নেই যে আনন্দ করবে। কিছুকাল পর নৌদোকানিরা একটি বড় বজরাকে এগিয়ে আসার পথ ক'রে দিল।

বজরা আর একটু কাছে এলে চাঁদ শুনতে পেল দাঁড়ের মৃদু আঘাতে জলের যে শব্দ হ'চ্ছে সেটাকে ছাপিয়ে বাঁশি এবং ঢোলের শব্দ উঠছে। বজরা জাহাজের গায়ে ভিড়িয়ে একজন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। তার বক্তব্য শুনে চাঁদ জাহাজ থেকে একটি দড়ির মই নামিয়ে দিতে হুকুম করল। বৃদ্ধ চাঁদের জাহাজে উঠে এলে এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পর্ব শেষ হ'লে চাঁদ বৃদ্ধের আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। বৃদ্ধ এসেছিল কোন্নগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠা নাগরিকা ক্ষীরোদসম্ভবার পক্ষ থেকে। সে বিদায় নিলে অন্যান্য আরও বজরাকে তার জাহাজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল চাঁদ। তাদের সকলের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তা করলে তার জাহাজের সব সম্পদ কোন্নগরে রেখে যেতে হবে। তা হ'লেও চাঁদ নিজের পদমর্যাদা কিম্বা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বৃদ্ধের নিমন্ত্রণের পরও আর একটি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল সেটা লীলালতিকার পক্ষ থেকে এসেছিল।

সন্ধ্যার কিছু পরে মাথায় মুকুট পরে, গলায় নীল চীনাংশুকের উত্তরীয় দুলিয়ে, কোমরে রুপোর কাজকরা কিংখাবের খাপে পোষাকি তরোয়াল এঁটে চন্দ্রশেখর রওনা হ'ল। এখানে বলা যায় তার মাথার মুকুটে যত না সোনা তার চাইতে বেশী ছিল ঝুটা প্রবাল ও মুক্তা। এরকম পোষাকি মুকুট দেখতে আসল মুকুটের চাইতেও মূল্যবান মনে হয়, এবং এ রকম বস্তু ব্যবহার করার কারণ এই যে অনেক সময়েই এগুলি উপহার স্বরূপ দান করাই চাঁদের রীতি। তার পোষাকি তরোয়াল কিংখাবের খাপে ঢাকা অবস্থায় আয়নীয় বণিকদের আনা নিছক পোষাকি কিছু ব'লে মনে হ'লেও আসলে সেটা তার স্বদেশের ইস্পাতে তৈরী তীব্র ধার দ্বৈরথ সমরের উপযুক্ত অস্ত্র। এরকম তরোয়াল ব্যবহারও চাঁদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বৃদ্ধের প্রেরিত বজরা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। চাঁদ তার নৌসৈন্যদলের নায়ককে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধের বজরায় সওয়ারি হল। জলদস্যুর ভয় কোন্নগরে

কম। তা ছাড়া সন্ধ্যার পর থেকেই নগরের কূলরক্ষী সৈন্যদল বড় বড় ছিপ এবং কোষায় বেরিয়ে পড়বে নোঙর করা জাহাজগুলিকে পাহারা দেওয়ার জন্য। বন্দরের সুনাম রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। তা হলেও চাঁদ তার সৈন্যদলকে হুঁসিয়ার থেকে পাহারা দিতে বলে গেল।

কোন্নগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠা নগর-নায়িকা ক্ষীরোদসম্ভবার প্রাসাদে পেঁছে যে কোনো লোকের পক্ষেই বিস্মিত হওয়ার কথা। ইন্দ্রসভা সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ধারণা মানুষের আছে এ যেন তারই বাস্তবরূপ। ম্লান অন্ধকারের বুকে সমগ্র প্রাসাদের আকৃতি একটি কল্পনাতীত বড় রত্নের মতো জ্বলছে। দীপান্বিত সেই প্রাসাদের আলোকসজ্জা দেখার জন্য প্রতিদিনের মতো আজও বালকবালিকা এবং বয়স্ক পথচারীদের একটা ছোটখাট ভিড় দাঁড়িয়ে আছে।

বিরাট প্রাসাদ; সেই প্রাসাদের একতলার অনেকাংশ জুড়ে ক্রীড়ানিকেতন। সেখানে নৃত্যগীত কিম্বা অভিনয় আয়োজন হয় না এমন রাত্রি নেই। চাঁদ জানত না যে আজ সেখানে একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দুটি বিদেশী নটিনীর নৃত্যগীতের ব্যবস্থা ছিল। এরা আরবদের জাহাজে এসেছে। আরবদেশের উত্তরে সিরিয়া, সেখানে নাকি নিনেভে নামে এক সহর আছে, সেই সহরে এরা বাস করত বটে আসলে নাকি এরা জাতীতে য়ায়নী। এরা শাড়ী পরে না। কাঁধ থেকে হাঁটুর কিছু নিচে পর্যন্ত ঝোলানো দুটুকরো কাপড় কোমরের কাছে একটা স্বর্ণবন্ধনীতে বাঁধা, কাঁধের উপরে সোনার বন্ধনী কাপড়কে ধ'রে রেখেছে। গলার কিছু নিচে সেই কাপড়ে অনেক কুঁচি দেখে মনে হয় সেখানে কিছু সূচসুতোর কাজ আছে। সর্বাঙ্গে কোথাও অলংকার নেই। মাথায় মুকুট। তার গঠনও কৌতুককর। সোনার তৈরী কিন্তু মনে হ'চ্ছে অত্যন্ত কচি—প্রায় লাল রঙের কয়েকটি পল্লবযুক্ত পাতা যেন জড়িয়ে রেখেছে। তারা নাচছে আর একজন প্রৌঢ় ব'সে একটি তাঁতযন্ত্র বাজাচ্ছে। বীণা কিম্বা ঐ জাতীয় দেশীয় বাদ্যের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এই বিদেশী বাদ্যযন্ত্রে অনুরণন আছে কিন্তু ঝঙ্কার নেই। দেশীয় নাচে হাতের মুদ্রা ও দেহের সূক্ষ্ম বিভঙ্গিম চঞ্চলতা মৃদঙ্গের তালে তালে ধীরে ধীরে যেমন কেন্দ্র-রসকে অবলম্বন ক'রে একটি মনোভাব গ'ড়ে তোলে এদের নাচ তেমন নয়। নটিনী দুজন কখনো হাততালি দিচ্ছে, কখনো গান গাইছে, সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করছে, কখনো হাওয়ায় ভেসে চলেছে; যেন তারা বায়ুচঞ্চল কোন পুষ্পিত শাখা, কিম্বা নবীন তৃণাঙ্কুর-প্রমত্তা দু'টি হরিণী, কিম্বা সূর্যকরঅভিষিক্ত দু'টি নির্ঝর ধারা। চাঁদের মনে হ'ল দেশী নাচে যেমন সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টাকে অনুভব করা যায়, নটিনীর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ যেমন ক্রমশ. তার প্রয়োগকৌশলকে অবলম্বন ক'রে তার অন্তরতম কাব্যকে আস্বাদ করতে. পারে এই য়ায়নী নাচে তা' হচ্ছে না। হরিণীর উল্লাস-নৃত্য দেখে, বায়ু-হিল্লোলিত পুষ্পিতশাখা দেখে দর্শকের মন প্রথমে যেমন আবেগতরঙ্গিত হয়, তার নিজের কোন পূর্ব-অনুভূতি স্মরণ ক'রে ক্রমশ সেই স্মৃতির সহায়তায় যেমন একটি বর্তমান অনুভবলোক সৃষ্টি করে এ নাচে ঠিক তেমন যেন কিছু হ'চ্ছে। সহরের সেই সব রসজ্ঞ যাদের রসচেতনার মূল উপাদান কৌতূহল, দর্শকদের বেশীর ভাগ সেই শ্রেণীর, বয়সের হিসাবে তাদের কোন বিশেষ গণ্ডিতে ফেলা যায় না। এরা ছাড়াও দর্শকদের মধ্যে আর একদল ছিল যাদের রসচেতনা প্রচলিত নৃত্যগীতের ধ্রুবপদী ঠাটে ঝিমিয়ে পড়েছে, ধ্রুবপদী

নৃত্যের পদচারণায় স্খলন এবং বিচ্যুতিই যারা এখন অনুভব করে। কিছু আসন খালি ছিল। তারই একটাতে চাঁদ বসল। সেনানায়ক তার দেহরক্ষীর মতো পায়ে পায়ে চলছিল। সে বোধ হয় এ সব আসরে অভ্যস্ত নয়, বসবার সময়ে তার কোষবদ্ধ তরবারি যোদ্ধসুলভ ঝঙ্কার ক'রে উঠল। কিছু দর্শক নিশব্দ বিস্ময় প্রকাশ করল। চাঁদ লজ্জায় ম'রে গেল। নাচ চলছিল। কিন্তু তার এক পর্যায়ে যখন নর্তকীদের জানুর ঊর্ধ্বদেশেরও কিছু কিছু চোখে পড়তে লাগল তখন চাঁদের কাছে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে অশ্লীল ব'লে মনে হল। সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

কার্নিসের উপরে লুকিয়ে রাখা অসংখ্য প্রদীপ থেকে আলো শঙ্খের মতো মসৃণ উজ্জ্বল ছাদের গায়ে প্রতিফলিত হ'য়ে অলিন্দগুলিকে ভাস্বর ক'রে রেখেছে। অলিন্দর স্তম্ভগুলির গায়ে ধাতব অলঙ্করণগুলো থেকেও আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। কোথাও একজোড়া হীরামন দাঁড়ে ব'সে আলাপ করার মতো ভঙ্গি করছে, অন্য কোথায় ভবনশিখীর পায়ে রৌপ্যমঞ্জীর বেজে বেজে উঠছে।

এক সুবেশিনী পরিচারিকাকে দেখতে পেয়ে চাঁদ জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারল দ্বিতলে ক্ষীরোদসম্ভবার দেখা পাওয়া যাবে। সিঁড়ির শেষে দেয়ালগিরির আলোকে রূপবান তামার সিংহ যেখানে একটি থাবা শূন্যে তুলে পুরুষের রূপের আদর্শ সম্বন্ধে জনসাধারণকে বিজ্ঞ করার চেষ্টা করছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল চাঁদ। সে প্রথমে ধানুকীদের বিশ্রামের ভঙ্গীতে ডান পা সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়াল, একটু পরে ভিক্ষুদের আয়াসের ভঙ্গীতে দু'পা একত্র করল। কয়েকবার এক পা থেকে আর একটিতে দেহভার চালাচালি করার পর চাঁদ সেই বৃদ্ধটিকে দেখতে পেল যে তাকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিল। বৃদ্ধ তাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের একটি ঘরে বসতে ব'লে ক্ষীরোদসম্ভবাকে খবর দিতে গেল। চাঁদ দেখতে পেল সেই ছোট ঘরটিতে এক মনোমোহিনীকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি যুবতী কোন একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করছে। দু'একজন চাঁদের আসার ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করল, কিন্তু তাদের আলোচনার গতির কোন পরিবর্তন হ'ল না। চাঁদ বুঝতে পারল এদের আলোচনার বিষয়বস্তু নরনারীর প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে কিন্তু এদের দৃষ্টিভঙ্গিটা যেন একটু বেশী রকমের তীর্যক।

কিছুকাল পরে একটি পরিচারিকা এসে চাঁদকে ডাকল। চাঁদ তার সঙ্গে দু'একটি ছোটখাট জলসার পাশ কাটিয়ে একটি রত্নগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। এই গৃহের দরজার পাশে একজন পরিচারিকা নিয়ত প্রতীক্ষমাণা। চাঁদকে যে পরিচারিকাটি পথ দেখিয়ে এনেছিল সে বিদায় নিলে দরজার পাশ থেকে অন্য একজন এগিয়ে এসে চাঁদের পরিচয় ইত্যাদি নিয়ে বলল, যান্ অনুসর। প্রবাল রঙের জাজিমে ক্ষীরোদসম্ভবা উরু মুড়ে বসেছিল, আলস্যে উভয় বাহু উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে মাথার পেছনে দুই করতল দিয়ে পরস্পর সংবদ্ধ। চাঁদ ঘরে ঢুকতে এই ভঙ্গীটি দেখতে পেল। চাঁদকে দেখতে পেয়ে ক্ষীরোদসম্ভবা উঠে এসে তাকে স্বাগত জানাল। চাঁদ আসন গ্রহণ করলে ক্ষীরোদসম্ভবা বলল, এতক্ষণ আমরা বীন বাজাচ্ছিলাম। আপনি কি তাই শুনবেন, বণিকশ্রেষ্ঠ?

চাঁদ লক্ষ্য ক'রে দেখল সেই ঘরে আর দু'জন উপস্থিত। তারা চাঁদের বক্তব্য শোনাবার জন্য তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

চাঁদ বলল,—সাগ্রহে।

ক্ষীরোদসম্ভবা বলল,—তার আগে এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি

কোন্নগরের আরক্ষা-অধিকর্তা চন্দ্রকেতু, আর ইনি কৌশাম্বীর কবি বামদেব। আর ইনি হচ্ছেন সমতটের অষ্টবসুর অন্যতম চন্দ্রশেখর।

কুশল প্রশ্নাদি ও সময়োচিত শিষ্টাচারের পর আলাপ একমুখী হ'লে ক্ষীরোদসম্ভবা বীন তুলে নিল। অনিন্দ্যকান্তি ক্ষীরোদসম্ভবা। মন্দিরের স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ কলালক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি যেন তাকে আদর্শ ক'রেই গঠিত। চাঁদ তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বীনের ঝঙ্কারিত মাধুর্য সম্বন্ধে বধির হ'য়ে গেল, কিছুক্ষণ পরে উল্টোটা ঘটল, তন্ত্রীর উপর চঞ্চল আঙুলগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে সে সচেতন রইল না। এ রকম একাধিকবার হ'ল।

বীন থামার পর কৌশাম্বীর বামদেব যখন রাগিনীটি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করল তখন চাঁদের পক্ষে বাস্তবজ্ঞানে ফিরে আসার সুবিধা হ'ল। রাগিনীটির কথায় তার দেশ সমতটে এর প্রচলিত রূপ সম্বন্ধে দু'চারটি কথা ব'লে চাঁদ আলাপকে একটি সংক্ষিপ্ত ছেদে টেনে আনল। এবং যেহেতু তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী এই সময়ে পান নিয়ে এল চাঁদ আলাপ-চারিকাকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিতে পারল,--আপনাকে দেখা, কিছুকাল আপনার কাছে ব'সে আলাপ করা, তার চাইতেও বড় আপনার এই সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য যে আমার হবে এ জানতাম না। কিন্তু আমাকে মার্জনা করুন, এখন আমাকে বিদায় নিতে হবে।

ক্ষীরোদসম্ভবার কাছে আরও কিছু বিনতি জানিয়ে তাম্বুলকরঙ্কের থালীতে পাঁচ-শত এক স্বর্ণমুদ্রার একটি তোড়া রেখে চাঁদ হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল।

একতলায় নেমে এসে চাঁদ দেখল তার সেনানায়ক তখনও ক্রীড়ানিকেতনেই ব'সে আছে। নৃত্যের সাময়িক বিরতি হয়েছে। চেটিকারা আসব বিতরণ করছে। চাঁদ একটি স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে সেনানায়কের সুরাপানের সময়টুকু একজন অপরিচিত বণিকের সঙ্গে আবহাওয়ার আলোচনা ক'রে কাটাল। কিন্তু এদিকে মঞ্চের উপরে আবার নাচের পূর্বাভাস দেখা দিতে না-দিতে চেটিকারা যখন আবার থালীতে ভৃঙ্গার ও পানপাত্র নিয়ে সুরা বিতরণ করতে এল চাঁদ সেনানায়কের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখে তখন নেশা, চাঁদ তাকে প্রায় হাত ধ'রে তুলে নিয়ে এল।

পথে বেরিয়ে অসন্তুষ্ট সেনানায়ককে স্থিতপ্রজ্ঞ করার জন্য সে অনেকক্ষণ থেকে এমন কি ক্ষীরোদসম্ভবার সঙ্গে আলাপ করতে করতেও যা ভাবছিল তা' প্রকাশ করল। সেনা-নায়কের দেশের ভাষায় সে বলল,—গান শুনবার, নাচ দেখবার সুযোগ এর পরেও হবে। এ রাতটা শেষ হওয়ার আগে আরও দু'একটি আমন্ত্রণ রাখা যেতে পারে। কিন্তু এখানে জাহাজ নোঙর করায় তাঁতী সংগ্রহ করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে—এটা বোধ হয় বিস্মৃত হওয়া উচিত হবে না, তাই নয়? আজ রাত্রিতেই তাদের বাসস্থান ইত্যাদির খবর নেয়া সম্ভব হবে না কিন্তু সহরের পথ ঘাট ইত্যাদি চিনে রাখাটা মন্দ নয়।

আকাশে চাঁদ উঠেছিল। পথের ধারে গাছের শাখাগুলির ছায়া মাটির উপরে লুটোপুটি করছিল। শুধু ছায়া নাচানো নয়, পাতার মসৃণ ত্বক্ থেকে একরকমের আলোর প্রলেপ যেন গড়িয়ে গড়িয়ে ফেলে দিচ্ছিল বাতাস, পদ্মপাতায় জমা শিশির নিয়ে ভোরবেলা যেমন হয়।

চাঁদ বলল,—এরপর আমরা যাচ্ছি লীলালতিকার বাসভবনে। তাঁর বয়েস হয়েছে, অত্যন্ত ধার্মিকা ব'লে তাঁর সুখ্যাতিও শুনেছি দু'একজনের মুখে। অনেক ভাগ্যহীন নাবিক তাঁর সাহায্য পেয়েছে, অনেক ভাগ্যহত তাঁর আশ্রয়ে নোঙর ফেলেছে এরকম প্রবাদ আছে।

সেনানায়কের কর্তব্যবোধ চাঁদের মৃদু খোঁচা খেয়ে বোধ হয় জড়িমা কাটিয়ে উঠেছিল কিম্বা চাঁদের তুলনায় তার কর্তব্যজ্ঞান কিছু কম নয় এটা প্রমাণ করার জন্যই সে বলল, —তিনি অনেককে অনেকভাবে সাহায্য করলেও আমাদের তাঁতী সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করবেন কি?

প্রার্থীকে অদেয় কিছু নেই তাঁর, এই ফাঁকা কথাটা ব'লে চাঁদ কিছুকাল নীরব হ'য়ে পথ চলতে লাগল। লীলালতিকার বাড়ীর পথ তার জানা নেই। ক্ষীরোদসম্ভবার বাড়ীর পথ সে পথচারীদের কাছে জানতে পেরেছিল। লীলার বাড়ীর পথ সম্বন্ধে সে বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখাল না; আবর্তিত পথে কতকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে লাগল। সেই অবসরে পর্যায়ক্রমে তাঁতী এবং ধর্ম তার মনে আবর্তিত হ'তে থাকল।

ধর্ম এমন এক বিষয় যা যতো না বিস্ময় ও শ্রদ্ধার তার চাইতে বেশী কৌতুক ও কৌতূহলের। তার নিজের দেশে এক শ্রেণীর ক্রীতদাস সাপের ফণার আকৃতির মুকুট পরা বানর-মুখ এক দেবতার পূজো করে। সমতটের আদিবাসীদের সর্প গোত্রীয় শাখা-চূড়াকরণ বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে হাঁড়ির ভেতরে ক'রে সাপ নিয়ে ব'সে সেই হাঁড়ি স্পর্শ ক'রে কতগুলো সামাজিক বিধি পালন করার প্রতিজ্ঞা করে। ক্রীতদাসদের সঙ্গে সর্পগোত্রীয়দের বিবাহ হ'চ্ছে উভয় পক্ষেই সাপের প্রতি শ্রদ্ধা আছে ব'লে। কালক্রমে যদি আদিবাসীরাও সর্পপূজা সুরু করে তবে অভিনব কিছু ঘটা অপ্রত্যাশিত হবে না। আর ধর্ম! বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের প্রচারিত ধর্মে কত না পার্থক্য। অনেক বিষয়ে একে অন্যের বিপরীত। দুদলের কথাই যদি সত্য হয় তবে তাদের নিষেধগুলি বাদ দিতে দিতে এমন একটা সংকীর্ণ পৃথিবীতে পৌঁছতে হবে যেখানে মানুষ প্রাসাদকাননে মালীর হাতে ছাঁটা ফুলের কেয়ারিতে পরিণত হবে। আর একই ধর্মের কত না বিভিন্ন রূপ। কাশী-কোশলের বৌদ্ধ ধর্ম সমতটে পৌঁছে পরিবর্তিত, স্বর্ণদ্বীপে গিয়ে দেখা যাবে বৌদ্ধধর্ম ঠাকুর পূজোয় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মে একটি বিষয় আছে যা সবগুলিতে একটা মৌল ঐক্যের নির্দেশ দিচ্ছে—তা হচ্ছে, কোন ধর্মেরই বিধান কেউ মানে না। অথচ যে কোন ধর্ম আলোচনার সভায় যোগ দিলে দেখা যাবে ধর্ম পালন করাই মানুষের মুখ্য কাজ।

এর চাইতেও কৌতুকের ব্যাপার ধর্মের কতগুলি বিধান, তা তোমার যে কোন ধর্মই হ'ক না, যা না মানলে ধর্মহীনদেরও চলে না। যেমন এই তাঁতী সংগ্রহের ব্যাপার। স্বর্ণ-দ্বীপের রাজা তার উপকার করেছে, তার বদলে কৃতজ্ঞতা নয় শুধু প্রত্যুপকার করা উচিত। নতুবা স্বর্ণদ্বীপের রাজার দেশে চাঁদের ব্যবসা গুটোতে হবে। তা ছাড়া বিপদসংকুল এই বাণিজ্যের ব্যাপারে প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকের সাহায্য দরকার। যদি এরকম অপযশ রাষ্ট্র হয় যে চাঁদ প্রত্যুপকার করে না তবে তার বিপদে অন্যের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। যে বণিক ঋণপত্রের মর্যাদা রাখে না তার হুণ্ডি কম্বুদয় থেকে নিনভে পর্যন্ত মূল্যবান ব'লে স্বীকৃত হবে কেন?

চাঁদ বলল,—এটা সম্ভবত এই সহরের বাজার। হিসেব ক'রে দেখো সমুদ্রতীর থেকে পূর্বদিককে লক্ষ্য রেখে উত্তরে প্রসারিত পথগুলি দিয়ে গেলে ক্ষীরোদসম্ভবার বাড়ীর পাশ দিয়ে এই বাজারে আসা যায়। তাঁতীরা এখানে দিনের বেলায় নিশ্চয়ই আসে। যদি তুমি দুজন সৈন্য সঙ্গে ছদ্মবেশে কাল এখানে আস হয়তো তাঁতীদের পাড়াগুলি চিনে যেতে পারবে। এর পর আমরা লীলালতিকার ভবনে যাব। লক্ষ্য ক'রে দেখো নাগরিকাদের বাসভবনগুলি প্রায়ই সমুদ্রতীর থেকে নগরের কেন্দ্রের দিকে প্রসারিত কোন

প্রধান পথের উপরে।

চাঁদ এবং তার সঙ্গী যখন লীলালতিকার বাসভবনের সম্মুখে পৌঁছালো তখন রাত্রির প্রথম প্রহরও জরাগ্রস্ত হয় নি। বাসভবনটি একটি চতুষ্কোণ সৌধ। পথ থেকে সদর দরজার দ্বারীদের পার হ'লে দূর্বাঢাকা একটি অঙ্গন। অঙ্গনের শেষে প্রাসাদ। তখন শুক্ল পক্ষ ব'লে প্রাসাদকে আলোকিত করার কোনো ব্যবস্থা নেই। চাঁদ বিস্মিত হ'য়ে প্রাসাদের গঠন লক্ষ্য করতে লাগল। অত্যন্ত সরল স্তম্ভগুলিতে কোনো বিশেষ কারুকার্য নেই। স্থূল স্তম্ভগুলি সূচলো হ'য়ে উঠেছে, তাদের গায়ে পল তোলা। স্তম্ভের গোড়ায় পদ্মের পাপড়ি খোদাই করা। কিন্তু অভিনবত্বের চাইতে বেশী যা তা হ'চ্ছে সমগ্র প্রাসাদটিকে একটি সজীব কিছু ব'লে মনে হ'ল। সে সজীবতা স্তম্ভে নেই, প্রাসাদের ভিত্তি দেয়াল কিম্বা চূড়াতেও পৃথকভাবে কোথাও লক্ষ্যণীয় নয় কিন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রাসাদটিকে লক্ষ্য করলে একটি জাহাজের মতোই তাকে প্রাণসত্তাবিশিষ্ট ব'লে মনে হয়।

লীলালতিকার বয়স হয়েছে। কপালে প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য ছায়া ফেলেছে। দেহবর্ণ ঈষৎ রক্তহীন, যেন শ্বেতপদ্মের রঙ। শাদায় রূপোর ফুলতোলা মসলিন পরনে। হাতে হীরক বলয়, গলায় মুক্তার হার। সাদা একটি গালিচার উপর সাদা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'সে লীলালতিকা একখানি বই পড়ছে। বাঁয়ের দিকে রৌপ্যদণ্ডের উপরে স্ফটিকের প্রদীপ। তার ডাইনে রৌপ্য পিঠিকায় সুদৃশ্য স্বচ্ছপাত্রে শ্বেত সুরা।

চাঁদ একা চেটিকার সঙ্গে লীলার ঘরে এসে দেখল সে তখনও বই পড়ছে। লীলালতিকা চাঁদকে স্বাগত ক'রে বলল,—এসো। তুমি চাঁদ? তোমার কথা আমি এর আগেও শুনেছি। তুমি কি আমার ভাষা বুঝতে পারছ? যদি এতে অসুবিধা হয়, তোমাদের সমতটীয় বাংলাতেও আলাপ করতে পারি।

চাঁদ বলল,—তার প্রয়োজন হবে না, লীলালতিকা, আপনার ভাষা এমন উৎকর্ষে পৌঁছেচে যেখানে পৃথিবীর সব ভাষাই এক। তা ছাড়া আমি আদি বাংলার ভাষা বাল্যে পাঠশালায় যত্ন ক'রে শিখেছিলাম।

লীলালতিকা স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বলল,—বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

চাঁদ ব'সে মুহূর্তকাল আলাপের বিষয় খুঁজল তার পর কৌতুককর সংবাদ আদানপ্রদান করার সুরে বলল,—যায়নীয় নাচ দেখলাম।

—কোথায়?—ক্ষীরোদসম্ভবার বাড়ীতে? ক্ষীরো এসেছিল বটে বলতে।

—হ্যাঁ, সেই নাচ দেখেছি।

—লোকে কিন্তু ভিড় করছে; তোমার কি বিরস বোধ হ'ল? প্রথম নাচ আমার এখানেই হয়েছিল।

—অশ্লীলও বটে। কিন্তু আপনি কেন এই নাচকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

লীলা কিছুকাল চুপ করে রইলো। তারপরে বলল,—আমরা যে এদের নাচে যায়নীয় শিল্পের উৎকর্ষ পাব না, তা খুবই স্বাভাবিক। একটা বিষয় কিন্তু লক্ষ্যণীয়—এরা যে মনোভাবটি প্রকাশ করতে চায় সেটা মিশ্ররসের এবং তা খানিকটা এরা করতেও পারছে। এই পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি বিরুদ্ধ রসগুলি গলাগলি ক'রে থাকে।

—কিন্তু পৃথিবীতে যা ঘটে তাতো শিল্প নয়।

—খুব খাঁটি কথা। তা হ'লে শিল্পই বাহুল্য হ'ত। আমাদের মতো দশজনের বোঝবার সুবিধার জন্যে শিল্পী আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিচিত আকারগুলো ফুটিয়ে তোলে,

কিন্তু সেই আকারগুলোকে গড়ার মুন্সিয়ানা যেখানে শেষ সেখানে সুরু হ'ল শিল্প।

—আমার মনে হচ্ছে কোন কারণে শাস্ত্রোক্ত রসবিভাগকে আপনি মানতে পারছেন না। এটা একটা বিদ্রোহের মতো ব্যাপার।

লীলাবতিকা একটু হেসে বলল,—আচ্ছা চাঁদ, ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী নিয়েই যদি মানুষ সন্তুষ্ট থাকত—

—মানুষকে তাহলে প্রশংসা করার কিছু থাকত না।

—ঠিক তাই। স্বর্গে, শুনেছি, যে গানই গাও ঐ বেয়াল্লিশের বাইরে যায় না। এ বিষয়ে অন্তত আমরা পৃথিবীকে স্বর্গের চাইতে বিস্তৃততর করেছি।

—য়বনীয় নাচ দেখে নতুন কোন নাচের পরিকল্পনা এসেছে আপনার মনে? তাহলে আনন্দের ব্যাপারই হবে। পরবর্তী কালে আপনার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে নৃত্য একটি সুমহান পরিণতি প্রাপ্ত হবে এমন আশা করা যায়।

লীলাবতিকা সুরার পাত্রে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়ে পাত্রটি নামিয়ে রাখল।

তোমার জন্যে কি আহার্য এনে দেব, চাঁদ?

চাঁদ যেন অত্যন্ত আগ্রহভরে লীলাবতিকার অধরস্পৃষ্ট সুরাপাত্রটি তুলে নেয়ার জন্য হাত বাড়াল।

লীলাবতিকা বলল, না ওটাকে স্পর্শ ক'র না। নতুন সুরাপাত্র আনছি। আমি তোমাকে বলতে পারতাম ওতে অহিফেন আছে। কিন্তু তা নয়, আমার কাশি হয়েছে। কমে গেলেও এখনো সাবধান থাকা উচিত।

চাঁদ খোলা গলায় হেসে বলল, এটা আদি বাংলায় খুবই স্বাভাবিক। অধর স্পর্শন সম্বন্ধে এ মতবাদের ঢেউ আমাদের দেশেও পৌঁছেচে। যুবকরা মানছে এবং যুবতীরা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করছে। খুব গোলমেলে অবস্থা।

—গোলমাল হওয়াটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আমাদের এ দেশে তো ব্যাপারটা প্রথম-দিকে ধর্মসম্প্রদায়গত কলহে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। মতবাদটি প্রথমে বিক্রমশীলা থেকে প্রচারিত হয়। এই সূত্রে প্রতিহত যুবক যুবতী এবং কালক্রমে বয়স্ক ব্যক্তিরাও বলতে সুরু করল এটা সমগ্র দেশকে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ করার কৌশল। লীলা হাসল।

সংসার পরিচালনার ব্যাপারে তার চোখের ইশারাই যথেষ্ট, তৎক্ষণে মণি-পান্না খচিত একটি পাত্র এবং ভৃঙ্গার এসে গেছে চাঁদের জন্য। লীলাবতিকার হাত থেকে সুরাপাত্র নিয়ে চাঁদ হাসিমুখে বলল, এটা শুনবার মতো গল্প বটে।

চাঁদ সুরায় অনভ্যস্ত নয়, অনাসক্তও নয়। সে আস্বাদ করে বুঝল অসাধারণ কিছু না হলেও বয়ঃসমৃদ্ধির দিক দিয়ে অন্তত লীলাবতিকার সমানই হবে এই সুরা। কিন্তু বিদেশে সুরামত্ত হয়ে বিপন্ন হওয়ার একাধিক ঘটনা জানা ছিল চাঁদের। তার মনে ছিল বর্তমানে তার দুর্দশার কাল যাচ্ছে। সুতরাং সুরাকে সে যত তারিফ করল ততটা গ্রহণ করল না। বরং পানপাত্রটির কারুকার্যের দিকে সে আসলের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

লীলা বলল, এ আধুনিকতা যদি তোমার ভালো লাগে, চাঁদ, তবে তোমাকে অন্য এক আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিতে পারি। অবশ্য তোমার কাছে সে সব চিত্র আধুনিক কিনা বলা শক্ত, আমাদের এদেশে তারা অভিনব।

ইরাণী চিত্রকরদের চর্মপটগুলোর কথা বলছেন?

না। এ দেশেরই এক চিত্রকর। চিত্রগৃহে যাবে?

চাঁদ লীলার সঙ্গে চিত্রগৃহে গেল। একজন ক্রীতদাসী সুরাপাত্র ও ভৃঙ্গার নিয়ে তাদের অনুসরণ করল। (পরিচারিকার লম্বমান বেণী, পেশোয়াজ ও ওড়নায় বোঝা যায় সে ক্রীতদাসী।)

লীলা বলল,—দূর থেকে দেখো চাঁদ, তোমার মনে হবে কোন বালকশিল্পী তার অপটু রেখায় এবং রঙের আতিশয্য-প্রিয়তা থেকে কতগুলো কিম্ভূত মূর্তি এঁকেছে।

চাঁদ দেয়ালে আঁকা ছবিগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল,—এ মূর্তিগুলো যেন কোথায় দেখেছি।

—দু'একখানা ছবি দেখবার পর আমার মনে হ'য়েছিল বাজারে শিশুদের জন্যে যে মাটির খেলনা পাওয়া যায়, চিত্রকর সেগুলোকেই নরনারী ও ইতর প্রাণীর প্রকৃত মূর্তি ব'লে গ্রহণ করেছে।

—চিত্রের গঠনে মাটির পুতুলের গঠনের সাদৃশ্য আছে। (চাঁদ লীলালতিকার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল।) এরকম মনে হওয়া অযৌক্তিক নয় যে চিত্রকর একজন চিত্রণপটু কিশোর, কিম্বা সে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে তার মনোজগতে বয়সের ছাপ পড়েনি। আমাদের দেশে এক সন্ত আছেন যাঁর বয়স সত্তরের কোঠায়; বেদ-বেদান্ত তাঁর কাছে ব্যাকরণের প্রথম পাঠ; কিন্তু তাঁকে প্রজাপতি ধরার জন্যে মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়।

লীলালতিকা বলল,—আমাদের এই চিত্রকর সম্বন্ধেও এক কৌতুককর গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। এ চিত্রকরও একজন প্রবীণ বৌদ্ধ ভিক্ষু। শ্রীপুর-বিহারের দেয়ালে এর প্রথম জীবনের আঁকা অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। তারপর এর জীবনে এসেছে এক নারী। সাধারণ নারী নয় সে, ভৈরবী। লোকে বলে রূপমুগ্ধ চিত্রকরের আকুলতায় নিজের সাধনাকে বিপন্ন দেখে ভৈরবী তাকে মন্ত্রবলে কিশোর ক'রে দিয়েছে।

—গল্পটি সুন্দর। কিন্তু এর মূলে কি কোনো সত্য আছে?

—তা আছে। এ সহরের একান্তে এক জীর্ণ লোকেশ্বরের মন্দিরে ভৈরবী বাস করে। আমাদের এই চিত্রকর দিনে অন্তত একবার তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। অন্য সময়ে আহার নিদ্রা জ্ঞানশূন্য হয়ে এই চিত্রগৃহে থাকে। এখনও বোধ হয় লোকেশ্বরের মন্দিরেই গিয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ বলল,—কিন্তু চিত্রকরকে আপনি কোনোরকম মনোরোগগ্রস্ত মনে করেন এমন তো বোধ হয় না। এমন ভাবে ছবিগুলোকে আলোকিত রাখার ব্যবস্থা শুধু সুরুচির চিহ্নই নয়।

লীলা একটু ইতস্তত ক'রে বলল,—আচ্ছা চাঁদ, তুমি ঠিক খাঁটি কথাটা বলোতো, চিত্রগুলোতে কোন অসাধারণত্ব দেখতে পাও কি না?

চাঁদ তার বক্তব্য প্রকাশ করার আগে মনে মনে সেটাকে গুছিয়ে নিল, তারপরে বলল,—আকৃতিগুলোতে প্রত্যক্ষের যাথার্থ্য না থাকায় এক সময়ে আকারের তুলনায় ভঙ্গিগুলোই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—আপাতত এইটুকুই লাভ। এও যেন যায়নীয় নাচ,—ব'লে লীলা হাসল। আঙ্গিক বুঝি না, প্রয়োগ কৌশল জানি না তবু যেন তার বক্তব্য কিছু গ্রহণ করি।

আরও কিছুকাল চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা হ'ল। লীলালতিকার বলবার সুন্দর ভঙ্গিতে তার যে কোনো বক্তব্যই আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে। চাঁদ যেমন লীলালতিকার সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন থাকবার চেষ্টা করল, লীলাও তেমনি চাঁদের মনের কথা জানবার ইচ্ছা থেকে

বুঝতে পারল সে প্রসঙ্গান্তরে পৌঁছে লীলার সাহায্য পাওয়ার আশ্বাস পেলে আরও শান্ত হ'তে পারে।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে লীলা বলল,- চাঁদ, আমি তোমার কথা শুনতে চাই।

ওরা চিত্রগৃহ থেকে বেরিয়ে লীলার সভাগৃহের দিকে রওনা হ'ল। সভাগৃহটিকে দেখার পর চলতি ভাষায় একে সম্বর্ধনা-কক্ষ বলা যায় অন্তত সাজসজ্জা ও আসন ইত্যাদি দেখে তাই মনে হ'ল।

-না, এমন কিছু তাড়া নেই, বলল চাঁদ, আচ্ছা কথায় কথায় মনে পড়ল এখানে তন্তুবায়দের পাড়াটা কোথায়?

ঠিক বলতে পারিনে। ওদের আলাপ শুনে মনে হয় ভালো কাপড় যেখানে হয় সেটা এখান থেকে প্রায় বিশ যোজন উত্তরে- দিগ্‌নগরে। এখানকার মহাজনরা দামী মাল সেখান থেকে আনে। কিন্তু সেখানে গিয়েও তুমি কিছু সুবিধা করতে পারবে ব'লে মনে হয় না, এখানকার শ্রেষ্ঠীরা তাঁতীদের দু'তিন বছরের দাদন খাইয়ে রেখেছে।

---আশ্চর্য! কয়েকজন লোক আমাকে বলল, কোন্নগরেও কিছু তাঁতী আছে যারা ভালো কাজ করতে পারে। (চাঁদের কথা সর্বাংশে সত্য নয়।)

লীলা মিঠা হাসিমুখে বলল, নিজের দেশের দুর্বলতার কথা বিদেশীকে ব'লে দেওয়া উচিত হবে না। আসলে কোন্নগরেও কিছু তাঁতী আছে। তাদের কাজ হ'চ্ছে দিগ্‌নগরী ধরনে শাড়ী বোনা। শ্রেষ্ঠীরা দিগ্‌নগরের সব তাঁতীকে জালে ফেলেছে বটে কিন্তু সে জাল সব সময়ে গুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এক সময়ে তোমার মতো কোন বণিক এসে যদি পাঁচ হাজার দিগ্‌নগরী চেয়ে বসে -তখন শ্রেষ্ঠীরা কি করবে? সেইজন্যেই প্রত্যেক শ্রেষ্ঠী কিছু কিছু তাঁতী পুষছে।

চাঁদ এবার আশ্চর্য হ'ল না; বাণিজ্যে এমন কৌশল আছে। তা ছাড়া অন্য কারণেও জাল শাড়ী বোনা দরকার- লাক্ষা দিয়ে জাল প্রবাল তৈরী করার মতো। কম দামের শাড়ীতে দিগ্‌নগরী নক্সা তোলা দরকার হয়, বরং যেন বাড়াবাড়িই করতে হয়। দয়িতের কাছে রাজকন্যা এবং কোটালকন্যার অধরবান্ধুলির স্বাদ যেমন এক, তাদের ভূষণপ্রিয়তাও তেমনি।

চাঁদ বলল, এমন কিছু তাঁতী আমার দরকার ছিল।

-- দাদন দেবে?

- -আপনি কি বলেন?

---তুমি বিদেশী হ'য়ে এদের দাদনে আটকাতে পারবে? তা ছাড়া এসব তাঁতী শ্রেষ্ঠীদের কাছে আত্মবিক্রীত। আরবদের আনা ক্রীতদাসের মতোই এদের অবস্থা।

চাঁদ কিছুকাল চিন্তা ক'রে বলল,--এসব তাঁতীদের তা'হ'লে হাত বদলের সম্ভাবনা আছে?

লীলা বলল,--ঠিক খবরটা তোমাকে দিতে পারলাম না। তবে স্বভাবত এদের মধ্যে যারা কর্মক্ষম তাদের ছাড়ে না শ্রেষ্ঠীরা। অতিবৃদ্ধ, অলস, অপরিণত তাঁতীদের এবং কোনো নারী যার রূপ তাঁতীকুলের পক্ষে মহার্ঘ্য--এমন সব হয়তো দাদনের সূত্রে হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন?

মনের কথা সব সময়ে মুখে বলা যায় না। উত্তর দেওয়ার আগে চাঁদকে ভাবতে হ'ল। উত্তর দিতে দেরী হ'চ্ছে এটা অনুভব ক'রে যেন কুণ্ঠাই সেই বিলম্বের কারণ এমনি এক

মুখভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে সে বলল,—তাঁতীদের সম্বন্ধে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম।

লীলা অপূর্ব শব্দ ক'রে হেসে উঠল। দেহের তুলনায় তার হাসি অনেক তারুণ্য মণ্ডিত।

চাঁদ বলল,—আপনি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না?

—করি। যদি দুজনেই জেগে থাকি। তবে তুমি যখন স্বপ্নাদেশের কথাই বলছ—তখন তোমাকে খবর দিতে পারি: কিছুক্ষণ আগে চিত্রকরের কথায় যে ভৈরবীর কথা বলেছিলাম সে নাকি এক স্বপ্নাদেশ পায় আর সেইজন্যেই এই সহরের নিচুতলার অধিবাসীদের উপরে তার প্রভাবও যথেষ্ট।

বণিক চন্দ্রশেখর তার উপজীবিকার তাগিদে এবং অভিজ্ঞতা থেকেও বটে নিজের মনোভাব কথার আড়ালে উহ্য রাখতে পারদর্শী। কিন্তু বর্তমানে তাঁতীদের নিয়ে সে অত্যন্ত দ্রুত চিন্তা করছিল ব'লে অন্য কথায় যাওয়ার জন্য যে কথাগুলো বলল সেগুলো রসাল হয়ে ফুটল না। কথা বলার নেতৃত্ব আবার লীলার কাছে ফিরে গেল।

লীলা বলল,– চাঁদ, তুমি নিশ্চয়ই বিবাহিত।

—বিপত্নীক।

লীলা এ প্রশ্নের অবতারণা ক'রে বিপন্না বোধ করল। এ ক্ষেত্রে সমবেদনা জানানো মানে আবহাওয়াকে গুরুভার ক'রে তোলা। সে বলল,—তোমার স্বদেশে ফিরে যাবার আকুলতা বুঝবার চেষ্টা করলাম। তুমি কি একবার চীনদেশে যেতে পার? সেদেশে, শুনেছি, একরকম মৃৎপাত্র পাওয়া যায় যার মসৃণতা মর্মরের মতো, ঔজ্জ্বল্য মুক্তার মতো, যা নাকি কপোতপক্ষের মতো লঘুভার আর অধরবিম্বের মতো রক্তচিহ্নিত।

—এ রকম পানপাত্রের ধনিষ্ঠ হ'তে সাধ যায় বৈকি। যদি যাই কখনো, মনে রাখব। আপনার জন্যে আর কি আনতে পারি?

– সত্যি আনবে, চাঁদ? যদি পার আমার জন্যে একটি বালকভৃত্য আনবে। আমি শুনেছি য়ায়নীদের মধ্যে কন্দর্পকান্তি পুরুষ পাওয়া যায়। তুর্কী বণিকরা অনেক সময়ে বোগদাদে তাদের বিক্রী করে। তুমি যে যায়নীদের দেখে এসেছ তাদের দেহে তুর্কী রক্ত আছে। আমি এদের একটিকে কিনব কিন্তু জোড়ার পুরুষটিকে এনে দেবে তুমি।

চাঁদ হেসে বলল,—আমার একার পক্ষে চীন ও ইরাণ থেকে পণ্য আহরণ করা কতদূর সম্ভব বলতে পারি না, তবে স্বদেশে ফিরে আমি ইরাণী ও চৈনিক বণিকদের কাছে ব'লে দেব, এবং আশা করি আপনার সখ্যের যৎকিঞ্চিত প্রতিদান দেবার সৌভাগ্য আমার হবে।

চাঁদ উঠে দাঁড়াল।

এটা ওটা আলাপ করতে করতে তারা সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল। লীলা বলল —তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি, চাঁদ?

চাঁদ বলল,—আপনার সখ্য দিতে পারেন। কোন্নগরের বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে তা হ'লে অনুভব করব স্বদেশে এলাম।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চাঁদকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে লীলা বলল,—তোমার সখ্য আমি স্বীকার করলাম। তারপর বয়সের তুলনায় অনেক তরল মধুর গলায় হেসে বলল,—কিন্তু দেখো নৃশংস ব্যবহার ক'রে আমাকে কুণ্ঠিত কোর না।

চাঁদ বলল,—না। বিশ্বের জন্য উন্মুক্তদ্বার এই কোন্নগরে ক্ষাত্রোচিত নিষ্ঠুরতার স্থান নেই। বণিকরা যে ক্ষত্রিয়দের চাইতে ভদ্র এবং হৃদয়বান্ অন্তত কোন্নগরে এসে তা বিশ্বাস করা যায়।

সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নামতে নামতে লীলা বলল,—তুমি কি তাঁতীদের সম্বন্ধে সত্যই খবর নিতে চাও? যদি বলো আমি আমার চিত্রকরকে ব'লে রাখতে পারি। সে তোমাকে কিছু সুযোগ ক'রে দিতে পারে।

চাঁদ বলল,—কাল আবার আসব।

পথে বেরিয়ে চাঁদ বলল,—এখন আমরা জাহাজেই ফিরব।

পরের দিন সন্ধ্যার কিছু আগে চাঁদ নৌসেনানীকে তার স্বপ্নের কথা বলল। সমস্ত দিন চাঁদ এই স্বপ্নেই ডুবে ছিল। স্বপ্নটা এই রকম . ত্রয়োদশী তিথিতে চাঁদের জাহাজ এক অজ্ঞাত দেশে এসে পৌঁছেচে, এমন সময়ে সে স্বপ্ন দেখল সমুদ্র তাকে ডেকে বলছে—তার এক কন্যার জন্য ভালো শাড়ী দরকার, দেখতে দেখতে তাঁতীরা এসে পৌঁছাল। ত্রয়োদশীর দিন ব'লে ঠিক তের ঘর তাঁতী। ওদিকে এক ভৈরবী স্বপ্ন দেখলেন, তাঁতীদের এক ভগবান এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে তাকে বলছেন, সমুদ্র আমার মিত্র; তার কন্যার জন্য আভরণ সংগ্রহ ক'রে দিলে আমি সন্তুষ্ট হব। তখন তের ঘর তাঁতী এল সন্ধ্যার লগ্নে, সমুদ্রের পুজো ক'রে তারা জাহাজে উঠল। তীরে দাঁড়িয়ে যেখানে সমুদ্রের জল দিনের বেলায় নীল এবং জ্যোৎস্নায় কালো দেখায় সেখানে এক অতিকায় প্রাণী আসবে। সেখানে বস্ত্রগুলো সম্প্রদান করতে হবে। চাঁদের জাহাজে ক'রে সেখানে তাঁতীদের নিয়ে যেতে পারে যদি তারা যেতে চায়।

স্বপ্ন বিবরণ শুনে নৌসেনানী চাঁদের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল।

চাঁদ বলল, এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কোন এক ভৈরবীকে খুঁজে বার করা যার সঙ্গে আমার স্বপ্নে দেখা ভৈরবীর কিছু মিল আছে।

—এই এতবড় সহরে তাকে কোথায় খুঁজে পাব?

—তোমার যদি তেল কিনবার দরকার হয় তাহ'লে তুমি যেমন বাজারে যাও, তেমনি ভৈরবীদের খুঁজতে তুমি শ্মশানেই যাবে। একজন ভৈরবীকে পেলে তার স্বগোত্রীয়দের অনেকের খবরই তার কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা।

সন্ধ্যার পরে চাঁদ সাজসজ্জা ক'রে লীলালতিকার বাড়ীতে গেল। সেনানায়ক একজন অনুচর সঙ্গে ক'রে শ্মশানের খোঁজে উপকূল ধ'রে ইতস্তত চলতে লাগল। বলা বাহুল্য তখন তাদের দেখে মৌনী কোনো সাধকশ্রেণীর লোক ব'লেই মনে হবে।

লীলা বলল,—এস চাঁদ তোমাকে আমার চিত্রকরের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেই। চাঁদ লীলার সঙ্গে গিয়ে দেখতে পেল,—মুণ্ডিতশীর্ষ এক প্রৌঢ়, পরনে তার কষায় বস্ত্র, চিত্রগৃহের মেঝেতে অস্থিরভাবে পদচারণা করছে। পদচারণার এক পর্যায়ে তাদের প্রায় দুহাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েও সে তাদের যেন দেখতেই পেল না।

লীলা তখন তাকে ডাকল। তার স্বরে স্নেহ এবং সহৃদয়তা। অন্যমনস্ক ভিক্ষু চারু দত্ত। লীলাকে দ্বিতীয়বার ডাকতে হ'ল।

চিত্রকর আহ্বান লক্ষ্য ক'রে কাছে এলে চাঁদ চমকে উঠল। চিত্রকরের মুখাকৃতি কুৎসিতভাবে বিকৃত। ডান ভ্রূর উপরে একটি শুকনো ক্ষতচিহ্ন, আগুনে পোড়ার পর যেমন হ'তে পারে। চিবুকটা নাকের তুলনায় এতটা বাঁদিকে স'রে গেছে যে অধরোষ্ঠ সমান্তরাল হ'লেও বিষম বিস্তৃত।

লীলা বলল,—ভিক্ষু চারুদত্ত, ইনি চন্দ্রশেখর।

চারুদত্ত তার পায়চারি থামিয়ে আকস্মিকভাবে চাঁদের একেবারে মুখোমুখি এসে

দাঁড়াল। হেসে বলল,—খুবই ভুল ওটা। শিশুদের চুলের মতো কোমল ভাবে অধর-ওষ্ঠ ও গণ্ডে লতিয়ে লতিয়ে পড়লেই কি আপনার গোঁফ ভালো দেখাবে? দু'পাশে পাকিয়ে তুলে দিয়ে পরশুর চেহারা ব'য়ে বেড়ালেই কি ক্ষত্রিয় হওয়া যায়?

চারুদত্ত হেসেছিল চাঁদের মনোহর আকৃতির অসামঞ্জস্যে কৌতুক অনুভব ক'রে আর লীলা হাসল চারুদত্তর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের অস্বাভাবিক প্রকাশ ও চাঁদের বিমূঢ়তাকে লক্ষ্য ক'রে।

লীলা বলল, —চারুদত্ত, তোমাকে সৌন্দর্যচর্চার জন্যে আহ্বান করা হয় নি। এ'র সঙ্গে রূঢ়ভাষী না হ'য়ে যদি আলাপ করতে পার, কর।

চারুদত্ত বলল,—কেন পারব না। বলুন, কি বিষয়ে আলোচনা হবে? বেদান্ত, নন্দনতত্ত্ব কিম্বা মহানিকায়: বলুন, ভদ্র, আপনি কোন বিষয়ে আলোচনার অভিলাষী।

চাঁদ প্রথমে বিমূঢ় হ'লেও এরকম পরিস্থিতিতে সেও কৌতুক বোধ করল। সে বলল, —আপনি যেভাবে ঐ তিনটি শাস্ত্রের কথা বললেন তাতে মনে হ'চ্ছে আপনি ওসব বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানী। যে কোন একটি বিষয়ে বললেই আমরা শুনতে পারি।

চারুদত্তের কুৎসিত মুখে লজ্জার চিহ্ন দেখা দিল। সে বলল,—আপনি যদি এরকম ক'রে বলেন আমি বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ব?

চাঁদ বলল,—তা হ'লে আসুন আমরা গল্প করি।

—তা মন্দ নয়। আচ্ছা বলুন তো পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর কি?

—প্রেম।

—উঁহু, আমার তো তা মনে হয় না। ও তো আসল জিনিসের একটা গতি মাত্র। আসলে সুন্দর হ'চ্ছে মানুষের মন। ফুল সুন্দর কিন্তু সেটা সৌন্দর্যের একদিক। বিষ এবং মধু, পবিত্রতা ও কদর্যতায় জড়ানো বহুবর্ণের বর্ণাতীত সমুদ্রের চাইতে গভীর, আলোর চাইতে স্বচ্ছ, আকাশের চাইতে উদার এবং গৃহের চাইতে সংকীর্ণ এই সম্পদ, মন। সব চাইতে সুন্দর আমার ছবি কিম্বা লীলার হাসি তা মনে করবেন না। কিন্তু এই সুন্দর জিনিসটা একজন মানুষ আর একজনকে দিতে পারে না, দেওয়া নেওয়া কোনদিনই হ'ল না। কেন, জানেন? মানুষের চেহারা আছে ব'লে। চোখের দৃষ্টি, অধরের ভাষা, উপস্থিতির উষ্ণতা এসবই মনকে আড়াল ক'রে রাখে। এই ব্যবধান সরানোর একমাত্র উপায়,—বলব কথাটা?

—বোধ হয় মানুষকে কুৎসিত করা?

চারুদত্ত চাঁদের অজ্ঞতায় হাসল। সে বলল,—তাই ব'লে আমার মতো কুৎসিত করা নয় যদিও কথাটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার চেহারার কদর্যতারও একটা ভাষা আছে তা' এত মুখর যে আমার মনের কদর্যতা তার হট্টগোলে চাপা প'ড়ে যায়। যদিও আপনার গোঁফ সম্বন্ধে আমার আপত্তি তুলে নিচ্ছি না, তাহ'লেও বলতে পারি আপনার রূপও আপনার মনকে আমার মনে ছাপ ফেলতে দেয় না। চেহারার ছাপটাই পড়ে সেখানে। আমি স্বপ্ন দেখি এক পৃথিবীর যেখানে মানুষের মুখাবয়ব কাঠের চতুষ্কোণ কুঁদোর মতো জ্যামিতিক অভিন্নতায় গঠিত। সেই পৃথিবীতে মানুষ প্রথম মুখভঙ্গী না ক'রে নিজের মনকে প্রকাশ করতে শিখবে।

—এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত, বলল চাঁদ, সেইজন্যেই নিজের আকৃতি সম্বন্ধে আমি যত্নহীন।

—বলেন কি? তা হ'লে আজ থেকে আমি আপনার সখা। জীবনে এই প্রথম একজন মানুষ পেলাম যার অনুভবের বালাই আছে। দেহের সঙ্গে দেহের ঘর্ষণই সার, হাটে বাজারে অজ্ঞাত লোকের মতো, মনগুলো এক অজ্ঞাত সাগরে দ্বীপের মতো বিক্ষিপ্ত।

চারুদত্ত একবার পায়চারি ক'রে এল।

লীলা আবার ধমকের সুরে বলল,—চারুদত্ত, কি ছাই পাঁশ বকছ। ইনি বিদেশী, তোমার ভাষাই হয়তো বুঝতে পারছেন না।

চারুদত্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্তির স্বরে বললে,— তা হ'লে কেন বকাচ্ছো আমাকে?

লীলা বলল,—তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন? ইনি তোমার সেই ভৈরবী সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান।

—সে কথা বললেই হ'ত। আপনি কিছু মনে করবেন না; এসব লীলার কারসাজি তা আমি বুঝতে পারছি। মেয়েটি ভালো ব'লেই ওর বাড়ীতে থাকি কিন্তু তার জন্যে সইতেও আমাকে কম হয় না। ও জানে যে আমার রাগ বেশী তাই চটিয়ে দেবে, জানে যে সৌন্দর্যের কথা বললেই আমি মনের কথা পেরে বসি তাই সেটাই প্রথমে বলবে। বলুন, কথাগুলো ওই আপনাকে শিখিয়ে দেয়নি? চারুদত্ত লজ্জায় বিপন্ন মুখ ক'রে থেমে গেল।

—তা দিয়েছি। এখন তোমার ভৈরবীর কথা বলো।

কথা আর কি বলব। সে তো তুমিই সব জানো।

ইনি তাঁকে দেখতে চান।

স্বচ্ছন্দে, এখুনি যেতে পারেন আমার সঙ্গে, আমি নিজেই তাঁর কাছে যাব-যাব করছিলাম।

—যাবে তাই, চাঁদ? আচ্ছা চারুদত্ত তাহ'লে তুমি প্রস্তুত হ'য়ে আমার বসবার ঘরে এসো, চাঁদ সেখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

লীলা চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে তার বসবার ঘরে এল, সেই ঘরে যেখানে ব'সে সে কাল বই পড়ছিল।

লীলা বলল,—এই ভালো হ'ল চাঁদ; চারুদত্ত এককথায় রাজি হ'য়ে গেছে, এখনই গিয়ে দেখে এস। চারুদত্তকে ভৈরবী সম্বন্ধে কথা বলানোই মুস্কিল। আমার মনে হয় চারুদত্ত ভৈরবীর মধ্যে স্নেহশীলা এক প্রণয়পাত্রী পেয়েছে। আর সেই জন্যে কখনো কখনো ভৈরবীর কাছে অন্য কারো উপস্থিতি সইতে পারে না।

চাঁদ বলল,—যদি ফিরতে অনেক রাত না হয়, তা'হলে আমি আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যাব।

চারুদত্তর গুছিয়ে আসতে কিছু দেরী হ'ল। লীলা এবং চাঁদ সেই অবসরে সান্ধ্য সুরা পান ক'রে নিল। লীলা খবর শুনালো, বাংলাদেশের রাজার মৃত্যু হ'য়েছে। মাস দু'এক পরে নতুন রাজার অভিষেক হবে। উৎসব দেখতে অন্য সব অঞ্চল থেকে যেমন, কোন্নগর থেকেও তেমনি বহু লোক রাজধানীতে যাবে। চাঁদও এই সুযোগে রাজধানী দেখে আসতে পারে। চাঁদ বলেছিল, যদি লীলা যায় তবে সে তার পার্শ্বরক্ষী হ'য়ে যেতে পারে।

চারুদত্তর সঙ্গে শ্মশানে পৌঁছে চাঁদ দেখতে পেল পুরাকালের এক লোকেশ্বর শিবের মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে যে অশ্বত্থগাছ উঠেছে তার পল্লবগুলি নবমীর চাঁদের আলোয় থর থর ক'রে কাঁপছে। সেই অশ্বত্থগাছের ছায়া যেখানে আলোকে আড়াল

রয়েছে প্রথম দৃষ্টিতে সেখানে অন্ধকারই চোখে পড়ে, তারপর দেখতে পাওয়া যায় নতুন খড়ের একটি ছোট চৌরি ঘর। চারুদত্ত সেই ঘরের সম্মুখে গিয়ে মৃদুস্বরে ভৈরবীকে ডাকল। প্রথমে আগড় খোলার শব্দ হ'ল তারপরে এক মূর্তি দেখা দিল। জটাসমন্বিতা রুদ্রাক্ষমালাভূষিতা একজনকে কল্পনা করেছিল চাঁদ। অশ্বত্থ ছায়ার গণ্ডির প্রান্তে এসে যে দাঁড়াল সে অবগুণ্ঠনবতী। অবগুণ্ঠন এসে বুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চাঁদের মনে পড়ল এরকম অবগুণ্ঠনবতী মেয়েকে সে তার এক আরব বণিক বন্ধুর জাহাজে দেখেছিল। শুধু সেই বণিকবন্ধুর স্ত্রীর অবগুণ্ঠনের আপাদশীর্ষ বিলম্বিত কালো কাপড়ে কোথাও ছেদ ছিল না, আর এর ঘোমটার পাড় বুকের উপর দিয়ে কাঁধে পৌঁছে একটা জীবন্ত কিছুর মতো লতিয়ে গিয়েছে গুণ্ঠনবতীকে ঘিরে ঘিরে। শুধু পা দুখানা দেখা যাচ্ছে, পা দুখানাকে দেখানোর জন্যই যেন কাপড়টা একটু উঁচু ক'রে পড়া। সেই অস্পষ্ট আলোকে চাঁদের মনে হ'ল গুহাভিত্তিতে চিত্রিত কোনো নগ্নিকার পদপল্লবের মতো সুপরিকল্পিত ভৈরবীর পা দুখানা। সে কবি হ'লে তার পরিচিত এক কবির মতো বলতে পারত : অনুভব হ'ল, সেই অলঙ্কারবিমুক্ত পদপল্লবে রৌপ্যমঞ্জীরের কলঙ্ক নয় শুধু, তাদের শব্দের রেশও এখনো জড়িয়ে আছে। কিন্তু ভৈরবীকে চিনবার উপায় ছিল না। অবগুণ্ঠনের আড়ালে সে সুন্দর কিম্বা কুৎসিত কিম্বা অতি সাধারণ এ বুঝবার যেমন সুযোগ নেই তেমনি উপায় ছিল না তার অদৃশ্য আকৃতি দেখবার আগ্রহকে মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার।

চারুদত্ত বলল,—ভৈরবী, ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমাদের লীলা-লতিকার বন্ধুস্থানীয় ইনি।

তারপর চাঁদকে সে বলল,—এবার আপনার পরিচয় আপনি দিন।

চাঁদ বলল,—আমি চন্দ্রশেখর বসু, সমতটের বণিক।

কোনো লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময়ে কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া যায় না, নতুবা তাই করা উচিত ছিল চাঁদের। তার স্বর বিকৃত শোনাল। ভৈরবী কথা বলল না, কিন্তু একটা কম্পন তার বুকের কাছে সুরু হ'য়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল। চাঁদ লক্ষ্য না করলেও চারদত্ত দেখতে পেল ভৈরবীর পায়ের আঙুলগুলো পিচ্ছিল মাটিতে চলার সময়ে যেমন স্বাভাবিক তেমনি ক'রে মাটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল।

চাঁদ বলল,—আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।

চাঁদের কথা শেষ হ'লে অশ্বত্থগাছের পাতার কয়েকটি পৎ পৎ ক'রে শব্দ হল। শ্মশানের দিগন্তবিস্তৃত বালি থেকে বালিয়াড়ি গড়া আর ভাঙার কাজে বাতাস শ্রান্ত শ্রমিকের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। চাঁদের মনে হ'ল সময় একটি অদৃশ্য বিরাট কায়ার রক্তস্রোতের মতো প্রবাহিত হ'চ্ছে।

চাঁদ এবার পরিষ্কার গলায় বলল,—আমি বিপন্ন। এই কথাটা বলতে বলতে তার মনে হ'ল আর কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হ্রাস পাবে।

ভৈরবী বলল, তার গলার স্বর ভারি,— কাল এসো, একা, অনেক রাতে।

চারুদত্ত বলল,—তাহ'লে আজ চলুন। আপনি ভৈরবীর কৃপা পেয়েছেন।

শ্মশান থেকে রাজপথে উঠে চারুদত্ত বলল,—আপনি সৌভাগ্যবান, ভৈরবী আপনার সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু সে কথা যাক, এমন রূপসী আপনি এর আগে কোথাও দেখেছেন? আমি তো দেখিনি। ঐ অশ্বত্থের ছায়ায় দাঁড়িয়েই এক রৌদ্রতপ্ত দুপুরে এই অবগুণ্ঠন-

বতীকে দেখতে দেখতে প্রথম মানুষের রূপের সাক্ষাৎ পেলাম। বলুন, ভৈরবীর মনের স্পর্শ পাচ্ছিলেন না?

চাঁদ বলল,--পাচ্ছিলাম! সে চিন্তা করল,--চাঁদের আলোয় দেখা সেই শান্ত শ্মশানে জটাজুটধারিণী গৈরিকমণ্ডিতা ভৈরবী দিনের আলোয় বড় চড়া রঙের হ'ত, মানাতো না।

চারুদত্ত বলল,--আমার কাছে এই শ্মশান অতি পরিচিত। আমি একা একা দিন-রাত ঘুরে দেখেছি কোথাও কিছু অস্পষ্ট নেই। নশ্বর পৃথিবীতে যা ঘটতে পারে তাই ঘটে। কিন্তু ভৈরবীর সান্নিধ্যে দাঁড়ালেই আমার মনে হয় পৃথিবীতে যা ঘটে সেটা যত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট বলে মনে হয় আসলে সেটা তা নয়। ভৈরবীর মনই নিজেকে আমার আপনার চোখের সম্মুখে ছড়িয়ে দেয়।

চাঁদ বলল, তা খানিকটা সত্য বৈ কি। ভৈরবীকে দেখতে পেলে তার দৃষ্টি, চিবুকের গড়ন, ঠোঁটের অবস্থান থেকে বোধ হয় ধরা যেত কি করলে তাকে প্রসন্ন করা যায়।

চারুদত্ত বলল, অবিশ্যি আমারও এ রকম মনে হ'ত, এ অনুভবের কারণ ভৈরবীর মন আমার মনকে স্পর্শ করছে বলে নয়, আমার মনই বরং সব কিছুকে এই ভাবে প্রভাবিত করতে চায় বলেই এরকম হয়। কিন্তু কথা না বলে সেই অবগুণ্ঠনবতীর সম্মুখে দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরাধিককাল দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করছিলাম একটি করুণ আর্তি আমাদের দুজনকে ঘিরে স্থির জলাশয়ের মতো স্পর্শ দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করিনি কিন্তু আমার বোধ হয় সে বিরহকাতর।

চাঁদ বলল,--তাই নাকি? সে চিন্তা করল, অনেক ভৈরবী বা সন্ন্যাসীকে বিত্তের সহজ এবং গৃহের স্বচ্ছন্দ সুখ দিয়ে যেমন ভোলানো যায় তেমনি যায় কপট সম্ভ্রম দেখিয়ে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে?

লীলালতিকার প্রাসাদ থেকে তখন বাঁশি ও মন্দিরার সংগীত ঝাঁঝরের সৈকতে এসে আছড়ে পড়ছে। প্রাসাদের কাছে চারুদত্ত বিদায় নিল।

পরের দিন দশমীর চাঁদ যখন মধ্যাহ্ন রেখা পার হ'য়েছে তখন একজন মাত্র সংগী নিয়ে সে ভৈরবীর শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। রাজপথ যেখানে শ্মশানভূমিতে মিশেছে চাঁদ সেখানে সংগীকে অপেক্ষা করতে বলল। তারা পরামর্শ করে স্থির করেছিল বিপন্ন হ'লে চাঁদ শিংগা বাজাবে। আর যদি নগররক্ষীরা তাদের কাউকে তস্কর ইত্যাদি মনে ক'রে কয়েদ করে তবে তাদের অনুরোধ করা হবে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার আগে লীলার সংগে দেখা করার সুযোগ দিতে। চাঁদ শ্মশানভূমির দিকে যাত্রা করল, আর তার সংগী পথের পাশে এক গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল।

দিগন্তবিস্তৃত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সৈকতে এই শ্মশান। কোথাও কাশজাতীয় ঘাসের ছোট দু'একটি ঝোপ। দূর্বাজাতীয় একরকম ঘাস বালি ঢেকে রেখেছে অন্য কোথাও। দূরে সমুদ্রের বীচিভংগের ছবি। শুধু চাঁদ জানে সমুদ্রের এমন তরংগ উৎক্ষেপে গর্জন থাকে। সমুদ্রের বুকে নিস্তব্ধ রাত্রি খাঁ খাঁ করে না। পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। সে লক্ষ্য ক'রে দেখল একটি চিতাও জ্বলছে না যে পথ হারালে সেখানে গিয়ে পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু দিকনির্ণয়ের জন্য জাহাজের পাটাতনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সুদূরকে লক্ষ্য করতে শেখা তার কাজে লাগল। দেখতে পেল সেই শ্মশানসৈকতের পূর্ব-দক্ষিণে একটি জায়গা কালো হ'য়ে আছে। গত রাত্রিতে চাঁদ আকাশে এত উঁচুতে ছিল না। চাঁদের কালকের অবস্থান এবং চারুদত্ত প্রদর্শিত পথ মিলিয়ে ঐ কালো জায়গাটিই যে

লোকেশ্বরের মন্দির এরকম ধারণা হ'ল তার।

চাঁদ যখন মন্দিরের কাছে গিয়ে পেঁছালো তখন যামঘোষরা রাত্রির তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করছে। সে কিছুকাল ইতস্তত ক'রে প্রথমে তার স্বাভাবিক পরে উচ্চতর স্বরে ভৈরবীকে কয়েকবার ডাকল। কাল চোখে পড়েনি, আজ অশ্বত্থের ছায়া স'রে গেছে ব'লে ভৈরবীর কুটীর স্পষ্টতর হ'য়ে চোখে পড়ল। চাঁদ উত্তরের আশায় কিছুকাল বৃথা অপেক্ষা ক'রে অবশেষে কুটীরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, এবং (অন্য মহিলার ক্ষেত্রে যা করতে কুণ্ঠিত হ'ত) ভৈরবী, ব'লে জাফরি দেওয়া জানালায় উঁকি দিয়ে কুটীরের ভেতরটা লক্ষ্য করল।

ভৈরবী ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল। কিছু দূরে একটি মাটির প্রদীপ প্রায় নিবে এসেছে। ভৈরবীর মাথার পাশে একখানা খোলা পুঁথি, তার উপরে তার ডান হাত অলস ভাবে ছড়ানো। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে এরকম হয়। তার সর্বাঙ্গ একটি মোটা চাদরে ঢাকা, ঘুমের ঘোরেও অবগুণ্ঠন স'রে যায়নি। তবে কালকের মতো আবক্ষ বিস্তৃত নয়। ঠোঁটের একাংশ, চিবুক ও কণ্ঠের কিছুটা চোখে পড়ছে। চিবুকের কোমল দৃঢ়তা, অধরোষ্ঠের রক্তাভতা ও কণ্ঠের শঙ্খভাঁজ দেখে চাঁদের মনে হ'ল ভৈরবী অত্যন্ত অল্প বয়সেই সিদ্ধিলাভ করেছে।

কই শুনছেন প্রভৃতি অনির্দিষ্ট আহবান ক'রেও ভৈরবীর গাঢ় ঘুম যখন ভাঙ্‌ল না তখন চাঁদ ভৈরবীর শিয়রের কাছে নতজানু হ'য়ে ব'সে ডাকল,—ভৈরবী, কাল দেখা করতে বলেছিলেন ব'লে এসেছি। দু'তিনবার এরকম ভাবে ডেকেও যখন ভৈরবীর ঘুম ভাঙ্‌ল না তখন চাঁদ বিড়বিড় ক'রে বলল,—এ কি রকম ভৈরবী বুঝি না। হাজার হ'লেও নারী। ঘুম ভাঙ্‌লে বলবে, কখন আবার ঘুমোলাম। ধাক্কা দিয়ে জাগানো কি উচিত হবে?

দু'এক দণ্ড অপেক্ষা ক'রে চাঁদ—ও মশাই, শুনছেন ব'লে যেই ধাক্কা দিতে যাবে এমন সময়ে ভৈরবীর ঘুম ভাঙ্‌ল।

সে উঠে ব'সে গুণ্ঠন টানল, কিন্তু তার ওষ্ঠাধর ঢাকা পড়ল না। চাঁদ লক্ষ্য করল তার বাম অধরে মস্ত একটি তিল এবং সেই তিল থেকে কয়েকটি রোম আত্মপ্রকাশ করছে। এই জন্যেই কি এত ঘোমটার বাড়াবাড়ি? ভাবল চাঁদ। কিন্তু ভৈরবীর রক্তাভ অধরোষ্ঠে মধুর হাসি খেলে গেল।

ভৈরবী বলল,—আপনি আসবেন আমি জানতাম। আপনার ভূতভবিষ্যৎ চিন্তা করতে গিয়ে প্রথমে দেখতে পেলাম আপনি কিছুদিন আগে পত্নী ও বাহন হারিয়েছেন। আপনার পত্নীর নাম ছিল স্বর্ণগোধিকা।

চাঁদ বলল,—স্বর্ণগোধিকা না স্বর্ণকায়া। তা হ'লেও আপনার দিব্যশক্তিকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। (চাঁদের একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।)

—আপনি বাহনগুলোর মধ্যে একটি হয়তো বাঁচাতে পেরেছেন কিন্তু অন্যগুলি?

—বাঁচাতে পারিনি। আমার স্ত্রী-র সম্বন্ধে আপনি কিছু বলতে পারেন?

—ভেবে বলতে পারি। তা ছাড়া আপনি সে সংবাদের জন্যে আসেননি ব'লেই আমি অনুভব করছি কাজেই ও বিষয়ে মনঃস্থির করা এখন সম্ভব নয়।

—আমি কেন এসেছি তা কি আপনি বুঝতে পারছেন?

—আপনার অতীত জানতে পেরে আর এই নিশুতি রাতে আপনার এখানে আসা থেকে এটুকু বুঝতে পারছি যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনে আপনি আমার সহায়তা চান।

চাঁদ আগ্রহসহকারে বলল,—একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি বিপন্ন এবং আপনাদের

সাহায্য প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আপনাকে আমার অভিপ্রায় জানাতে পারি।

—আপনাকে আমার যথাশক্তি সাহায্য করা হয়তো অসম্ভব নয় কিন্তু তাতে কারো সঙ্গে শত্রুতার সৃষ্টি হবে না তো।

চাঁদ বলল,—না, না। তা কেন। এই ব'লে চাঁদ তার তাঁতীদের সম্বন্ধে স্বপ্নের কথা বলল।

ভৈরবী স্তব্ধ হ'য়ে শুনল। স্বপ্ন এখন আরও বিস্তৃত হ'য়েছে, এমনকি তার মধ্যে তাঁতীদের বয়স ইত্যাদি সম্বন্ধেও সংখ্যাগত বিবরণ প্রবেশ করেছে। স্বপ্ন-বর্ণনা শেষ ক'রে চাঁদ বলল,—এখন বলুন এই ব্যাপারে আপনি কি সাহায্য করতে পারেন আমাকে।

ভৈরবী বলল,—তাঁতীদের বর্ণনা শুনে মনে হ'চ্ছে আপনি তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে কুশলী তাদেরকেই চান। কিন্তু তাদের কোন অসুবিধা হ'লে আমার পক্ষে এদেশে সুনাম নিয়ে বাস করা কঠিন হবে।

চাঁদ বলল,—অসুবিধা কেন হবে, কিই বা হবে? একটু নতুনত্ব বইতো নয়। সে মনে মনে বলল,—কাজটা অত সহজে যদি মিটে যায় তোমাকেও জাহাজে ক'রে তাঁতীদের সঙ্গে রেখে আসতে পারি। উক্তিটা অশ্রদ্ধেয় শোনায় ব'লেই সে যুক্তি দিল নিজের মনের কাছে,—দেবদেবীরাও তো একদেশ থেকে আর একদেশে গিয়ে পুজো পায়, ভৈরবী চালান গেলেইবা ক্ষতি কি?

ভৈরবী কথা বলার আগে চিন্তা করল তারপর বলল,—ভেবে দেখব। কাল আসবেন?

—তা আসব।

কাজটা যত সহজে মিটবে আশা করেছিল চাঁদ তা' হ'ল না। ভৈরবীর সঙ্গে আরও কয়েক রাত্রি পর পর দেখা করতে হ'ল।

ভৈরবী একদিন বলল, আচ্ছা, চাঁদ, তুমি বিয়ে করো না কেন? কাজের কথা বলা হ'য়ে গেছে, ভৈরবী খবর দিয়েছে তাঁতীদের কয়েকজন মাতব্বর কাল আসবে। চাঁদের মন প্রফুল্ল ছিল, সে বলল,—আবার বিয়ে ক'রে কি হবে। একটির স্মৃতিই যথেষ্ট।

—তুমি কি তোমার স্ত্রীকে এত ভালোবাসো?

—তা কিছুটা বাসি বৈকি?

—আচ্ছা চাঁদ তোমার চোখে কি এমন কোনো নারী পড়েনি যে তোমার স্ত্রীর চাইতেও কাম্য হ'তে পারে?

চাঁদ মনে মনে ভাবল,—ভৈরবী হ'লে কি হবে, স্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে পারেনি।

—উত্তর দিলে না।

—আপাতত পড়েছে বলতে পারি না।

মানুষের বেলায় যেমন, দেবতাদের বেলাতেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাদের চরিত্রের অনেক নতুন দিক উদ্ঘাটনের সুযোগ এনে দেয়। চাঁদ অনুভব করল এই তরুণী ভৈরবীর চরিত্রে দৃঢ়তা যেমন আছে তেমনি আছে পরিহাস-প্রিয়তা। সে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেনি কিন্তু নিজের অজ্ঞাতে তার স্বরূপের কিছু অংশ উদ্ঘাটিত করেছে। ইতিমধ্যে সে একবার খিল-খিল ক'রে হেসে উঠেছিল। সে হাসি শুধু ভৈরবীর কঠোর জীবনের পক্ষেই অনন্যসাধারণ নয় সুখলালিতা গৃহস্থ বধূদের মধ্যেও দুর্লভ। অবগুণ্ঠনের প্রান্তে বিকশিত তার অধরোষ্ঠের গতিভঙ্গ, তার সুগঠিত কৌমুদিশুভ্র দন্তপংক্তি এসবই তার ভাষাকে

পূর্ণতর করছে। এমনকি তার চিবুকের বামদিকের রোমশ তিলটিও পরিচয়ের ফলে বন্ধুর মুখের বিকৃতির মতো সুখসহ হ'য়ে গেছে।

চাঁদ বলল,—আপনি আমার জন্যে এত করছেন আমি আপনার কোনো কাজে এলে ধন্য হ'তাম।

—তুমি বণিক। তুমি ঐশ্বর্য বলতে ধনসম্পদকেই বোঝ। তুমি আমাকে কি দেবে, চাঁদ? শুনলে অবাক হবে আমার পিতৃকুল থেকে আমি এত বিত্ত পেতে পারি যে তোমার সেই মধুকর জাহাজগুলোর মতো সাতখানা জাহাজ জলে ভাসিয়ে কোনো তরুণ বণিককে তোমার গল্পের অষ্টবসু হ'তে সাহায্য করতে পারি।

চাঁদ বিস্মিত হ'ল। ভৈরবীর কথার সুর একটু ভারি, কিন্তু দম্ভ প্রকাশের উদগ্রতা কিম্বা মিথ্যা কাহিনীর দ্বিধা তাতে ছিল না। তা ছাড়া 'মধুকর' কথাটার উল্লেখ ছিল।

– তবে আপনি এ পথে এলেন কেন?

—এ পথ কি খারাপ? জানতে চাও, চাঁদ, কেন আমি এ পথে এলাম? আমাকে নিয়ে গৃহী হ'তে পারে এমন সাহসী পুরুষের সাক্ষাৎ আমাদের দেশে পাইনি ব'লে।

—কিসে তাদের সাহসের এত অভাব হ'ল?

— কিন্তু তুমি এত কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? ভৈরবী হেসে উঠল।

চাঁদ যেন সম্বিত পেল।

ভৈরবী বলল,—এখন তুমি যাও। কাল দিনের বেলায় তাঁতীদের মাতব্বররা আসবে, তখন এসো। তোমার এত অভিজ্ঞতা হ'য়েছে আর এটুকু জানো না ভৈরবীদের মোহগ্রস্ত পুরুষের শেষ পরিণতি মহাসনে রূপান্তরিত হওয়া। আর কখনো ভৈরবীদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা কোর না।

চাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—কাল দুপুরে আসব।

সে রাত্রিতে জাহাজের অল্পপরিসর শয্যায় সত্যিকারের স্বপ্ন দেখল চাঁদ। তার জাহাজ বাণিজ্যবায়ু ভরে তীব্র গতিতে কূল থেকে স'রে যাচ্ছে এমন সময়ে ঢাকঢোলের বাজনায় সৈকতের দিকে চাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। জনতার মধ্যে কে যেন আকুল স্বরে কি বলছে কিন্তু তার আর্তির একটি শব্দও বোধগম্য হ'চ্ছে না। চাঁদ যেন ভালো ক'রে লক্ষ্য করার চেষ্টা করতেই দেখতে পেল তার স্বদেশে মৃত ক্রীতদাসদের স্ত্রীদের যেমন কখনো কখনো হাত পা বেঁধে সহমরণে যেতে বাধ্য করা হয় তেমনি ক'রে হাত পা বাঁধা একটি অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে এরা নিয়ে যাচ্ছে। ভৈরবী নাকি? দূরে লোকেশ্বর মহাকালের মন্দিরচত্বরের ভগ্নাবশেষের সামনে ফুলের মালার সাজানো একটা হাড়িকাঠ। স্ত্রীলোকটিকে হাড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধেছে। অবগুণ্ঠন ঢাকা মাথাটা হাড়িকাঠের গায়ে হেলান। শঙ্খভাঁজের চিহ্ন আঁকা মসৃণ কোমল কণ্ঠ চোখে পড়ছে। মৃদুবাতাসে তার অবগুণ্ঠন স'রে গেল। চাঁদ সনকা-সনকা ব'লে ডাকতে ডাকতে উঠে বসল।

পরদিন তাঁতীদের মাতব্বররা কিছুক্ষণ আলাপ করার পর সরল ধর্মবিশ্বাস এবং ব্যাপারটার অভিনবত্ব ও উৎসব-উল্লাসের আশ্বাসে সমুদ্রকন্যাকে বস্ত্র দিতে রাজি হ'য়ে চ'লে গেল। ভৈরবী বিশ্রাম করব ব'লে উঠে দাঁড়ালেও চাঁদ ব'সে রইল।

পূর্ণিমার তিথিতে তাঁতীরা সমুদ্রপূজায় যাবে। তেরজন কুশলী তাঁতী এবং সমসংখ্যক স্ত্রীলোক উৎসবের বেশে সজ্জিত হ'য়ে আসবে। উৎসবউন্মুখতা ও কৌতূহল থেকে আরও অনেক তাঁতী ও তার দ্বিগুণ সংখ্যক স্ত্রীলোক সমুদ্রপূজায় যোগ দেওয়ার জন্য

ভৈরবীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল। ভৈরবী তাদের নিরস্ত করেছে। তখন তারাই নিজেদের মধ্যে থেকে যোগ্যতম লোক বেছে দিয়েছে।

চাঁদ চ'লে গেলে ভৈরবী রান্নার ব্যবস্থা করবে ব'লে উঠল কিন্তু উনুন ধরাতে ব'সে চোখ জ্বালা ক'রে উঠল তার। একি করছে সে? চাঁদ প্রায় বিদ্ধ হ'য়েছে। তাকে এ পরীক্ষা না করলে কি চলে না? আজ রাত্রিতে আবার আসতে বলার কোনো কারণই ছিল না। ভৈরবীর কাছে তার যে সাহায্য পাওয়ার কথা সে সম্বন্ধে দিনের বেলাতেই সব কথা হ'য়ে গেছে। চাঁদের অতীত থেকে এই বোঝা যাচ্ছে যে তার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের ভূতের বোঝা কাঁধ থেকে নামতেই তার প্রফুল্ল মন মধুরের সঙ্গ চাইবে; ফুল, কাব্য, সঙ্গীত ও রমণীর সঙ্গ সবই তার কাছে সমান আগ্রহ এবং শ্রদ্ধার বিষয়। আর দু'দিন পরেই উৎসব, তার পরেই হয়তো চাঁদ চ'লে যাবে। ভৈরবী কি করবে সহসা খুঁজে পেল না। গুণ্ঠনের ভৈরবীভঙ্গীর আড়ালে যা আছে সেটা রমণীর মন। ভৈরবী রান্না করল না।

চাঁদ বিকেলের রোদ পড়তেই উপস্থিত হ'ল।

সে এসেই বলল,—আমি অনেক ভেবে দেখলাম। আমার নৌকায় ক'রে আপনাকে নিয়ে যাওয়াই উচিত হবে।

ভৈরবীর অধরোষ্ঠ হেসে উঠল। সে টিপে টিপে হাসতে হাসতে বলল,—তুমি তো বণিক চাঁদ, তোমার কি কোন্নগর থেকে কেনাকাটা কিম্বা বিক্রীর কিছু নেই? তোমার হাতে যেন অনেক সময়।

চাঁদের মুখমণ্ডল লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। সে ক্ষণকালের জন্য অধোবদন হ'ল। আর তাই দেখে ভৈরবীর চিত্ত আবার আহা আহা ক'রে উঠল। কিন্তু সে বলল,—সারাদিন তোমার কাজ ক'রে আজ রান্নাবান্নাও করিনি।

চাঁদ উঠে দাঁড়াল।

ভৈরবী বলল,—আহা, তোমাকে কে উঠতে বলেছে? এখন বিকেল। তুমি যদি বসতে রাত্রি হও আমি রান্না ক'রে নিতে পারি। কাজ করতে করতেই তোমার গল্প শুনতে পারি। আমার শুনবার আগ্রহ আছে। তুমি চ'লে গেলে বুঝব আমার অসৌজন্যেই বিরক্ত হ'য়ে গেছ।

চাঁদ ব'সে প'ড়ে বলল,—আপনি রান্না করুন।

—তা হ'লে তুমি গল্প করতে রাজি আছ? বেশতো আর এক কাজই না হয় করো। আমার কাছে খেতে আপত্তি আছে? যখন গৃহস্থ ছিলাম তখন আমি তোমার স্বজাতী ছিলাম। তা ছাড়া আমি মহামাংস খাই না, এমনকি নরকপালও পাত্র হিসাবে ব্যবহার করি না।

চাঁদ দ্বিধা করতে লাগল।

ভৈরবী বলল,—থাক তা হ'লে তুমি গল্প কর। রান্না পরে হবে।

—না না, আমার জন্যে কেন ব্যস্ত হ'চ্ছেন? আমি তো জাহাজে ফিরেই আহার করব।

—খেলেইবা আমার কাছে। জানো চাঁদ সেই কতদিন আগে একটি পুরুষকে রান্না ক'রে খাইয়েছিলাম এক ব্রত ক'রে। ভৈরবী ব'লে এখন সবাই ভয় ক'রে বটে মনে মনে বোধহয় ঘৃণাও করে। চারুদত্ত ছাড়া আর কেউ আমার হাতে খায় না পর্যন্ত।

—আপনার জীবন পবিত্র। একথা সত্য, আমার ভয় ছিল হয়তো ভৈরবীরা নরমাংস খায়। আপনাকে দেখে তা মনে হয় না।

—বলো তা হ'লে তোমার জন্যে রান্না করি।

—করুন।

আয়োজন সামান্য। রান্না শেষ হ'তে দেরী হ'ল না। গুণ্ঠনবতী ভৈরবী চাঁদের হাত-পা ধোয়ার জল এনে দিল। হাত-পা ধুয়ে চাঁদ যখন আহারে বসল তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে; ঘরের মধ্যে আলো এসে পড়েছে।

ভৈরবীর ঘরে দু'টিমাত্র আসনই ছিল : একটি তার শয্যা, অন্যটিতে চাঁদ এতদিন এসে বসেছে। কিন্তু চাঁদ সেই আসনে ব'সে আহার করায় হয়'ত ভৈরবীর হিসাবে সেটা বর্তমানে অব্যবহার্য। ভৈরবী বলল,—তুমি বিছানায় বোস। আমি এদিকটা মুক্ত ক'রে ফেলি।

চাঁদ বলল,—কিন্তু আপনি অনাহারে আছেন।

ভৈরবী খিল খিল ক'রে হেসে উঠে বললে,—ভৈরবীর দৃষ্টিমাত্রেই আহার তা বুঝি জানো না? কিন্তু তাও নয় আমি রাত্রিতে আহার করি না।

কাজ শেষ ক'রে হাত-পা ধুয়ে-মুছে তার বাঘ-ছালের শয্যারই এক প্রান্তে ভৈরবী বসল। তার ইচ্ছা হ'ল সে সনকার কথা উত্থাপন করবে; বিশেষ ক'রে সনকা চাঁদের অন্তরে এখনো কতখানি উজ্জ্বল হ'য়ে আছে এই যেন জানবার ইচ্ছা হ'ল তার। কিন্তু সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। দু'জনেই নির্বাক। দু'জনের নিশ্বাসের শব্দ থেমে থেমে কেঁপে কেঁপে দুজনের কানে আসতে লাগল। চাঁদ যখন তার অনিচ্ছুক কণ্ঠ থেকে কথা ফুটিয়ে তুলল তখন ভৈরবী তার অবগুণ্ঠন সমেত যেন পাথর হ'য়ে গেল, চাঁদ নিজেও কথাটার রূঢ় প্রকাশে লজ্জিত হ'ল। চাঁদ বলেছিল,—আমি তো দু'দিন বাদেই চ'লে যাব, একবারও কি আপনার মুখখানি দেখতে পাই না? কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভৈরবী বলল, —চাঁদ, রাত হ'য়েছে। এখন কি তুমি যাবে?

উৎসবের আগের দিন চাঁদ লীলার বাড়ীতে গেল। তখনও দুপুর হয়নি। লীলার ঘরে গিয়ে চাঁদ একটু অবাক হ'য়ে গেল, সেটা যেন রাতারাতি কোন বৌদ্ধবিহারে পরিবর্তিত হ'য়েছে। কোনো একটি বিষয়ে তুমুল আলোচনা হ'চ্ছে। চাঁদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল না তার পক্ষে এখন এ ঘরে প্রবেশ করা উচিত হবে কি না। দু'একজন মাত্র তাকে লক্ষ্য করল। আর সকলে আলোচনায় ব্যস্ত। প্রকাশ্য আলোচনার এই নিয়ম যে নিঃশব্দে সভার একপ্রান্তে আসন নিলেই সভাকে কম বিব্রত করা হয়। চাঁদ তাই করল। সে লক্ষ্য করল লীলাকে কেন্দ্র ক'রে যে সব রূপসীরা বসেছে তাদের মধ্যে ক্ষীরোদসম্ভবাও আছে। পুরুষদের মধ্যে কৌশাম্বীর কবি বামদেব এবং নগর অধিকর্তা চন্দ্রকেতুকে চিনতে পারল চাঁদ। চারুদত্ত ছিল·না। অন্যান্যদের চিনতে না পারলেও তাদের বহুমূল্য বেশভূষা, কারো কারো রত্নখচিত মুকুট দেখে চাঁদ বুঝতে পারল এরা কেউই অবহেলার উপযুক্ত নয়।

আলোচনা হ'চ্ছিল একটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। আলোচনার ধারা দেখে চাঁদ বুঝতে পারল কাব্যটি আর যাই হোক বহু প্রচলিতের মধ্যে নয়। আলোচনা চলতে চলতে লীলা বলল,—উর্বশীর মুখ দিয়ে কবি যা প্রকাশ করেছেন সে রকম জীবনের কামনা মেয়েদের হয় কিনা বলা কঠিন, উর্বশীর মতো কারো হ'তেও পারে কিন্তু এখানে আসলে দ্রষ্টব্য হ'চ্ছে পুরুষের মন। পুরুষরা আদর্শ নায়ক হ'য়েও উর্বশীর পূর্ব-প্রেমিকদের প্রতি অসহিষ্ণু। পুরুষরা চিরকালই এরকমই ছিল কিনা জানি না। বর্তমানে তারা পুরুরবার মতোই

অসূয়াপরায়ণ। স্ত্রীকে সে নিজে কত প্রশংসাই না ক'রে কিন্তু অন্য কেউ তেমন করুক, অমনি সেই প্রশংসার পাত্রী অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবার অপরাধে অভিযুক্ত হবে।

পুরুষদের একজন বলল,—পুরুষদের এই প্রবণতাকে কি আপনি অন্যায় মনে করেন?

—না।

—উর্বশীর মনোভাবকে কি নিন্দাযোগ্য মনে করেন? একজন নাগরিকা বলল। সে ইন্দ্রের শয্যা থেকে পালিয়ে এসেছিল একটি মানুষ রাজার কাছে সেদিকটা লক্ষ্য ক'রে বলছি না। উর্বশী যে বলছে আমি বাঁধন সইতে পারি না। একাহং বহু স্যাম্। অনেকে আমাকে বন্দনা করুক, অনেকে আমাকে কাজে লাগাক—এ মনোবৃত্তিকে কি আপনি চপলতা মাত্র বলেন?

লীলা হাসল। মাথা নিচু ক'রে নিজের সংবদ্ধ অঞ্জলির দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, নিন্দার নয়। পুরুষ যদি অসূয়াপরায়ণ না হ'ত প্রকৃতি থেকে তবে তাকে অসূয়ার শিক্ষা দেওয়ার দরকার হ'ত। স্ত্রী যদি নিজের সম্পদ একজনকে দিয়েই তৃপ্ত হ'ত তাহ'লে পৃথিবী বিস্বাদ হ'য়ে যেত। আমার মনে হ'চ্ছে কবি একটি আদি সত্যকে প্রকাশ করেছেন। পুরুষ অসূয়াপরায়ণ হ'য়ে স্ত্রীকে তার রোমশ বাহু মেলে ঘিরে না রাখলে নারীর লালিত্য ও লাবণ্য বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকত না, তার সন্তানরা রক্ষা পেত না; নারী যদি বহুর বন্দনা কামনা না করত তবে সে বাঘিনীর চাইতেও ভয়ঙ্কর হ'য়ে নিজের সন্তানকে আহার করত, সংসারকে নিজের চারিদিকে ধ'রে রাখতে পারত না। আসলে নারীকে উর্বশীর মতো আর পুরুষকে পুরুরবার মতো করা প্রকৃতির উদ্দেশ্য। সে যাই হ'ক, উর্বশীর কাহিনী কবির হাতে একেবারে নতুন হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু আমার একটা বিশেষ বক্তব্য আছে এখন। আমাদের এখনও দুটি সর্গ শোনা বাকি। সকলে স্নানাহার ক'রে নিলে কেমন হয়। না-না, আপনারা কেউ উঠবেন না। কবিকে নিয়ে চলুন। বাড়ীর সরোবরে স্নান হবে। স্নান করতে করতে আলোচনা চালালে দোষের হবে না। আমি চেটিকাদের ব'লে দিচ্ছি তারা বস্ত্রাদি নিয়ে যাবে। কিছু আহার্যও সঙ্গে যাবে। সরোবরে একটি ছোট নৌকা আছে। আমরা যখন ফিরব ততক্ষণে রান্না হ'য়ে যাবে।

লীলা সকলের কলরবের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। যদিবা কারো সঙ্কোচ ছিল পার্শ্ববর্তী লোকটির কোলাহলে তা ঢেকে গেল। লীলা চেটিকাদের হুকুম দেবার জন্য যাওয়ার সময়ে দরজার পাশে চাঁদকে দেখে তাকে স্পর্শ ক'রে নীরবে অভ্যর্থনা জানিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে আবার বলল,—এবার মহিলারা আমার পড়বার ঘরে যাও। সেখানে অলঙ্কারাদি খুলে স্নানের জন্যে প্রস্তুত হওগে। তোমাদের যে রূপ কল্পনা ক'রে কল্পিতা উর্বশীর সৃষ্টি, দেখো পরস্পরের সেই লাবণ্য দেখে হাসাহাসি কোর না। এই ব'লে সে নিজেও প্রস্তুত হ'তে চ'লে গেল।

মেয়েরা হাসাহাসি করল কিনা জানি না কারণ সে ঘরে এখন আমার প্রবেশ নিষেধ। পুরুষদের এখানে কিন্তু হাসাহাসি হ'ল। স্বর্ণখচিত চীনাংশুকের উত্তরীয় মোচন করতেই রোমশ জম্বুবান সদৃশ বক্ষপট আবিস্কৃত হ'ল, কঞ্চুকির হাতে বহুমূল্য মুকুট খুলে দেওয়াতে মস্তকের বিরাট টাকও তেমনি প্রকাশিত হ'য়ে পড়ল পুরুরবাদের। দেখা গেল কবি প্রয়োজনের সময়ে অশিক্ষিতোচিত প্রাকৃত ভাষায় গলাগলি ধ'রে কথা বলতেও অত্যন্ত পটু।

সরোবরের প্রশস্ত ঘাটে ব'সে নানা রকম আলাপ আলোচনা স্নানের আগে এবং পরেও

হ'ল। দু'একজন, যাদের বয়স কম, মেয়েদের ঘাটের দিকে দু'একবার সাঁতরে গেল না, জল ছিটিয়ে কপট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাল না, এমন নয়। সরোবরের মাঝামাঝি জায়গায় পুরুষ এবং মেয়েরা পাশাপাশি দু'একবার সাঁতরাল বৈকি।

সর্বাঙ্গ হিমের মতো এবং চোখগুলো আসবপ্রমত্তর মতো যখন রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠেছে তখন তারা প্রাসাদে ফিরে এল।

আহারে বসবার আগে কবিকে মালাচন্দনে ভূষিত করা হ'ল। উপস্থিত সকলেই কিছু কিছু উপহার দিল। ক্ষীরোদসম্ভবা তার নিজের কণ্ঠ থেকে সাতলহরা মুক্তার মালা খুলে সাগ্রহে কবির কণ্ঠে পরিয়ে দিল। অভিভূত কবি নির্বাক হ'য়ে গিয়েছিল। যখন সে কথা বলার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারল তখন বলল,—লীলা, আমার কাব্যের প্রথম দু'টি শ্লোক পরিবর্তন করতে চাই। স্বর্গের যে বর্ণনা দিয়েছি সেটা অনেকাংশে কষ্ট কল্পনা, কখনোবা ঐতিহ্যগত কবিপ্রসিদ্ধি। এই স্বর্গে বাস ক'রে কাব্যের বর্ণনায় ঐতিহ্যকে ত্যাগ না ক'রেও কিছু অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার সাধ হয়েছে।

লীলালতিকা এই প্রশংসাবাক্যে ব্রীড়াজড়িতার মতো মুখ নামাল।

দুপুরের শেষ দিকে আবার কাব্যালোচনা হ'ল। সন্ধ্যার কিছু আগে কবি প্রথমে তারপর একে দুয়ে অন্য অতিথিরা বিদায় নিল। তখন চাঁদ লীলার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। লীলাকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, কিন্তু তার হাসিটি তখনও সৌরভে ভরা। সে বলল, -নিশি শেষের হে চাঁদ, এবার তুমি শান্তিবর্ষণ করো।

চাঁদ বলল,—কবির মতো বলতে সাধ যায়, এই স্বর্গভূমি।

লীলা বলল,—তোমাকে তো এই স্বর্গভূমি ধ'রে রাখতে পারে না। এখন তুমি বলো কাল তোমার উৎসবের কি কি ব্যবস্থা হয়েছে।

চাঁদ ভবিষ্যৎ ঘটনার যথাসম্ভব বাস্তব বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করল। তারপর বলল, —আমি ভাবছি উৎসব শেষে আমার আর ফেরবার কি দরকার?

—তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

চাঁদ কিছুকাল নিরব থেকে বলল,—আমাকে বিদায় দিন।

লীলার বাড়ী থেকে চ'লে আসার আগে চাঁদ চারুদত্তর সঙ্গে দেখা করতে গেল। চারুদত্ত যেন আরও হিংস্র হ'য়ে উঠেছে। তার কথায় অভূতপূর্বের সমাবেশ আরও বেড়েছে। অত্যুগ্র কোন শল্যচিকিৎসক যেমন আগ্রহ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র কিম্বা রাজকীয় বধ্যভূমি থেকে মৃতদেহ চুরি করার চেষ্টা করে, তেমনি একটা উদগ্র স্পৃহা দেখা গেল চারুদত্তর মানুষের মনকে আত্মসাৎ করার।

আলাপের মাঝখানে চারুদত্ত বলল,—কৌতুকের কথা, লোকে বলে আমি হৃদয়হীন, আমি নাকি মস্তিষ্কসর্বস্ব। কিন্তু আপনি শুনলে অবাক হ'য়ে যাবেন ভৈরবী চ'লে যাবে ব'লে আমার অন্তর শূন্য হ'য়ে যাচ্ছে। অথচ না পারছি অন্তরের সেই ব্যথা তুলির ডগায় ফুটিয়ে তুলতে, না পারছি সে ব্যথায় নিশ্চেষ্ট হয়ে ডুবে থাকতে।

খবরটা নতুন। চাঁদ বিস্ময় প্রকাশ করল। লীলা প্রশ্ন করল।

চারুদত্ত বলল,—যাওয়াই ভালো। কোথাও চ'লে যাক। আমার আজকাল মনে হয় আমরা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছি এবং এ দুর্বলতা আমাদের পরস্পরের অন্তর্লোক একরকম সান্ধ্য অস্পষ্টতায় ঢেকে দিচ্ছে।

চীনে মাটির পানপাত্র আর য়ায়নীয় বালকভৃত্য এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা চাঁদ নিজে

থেকেই তুলল। লীলার একখানা হাত নিজের দু'হাতে তুলে নিয়ে সে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিদায়-চুম্বন দিল।

চাঁদের জাহাজ পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত। জাহাজের উপরে নৌসৈন্যরা এবং নাবিকরা উৎসবের বেশ পড়েছে। জাহাজের ধবধবে পালগুলিতে মৃদু মৃদু বাতাস লাগছে। সব চাইতে উঁচু একটি পালে বাতাস পরিপূর্ণভাবে লেগেছে। সেটা রাজহংসের বুকের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না এমন উজ্জ্বল সোনার রঙে আঁকা পদ্মপাতায় ঢাকা একটি কলস সেই পালের গায়ে। নোঙগরের কাছি ভিজে বালি এবং জলে লতার মতো আলগা হ'য়ে প'ড়ে আছে। এখন ভাঁটার সময় বটে জোয়ার আসবারও খুব দেরী নেই। চাঁদের জাহাজ তীর থেকে প্রায় একশ' গজ দূরে। তীরের উপরে সারিবন্ধ জনতা। জনতা উৎসবের বেশে সজ্জিত। ঢাক ঢোল কাঁসির শব্দের ফাঁকে ফাঁকে লোকসংগীত বহুকণ্ঠে একত্রিত হ'য়ে ভেসে আসছে। কান পেতে শুনলে বোঝা যায় গানগুলি হয় এই বিশেষ উৎসবের জন্য লিখিত কিম্বা পুরানো কোন গানকে নতুন ক'রে কালোপযোগী করা হয়েছে। অবশেষে কতগুলো ছোট ছোট নৌকায় ক'রে তাঁতীরা এল। নৌকাগুলিও ফুলে পাতায় সজ্জিত। প্রত্যেকটি নৌকার গলুইতে সপল্লব ঘট। প্রত্যেকটি নৌকায় স্ত্রীলোকদের হাতে বরণডালা পুষ্পপত্রাদি আছে। প্রত্যেক নৌকায় চারজন ক'রে তাঁতী। তাদের নানা বয়স। কিন্তু কেউই অতিবৃদ্ধ নয়, কিশোরও নয়। এরকম চারখানা নৌকায় ষোলজন তাঁতী ও সমসংখ্যক স্ত্রীলোক এসেছে। এ ছাড়াও অন্য অনেক নৌকা ভ'রে ফুর্তিবাজ লোক এসেছে। সে পূজার বিধান কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না—দেখা গেল তাঁতীদের পুরোহিত অন্যান্য পূজার বিভিন্ন অঙ্গের অনুকরণে সেই পূজার রূপায়ণে কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছে। সহজ ও সরল ধর্মপ্রাণ জাতী পূজা করতে পেরে যত আনন্দিত, আনন্দ পাওয়ার নতুন পথ করতে পেরে স্বভাবের উদারতর বৃত্তিগুলি ততোই প্রকাশিত করেছে। পূজা উপলক্ষ্য ক'রে দান ধ্যানও চ'লছে। চাঁদের জাহাজ থেকে কাঠের সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হ'ল জলের মধ্যে। সেই সিঁড়ির গায়ে নৌকাগুলো ভিড়িয়ে এক এক ক'রে তাঁতীরা সবাই জাহাজে উঠতে লাগল। চারখানা নৌকার তাঁতীরা এবং তাদের সঙ্গিনীরা জাহাজে উঠে এলে সিঁড়ি তুলে নেওয়া হ'ল। তীরের ভিড়ও এগিয়ে এসে ভিজে বালি ও জোয়ারের রেখা পার হ'য়ে ভাঁটার জলের কিনারায় এক হাঁটু জলে দাঁড়াল। পড়ন্ত সূর্যের আলোয়, লোকের ভিড়ে, জলের উপরে দেখা কম্পিত প্রতিবিম্ব থেকে মনে হচ্ছিল এ যেন নতুন কোন বিজয়ার উৎসব। জাহাজে উৎসবের বাজনা বাজাবার লোক না থাকলেও চাঁদের হুকুমে দাঁড়িমাঝিরা নিজেদের মধ্যে অবসর বিনোদনের জন্য যে বাঁশি আর ঢোল বাজায় সেটারই একটা মার্জিত সংস্করণ প্রচার করতে লাগল।

চাঁদের জাহাজের পেছনে সূর্য ডুবে গেল। সে জাহাজের প্রধান মাস্তুলের স্বর্ণকলস আঁকা পালের পাশ দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিল। তখন পূর্ণিমার জোয়ার পরিপূর্ণ। জলের জোর বেড়েছে, ডাক উঠেছে, ফেনা ভেসে আসছে। জাহাজের নোঙগর উঠি উঠি করছে। নাবিক বসেছে দড়ি ধ'রে জাহাজের উপরে। জাহাজ ঘুরবে ফিরবে। স্বভাবতই জোয়ারের চাপে তীরমুখী একটা গতি থাকবে তার। নৌকাগুলি স'রে স'রে গেল। সকলে লক্ষ্য না করলেও দু'একজন লক্ষ্য করল, একটি আলোহীন নৌকা সেই চাঁদের আলোয় আন্দোলিত জলের বুকের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেন এই জোয়ারের মুখেও ভাঁটার টানের সাহায্য পাচ্ছে।

নাবিকদের নির্দেশ দেওয়া ছিল। তারা জাহাজের উপর থেকে সেই আলোকহীন

নৌকার রুপো বাঁধানো দাঁড় এবং একক দাঁড়ী দেখে চিনতে পেরে দড়ির মই নামিয়ে দিল। সেই দড়ির মই বেয়ে প্রথমে ভৈরবী পরে চাঁদ জাহাজে উঠল। (লক্ষ্য করার বিষয় ঝোলানো দোদুল্যমান মই বেয়ে উঠতে অবগুণ্ঠন সত্বেও ভৈরবীর কষ্ট হ'ল না। যেন সে চাঁদের দেশেরই কোন বণিককন্যা এবং বণিকবধূ।) চাঁদ নৌকা মইএর সঙ্গে বেঁধে দিয়ে উঠেছিল। মইএর টানে টানে ছোট নৌকাটিও জাহাজে উঠে এল। চাঁদ শিঙা বাজাল, হেঁহো ব'লে নোঙ্গর টেনে তোলা হ'ল। নাবিকরা কাছি টেনে ধ'রে পালকে হাওয়া খাওয়ালো। জোয়ারের জলের উপর দিয়ে চাঁদের জাহাজ অগ্রসর হ'ল। জাহাজ থেকে তাঁতীদের স্ত্রীলোকরা উলুধ্বনি করল, তীর থেকে মেয়েরা সে ধ্বনি শুনতে না পেলেও একটু পরে জাহাজ ছেড়েছে বুঝতে পেরে উলু দিয়ে উঠল।

উৎসব অবসন্ন হয়। তাঁতীদের দেহে ক্লান্তি এল। পালে তখন হাওয়া লেগেছে। আকাশের জ্যোৎস্না সাগরের জলে প্রতিবিম্বিত। জাহাজের মুখের দু'পাশে জল বিভক্ত হ'য়ে ভেঙে পড়ছে। জ্যোৎস্নায় সে দৃশ্যকে অলীক স্বপ্নের মতো সুন্দর বোধ হচ্ছে। আকাশে চাঁদ ক্লান্ত হ'য়ে হেলে পড়েছে, বরণডালায় প্রদীপগুলো নিবু নিবু। মঙ্গলসাধিকাদের চোখ জড়িয়ে আসছে। যারা আগ্রহের আতিশয্যে উপহারের জন্য আনা বস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়িয়েছিল তারা সেই বস্ত্র পুষ্পপাত্রর উপরে রেখেছে। চাপা গলায় তারা আলাপ করছে এবং সমুদ্রের জলের দিকে সেই বিরাট সামুদ্রিক প্রাণীকে প্রথম আবির্ভাবে দেখবার আশায় চেয়ে আছে। তাঁতীরা লক্ষ্য ক'রে দেখল তাদের চারিদিকে চাঁদের সৈন্যরা একসময়ে খোলা তরবারি হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক ছিল যারা তরবারি এই প্রথম দেখছে। তারা ফিস্ ফিস্ ক'রে অন্যদের বোঝাল আজ তারা রাজকীয় সম্মান পাচ্ছে। কিন্তু ক্লান্তি কারো কারো হতাশায় পরিণত হ'ল। চাঁদের যে কর্মচারী সামুদ্রিক প্রাণীকে দেখবার ভঙ্গিতে জাহাজের মুখের উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল তাঁতীদের দু'একজন তাকে মৃদু পরিহাস করতে লাগল।

পূব আকাশে যখন সূর্য উঠতে লাগল সেই রক্তাভ দিকবলয়কে লক্ষ্য ক'রে তপ্তস্বর্ণের মত জল দেখে তাঁতীদের মেয়েরা যখন আবার নতুন আশায় ঐ ঐ বলতে সুরু করেছে তখন তাঁতীদের দলপতি আবিষ্কার করল এ শুধু আশার পেছনে ব্যর্থ ছুটোছুটি নয় তার চাইতেও গভীর দুঃখের কিছু। সে চিৎকার ক'রে উঠল,—আমরা জানতে চাই এ তোমাদের কি খেলা। আমরা তোমাদের আর বিশ্বাস করি না। তার চিৎকারে অন্য তাঁতীরা কেঁপে উঠল, মেয়েরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। চাঁদ ছুটে এল তার কক্ষ থেকে, সৈন্যরা সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু দলপতিরা যেমন শেষ মুহূর্তে ভুল বুঝতে পেরে কিছু একটা করার জন্য উন্মাদ হ'য়ে ওঠে তেমনি এক আকস্মিক উন্মত্ততা থেকে সেই প্রৌঢ় তাঁতী চাঁদের সৈন্যরা রাখ রাখ ক'রে ছুটে এসে ধরার আগে সমুদ্রের জলে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর অনেক কিছুই দ্রুত ঘটতে লাগল। চাঁদের সৈন্যরা আর দাঁড়িয়ে রইল না। উন্মুক্ত তরবারির অগ্রভাগ তাঁতীদের দিকে উদ্যত ক'রে তারা ক্রমশ ঘন সন্নিবিষ্ট হ'য়ে দাঁড়াল। তাঁতীরা এবং স্ত্রীলোকরা গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে বেদনায় হতাশায় দিশেহারা হ'য়ে গেল। চাঁদ তখন বলল,—এদের জাহাজের খোলে নিয়ে যাও। তাঁতীদের এবং তাদের স্ত্রীলোকদের টানাটানি ক'রে তরবারির পেছন দিক দিয়ে আঘাত ক'রে সৈন্যরা তাদের জাহাজের খোলে বন্ধ ক'রে রেখে দিল। তাদের বরণডালা, পুষ্পপাত্র সৈন্যদের পায়ের তলায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেগুলিকে জলে ফেলে দেওয়া হ'ল। প্রবল বাণিজ্য বায়ুতে

সবগুলো পাল ভ'রে নিয়ে চাঁদের জাহাজ যেন জলের বুক ছুঁয়ে উড়ে চলল।

ভৈরবী তার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিল। অবগুণ্ঠন সত্ত্বেও রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি তার ভঙ্গিতে সপ্রকাশ। চাঁদ তাকে বিশ্রাম করার কথা বলতে এসেছিল, ভৈরবী প্রথম কথা বলল,—কে কাঁদে, চাঁদ?

—জলের শব্দ।

ভৈরবী প্রায় বলে ফেলেছিল : চাঁদ আমি বণিককন্যা, এর আগেও সমুদ্রযাত্রা করেছি কিন্তু পুরুষদের হাহাকার শব্দের সঙ্গে মিশে নারীর করুণ বিলাপে যখন চোখে জল আসছে তখন তাকে জলের শব্দ বলি কি ক'রে।

ভৈরবী কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইল।

চাঁদ বলল, এবার তুমি কিছুকাল বিশ্রাম কর। ভোর হ'চ্ছে।

ভৈরবী বলল,—আমরা কি এখন কোন্নগরে ফিরছি?

চাঁদ বলল, তোমার কাছে গোপন ক'রে লাভ নেই কারণ দু'এক দণ্ডেই জানবে আমরা সূর্যের গোলক লক্ষ্য ক'রে পূর্ব দিকে মহাসমুদ্রের উদ্দেশ্যে জাহাজের গতি নির্দিষ্ট করেছি।

ভৈরবী থর থর ক'রে কেঁপে উঠল।

—কিছু বললে? তা হ'লে তুমি বিশ্রাম করো।

চাঁদের ভাষায় পরিবর্তন হয়েছে, সে ভৈরবীকে আর সম্মানসূচক আপনি বলছে না। সে চ'লে গেলে ভৈরবী কক্ষের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে কাঁদতে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিম্বা হাহাকার ক'রে সে কাঁদল না। সে অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে বসেছে। তার ইন্দিবর তুল্য চোখ দুটি থেকে অজস্রধারায় জল পড়তে লাগল।

দেখা গেল ভৈরবী শক্ত মেয়ে। পর্দার ঘেরের মধ্যে জালা ভরা জল। জল তুলে গায়ে ঢালতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল জল সুরভিত। স্নান ক'রে তার বন্দীঘরে ফিরে এসে দেখল চটের আসনের পরিবর্তে ঘরজোড়া বহুমূল্য গালিচা পাতা, চারিদিকের দেয়াল সাটিন কাপড়ে ঝলমল করছে। গালিচার একপ্রান্তে কেশসংস্কারের ধূপদান। তার পাশে দর্পণ ও চিরুণী। শুধু লোধ্ররেণু কিম্বা অনাকোনো অঙ্গরাগ এবং অলঙ্কার নেই। সাধারণ কোনো ভৈরবীর মনেও এই উপাচারগুলি ইঙ্গিত বহুল হ'য়ে উঠতে পারত যেমন এ ভৈরবীরও হ'ল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভৈরবী আতঙ্কে বিবর্ণ হ'য়ে গেল না। সে ধূপাধার স্পর্শ করল না, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে জটাপড়া চুলগুলোকে অনেকক্ষণ ধ'রে সংস্কার করল। অনাহারে হীনবল হওয়ার পক্ষপাতী সে নয়, যেমন তাঁতীদের স্ত্রীলোকেরা করছে জাহাজের খোলে। সে বরং চাঁদের সঙ্গে এই সর্ত ক'রে নিল যে তার কক্ষের দিকে চাঁদ ছাড়া আর কেউ আসতে পারবে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর তার ঘরের পাশে জাহাজের কাঠের ঘের ধ'রে সে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। চাঁদ এসে দাঁড়াতেই সে শিউরে উঠল না, চাঁদের হাত তার হাতের পাশে থাকলেও হাত সরিয়ে নিল না। কিন্তু প্রথম যে কথা সে বলল সেটি অগ্নিময়। সে বলল, —চাঁদ, তাঁতীদের নারীরা কি তোমার নাবিকদের ভোগ্যা হয়েছে।

—না-না। তা কেন? আমি দেখে আসছি ব'লে চাঁদ চ'লে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল,—তুমি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু সেটা অমূলক হ'লেও সাবধান ক'রে দিয়ে ভালো করেছ।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভৈরবী বলল,—তাঁতীদের তুমি ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী

করতে নিয়ে যাচ্ছ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি কি এই নারীগুলোকে এদের থেকে পৃথক করে বিক্রী করবে।

চাঁদ কথাটা ভেবে দেখল, পরে বলল,—তুমি নিজে থেকে কথাটা উত্থাপন করে ভালো করেছ। এরা ক্রীতদাসের মতো হস্তান্তরিত হবে কিন্তু ঠিক বিক্রীত হবে না। এদের নারীরা যদি এদেরই বিবাহিত হয় তবে তো বটেই, কিম্বা এরা যদি পরস্পরে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'তে চায় তাহ'লেও নারীদের অন্যত্র বিক্রয় করার ইচ্ছা আমার নেই।

—আর আমার সম্বন্ধে তোমার কি ইচ্ছা?

আলোচনা বন্ধ হ'য়ে গেল। তারার আলোয় জাহাজ চলছে। মাঝ সমুদ্রের তারাভরা সেই গোলাকার আকাশে যেন একটি নীড় থেকে উত্তাপ বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে। মৃদুমন্দ বায়ু যেন স্পর্শক্ষম গতিময় তরল অস্পষ্টতা। এই প্রথম এমন হ'ল কারণ ভৈরবী আজ চুল বাঁধেনি, পিঠভরা চুল তার সর্বাঙ্গে মৃদু স্রোতস্বান একটা ক্ষুদ্র প্রবাহের মতো উড়ে উড়ে পড়ছে।

পরে নিজের প্রশ্নকে ইঙ্গিত করেই ভৈরবী আবার বলল, —যাক সে কথা। তোমার এই অভিযানের মন্দ দিকগুলো বুঝতে পেরেছ? কোন্নগরে জাহাজ ভিড়িয়ে আত্মপরিচয় দেওয়া চলবে না। আজ সারাদিন তাঁতীদের পাড়ায় পাড়ায় শোক ও প্রতিবিধিৎসা হাহাকারে আত্মপ্রকাশ করছে কিন্তু তাদের পাড়ার বাইরে ব্যাপারটা তোমার প্রতি ঘৃণার রূপ নিচ্ছে।

—সেটা স্বাভাবিক। যদি কোনোদিন আবার কোন্নগরে আসতে হয় তার আগে শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

—তোমার সেই লীলালতিকাকে পত্র দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এবং এইসব তাঁতীরা যাদের দাদন নিয়েছিল সেই সব মহাজনকে সুদসমেত দাদনের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

চাঁদ বলল,—আমিও বোধ হয় চিন্তা করতে বসলে এই ধরনের কিছু স্থির করতাম।

আবার নীরব হ'ল দুজনে। আকাশে চাঁদ উঠবে উঠবে এমন মনে হ'ল।

চাঁদ বলল,—আচ্ছা ভৈরবী তোমার পিতৃবংশে তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার মতো কেউ আছে? তোমার সঙ্গে আজ প্রায় আটদশদিন হ'ল পরিচিত হয়েছি কিন্তু—

ভৈরবী বলল,—আটদশদিনে যা হয় নি তা কি এক সন্ধ্যাতেই হবে? আপনি এখন আহারাদি করুন গে।

—তার এখন তাড়াতাড়ি নেই। একটা কথা শোন। জাহাজ আমাদের গন্তব্যে পেঁছিতে আরও দুমাস সময় নেবে। তার আগেই তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছানো দরকার। তা ছাড়া আমি চারুদত্ত নই।

ভৈরবী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

—হাসলে?

ভৈরবী খানিকটা স্নেহমেশানো সুরে বলল,—দুমাসে আরও পূর্ণিমা আসবে। অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রশস্ততর ক্ষণও আসতে পারে।

এক সন্ধ্যায় চাঁদ ভৈরবীর কাছে এসে বসল। জাহাজ দিক পরিবর্তন ক'রে কূলের সমান্তরাল পথ ধ'রে চলছে। কাণ্ডারীকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য দিনের বেলায় তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। রাত্রিতে যখন তারার মানচিত্র দেখে গভীরতর সমুদ্র বেয়ে জাহাজ চলতে সুরু করে তখন চাঁদের অবসর। নির্দিষ্ট পথে দ্রুতগতিতে এগোনোর জন্য দিনের বেলায়

কূলের কাছে কাছে চলতে হয়, আর রাত্রিতে নিরাপত্তার জন্য গভীরতর সমুদ্র দিয়ে তারার আলোয় জাহাজ মন্থরগতিতে চলে।

চাঁদ বলল,—আজ চারদিন হ'য়ে গেল। তাঁতীদের মেয়েরা কিছু মুখে দেয় নি। কি করা যায় বলো তো?

ভৈরবী বলল,—তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলে।

—ফল হয় নি। না হওয়ারই কথা। আমি ভেবেছিলাম ওরা পুরুষদের সাহচর্যে হয়তো তাদের উপরে নির্ভর ক'রেই থাকতে পারবে। কিন্তু ওদের দু'একজন স্বামী এবং সন্তান রেখে এসেছে। আর কেউবা অবিবাহিতা।

ভৈরবী বলল,—আহা।

—কিন্তু আহা বললেই তো সব বলা হ'ল না। ওরা অনাহারে প্রাণত্যাগ করে তা আমি চাই না। আমি বলেছি ওদের কোথাও বাজারে হাটে বিক্রী করা হবে না। রাজাকে উপহার দেওয়া হবে এবং সেখানে ওরা সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। তার চাইতেও বড় কথা পাঁচ সাত বৎসর পরে হয়তো দেশে ফিরে আসারও সুযোগ পাবে। সে দেশে তাঁতী নেই ব'লেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভৈরবী বলল,—ওদের পুরুষদের ভয় দেখাও। মেয়েরা না খেলে তোমার নাবিকরা জোর ক'রে তাদের খাওয়াবে বলো।

চাঁদ ভৈরবীর কাছে বিদায় নিতে নিতে ভাবল,—প্রয়োজন হ'লে ভৈরবী চিকিৎসকের মতো নির্মমও হ'তে পারে। সে যে নিজেকে বণিককন্যা ব'লে ঘোষণা করেছে তারও যুক্তি যেন আছে।

ভৈরবী তার ঘরের পাশে সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে ব'সে ছিল। তার অবগুণ্ঠনে আজ যেন তেমন বাড়াবাড়ি নেই। একটু হেলে বাঁ হাতের উপরে কিছুটা দেহভার ঢেলে দিয়ে সে ব'সে আছে। তার মুক্ত ডান হাতখানা চোখে পড়ছে আজ। সে হাতে দু'এক খানি অলংকার আছে। অলঙ্কার বোঝা যায় কিন্তু তার বর্ণ বোঝা যায় না।

ভৈরবী নিচু গলায় হেসে তার অবগুণ্ঠন মোচন করল। চাঁদ লক্ষ্য করল অন্ধকারে তার বসন ও স্বল্প কয়েকটি আভরণ একটি বর্ণহীন ঔজ্জ্বল্যে ঝক্‌মক্‌ করছে। অতি মূল্যবান চীনাংশুক যেমন অল্প আলোতেও কার্পাস বস্ত্র থেকে নিজের তন্তুর গঠনের পার্থক্য ঘোষণা করে এও যেন তেমনি। ভৈরবী অবগুণ্ঠন মোচন করল, শুধু একটি অস্বচ্ছ ওড়না তার কাঁধ ও মাথার উপর দিয়ে ঘুরে মুখকে আড়াল ক'রে রাখল। চাঁদ লক্ষ্য করল একটি হার মুকুটের মতো ক'রে পরা সেই ওড়নাখানাকে স্বস্থানে ধ'রে রেখেছে। এবং এ হার সেই রেখেছিল ভৈরবীর কক্ষে।

ভৈরবী বলল,—চাঁদ, আমার মত নিস্বকে প্রলুব্ধ করার জন্যে চারিদিকে মূল্যবান বস্ত্রাভরণ রেখে ভালো করনি।

—তুমি কি আমার দেশে যাবে?

—সেখানে কি তুমি আমাকে কোন বৃদ্ধ বণিকের কাছে বিক্রী করবে, চাঁদ?

চাঁদ কিছু বলবার জন্য যেন উপযুক্ত ভাষা খুঁজতে লাগল। সেই অবসরে ভৈরবী বলল,—চাঁদ, তুমি কি শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কোনো দুঃখের কাহিনী শুনেছিলে তোমার এক সম্পর্কীয়া শ্যালিকার সম্বন্ধে।

—হ্যাঁ, শুনেছিলাম। সে কথা কেন বলছ?

—যদি বলি আমি তোমার সেই শ্যালিকা।

চাঁদ বলল,—যদি একথা তোমার সত্য হয়, ভৈরবী, আমি বুঝব আমি পুণ্যবান। ভগবান আমাকে আশীর্বাদ করছেন। কিন্তু তুমি কি আমাকে প্রথম থেকেই চিনতে পেরেছিলে?

ভৈরবী খিলখিল ক'রে হেসে বলল,—তোমার মাথা ঘুরে গেছে নতুবা কেউ একজন নিজেকে শ্যালিকা ব'লে পরিচিত করার চেষ্টা করতেই তার কথা মেনে নিতে না, অন্তত দু'একটা পরীক্ষা করতে।

চাঁদ বলল,—আমার সেই উচ্চাভিলাষী শ্যালিকার কথা তাদের পরিবারের বাইরে কারো জানার কথা নয়। তার পক্ষে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় থাকা সম্ভব। এই কারণেই তোমার কথায় বিশ্বাস করতে আমার দ্বিধা হয়নি। তুমি যদি আমার আত্মীয়া নাও হও তা হ'লেও তুমি তার বয়স্যা কেউ।

ভৈরবী বলল,—চাঁদ, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি বিপত্নীক কিন্তু তুমি কি নিসন্তানও বটে?

—হ্যাঁ। সনকা সন্তান রেখে যায় নি।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভৈরবী বলল,—এই পরিচয়টুকু দেওয়ার ছিল। এরপর, তুমি স্থির হ'য়ে শোন চাঁদ, আমার পক্ষে সমুদ্রের অতল শীতলতাই বাঞ্ছনীয়।

—সেকি! তুমি যদি আমার সেই শ্যালিকাই হও তাহ'লে বলতে পারি আমার উচিত তোমাকে সমতটে নিয়ে যাওয়া। তাতে আমার শ্বশুর শাশুড়ী সন্তুষ্ট হবেন। তোমার বাপ মাও, যদি জীবিত থাকেন, শেষ জীবনে শান্তি পাবেন। তুমি তাঁদের একমাত্র সন্তান।

—তারপর কোন্নগরের লীলালতিকা কিম্বা ক্ষীরোদসম্ভবার মতো—

—না, না। চাঁদ আবার চিন্তা করল। না, তা তোমাকে করতে হবে না। চন্দ্রশেখর বসুর বিরাট প্রাসাদের একাংশে তুমি থাকতে পারবে না এ ভাবছ কেন?

—কিন্তু এমন সমাদরে গ্রহণ করার পক্ষে আমার কতটুকু পরিচয় পেয়েছ। আমি আযৌবন বৌদ্ধ পরিব্রজ ও তন্ত্রসাধনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

—আমার বিপদসংকুল জীবনের পক্ষে তেমনি একটি দৃঢ় মনই দরকার হ'তে পারে।

নিজের পরিচয় দেওয়ার পর ভৈরবী যেন আরও সংকুচিত হ'য়ে গিয়েছে। তার সেই মোটা কাপড়ের অবগুণ্ঠন আবার তার সর্বাঙ্গ ঘিরে নেমেছে। এর পরে আবার এক সময়ে যখন চাঁদ ভৈরবীর সঙ্গে দেখা করতে এল তখন ভৈরবী বলল,—তা হয় না চাঁদ। আমি স্বপ্ন দেখেছি তোমার সনকা হয়তো বেঁচে আছে।

—সনকা? সনকা বেঁচে আছে?

—অতো উতলা হয়ো না। এ সংবাদটাই যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হওয়ার যথেষ্ট অন্তরায় আছে।

—তুমি যদি তার সংবাদ আনতে পার তবে অন্তরায়গুলোও দূর করা সম্ভব। সম্ভব নয়?

ভৈরবীর হাসি তার অবগুণ্ঠনের বাইরে প্রকাশিত হ'ল না, কথায় জড়িয়ে রইল। সে বলল,—সনকা কি তোমার এত প্রিয়? তুমি কি জানো না এক নারীর সম্মুখে অন্য কোনো নারী সম্বন্ধে ব্যাকুলতা প্রকাশ করা অদাক্ষিণ্য? তা ছাড়া, ভৈরবীর স্বর গাঢ় হ'ল, ভাগ্য যখন তোমাদের পৃথক করেছে সহজে ও বিনা মূল্যে আবার সে তোমাদের কি একত্র করবে?

চাঁদ কিছু বলল না। সে নিজের আকুলতা প্রকাশ ক'রে লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল। যে ঝড়ে তার ছ'খানা বাণিজ্য পোত নাবিকদের নিয়ে তলিয়ে গেছে, ফুলের চাইতেও কোমল স্বর্ণকায়া সেই ঝড়কে তুচ্ছ ক'রে বেঁচে আছে এ কল্পনা করা আর আকাশকুসুম দেখা একই জিনিস। তা হ'লে তো সম্মুখের এই ভৈরবীকে অসাধারণ ঐশীশক্তির অধিকারিণী ব'লে মানতে হয়। কিন্তু ভৈরবী কি এতো হৃদয়হীনা যে সে সনকাকে নিয়ে পরিহাস করছে?

ভৈরবী বলল,--সনকার সংবাদ পরিহাস নয় চাঁদ। দীর্ঘদিন একা একা বিদেশে তার রূপ যৌবনকে সে কি সব সময়ে আড়াল ক'রে রাখতে পেরেছে? তুমি ভেবে দেখো ধর্মশীল রামচন্দ্রও সীতাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি।

- কিন্তু সীতা জীবিতা ছিলেন। তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর ভৈরবী, সনকা বেঁচে আছে?

বিশ্বাস করার জোর পাচ্ছি না। জানো চাঁদ, আমার যেটুকু শক্তি তাতে এমন দূরের ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে হয়তো তার সবটুকুই ফুরিয়ে যাবে। তা ছাড়াও--

- বলো, কি তা ছাড়া--

--তা ছাড়া চাঁদ, তার সংবাদ দেয়ার পর তুমি যদি তাকে না পাও আমি তোমার মনের দিক দিয়ে কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হ'য়ে পড়ব না? ভৈরবী যেন অতিবেদনায় হাসল।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার তাদের দেখা হ'ল। ভৈরবীর পায়ে মঞ্জীর ধ্বনিত হ'ল। সে চাঁদের অনতিদূরে এসে দাঁড়াল। আগেকার আর এক সন্ধ্যার মতো শুধুমাত্র ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা। তার বলয় ও অঙ্গদ ঝঙ্কারিত মসৃণ বাহু দু'টি আজ স্পষ্ট।

ভৈরবী বলল,--চাঁদ, তোমাকে সনকার কথা ব'লে আমি ভুল করেছি।

--আমারও তাই ধারণা।

--আমার বিশ্বাস ভাগ্যকে জয় করার চেষ্টা ক'রে তাকে ক্ষিপ্ত করাই হবে।

--শুধু কি ভাগ্যই?

--নতুবা চাঁদ, আমি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। অবশ্য সফল হব এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। কিন্তু যদি আমার চেষ্টা ব্যর্থও হয়, তা'হলে তুমি আমার অনুসন্ধান করবে না, এই কথা দিতে পার?

চাঁদ ভাবল।

ভৈরবী বলল,--ঠিক যেন তোমাকে বলছি আমার আর সনকার মধ্যে বেছে নিতে হবে, তাই নয়?

চাঁদ বলল,--তোমার কি অমঙ্গল হবে তাতে?

এবার ভৈরবী হাসল। সে বলল,--তুমি সনকাকে চাও!

--ভৈরবী, সনকা তোমার মতো মোহময়ী নয় কিন্তু সে আমার স্ত্রী। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টায় তোমার নিজের অমঙ্গল ডেকে এনো না।

সে রাত্রিতে চাঁদ কান্ডারীকে নির্দেশ দিয়ে বিশ্রাম করতে যাবে এমন সময় দিকদর্শনে নিযুক্ত এক নাবিক মাস্তুলের মঞ্চ থেকে চিৎকার ক'রে বলল,--কে যেন জলে প'ড়ে গেল। শব্দ শুনে তার ইঙ্গিত মতো জায়গায় গিয়ে চাঁদ সেই অস্পষ্ট আলোতে দেখল যেন ভৈরবীর ওড়না এবং আজকের সন্ধ্যায় সে যে বহুমূল্য বস্ত্র পড়েছিল সেটা তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এই রাত্রিতে মধ্য সমুদ্রের গভীরতা থেকে কাউকে উদ্ধার করার জন্য অন্য কারো প্রাণ বিপন্ন

করা উচিত কিনা এতখানি চিন্তা করার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। চোখের সম্মুখে একটি মৃত্যু ঘটে গেল। বেদনা ও নিরুপায় আকুলতায় চাঁদের মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে ভৈরবী কথাটা উচ্চারিত হ'ল।

দর্পণের সম্মুখে ব'সে মুখের রোমশ তিলটিকে অনেক যত্নে ধুয়ে ফেলে ভৈরবী সনকায় রূপান্তরিত হ'তে হ'তে চারুদত্তর কথাই চিন্তা করল। চারুদত্ত তাকে অবগুণ্ঠনবতী হওয়ার উপদেশ দেওয়ার আগে তার রূপের প্রাবল্যকে ঢাকবার জন্য তিলটি আঁকবার ব্যবস্থা শিখিয়েছিল। সে ভাবল ভাগ্যকে কি সত্যি জয় করা যায়। আকস্মিক যে সৌভাগ্যের সূচনায় চাঁদকে সে ফিরে পেল তা' কি ভাগ্যের একটি দারুণ প্রতারণা নয়? প্রিয় মিলনের প্রতীক্ষায় যেমন, ভাগ্যের নির্মমতার আশঙ্কাতেও তেমনি সে কেঁপে কেঁপে উঠল। বাকিটুকু চাঁদ।

চার

দূরে সপ্ততল পাহাড় চোখে পড়ছে। চম্পকবতী ঘাটে চাঁদের জাহাজ ভিড়ল। তখন সূর্যোদয় হচ্ছে। সপ্ততল থেকে যে ছোট নদী এসে সমতট বন্দরের কিছু দক্ষিণে সাগরে পড়েছে সে নদীমুখ অত্যন্ত বিস্তৃত বটে কিন্তু বড় জাহাজ চলার মতো গভীর নয়। নদীমুখেই জাহাজ ভিড়েছে। চাঁদের জাহাজের চারিদিকে নদী কিম্বা খাড়ির জল সকালের বাতাসে তরঙ্গিত। সেই জলে সূর্যের আলো পড়ে লক্ষ কোটি চাঁপা ফুলের সৃষ্টি করেছে। সমস্ত জলই যেন চাঁপাফুলে ঢাকা। এই দৃশ্য এ অঞ্চলে বিখ্যাত। এ জন্যই নদীর নাম চম্পকবতী। যে নাম দিয়েছিল সে কতদিন আগে পৃথিবীতে ছিল তা জানা যায় না কিন্তু তার চোখে এই খাড়ি আবিষ্কারের প্রথম প্রত্যূষে যেমন চম্পকাস্তৃত ব'লে অনুভূত হয়েছিল এখনও তেমনি হয়। হাজার বছর পরেও এমনি হবে।

যারা অন্য আর একটি জাহাজ থেকে মাল নামানোর কাজ করছিল এবং যে বেকারের দল ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল কিম্বা কোন উল্টিয়ে রাখা নৌকার উপরে ব'সে সকালের দৃশ্য উপভোগ করছিল তারা চাঁদের মাস্তুলের স্বর্ণকলস দেখতে পেল।

তীরের কিছুদূরে নিজের বাড়ীর দ্বিতলে ব'সে প্রাতরাশ করতে করতে বীরচন্দ্র সেন লক্ষ্য করল একটা বড় জাহাজ আসছে। নিজ সমতট বন্দরের দিকে ব'লেই তার ধারণা হয়েছিল। প্রাতরাশ শেষ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য ক'রে সে বুঝতে পারল জাহাজখানা চম্পকবতীর ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। মাস্তুলের স্বর্ণকলস অস্পষ্টভাবে নজরে পড়ল তার। চম্পকবতীর ঘাটে একটি উঁচু মঞ্চ ছিল বীরচন্দ্রর। একজন কর্মচারীকে সে বাড়ীর ছাদে পতাকা নিয়ে যেতে হুকুম করল। অন্য একজন কর্মচারীকে তার গোশালায় পাঠিয়ে দিল। চম্পকবতীর ঘাটমঞ্চে বীরচন্দ্রর কর্মচারী জাহাজ আসতে দেখেই পতাকা হাতে ক'রে দাঁড়িয়েছিল। পতাকা চালনায় সে বলল,—স্বর্ণকলস, উপরে পদ্মপত্র।

এদিকে প্রাসাদের উপর থেকে পতাকা চালনায় প্রশ্ন উঠল,—ক'খানা?

—এক।

বীরচন্দ্র খবর পেয়ে বলল,—পদ্মপত্র ঢাকা স্বর্ণকলস? পদ্মপত্র ঢাকা? আরে, চাঁদবেনে নাকি? তার কর্মচারী বিস্মিত হ'ল। এমনকি তাঁর স্ত্রী—যে ঘরের মধ্যে কাজ করছিল তার কানে কথাটা যেতে সেও অবাক হ'য়ে বেরিয়ে এল।

বীরচন্দ্র তার স্ত্রীকে বলল,—চাঁদবেনেই যদি হয় তবে এটা তাদের বংশের ধারা হ'ল দেখছি। অন্য বংশের লোক হারালে ফেরে না, এরা যেন ফিরে আসার জন্যেই হারায়।

এখানে ব'লে রাখা দরকার, সমতটে ভারবাহী হিসাবে গোশকট, বলদ এবং ক্রীতদাস ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত ভারি জিনিস এবং যেগুলো ঘোরাপথে দেরিতে গেলেও ততো ক্ষতি নেই সেগুলো যায় গোশকটে। অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা কিন্তু মূল্যবান এবং যেগুলো তাড়াতাড়ি পেঁছানো দরকার সেগুলো বলদের পিঠে সাওতালি পাহাড়ের গা বেয়ে যে পথ তাতে চলে এক বেলায় সমতটে পেঁছয়। মুক্তা রত্ন ইত্যাদি অত্যন্ত মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ক্রীতদাসরা কড়া পাহাড়ায় থেকে বহন করে।

চাঁদের জাহাজে এমন কিছু পণ্য ছিল না যে বীরচন্দ্রর মতো মালখালাসীর পূর্ণ আয়োজন কাজে লাগবে। সে কম্বুদয় থেকে কিছু মসলা এনেছে আর কিছু চুনী ও পান্না। কিন্তু সব চাইতে বেশী যা এনেছে তা হ'চ্ছে ভাল ভাল মাটি। পরিমাণে তা খুব কম নয় এবং তার জন্য সে বীরচন্দ্রর একশ' বলদ নিযুক্ত করল। চাঁদ সস্ত্রীক তার ছোট নৌকা জলে ভাসিয়ে রওনা হ'ল। এ নৌকা জাহাজের উপরেই তৈরী করেছে তার মিস্ত্রীরা। নৌকাখানা রূপোর তৈরী ব'লেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু নৌকা যতই সুন্দর হোক, তাকে সস্ত্রীক যতই মোহনীয় দেখাক, চাঁদ ফিরে এসেছে একথা যেমন রাষ্ট্র হ'ল তার চাইতেও দ্রুততর ও অধিকতর প্রচারিত হ'ল চাঁদ একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হ'য়ে ফিরেছে। নতুবা কেউ জাহাজের খোল ভ'রে মাটি আনে!

. চাঁদের আত্মীয় পরিজনের মধ্যে একাংশ সুখী হ'ল কিন্তু তার নিকটতরদের মধ্যে অন্য আর এক অংশ যতটা আনন্দের বাড়াবাড়ি করল আসলে ততটাই দুঃখিত হ'ল। তার কারণ এই যে এসব জাহাজডুবির ব্যাপারে যেমন হয়—একজন নাবিক কি ক'রে মৃত্যুর মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে পড়ে মাস চারপাঁচ আগে সমতটে ফিরে চাঁদের ভরাডুবির কাহিনী বলেছিল, এমনকি নগর মুখ্যদের এক সভাতেও দিব্য গেলেছে। কাজেই চাঁদের নিকটতর স্বজনরা লব্ধপ্রায় বিত্ত থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বিরক্ত হ'ল বৈকি। তারই প্রচার করল বীরচন্দ্রর লোকেরাও চাঁদের মতোই পাগল নতুবা তার মতো মালখালাসী কিনা মাটি আর কাদার তাল ব'য়ে মরে।

মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসার মত ঘটনার উপরে মানুষের একটা স্বাভাবিক মোহ আছে। কাজেই গল্প শুনবার লোক এমনিতেই আসত, তার উপরে চাঁদ পাগল হ'য়ে ফিরেছে এটাও তাকে দ্রষ্টব্য কিছু করেছে। প্রথম এক সপ্তাহ কিছু বেশী ভিড় হ'ল তার বাড়ীতে। এই সময়টা চাঁদ শুধু বিশ্রামের ভঙ্গিতে কাটিয়ে দিল। তার আনা বিশেষ ধরনের মাটি একটি বড় গুদাম ঘর জুড়ে প'ড়ে রইল। আসলে চাঁদ এই কয়েকদিনে তমসুকি দলিলের সুধ আসল কষল এবং হুণ্ডি বাবদ তার কাছে কে কত পাবে এবং সে কার কাছে কত পায় তার যোগবিয়োগ ক'রে আদায়ের কাগজ তৈরী ক'রে ফেলল। পঁচিশ বছর বয়সে সাতখানা মধুকর জাহাজ হারানো কঠিন আঘাত। আর তার বংশে তার বাবার সময় থেকে এমন সব আঘাত মাঝে মাঝেই আসছে। তা হ'লেও চাঁদ হিসাব কষা শেষ ক'রে যখন একসঙ্গে তিনখানা নতুন জাহাজ তৈরীর বায়না দিয়ে বসল তখন একদল লোক তার উন্মত্ততার কথাই আবার বলল কিন্তু যারা অভিজ্ঞ তারা বলল, ও বংশের কতটাকা কোথায় ছড়িয়ে আছে সেটা খুঁজে পাওয়াই কঠিন, পেলে সবই হ'তে পারে।

তারপর চাঁদ পথে বার হ'ল।

সহরে চাঁদের অনেক বন্ধু ছিল। কিন্তু বাল্যসঙ্গীদের দু'জন এখনও অন্তরঙ্গ তার।

সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্যের অন্তরের পরিবর্তন হয়। এজন্য শৈশবের প্রীতির পাত্র যৌবনে পূর্বের মতো আকর্ষণীয় থাকে না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম আছে। চাঁদের বন্ধু শূরসেন ও বান্ধবী দময়ন্তী তার আবাল্য সঙ্গী। অবশ্য আগের মতো প্রতিদিন দেখা হয় না। তা হ'লেও শূরসেন ও দময়ন্তী এখনও তার বন্ধু। সনকার পরই যদি তার প্রিয়পাত্র হিসাবে কারো নাম করতে হয় তবে পর্যায়ক্রমে সে অবশ্য তাদেরই নাম করবে। শূরসেন ও দময়ন্তী এখন স্বামী-স্ত্রী। দময়ন্তী চাঁদের স্ত্রীও হ'তে পারত যদি শূরসেন চাঁদের চাইতে বছর দু'একের বড় না হ'ত অর্থাৎ যদি তার যৌবন আগে না আসত। শূরসেন ও দময়ন্তী তাদের প্রাক-বিবাহ জীবনে অষ্টবসুর আভিজাত্যের গণ্ডীর মধ্যে ছিল। এখন শূরসেন তার বৃদ্ধ পিতা শ্রেষ্ঠী ইন্দ্রসেনের ব্যবসায়-সংস্থার প্রধান সচিব।

একদিন আমন্ত্রণ পেয়ে চাঁদ সন্ধ্যার কিছু পরে শূরসেনের প্রাসাদে উপস্থিত হ'ল। চাঁদ যদি উন্মাদ হ'য়ে থাকে তবে সখ্যের সহায়তায় তাকে স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং যদি উন্মত্ততার গল্প তার প্রতিভার কোন কৌণিক প্রকাশ থেকেই ছড়িয়ে থাকে তবে তাকে নিয়ে একটি ছোট ঘরোয়া উৎসবে প্রমত্ত হওয়ার আয়োজন করেছিল দময়ন্তী এবং শূরসেন।

চাঁদের দ্রুত ও সিদ্ধ হস্তে রথ চালনা তারা প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছিল এবং চাঁদের উন্মত্ততায় তখনই তাদের সন্দেহ এসেছিল। চাঁদ যখন শূরসেনের কাছে অভ্যর্থনা পেয়ে তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল তখন সন্দেহটা মুছে যাওয়ার মতো হ'ল এবং যখন দময়ন্তী তাকে মালা পরিয়ে দিলে সে মালাটা খুলে দময়ন্তীর গলায় পরিয়ে দিয়ে দুই হাত ধ'রে তার চোখের দিকে চেয়ে রইল তখন উন্মত্ততার গল্পটাকে রসিকতা ব'লে মনে হ'ল।

অতঃপর চাঁদের দু'পাশে থেকে শূরসেন ও দময়ন্তী তাকে নিয়ে চিত্রশালায় গিয়ে বসল। আলোকবিচিত্র সেই ঘরে ব'সে তিন বন্ধুর গল্প সুরু হ'ল। একটি স্বর্ণ-পিঠিকায় সুরা ও সুরাপাত্র তাদের কাছে। কিছু দূরে ব'সে দু'টি ক্রীতদাসী বীন ও রবাব বাজাচ্ছে। সঙ্গীত মৃদু। দময়ন্তী বলল,—আমার জন্যে কি এনেছ চাঁদ?

—আমাকে ফিরিয়ে এনে তোমার দু'হাতে তুলে দিলাম, এর চাইতে আর বেশী কি দেয়ার আছে?

এক মুহূর্ত যেন দময়ন্তী কথাটাকে নিয়েই আচ্ছন্ন হ'য়ে রইল। তারপর সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে উঠল।—তুমি কি পাওনাদারদের দাবীও আজকাল সমতটীয় মুদ্রার বদলে সুগ্রথিত বাক্য দিয়ে পূরণ করছ।

শূরসেন হাসতে হাসতে বলল,—চাঁদ জাহাজ ভ'রে তোমার জন্যে যে পরিমাণ মাটি এনেছে তাতে তোমার তিন জন্মের শৈশব রান্নাঘরের ভাত ডাল পায়েস হ'য়েও কিছু বেঁচে যাবে।

চাঁদ বিব্রত হওয়ার ভান করল। যেন তার বোকামি প্রকাশিত হ'য়ে পড়েছে এমন ভাবে আলোচনাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সে বলল,—এক ছড়া চুনীর মালা গাঁথবার মতো চুনী এনেছি তোমার জন্যে যদি তুমি নিয়ে আমাকে ধন্য কর।

একজন ক্রীতদাসী এসে একটি স্বর্ণপাত্রে ভোজ্যদ্রব্য এবং নতুন আর একটি ভৃঙ্গারে ইরাণী দ্রাক্ষাসব রেখে গেল। চাঁদ আসব ভৃঙ্গারটির গায়ে হাত রেখে তার শীতলতা অনুভব করল। ভৃঙ্গারটি এখানে আনবার আগেই পূর্ণ করা হয়েছে মুখবন্ধ মাকড়সার ঝুল ঢাকা রোমক কাচপাত্র থেকে। দ্রাক্ষাসবের ফেনা ও বুদ্বুদ ভৃঙ্গারটির মুখ ছাপিয়ে উঠছে।

দময়ন্তীর হাত থেকে তৃতীয় সুরাপাত্র নিয়ে চাঁদ বলল,—দময়ন্তী আজকে কি উৎসবের পর এখানে বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে।

শূরসেন বলল, তুমি আমাকে কৃপণ মনে করছ চাঁদ। আজ ছেলেমেয়েদের তাদের ঠাকুমার কাছে রেখে আসা হয়েছে।

—তা হ'লে সাধারণভাবে ঢিলেঢালা হ'য়ে চলা যেতে পারে।

হাসি গল্প, ক্রীতদাসীদের সংগীতের মধ্যে সুরা-উৎসব চলতে লাগল। তার আনা মাটির গল্প বলার ইচ্ছা চাঁদের ছিল কিন্তু ইরাণী স্বর্ণবর্ণ সুরা তাকে কথঞ্চিৎ অবিবেচক কিম্বা অন্যকথায় অত্যুৎসাহিত করল। সে বলল,—শূর, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। আমার এক জাহাজ মাটি অন্য কোন শ্রেষ্ঠীকে দেওয়ার আগে আমি তোমার দামটা শুনতে চাই।

শূরসেন উত্তপ্ত হয়েছিল অন্তরে অন্তরে। সে বলল,—তা বৈকি, তা বৈকি।

চাঁদ বলল, বলো ঐ এক জাহাজ মাটির বিনিময়ে যদি তোমার একটা পুরনো জাহাজ চাই, অন্যায় হয়? তুমি তো জানো বন্ধু, আমার জাহাজের বড় অভাব। একখানি পুরনো ছোট জাহাজ, এই এতটুকু। (চাঁদ তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মেলে ধ'রে জাহাজের ক্ষুদ্রতা নির্দিষ্ট করল।)

শূরসেন বলল,—তা বেশ। কিন্তু তুমি আমার জাহাজ পেলে কি আবার নতুন ক'রে মাটি আনবে?

এই মাটি করেছে। চাঁদ শূরসেনের নির্বুদ্ধিতায় হাসল। সে যেন শুধু এক জাহাজ মাটিই আনবে। কিন্তু হাসতে গিয়ে মনে হ'ল তার নেশা ধরেছে এবং এ অবস্থায় মাটির কথা আলোচনা করা ঠিক হবে না। আর নেশা যদি ধ'রে থাকে তাহ'লে ভালোই হয়েছে। বহুদিন সে দময়ন্তীদের সাহচর্যে নিজেকে নিঃশেষে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয় নি।

দময়ন্তী বলল,—চাঁদ আমারও কিছু বিক্রী করার আছে।

—বটে? তুমি দেখছি একটা ছোটখাটো সওদাগর পত্নী হ'য়ে উঠলে। কি বিক্রি করবে?

—দু'জন ক্রীতদাসী।

—ও বাব্বা। দু' জোওন?

—না-না চাঁদ। এ তোমাকে কিনতেই হবে। লক্ষ্মী চাঁদ, ভেবে দেখো তুমি আমার কতদিনের বন্ধু।

—আমি আর শূর থাকতে তোমার কি টাকা পয়সার অভাব হ'তে পারে যে বিক্রি করবে?

—না চাঁদ কেনো। শূরসেন দময়ন্তীর কথায় সায় দিল।

—যাও, যাও। বেশ তুমি যখন বলছ। কিনতু, শোনও, কিনব, যদি তুমি তার বদলে পাঁচশ' মোহর নিতে রাজি থাক।

শূরসেন বলল,—না-না। থামো। একজন ব্যবসায়ী হিসাবে এ আমি হ'তে দিতে পারি নে। চাঁদ এমন ক'রে বাজার দর বাড়িয়ে দিও না। দময়ন্তী ক্রীতদাসী দু'টির বদলে বড় জোর দশটি মোহর পেতে পারে।

—উহুঁ। এ রকম দামে রাজি হওয়ার বদলে আমি বরং ওদের বাজনার সঙ্গে নাচতে রাজি আছি।

দময়ন্তীর চাঁদের সঙ্গে এই ক্রীতদাসী দু'টিকে নিয়ে একটু রসিকতা করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সব যেনো গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। শূরসেন অনুভব করল, ওরা দু'জনেই তার চাইতে

বয়সে ছোট এবং ওরা যখন খেলা করে তখন গম্ভীর হ'য়ে পরামর্শ দেওয়াই তার অনেক-দিনের প্রথা। সে বলল,—না তা হয় না চাঁদ। তুমি ক্রীতদাসীও নেবে আবার দামও দেবে তা হয় না। একটা কিছু কর।

চাঁদের অনুভূতি যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। তার ভাষার আকার-ইকারগুলি দুর্বল অস্পষ্ট হচ্ছে। কতগুলি একেবারে ঝ'রে প'ড়ে যাচ্ছে। সেগুলিকে ধ'রে রাখবার জন্য সে চেষ্টা করতে লাগল। তেমনি তার মনে হ'তে লাগল ঘরের চারিদিকে স্ফটিকের প্রদীপদান থেকে প্রতিফলিত আলো তার মনে গিয়ে পড়ছে এবং তার মনকে যেন খোলা বইএর মতো পড়তে পারছে শূরসেন। বই মুড়বার মতো সে মনকে লুকোবার বৃথা চেষ্টা করল কয়েকবার। কিন্তু ক্রীতদাসীদের বাজনার শব্দে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছে।

রাত তখন বেড়েছে। চাঁদ একটি উপাধানে হেলান দিয়ে বসেছিল। সে শূরসেনকে বলল,—বুঝলে শউর, মরতে যদি হয়ই বন্ধুর বাড়ীতেএ মরা ভালো।

শূর বলল,—কি রকম?

—রকম আআর কি। এই ধরোও এখন ঘুউম পাচ্ছে। সুরাতো পাআন কত্তে হবেএ তা এমন জায়আগা আর কোথায় পাই।

দময়ন্তী বোধ হ'য় জেগে ছিল,—সে বলল, ভাই চাঁদ তুমি দাসী কিনলে না?

—কক্‌খনোও না। চাঁদের মনে হ'ল কথা বলার চেষ্টায় তার দুইগাল বায়ুপূর্ণ হচ্ছে কিন্তু ঠোঁট দু'টি যেন সহজে নড়ছে না। সে যেন দেখবার চেষ্টা করেও আর দেখতে পাবে না, শুনবার চেষ্টা করলেও তেমনি হবে। মনের এমন অবস্থায় সে ব'লে বসল,—দময়ন্তী, দাসী কিনতেএ চাই না।

চাঁদ উঠে দাঁড়াতে গেল কিন্তু পা দু'টি তার শাসন মানল না। একটা পুঁটুলির মতো সাটেনের জাজিমের উপর প'ড়ে গেল। বাদ্যরত ক্রীতদাসীরা হাসি সম্বরণ করতে পারল না। এদিকে দময়ন্তীকে ক্রীতদাসী বিক্রীর ব্যাপারটা পেয়ে বসেছে। কেন যে কথাটা উত্থাপন করেছিল এখন আর তার মনে নেই কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা কাজ হয় নি এরকম একটা চিন্তা তাকে পীড়িত করতে লাগল। সে উচ্চৈঃস্বরে হুকুম ক'রল,—কাগজ আনো। আলতা আনো।

একজন দাসী ছিল দরজার কাছে। সে কাগজ আলতা আনলে দময়ন্তী তাকে দিয়ে চাঁদের পাঞ্জা নেওয়াল কাগজে। তারপর খুব খুসি হ'য়ে বলল,—শুতে যাব, আমাকে নিয়ে চল। দাসীদের গায়ে ভর দিয়ে সে টলতে টলতে চ'লে গেল।

চাঁদ তখনও ঘুমিয়ে পড়ে নি। পাঞ্জা দেওয়ার ব্যাপারটা তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হলো। নিজের আলতা রাঙানো ডান করতলের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো, শূরসেনকে বিবাহ ক'রে যেমন, এ ব্যাপারেও তেমনি দময়ন্তী তাকে খুব ঠকিয়েছে। শূরসেন কিছুক্ষণ গুম হ'য়ে ব'সে থেকে একপাত্র সুরা ঢেলে পান করলো তারপর সেও একটা তাকিয়া টেনে কাছে আনবার চেষ্টা ক'রে হতাশ হয়ে অবশেষে সেটির দিকে গড়িয়ে পড়ল।

পরদিন দুপুরের কিছু আগে ঘুম ভাঙলে চাঁদ উৎসব অবসিত সেই ঘরে ব'সে প্রথমে অবাক হ'ল, তারপরে গতরাত্রির কথা ধীরে ধীরে তার মনে পড়ল। তাকে এবং শূরসেনকে না জাগিয়ে যতদূর গোছগাছ করা সম্ভব তা করেছে দাসীরা। পানপাত্র এবং ভৃঙ্গারগুলো নেই। দেয়ালের প্রদীপাধার থেকে প্রদীপগুলো সরিয়ে নিয়ে গেছে। ঘরের ইতস্তত টাঙানো পুষ্পস্তবকে তখনও গতরাত্রির ফুলগুলো আছে। কে একজন ঘরের কয়েকটি জানলা খুলে

দিয়েছে। সমুদ্রের বাতাস এসে লাগছে চাঁদের কপালে। এমন সময়ে দময়ন্তী এল।

—ভালো আছ? মাথা ধরেনি তো? কি যে তোমাদের দুই বন্ধুর পাগলামি।

—সে কোথায়?

—ধারাযন্ত্রের তলায় বসিয়ে দিয়ে এসেছি। তুমি কি এখানেই স্নান করবে?

—না। সারথিকে খবর দাও।

—আমিও তাই বলি। সনকা দুশ্চিন্তা করবে। দময়ন্তী চাঁদের সারথিকে খবর দেয়ার ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এসে বলল, একটু গরম দুধ এনে দেব?

—দুয়ো। বরং কালকের যদি তলানি থাকে।

চাঁদ এক মাথা ব্যথা ও এক মুখ হাসি নিয়ে রথে গিয়ে উঠল। এরকম ঘটনা, চাঁদের ভাষায় যা সাধারণভাবে ঢিলেঢালা হ'য়ে বসা, ঘটার পরে চার পাঁচ দিন সে নিজের বাড়ীতে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেয় এবং সনকার একান্ত অনুগত ভাবে ঘর-বাড়ীর কাজ করে। অর্থাৎ দেয়ালের কারুকার্যগুলি থেকে কাপড় ঘষে-ঘষে ধুলো মোছে। গালিচা-গুলোর ধুলো ঝাড়ায় দাসদাসীদের দিয়ে। কিন্তু এবার তার তাড়া ছিল। শূরসেনের সঙ্গে তার দপ্তরে গিয়ে সে দেখা করল। সেখানে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে তারা গোপন পরামর্শ করল। দুজনের পরামর্শে এই স্থির হ'ল, বণিকদের একটা সভা ডাকা হবে। সভার নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়ে চাঁদ তার জাহাজে ক'রে আনা মাটি নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে অবশ্য দময়ন্তী এসেছিল তার বাড়ীতে। সনকা তার সঙ্গে অনেক গল্প করল কিন্তু তার হারিয়ে যাওয়া এবং ফিরে পাওয়ার কাহিনী উহ্য রইল। দময়ন্তী যখন রথে উঠছে আর সনকা নিচে থেকে আবার কবে আসবেন ব'লে বিদায় দিচ্ছে তাকে তখন চাঁদও বেরিয়ে এসেছিল। দময়ন্তী বলল,—চাঁদ, তোমার সেই ক্রীতদাসীদের আনলে না?

—আমার ক্রীতদাসী। ও, পরে মনে পড়েছিল বটে। তুমি আমাকে দিয়ে যেন কি একটা বিক্রীর কাগজে পাঞ্জা নিয়েছিলে।

দময়ন্তী বলল,—একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে যে তোমার মতো ঝানু বণিককে আমার মতো একজন অবলা কোন কাগজে পাঞ্জা বা সই দিতে বাধ্য করেছে?

দময়ন্তী ক্রীতদাসীদের পাঠিয়ে দিয়েছিল। এবং তারা চাঁদের বাড়ীতে সপ্তাহকাল যাপন করতে না করতে কৌতুককর সব ব্যাপার ঘটতে লাগল। ক্রীতদাসী দুটি দময়ন্তীদের অনেক দাসদাসীদের মধ্যে থেকে বাছাই করা। তারা দুজনেই স্বাস্থ্যবতী এবং একজন সত্যই সুন্দরী। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য বোধ হয় চরিত্রগত। একজনের নাম সারি। সে যেন পাথরে গড়া। দ্বিতীয় জনের নাম মল্লি। সে যেন ফুলের পাপড়িতে তৈরী। মল্লি শুধু সুন্দরী নয় মালিকশ্রেণীর সংস্কৃতি তার মধ্যে এত সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে বিধৃত যে তাকে কৃত্রিম ব'লে মনে হয়। তার অদ্ভুত এক ধারণা এসব গুণাবলী থাকার ফলে সে মালিকসম্প্রদায়ের কোন যুবককে বিবাহ ক'রে তার সন্তানের জননীরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্য। সারির মতামত অন্য রকম। সে প্রায় সব সময়েই অসন্তুষ্ট। তার মুখে একটিমাত্র কথা শোনা যাবে—আমিও মানুষ। এ নিয়ে শুধু মালিক-শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু নয় দাস-দাসীরাও তাকে বিদ্রূপ করে। এদের বিক্রীর ব্যাপারে দময়ন্তীর রসিকতাটুকু সনকা একা একা উপভোগ করল এবং মনে মনে পাল্টা রসিকতা করার মতলব আঁটতে লাগল, কারণ চাঁদ তখন তার জাহাজে আনা মাটি জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে গুদাম-

ঘরের নিচতালায় বর্ষার কাদা ক'রে ফেলেছে।

অবশেষে বণিকসভার নির্দিষ্ট দিন এসে পড়ল। সভা বসল শূরসেনের উদ্যানবাটিকার একটি কুঞ্জে। কুঞ্জের পাশ দিয়ে যে উৎপ্রেরিত জল ঝরনার মতো ব'য়ে যায় আজ সেটি চাঁদের হাতে প'ড়ে কর্দমাক্ত হ'য়ে উঠেছে। তার এখানে ওখানে বাঁধ পড়েছে, ফলে ছোট ছোট প্রপাত ও হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চাঁদের ক্রীতদাসের দল উৎসর গোড়ায় পাথরে বাঁধানো কুণ্ডটির পাশে ব'সে দু'হাতে ক'রে ঝুড়ি থেকে মাটি তুলে তুলে কুণ্ডের জলে গুলে দিচ্ছে। ফলে ঝরনায় পয়ঃপ্রণালীর মতো দূষিত জলধারা ব'য়ে যাচ্ছে।

অতিবৃদ্ধ মণিভদ্র এলে সভার কাজ সুরু হ'ল। পাঁচ সাতজন বণিক, তারা সকলেই অষ্টবসু নয়। চাঁদ অবশ্য অষ্টবসুর অন্য সকলকেই খবর দিয়েছিল। এবং অন্যান্য বণিকদের সংগে যখন তাঁদের দু'একজন আসতে আরম্ভ করল তখন চাঁদ আশা করেছিল তারা অনেকেই আসবে। কিন্তু মণিভদ্র এসে চাদর দিয়ে মাথার টাক মুছে বলল,--তা হ'লে ছোকরা একেবারেই পাগল হয়নি। তখন চাঁদ বুঝল পাগলের আসরে আসতে অনেক বিজ্ঞেরই আপত্তি আছে। শূরসেনই সকলকে অভ্যর্থনা করছিল। সে বলল,--তাই বা বলি কি ক'রে। একটা অভাবনীয় কিছু বলবে ব'লেই মনে হচ্ছে।

স্বর্ণখচিত জাজিমে সকলে বসলে শূরসেন বলল,--আলাপ আলোচনার পর আমরা কিছু কৌতুক উপভোগ করব, তারপর এখানে ফিরে এসে কিছু জলযোগ ক'রে আমরা সভার কাজ শেষ করব। অবশ্য জলযোগ করতে করতে এবং তারপরেও আলোচনা করা যেতে পারে।

যথোচিত সম্মান পুরঃসর চাঁদ তার বক্তব্য নিবেদন করল। চাঁদ গল্প বলায় সিদ্ধহস্ত এবং গল্প বলার ভঙ্গিতে সে যা বলল তার সারমর্ম এই : পৃথিবীতে যতগুলি ধাতু আছে ব'লে জানা গেছে আসলে ধাতুর প্রকৃতিগত পার্থক্যের বিচারে তাদের সংখ্যা তার চাইতে বেশী। বিদেশে ভ্রমণকালে এরকম একটি ধাতুর খোঁজ সে পেয়েছে যা রূপার মতো উজ্জ্বল, রূপার চাইতে কম উত্তাপে গলে অথচ রূপার চাইতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। চাঁদের ব্যক্তিগত ধারণা, যে দেশ সে আবিষ্কার করেছে সে দেশটা অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক এই ধাতু দিয়ে গঠিত। সে দেশের যে কোন নদীর গর্ভ থেকে মাটি তুললে দেখা যাবে সেই মাটির অনেকাংশই এই অভিনব ধাতু।

—তা বেশ, কিন্তু ধাতু অভিনব হ'লেই মূল্যবান হয় না, একজন প্রৌঢ় বণিক বলল।

শূরসেন বলল,—শ্রেষ্ঠী সোমদত্ত উত্তম প্রশ্ন তুলেছেন। অভিনব ধাতু যদি অভিনব ভাবে মানুষের ব্যবহারে না লাগে তবে তা অকিঞ্চিৎকর বৈকি।

চাঁদ বলল,—কিন্তু এ পর্যন্ত এমন কোন ধাতু কি আবিষ্কৃত হ'য়েছে যা মানুষের কাজে লাগেনি?

ওদন্তসেনের পুত্র বজ্রদন্ত বলল,—তাদের গুণ আছে ব'লেই কাজে লাগে।

শূরসেন বলল,—কিম্বা তাদের কাজে লাগিয়েছি ব'লেই তাদের গুণের যুক্তি দেই?

এক সময়ে মনে হ'ল ধাতুর গুণ সম্বন্ধে এই তাত্ত্বিক বিচারে চাঁদের বক্তব্য তলিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর চাঁদ হাসিমুখে বলল এবং বলবার সময়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হাঁটু পেতে বসল,—সোনা এবং লোহার ব্যবহার নিয়ে তাদের গুণ এবং বিষক্রিয়া সম্বন্ধে আপনারা যে আলোচনা করলেন নিঃসংশয়ে তা মূল্যবান এবং উপভোগ্য। কিন্তু লোহা আবিষ্কার ক'রে মানুষ কতটুকু ধ্বংস করল আর কতটুকু সৃষ্টি করল, কিম্বা

সোনা গৃহস্থের চাইতে চোরের পক্ষে অধিকতর মূল্যবান কিনা এ সমস্ত আলোচনা ব্রাহ্মণ জাতীর জন্য তোলা থাক। আমরা বণিক। আমাদের ভুললে চলবে না অভিনব সংগ্রহ করাই আমাদের জাতীয় ধর্ম। যদি কোন অভিনবকে ক্রেতার চোখের সম্মুখে তুলে না ধরি তবে সেই নবীন তো অপরিজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন না হ'লে কি ক'রে তার গুণ আবিষ্কার করা যাবে। ধরুন ইরাণী মদ্যের কথা। এ যদি কোন বণিক প্রথমে এ দেশে না আনত তা'হলে তা' যে মাধবীর চাইতে অন্যতর উপভোগ্য কিছু এ কি আমরা জানতাম? এখন অবশ্য ভিষক্‌রা তার নানা গুণাগুণ বর্ণনা করছে। ধরুন জটামাংসীর কথা। এখন ভিষক্‌রা কতই না বলছে। কিন্তু লবন সমুদ্র থেকে কোন বণিক যদি প্রথমে তা না আনত! আর এ ছাড়াও আমার কি মনে হয় জানেন? ইরাণী মদ্য কিম্বা জটামাংসী না এলেও দিন যাচ্ছিল, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ছিল ব্যবসায়ের। ধরতে গেলে লোকের মনে আমরাই অভাববোধ জাগিয়ে তুললাম ইরাণী মদ্যের জন্য। এখন যেন তারাই হুকুম করে আর আমরা তাদের প্রয়োজন পূরণ করি। বণিকবৃত্তির সুবিধাগুলো ভোগ করতে গেলে এ হীনতা স্বীকার করতেই হবে। ওরা বলে থাক, ওদের চাহিদা অনুসারে আমরা যোগান দেই। আমরা জানি আমরা প্রচার দ্বারা চাহিদার সৃষ্টি ক'রে যোগানে টান ধরিয়ে দাম বাড়াই। কতকটা যেন রমণীর রূপযৌবনের মতো তাই নয়?

শ্রোতাদের দু'একজন হেসে ফেলল। মণিভদ্র বলল—সাধু সাধু। উত্তম বলেছ। তোমার এই অভিনব ধাতু কি সস্তা দামের অলংকারাদি তৈরীর কাজে লাগবে?

—শুধু তাই নয়। লোহাকে রূপায় পরিণত করা যায় এর সাহায্যে। এতে মরচে পড়ে না।

—রং কি রূপার মতো? মণিভদ্র আবার প্রশ্ন করল। তা হ'লে রূপার সঙ্গে ভেজাল দেওয়া যেতে পারে?

—অক্লেশে।

বণিকসভা নির্বাক হ'য়ে গেল। কিছুকাল তাদের নীরবে চিন্তা করার অবসর দিয়ে শূরসেন বলল,—এবার চাঁদ কি কৌতুক দেখাবে চলুন দেখে আসি। বণিকরা যেন একটু বোকা হ'য়ে গিয়েছিল কাজেই তারা এবার আপত্তি করল না।

ছোট একটি দল উৎস এবং ঝরনার পাশে এসে দাঁড়াল। নীল রঙের চীনাংশুকের পাগড়ি বাঁধা দাসরা উৎসের কুন্ডে মাটি গুলে যাচ্ছিল। এতক্ষণ যে আলোচনা তারা ক'রে এসেছে তার পরে চাঁদকে বাতুল চিন্তা করার মতো জোর তাদের ছিল না। তবু একজন ফুট কাটল,—এ ধাতু কি জলে গোলা যায়?

চাঁদ তার বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য এই প্রশ্নটিকেই সূত্র হিসাবে ধ'রে নিল। সে বলল,—ধাতু নিষ্কাশনের এই হ'চ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা।

তারা সভাগৃহে ফিরে আসতেই ক্রীতদাসরা হাত-পা ধোবার সুগন্ধি জল এনে দিল।

আহার করতে করতেও বণিকরা আলোচনা চালিয়ে গেল। বজ্রদন্ত বলল,—চন্দ্রশেখরকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—তা বৈ কি। আমার তো মনে হয় এ ধাতুর নামকরণের সঙ্গে চাঁদের নাম জড়িয়ে থাকা উচিত, সোমদত্ত বলল, চাঁদি বললে ক্ষতি কি?

বিরূপাক্ষ বয়সে প্রৌঢ়। সে এ পর্যন্ত কথা কমই বলেছে। সে বলল,—তা মন্দ

নয় যদি চাঁদ রুপোর গুঁড়ো মাটিতে মিশিয়ে এই খেলা দেখিয়ে থাকে তবে এর ফাঁকির ব্যবসা বোঝাতে কালক্রমে চাঁদি কথাটা ব্যবহার করা যাবে। আর এ যদি অপ্রাপ্য কিম্বা ব্যবসায়ের পক্ষে লাভজনক না হয় তবে অকার্যকরী কিন্তু লোভনীয় ভ্রান্তক বোঝাতে চাঁদি কথাটা প্রযুক্ত হবে।

শূরসেন বলল,—কি হবে তা এখনই বলা যায় না। এমনও হ'তে পারে কালক্রমে মানুষ রৌপ্যকেও চাঁদি বলতে আরম্ভ করবে। সে কথা পরে বিবেচ্য। এখন আপনারা চাঁদকে একটা প্রশ্ন করতে পারেন—সেটা হচ্ছে এই : আজকের এই সভা আহ্বান করার পেছনে চন্দ্রশেখরের কি উদ্দেশ্য। সে কি শুধু আপনাদের ঈর্ষাকে জাগিয়ে তুলতে চায়? কিম্বা সে শুধু আপনাদের এই ধাতুর প্রচারক ও খুচরো দোকানদার হিসাবে দেখতে চায়?

মণিভদ্র বলল,—সেটা অন্যায় হয় না যদি আবিষ্কারক হিসাবে সে তা করে। এরকম ব্যবহারের নজির আছে। এই সমতটের প্রতিষ্ঠাতারা নারিকেল তৈল নিষ্কাশনের উপায় উদ্ভাবন ক'রে দীর্ঘদিন এমন করেছিল।

চাঁদ বলল,—আমরা পরে জানলেও সে দেশে গিয়ে দেখে এসেছি চৈনিক বণিকরা এ বিষয়ে আমাদের তুলনায় অগ্রসর। প্রায় পঁচিশখানি জাহাজে ক'রে তারা সেই দেশ থেকে ধাতুমিশ্রিত মাটি নিজেদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। এমন সম্ভাবনা আছে যে আমরা ধাতুটিকে এদেশে নিয়ে এসে তার সাহায্যে পণ্যসামগ্রী তৈরী করলেও চৈনিকদের কাছে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হব।

বজ্রদন্ত বলল,—এদেশ থেকে পঁচিশজন বণিকের পঁচিশখানা জাহাজ যেতে পারে।

শূরসেন বলল,—আমার প্রস্তাবও অনুরূপ। কিন্তু আমাদের সেই পঁচিশখানি জাহাজ যূথবদ্ধভাবে চলবে। সমুদ্রে বেরিয়ে প্রতিযোগিতা করলে চৈনিকদের পক্ষে সুবিধাই হবে। তা ছাড়া সে দেশের রাজা বলেছেন বিবদমান বণিকদলকে কখনই তিনি প্রশ্রয় দেবেন না।

—তা ছাড়া, চাঁদ বলল,—আমাদের জনবল প্রয়োজন হবে। আপাতত জাহাজের নাবিকদল ছাড়া পাঁচশ' জন শ্রমিক নিয়োগ করা দরকার সে দেশে। এবং এ দেশে আরও চার পাঁচশ' পরিষ্কারক ও কারিগর নিযুক্ত করতে হবে। এ সব বিবেচনা ক'রে আমার মনে হ'য়েছে যূথবদ্ধভাবেই কাজে নামা দরকার। শূর, তুমি যেন কাল কি বলছিলে?

—যৌথ ব্যবসা।

—এ নামটা অন্তত মন্দ নয়। এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? সোমদত্ত প্রশ্ন ক'রল।

—কমপক্ষে একখানা জাহাজ ও একশ'জন শ্রমিক নিয়োগ করলে এই যূথের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে। কিন্তু আপনারা এখনই কথা দেবেন না। চিন্তা করুন। সময় নিন, বলল চাঁদ।

মণিভদ্র বলল,—এ কথাটা তুমি বণিকের মতো বলেছ। এতক্ষণ তোমাদের আলোচনা ক্ষত্রিয়দের দেশজয়ের উদ্যোগের মতো শোনাচ্ছিল।

সভা শেষ হবার আগে কিছুক্ষণ গল্পগুজব হ'ল। একথা গৌণভাবে প্রকাশিত হ'ল যে এই যৌথিক ব্যবসায়ে একজন বণিকের দু'খানার বেশী জাহাজ থাকা উচিত হবে না। চাঁদ অবশ্য ব্যতিক্রম। আগামী দশ বৎসরের জন্য তার থাকবে তিনখানা জাহাজ আর তা ছাড়া প্রত্যেক জাহাজের উত্তোলিত ধাতু থেকে সমতটে পৌঁছে পাঁচ শতাংশ পরিমাণ ভাগ পাবে সে আবিষ্কারক ও পরিচালক হিসাবে। কথা হ'ল চাঁদ সভাস্থ প্রত্যেক বণিকের কাছে

মাটি-মিশ্রিত এবং নিষ্কাশিত ধাতু পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পাঠাবে।

সকলে চ'লে যাওয়ার পর শূরসেন বলল,—খুব কাজ করেছ চাঁদ। এবার আমার বাড়ীতে চল। কাল এক জেন্দি বণিক এসেছিল। সে এক রকমের সাদা পানীয় এনেছে। তার বক্তব্য, রুমের বাদশার জন্য যে জাহাজে চালান যাচ্ছিল সে নাকি সেই জাহাজের নাবিক ছিল এবং সামান্য কিছু সরিয়ে এনেছে।

—তুমি নিজে কি বলো?

কিছু না, কিছু না। এ সব বিষয়ে তুমি ছাড়া কে কবে খাঁটি কথা বলেছে?

চাঁদ এবং শূরসেন রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। দুজনেরই প্রস্ফুটিত স্বাস্থ্যদৃঢ় যৌবন। বেশভূষায় নিশ্চয়ই স্বর্ণ ও চীনাংশুকের রুচিসম্মতি ছিল। চাঁদের হাতে কালো আবলুস কাঠের ছোট একটি দণ্ড। শূরসেনের সুবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশ। চাঁদ বলল, - আমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আবার কিছু বিক্রী ক'রে দেবে না তো? শূরসেন দেবতার মতো হেসে উঠল।

রাজপথের দুপাশে বিপণী। বিপণীর নিচেও দুএক জায়গায় মাটিতে ছোট ছোট দোকানদাররা পশরা বিছিয়ে বসেছে। বাতাসে একটা হাল্কা ধুলার মিশ্রণ। একজন মেষপালক দুপাশের দোকানদার ও পথচারীদের তিরস্কার শুনতে শুনতে বোকা বোকা মুখ ক'রে তার মেষ ও ছাগের মিশ্রিত দলটিকে যতটা সম্ভব শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ও দ্রুত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মেষযূথের পায়ে ধুলো উড়ছে। দুই বন্ধু একটা বড় দোকান ঘেঁষে দাঁড়াল। চাঁদ বলল,—তোমার ক্রীতদাসীদের সম্বন্ধে আমি নানা রকম সংবাদ পাচ্ছি। মল্লি নাকি ইন্দ্রদত্তর পুত্র ইন্দুধবকে পরিণয়ে রাজি করিয়েছে।

—সর্বনাশ! তোমার বাড়ীতে কি কোন বলবান প্রবৃত্তিপরায়ণ ক্রীতদাস নেই?

- তা আছে। তবে আমি মল্লিকে সেভাবে শাসন করতে চাই না। ইন্দুধব তাকে পরিণয়ে আবদ্ধ করুক না করুক প্রণয়াবদ্ধ করুক। তারপর চাঁদি আনবার প্রথম জাহাজে চালান দিয়ে দিলেই হবে। প্রেমটা কি, বিশেষ ক'রে ইন্দুধবর মতো একটি কৃষ্টিবান বাঙালির প্রণয় যে কত জ্বালাময় তা বুঝুক।

শূরসেন বলল,—ওদিকে আবার শুনছি ওদন্তসেনের এক পৌত্রীর সঙ্গে ইন্দুধবর বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

—তা হ'লে তো আরও ভালো হবে।

পণ্যবিথীকার এ অঞ্চলটিতে ওষধি এবং অন্যান্য ঔষধ-উপাদানের আড়ত। শুকনো আধশুকনো ও পচনশীল লতা পল্লব ও ফুল থেকে যে গন্ধ এদিকের বাতাসকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে সেটা প্রীতিপ্রদ নয়। শূরসেন ও চাঁদ উত্তরীয় দিয়ে নাক ঢেকে পথটুকু পার হ'ল।

শূরসেন বলল,—তুমি শুনেছ নাকি চাঁদ, লক্ষেশ্বর বসুর দাসরা একটা খণ্ড বিদ্রোহ করেছিল।

—তাই নাকি, কেন?

—লক্ষেশ্বরের ভুল। সে ভেবেছিল এক্কজাতীয় বা সমজাতীয় দাসদাসীরা একত্র থাকলে সুখে থাকবে এবং বেশী কাজ করবে। কিন্তু একত্র থেকে তাদের ধারণা হ'য়েছিল, তারা মনুর সন্তান মানুষ। লক্ষেশ্বরের ছেলে এক ক্রীতদাসীকে তার ঘরে নিয়েছিল একদিন। তাইতে বিদ্রোহ। সে ক্রীতদাসী নাকি অন্য এক দাসের নবপরিণীতা।

চাঁদ বলল,—তারপর?

—বিদ্রোহ দমন করার পর লক্ষেশ্বর বিভিন্নজাতীয় আফ্রিকান দাস এনে তার ক্রীত-দাসীদের দলে ছেড়ে দিয়েছে।

চাঁদ একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে বলল,—ভবিষ্যতে একদিন আমাদের এই দাসদের জন্যে কিছুটা চিন্তা করা হয়তো প্রয়োজন হবে।

শূরসেন কথাটা শুনল। পথে তখন বিকেলের বাজার করার জন্যে পুরনারীরা বার হয়েছে। রথে শুধুমাত্র সারথিকে সঙ্গে ক'রে কয়েকজন বাঙালিনী চলেছে। শূরসেন একজনকে চিনতে পেরে হাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকল। রথ তাদের পাশে এসে থেমে গেল। পিছনে দু'একখানি রথ আটকে গেল। পথচারীরা পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল। পিছনের রথের সারথিরা অস্ফুটস্বরে প্রতিবাদ জানাতে লাগল কিন্তু সে সবকে অবহেলা ক'রে সেই মহিলার রথের গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে শূরসেন বলল,—ইনি হ'চ্ছেন লক্ষেশ্বর বসুর কন্যা সুমধ্যমা সুভদ্রা। আর ইনি সেই চাঁদে পাওয়া চাঁদ।

চাঁদ বলল,—এই পরিচিতির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কিনা বুঝতে পারছি না। সুভদ্রে আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমার সৌভাগ্যকে কিন্তু ধন্যবাদ দিচ্ছি। সুভদ্রার চোখ দু'টিতে এক মধুর বিলোলতা এল, তার অধরোষ্ঠে একটা নির্বাক আকাঙ্ক্ষার ছায়া অভ্যস্ত মুদ্রায় প্রস্ফুট হ'য়ে নিমেষ পরে হাসির রূপ নিল। সে বলল,—আপনি চাঁদ?

শূরসেন বলল,—জানো সুভদ্রা, ইনি সেই চাঁদ যিনি শীতকিরণ হ'য়েও বিরহজ্বালাকে দ্বিগুণিত করেন, নিজে কলঙ্কী হ'য়েও অন্যের কলঙ্ক লক্ষ্য করার জন্যে মেঘের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করেন।

সুভদ্রা বলল,—আমাদের শূরসেনের পক্ষে সময়ের গতি আটকে দেওয়াও সম্ভব। এই ব'লে সে হাসল। তার সারথি রথের রশ্মির ইঙ্গিত করল।

সুভদ্রার রথ বেরিয়ে গেলে শূরসেন বলল,—চাঁদ, তুমি বাতাসকেও মদির ক'রে তুলেছ। তুমি কি অনুভব করতে পারছ না সমতটে কি নতুন সম্পদ এনে দিচ্ছ। হাতির দাঁতের পুতুল ছাড়া আমাদের এ দেশে কিছু তৈরী হয় না। আর যত পণ্য দেখ সবই আমাদের বণিকরা এক দেশ থেকে সংগ্রহ ক'রে অন্য দেশে পৌঁছে দেয়। তার ফলে উৎপন্নের দেশে পণ্য অপ্রতুল হ'লে আমাদের বণিকদের ব্যবসায়ে তার আঘাত লাগে। তোমার এই চাঁদির সাহায্যে আমরা নিশ্চয়ই নতুন পথ খুঁজে পাব। বহু শ্রেণীর কারিকর নতুন কাজ পাবে, বহু শ্রেণীর যোগানদার অন্নসংস্থানের নতুন উপায়ে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।

চাঁদ হাসিমুখে বলল,—বন্ধু শূরসেন, তুমি বণিক না হ'য়ে কবি হ'লে ভালো হ'ত।

পাঁচ

সংবাদটা কি ক'রে স্বামীকে বলা যায় তা' সব মেয়ের মতো সনকারও সমস্যা। বাড়ীতে বয়োবৃদ্ধা যে আত্মীয়ারা আছে তাদের মুখ দিয়ে খবরটা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যায় কিন্তু তারাও যে নিজের গরজে কিছু বলবে এমন মনে হয় না। মোহর বা এক ছড়া মুক্তোর মালা পাওয়ার লোভে অপেক্ষাকৃত কম বয়সি দাসীদের নেই তা' নয়। আসল ব্যাপারটা কৌতুকের : সনকাকে দেখে কেউ যেন ধরতে পারছে না।

স্বামীকে বলার ইচ্ছা যত প্রবল, সঙ্কোচ যেন ঠিক তার চাইতে একটু বেশী। কথাটা

ভাবতে গিয়েও সনকার গাল লাল হ'য়ে ওঠে। সে ভাবে চাঁদের চোখে কি পরিবর্তন ধরা পড়বে না। দময়ন্তীর চোখে ধরা প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং সে যেমন তাতে চাঁদকে না ব'লে থামবে না। সনকার ইচ্ছা খবরটা দময়ন্তী দেওয়ার আগে সে নিজে দেয়।

সেকালে অনেক বণিক অনেক সময়ে স্ত্রীর কথা ভুলে যেত। চাঁদ অবশ্য তার আদরিণী স্ত্রীর কথা ভুলে যায়নি কিন্তু তার নতুন জাহাজ নির্মাণের ব্যাপার তদারক করতে সে দিবা-রাত্রির অনেক সময় ব্যয় করছে। একদিন সনকা জাহাজ নির্মাণের কাজ দেখার ছল ক'রে চাঁদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে এসেও কথাটা উত্থাপন করতে পারল না। এখন তার বয়স বাইশ বছর। চাঁদের সঙ্গে তার তিন বছর হ'ল বিবাহ হ'য়েছে। লোকে ভাবতে সুরু করেছে সনকার সন্তান হবে না। জাহাজডুবীতে সে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছে এবং একা বিদেশে বাস করার ভিক্ততর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে; এমন সাহস দেখানো সত্বেও এখন সংবাদটি সে স্বামীকে দিতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

একদিন সে চাঁদকে বলল,—আজ পূর্ণিমা তিথি, আমাকে নিয়ে একটু শিবমন্দিরে যাবে?

– তার চাইতে চলো, না হয় দময়ন্তীর বাড়ীতে যাই। তুমিও বেরোতে চাও না, আমারও যাই যাই ক'রে যাওয়া হ'য়ে ওঠে না।

—কাল যাব সেখানে। আজ চল মন্দিরে।

চাঁদ তখুনি রাজি হ'য়ে সারথিকে খবর দিল রথ তৈরী রাখতে। সনকার সাজসজ্জা শেষ হ'লে চাঁদ তাকে নিয়ে বেরুল। সারথির কাছে থেকে রথরশ্মি হাতে নিয়ে তাকে বিদায় দিল। আকাশে পূর্ণিমা। পথে লোকজন আছে। চাঁদ অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ বেছে নিল। সনকা তার গা ঘেঁষে বসল।

জ্যোৎস্না ধোয়া পথ নীরবে অতিক্রান্ত হ'তে লাগল। দু'জনের গায়ে একই মৃদু বাতাস স্পর্শ দিচ্ছে। রথাশ্ব দু'টির পশ্চাদর্ধ তালে তালে উঠছে নামছে; বল্গায় ঈষৎ টান পড়লে অশ্ব দু'টির খাড়া খাড়া কানগুলো ন'ড়ে উঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ছে গায়ে, কখনো পথের ধারের গাছের ছায়া দু'জনকে নিমেষের জন্য আবৃত করছে। দূর থেকে নগরের স্তিমিত কোলাহল ও সমুদ্রের গর্জনের আভাস একত্রিত হ'য়ে কানে আসছে। চাকার একটানা শব্দ, ঘোড়ার গলার ছোট ছোট ঘণ্টার একটানা শব্দ। দু'জনের কেউই কথা বলল না। একই পরিবেশ আত্মস্থ করার ছলে তারাও যেন একাত্ম হ'য়ে গেল। সমুদ্রের পারে বালুবেলায় দুধে ধোয়া শিবমন্দির। এই সমুদ্রবেলার বৈশিষ্ট্য—এ যেমন সমতল তেমনি মসৃণ এবং দৃঢ়। বালিতে মাটির মিশ্রণ থাকায় সৈকতে রথ চালনা সম্ভব। তবু চাঁদ সতর্কতার খাতিরে রথের গতি সংযত ক'রল। শিবমন্দিরের পাথরের চাতালে উঠে তারা দেখতে পেল দেবতার সম্মুখে মৃদু প্রদীপ জ্বলছে। পুরোহিত নেই কিন্তু এইমাত্র ছিল ব'লে মনে হয়। মন্দিরের সম্মুখে টাঙানো ঘণ্টাটায় দোলা দিয়ে ঢং ঢং ক'রে বাজিয়ে দিল চাঁদ। তার পরও অপেক্ষা ক'রে যখন পুরোহিত এল না তখন সনকা আঁচল থেকে ফুল নিয়ে মন্দিরের দরজার কাছে রেখে প্রণাম ক'রল। একটা মোহর ছুঁড়ে দিল পুষ্পকুণ্ডে। তারপর দু'জনে ব'সল মন্দিরের চত্বরে।

চাঁদ বলল,—মধু বাতা ঋতায়তে, সমুদ্র মধুময়। চন্দ্র আজ সুধার আকর।

—শিবমন্দিরে ব'সে—

—লক্ষ্য ক'রে দেখো ধূর্জটির মুখের দিকে চেয়ে পার্বতী হাসছেন।

সনকা বলল,—হে আমার চাঁদ, এই ব'লে সে বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে চাঁদের কোলে মুখ লুকালো।

চাঁদ বলল,—কিছু বলবে তুমি?

—হ্যাঁ। আমি গর্ভবতী।

পিতৃত্বের ঘোষণা প্রথম শুনবার পর অনেক সময়ে পুরুষের মন তার ভবিষ্যৎ সন্তানের উদ্দেশ্যে কিম্বা তাকে দেয় করুণা ও কোমলতায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। সন্তানের জননী সেই কোমলতার স্পর্শলাভ করে। ফিরবার সময় সনকা রথে উঠতে গেলে চাঁদ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। রথ সে এত মন্থর গতিতে চালাতে লাগল যে সনকাকেই সলজ্জভাবে বলতে হ'ল,—এ ভাবে গেলে কাল সকালের আগে বাড়ীতে পেঁছনো যাবে না। চাঁদ লজ্জিত হ'য়ে রথের গতি বাড়ালো।

চাঁদের জাহাজ তিনখানির মধ্যে দু'খানির নির্মাণ শেষ হ'য়েছে। অন্যান্য বণিকদেরও জাহাজগুলো মেরামৎ করা হ'চ্ছে। যৌথিক কারবারের কাগজ তৈরী হ'য়েছে। শূরসেন এ বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ এবং তার সেই কাগজের সর্তগুলি চাঁদ এবং শূরসেন ছাড়াও যে দশজন বণিক মেনে নিয়েছে তারাও সকলে শূরসেনের ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হলো। তামার সঙ্গে এই চাঁদির বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ করার ব্যাপারে সমতটের এক স্বর্ণকার এরকম দক্ষতা দেখিয়েছে যে তার জাহাজ না থাকলেও এই যৌথিক কারবারে অন্য সব বণিকের কাছে থেকে চাঁদের প্রাপ্য এক শতাংশ লভ্যাংশের দশমিক এক পরিমাণ তাকে দেওয়া হবে ব'লে লিখিত হ'য়েছে।

সম্মুখে বর্ষাকাল। শরৎকালের পূর্বে বণিক কিম্বা ক্ষত্রিয় কারো পক্ষেই অভিযান সম্ভব নয়। এ সত্বেও চাঁদ ব'সে থাকতে চায় না। তার নতুন জাহাজ তিনখানা পরীক্ষা করা দরকার। জাহাজে নতুন যে সব মাল্লা সে নিয়োগ করবে ব'লে স্থির করেছে তাদের মধ্যে দিশি বাঙালি আদিবাসীও আছে। তাদের কর্মতৎপরতা ও শৃংখলাবোধকেও পরীক্ষা করা দরকার। তার চাইতে বেশী দরকার তাদের শিক্ষিত করা। চাঁদের বিবেচনায় বর্ষার সমুদ্রই শিক্ষার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। এক বর্ষায় সমুদ্রে চলার অভিজ্ঞতা সাধারণ মাল্লাকে সমুদ্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে। যারা সে অভিজ্ঞতা নিয়ে টিকে থাকবে তারা যে কোন বণিকের গর্ব করার মতো সম্পদ। এ ছাড়াও সুখ চাঁদকে দুঃসাহস এনে দিল। সনকা এবার সঙ্গে যাবে না বটে কিন্তু সনকার ব্যাপারটা যেন তাকে পূর্ণতর করেছে, সুআহার এবং সুখনিদ্রার পর যেমন অনুভব হয়। চাঁদ স্থির করল সে উপকূল ধ'রে সিংহলে বাণিজ্য করতে যাবে। এক বর্ষামেদুর দিনে, কালো মেঘের ছায়ায় অবসন্ন সমুদ্রের বুকে চাঁদের দু'খানা বাণিজ্যতরী যাত্রা করল—

> "সনকারে ডাক্যে চান্দ বলেন আপনে। সাবধানে হয়্যা তুমি থাকহ ভুবনে॥
> সিংঘলের মুখে সাধু চলে শীঘ্র গতি। বাহ বাহ বলে নৌকা কিবা দিবারাত্রি॥"

পথে ঝড় উঠবার কথা, ঝড় উঠেছিল। পালের দড়ি ধ'রে রাখা দায় হ'য়ে উঠেছিল। আকাশে কালো মেঘ ধূসর মেঘ মথিত সমুদ্রের মতো উত্তাল। সমুদ্রের উন্মাদ ঢেউগুলির নীলাভ ফেনা যেন বাসুকীর গরল স্রোত। শোঁ শোঁ ক'রে হাহা হাহা ক'রে ঝড় প্রবাহিত হচ্ছে। বজ্রের গর্জন আত্মসাৎ ক'রে সেই ঝড় ক্রোধের মূর্তরূপ ধারণ করছে। শিলা ও বৃষ্টি উপর

থেকে নিচে পড়ছে না, সমুদ্র তরঙ্গের সমান্তরাল থেকে মুহুর্মুহুঃ আঘাত করছে। সেই প্রমত্ততার মাঝখানে কয়েকটি মানুষ আর তাদের অকার্যকরী তরণী। চাঁদ আজ নিজে কাণ্ডারি। কটিমাত্র বাস পরিহিত হ'য়ে সে জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় পাটাতনের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটি জলের ঝাপটায় লাল হ'য়ে উঠেছে, সে যেন প্রকৃতির এই সর্বোৎকৃষ্ট সুরা পান ক'রে ক'রে অতিমানবীয় শক্তির সাধনা করছে। এপাশে ওপাশে কয়েকজন সমুদ্র অভিজ্ঞ নাবিক তাকে পরামর্শ দিচ্ছে, তার আদেশ প্রায় সমস্বরে চিৎকার ক'রে ঘোষিত করছে। কখনো সেই আদেশগুলি জাহাজের সবগুলি মাল্লার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে বাতাসের গর্জনকে প্রতিহত করছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঝড় থামল। বর্ষণক্লান্ত ছাই রঙের আকাশ যেন মাস্তুলের মাথা থেকে কিছু উপরে উঠেছে কিন্তু তার রঙ্ এখনও আলো-কে প্রভাবিত করছে। কাপড় বদলানোর মতো অবকাশ নেই। ঝড় যেন বেকায়দায় অমনোযোগী অবস্থায় ধরতে না পারে। চাঁদের চুল বেয়ে অন্যান্য নাবিকদের মতো জল পড়ছে। সে সকলকে এক পাত্র ক'রে সুরা দিতে বলল। সম্মুখে কাবেরীর মোহনা। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে মোহনা পেয়ে কিছুটা ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। ততক্ষণে পরনের ভিজে কাপড় শুকিয়ে যাবে। একরোখা বাতাসের ভরে জাহাজখানি তরতর ক'রে ছুটে চলল।

চাঁদের অন্য জাহাজ ঝড়ের আকাশ দেখে খোলা সমুদ্রে বার হয়নি। সে রকমই উপদেশ ছিল।

পথে ছোটখাট আরও দু'একটি ঝড়ের ঝাপটা লেগেছিল। চাঁদ শুধু ঝড়ের ভয় ভাঙানোর চেষ্টাই ক'রল না, দীর্ঘ রৌদ্রতপ্ত দিনের উদয়াস্ত সে বাচের নৌকার ভঙ্গিতে দাঁড়িদের দিয়ে দাঁড় টানালো। হাতে ফোস্‌কা, সর্বাঙ্গে ক্লান্তির ঘর্ম, মাথার উপরে ভিজে কাপড়—দাঁড়িরা দাঁড় টানছে। কারো চোখে জল এসেছে, বিকেলের দিকে মানুষের সহ্যের সীমা যখন পার হয়েছে পালের নাবিকদের হাতে জাহাজের ভার দিয়ে দাঁড়িদের নিয়ে একাসনে আহারে বসত চাঁদ। সুপাচ্য আহার, সুগন্ধ সুরা। অবশেষে দশম দিনে জাহাজ সিংহলে পৌঁছালো।

"নৌকা লাগাইল সাধু সমুদ্রকিনারে। মনের কৌতুকে সাধু নাম্বিলা সত্বরে॥
রাজভেট লয়্যা সাধু বিদায় হইল। উত্তম স্থানেতে যাঞে বসতি লইল॥
বাণিজ্যের আরম্ভ করিল সদাগর। বেচাকিনি করে সাধু নাঞি অবসর॥
লবঙ্গ কর্পূর লেই সুগন্ধি চন্দন। সুখের সক্কর লেই বণিকনন্দন॥
ছিট ওড়নী লেই গরভসুতি ভুর্‌য়া। নীল শাটী লেই সাধু বড় যত্ন কর্‌য়া॥
হীরা মণি মাণিক লেই রত্নের কংকণ। সোনা রুপা লেই আর বস্ত্র আভরণ॥
শঙ্খ লেই সিন্দুর লেই চান্দ সদাগর। নারীর ভূষণ লেই গন্ধ মনোহর॥"

এই ভাবে বাণিজ্য শেষ ক'রে চাঁদ সমতটে যাত্রার উদ্দেশ্যে আবার জাহাজ সাজালো। সিংহলের বাণিজ্য তখনও লাভজনক ছিল। কিন্তু ঘরে ফেরার তাড়াও তার কম ছিল না। সনকার কথা মনে প'ড়ল। তার ব্রীড়াজড়িত প্রতিটি পদক্ষেপ যেন নিজেকে আবিষ্কার করছে এক নতুন রাজ্যে। চাঁদ এবার কাণ্ডারীকে জাহাজের ভার দিয়েছে। শান্ত সমুদ্রবক্ষে তার জাহাজ ভেসে যাচ্ছে, চাঁদের অলস অবসর। সে চারুদত্ত ভৈরবীদের কথা ভাবতে লাগলো। যৌথিক কারবার স্থাপন করার মাঝে মাঝে জাহাজনির্মাণের অবকাশে তার

মনে পড়েছে সে সব কথা। কিন্তু হঠাৎ অন্য কথায় মিশে স্মৃতিতে কোন ঘটনার স্ফুরণ আর সেই স্মৃতিকে রোমন্থন এক নয়। চারুদত্তকে অদ্ভুত মনে হ'ল, শাক্তিমানও মনে হ'ল। ভৈরবীর একান্ত অদ্ভুত আত্মপ্রকাশ, তার আত্মবিলোপ, সনকাকে ফিরে পাওয়া এসবই সে চিন্তা করল। ভৈরবী এবং সনকা কি একই নয়? তাই যদি হবে তেমন অবস্থায় পুনর্দর্শন মাত্র সনকার কি আত্মপ্রকাশ করা স্বাভাবিক হ'ত না? ভৈরবী আছে, তাদের অসাধারণ শক্তিও আছে। কিন্তু দিনের আলোয় ভৈরবীকে অসাধারণ ব'লে মানা কিছুটা অযৌক্তিক মনে হয় যেন। সে যাই হ'ক—

"দেশে আইল সদাগর বার্তা গেল ঘরে। সনকা বেন্যানী আস্যে নৌকা নিবার তরে।
দূর্বা ধান্য নিল আর সুগন্ধি চন্দন। ধূপ দীপ নিল আর যে লাগে যখন॥
এই মতে সনকা সে করিল গমন। চান্দের নিকট যাঞে দিল দরশন॥
চান্দ বেন্যা দেখি আইল সনকা বেন্যানী। অধোমুখ হইল চান্দ মনে মনে গণি॥"

বদরি ফলের মধ্যে সর্পরাজ তক্ষক আত্মগোপন করতে পারে সে শুধু রাজার ভাগ্যদোষে। বড় বড় ঝড় কাটিয়ে এসে ছোট ঝড়ে জাহাজ বানচাল হয় সে শুধু বণিকের ভাগ্য অন্ধ ব'লে। নতুবা চাঁদের মনে অকস্মাৎ জাগ্রত সন্দেহের অভ্যুদয় কোথা থেকে হয়? সনকাকে ডেকে কথা বলার মতো শক্তিও কিছু কালের জন্য রইল না তার। নীতিবিদরা যদি বলেন, সে কালের সমাজজীবনে এক শ্রেণীর মানুষকে ক্রীতদাস ক'রে রেখে তাদের জীবনের অন্য সব বিষয়ের মতো যৌনজীবনকেও অশ্রদ্ধেয় ও অবহেলার যোগ্য ব'লে বিবেচনা করার ফলেই নিজেদের যৌনচেতনাতেও আবিলতার সূচনা দেখা দিয়েছিল তা হ'লেও চাঁদের সান্ত্বনা নেই।

কিন্তু সনকা যখন কথা বলল সন্দেহের এই মেঘটা দূরে স'রে গেল কিছুক্ষণের জন্য। জাহাজে মালখালাসীরা হাত লাগিয়েছে। চাঁদ সনকাকে নিয়ে রথে গিয়ে উঠল। অন্যান্য পরিজন পুরোহিত ও দাসদাসীরা নৌকা ক'রে আসতে লাগল। চাঁদ সনকাকে কতই না আদর করল। সনকা লক্ষ্য করল এবার সিংহল থেকে ফিরে এসে চাঁদ যেন তার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হ'চ্ছে। কখনো সে প্রেম প্রথম প্রণয়ের মতো আত্মবিস্মৃত, কখনো বা বৃদ্ধের প্রণয়াসক্তির মতো অন্ধ। কিন্তু সনকা দুঃখিত হয় যখন সেই সস্নেহ রসবেত্তা চাঁদ কামনাকর্কশ হ'য়ে ওঠে। সে চিন্তা করে তার মতো অবস্থায় স্বামীদের স্নেহ কি এমনি সাময়িক রূপান্তর নেয়।

চাঁদ বাইরে কাজে ডুবে থাকে। যৌথ কারবারের সর্তগুলি লিখবার জন্য শূরসেন যে ধাতুফলকগুলি নির্মাণ করেছে সেটাই তাদের কারবারের সাফল্যের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন। রৌপ্যফলকের মতো উজ্জ্বল ও ভাস্বর সেই ফলকগুলির নির্মাণে নাকি চাঁদের আনা ধাতু আছে। মণিভদ্র নাকি তামার সঙ্গে এই ধাতু মিশিয়ে স্বর্ণবর্ণ এক যৌগিক উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে। এদিকে চাঁদের জাহাজগুলি প্রস্তুত। সিংহল-বাণিজ্য শেষে সে বুঝতে পেরেছে জাহাজের উপরের কারুকার্য কিছু কমিয়ে ফেলতে হবে। একটু ভারি হ'য়েছে। শূরসেন তাদের দু'খানা জাহাজের কিছু কিছু মেরামৎ করিয়ে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার উপযোগী করেছে। বজ্রদন্ত, মণিভদ্র সোমদত্ত ছাড়াও লঙ্কেশ্বর প্রভৃতিরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

বাড়ীর পথে ফিরতে ফিরতে অনেক সময়ে তার মনে হয়েছে সনকাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে হয়। সনকার জন্য তার চিত্ত করুণ হ'য়ে ওঠে। অন্য কোনদিন সনকাকে

প্রশ্ন ক'রে তার সময় সম্বন্ধে জেনে নিয়ে হিসাব ক'রে নিজেদের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধানটিকে দূর করার ইচ্ছা হয় চাঁদের। কখনো সে ভয় পায় হিসাব যদি তার আশঙ্কাকে সত্য ব'লে প্রমাণিত করে। কখনো মনে হয় তার আশঙ্কার মূলে যদি সত্য থাকে সনকা কি হিসাব ক'রে মিথ্যা বলতে পারবে না। অন্য কখনো চাঁদ যেন তার স্বরূপকে ফিরে পায়, সন্দেহকে তখন সে চিত্তের দুর্বলতা ব'লে চিনতে পারে। এরকম মনের অবস্থায় একদিন সে অতিসাহসিকের মতো স্বগতোক্তি করল,—তাই যদি হয় তবে হোক। সনকার প্রেম যেমন সনকার এই সন্তানও তেমনি মূল্যবান।

একদিন চাঁদ বলল,—চল সনকা, আজ সাওতালি পাহাড়ে যাই। জায়গাটা কিনেই রাখলাম, আজ করি কাল করি ব'লে বাড়ী করা আর হ'ল না।

—কিন্তু সঙ্গে দাস-দাসী নেব না।

—না-না, কেউ নয় আর। আমরা দু'জনে শুধু!

সাওতালি পাহাড় সমতটের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও সমতটের আবহাওয়া ও তার আবহাওয়া এক নয়। ফাঁকা জায়গা ব'লেও বটে ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা উঁচু ব'লেও বটে এখানে সমুদ্রের লবনাক্ত বায়ুকে শীতল ও মনোহর রূপে অনুভব করা যায়। মাত্র দু'জন বণিক এ পর্যন্ত এখানে বাড়ী করেছে। তার মধ্যে লক্ষেশ্বর একজন। লক্ষেশ্বরের প্রাসাদের আকৃতিটা অস্তগামী সূর্যের আলোয় চোখে পড়ল। এখানে রথ থামাতে হয়। এর পর থেকে যদিও উপত্যকা কিন্তু এই উপত্যকার প্রান্তে এসেই চওড়া রাস্তা শেষ হয়েছে। পথের পাশে রথ থেকে নেমে, ঘোড়া দুটিকে তাদের বল্‌গার সাহায্যে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে চাঁদ আর সনকা পাশাপাশি হাঁটতে সুরু ক'রল।

সনকাকে নিয়ে চাঁদ যখন বেড়াতে বেরিয়েছিল সাওতালি পাহাড়ের সপ্ততলে বাড়ী করার কথাই আলোচ্য হবে এই ধারণা করেছিল চাঁদ। কিন্তু সেই নির্জনতায় সনকার হৃদয় যখন চাঁদের দিকে উন্মুক্ত হবে তখন কি অন্য প্রশ্নেরও সমাধান হবে না? পাহাড়ের সৌন্দর্য তাদের দু'জনকেই আকৃষ্ট ক'রল। চারিদিকের মাধুর্য অনুভব করতে করতে তাদের আলোচনায় সেই মাধুর্যের ছায়াপাত হ'ল। খস্‌খসের জঙ্গল থেকে এখনও একটা মৃদুগন্ধ উঠছে। পাহাড়ের শুকনো শোষক বাতাসে আজকের ক্ষণবর্ষাটুকুর কোন চিহ্নই আর নেই। পাহাড়ের উপরে ব'লে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হ'তে সময় লাগছে। নাপিতানীর চুবড়ির আলতা তুলোর মতো সন্ধ্যা। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ঝোপের দু'একটা পাখী সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ ক'রল। তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সমতটে যাওয়ার প্রশস্ত পথটি চোখে পড়ে না, কিন্তু বলদের গলার টুং টাং টুং টাং ঘণ্টার স্তিমিত শব্দ ভেসে আসছে। প্রকৃতি চাঁদকে আকর্ষণ করল, সেও নিজেকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিতে পেরে সুখী হ'ল। সপ্তমীর চাঁদ উঠল। অনির্দিষ্ট গতিতে সংসারের বিষয়, ব্যবসার কথা, সিংহলের আচার-ব্যবহার নিয়ে গল্প করতে করতে তারা দু'জনে কখনো আতপ্ত শিলায় ব'সল কখনো উপত্যকার সমতলে ঘুরে বেড়াল। এ সময়ে একটা কৌতুককর দৃশ্য তাদের আকৃষ্ট ক'রল। মৃদু প্রদীপ জ্বলছে। ধূপধুনোর গন্ধ আসছে। মন্ত্রোচ্চারণের মতো শব্দ আসছে। সনকা উচ্চারণ না ক'রে মুখভঙ্গীতে প্রশ্ন ক'রল—কি?

চাঁদ ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলল,—দেখে নাও পরে আলোচনা করব।

দু'তিনটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ বড় পাথরের আড়ালে ব'সে একটি সর্পমূর্তিকে পূজা করছে। হে সর্প, তুমি পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছ। হে সর্প, তুমি মহাসাগর

থেকে ধনরত্ন আহরণ কর। তুমি আমাদের অনুকূল হও। হে সর্প, তোমার নিদ্রাকালে পৃথিবীর শস্যবীজ তোমার কোলে নিদ্রিত থাকে, তুমি যখন জাগ্রত হও তখন পৃথিবী শস্যশালিনী হয়। আমাদের পিতৃপিতামহ তোমার পূজা করেছে, আমরাও তোমার পূজা করি। তুমি আমাদের অনুকূল হও।

সর্পপূজকদের কাছে থেকে স'রে এসে সনকা হেসে বলল,—ক্রীতদাসরা পূজা করছে?

—হ্যাঁ। তুমি মল্লিকে চিনতে পেরেছ?

—মল্লি, তোমার নতুন ক্রীতদাসী? সেও ছিল নাকি? ওকে কিন্তু তা হ'লে শাসন করা দরকার। এইজন্যে বুঝি দময়ন্তী ওকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়েছে।

চাঁদ কিছু বলল না।

সনকা বলল,—তোমাদের এই বিধান দেওয়া উচিত সমতটের কোথাও সর্পপূজা হবে না।

চাঁদ ভাবতে লাগল : ভাগ্যের সঙ্গে ধর্মের কি যোগ আছে? ধর্ম কি ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে? তার মনে প'ড়ল ভৈরবী বলেছিল ভাগ্য যখন চাঁদ ও সনকাকে পৃথক করেছে তখন অতি সহজে মিলন ঘটা ভাগ্যের অভিপ্রেত নাও হ'তে পারে। ভাগ্যকে প্রলুব্ধ করা কিম্বা বিরক্ত করা সম্বন্ধেও প্রচলিত একটা মত আছে। কিন্তু ভাগ্য যদি তার বিরূপই হয় তবে সনকাকে সে অচিন্তনীয় উপায়ে ফিরে পেল কেন? অবশ্য সপ্তডিঙ্গা মধুকর তলিয়ে গিয়ে তার ধনক্ষয় হ'য়েছে। এখনও সে ঘাটতি পূরণ হয়নি, কিন্তু ধনক্ষয় না হ'লে সে কি এই নতুন ধাতু আবিষ্কার করার সুযোগ পেত? বরং যেন মনে হয় ভাগ্য তাকে আশীর্বাদ করেছে ভৈরবীর রূপ ধ'রে, সে ভৈরবী যদি সনকাই হ'য়ে থাকে। সে বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারেই ধার্মিক।

ফিরবার সময়ে যে পথে এসেছিল তা ছেড়ে দিয়ে অন্য আর একটি পথ ধরল চাঁদ। এ পথ মসৃণ এবং চওড়া বটে কিন্তু পূর্বের পথের তুলনায় অনেক খাড়া, সাধারণতঃ এই পথে কেউ রথ চালনা করে না। উঠবার সময়ে অশ্বগুলি অকারণ ক্লান্ত হয়, নামবার সময়ে রথের গতি এত দুর্বার হয় যে অপঘাতে রথীর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বণিক-পুত্রদের মধ্যে এককালে এই পথে রথ চালনা করা এক প্রকার উন্মত্ত ক্রীড়ারূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইন্দুধবর অগ্রজ বিধুধবর মৃত্যুর পর থেকে এ পথ পরিত্যক্ত হ'য়েছে। সেদিনকার ক্রীড়াতে চাঁদ এবং শূরসেনও যোগ দিয়েছিল। একই রথে ছিল শূরসেন এবং চাঁদ। উঠবার সময়ে সারথি চাঁদ বিধুধবকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। নামবার সময়ে শূরসেন বল্‌গা হাতে নিয়ে রথকে নক্ষত্রবেগে চালনা করেছিল। পথের দু'পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা আশঙ্কায় স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। চাঁদ যেন এখন সনকাকে দেখাতে চায় শূরসেনের বদলে সেদিন সে যদি বল্‌গা হাতে নিত তা হ'লেও তাদের রথই প্রথম হ'ত। চাঁদের রথ তীব্র গতিতে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। রাত্রির পথ, অন্তত চাঁদের আলো পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামা পথে দ্রুত গতিশীল রথের সতর্ক চালনার পক্ষে অপ্রতুল। পথের পাশের অন্ধকার দৃশ্যগুলি একই কালে রথের দিকে এগিয়েও আসছে, তাকে অতিক্রম ক'রে দূরেও পালাচ্ছে। চাঁদও যেন এই সময়ে মনের অন্ধকারকে আক্রমণ করতে চায় বর্জন করতে চায়।

রথ যখন সমতলে নেমে এসে মন্দগতি হ'তে হ'তে ক্রমশ থেমে গেল তখন চাঁদ রথ থেকে

নেমে সনকাকে দুই হাতে বুকে তুলে নিল। সনকা থর থর ক'রে কাঁপছিল। তার চোখ নিমীলিত। ওষ্ঠ গণ্ড রক্তহীন বিবর্ণ। চাঁদের মনে হ'ল সে যেন শত্রুর শিবির থেকে নারী আহরণ ক'রে এনেছে। চুম্বনে, চুম্বনের অধিক কোমল আদরে সনকাকে আবৃত ক'রে দিয়ে সে অনুভব ক'রল—ঈশ্বরের এই বিধান যে প্রত্যেক মানুষকে পৃথক ব্যক্তিত্ব দিয়ে নির্মিত ক'রে পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও তারই অনুরূপ, তারই উপযুক্ত ক'রে একটি নারীকে সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন। তাকে খুঁজে পাওয়াই জীবনের সার্থকতা।

এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে সনকার সময় লাগল। দু'দিন সে মৃত্যুর মুখোমুখী কাটিয়েছিল। তারপর চাঁদের ভাগ্য বলেই যেন কাটিয়ে উঠল। কিন্তু একেবারে সুস্থ হ'ল না। যেদিন সে উঠে বসল সেদিন দময়ন্তী উপস্থিত ছিল। সে চাঁদকে তিরস্কার ক'রে বলল, ছি-ছি চাঁদ, তুমি চিরদিনই ছেলেমানুষ থেকে গেলে। ভাগ্যে আমি তোমার স্ত্রী নই।

সনকা মৃদু হেসে বলল,—নতুবা আমার পোড়া চোখে চাঁদের আলো জ্বালা করবে কেন?

মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সনকা আত্মগত চিন্তা করল। এমন ঘটনা ঘটে বৈকি। সনকা কথাটা ভাবতে গিয়ে দু'একবার নিজের কাছে মিথ্যা ব'লে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তাই ব'লে সেটা মিথ্যা হ'য়ে যায় না। চারুদত্ত সম্বন্ধে তার কোন মোহ ছিল না, চারুদত্তের কোন বিশেষ কামনা ছিল বললে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু একটা করুণা অনুভব করেছিল সে একদা তার প্রতি। মন জুড়ে এখন যেমন চাঁদ তখনও তেমনি ছিল। তা সত্ত্বেও করুণা বিলোবার কোন বাধাই ছিল না। বরং করুণার সঙ্গে কৌতুকবোধ, একটা অনির্দিষ্ট চঞ্চলতা যুক্ত হ'য়েছিল। এ বিষয়ে একমাত্র প্রতিবন্ধক হ'ল এমন একটি ঘটনা যার সঙ্গে তার হৃদয়ের কোন যোগ ছিল না। চারুদত্ত অজ্ঞাত একটি ওষধি থেকে চিত্রের জন্য রঙ আহরণের পরীক্ষা করছিল এবং তাতেই সে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল।

সনকা চাঁদের প্রতি সহানুভূতিও অনুভব করে। আত্মার আত্মীয় দেহর দেহী এই সন্তান। আত্মার অবিনশ্বরত্বে যদি বিশ্বাস দৃঢ় না থাকে তবে সব মানুষেরই বিশেষ ক'রে পবনের ও বরুণের মতো দুইটি প্রখ্যাত বিরোধী শক্তির সঙ্গে পাঞ্জা ধ'রে যাদের জীবন তাদের পক্ষে জীবনের সব আয়োজনই আকস্মিকভাবে ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বিস্বাদ ও নিরর্থক মনে হবে। সনকা জানে নাবিকরা ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে যখন অতল অকূল সমুদ্রে একই কালে পবন ও বরুণের রোষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অসুরের মতো নির্ভীক হ'য়ে দাঁড়ায় তখন তাদের মানুষের মন থেকে নিজেকে ভয়শূন্য করার চেষ্টায় যে সব পদ সৃষ্টি হয় তার প্রখ্যাতমতটিতে 'মায়ের কোলে ছেলে দুলছে' এই ভাবটি থাকে। সে যেন পবন ও বরুণকে বুঝিয়ে দিতে চায় তার মৃত্যুতে সে মুছে যাবে না। তার ছেলে রইল, সেও বেঁচে রইল।

কিন্তু কি ক'রে সে সন্দেহ দূর করবে? এ কি মুখের কথায় যায়! চাঁদ তার সন্তানের মধ্যে যে তৃপ্তি পেতে চায় তা যদি এক্ষেত্রে সে না পায় তবে চাঁদকে সেটা কি ভাবে পাইয়ে দেওয়া যাবে? সত্য কি ভাস্বর ও স্বপ্রকাশ? সত্যকেও প্রমাণিত করতে হয়। সনকা অভিমান ক'রল না, অপমানিত বোধ ক'রল না। কিন্তু দু'একবার তার মনে হ'ল একি ভাগ্য শুল্ক নিচ্ছে তার জীবন আবার ঘাটে ভিড়েছে ব'লে!

ছয়

কাহিনীর এই সময়ে নগরের প্রধান ছিল সংগ্রামনায়ক শেখরসেন। শেখরসেন বণিকদের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না। তার অর্থ উপার্জনের উপায় ছিল সমতটের কয়েকটি বড় বড় ফলের বাগান। আর যা সে করত তা' হ'চ্ছে জমি হস্তান্তরের কাজ। নগর কোনদিকে বাড়বে এ যেন সে বুঝতে পারত। সেদিকে পতিত ও অবাসযোগ্য জমি সে কিনত। তারপর নগর বাড়তে সুরু করলে বণিক এবং অন্যান্য ধনবান লোকদের কাছে চড়াদামে সেই সব জমি বিক্রী ক'রে দু'পয়সা ক'রত।

যৌবনে শেখরসেন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির ছিল এবং ক্ষত্রিয়দের মতো শস্ত্র চর্চা করতে ভালোবাসত। তখন সে ছিল নগরপ্রধানের কর্মচারী। তিনদিকের মূল ভূখণ্ডের যে অংশ তাম্রলিপ্ত নামে সমতট থেকে শাসিত হ'ত তার পূর্বাঞ্চলে একটা গোলযোগের সূত্রপাত হয়। আরও পশ্চিমের দেশে সেবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। অনাহার মৃত্যুভীত আদিবাসীরা প্রথমে দু'একজন পরে সদলবলে গ্রামকে গ্রাম উঠে এসে তাম্রলিপ্তে অনুপ্রবেশ করল এবং তাম্রলিপ্তের অধিবাসীদের ফলের বাগানগুলিতে আশ্রয় নিয়ে একদিকে যেমন প্রচণ্ড সূর্যের খরতাপ থেকে রক্ষা পেল তেমনি বাগানের কাঁচা পাকা ফলগুলি খেয়ে প্রাণরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগল।

সংবাদ নগরে পেঁছালে প্রথমে প্রায় সকলের মনোভাবই হ'ল : আহা, বাঁচুক ওরা। কিন্তু পরে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে বুদ্ধিমানরা বলল—বলো কি, তাই ব'লে কি ফলের বাগান-গুলি নষ্ট হ'তে দেওয়া যায়। এ বছর ফল একটাও পাবে না। তৎকালীন নগরপ্রধান শেখরসেনকে পাঠিয়েছিল ব্যাপারটা তদন্ত করতে। যদি প্রয়োজন বোধ ক'রে সে যেন তাদের অন্যত্র সরিয়ে দেয়, এ রকম হুকুম ছিল।

কাজটি শেখরসেন ভালোভাবেই করেছিল। সহস্রাধিক দুর্ভিক্ষপীড়িত আদিবাসীকে হত্যা ক'রে তাদের মনে দুর্ভিক্ষের চাইতেই অধিকতর ভয়ের সঞ্চার ক'রে বাগানগুলি থেকে তাদের তাড়াতে পেরেছিল। তার নির্মমতার খ্যাতি এমন ভাবে রাষ্ট্র হয়েছিল যে সমতটের অধিবাসী আদিবাসীদের মধ্যে নিন্দা সোচ্চার হ'য়ে উঠল। এমনকি বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা লজ্জাবোধ জাগ্রত হ'ল। তখন শূরসেনের পিতৃব্যস্থানীয় রাঘবারি জীবিত ছিলেন। তিনি নগরপ্রধানকেই এই নৃশংসতার জন্য ধিক্কার দিয়েছিলেন, পথে, বাজারে বণিকসভায় এবং তাঁর প্রমোদ সভায়। একদিকে আদিবাসীদের অসন্তুষ্টি অন্যদিকে রাঘবারির খরধার জিহ্বার ধিক্কার, অভিজাত সম্প্রদায় ও সুরুচিসম্পন্ন নাগরিক মাত্রই বিব্রত হ'য়ে পড়ল। কিছু একটা করা দরকার ছিল। তারা সকলে নগরসভা আহ্বান করেছিল। এবং সেই সভায় রাঘবারির ধিক্কার ধ্বনি সমুদ্রতরঙ্গের মতো প্রহরকাল ধ'রে গড়িয়ে গড়িয়ে গেল। শেখরসেন কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছিল কিন্তু প্রহরকাল সমুদ্রতরঙ্গে নাকানি-চোবানি খেলে আর কিছু করার মতো মনের জোর কোন নাবিকেরই থাকে না। নগরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কিন্তু নগরপ্রধানের পরিবর্তন হ'লেও শেখরসেন নগরপ্রধানের দপ্তরের এক অপ্রয়োজনীয় এবং অনুচ্চারিত অংশে টিকে থাকল। প্রবাদ মাকড়সার জালে ঢাকা এক কলুঙ্গিতে সে আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু শেখরসেন উচ্চাভিলাষী। সে অন্ধকারে ব'সে ব'সে অপ্রধান কাজগুলি কুশলতার সঙ্গে ক'রে যেতে লাগল। কালক্রমে নগরপ্রধানরা তাকে বেতনের দিক দিয়ে কিছু কিছু সুবিধা ক'রে দিয়েছিল। তারপরে এক সময় এলো

যখন নগর পরিচালনার ব্যাপারে নিরুৎসাহ বণিকঅভিজাতরা দেখতে পেল দপ্তরগুলির সংবাদ সম্বন্ধে একা শেখরসেন যত ওয়াকিবহাল বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তারা তত নয়। এ সময়ে কিছুকাল বণিকরা অত্যন্ত আত্মস্বতন্ত্র হয়েছিল এবং কয়েকজন অপরিণামদর্শী অকেজো বণিককে নগরপ্রধান নির্বাচিত করেছিল। প্রায় বছর দশেক পরে এক নগরসভায় উদ্ঘাটিত হ'ল যে নগরের কোষাগারে ইঁদুর এবং আরসোলা ছাড়া আর কিছু নেই, কর্মচারীরা শ্রমবিমুখ এবং উদ্ধত, নগরসেনারা সকলেই এক একটি সামন্ত। এক কথায়, অব্যবস্থা এবং অনাচারের চূড়ান্ত। বণিকঅভিজাতরা আলাপ-আলোচনায় স্থির করল এমন একজন লোক চাই যে কাজ ভালোবাসে, যে কর্মচারীদের কাজের ফাঁকি ধরতে পারবে, যে নগরপ্রধানের দপ্তরের অন্ধিসন্ধি জানে, যে ভদ্রতা এবং সৌজন্যর চাইতে হৃদয়হীন কর্তব্যবোধকে মূল্য দেয়। শেখরসেনের দিন এল। পলিতকেশ এই কর্মচারীকে তারা দপ্তরের প্রায়ান্ধকার ঘর থেকে টেনে এনে নগরপ্রধান নির্বাচিত করল।

আগে অনেক দীপ্তিমান নগরপ্রধান নির্বাচিত হ'য়েছে, তাদেরও দক্ষতা ছিল। কিন্তু শেখরসেনের এক রকম দীপ্তিবিহীন দক্ষতা ছিল যা নির্বাপিত অগ্নির উত্তপ্ত অঙ্গারের মতো। এই ভোঁতা দক্ষতার সঙ্গে তার হৃদয়হীন কর্তব্য-প্রীতি যুক্ত হ'য়ে নগরপ্রধানের দপ্তরে শৃংখলা এনে দিল। শেখরসেনের সঙ্গে তার কার্যকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিজাত বণিকদের বিবাদ লেগে ওঠার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কোষাগার পূর্ণ করার জন্য সে এক শুল্ক ব্যবস্থা চালু করেছিল। দাঁড়শুল্ক। জাহাজে যত দাঁড় তদনুসারে শুল্ক দিতে হবে। বণিকরা এটাকে তাদের অধিকারে অকারণ হস্তক্ষেপ ব'লে প্রতিবাদ করার জন্য নগরসভায় গিয়েছিল, শেখরসেনও প্রস্তুত ছিল পদত্যাগ পত্র নিয়ে। সেই সান্ধ্য-সভায় একপক্ষ অন্য পক্ষকে চিনবার সুযোগ পেয়েছিল। পরে অবশ্য দাঁড়শুল্ক দাঁড়িদের দেয় শুল্কে পর্যবসিত হয়।

শেখরসেন কোন কোন বিষয়ে শুচিতা-ধর্মীর মতো কাজ করে। রাজস্ব সম্বন্ধীয় এবং অপরাধ-নিবারক বিধানগুলি প্রয়োগ করা সম্বন্ধে ধর্মাধিকরণকে সে দৃঢ় হওয়ার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। দুজন আদিবাসীর মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে ধর্মাধিকরণ বিধানানুযায়ী কাজ করে। এমনকি অভিজাত বণিকরা এবং একজন ক্রীতদাসও আইনের চোখে সমান। এ সত্বেও বণিকদের মর্মপীড়ার কোন হেতু নেই কারণ আইন যত কার্যকরী হবে ক্রীতদাসরা তত বেশী ক্রীতদাসত্ব অর্জন করবে এবং সাক্ষ্য ও সত্যের পার্থক্য তখনকার দিনেও অর্থের উপরে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এ হেন শেখরসেনের একদিন শিরঃপীড়ার কারণ ঘটল। ঘটনাটি একটু আনুপূর্বিক বলা দরকার : শূরসেনের পিতৃব্য-স্থানীয় রাঘবারির এক অবৈধ ভাই ছিল ভামহ। রাঘবারির পিতা তখন বিত্তভূয়িষ্ঠ বণিকদের শ্রেষ্ঠতম। তা ছাড়া এমন রূপবান ও কান্তিবান পুরুষ সে যুগে ছিল না। তৎকালীন মহিলারা তার সঙ্গে পরিচিত বলতে গর্ব বোধ করত। তাদের মধ্যে একজন ছিল বালাদিত্যর পত্নী রত্না। ভামহ তারই পুত্র।

ভামহ পিতার কাছে রূপ পেয়েছিল এবং পালক-পিতা রত্নার স্বামীর কাছে পেয়েছিল সুরার প্রতি আকর্ষণ। রাঘবারির পিতা তাকে প্রকাশ্যে সমাদর করত এবং নিজের বিবাহজাত সন্তান রাঘবারির তুলনায় তাকেই হাতখরচের টাকা বেশী দিতেন। ফলে রাঘবারি যেমন অসূয়া থেকে অসহিষ্ণু ও পরদোষ সমালোচক হয়েছিল, ভামহ তেমনি মধুরস্বভাব দিলদার এবং উদ্দাম-প্রকৃতির হয়েছিল।

কালক্রমে ভামহ ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে সঙ্গীত-কাব্য প্রভৃতি নিয়ে মত্ত হ'য়ে উঠল। শেষ-পর্যন্ত সে এক অভূতপূর্ব সন্ন্যাস নিয়েছিল। সমতটের উপান্ত প্রদেশে আদিবাসী জালিকদের বাস ছিল। ভামহ সেই জালিকদের মধ্যে গিয়ে বাস করত। দীর্ঘকাল নিজের অভিজাত কুলের ভয়ে বিহ্বল এবং জালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ইচ্ছামতো নারী সংগ্রহ ক'রে আর তাদের তৈরী মদ্যপান ক'রে কাটানোর পর তার পরিবর্তন এল। পরিবর্তনটা সকলের চোখে ধরা পড়ল যখন সে বৃদ্ধ হয়েছে। সে তখন অভ্যাসে ও কার্যক্রমে পুরোপুরি জালিক হ'য়ে গেছে। শুধু তার বিদগ্ধ মনে অজ্ঞাত ও অভূতপূর্বকে গ্রহণ করার সাহস তখনও ছিল। বৃদ্ধ ভামহর জালিক স্ত্রী, তার গর্ভজাত সন্তান ও সমুদ্র সৈকতে তার কুটীর যেমন অখ্যাতি লাভ করল, তেমন প্রসিদ্ধি পেল তার টাক মাথা এবং বুক ঢাকা সাদা দাড়ি। জালিকদের নৌকায়, জলের কিনারে কিনারে শান্ত সৌম্য হাস্যময় ভামহকে জাল ফেলে দৈনন্দিন আহার্য সংগ্রহ করতে অনেকেই দেখেছে। জালিকদের কাছে মৃত্যুর পরে সে ভামহদেব। তার প্রভাবেই একপুরুষে অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় জালিকরা এগিয়ে গেছে। সমতটে এমন কোন জাহাজ নেই যাতে দাঁড়ি মাঝি কাণ্ডারী হিসাবে একাধিক জালিক নেই। তাদের অবস্থা ফিরেছে। তাদের মধ্যে দু'একজন সমুদ্রের কূলে কূলে অদূরবর্তী অন্যান্য রাজ্যে ছোটবড় নৌকা নিয়ে বাণিজ্য করে। কিছু কিছু ভালো ঘরদোর তুলেছে তারা। জালিক পল্লী ধীরে ধীরে সমতটের একটি উপনগরী হওয়ার দিকে লক্ষ্য ক'রে বাড়ছে।

ভামহর জালিক সন্তান ভৌমদেব। বর্তমানে তার বয়স কিঞ্চিত অধিক চল্লিশ বৎসর। তার শিক্ষাদীক্ষার ভার ভামহ স্বহস্তে গ্রহণ করেছিল কাজেই একটু একপেশে ধরনের হয়েছে। সঙ্গীত ও কাব্যকলায় দখল হয়েছে ভৌমদেবের। সে সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং বাংলা কাব্যগ্রন্থ থেকে অনর্গল আবৃত্তি করতে পারে, কলাপ-ব্যাকরণ কিছু কিঞ্চিত জানে; দর্শন সম্বন্ধে তার জ্ঞান ভামহদেবের নানা সময়ের নানা উক্তির যোগফল। কিন্তু সে শৈব অর্থাৎ এ বিষয়ে তার পিতার ধর্ম গ্রহণ করেছে। এবং শিবের জালিক মূর্তি কল্পনা ক'রে সে কিছু কিছু ছড়া ও গানও বেঁধে দিয়েছে। অভিমন্যুর শস্ত্রজ্ঞানের মতো ভৌমদেবেরও বাণিজ্যজ্ঞান হয়েছিল। তারই ফলে সে জালিক বৃত্তি ত্যাগ না করেও বণিকবৃত্তিও কিছু কিছু গ্রহণ করেছে। তার দু'খানা বড় নৌকা আছে। সমতটের বড় দোকানীদের কাছে সে বাকিতেও মাল পায়, সমুদ্র তীরবর্তী কলিঙ্গদেশের গ্রামে অন্ধ্র দেশের কোন কোন ছোট সহরে সে বাণিজ্য করতে যায়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সে সাধারণ দিশি-বাঙালির চাইতে অধিকতর বাঙালি ছিল। ভামহর পুত্র বলে অভিজাত বণিকরাও তার সঙ্গে কিছু ভদ্রভাবে কথা বলত। অবশ্য ভৌমদেব জাতীগত সীমান্তের অরক্ষিত স্থানগুলিতে অত্যন্ত হুঁসিয়ার হ'য়ে চলা ফেরা করত।

চাঁদের ক্রীতদাসী মল্লি যখন শূরসেনের ক্রীতদাসী ছিল তখন থেকেই ভৌমদেবের সঙ্গে তার জানা শোনা ছিল। সে ভৌমদেবের অতীত কাহিনী জানত। এবং তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল ভৌমদেব পিতৃরক্তর দিক দিয়ে শূরসেনের মতোই অভিজাত। ইন্দ্রদত্তর পুত্র ইন্দুধব অবশ্য পুরোপুরি বাঙালি। কিন্তু মল্লি ইন্দুধবর প্রণয় থেকে বুঝতে পেরেছে আর যাই হ'ক ওদন্তসেনের পৌত্রী মধুবালার সমকক্ষ ব'লে ইন্দুধব তাকে মনে করে না। রূপের দিক দিয়ে সে মধুবালার তুল্য হ'লেও বেশভূষা, রূপচর্চা, নায়িকাসুলভ অন্যান্য অনুশীলিত বৈদগ্ধিতে সে মধুবালার অনেক পিছনে। ভৌমদেব অবিবাহিত। গত তিন চার মাসে ভৌমদেবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হয়েছে। বাজারে ভৌমদেবের একটি

ছোট দোকান আছে। চাঁদের বাড়ীতে আসবার পর সনকা এই অকেজো হৃদয়সর্বস্ব ক্রীতদাসীটিকে লঘু কাজ হিসাবে বাজার থেকে টুকিটাকি কিনবার জন্য নিযুক্ত করেছে। মল্লিও সুযোগ পাওয়া মাত্র ভোমদেবের দোকানে গিয়ে কেনাকাটার ছলে কিছুকাল তার সংগে আলাপ ক'রে আসে। সনকার ব্যক্তিগত ক্রীতদাসীর সংখ্যা অনেক কাজেই কে কোথায় কি ছলে দেরী করছে তা' সব সময়ে তার নজরে পড়ত না, পড়লেও সে ভ্রূক্ষেপ ক'রত না।

ভোমদেব চল্লিশ বৎসর বয়সে মল্লির প্রেমে প'ড়ল। পঁচিশ বছরের এই পূর্ব-প্রণয় অভিজ্ঞা ক্রীতদাসীর ব্যবহারে এমন একটি পরিমিতি ছিল, তার ভাষায় এমন একটি রুক্ষ্ম মাধুর্য ছিল যে তার বাঙালির অনুকরণে রূপচর্চা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম ব'লে মনে হ'ল না। ভোমদেবের জননী এ বিবাহে উৎসাহিত হ'ল। বিবাহটা অতিগোপনে সর্পমন্ত্রোচ্চারণ ক'রে হ'য়ে গেল।

এরপর ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করতে হবে। মল্লি সনকাকে সন্তুষ্ট ক'রে ভোমদেবের বাড়ীতে বাস করার অনুমতি চেয়ে নেবে যদি তা সম্ভব হয় নতুবা সারাজীবন গোপনে অনির্দিষ্ট সময়ে কিছুকালের জন্য স্বামীর সংগে মিলিত হওয়ার সন্দেহজনক সৌভাগ্যকে মেনে নিতে হবে। অধিকাংশ ক্রীতদাসীকে প্রভুজাতির জঘন্য লালসা কিম্বা তার চাইতে ভয়ংকর খোজা ক্রীতদাসদের বিভৎস নিবৃত্তিহীন পশু প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। মুক্তির উপায়ও আছে : বন্ধ্যা লোলচর্মা ক্রীতদাসী এবং পংগু-প্রায় দাস বিক্রয়ের একটি বাজার আছে; আজ থেকে ত্রিশ বছর পরে ভোমদেব সেই বাজারে চাঁদের পুত্র কিম্বা অন্যকোন উত্তরাধিকারীর কাছে থেকে মল্লিকে কিনে নিতে পারে। এই আশায় বুক বেঁধে চলতে হবে। ত্রিশ বছর ধ'রে এই আশাকে মরু-উষর আবহাওয়ায় নবাংকুরের মতো প্রাণময় ক'রে রাখতে হবে। কিন্তু শুধু বন্ধনদশাই তো নয়। নিরুপদ্রব বন্ধনদশা তবুতো সৌভাগ্যের বিষয়। এই দেহটাকে প্রয়োজন মতো অন্তর্হিত করা যায় না। সেটা প্রভুজাতির পুরুষ-প্রবৃত্তি এবং ক্রীতদাসদের লালসার দৃষ্টিতে ধরা পড়বে। প্রতিটি দিন রাত্রি চারিদিকে সেই কামনার তরংগাবিক্ষোভ জাগাবার সম্ভাবনা আছে। ত্রিশটি বছর ধ'রে কৌশলমাত্র সহায় ক'রে এই দেহকে সন্তানের জন্য পবিত্র রাখতে হবে। বণিকরা অজ্ঞাত মৃত্যুবিকীর্ণ সমুদ্রে নৌবহর নিয়ে যে সাহসের পরিচয় দেয় মল্লির পক্ষে এও যেন তেমনি কোন সাহসে নির্ভর ক'রে অগ্রসর হওয়া।

ভোমদেব বলেছিল,—মল্লি, সে রকম যদি কিছু ঘটে তুমি তবু আমার কাছে আত্মগোপন ক'র না। আমার সন্তানরা তার জন্য তোমাকে অসম্মান করবে না।

মল্লির মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। সে বলল,—তুমি পুণ্যাত্মা ভামহদেবের সন্তান। আমাকে আশীর্বাদ করো। তোমরা পুণ্য আমাকে বর্মের মতো ঘিরে রাখুক।

মল্লি অতঃপর হাসিমুখে চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিল,—সমুদ্রে নাবিকের মৃত্যু হ'লে তার জন্যে দুঃখ করতে নেই। শুধু যদি মনে রাখ সেই মৃত্যু-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

ভোমদেব ক্রীতদাসী মল্লির জন্য একটি বাড়ী তৈরী করবে স্থির করল। প্রথমে সে জালিক পল্লীতে তার নিজের বাড়ীটাকেই নতুন ক'রে গড়বে স্থির করেছিল কিন্তু পরে সে বুঝতে পেরেছিল সে বাড়ীতে মল্লি সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার জন্যও যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। বাজারে তার দোকানের কাছে এক মন্দভাগ্য বণিকের পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ী ছিল। দু'একবার আলাপ ক'রে ভোমদেব তাকে জমিটুকু হস্তান্তরে রাজি করেছিল। জমি দখল নিয়ে

ভোমদেব যখন একটা ছোট নতুন বাড়ী তুলবার জন্য পুরনো বাড়ীটা ভাঙতে সুরু করল তখন গোলমাল সুরু হ'ল। বাজারে আরও আদিবাসী এবং দিশি-বাঙালির দোকান ছিল। কিন্তু সে সব দোকানই কোন না-কোন বণিকের ঘর ভাড়া ক'রে। আদিবাসী এবং দিশি-বাঙালিরা অবাক হ'য়ে ভোমদেবের এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এবং এই ব্যাপার নিয়ে একথা আবার রাষ্ট্র হ'ল যে শূরসেন এবং ভোমদেবের শিরায় একই রক্তের ধারা প্রবাহিত। কথাটা শূরসেনের কানেও গেল এবং একদিন সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে রথ থামিয়ে সে ভোমদেবকে ডেকে পাঠাল।

—এখানে শুনছি তোমার বাড়ী হবে।

—আপনি অগ্রজতুল্য আশীর্বাদ করুন।

শূরসেনের একটা রসিকতা করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু উভয়ের রক্ত-সামান্য নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে সেটা তার মনে তিড়বিড় ক'রে উঠল ঐ অগ্রজতুল্য কথায়। সে বিদগ্ধভাষায় এমন কতগুলি ইঙ্গিত করল যে ভোমদেব না হ'য়ে অন্য কোন বণিক হলে সে নিশ্চয়ই তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করত। ভোমদেব স্থির হ'য়ে বলল,—দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম।

—আর তোমার বুঝি পৌরুষ। ঘোড়ার চাবুকের দরকার আছে?

ভোমদেবের মুখ অপমানে রক্তহীন হয়ে গেল কিন্তু মল্লির স্বার্থের জন্যই সে শত্রুতা থেকে দূরে থাকতে চাইল। বলল,—আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনাদের বংশের কাছে আমি আমার রক্তের জন্য ঋণী একথাই বলতে চেয়েছিলাম।

শূরসেন ছাড়া অন্য কোন বণিক কি করত বলা যায় না। শূরসেন স্বভাবতই ক্রোধী নয়। তা ছাড়া একজন আদিবাসীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে এ-রকম ব্যাপারটা তার রুচিতে বাধ-বাধ লাগল। সর্বোপরি একথা সত্য ভামহপুত্র ভোমদেব আর সাধারণ একজন আদিবাসী এক নয়। ব্যাপারটা মিটে যাক এই ভেবে শূরসেন রথাশ্বকে ইঙ্গিত করার জন্য বল্গায় মৃদু টান দিল কিন্তু রথ নড়ল না। ভোমদেবের সঙ্গে তার আলাপের সূত্রপাতেই পথচারীরা রথ ঘিরে কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারা কখন একত্রিত হয়ে পথরোধ করার মতো ঘন সন্নিবিষ্ট হয়েছে শূরসেন দেখতে পায় নি। এই অভূতপূর্ব এবং সমতটে প্রায় অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখে সে বিস্মিত হ'ল। মুহূর্তের জন্য তার মুখ বিবর্ণপ্রায় হ'ল। তারপর সে বলল,—রথের পথ ছাড়।

বাড়ীতে পৌঁছেও সে শান্তি পেল না। এটা এমন একটা ব্যাপার যা অন্য কাউকে বলা যায় না; এমনকি বণিকতনয়া গরবিনী দময়ন্তীকে বললে সেও বিদ্রূপ করবে। শূরসেন নিজের প্রাসাদের মর্মর প্রকোষ্ঠগুলিতে শীতলতা খুঁজতে লাগল। কিন্তু ক্রীতদাসদের মুখে এবং বাজারের আলোচনা থেকে সংবাদটা প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হ'য়ে গেল। কয়েকজন বণিক শূরসেনের কাছে খবর নিতে এল। নিজের অপমানকে লুকিয়ে রাখার জন্য সেও ও কিছু নয় ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কতকটা তার অপমানকে আলোচনা করার সুযোগ নেওয়ার জন্য, কতকটা আদিবাসীদের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হ'য়ে বণিক সমাজ একটা আন্দোলন সৃষ্টি করল। তখনই মুস্কিল হ'ল শেখরসেনের। আইনের বিধানে এবং তাদের অনুসিদ্ধান্তগুলিতে এমন কিছু সে পেল না যাতে ভোমদেবকে শাস্তি দেওয়া যায় অথচ এক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়াই প্রয়োজন। এইখানে তার বিবেক নানা সূক্ষ্ম মোচড় নিতে লাগল। ঘটনাটিকে নানাভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে, প্রতিটি কথাকে ওজন ক'রে, তাদের বিভিন্ন সূক্ষ্ম অর্থ নির্ধারণ ক'রে, ক্রিয়াপদ ও বিশেষণের বিশেষ তাৎপর্যগুলি প্রয়োজন মতো একত্র

করেও বিবেককে নিশ্চিন্ত করতে পারল না সে। তখন সে বণিক সভা আহ্বান ক'রে বসল।

অবশেষে সভা বসল। চাঁদ, মণিভদ্র, বজ্রদন্ত প্রভৃতি বণিকরা এল, অষ্টবসু ব'লে প্রখ্যাত বংশগুলির সাতজন প্রতিভূ এল। যে সব বণিকরা ঔদ্ধত্যের সরাসরি বিচার করতে চেয়েছিল তারাও কিছুটা কৌতূহল ও শেখরসেনের প্রভাব সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত বিস্ময়বোধ নিয়ে উপস্থিত হ'ল। সভার সূচনায় শেখরসেন বারংবার ঘোষণা করল,—আইনের চোখে সকলেই সমান এবং আমাদের এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হবে না যাতে আমাদের বংশধররা আমাদের কাজে পক্ষপাতদুষ্টতা খুঁজে পায়।

চাঁদ কিছুকাল দ্বিধা এবং সংকোচের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে কথা বলল। উভয় পক্ষকে যাতে সন্তুষ্ট করা যায় এমন একটি প্রস্তাব আনার চেষ্টা থেকে সে বলল : বন্ধুগণ, বিশ বৎসর আগে যা সত্য ছিল এখন তা সত্য থাকতে পারে না। সত্যের পরিবর্তন হয়। তখন এমন একটা পরিস্থিতি ছিল যে আমাদের পূর্বগ বিচক্ষণ বণিকরা আশংকা করেছিলেন—আদিবাসী জনসংখ্যার চাপে আমরা এ দেশে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাব। এখন তেমন অবস্থা নেই। এ অবস্থায় আদিবাসীদের কোন মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার আইনকে আমি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর কিছু ব'লে মনে করি। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না আমাদের রুচি সংস্কৃতি রীতিনীতির শুচিতা রক্ষা করা এবং সেটাকে অমিশ্র অবস্থায় আমাদের উত্তরাধিকারীদের হাতে দিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। কৃষ্টি পরম্পরাগত ন্যস্তধন। আমাদের এমন ব্যবস্থা করা উচিত যার ফলে এদেশের আদিবাসীদের ক্রমশ উন্নতি হয়। এটা যেমন আমাদের দেশ, তেমনি তাদেরও দেশ। কাজেই তাদের মধ্যে যারা উপযুক্ত তারা সমতটে যথোপযুক্ত অধিকার পাবে। আমাদের ধর্ম, আমাদের নীতি, আমাদের শিল্প সাহিত্য, আমাদের রুচিকে যারা গ্রহণ করবে তারা আমাদের সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। আমার এই প্রস্তাবের অংশ হিসাবে এবং এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য একটি সংস্থা গঠন করতে হবে। এই সংস্থা আদিবাসীদের আবেদন বিচার করে সমতটে স্বাধীনভাবে বাস করার পক্ষে তাদের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে। কিছুকাল সভা নীরবে প্রস্তাবটি বিবেচনা করল।

শূরসেন চিন্তা করছিল ভোমদেব তাকে যে অপমান করেছে তার প্রতিবিধান করার জনাই এই সভা। প্রতিবিধানটি চিরস্থায়ী করার অন্য অর্থ অপমানকে চিরস্থায়ী করা। এখন থেকে দু'তিন পুরুষ পরে যদি কোনো অন্যায় আইন চলে লোকে ভোমদেব এবং তার ব্যাপারটা মনে রাখবে। ভোমদেব যদি কোন বণিক হ'ত তবে অবশ্য প্রতিবিধানের দৃঢ়তা ও কার্যকারিতাই মুখ্য ব'লে মানা যেত। কিন্তু হীনবল ভোমদেবকে শাসন করতে গিয়ে বণিক সম্প্রদায় যেন তার অপমানকেই মুখ্য ক'রে তুলেছে।

সে বলল,—আমি চাঁদের প্রস্তাব সমর্থন করি। আমার ধারণা চাঁদের প্রস্তাবই একমাত্র বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা। আদিবাসীরা নিশ্চিহ্ন হবে না। কারণ তাদের মৃত্যুর হার আমাদের দ্বিগুণ হলেও তাদের জন্মের হার আমাদের তিনগুণ। তাছাড়া এদেশে তাদের একাধিকার যেমন আমরা স্বীকার করি না, তেমনি তাদের অনধিকারও মানি না। আর আমাদের আলোচনায় যেন ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রবেশ না করে। ভোমদেব আমাকে যদি অগ্রজ ব'লে থাকে তবে অগ্রজের শাসনও সে মেনে নিয়েছে। আমি মনে করি চাঁদের প্রস্তাব অনুসারে ভোমদেবকেই প্রথম সমতটে বাড়ী তুলবার অধিকার দেওয়া যেতে পারে। চাঁদের যৌথিক কারবারের বণিকরা শূরসেনকে সমর্থন করল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আলাপ আলোচনার পর চাঁদের প্রস্তাব মূলত ঠিক রেখে কিছু কিছু

পরিবর্তন ও সংযোজন ক'রে মতাধিক্যে গৃহীত হ'ল। সমতটের ইতিহাসে ক্রমোন্নয়ন মতবাদ এইভাবেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল।

শূরসেন ও চাঁদের রথ পাশাপাশি মৃদুগতিতে যাচ্ছিল। চাঁদ তাকে আমন্ত্রণ করল। ব্যবসা সংক্রান্ত কতগুলি আলোচনা করার ছিল। এই ঘটনার পর মাল্লা ও অন্যান্য জাহাজী কর্মচারীদের নিয়োগের ব্যাপার একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়েছে। নিজের রথকে বিদায় দিয়ে শূরসেন চাঁদের রথে উঠে চাঁদের বাড়ীর দিকে গেল।

শূরসেন বলল,—সেকালের মুনিঋষীদের মতো আমার একটি দার্শনিক তথ্য ঘোষণা করতে ইচ্ছা হ'চ্ছে চাঁদ।

চাঁদ বলল,—মাথার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করছে, বোধ হয় বিড় বিড়ও করছে একটা কিছু।

—না, না। তা হ'লেও শোন। তোমার ক্রমোন্নয়ন মতবাদ আমাকে মানুষ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান দিয়েছে।

বাড়ীতে ফিরে চাঁদ বলল,—সনকাকে ডাকি। সে কিছু আহার্যের ব্যবস্থা করুক, কি বলো।

—কিছু লঘুপাচ্য আহার ও সাদা ও অত্যন্ত তীব্র কিছু সুরা।

—শূল্যপক্ক সারস কিম্বা তিতির?

—মন্দ নয়। অসুবিধায় হরিণ হ'লেও আপত্তি করব না।

—তা হ'লে তোমার ক্ষুধাটা তীব্র হয়েছে বলতে হবে।

কিন্তু চাঁদের আহ্বানে দাসী যাকে ডেকে আনল সে দময়ন্তী। দময়ন্তী এসে বলল, —যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। দু'জনে পরামর্শ ক'রে কোথাও গিয়েছিলে নিশ্চয়। সারাদিনের পর এখন ক্ষুধার তাড়নায় বোধ হয় বাড়ীর কথা মনে হয়েছে।

—স্বাস্থ্যবান পুরুষদের সংসারের উপরে একমাত্র আকর্ষণ যে আহার্য এ যদি তুমি বুঝতে পেরে থাক তবে আমি তোমাকে চাঁদের উপযুক্ত মনস্বিনী মনে করব, বলল শূরসেন।

—তা মনে করো আর না-করো সারাদিন যদি এ পথে না এসে চ'লে থাকে তোমাদের বাকি রাতটাও চলবে। এখন দু'জনে গাত্রোত্থান ক'রে বিদায় হও। চেষ্টা ক'রে দেখগে আমার রান্না ঘরে কিছু জোটে কিনা।

দময়ন্তীর রান্নাঘরে ক্রীতদাসীরা রান্না করছিল। ধরাচূড়া সমেত দুইজন বণিককে সেই ঘরে ঢুকতে দেখে তারা বিভ্রান্ত এবং ভীত হ'য়ে উঠল। একজনের হাত থেকে একটা বাটি ঝন্ ঝন্ ক'রে পড়ে গেল। ঘৃতপক্ক মসলা-ম'ম' ঝোল ছিটে উঠল। এই মরেছে ব'লে শূরসেন পিছিয়ে গেল। ক্রীতদাসীরা প্রভুজাতীর এই দু'জন ধুরন্ধর পুরুষকে দেখে চিলের ছোঁএর সামনে থেকে হাঁসের মতো সশব্দে পলায়ন করল।

চাঁদ বলল,—কি আপদ!

দুই বন্ধু অতঃপর খাদ্য অন্বেষণে এদিক ওদিক ঢুঁড়ল। একটা বড় পাত্রে মসলা-সুগন্ধি ও জাফরান রঙানো ময়দা গোলা ছিল বোধ হয় পোড় হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। শূরসেন তাকে ঝোল মনে ক'রে একটা চুমুক দিয়ে মন্তব্য করল—আজকাল ক্রীতদাসীরা, বুঝলে চাঁদ, অত্যন্ত অকেজো হচ্ছে। ঝোলে একেবারেই লবন দেয়নি। খেয়ে দেখো। চাঁদ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়েছিল। সে বেশ খানিকটা চুমুক দিয়ে নিয়ে বলল,—আর সবই ভালো।

কিন্তু অন্য আহার্য সম্বন্ধে অজ্ঞ হ'লেও যেখানে মৃদু আঁচে গুটি কয়েক তিতির শূল্যপক্ক হ'চ্ছিল সুগন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে তারা সেদিকে গেল। এবং শূলে ঝলসানো পাখীর

গলা গরম চর্বিতে হাত পুড়িয়ে গুটি দুতিন আধভাজা আধপোড়া পাখী সংগ্রহ ক'রে নিয়ে বসবার ঘরে ফিরে গেল। ততক্ষণে ক্রীতদাসীরা সম্বিত পেয়েছে। তারা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল এবং দময়ন্তী প্রভুর পরিচর্যা করার যে হুকুম দিয়ে গেছে সেটা কিভাবে পালন করা যায় তা চিন্তা করছিল। কাজেই উৎকৃষ্টতর সুরার ভাণ্ডার থেকে কিছু সুরা সংগ্রহ করতেও তেমন বেগ পেতে হ'ল না। দুই বন্ধু আহার শেষ ক'রে সুরাপান করতে করতে গেণ্ডুয়া খেলাতে লেগে গেল।

নিজেদের নিয়ে এরকমভাবে ব্যস্ত না থাকলে পরিস্থিতিটা অবশ্যই তাদের কাছে কৌতুককর মনে হ'ত। কারণ এটা যদি দময়ন্তীর একটা ছলনা মাত্র হ'য়ে থাকে তবে এতক্ষণ ওর এবং সনকার আসা উচিত ছিল। অবশ্য সময় সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানও খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না তখন। এক হাতে সুরাপাত্র অন্য হাতে গেণ্ডু নিয়ে হাঁটু পেতে বসে যখন তাক্ ক'রে নানা কোণ থেকে লক্ষ্যে আঘাত করার চেষ্টায় তারা দময়ন্তীদের কথা বিস্মৃত হয়েছে তখন একজন ক্রীতদাসী এল।

-কি বললে? ব'লে গেণ্ডু নিয়ে শূরসেন আবার লক্ষ্যর দিকে নজর দিল।

প্রভুদের সম্মুখে মাটির দিকে চোখ রেখে যে ভাবে কথা বলা উচিত তেমনি একটানা স্বরে ক্রীতদাসী বারবার একই কথা বলতে লাগল।

চাঁদ বললে, স'রে পড় বাছা। রাত্রিতে আমরা আর কিছু খাব না। বরং দুটো বালিশ আর গালিচায় পাতবার একটা জাজিম-টাজিম রেখে যেয়ো। ক্রীতদাসী তার বক্তব্য আবার পেশ করল।

এবার কথাটা শূরসেনের কানে গেল। সে বলল,—যা। তা কি ক'রে সম্ভব? এখনও কাল পূর্ণ হয়নি।

—আজ্ঞে, দময়ন্তী মা আপনাদের খবর দিতে বললেন, ক্রীতদাসী বলল।

—শুনছ চাঁদ। ওদের খেলাটা এবার বুঝলে? সনকার নাকি একটা মেয়ে হয়েছে।

—দময়ন্তীটা দিনকে দিন বোকা হচ্ছে। এর চাইতে ভালো আর কি উদ্ভাবন করবে।

ক্রীতদাসী বলল, —আজ্ঞে অকালেই হয়েছে।

—সত্যি?

—সত্যি।

তখন চাঁদ গলা থেকে এক ছড়া মুক্তার হার খুলে দাসীকে দিল। শূরসেন হীরক বসানো একটি অঙ্গদ খুলে দিল নিজের হাত থেকে।

তারপর দুই বন্ধু পরস্পরের বাহুতে বাহু আবদ্ধ করে একটু যেন অসমান পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরুল। শূরসেন হাঁক দিয়ে বলল,—দু'জন সারথি চাই।

—দু'জন কি হবে?

—অধিকন্তু ন দোষায়।

—তা বটে।

চাঁদের বাড়ীতে পরদিন চাঁদ এবং শূর ঘুম ভাঙতেই দময়ন্তীর হাসিমুখ দেখতে পেল। একটা স্নিগ্ধ আনন্দে সে ভরপুর। সে বলল,—মা ও মেয়ে ভালোই আছে। কাল সারা রাত কি ভয়েই গেছে।

—তা আমাদের জানালেও হ'ত, চাঁদ বলল।

শূরসেন বলল,—তা উচিত ছিল বৈকি।

দময়ন্তী হেসে বলল,—এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি। তোমরাও চল। কাল বোধ হয় শূকনো কিছু পেটে যায়নি।

চাঁদ বলল,—কি বলে শোন, শূর!

তারপর চাঁদ খোঁজ করল কোন ক্রীতদাসী খবর নিয়ে গিয়েছিল। অনেক মিথ্যা দাবীর জটিলতা থেকে মল্লির দাবীই সত্য ব'লে প্রমাণিত হ'ল। চাঁদ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, —তা বেশ। দময়ন্তী, মল্লিকে আমি মুক্তি দিলাম। কি বলো?

—সেটা এক্ষেত্রে উপযুক্ত হবে।

চাঁদ সনকাকে দেখবার জন্য, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য পাগল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু ভিষক্ ও অন্যান্য গ্রাম্ভারি মতামত তাকে সনকার কাছে থেকে দূরে রাখল। ক্রীতদাসীদের কাছে সে খবর নিতে নিতে সাতদিনের মধ্যে সনকাকে না দেখবার যে প্রথা আছে তা' গোপনে লঙ্ঘন করা যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণা করতে লাগল।

বাড়ীতে ফিরে চাঁদ ও শূরসেনের আহারাদির ব্যবস্থা নিয়ে দময়ন্তী ব্যস্ত ছিল। চাঁদ আহার শেষে স্বগৃহে ফিরলে দময়ন্তী শূরসেন যেখানে বিশ্রাম করছিল সেখানে এল। শূরসেনের আহার শেষ হ'লে দময়ন্তী সকালে স্নান ক'রে যে কাপড়ে রান্না ঘরে গিয়েছিল সেটা ছাড়ে, খোপায় বাঁধা ভিজে চুল খুলে দেয়, হাত মুখ ধুয়ে কিছুকাল বিশ্রাম ক'রে তার পরে নিজের আহারের ব্যবস্থা করে। এখন সে শূরসেনের সামনে দাঁড়িয়ে খোপা খোলা চুল আঙুল দিয়ে ছড়িয়ে দিতে দিতে সনকার কথা বলছিল। কষ্ট খুব বেশী হয়নি কিন্তু অকালে ব'লে এবং সেই রথ চালানোর ফলে দুর্বল ব'লে একটু ভয় ছিল, এখনও সেটা কাটেনি। তার নিজের সন্তানদের কথা মনে পড়ল। এবং শূরসেনকে ঠেলেঠুলে তাদের দেখবার জন্য তাদের মামা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে সে খেতে গেল।

মুক্তির ঘোষণাটা শুনবার পর থেকে মল্লি সনকার প্রতি একটি অনাস্বাদিতপূর্ব শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অনুভব করছিল। তার মনে হ'ল মুক্তি পেয়েছে বটে কিন্তু সনকা সম্পূর্ণ সুস্থ না হ'লে সে স'রে আসতে পারে না। তবে এরই মধ্যে সে একবার ভৌমদেবের কাছে গিয়ে খবরটা দিয়ে এসেছে। খবর দেওয়ার সময়ে সে অনেক কথা বলবে ভেবেছিল কিন্তু সে এবং ভৌমদেব তার দোকানের পিছনের একটা নির্জন অংশে দু'জন দু'জনের করস্পর্শ ক'রে দাঁড়িয়ে নীরবে কাঁদতে লাগল।

ভৌমদেব ভাবল এমন মহান এবং উদার ব'লেই স্বয়ম্ভু মহাদেব এদের হাতেই দেশ শাসনের ভার দিয়েছেন। এই বণিকজাতী নিঃসন্দেহে মহত্তর মানবগোষ্ঠী। সে ইতিমধ্যে ক্রমোন্নয়ন মতবাদও শুনতে পেয়েছিল।

মল্লি পূর্বপুরুষদের সর্পদেবতাকে মনে মনে অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে সনকাকে সেবা করার জন্য ফিরে গেল। মনে মনে সে মানত করল সনকা যেদিন সুস্থ হ'য়ে উঠে বসবে সেদিন সে সর্পদেবতার পূজার ব্যবস্থা করবে। অন্য কারো জন্য সর্পদেবতাকে সে তেমন ক'রে ডাকেনি আজ যেমন ক'রে সে সনকার জন্য ডাকল।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

সমালোচনার পদ্ধতি

প্রতীক-বিচারী সমালোচনা

অমলেন্দু বসু

প্রতীক বলতে আমরা কি বুঝব? নানা ঐতিহাসিক কারণে প্রতীক শব্দটি এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংজ্ঞায় প্রযুক্ত হয়েছে, শব্দটির সর্বজনসম্মত সংজ্ঞার্থের এমন অভাব ঘটেছে, আর সর্বোপরি, আধুনিক দর্শনে প্রতীকতত্ত্বের সীমানা এতই দ্রুত বেড়ে চলেছে যে প্রতীক-বিচারী সাহিত্যালোচকের পথ আজ ফলতঃ অত্যন্ত পিচ্ছিল ও বিঘ্নসংকুল। উনিশ শতকে যখন এক ফরাসী লেখক-গোষ্ঠী প্রতীকবাদী বলে পরিচিত হতে লাগলেন, যে কাল থেকে প্রতীক প্রয়োগ সাহিত্যশিল্পীর শ্রদ্ধেয় রীতি হিসাবে মানা গেল, তখন সাধারণ্যে প্রতীক শব্দটির যে সংজ্ঞা প্রচলিত ও গ্রাহ্য ছিল আজকাল ঠিক সে-সংজ্ঞায় নির্ভরশীল সাহিত্যালোচনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কেননা বিশ শতকে দেখা গিয়েছে যে প্রতীক প্রয়োগ সাহিত্যে ও শিল্পকলায় সীমাবদ্ধ নেই, গণিতে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে, সামাজিক প্রথায়, ধর্মাচরণে ও অধ্যাত্মবিদ্যায়, জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব দৃশ্যমান। দু'চারজন দর্শনবিৎ এমনও বলেছেন যে মানুষের যাবতীয় আত্মপ্রকাশ মাত্রেই মূলতঃ প্রতীকপন্থী।

প্রতীকতত্ত্বের যত বিভিন্ন ব্যাখ্যা হয়েছে কাণ্ট থেকে ওয়াইটহেড ও কাসিরের অবধি, সব ব্যাখ্যার সমন্বয় করতে গেলে সাহিত্যালোচক অচিরেই সাহিত্যের পথ ছেড়ে দর্শনের অনভ্যস্ত পথে গিয়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়বে। সে-সমন্বয়সাধন দর্শনবিদের কর্ম, সাহিত্যা-লোচকের নয়। যেহেতু এখন পর্যন্ত দর্শনবিদেরা প্রতীকতত্ত্বের কোনো সর্বজনসম্মত সংজ্ঞায় পৌঁছতে পারেননি, আর যেহেতু প্রতীকবিচারী সমালোচনা আধুনিক সাহিত্যালোচনায় অতীব সুফলসম্ভব পদ্ধতি, সেজন্য এ আলোচনায় আমরা সিম্বলিজ্‌ম্‌ বা প্রতীকতত্ত্বের সূক্ষ্ম তর্কগুলি এড়িয়ে কতকগুলি প্রশস্ত স্বীকৃতিতে আবদ্ধ থাকব, বিশেষত যে সব স্বীকৃতি খ্যাতনামা প্রতীকবিচারী সাহিত্যালোচকদের মধ্যে সহজে পাওয়া যায়।

তাছাড়া প্রতীকপন্থী সমালোচনা থেকে সংজ্ঞাবিভ্রম দূর করতে হ'লে প্রতীকতত্ত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, প্রতীকবিচারী সমালোচনার বৈশিষ্ট্য কি, তার সম্ভাবনা কতদূর—এ সব প্রশ্নের উত্তরই বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—সে কথায় পৌঁছবার পূর্বে আমাদের বোঝা দরকার সাহিত্যালোচনায় প্রতীক শব্দটি কোন্‌ সংজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হওয়া সংগত, আর এই সংগতিজ্ঞান আসবে যখন শব্দার্থটির ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অন্তত মোটামুটি ধারণা থাকবে।

·

যদিও প্রতীক প্রয়োগ ও প্রতীক সম্পর্কে ধারণা সমস্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতাতেই অল্পবিস্তর পাওয়া যায় তবুও সাহিত্যে প্রতীকপ্রয়োগ সংক্রান্ত উৎসুক্য আমাদের মধ্যে সম্প্রতি জেগেছে ইংরেজি (তথা ইয়োরোপীয়) সাহিত্যের মাধ্যমেই। ইংরেজি সিম্বল (symbol) শব্দটি—বস্তুত যে কোনো ইউরোপীয় ভাষার এতদর্থক শব্দটি (ফরাসী—symbole, জার্মান—symbol, ইতালীয়—simbolo, রুশ—simbol)—মূল গ্রীক শব্দ সুম্বোলোস্‌ (sumbolos) থেকে উদ্ভূত। গ্রীকেরা কোন্‌ অর্থে শব্দটির ব্যবহার করতেন?—কোনো দুটি বস্তুর আকস্মিক সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষণ, যার পরিণামে সন্ধি। সেকালে

দুদল বণিক (অথবা যে কোনো পক্ষ ও প্রতিপক্ষ) যখন অনেক দরদস্তুরের পরে একটা বোঝা-পড়ায় আসতেন, একটা চুক্তি অথবা শপথ অথবা নিয়ম মেনে নিতেন নিজেদের কাজকারবারের আগামী সুবিধার জন্য, তখন তাঁরা তামার পাত (অথবা তত্তুল্য কোন মজবুত উপাদান) দুটুকরো ক'রে একেক দল একেক টুকরো রাখতেন সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ। অতঃপর ভবিষ্যতে প্রয়োজন মতো টুকরোগুলিকে দেখিয়ে তাঁরা প্রীতির সম্পর্ক আবার ঝালিয়ে আবার নূতন করে ব্যবসা সম্পর্কে লিপ্ত হতেন। টুকরোগুলিকে বলা হত সুম্বোলোস্। ব্যাবিলনের ক্যারাভান পথে, আনাতোলিয়ার প্রস্তর বিষম বাঁকা রাস্তায়, অথবা ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপসঙ্কুল বাণিজ্য পথে, সাইর‍্যাকিউজ্, করিন্থ বা সালোনিকার ব্যস্ত বাজারে, যেখানেই অতঃপর এই বণিকদের সাক্ষাৎ হত, তাঁরা ব্যবহার করতেন তাঁদের নিদর্শনগুলিকে, পাথর বা তামার যে-টুকরোকে তাঁরা একদা অভিজ্ঞান ব'লে মেনে নিয়েছিলেন অনেক প্রারম্ভিক দরকষাকষির পরে, আজো সে-অভিজ্ঞানকে তাঁরা অবশ্যই মেনে নিতেন, তাঁদের কথার খেলাফ হত না। এ ভাবে সুম্বোলোস্ বা অভিজ্ঞান দ্রব্যটি মূল্যবান হ'য়ে উঠল কিন্তু এর মূল্য-প্রকৃতিতে র'য়ে গেল প্রচুর অসাধারণত্ব। দ্রব্যটির স্বকীয় মূল্যের সমতুল্য নয় এর অভিজ্ঞান-মূল্য। স্বকীয় মূল্যের উপরে তদতিরিক্ত কাল্পনিক মূল্য এতে আরোপ করা হয়েছে, আর এই কাল্পনিক আরোপিত মূল্যই এর অভিজ্ঞান মূল্য। দ্রব্যটির মামুলি বস্তুমূল্য উন্নীত হ'য়ে গেল পরাবস্তুমূল্যে। এই মূল্যান্তরের গোড়ায় যে ঘটনা ঘটেছে তা মনে রাখলে এর মূল্যপ্রকৃতির অসাধারণত্ব বোঝা যাবে। সব ব্যবসায়িক দরদস্তুর অসম্মতিতে সুরু হ'য়ে সাঙ্গ হয় সম্মতিতে, সুতরাং এহেন দরদস্তুর থেকে যে-অভিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে তার মূল্য-প্রকৃতিতে একটা সহজাত বৈপরীত্য থাকবেই, তার মূল্যপ্রকৃতিতে থাকবে, দ্বন্দ্বোদ্ভব মিলন, মিলন-পরিণামী বিরোধ।

প্রতীক শব্দটির পরবর্তী ইতিহাসে এর সংজ্ঞা আরো ব্যাপক হয়েছে, আরো গভীরতর পরাবস্তুমূল্য এতে আরোপিত হয়েছে। সুম্বোলোস্ প্রয়োগের এককালীন ব্যবসায়িক সূত্র হারিয়ে গেছে, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, দার্শনিক অর্থে বহু প্রয়োগের ফলে এর বাণিজ্যিক অভিধা আজ প্রায় বিস্মৃত, কিন্তু প্রতীকের আধুনিক মূল্যপ্রকৃতিতে এখনো এর আদিম বৈপরীত্য বর্তমান, অর্থাৎ, দ্বন্দ্বোদ্ভব মিলন, মিলন-পরিণামী বিরোধ। আমরা ক্রমশঃ দেখতে পাব যে সাহিত্যিক প্রতীকের মৌলধর্মে এই মিলন-পরিণামী বিরোধ বর্তমান।

ইতিহাসে দেখতে পাই প্রতীকের প্রকৃতি ক্রমশঃ সরতে লাগল তার আদিম প্রকৃতি থেকে। প্রাচীন গ্রীক বণিকেরা অভিজ্ঞান ব্যবহারের যে-রীতি চালু করলেন বাণিজ্য পন্থায়, ক্রমে সে-রীতি জীবনযাত্রার অন্যান্য ক্ষেত্রেও চলতে লাগল। কেবল বাণিজ্যে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রথায়, বিশেষত ধর্মাচরণে, নানা রকম অভিজ্ঞানের ব্যবহার হতে লাগল আর এই প্রয়োগ বিস্তৃতির ফলে প্রতীকের অভিধা বদলে গেল অনেক পরিমাণে। গোড়াতে সুম্বোলস্ ছিল একটা চুক্তির নিদর্শন, ক্রমে চুক্তির তাৎপর্য লোপ পেয়ে গেল, প্রধান হয়ে উঠল নিদর্শন বা চিহ্নসূচক অভিধা। এই নূতন অভিধা দ্রুত গতিতে বাড়ল খৃষ্টীয় ধর্মের প্রসারের সঙ্গে। খৃষ্টীয় ধর্ম প্রকাশ্যে আচরিত ধর্মের মর্যাদা সহজে লাভ করতে পারেনি। রোমে ত বটেই, এমন কি গ্রীসেরও অনেক অঞ্চলে খৃষ্টীয়ধর্ম বহুকাল পর্যন্ত ছিল গুপ্ত ধর্ম, খৃষ্টানের পক্ষে নিজকে খৃষ্টান ব'লে পরিচয় দেওয়া আদৌ নিরাপদ ছিল না। সুতরাং খৃষ্টানেরা নিজেদের মধ্যে গুপ্ত পরিচয়-সঙ্কেত ব্যবহার করতেন, আর এ-ভাবেই সুম্বোলোসের সঙ্কেতার্থ প্রধান হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু যেহেতু খৃষ্টানদের ধর্মাচরণ কেবল আচরণ-

সর্বস্ব ছিল না, তাদের আচরণের পশ্চাতে ছিল ভক্তি ও মননমিশ্রিত প্রচণ্ড তাত্ত্বিকতা, সে জন্য তাঁরা যে সব চিহ্ন ও সঙ্কেতের ব্যবহার করতে লাগলেন সেগুলি স্থূলবস্তু বা প্রথার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত রইল না, তারা নির্দেশ দিল বস্তুর অতীত নির্বস্তুক ধারণার। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। প্রাচীন খৃষ্টানেরা মৎস্য মূর্তিকে অতি পবিত্র ব'লে মানতেন কেননা গ্রীকভাষায় "যীশুখৃষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, মানবত্রাতা" এই কথার প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষরগুলি একত্র সাজালে যে শব্দটি তৈরি হয় তার মানে মৎস্য। মৎস্যচিহ্ন তা'হলে ধর্মাচরণের সঙ্কেত তো হ'লই, ধর্মমত ও তত্ত্বের প্রতীকও হয়ে উঠ্‌লো।

বস্তুতঃ ধর্মেই প্রতীকপন্থার সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ। প্রতীকতত্ত্বের গোড়ায় সর্বদেশে, সর্বচিন্তাশাস্ত্রে, ধর্মের অমেয় প্রভাব বর্তমান। প্রাগৈতিহাসিক কৌমগুলিতে প্রতীকের বহুব্যাপ্ত ব্যবহার প্রচলিত ছিল একথা অনুমান হয় এখনো যে সব আদিম সংস্কৃতি পৃথিবীতে টি'কে আছে তাদের নৃতাত্ত্বিক আলোচনায়। ভারতীয় আর্যরা অবশ্য প্রতীক-চেতন ছিলেন, তাঁদেরও পূর্বে ছিলেন অ্যাসেরিয়া ও মিসরের লোকেরা। প্রতীক প্রয়োগের যে-বিবর্তন খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টোত্তর গ্রীসে লক্ষ্য করা যায় তার অনুরূপ মিসরে, ইরাণে, সিন্ধুতীরেও ঘটে থাকবে কিন্তু সে-ঘটনার কোনো ইতিবৃত্ত মজুদ নেই। তবুও একথা বলা সম্ভব যে যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অল্পবিস্তর প্রতীকপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী যেহেতু ইন্দ্রিয়োত্তর চেতনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার সমস্যা, লোকোত্তরকে লোকায়তে বাঁধবার প্রয়াস, নির্বস্তুক তত্ত্বকে বস্তুনির্ভর ধারণাযোগ্য করার প্রশ্ন, সর্বপ্রথমে ধর্মাচরণেই দেখা দিয়েছিল, যাবতীয় আদি সংস্কৃতিগুলির ধর্মাচরণে। যখন থেকে ধর্মানুষ্ঠানে যুগপৎ অনুভূতি ও জ্ঞান, ভক্তি ও যুক্তি সংমিশ্রিত হল, প্রতীকের বিস্তর প্রসার তখন থেকেই। প্রাচীন যুগের স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়, সাহিত্যে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, প্রতীকের যে-অগণিত প্রয়োগ একেকটি সংস্কৃতিকে রূপৈশ্বর্যময় ক'রে তুলেছিল, আধুনিক সংস্কৃতিতেও তার কখনো সুপ্ত কখনো প্রকট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। স্বস্তিক চিহ্ন, পদ্ম, ধানের ছড়া, রথচক্র; রুটি ও সুরা, লিলি ফুল, স্থান ও উপলক্ষ বিশেষে কতকগুলি রঙের ব্যবহার (মৃতাশৌচ সূচনায় খৃষ্টানেরা কালো রঙ ব্যবহার করেন, হিন্দুরা সাদা রঙ); বাঙালী সধবার সিঁথেয় সিঁদুর হাতের নোয়া, গ্রীক চার্চে বিশ্বাসী খৃষ্টানদের আইকন্, ক্রীস্‌মাস্ উপলক্ষে ইংরেজদের মিস্‌ল্‌টো গাছের ডালপাতা সাজানো—এহেন অসংখ্য প্রতীক আজো ছড়িয়ে আছে সমাজ-জীবনে। মহাযানী কাব্যের ভাষা প্রতীকসর্বস্ব, বাউলের গান ও শ্যামাসংগীতও তাই। বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও স্থাপত্য, মধ্যযুগীয় খৃষ্টীয় চিত্রকলা প্রতীকপরায়ণ। সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতার দরুণ একই প্রতীকবস্তুর অর্থবহতা দেশে দেশে পৃথক হতে পারে। বাঙলা-ভাষায় "ঘুঘু" কথাটির প্রতীকার্থ গৌরবজনক নয় ("তুমি তো দেখছি কম ঘুঘু নও") অথচ খৃষ্টীয় সংস্কৃতিতে ঘুঘু পাখী শান্তির দূত, এমন কি পরমাত্মারও প্রতীক (দান্তে রোসেটির "ব্লেসেড ড্যামোজ্‌ল্" কবিতার 'মিস্‌টিক ডাভ্' উল্লেখনীয়)। পারিবেশিক বিভিন্নতা ও অভিধাগত পার্থক্য যেমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আবার নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় তুল্যার্থক প্রতীকও মেলে বড় কম নয়। হোলির আমোদ (অন্তত যেদিন অবধি এ-আমোদ উৎপীড়নে পর্যবসিত হয়নি) ও মে-মাসের উৎসব একই ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন, পশ্চিমের কাব্যে ও ভারতীয় কাব্যে উৎসব দুটি প্রায় সমার্থক। সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া অনেক বস্তু অনেক দৃশ্য আছে যে-বিষয়ে কাব্যানুভূতি পূর্বে ও পশ্চিমে সমতুল্য। দুটি বিখ্যাত কবিতার অংশ ধরা যাক :

When I behold, upon the night's starr'd face,
Huge cloudy symbols of a high romance.

অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা।

উদ্ধৃত অংশ দুটি সমান্তরাল নয়, সমতুল্য। নক্ষত্রের আবেদন দুই কবির কাছে দুরকম রূপকল্পে সংমূর্ত বটে কিন্তু যে-সৃজনী দৃষ্টির আশীর্বাদে বস্তুর রূপান্তর হয়ে যায় পরাবস্তুতে, যে-স্বংকেত সন্ধানী কল্পনায় নক্ষত্র শুধু আকাশের সৌরপিণ্ড হয়ে থাকে না, দূরপ্রসারী ধারণার ইশারা দেয়, সে-দৃষ্টি ও সে-কল্পনা উভয় কবিতেই সমতুল্য, সমগোত্রীয়।

আপাতত আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে সূম্বোলস্ কথাটির অভিধা-বিবর্তনে ধর্মানুষ্ঠানের ও ধর্মমতের অংশ প্রবল, আর এই প্রাবল্যের কারণ যে ধর্মবিৎ নিয়ত এমন বস্তু এমন আকার খুঁজে বার করার চেষ্টায় ছিলেন যার সাহায্যে পরাবস্তুর সংকেত পাওয়া যেতে পারে। ধর্মবিদের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীতের সমন্বয়, বাক্যের মধ্যে অনির্বচনীয়ের আকুতিলাভ, সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান। গোড়ায় প্রতীক ছিল নিদর্শনমাত্র, এখন প্রতীক হ'য়ে উঠল অব্যয় ধারণার ইঙ্গিতসম্পন্ন। অভিজ্ঞানের অন্তর্লীন তাৎপর্য সম্বন্ধে মানুষ কবে থেকে সচেতন হ'ল সঠিক বলা সম্ভব নয়—হয়তো ইতিহাসের সুরু থেকেই—কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খৃষ্টধর্মের প্রচণ্ড প্রয়োজনে ইয়োরোপীয় মানব নিদর্শনের শাদামাটা অর্থ পেরিয়ে পেঁছিলো প্রতীকের গভীর স্থরে। প্রতীকবস্তু এখন অপর যে-বস্তুর অভিজ্ঞান, যার ধারণাজ্ঞাপক, সে-বস্তু কেবল বস্তুময় নয়, ভাবঘনও বটে, প্রতীক-বস্তুর মাধ্যমে আমরা এক ভাবমণ্ডলে পেঁছিই, আর এ-ভাবমণ্ডলে যুগপৎ মনন ও অনুভাবন দুই-ই সক্রিয়।

প্রতীকবিচারী সাহিত্যালোচনায় প্রতীকে ও চিহ্নে, প্রতীকে ও সাধারণ বাক্‌কল্পে প্রভেদ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে নতুবা সমালোচক শিথিল অভিধার চোরাবালিতে আপনাকে তো হারাবেনই, তাঁর আলোচনার পদ্ধতিও যাবে হারিয়ে।

চিহ্ন বা সংকেত আমাদের চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে। গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, সামনে দেখলাম লালবাতি জ্বলছে, লালবাতির সংকেত হ'ল সোজা রাস্তা আপাতত বন্ধ, যতক্ষণ লালবাতি জ্বলছে এগিয়ো না। অথবা দেখলাম রাস্তার পাশে একটি ফলকে ধাবমান বালকের ছবি, এ-ও পথচারী নিয়ন্ত্রণের এক সংকেত। কাগজে কয়েকটি রেখা আঁকলাম, আকৃতিটা দাঁড়াল "ক" অর্থাৎ "ক" আকৃতির রেখাগুলি একটি বিশেষ ধ্বনির চিহ্ন। দুটি সংখ্যার মাঝখানে একেকবার একেকটি চিহ্ন আঁকলাম : ৯+৩, ৯−৩, ৯×৩, ৯÷৩, সংখ্যা দুটি পুনরাবৃত্ত হচ্ছে কিন্তু চিহ্ন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে। মন্দিরগৃহে গিয়ে দেখলাম প্রস্তর মূর্তির হাতের আঙ্গুলগুলি একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দেখানো হয়েছে, করমুদ্রার বিশিষ্ট চিহ্ন দেখে বুঝলাম এ মূর্তি অবলোকিতেশ্বরের। সাম্প্রতিক দর্শনবিদেরা পুনঃপুনঃ বলছেন যে এ-সব substitutional signs বা বদলা চিহ্ন কখনো প্রতীক পর্যায়ী নয় কেননা এসব চিহ্নে অনেকটা খামখেয়াল অনুসারে এক বস্তুতে অপর বস্তু বোঝানো হচ্ছে, উভয় বস্তুর কোনো গভীর আত্মিক সম্পর্ক নেই।

দর্শনবিদ্ আর্নস্ট্ কাসিরের বলেন যে যাবতীয় শব্দ প্রতীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুতে কিছু না কিছু কায়িক সাদৃশ্য থাকবে, অবশ্য যে-পরিমাণে আকার কল্পনাকে কায়িক মূর্তি দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব। একটি অপরটির নকল নয় কিন্তু একের মধ্যে অপরের আভাস মেলে। শিল্পকলার উপাদানে প্রভেদ থাকার দরুণ এই সাদৃশ্যের স্বরূপীকরণে প্রভেদ থেকে যাবে, অর্থাৎ একই মৌল সাদৃশ্যের ভাবনা চিত্রশিল্পীর উপাদানে যে-মূর্তি গ্রহণ করছে ভাষা-শিল্পীর অথবা ভাস্কর্য-শিল্পীর উপাদানে তা করছে না।

বলা যেতে পারে যে প্রতীক মাত্রেই এক রকমের চিহ্ন কিন্তু চিহ্ন মাত্রই প্রতীক নয়। চিহ্ন দু'রকমের : the merely designatory sign and the really significative sign, এক শ্রেণীর চিহ্নে ঋজু প্রত্যক্ষ নির্দেশ, অপর শ্রেণীর চিহ্নে গভীর ভাবব্যঞ্জনার তির্যক ইঙ্গিত।

প্রত্যক্ষ নির্দেশমূলক চিহ্ন নিয়ে সাহিত্যালোচকের কারবার কম কেননা প্রত্যক্ষ চিহ্ন স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রশিল্পে যত প্রচুর পরিমাণে প্রকট ভাষাশিল্পে ততটা নয়।

কিন্তু সাহিত্যালোচকের সংকট সুরু হয় যখন তাঁকে বাক্‌কল্পে ও প্রতীকে প্রভেদ বিচার করতে হয়। এক হিসাবে বাক্‌কল্প ও প্রতীক সমপর্যায়ী। ভাষাপ্রয়োগের প্রকার দু'টি : referential, উল্লেখী বা নির্দেশী, emotive, আবেগবান বা অনুভবী। ইংরেজি ভাষায় প্রকার দু'টির নানা নামকরণ হয়েছে : denotation, connotation (লজিক পুস্তকের সুপরিচিত নামকরণ); statement, suggestion (পেটার ও অন্যান্য অনেকে); direct, oblique (অধ্যাপক টিলিয়ার্ড); referential, emotive (আইভর রিচার্ড্‌স্, যদিও রিচার্ড্‌স্ তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থে প্রকাশ প্রণালীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন)। চরম বিচারে এই বিভিন্ন নামকরণে একই তারতম্য বোঝায়, যে-তারতম্য ভারতীয় ন্যায় ও অলংকার শাস্ত্রে ব্যক্তার্থ বা বিশেষ্যাভিধান ও জাত্যর্থ বা সামান্যাভিধান নামক দ্বৈততায় সুস্পষ্ট। উক্তি-মাত্রেই (বাচনিক হোক অথবা আচরণিক) হয় পরক্ষো নয়তো প্রত্যক্ষ অর্থজ্ঞাপন করে, তার তাৎপর্য হয় স্পষ্ট—যে কথাটি বলা হয়েছে ঠিক তাই—নয়তো তার বক্র ভঙ্গিমায় ইশারা পাওয়া যাবে কোনো তির্যক অভিধার। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে ব্যক্তার্থ বা বিশেষ্য-ভিধান বা ঋজু প্রত্যক্ষ উক্তি বিজ্ঞানরীতি সম্মত, আর জাত্যর্থ বা সামান্যাভিধান বা তির্যক পরোক্ষ উক্তি শিল্পরীতি সম্মত। বিজ্ঞানে চাই উক্তি ও বক্তব্যের পূর্ণ সংগতি, কাব্যের দ্যোতনা নিয়ত উক্তির সীমানা লঙ্ঘী। দ্ব্যর্থ্য বা বহুলার্থ উক্তি বিজ্ঞানে অচল, কাব্যে আদরণীয়। বস্তুতঃ ইংরাজ সমালোচক উইলিয়ম এম্‌প্‌সন্ সাত রকম বক্রোক্তির বিশ্লেষণ করেছেন, কাশ্মীরী আলঙ্কারিকদের কাছে তিনি সাতের কয়েকগুণ বেশী বক্রোক্তি প্রণালী শিখতে পারতেন।

বক্রোক্তির প্রণালী সাত না সাতাত্তর সেটা আলঙ্কারিক বিশ্লেষণের প্রশ্ন, প্রতীক-বিচারী সমালোচনায় সে-প্রশ্ন অবান্তর। এ-সমালোচনায় বিচার্য, বাক্যার্থের প্রধান স্তর কয়টি? এ-বিষয়েও মতভেদ প্রচুর কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে আমার নিজের ধারণা ও অভিজ্ঞতার নির্ভরে, আর্নস্ট্ কাসিরের ও উইলবর আর্বানের অনুসরণে, আমি মানি যে ভাষা প্রয়োগের তিনটি স্তর বিদ্যমান।

প্রথম স্তরে সরল স্পষ্ট ব্যক্তার্থ নিয়ে কারবার। যদি বলি "ভোর", "রোদ", "ধান", "ক্ষেত", "মাঠ", "ঘাস", তাহলে কয়েকটি বিশেষ বস্তুই বুঝব, অন্য কিছু বুঝবার উপায় নেই, যদি বলি "কার্তিকের ক্ষেতে ভোরের রোদ পড়েছে", তাহলেও সুস্পষ্ট সুমিত অর্থ-

সম্পন্ন কথা-ই বলা হ'ল। কিন্তু কবি লিখলেন,

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে'
অলস গেঁয়োর মত এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার।

সংগে সংগে "ভোর" "রোদ" ইত্যাদি সরল ব্যক্তার্থ সম্পন্ন কথা কয়টির অর্থ বেড়ে গেল আশ্চর্য রকমে, পাঠক শুধু কয়েকটি বস্তুই বুঝলেন না, তাঁর বোধ পেঁছিল অনুভূতির গভীরতর স্তরে। আরো কয়েকটি ছত্র লক্ষ করা যাক :

(১) When to the sessions of sweet silent thought

(২) Silent silver nights and darks undreamt of

(৩) আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসংগ

(৪) শিশিরের মতো ঘুম ঝ'রে পড়ে নিশীথের আকাশের তলে

(৫) নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।

ভাষা প্রয়োগের কোন্ গুণ, কোন্ স্তরের গুণ, এই ছত্র কয়টিতে পেলাম? পেলাম হৃদয়াবেগ-সঞ্চারী গুণ, যাকে ইংরেজ লেখক বলেছেন emotive quality; ভাষা-প্রয়োগের এই দ্বিতীয় স্তরে ভাষা কেবল নামার্থ ব্যক্ত করে না, নামার্থের সংগে জাগায় ইন্দ্রিয়সংবেদী কল্পনা, অনুভূতির দোলা।

কিন্তু ভাষা-প্রয়োগে আরো এক স্তরের শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কবি লিখলেন :

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া, আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা
মেলাবেন।

"হাওয়া", "বাড়ি", "দরজা", আর "তিনি" (যে-ই হন না কেন) কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম নয়, এরা আবেগ-সঞ্চারী শব্দ। বাক্যার্থের প্রথম স্তর থেকে আমরা দ্বিতীয় স্তরে পেঁছেছি, কিন্তু সে-স্তরেও আবদ্ধ না থেকে তৃতীয় স্তরে, আরো সূক্ষ্ম সংগুপ্ত স্তরে পেঁছাই যখন বুঝতে পারি যে "হাওয়া", "বাড়ি", "দরজা" এসব শব্দের অভিধায় অধ্যারোপ হয়েছে, অর্থাৎ এক বস্তুতে অপর বস্তুর কল্পনা করা হয়েছে। ছত্র কয়টির মুখ্য অভিধায় ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়ি আর ভাঙা দরজার একটা রূপকল্প আমাদের চেতনায় জাগ্রত হয় বটে কিন্তু একথা বুঝতেও সময় লাগে না যে শব্দকয়টি একটা বৃহত্তর ভাবের প্রতিকল্প, তারা আরো সূক্ষ্ম অথচ আরো হৃদয়গ্রাহী কাব্য বস্তুর suggestion বা অভিভাব আমাদের কাছে উপস্থিত করে, সুতরাং শব্দকয়টি তথা সমগ্র স্তবকটি প্রতীক ধর্মী। ভাষা

প্রয়োগের এই তৃতীয় স্তরে, প্রতীকের স্তরে, ভাষার আবেগ সঞ্চারী গুণের সঙ্গে সংযুক্ত হয় মনন দ্যোতক গুণ। ঋজু বচনে যে মনন দ্যোতনা সম্ভব ছিল না—কেননা সীমার বন্ধনে অসীমকে বাঁধা যায় না তা সম্ভব হল তির্যক ভঙ্গীতে, অধ্যারোপিত বাক্যের প্রতীকী অভিভাবে। সামান্য বাক্‌কল্পের সঙ্গে প্রতীকের মস্ত প্রভেদ এখানে। বাক্‌কল্প দ্বিস্তর আবেগসম্পূর্ণ প্রকাশভঙ্গী; প্রতীক ত্রিস্তর প্রকাশভঙ্গী, আবেগ ও মননের সাযুজ্যে সে সমৃদ্ধ, যে আবেগ ও যে-মনন ঋজুভাষার নিগড়ে ধরা দেয় না।

জীবনানন্দ দাশ ও অমিয় চক্রবর্তী থেকে যে দুটি কাব্যাংশ উপরে উদ্ধৃত হয়েছে—"শুয়েছে ভোরের রোদ", "মেলাবেন তিনি" সে দুটিতে আবেগ সঞ্চারী গুণের উদ্ভব যে-পরিমাণে তাদের চিত্রকল্পে সে-পরিমাণেই তাদের প্রবহমান সুরে। একটিতে সুরের গতি মন্থর, অলস, প্রায় বিবশ। অপরটিতে "মেলাবেন" কথাটির প্রথম ও দ্বিতীয় প্রয়োগের মাঝখানে তিনটি সংক্ষিপ্ত খণ্ড-বাক্যের সমাবেশ। তাতে একপক্ষে সুর যেমন চূর্ণিত দ্রুতধাবী শিশুতরঙ্গের মতো উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, অপর পক্ষে "আর" কথাটিকে দ্বিতীয় ছত্রের সুষ্ঠু বাক্যবন্ধ থেকে প্রথম ছত্রে সরিয়ে নিয়ে আসার ফলে ও "হাওয়া" "আর" এ-দুটি তুল্য স্বরধ্বনির সমাবেশের ফলে সুর গড়িয়ে পড়েছে দ্বিতীয় ছত্রে। সঙ্গে মিলেছে প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রের সাদাসিধে মিল ("আর"—"বাঁচবার")। সমস্ত জড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ কয়েকটির তরঙ্গ চূর্ণগুলি এক প্রবহমান স্রোতে বাঁধা পড়েছে। ছত্র কয়টিতে যেন সুরের যুগপৎ দুটি গতি : একটি vertical, ঊর্ধ্বরেখ (ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে), অপরটি horizontal, ক্ষিতিবদরেখ (তরঙ্গগুলি সম্মুখগামী)। জীবনানন্দ-র ছত্র কয়টি চিত্রকল্পে ও সুরবৈভবে সম্পূর্ণ, আর কিছু করার প্রয়াস কবির ছিল না, অতএব ছত্র কয়টির প্রকাশভঙ্গী দ্বিস্তর মাত্র। অমিয় চক্রবর্তীর ছত্র কয়টির চিত্রকল্পে ভাবাদর্শের ইঙ্গিত বর্তমান, অতএব এ ক্ষেত্রে রচনাভঙ্গী প্রতীক পন্থী।

প্রতীক বলতে শিল্পালোচনায় তাহলে কী বুঝলাম? বুঝলাম যে ভাবাদর্শের ইঙ্গিত-সম্পন্ন বাক্‌কল্পে প্রতীকের প্রকাশ। বিশেষ একটি বা কয়েকটি ভাবের প্রতিভূ যে বাক্‌কল্প তাকে প্রতীক বলা চলে না, সেটি রূপক। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র নির্ঝর প্রতীক নয়, রূপক।

(১) যে-ভয় জীবনে ফণিমনসার বন।

(২) মৈনাক, সৈনিক হও

(৩) পাষাণ ফেটে আকাশে ফোটে আশার রংমশাল
কর্মখর দ্বিপ্রহর দীপ্ত হলো;
কবি-কিশোর, শক্তি তোমার মুক্ত করো,
বৃহন্নলা, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ।

এ সব উদ্ধৃতির কোনটিই প্রতীক নয়, রূপক মাত্র, কেননা A symbol, like a metaphor, does not stand for a 'thing' or for an idea ; it is a focus of relationship। অনেক ধারণা, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক ইন্দ্রিয় সংবেদনা ও অনুভূতি যেন কালক্রমে কবির সৃজনীচিত্তে সংগোপনে থিতিয়ে গিয়ে যে কল্পরূপ ধারণ করে তাকেই

বলতে পারি প্রতীক। ইব্‌সেন্‌-এর "প্যের্‌ গিণ্ট্‌"-এর কথা স্মরণ করুন, সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য যেখানে প্যের্‌ পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে আর নিজ মনে বলছে :

Now, my dear Peer, you're not an emperor, you're an onion, I'm going to peel you. (Takes an onion and peels it, layer by layer.) There's the untidy outer husk ; that's the shipwrecked man on the wreck of the boat ; next layer's the Passanger, thin and skinny— Next we come to the gold-digger self ; the pith of it's gone—some one's seen to that . . . Are we never coming to the kernel? (Pulls all that is left to pieces.) There isn't one! To the innermost bit it's nothing but layers, smaller and smaller. Nature's a joker . . . Life's an uncommonly odd contraplion ; it plays an underhand game with us ; if you try to catch hold of it, it eludes you, and you get what you didn't expect—or nothing! পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ভিতরের শাঁস বার করার চেষ্টা হল, কিছু বেরল না, পেঁয়াজ খোসা-সর্বস্ব সব্জি, বহুব্যক্তিরূপ সম্পন্ন মানুষের সত্তা-ও তেমনি অন্তঃসার শূন্য। খোসা ছাড়া পেঁয়াজ নেই, দৃশ্যমান ব্যক্তিরূপ ছাড়াও মানুষের সত্তা নেই। কিন্তু কোন্‌ সে আদর্শ-সত্তা যা খুঁজে বেড়াই আমরা, আর ব্যক্তিরূপগুলি কি স্বতন্ত্র না ওতপ্রোত জড়িত, যদি জড়িত হয় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী?—এ সব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর ইব্‌সেনের প্রতীকে নেই, তাদের ইঙ্গিত আছে। প্রতীকটি এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র ভাবাদর্শ আমাদের সামনে উপস্থিত করছে না, প্রতীকের রূপকল্পে মিশে' গেছে অনেক স্তরের ভাবনা, প্রতীকটি যেন বহু ধারণার নাভিকেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথেও জটিল ও পরস্পরসম্পৃক্ত একাধিক ভাবাদর্শ মিলে মূর্ত হয়েছে 'অচলায়তনে'র ও 'ডাকঘরে'র চিত্রকল্পে।

যেহেতু প্রতীক হচ্ছে a focus of relationships, বহু সম্পর্কের সংযোগকেন্দ্র, সেজন্য কোনো শুদ্ধ প্রতীকেরই সর্বজন সম্মত নিঃসংশয় ভাবার্থ ব্যাখ্যা চলে না। ইয়েট্‌স্‌ নিজের একটি কবিতা সম্বন্ধে বলেছিলেন, the poem has always meant a great deal to me, though, as is the way with symbolic poems, it has not always meant quite the same thing.

আঁদ্রে জিদ্‌ তাঁর জার্ণালের এক জায়গায় লিখেছেন, In uncertain dreams are already sketched not vaguely the great figures of eternity. জিদ্‌-এর উক্তিতে uncertain ও vaguely শব্দ দুইটি লক্ষ্যণীয়। সার্থক প্রতীকী কবির চিত্তে যে সব শাশ্বত ভাবনা মুহুর্মুহু আন্দোলিত হচ্ছে সেগুলি এমন চিত্রকল্পে সমাবেশিত হয় যার সীমানা অনির্ধারিত অথচ যার স্বরূপ অভিজ্ঞতাসাধ্য। এ যেন সমুদ্রবক্ষ, তার উপরিতল নিয়ত অস্থির অথচ তার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি। শেক্‌স্‌পীয়রের 'অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপাট্রা' নাটকে পরাস্ত অ্যাণ্টনি সহচর ঈরস্‌কে বলছেন : আকাশে সদা পরিবর্তনশীল মেঘের খেলা দেখেছ কি? তার আকৃতি বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। যে আকৃতি এখন দেখছ তার ধারণা তোমার মনে সুস্পষ্ট হওয়ার আগেই সে-আকৃতি যেন গলে' গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই সে-বিগলিত উপাদানে তৈরি হ'ল নূতন আকৃতি।—একথা অ্যাণ্টনি বলেছিলেন অনিশ্চয় মানব জীবন সম্বন্ধে, বিশেষত নিজ

জীবন সম্বন্ধে কিন্তু এই উৎকৃষ্ট চিত্রকল্প আমরা অনায়াসে প্রতীকের স্বরূপে প্রয়োগ করতে পারি। প্রতীকের কোনো সুনির্ধারিত, অবিসংবাদিত ব্যাখ্যা হতে পারে না। যেমন পেঁয়াজের খোসার প্রতিটি স্তরেই পেঁয়াজ, তেমন বহুধারণাসম্পৃক্ত প্রতীকের যে কোনো একটি ধারণাতেই প্রতীকের মর্মার্থ গ্রাহ্য হতে পারে আর সেজনাই প্রতীক ব্যাখ্যায় সমালোচকে সমালোচকে মতানৈক্য। ব্লেইক ও ইয়েট্‌সের ভাষ্যকারগণ একমত হয়েছেন এমন দেখা যায় না। স্মরণ আছে আমার ছাত্রাবস্থায় স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'চয়নিকা' পড়াবার কালে "সোনার তরী"র দশ বারোটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছিলেন। সে কালে এই ব্যাখ্যাবাহুল্যে অসুখী বোধ করেছিলাম, আমার তরুণচিত্ত তখন চেয়েছিল নির্দিষ্ট ভাবার্থ। আজ বুঝতে পারি ঐ ব্যাখ্যাগুলির সব কয়টিই সংগত, সব কয়টিই "সোনার তরী"র প্রতীকে অন্তর্লীন, ব্যাখ্যাগুলির আপাতবিরোধ আসলে একই সৃজনীশক্তির নাভিকেন্দ্রে সম্মিলিত।

অজিত দত্ত-র "খাণ্ডব দাহন" মহাভারতীয় কাহিনী থেকে প্রতীক খুঁজে পেয়েছে। খুশী হয়, পাঠক মনে করতে পারেন পৌরাণিক কাহিনীতেই কবিতাটির অভিধা সম্পূর্ণ কিন্তু পাঠক আরো এগিয়ে যেতে পারেন অভিধা-সন্ধানে। তখন কালান্তক দাবানল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে প্রতীকার্থে, যে-প্রতীক দিয়ে বুঝতে পারি চিরন্তন দহ্যমান সংসারী মানবের জীবন, বুঝতে পারি আধুনিক সভ্যতা, হয়তো বুঝতে পারি বিভক্ত বঙ্গের সর্বনাশী আগুন যাতে –

নগণ্য জীবন-লীলা হয়ে যাক নিঃশেষে নির্মূল,
জীবনের অবশিষ্ট চিহ্ন থাক এক মুঠো ছাই,
* * *
তবু যত বহ্নি জ্বলে, অগ্নিশিখা ঘেরে চারিভিতে
তত মোরা মাঠে-ঘাটে নীড়-বাঁধা খড়-কুটা খুঁজি।

প্রতীকী সাহিত্যে বহু সম্পর্কের সংযোগ কেন্দ্র একথা স্মরণ রাখলে আমাদের সাহিত্য সম্ভোগ যুগপৎ তীক্ষ্ণতর ও প্রশস্ততর হবে। সে-সম্ভোগে অনুভূতি ও মনন মিলবে গঙ্গাযমুনার অনির্ণেয় মিলন রেখার মতো, তাতে থাকবে বহু ভাব সম্পৃক্তির প্রত্যাশা, পাঠকের চিত্ত একটি মাত্র ব্যঙ্গার্থের নিগড়ে আবদ্ধ থাকবে না।

(১) জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?

(২) এ কি এল যুগান্তর! নব অবতার কোন্! কার আগমনী!
এ যে দস্যুদল!
সুভদ্রা আমার!
লুব্ধ যাযাবর! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী।

(৩) তাল তাল সোনা, উত্তম উত্তর; ছুঁড়ে তো মারা যায় না?
গলিতে গলিতে মেশাই রোদ্দুরে, দাঁড়ের ময়নাকে দিই বায়না
গান শোনায় বনের; চোখে আছে, আমার চালসের চোখেও, গাঁয়ে গঙ্গার উপর
শুভ্র ধাপ, তেঁতুল গাছের ঝিলমিল্, প্রাণের ছাঁদ মেলাই রুপোর
চন্দ্রহারে, দোলাই কানের দুলে, আমার উত্তর মণিতে বাঁধি।

(৪) কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরো বড় বিষয়ের হাতে
সে সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কি এক গভীর সুসময়!
মকরক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন :
—তবুও তা পৃথিবীর নয়;
এখন গভীর রাত হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

(৫) তবুও ভোরের বেলা বারবার ইতিহাসে সঞ্চারিত হয়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হ'য়ে,—
যদি না সূর্যাস্তে ফের হয়ে যায় সোনালি হেঁয়ালি।

উপরের প্রতিটি উদ্ধৃতিতে একাধিক ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমালোচকের বিশ্লেষণ প্রযুক্ত হবে পৃথক ভাবগুলির স্বতন্ত্র স্বরূপে, তারপরে সমালোচক বিচার করবেন কি ভাবে ভাবগুলি কেন্দ্রীকৃত হ'ল। কোল্‌রিজ্ বলেছেন,

A symbol is characterized by the translucence of the special in the individual, or of the general in the special, or of the universal in the general; above all by the translucence of the eternal through and in the temporal. It always partakes of the reality which it renders intelligible; and while it enunciates the whole, abides itself as a living part in that unity of which it is the representative. . . . It is very possible that the general truth represented may be working unconsciously in the writer's mind during the construction of the symbol.

বিশেষার্থের মধ্যে বৃহত্তর ব্যপ্তার্থ, অনিত্যের মধ্যে নিত্য, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি কি ভাবে সংমিশ্রিত হ'য়ে সমগ্র সাহিত্যে প্রোজ্জ্বল হয়, একের দীপ্তিতে অপরে উদ্ভাসিত হয়, প্রতীক-বিচারী সমালোচনা যে-বিশ্লেষণে নিযুক্ত।

প্রতীক বিচারে আরো দু'টি বিষয় স্মর্তব্য। সাহিত্যে প্রতীক দু'ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। কাব্যের প্রতীকগুলি বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে, অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টি-কর্মে আলাদা আলাদা প্রতীক তাৎক্ষণিক সৃষ্টির জন্যই উদ্ভাবিত হতে পারে, কবিতার পরে কবিতায় ব্যবহৃত

প্রতীকগুলি সমশৃঙ্খলিত না-ও হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতীক-পরায়ণতা কবির পক্ষে সাময়িক আঙ্গিক অবলম্বন মাত্র। কবিকর্মে তাঁর যে বিশেষ একটি "মুড্" এসেছে সেটি অ-ধরাকে ধরার চেষ্টায় ঋজু ভাষা ছেড়ে তির্যক ভাষা অবলম্বন করল আর সেই তির্যক ভাবগুলি কোনো একটি প্রতীকের নাভিমূলে কেন্দ্রীভূত হ'ল। কবির অভ্যস্ত চিন্তাধারা প্রতীকী না-ও হ'তে পারে, বিশেষ প্রয়োজনে তিনি প্রতীকের শরণাপন্ন হয়েছেন। এহেন তাৎক্ষণিক প্রতীক, আমার বিবেচনায়, আধুনিক বাঙলা কাব্যে প্রচুর। পক্ষান্তরে কোনো কোনো কবির সমগ্র চিন্তাধারা, মূল সৃজনী শক্তি প্রতীকপন্থী, তাঁদের বিশ্ববীক্ষা প্রতীকোদ্ভাসিত, প্রতীক অবলম্বন ছাড়া তাঁরা চিন্তায় অভ্যস্ত নন। প্রতীকধর্মী বিশ্ববীক্ষা সকল কবির মধ্যে দেখা যায় না, বস্তুতঃ প্রতীকী চিন্তাভ্যাস এ যুগের সংক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রার বিশেষ প্রতিভাস, অবদমিত চিত্তবৃত্তি ও বীতনিষ্ঠ চিন্তনের ঊর্ণজাল এড়াবার উৎকৃষ্ট উপায়। এ যুগের ইয়োরোপে আলেকজান্ডার ব্লক, স্টেফান গিয়র্গ, পল ভ্যালেরি, ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় কবি সুস্থ প্রতীক পথে চলেছেন তাঁদের কাব্যের অতি সুন্দর বিশ্লেষণ ইংরেজ সমালোচক স্যর মরিস বাওরা-র পুস্তকে পাওয়া যায়। এহেন সার্বিক প্রতীকতা কোনো বঙ্গীয় কবির মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না যদিও জীবনানন্দ দাস ও বিষ্ণু দে প্রতীক পথে বহুদূরগামী। প্রতীকবিচারী সমালোচক অবশ্য তাৎক্ষণিক প্রতীকতা ও সার্বিক প্রতীকতায় তারতম্য করবেন।

দ্বিতীয় স্মর্তব্য বিষয় যে প্রতীকের প্রকৃতিতে যেন আমদরবার ও খাসদরবার, দুটি দরবার আছে। প্রতীকটি হতে পারে নেহাতই কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতায় সম্বদ্ধ, অপরের চিত্তে তার কোনো সরাসরি আবেদন অনুপস্থিত। এরকম private symbol, খাসমহলী প্রতীক, আধুনিক সাহিত্যে (বিশেষত কাব্যে) প্রচুর, এমনকি বলা চলতে পারে খাসমহলী প্রতীক ছাড়া আধুনিক কাব্যে প্রতীক নেই। রিলকে বা ভের হায়রেন যত প্রতীকের ব্যবহার করেছেন তার সবই তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। সে-প্রতীকের ইঙ্গিত অনুধাবন করতে হ'লে কবির শিল্পব্যক্তিত্ব ছাড়া সাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে-কালে কবির সঙ্গে পরিবেশের বিচ্ছেদ ঘটেনি, কবির ব্যক্তিজীবন ও পারিবেশিক জীবন ছিল সঙ্গত, সে-কালে পরিবেশের সাধারণ ধারণা ও প্রত্যয়গুলিতেই কবি শক্তিশালী প্রতীকের উপকরণ পেতে পারতেন। তাঁর নিজস্ব প্রত্যয় ও পারিবেশিক প্রত্যয়ে কোনো ব্যবধান বড় একটা থাকত না বলেই তাঁর প্রতীকগুলি সরাসরি পাঠক চিত্তে প্রবেশ করত। বৌদ্ধ দোঁহা, ষোড়শ শতকী বৈষ্ণব কাব্য ও পরবর্তী কালের শ্যামাসঙ্গীত অজস্র প্রতীকে সমৃদ্ধ কিন্তু সে প্রতীক public symbol, আমমহলী প্রতীক, সে-মহলের প্রশস্ত দ্বারপথে যে কোনো পাঠক অল্পায়াসে প্রবেশ করতে পারেন। প্রতীকপ্রকৃতির এই দ্বৈততা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশমাত্র, এবং সন্ধানী সমালোচকের কর্তব্য দ্বৈততার হেতু বিশ্লেষণ করা কিন্তু সর্বোপরি সমালোচকের কর্তব্য প্রতীক বিশ্লেষণের সাহায্যে কাব্যের সৃষ্টিমূলে প্রবেশের প্রয়াস কেননা শিল্পসৃষ্টির মায়াবী গোপন কক্ষের উৎকৃষ্ট সন্ধান সবচেয়ে ভালো মিলবে প্রতীক বিচারে।

আধুনিক সাহিত্য

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের পুরোভাগে যাঁরা আছেন তাঁদের রচনায় মেধা, বহুশ্রুতি, প্রবচন ইত্যাদির অভাব আছে এ-কথা অতি বড় নিন্দুকও বলবেন না, কিন্তু প্রজ্ঞার অভাব আছে, একথা বললে খুব অন্যায় বলা হ'বে কি? প্রজ্ঞার যে ক্ষুধা মানুষের মনে, সে ক্ষুধার তৃপ্তি মানুষ খুঁজেছে হয় অধ্যাত্মসাধনার নির্বাক নিগূঢ় অভিজ্ঞতায়, না হয় বিজ্ঞানের স্বচ্ছ দর্পণে, অথবা কাব্য-শিল্প-সংগীত-নৃত্যের শুভ্র জ্যোতির্ময় মহিমায়। বাংলা কাব্যের রবীন্দ্রোত্তর পর্বে সে-ক্ষুধার আস্বাদন পরিবেশন করেছেন এমন কবি বিরল। জীবনানন্দ প্রজ্ঞার স্পর্শ প্রায় পেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ অথচ গভীর ক্ষুধার ছায়াছবিগুলো রং ও রেখায় সুস্পষ্ট দৃঢ়তা লাভ করবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কাল তাঁকে হরণ করলো। সে-ক্ষতি সহজে পূরণ হ'বার নয়। আর করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। জীবিত কবিকুলের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একতম প্রজ্ঞাবান কবি।

প্রজ্ঞা স্বতপ্রকাশ, প্রমাণ নিরপেক্ষ। প্রজ্ঞার গভীরে বোধ আছে, বুদ্ধিও আছে, কিন্তু বোধের বিকার ও বুদ্ধির শাণিত ঔদ্ধত্য সেখানে বোধির শাসনে সংযত, শান্ত, সমাহিত; সংশয় ও সংগ্রামের সুদূর স্মৃতিও বুঝি সেখানে আর নেই। বহুশ্রুতি ও প্রবচনের সংখ্যাতীত উপাদান উপকরণ থেকে যে-আলোর বিচ্ছুরণ, সেই আলোই তো প্রজ্ঞা, আর সেই আলোতে জগৎ ও জীবনকে দেখাই তো দর্শন। সার্থক কবিদৃষ্টি তাকেই বলি যার গর্ভে আছে এই প্রজ্ঞার আলোক। সার্থক রুচির পশ্চাতেও এই প্রজ্ঞারই দীপ্তি, কারণ, রুচি তো ইংরাজি taste নয়, রুচির অর্থই হ'চ্ছে জ্যোতি, দীপ্তি। পঞ্চাশোত্তর প্রেমেন্দ্র মিত্র এই প্রজ্ঞার দৃষ্টি ও রুচির কতক অধিকার লাভ করেছেন, "সাগর থেকে ফেরা"-র কবিতাগুলো পড়ে আমার এই ধারণা হোলো। এবং এর স্বল্প অধিকারও যিনি লাভ করেছেন, তিনি সার্থক, তিনি ভাগ্যবান : স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।

এরই ফলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাম্প্রতিক কবিতা শান্ত, স্নিগ্ধ, সমাহিত; স্বল্পবাক্, নিরাভরণ, বিরলালংকার; অথচ তার চারদিকে স্নিগ্ধ আলোর প্রশান্ত দীপ্তি। প্রথম যৌবনের উদ্বেল আবেগ, প্রাণতরঙ্গের ঔজ্জ্বল্য দেখেছি "প্রথমা"-য়, যৌবন-মধ্যাহ্নের প্রতাপান্বিত মহিমা দেখেছি "সম্রাট্"-এ; পরিণত যৌবনের জীবন-জিজ্ঞাসার সূচনা দেখেছি "ফেরারী ফৌজ"-এ। আর, এই "সাগর থেকে ফেরা"-য় দেখছি, প্রথম প্রৌঢ়ত্বের প্রবণতা, অর্থাৎ জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর পাবার প্রয়াস। কিছু কিছু উত্তর যেন তিনি পেয়েওছেন,

> পৃথিবী এখনো ক্রূর
> ইতিহাস সংকীর্ণ সর্পিল
> তবু নক্ষত্রেরা আর সমুদ্রসময়
> দিতে চায় যে প্রত্যয়
> সেই চোখে জানি মিথ্যা নয়।

প্রত্যয়ের দৃষ্টিলাভ তাঁর ঘটেছে, এমন মনে হ'চ্ছে। ঘর্মাক্ত মন নিয়ে জীবনের অর্থ খোঁজার দিন প্রায় যেন শেষ হ'য়ে এসেছে, হৃদয় নির্ভার, বুদ্ধি স্বচ্ছ ও প্রসন্ন হ'য়ে এসেছে।

মানে খোঁজা নিয়ে যোঝা
একদিন থেমে যায়
তেপান্তরে ঝড়ের মতন,
শুধু থাকে চেয়ে থাকা, শুধু কান পেতে রাখা
শুধু নীল ছড়ানো গগন।

এখনো নদীরা থাকে
থাকে স্রোত, থাকে ঢেউ, তীর;
শুধু হৃদয়ের আর থাকে নাক কোনো ভার
কোনো দায় কোনো বেসাতির

তখনই পাখীরা আসে প্রাণের প্রান্তরে।

রামায়ণের রামচন্দ্র পিতৃসত্য, লোকসত্য, আরো অনেক সত্য পালন করে দেশের ও দশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছেন যুগ যুগ ধ'রে, কিন্তু সেই রামচন্দ্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রীরাম ন'ন।

পিতৃসত্য, লোকসত্য
সকলের সব সত্য পালনের পর
আপন গহন সত্য
খুঁজিবারে রহে যেন কিছু অবসর।

এই গহন সত্য খুঁজবার কিছু অবসর যেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনে এসেছে। খেলাচ্ছলে, ছড়ার ছন্দেও 'জীবনের গভীর শেকড়টা'র কথা এসে পড়েছে; স্মৃতিতে এসে পড়ছে 'উদ্ভাসিত সত্তার গূঢ় পরিচয়ের' ছায়া। 'মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে' যাবার ডাক এসেছে, 'পরম পাওয়ার এষণা' জেগেছে। তারই ফলে জীবন আরো সত্য হ'য়ে উঠেছে, জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা গভীরতর হ'য়েছে; এমন যে দশানন রাবণ তার ভিতরও তিনি নোতুন অর্থসন্ধান লাভ করেছেন। 'জানা-না-জানার চেয়ে অন্য কোনো উত্তরণ', 'কোনো নূতন অন্বয়', কোনো 'গূঢ় এক দীপ্ত অনুভব' তাঁকে আহ্বান করছে। এ-আহ্বান যিনি শুনেছেন, মানবসত্যের প্রত্যয় তাঁর গভীরতর হ'বে, এ-প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে রেখে গেছেন; সে-প্রমাণ প্রেমেন্দ্র মিত্র দৃঢ়তর করেছেন এই কাব্যে।

এই অকিঞ্চন পৃথিবীর মৃত্তিকায়
যে সূর্যবীজ তুমি রোপণ করো
তা' ব্যর্থ হ'বার নয়।
মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানের সমস্ত কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করে
সুদূর যুগান্তে তার সঙ্কেত প্রসারিত
মানবতার গভীর উৎসমূলে
অক্ষয় তা'র প্রেরণা।

হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে
আমরা ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ্‌,
তবু সেই সূর্য-শিখা যে আমাদের মাঝে
প্রতিফলিত হয়
এই আমাদের গৌরব।

প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের চার পর্বে চারটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন; প্রত্যেকটি কাব্য বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সুস্পষ্ট রং ও রেখায় চিহ্নিত। খুব কম লেখেন তিনি; চারটি কাব্যে সবশুদ্ধ মাত্র ১২৬টি কবিতা। বর্তমান গ্রন্থে মাত্র ৩২টি। কিন্তু ক্ষতি নেই তাতে। তাঁর কবিকর্ম বরাবরই নিখুঁত; যখনই লেখেন খুব যত্ন নিয়ে লেখেন যার ফলে একটি নিটোল পরিচ্ছন্নতা, সুস্পষ্ট ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার মহিমা কবিতাগুলোকে ঘিরে থাকে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, কবির আবেগের বিশুদ্ধতা, প্রাণের স্বচ্ছতা, যে স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধতা কখনো বুদ্ধির শাসনে তিরস্কৃত হয় না, ম্লান হয় না। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাঁর কবিতা পড়লে বেশ ধরা যায়, তিনি পড়েছেন বিস্তর, বিশেষ ক'রে পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণীতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, আধুনিক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদি; দেখেছেনও বিস্তর, জীবনের নানা ছোট-বড় লীলা খেলা, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি নানা বকযন্ত্র পরম্পরায় শোধিত হ'য়ে জারিত হ'য়ে জীবনরসে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়; তাঁর রচনায় সঙ্গীন উঁচু করে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে না। আগেও করেনি', এখন আর তো করতেই পারে না; ভূয়োদর্শন যাঁর ঘটেছে তাঁর রচনায় তা' করবার কথাও নয়। ক্ষয় ও ক্ষতি, সংশয় ও সংগ্রামের চিহ্ন মুছে না যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যয় জন্মায় না।

"সাগর থেকে ফেরা" এই প্রত্যয়ের কাব্য। এই প্রত্যয় আরো দৃঢ় হোক, গভীর হোক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে, এই কামনা করি। সূর্যের স্পর্শ, সাগরের ডাক, পাহাড়ের ডাক, দিগন্তের আহ্বান, পরম পাওয়ার এষণা তাঁর জীবনে ও কাব্যে আরো সত্য, আরো সার্থক হ'য়ে ফুটে উঠুক। "ফেরারী ফৌজ" থেকেই তাঁর কাব্যে গভীরতার সুর লেগেছে, "সাগর থেকে ফেরা"-য় সে সুর আরো স্পষ্ট হ'য়েছে। গান হ'য়ে বাজবে বা মন্ত্রের মত ধ্বনিত হ'বে কবে, তার প্রতীক্ষায় থাকবো।

নীহাররঞ্জন রায়

সাগর থেকে ফেরা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং প্রাইভেট লিঃ। তিন টাকা।

সমালোচনা

Economics and Action *By* Pierre Mendes-France and Gabriel Ardant. William Heinemann, London (UNESCO). 15*s*.
The Life of John Maynard Keynes *By* R. F. Harrod. Macmillan. London. 25*s*.

সমালোচ্য বই দু'খানি এমন একটি বিষয় (অর্থবিদ্যা) নিয়ে লেখা যা ক্রমেই অত্যন্ত জটিল প্রায়োগিক এবং অনেকটা অবিমিশ্র গাণিতিক ব্যাপার হয়ে উঠছে। দু'খানি বই-ই অবশ্য অর্থবিদ্যার তত্ত্বকথা নয়। মেন্ডেস-ফ্রাঁস চিন্তাশীল অর্থবিদ্ ব'লে পাশ্চাত্ত্য বিদ্বৎ-সমাজে স্বীকৃত। রাষ্ট্র-পরিচালনার কাজেও তাঁর অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে মূল্যবান, কারণ অর্থবিদ্যার যে সাম্প্রতিক রূপতত্ত্বের তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তা সে-তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ-জ্ঞান ভিন্ন যথাযথভাবে করা সম্ভব নয়। অর্থবিদ্যা প্রধানতঃ সমাজবিজ্ঞান, অথবা মানববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তার যাবতীয় তত্ত্বকথার সার্থকতা তখনই যখন সেগুলি বাস্তব জীবনের ধোপে টিকে যায়। তা না টিকলে, কোন বিদ্যার কোন বুলিরই অর্থ হয় না, অর্থবিদ্যারও না। ক্লাসিকাল অর্থবিদদের এরকম অনেক বুলি শেষ পর্যন্ত সামাজিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ধোপে টেকেনি বলেই, কীনেস, কাহ্ন প্রমুখ সজাগ অর্থবিদদের অনুসন্ধানী মন আবার নতুন ক'রে সব সূত্রগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার ফলেই নতুন অর্থবিদ্যার বিকাশ হয়েছে। আধুনিক অর্থবিদ্যার উৎপত্তিই হয়েছে ধনিকতন্ত্রের আবির্ভাব, বিকাশ ও বৃদ্ধির যুগে। তার সাম্প্রতিক সংস্কার ও নবকলেবর-ধারণ প্রয়োজন হয়েছে, ধনিকতন্ত্রের গভীর সংকটের যুগে (দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের)। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাইরে প্রায় প্রত্যেক দেশে এই নতুন কীনেসীয় ও উত্তর-কীনেসীয় অর্থবিদ্যার প্রয়োগ-পরীক্ষা চলছে। রাষ্ট্র-নায়করা মনে করছেন যে বহুদিন পরে তাঁরা বার্ধক্য-জীর্ণ ধনিকতন্ত্রের পুনর্জীবনের জন্য কায়কল্প চিকিৎসার অভিনব পন্থা খুঁজে পেয়েছেন কীনেসের ন্যাসসূত্রের মধ্যে। আমাদের ভারতবর্ষেও কীনেসীয় অর্থবিদ্যার ন্যাসসূত্রগুলি অর্থসচিব ও প্ল্যানিং-বিশেষজ্ঞরা একান্ত অনুরাগীর মতন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছেন। 'ইনভেস্টমেন্টে'র বা অর্থ-নিয়োগের যে জাদুকরী শক্তি কীনেস্-কাহ্ন আবিষ্কার করেছেন "মাল্টিপ্লায়ারে"র ক্রিয়ায়, ভোগবৃত্তির প্রবণতার (propensity to consume) সজাগতা ও ক্রমবৃদ্ধির জন্য তাঁরা ট্যাক্সের জাদুদণ্ডের সাহায্যে যে অর্থসাম্য ও আয়সাম্য মোটামুটি বজায় রাখার সুপারিশ করেছেন, অর্থসচিবরা আজ তাই অন্ধের মতন অনুসরণ ক'রে চলেছেন বলা চলে। ধনিকতন্ত্রের বাইরের এই সমাজতান্ত্রিক পোশাকের একটা চাকচিক্য আছে, সাধারণের কাছে আকর্ষণও আছে। তাই রাষ্ট্রের কর্ণধাররা আজ সামাজিক প্রগতি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশান্বিত হয়েই নতুন অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তৎপর হয়েছেন। তৎপরতা ও উদ্দেশ্যের

সাধুতা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে 'পূর্ণ কর্মসংস্থান' ও জাতীয় ধনবৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না, ভোগ (consumption) ও মূলধন-নিয়োগের সম্মিলিত চাহিদার ঘাটতি পড়ছে, সুখদুঃখের নিয়তিচক্রের মতন তেজী-মন্দার আবির্ভাব হচ্ছে, তাহ'লে আবার কীনেসের নয়াসূত্রের পুনর্বিচার করার প্রয়োজন হবে। সমাজবিজ্ঞানীর বিজ্ঞানাগার হ'ল সমাজ ও মানুষ। সেই বিজ্ঞানাগারের পরীক্ষায় যদি কীনেসীয় অর্থবিদ্যার নয়াসূত্র উত্তীর্ণ না হতে পারে, তাহ'লে তার সমস্ত গাণিতিক বিশ্লেষণের কসরৎ কেবল ভোজবাজী ও মিথ্যা বুদ্ধির সাফাই ব'লে গণ্য হবে এবং সূত্রাদিও বাতিল হয়ে যাবে।

"ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকশন" বইয়ের মধ্যে কীনেসের এই নয়াসূত্রগুলির ব্যাখ্যা ক'রে, তার প্রয়োগ-পরীক্ষার একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বইখানি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ তত্ত্বপ্রধান, দ্বিতীয় অংশ তথ্যপ্রধান। তত্ত্বপ্রধান অংশটিতে, যতদূর সম্ভব সরল ভাষায়, মার্কাণ্টাইল ও ক্লাসিকাল অর্থবিদদের প্রতিপাদ্যের বিচার ক'রে, কীনেসের নয়াসূত্রগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে দেখানো হয়েছে, কিভাবে এই নতুন আর্থিক সূত্রগুলি বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রয়োগের ফলাফল কি, ভবিষ্যৎই বা কি? কেবল অর্থ-বিদ্যার ছাত্রদের কাছে নয়, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছেও বইখানির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হবে, আশা করা যায়। তার কারণ, লেখকরা তাঁদের বক্তব্যকে বেশ সচেতনভাবেই 'নন্-টেকনিক্যাল' ভাষার মাধ্যমে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করবার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে খানিকটা অতিসরলীকরণের দোষ ঘটেছে বটে, কিন্তু তাতে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি।

দ্বিতীয় বইখানি হ'ল, জন মেইনার্ড কীনেসের জীবনচরিত। বছর চারেক আগেকার বই হলেও, বইখানি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব'লে আলোচ্য মনে করি। লিখেছেন এমন একজন অর্থবিদ্ (আর. এফ. হ্যারড), যিনি কেবল কীনেসের সান্নিধ্য ও সাহচর্যলাভে যে উপকৃত হয়েছেন, তা নয়, তাঁর নতুন চিন্তাধারার বিকাশেও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কাহ্‌ন, হিক্স, জোন রবিনসন প্রমুখ দু'চারজন যাঁরা সাম্প্রতিক অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে স্বকীয়তায় ও স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল, হ্যারড তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। কীনেসের জীবনের পটভূমিকায় তিনি আধুনিক অর্থবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা করেছেন বলা চলে। কাহিনী ও ঘটনার সংমিশ্রণে নীরস তত্ত্বকথাও তাই সরস হয়ে উঠেছে। অ্যালফ্রেড মার্শালের আমল থেকে কীনেসের আমল পর্যন্ত কিভাবে, কি কারণে, অর্থবিদ্যার অনুশীলনের ধারা বদলে গেল, তার একটা ক্রমিক ইতিবৃত্ত হ্যারড রচনা করেছেন, প্রধানতঃ কীনেসের জীবনধারা অবলম্বন ক'রে। যাঁরা কীনেসীয় অর্থসূত্রের উৎস ও বিকাশের ধারা সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাঁরা হ্যারডের বইখানি অবশ্যই পাঠ করবেন। তাতেও যাঁরা সন্তুষ্ট হবেন না, তাঁদের জন্য সুম্পেটার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *History of Economic Analysis* লিখে গিয়েছেন। তার মধ্যে সাম্প্রতিক অর্থবিদ্যার প্রত্যেকটি 'tool' ও 'concept'-এর ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুম্পেটারের বই অবশ্য কেবল অর্থবিদ্যার ক্রনিক্‌ল বা ইতিবৃত্ত বললে অন্যায় করা হবে। অর্থবিদ্যাপ্রসঙ্গে সুম্পেটার আধুনিক যুগের মানববিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা করেছেন। কেবল 'ইকনমিক অ্যানালিসিস' নয়, 'ইণ্টলেকচুয়াল অ্যানালিসিসের' ইতিহাস বলা চলে তাঁর বইখানিকে। তার মধ্যে ইকনমিক্স হ'ল মধ্যবিন্দু। সুম্পেটারের সঙ্গে কারও কোন তুলনা করা চলে না। যাঁদের অবসর কম, কৌতূহলের সীমানাও সীমাবদ্ধ, তাঁরা হ্যারডের লেখা জীবনচরিতেই

পরিতৃপ্ত হবেন মনে হয়। তৃপ্তির প্রশ্ন বাদ দিয়েও বলা যায় যে সাম্প্রতিক কীনেসীয় অর্থসূত্রের তাৎপর্য ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে, তার ঐতিহাসিক ও মানসিক পশ্চাদ্‌ভূমি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজন হ্যারড অনেকখানি মিটিয়েছেন। 'ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকশন' বইয়ের মধ্যেও পরিবর্তনের পটভূমি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এত সংক্ষেপে করা হয়েছে যে সকলে তাতে খুশি হবেন না। হ্যারড পড়লে তাঁরা অনেকটা খুশি হবেন।

এখানে কীনেসের মূল বক্তব্যে আসা যাক। দেখা যাক, ক্লাসিকাল অর্থবিদদের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের পার্থক্য কোথায়, কতখানি এবং তার নূতনত্বই বা কোথায়? ১৯৩৬ সালে কীনেসের *The General Theory of Employment, Interest and Money* বইখানি প্রকাশিত হবার পর থেকে এদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাতারাতি কোন তত্ত্বকথাই অবশ্য কারও মগজে গজিয়ে ওঠে না। আগে থেকে সেদিকে সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের চিন্তাধারার একটা ঝোঁক দেখা যায়, সাধারণভাবে সমাজের মধ্যে এমন সব সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা সেই চিন্তাধারার গভীর অনুশীলনে প্রেরণার সঞ্চার করে, তবেই নতুন সমাধানের পন্থা বা তত্ত্বকথার উদ্ভব হয়। কীনেসের 'জেনারল থিয়োরি' প্রকাশিত হবার আগেও তেমনি একটা দীর্ঘ প্রস্তুতির ইতিহাস আছে। 'ট্রিটিজ অন মনি' বইয়ে কীনেস তাঁর 'ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশনের' মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ধনসঞ্চয়ের চেয়ে ধননিয়োগ যদি বেশি হয় তাহ'লে জিনিসপত্তরের অর্থমূল্য বাড়ে, এবং তার ফলে উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয়। এর বিপরীত হ'লে ঠিক উল্টো ব্যাপার হয়। কিন্তু অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে বর্ধিত ধননিয়োগ কেন প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন (output) বাড়াবে না? আগে মূল্যবৃদ্ধি হবে, তবে উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হবে উৎপাদকরা, এমন ব্যাপার তো নাও ঘটতে পারে? উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে পরেও তো মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে? সঞ্চয় ও নিয়োগের অসামঞ্জস্যের ফলে উৎপাদনের পরিবর্তন ঘটে, একথা কীনেস 'ট্রিটিজে' বলেছিলেন। কিন্তু উৎপাদনের পরিবর্তন যে আবার ঐ সঞ্চয়-নিয়োগের অসামঞ্জস্যের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে-কথা তিনি বলেননি। ট্রিটিজের চিন্তাধারায় এদিক থেকে একটা বড় ফাঁক থেকে গিয়েছিল। শূন্যতা পূরণ করার জন্য অবশ্য চিন্তার বিরাম ছিল না।

এই প্রশ্ন নিয়ে যখন অনেকেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন, তখন কাহ্‌ন 'ইকনমিক জার্নালে' (জুন ১৯৩১) একটি প্রবন্ধ লিখলেন—"Home Investment and Unemployment"— এই নামে। এই প্রবন্ধে কাহ্‌ন দেখালেন, উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ-বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফলাফল কিভাবে হ'তে পারে। যে-উপায়ে বা পদ্ধতিতে হতে পারে, তার নামকরণ করলেন তিনি 'মাল্টিপ্লায়ার'। সাম্প্রতিক অর্থবিদ্যার ইতিহাসে কাহ্‌নের এই রচনাটিকে যুগান্তকারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। হ্যারড তাই কীনেসের জীবনচরিতের মধ্যে একজায়গায় বলেছেন, "The ideas in this article had a crucial influence on Keynes' subsequent thinking" (p. 434)। মাল্টিপ্লায়ার সম্বন্ধে কীনেস তাঁর 'জেনারল থিয়োরি' বইয়ের মধ্যে বলেছেন :

"Unless the psychological propensities of the public are different from what we are supposing, we have here established the law that increased employment for investment must necessarily stimulate the industries for consumption and thus lead to a total increase of

employment which is a 'multiple' of the primary employment required by the investment itself." (Chapter 10, p. 118.)

সহজ কথায় 'মাল্টিপ্লায়ারের' তাৎপর্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : প্রাথমিক ধন-নিয়োগের ফলে একদল লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তার ফলে, ব্যবহার্য পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ বাড়ে, কারণ নতুন কর্মনিযুক্ত লোকসমষ্টি তাদের উপার্জিত আয়ের অনেকটা অংশ এই খাতে ব্যয় করতে চায়। তার ফলে নতুন নতুন পণ্য-উৎপাদনের কারখানা গ'ড়ে ওঠে, খানিকটা মূলধন এই ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়, এবং আরও একদল লোকের বেকারত্ব ঘুচে যায়। তাহ'লে একথা বলা চলে না যে প্রাথমিক ধননিয়োগের প্রভাব কেবল সেই প্রাথমিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমাজের বহু দূর-স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে এবং হওয়াই স্বাভাবিক। কর্মসংস্থানও শেষ পর্যন্ত কয়েকগুণ বেড়ে যেতে বাধ্য। এই মাল্টিপ্লায়ারের কার্যকারিতা অবশ্য অনেকটা নির্ভর করে ভোগপ্রবণতার উপর। কারণ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে যদি মানুষের ভোগবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা না বাড়ে, অথবা খুব সামান্য বাড়ে ('not much above zero'), তাহ'লে মূলধন-নিয়োগের প্রতিক্রিয়াও তেমন আশানুরূপ হবে না, এবং হয়ত 'পূর্ণ কর্মসংস্থানের' জন্য খুব বেশি পরিমাণে ইনভেস্টমেণ্টের প্রয়োজন হবে। কিন্তু যে-সমাজে মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা বেশি, সেখানে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়বৃদ্ধিও হবে যথেষ্ট, এবং তার ফলে ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। চাহিদা বাড়লে তার উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হবে মূলধনের মালিকরা। সেই সব ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেণ্ট বাড়বে, লোকের কর্মসংস্থানও বাড়বে এবং সর্বসাকুল্যে মোট কর্মসংস্থানও বহুগুণ বাড়বে (প্রাথমিক সংখ্যার তুলনায়)। এই অবস্থায়, অর্থাৎ ভোগপ্রবণতা আয়-বৃদ্ধির প্রায় সমান হারে বাড়লে ('not far short of unity'), হয়ত সামান্য মূলধন-নিয়োগের ফলেই Full Employment-এর স্তরে পৌঁছান যায়। কিন্তু ভোগপ্রবণতা যাচাই করা, অথবা কমানো-বাড়ানোর সমস্যা, নানা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ব'লে কঠিন। সেকথা পরে আমরা আলোচনা করব। আপাততঃ দেখা যাক্, কীনেসের এই মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে ক্লাসিকাল অর্থবিদদের বক্তব্যের পার্থক্য কোথায়? মৌলিক পার্থক্য কিছু আছে কি না?

'ইকনমিক্স অ্যাণ্ড অ্যাকশন' বইয়ে এই পার্থক্য সম্বন্ধে লেখকরা যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন। কীনেসের জীবনচরিতের মধ্যেও হ্যারড 'জেনারল থিয়োরির' বেশ চমৎকার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গতঃ ক্লাসিকাল অর্থবিদদের সঙ্গে কীনেসের বক্তব্যের পার্থক্য কোথায়, তাও উল্লেখ করেছেন (৪৫৩-৪৬১ পৃষ্ঠা)। কীনেসের প্রধান লক্ষ্য, এক কথায় বলা যায়, ধনতান্ত্রিক সমাজে বেকার-সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করা। ক্লাসিকাল অর্থবিদরা বেকারসমস্যাকে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সমস্যা বলেই মনে করতেন না। তাঁরা কেবল 'ফ্রিকশানাল' বা 'ট্র্যানজিশানাল' বেকারত্বে (কর্মান্তরের জন্য, এক কাজ থেকে অন্য কাজে যোগদেবার মধ্যবর্তী কালের জন্য) বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বলতেন যে লেবারের মূল্য (অর্থাৎ মজুরি) এমন এক স্তরে স্থিতিশীল হতে চায়, যেখানে তার কাজের অভাব হবার কথা নয়। কাজের অভাব হ'লে, অর্থাৎ বেকার থাকলে ভাবতে হবে যে তারা এমন মূল্য বা মজুরি চাইছে, যে মূল্য দিয়ে তাদের কাজে নিয়োগ করা মালিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বেকার-সমস্যার সহজ সমাধান হ'ল, কর্মপ্রার্থীদের মজুরি কমিয়ে দেওয়া এবং অল্প মজুরিতে তাদের কাজ করতে জুলুম করা। কীনেস

এ-যুক্তি বর্জন ক'রে বললেন যে মজুরির হারবৃদ্ধির ফলে বেকারসমস্যা দেখা দেয়, একথা ঠিক নয়। মজুরি কমিয়ে এ-সমস্যার বা সংকটের সমাধানও করা যায় না। সমাধানের পথ অন্য। 'জেনারল থিয়োরিতে' তিনি বললেন যে ভোগপ্রবণতা এবং মূলধননিয়োগ প্রবণতার সম্মিলিত তাগিদই হ'ল আসল কথা এবং তার দ্বারাই কর্মসংস্থানের সমস্যা দূর করা সম্ভব। হয় মূলধননিয়োগ বাড়িয়ে, না হয় ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে, কর্মসংস্থানের স্তর বিস্তৃত করতে হবে।

কি ক'রে তা করা হবে? এখানেও ক্লাসিকাল স্কুলের সঙ্গে বিরোধ বাধল। ক্লাসিকাল অর্থবিদ্‌দের কাছে "সুদের হার" (Rate of Interest) ছিল বড় কথা। সুদ কমিয়ে-বাড়িয়ে স্থিতাবস্থায় পৌঁছানো যায়। সঞ্চয় যদি বাড়ে, তাহ'লে সুদের হার কমবে। সুদের হার কমলে মূলধননিয়োগ বাড়বে, ওদিকে সঞ্চয়ের স্পৃহা কমবে এবং এইভাবে আবার 'সেভিং' ও 'ইনভেস্টমেন্টের' সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। কীনেস বললেন যে সুদের হার দিয়ে এরকম ম্যাজিক দেখানো সম্ভব নয়। হ্যারডের ভাষায় : "It was Keynes' central contention that the rate of interest does not do this trick" (p 457)। কীনেস এখানে একটি নতুন ভাবের (Concept) আমদানি করলেন—'liquidity preference"-এর। কাঁচা টাকা হাতে রাখার ইচ্ছাকে 'লিকুইডিটি প্রেফারেন্স' বলা যায়। সঞ্চয় বা সেভিং নির্ভর করে, লোকের এই কাঁচা টাকা হাতে রাখার ইচ্ছার উপর। নানা কারণে এই ইচ্ছা কমতে বাড়তে পারে। কমতে পারে নিশ্চিত একমাত্র টাকার সংখ্যা বাড়লে। সুদের হার নির্ভর করবে, যে-লোকের কাঁচা টাকা রাখবার ইচ্ছা সবচেয়ে প্রবল, সে যে-সুদ পেলে টাকা হাতছাড়া করবে, তার উপর। ব্যাঙ্ক এখানে টাকার সংখ্যা বাড়িয়ে এই ইচ্ছা অনেকটা পূরণ করতে পারে। সুতরাং 'সেভিং' ও 'ইনভেস্টমেন্টের' ব্যালান্সের উপর সুদের হার নির্ভরশীল নয়। মানুষের টাকা রাখার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রবলতার উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।

এখন প্রশ্ন হ'ল, সঞ্চয় ও মূলধননিয়োগের মধ্যে ব্যালান্স তাহ'লে কি উপায়ে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কীনেস বললেন, ব্যালান্স রক্ষার উপায় 'সুদের হার' নামে জাদুদণ্ড নয়, কর্মসংস্থানের স্তর (Level of Employment)। টাকা হাতে রাখার ইচ্ছার প্রভাবে যদি দেখা যায় যে সুদের হার এমন দাঁড়াচ্ছে যে পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে লোকের সঞ্চয়াকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাচ্ছে মূলধননিয়োগের (ক্যাপিটালিস্টদের) ইচ্ছার তুলনায়, তাহ'লে জিনিসের বাড়তি স্টক্ হবে, মুনাফা কমবে, এবং চাহিদা হ্রাসের ফলে কর্মসংস্থানের স্তর নেমে যাবে (অর্থাৎ বেকারত্ব বাড়বে), এবং তার ফলে সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয়শক্তি কমবে, আবার সেভিং ও 'ইনভেস্টমেন্টের ব্যালান্স ফিরে আসবে। অর্থনীতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এইভাবে ঘটতে দেখা যায়। কীনেসের এ-উক্তি ও বিশ্লেষণ একেবারে নতুন। হ্যারড বলেছেন :

"This is the central doctrine of employment. I cannot at all agree with those who suggest that it is the old story with minor modifications. To my judgment it is quite a new story." (p. 459.)

হ্যারড কীনেসের একজন অন্ধ অনুরাগী নন। নানাবিষয়ে, 'জেনারল থিয়োরি' লেখার সময় থেকে, তিনি কীনেসের কঠোর সমালোচনা করেছেন। প্রাচীনদের সঙ্গে কীনেসের মূলগত মিল কোথায়, তাও তিনি তাঁর একাধিক রচনায় দেখিয়েছেন। সুতরাং

গরমিলের কথা বা কীনেসের বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি যা বলেছেন, তা প্রণিধেয়।

'ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকশন' বইয়ের মধ্যে কীনেসের অর্থতত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে লেখকরা মার্ক্স ও মার্ক্সবাদীদের কথা উল্লেখ করেছেন। সোশ্যালিজমের কথাও স্বভাবতঃই উঠেছে। কিন্তু আলোচনা আদৌ সন্তোষজনক নয়। দু'চার কথায় মার্ক্স-প্রসঙ্গ শেষ ক'রে, লেখকরা কীনেসের তত্ত্বব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেছেন। কীনেসের নতুন তত্ত্ব প্রসঙ্গে মার্ক্সের কথা অনেকেরই মনে হবে, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুয়েরই জন্য। মার্ক্সের সঙ্গে কীনেসকে এবং কীনেসের সঙ্গে মার্ক্সকে জড়িয়ে ও মিলিয়ে-মিশিয়ে ফেলার একটা ঝোঁকও তরুণ অর্থবিদ্‌দের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য সুম্পেটার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইকনমিক অ্যানালিসিসের' মধ্যে বলেছেন :

". . . there are the attempts to Keynesify Marx or to Marxify Keynes. These attempts are very revelatory of prevailing ideologies but also indicate awareness of a purely analytic task. It is in fact possible to enrich the meanings of both these authors by points culled from the other, though they are at opposite poles in matters that are of decisive importance analytically. But these attempts have never, so far as I am aware, gone to the length of trying to revive Marx's theoretical apparatus." (Schumpeter: *History of Economic Analysis*, p. 885.)

মার্ক্সের সঙ্গে কীনেসের সাদৃশ্য যে একেবারে নেই তা নয়। মার্ক্সের বিখ্যাত 'রিপ্রডাক্‌শন' স্কিমের কথা কীনেস প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে। মার্ক্সও অর্থনীতি-ক্ষেত্রের দুটি প্রধান বিভাগ স্বীকার করতেন, একটি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন-বিভাগ এবং একটি উৎপাদক-দ্রব্যের উৎপাদন-বিভাগ। 'কনজিউমার্স গুড্‌স' ও 'প্রডিউসার্স গুড্‌সের' উৎপাদনের সম্পর্কের উপরই সবকিছু নির্ভরশীল। মার্ক্স একথাও কীনেসের মতন স্বীকার করেছেন যে মূলধননিয়োগের অসমতা বা কমবেশির জন্যই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের তেজী-মন্দা ও চক্রাকারে উত্থান-পতন, সমৃদ্ধি ও সংকট দেখা দেয়। কীনেসের এই ধরনের উক্তি—"Each time we secure today's equilibrium by increased investment we are aggravating the difficulty of securing equilibrium tomorrow"—নিশ্চয়ই মার্ক্সও অনেকটা সমর্থনযোগ্য মনে করতেন। কিন্তু মার্ক্স ও কীনেসের মূলগত পার্থক্য হ'ল, দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। কীনেস্ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে, তার মধ্যে যতদূর সম্ভব তার ক্রমাগত সংকটের আবর্তনকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন, এবং তার অন্তর্নিহিত বিরোধকে মসৃণ করতে চেষ্টা করেছেন। মার্ক্স ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বিরোধ রয়েছে, তার স্বরূপ ও মূল কারণটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। কীনেস তাই স্বল্পকালস্থায়ী সমাধানের পথ বাতলে দিয়ে বলেছেন যে দীর্ঘকালের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই, কারণ "in the long run we are all dead." মার্ক্স এই স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালের বিচার-স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য মেনে নেননি। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের মূল প্রেরণা হ'ল ক্যাপিটালিস্টের মুনাফার হার। এই মুনাফার হার ক্রমে কমে আসতে থাকে, যত দিন যায়। ক্যাপিটালিস্টদের কাছে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি কাম্য নয়। তাদের কাম্য হ'ল, মূলধনের

'ভ্যাল্‌' রক্ষা করা এবং চূড়ান্তভাবে তার সদ্ব্যবহার করা। তার জন্য তারা সঞ্চয় ও উৎপাদিকাশক্তি দুই-ই বাড়াবার চেষ্টা করে, যাতে তাদের মুনাফা বাড়ে এবং মূলধনের দাম বাড়ে। কিন্তু প্রায়োগিক পরিবর্তনের ফলে মূলধনের গড়ন বদলে যায় এবং তার ফলাফল সহজে এড়ানো সম্ভব হয় না ব'লে, শেষপর্যন্ত মুনাফার হার কমতে থাকে। এদিকে 'অ্যাকুমুলেশন' বা সংরক্ষণ চলতেই থাকে, 'ক্যাপিটাল গুড্‌স' বাড়তে থাকে এবং আগেকার মূলধনের দাম কমতে থাকে। অথচ মুনাফার হার ঠিক রাখতে হবে। সুতরাং উভয়সংকটে প'ড়ে তাদের পক্ষে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ কমাতে হয়, মানুষের ভোগপ্রবণতাকে দমন করতে হয়। কীনেস্‌ যে ভোগাকাঙ্ক্ষার (Propensity to Consume) কথা বলেছেন, তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি সব সময় উৎপাদন-বৃদ্ধি বা আয়-বৃদ্ধির সমানুপাতে হওয়া সম্ভব নয়। এককথায় বলা যায়, কীনেসের মূল সামগ্রিক চাহিদার (effective demand) যে দুটি স্তম্ভ- ভোগের চাহিদা এবং মূলধননিয়োগের চাহিদা—তার কোনটাই ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় 'স্বাভাবিক' বা নর্মাল হ'তে পারে না। শ্রেণীগত শোষণের ফলে অধিকাংশ মানুষের ভোগবৃত্তি অবদমিত হয়ে এমন এক সারল্যের নিম্নস্তরে থিতিয়ে যায় যে তাদের কোন কারণে আয় বাড়লেও ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়ে না বা তার চিরাভ্যস্ত স্তর(traditional consumption-pattern) উন্নীত হয় না। সুতরাং ভোগপ্রবণতার স্তম্ভটি আদৌ মজবুত নয়, অত্যন্ত নড়বড়ে। দ্বিতীয় স্তম্ভ, মূলধননিয়োগাকাঙ্ক্ষার কথা তো আগেই বলেছি, মুনাফার হারের উপর নির্ভরশীল। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অনিবার্য নিয়মেই সেই হার কমবে এবং নিয়োগাকাঙ্ক্ষাও কমবে। সংকট অনিবার্য নিয়মে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসবে।

'ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকশন' বইয়ের দ্বিতীয় অংশে কীনেসীয় অর্থতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ-অভিজ্ঞতার ও ফলাফলের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ফাঁক ও ত্রুটি আছে অনেক। 'ডেফিসিট স্পেন্ডিং' বা 'পাবলিক ইনভেস্টমেন্টের' নীতির সাহায্যে সব ব্যাধির চিকিৎসা হয়ে যাবে এবং রুগ্ন ও জীর্ণ ধনতান্ত্রিক সমাজ পুনর্জীবন লাভ করতে পারবে, মেন্ডেস-ফ্রাসের বই পড়লে এইরকম একটা ধারণা হয়। বোঝা যায়, কেন সব ধনতান্ত্রিক দেশে আজ ন্যাশনালাইজেশন ও সোশ্যালাইজেশনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কীনেসের ভাষাতেই বলা যায়, মূলধননিয়োগ বাড়িয়ে আমরা যখন আজকের স্থিতাবস্থা সৃষ্টি করছি, তখন কালকের স্থিতাবস্থা সৃষ্টির সমস্যাকে আরও জটিল ক'রে তুলছি। কীনেসীয় অর্থনীতি ক্যাপিটালিজম্‌ ও সোশ্যালিজমের মধ্যে একটা বিসদৃশ মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছে,কিন্তু সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে কেন বাধ্য, তার আভাষ কীনেস নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যকাররা যদি এই দিকটা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও ভাল ক'রে আলোচনা করেন তাহ'লে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রকৃতি তাঁদের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। মার্ক্সীয় অর্থবিদ্‌দেরও একটা বড় কর্তব্য আছে। আজকের দিনে, বিশেষ ক'রে, মার্ক্সীয় অর্থনীতির তত্ত্বগত দিকটাকে এবং তার মূল সূত্রগুলিকে পরিষ্কার ক'রে অর্থবিদ্‌দের কাছে তাঁদের তুলে ধরা উচিত। এ-কাজ মরিস ডব ও পল সুইজির মতন দুচারজন অর্থবিদ্‌ খানিকটা করেছেন, কিন্তু মার্ক্সের যে 'থিয়োরেটিক্যাল অ্যাপারেটাস' পুনরুদ্ধার করার কথা সুম্পেটার বলেছেন, তা বোধ হয় আজও কেউ করেননি।

বিনয় ঘোষ

The Colour Curtain: A Report on the Bandung Conference. *By* Richard Wright. Dennis Dobson. London. 12/6*d*.

আমাদের এই যুগটা নাকি খোলাখুলি রাজনীতির যুগ অর্থাৎ যাকে বলে ওপ্‌ন্ ডিপ্লোমেসীর (open diplomacy)। খোলাখুলি আলাপ, খোলাখুলি জোট বাঁধা, খোলাখুলি ঠান্ডা-যুদ্ধের তুমুল কলহ-কোলাহল, লন্ডন, মস্কো, ওয়াশিংটন, পিকিং, নয়াদিল্লীর বার্তা-বিনিময়, যৌথ বিবৃতি সবই "ওপ্‌ন্ ডিপ্লোমেসীর" জয় জয়কার ঘোষণা করছে। মুস্কিল এই যে, অজস্র বিবৃতি, ঘোষণা, সম্মেলন, শুভেচ্ছা, সফর ইত্যাদির দৈনন্দিন মহোৎসব দেখে কী যে হচ্ছে সেটা ধারণা করা সব সময়ে সহজ নয়। আজ যা খুব বড়ো রকম একটা ঘটনা বলে মনে হচ্ছে কাল হয়ত তার কোনোই গুরুত্ব থাকছে না। সমসাময়িক রাজনীতির কোনো ঘটনার গুরুত্ব তাই পাকাপাকি ভাবে হিসাব করা অসম্ভব। গত বৎসর জেনেভা "শীর্ষে" চার প্রধানের বৈঠকের কথাই ধরা যাক; এই বৈঠকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সকলেই প্রায় একবাক্যে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু "জেনেভা সমঝোতার" (Geneva Accord) স্থায়ী মূল্য যে কী তা এখনও কেউ ঠিক মত বলতে পারেন না। বৃহৎ শক্তিরা পরমাণবিক যুদ্ধ বাধাবেন না - এই কি গত বৎসরের জেনেভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত? হয়ত তাই, তবু যুদ্ধের আশংকা কাটেনি, পরমাণবিক অস্ত্র মজুত করার প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়নি, একথাও ঠিক। একই রকম অনিশ্চয়তা, আশানিরাশা, সংশয় ও সম্ভাবনার প্রশ্ন গত বৎসর বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া-আফ্রিকা কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে।

বান্দুং-এ এশিয়া-আফ্রিকার ২৯টী দেশের প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বানে উদ্যোক্তা ছিল ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া। এক দিক দিয়ে এই সম্মেলন ঐতিহাসিক, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডাঃ সোকার্নো বান্দুং-এ তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে অশ্বেতকায় জাতিদের এই সর্বপ্রথম মহাসম্মেলন। রিচার্ড রাইট বান্দুং সম্মেলনের উপরে তাঁর "রিপোর্টাজের" নাম দিয়েছেন "বর্ণ যবনিকা"—*The Colour Curtain*। রাইট আমেরিকান নিগ্রো, বর্ণ বৈষম্য সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও সচেতন। তাঁর বই-এর নাম করণেই সেটা সুস্পষ্ট। কিন্তু বান্দুং-এর এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনকে গায়ের চামড়ার রং-এর নিরিখে চিহ্নিত করা খুব প্রীতিকর মনে হয় না। এর জন্য একমাত্র রাইটই অবশ্য দায়ী নন। বান্দুং সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব ঘোষণা হওয়ার সংগে-সংগে বর্ণ যবনিকার বড় তরফ অর্থাৎ পশ্চিম য়ুরোপ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নানারকম আতঙ্ক, জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে যায়। এশিয়া-আফ্রিকার স্বাধীনদেশের প্রতিনিধিরা নিজেদের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাদা ভাবে আলোচনা করবে, এটা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে অনেকের মনঃপুত হয়নি। বান্দুং সম্মেলনের বিরোধী ভয় এবং বিদ্বেষমূলক অনেকগুলি মন্তব্য রাইট তাঁর বই-এ উদ্ধৃত করে এটা দেখিয়েছেন। বান্দুং-এর প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণ অবশ্য একটা নয়। প্রথমতঃ, যে সব রাষ্ট্র সামরিক জোটবাঁধা নীতির উৎসাহী সমর্থক তারা আশঙ্কা করে নেহেরু তাঁর নিরপেক্ষতার নীতি দিয়ে এশিয়া আফ্রিকার অন্যসব দেশ-গুলিকে আকর্ষণ করবেন। দ্বিতীয়তঃ, বান্দুং-এ চীনকে আমন্ত্রণ করার অর্থ ঠান্ডাযুদ্ধের একটী মূল নীতিকে অমান্য করা। বান্দুং-এ অবশ্য অকম্যুনিষ্ট, কম্যুনিস্ট, গণতন্ত্রী, অগণতন্ত্রী, স্বাধীন এশিয়া আফ্রিকার সকল রাষ্ট্রই আমন্ত্রিত হয়েছিল। আরব রাষ্ট্রগুলির আপত্তি হবে বলে ইসরেলকে আমন্ত্রণ করা হয়নি, আর আমন্ত্রণ করা হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার

বর্ণ যবনিকার কর্তা ব্যক্তিদের।

বান্দুং সম্মেলনকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধী মনে করার যুক্তিসংগত কোনো কারণ ছিল না। পাকিস্থান, ফিলিপাইন্‌স এবং শ্যামদেশ পশ্চিমী রাষ্ট্রদের সংগে সামরিক জোটে আবদ্ধ হলেও বান্দুং সম্মেলনে তারা অংশ গ্রহণ করেছে। বান্দুং-এ যে সব দেশের প্রতিনিধি মিলিত হয়েছিল তাদের মধ্যে যোগ সূত্রটা তাহলে কি? তারা পৃথিবীর প্রাচীনতম, বৃহত্তম দুই মহাদেশ এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রতিনিধি, তাদের দেশগুলি অধিকাংশই গত দশ বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা পেয়েছে -সকলেরই শরীরে এখনও বিদেশী শাসনের কড়া চাবুকের দাগ, মনে আশঙ্কা, নানা বাস্তব কারণেই,--যে আবার কূটনীতির কৌশলে নতুন ছলাকলা প্রয়োগ করে "কলোনিয়ালিজ্‌ম" অর্থাৎ উপনিবেশবাদ তাদের কাঁধে চাপতে পারে। বান্দুং-এ যারা মিলেছিল তাদের নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ, নীতিগত পার্থক্য ছিল, কিন্তু একটী বিষয়ে মোটামুটি ঐক্য ছিল-- বিদেশী কোনো শক্তির হস্তক্ষেপ এশিয়া-আফ্রিকায় তারা বরদাস্ত করবে না। এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলির উপরে এত কাল যারা প্রভুত্ব করেছিল তারা শ্বেতকায় জাতি, এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তা বলে বর্ণ-বৈষম্য এবং বর্ণ-বিদ্বেষকে ভিত্তি করে বান্দুং এর সংকল্প রচিত হয়নি। রাইট যে "বর্ণ যবনিকা"র কথা বারবার উল্লেখ করেছেন সে যবনিকা এশিয়া-আফ্রিকার কালো, বাদামী, হলদে মানুষেরা সৃষ্টি করেনি, সে যবনিকাকে তারা কিছুতেই মানবে না ঠিকই, কিন্তু সেজন্য পশ্চিমী রাষ্ট্র এবং জাতিগুলির বিরুদ্ধে বর্ণগত সংগ্রামের (Race War) ভয়াবহ মূঢ়তাকে এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলি প্রশ্রয় দেবে না। এশিয়া আফ্রিকার সংগে শ্বেতকায় জাতিদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ইতিহাসের অমোঘ বিধান বলে বিশ্বাস করলে সভ্যতার চূড়ান্ত বিপর্যয় হতে পারে। বান্দুং তাই শ্বেতকায় জাতিদের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা নয়। য়ুরোপ আমেরিকার প্রতি বান্দুং-এর আবেদন হল স্বাধীনতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বের। এশিয়া-আফ্রিকার যে সব রাষ্ট্র নেতারা বান্দুং-এ সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই পশ্চিমের শিক্ষা দীক্ষা রাজনীতির আদর্শে আস্থাবান। বান্দুং-এর "বর্ণ যবনিকায়" তাই বর্ণ বিদ্বেষের রং নেই। রাইট কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে তাঁর লেখায় মাঝে-মাঝে একটু বেশি রং চড়িয়েছেন, পশ্চিমী জাতিদের উদ্দেশ করে বলেছেন, এখনও সময় আছে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস অর্জন করবার।

রাইটের রচনারীতি প্রাঞ্জল, বেগবান। তিনি কবি এবং গল্পলেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। নিগ্রো হিসাবে এবং এককালে বামপন্থী রাজনীতির সক্রিয় কর্মী থাকায় তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা গভীর এবং বহুদূরবিস্তৃত। এশিয়া-অফ্রিকার অনগ্রসর অশ্বেতকায় জাতিদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি স্বভাবতই প্রখর, সেই প্রখর সহানুভূতি তাঁর বর্ণনাকে কখনও কখনও অতিরিক্ত আবেগোচ্ছল করেছে, রাজনৈতিক তথ্য এবং ঘটনা বিশ্লেষণের দিকে তিনি নজর দিয়েছেন কম, নানা রকমের মানুষ এবং দৃশ্য বর্ণনায় তাঁর উৎসাহ বেশি। সাড়ে তিনশ বৎসর ওলন্দাজ শাসনের পর মুক্তি পেয়ে ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি কী হয়েছে সে বিষয়ে রাইটের বর্ণনা খুবই হৃদয়গ্রাহী। রাইটের বইখানির এই অংশ গত বৎসর "এনকাউণ্টার" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার মতই এশিয়া আফ্রিকার অন্য সব অনগ্রসর নতুন স্বাধীন দেশের দাবী এবং দায়িত্ব হল, জনসাধারণের সামাজিক আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন। বান্দুং-এ গণতন্ত্র বনাম কম্যুনিজম, এরকম কোনো তত্ত্বগত মতবিরোধ প্রাধান্য পায়নি, তবে সিংহলের সার জন কোটেলাওয়ালা এবং শ্যাম প্রভৃতি অন্য ২।৪টী

দেশের প্রতিনিধি "ঠাণ্ডাযুদ্ধের" ধুয়া তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। রাইট দেখিয়েছেন, কম্যুনিজমের প্রতি ভীতি অথবা প্রীতি কোনোটাই বান্দুং-এর এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের দিগ্‌দর্শন নয়। ডাঃ সোকার্নো তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, "এশিয়া-আফ্রিকার জাতি আমরা দীর্ঘকাল বিদেশীর স্বার্থ অনুযায়ী বিদেশীর হুকুম অথবা সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। দারিদ্র্য এবং হীনতা আমাদের চেপে রেখেছে। সামরিক শক্তি আমাদের নগণ্য, আর্থিক শক্তি আমাদের এখনও যৎসামান্য এবং বিক্ষিপ্ত। ক্ষমতার রাজনীতি (Power Politics) আমাদের জন্য নয়। যে সর্বজনীন অভিজ্ঞতা আমাদের পরস্পরকে এক সূত্রে বেঁধেছে সে হল "কলোনিয়ালিজম" অর্থাৎ বিদেশী শাসন এবং শোষণের অভিজ্ঞতা।" আশ্চর্যের বিষয় বলতে হবে, ফিলিপাইন্‌সের প্রতিনিধি কার্লস রমুলো পর্যন্ত ঘোষণা করেন, "আমরা জানি য়ুরোপীয় সাম্রাজ্য ব্যবস্থার যুগ শেষ হয়েছে। তবে সব য়ুরোপীয়ানেরা এখনও একথা জানে না।" চীনের মনোভাব সম্পর্কে সব আশঙ্কা জল্পনা কল্পনা ব্যর্থ করে এশিয়া আফ্রিকার জাতিগুলির এই সর্বজনীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বন্ধুত্বের আবেদন জানান চৌ এন-লাই। বান্দুং-এ এশিয়া আফ্রিকার নবজীবনের স্পন্দন শেষ পর্যন্ত চৌ এন লাই এবং সার জন কোটেলাওয়ালাকেও আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিল। এ বিষয়ে এবং নেহেরুর ভূমিকা সম্বন্ধে রাইটের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা খুবই প্রাঞ্জল।

"In the end the photographers were able to snap pictures of Chou En-Lai arm in arm with Sir John Kotelawala. Nehru's motives were clear: he wanted Asian unity. India was an Asian power and what happened in Asia should happen only with the consent of Asians. And such a state of affairs could not be brought about, as Nehru knew, without the co-operation of Red China."

নেহেরু জানেন এশিয়া-আফ্রিকার যে কোনো স্বাধীন দেশ অনগ্রসর এবং সামরিক ও আর্থিক বিষয়ে পরনির্ভর থাকলে প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না। প্রত্যেকটী দেশেরই প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ উপায়ে আর্থিক এবং সামাজিক প্রগতির ভিত্তি দৃঢ়বিস্তৃত করা। উন্নতি সময় সাপেক্ষ, তাই আর একটী যুদ্ধের অর্থ এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির স্বাধীনতা নাশ ও বিদেশী প্রভুত্বের পুনরায় প্রতিষ্ঠা। এই বিপজ্জনক সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার উপায় হল এশিয়া-আফ্রিকার দেড়শত কোটী লোকের নৈতিক সংকল্প এবং সহযোগিতা। সামরিক আর্থিক শক্তি এদের এখনো যৎসামান্য; সেই জন্যই এই বিপুল জনশক্তিকে শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্বের সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ করার সার্থকতা আছে। সামরিক শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি করা অসম্ভব, সুতরাং জনশক্তি ও তার নৈতিক সংকল্প কেন্দ্রীভূত করে সমতা রক্ষা করা হল "ওপ্‌ন ডিপ্লোমাসীর" প্রকৃষ্ট পন্থা। বান্দুং সম্মেলন এই বিপুল জনশক্তি নিয়ে নৈতিকশক্তির সূত্র রচনা করতে অগ্রসর হয়েছে। কম্যুনিষ্ট চীনকে অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্য হল, অকম্যুনিষ্ট দেশগুলি চীনের আচরণকে বন্ধুত্বমূলক উপায়ে ঠিক পথে রাখতে চেষ্টা করতে পারবে।

"A multi-nationed agreement with China would, perhaps, give the other non-communist nations a chance to stand together against China if she were caught cheating."

বান্দুং-এর যৌথ বিবৃতি সম্বন্ধে রাইটের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"The Bandung communique was no appeal, in terms of sentiment or ideology, to Communism. Instead, it carried exalted overtones of the stern dignity of ancient and proud peoples who yearned to rise and play again a role in human affairs."

বান্দুং-এ সমবেত হয়েছিলেন সারা পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি জনসমষ্টির প্রতিনিধিরা। আরও মনে রাখতে হবে যে, এশিয়া আফ্রিকার এই জননায়কেরা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত; উপনিবেশবাদ ও বর্ণযবনিকার তাঁরা বিরোধী হলেও পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আদর্শ ও শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নেননি। তাঁদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, দায়িত্ব এশিয়া-আফ্রিকার অনগ্রসর জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন দ্রুত উন্নতির। বান্দুং-এর এশিয়া-আফ্রিকা ঐক্য মর্মগত, দীর্ঘ ইতিহাসের অভিজ্ঞতালব্ধ। তাই বান্দুং এই ঐক্যকে কোনো সামরিক অথবা রাজনৈতিক জোট বাঁধার কাজে লাগায়নি। বান্দুং-এর "ওপ্‌ন ডিপ্লোমাসী" কতদূর সফল হয়েছে, তার ভবিষ্যৎ কি সেকথা আলোচনা করবার সময় এখনও আসেনি। এশিয়া-আফ্রিকার নতুন ইতিহাস রচনার আয়োজনে বান্দুং একটা বৃহৎ সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি এনেছে মাত্র। রাইটের ভাষায় বলতে গেলে,—

"If Asians and Africans can sink their national and religious differences for what they feel to be a common defence of their vital interest, as they did at Bandung, then that sense of unity can serve for other ends, for a rapid industrialization of the lives of the peoples of Asia and Africa, for a shaking loose of the Asian-African masses from a static past."

সরোজ আচার্য

চারদেয়াল—সত্যপ্রিয় ঘোষ। নাভানা। দাম তিন টাকা।

ভাল উপন্যাস বাংলা দেশে বিরল দর্শন। তথ্যটি যতখানি সত্যতার দাবী করুক না কেন, নিঃসন্দেহে এ-প্রত্যয় আমাদের মনের দিগন্তরেখাকে ম্লান ও করুণ করে তুলবে। যাঁরা সাহিত্যের, বিশেষ করে উপন্যাসের পাঠক, তাঁদের কাছ থেকেও অধুনা অভিযোগের অন্ত নেই। তাই নতুন কারো দর্শন প্রথম গ্রন্থেই উপন্যাসে হলে আমাদের এষনা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়।

"চারদেয়াল" সত্যপ্রিয় ঘোষের প্রথম উপন্যাস। এর আগে ইতস্ততঃ তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাস সে কারণে অনেকখানি আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তিনি আমাদের আশা ভঙ্গ করেছেন। লেখক উপন্যাস রচনার কোনো রীতিই অনুসরণ করেননি। উপন্যাস আসলে লেখকমনকে প্রসারিত করে। নানা দিক থেকে বিভিন্ন চরিত্র-গুলিকে তিনি দেখেন। এ-যেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যামেরায় তোলা ছবি। তবু পার্থক্য আছে অনেকখানি। ক্যামেরার ছবির মত উপন্যাসের ছবি শুধু কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আরো কিছু তা প্রতিষ্ঠিত করে, যার অবস্থিতি কাগজের পরিমাপের বাইরে। উপন্যাসের

চরিত্রগুলি সে-কারণে পরিস্ফুট রূপ। যা কথার পর কথা সাজিয়ে আঁকতে হয়। প্রথম থেকে পরিণতি নানা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পরিষ্কার করে প্রকাশের প্রয়োজন। রঙ নেই এখানে কিন্তু কথার অগোছালো ব্যবহারও এ রূপের ভারসাম্য নষ্ট করে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে অনেক নিষ্ঠা, ধৈর্য, উপন্যাসবোধ এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় সে-কারণেই।

উপন্যাসের চরিত্রগুলিরও কয়েকটি মূল্য, কয়েকটি সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু এ-সত্য কোনো বাইরের ভাব অনুসারী নয়। বিভিন্ন চরিত্রের সংঘাতে যার প্রকাশ। সংশ্লেষণ এবং দ্বন্দ্বে তার পূর্ণতা।

এই সামান্য তত্ত্বটি সমস্ত সময় বুঝি লেখকের মনের আড়ালে ছিল। তাই নিত্যপ্রসাদ এবং উন্মেষ, উপন্যাসের মূল দুটি চরিত্রও মনে হয় বিবর্ণ, অপরিণত এবং কার্যতঃ অর্থহীন।

রাজনৈতিক পটভূমিকায় উপন্যাস রচিত হলে আনন্দিত হবারই কথা। "চার দেয়ালে"র পটভূমিকা রাজনৈতিক। ছাত্র ধর্মঘট, দাঙ্গা আর এই ঘটনায় আজীবন অবিবাহিত ইংরেজীর অধ্যাপক নিত্যপ্রসাদ এবং তাঁর ভাগ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র উন্মেষের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা' নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে উপন্যাসের আখ্যানভাগ। এ-ঘটনা নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনারও সূত্রপাত করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও এ'দের আলোচনায় গভীরতা পরিলক্ষিত হয় না। কোথাও সমস্ত ঘটনাটিকে প্রকৃত রাজনৈতিক অথবা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়নি।

নিত্যপ্রসাদকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ হিসেবে যদি লেখক প্রতিপন্ন করতে চেয়ে থাকেন, তবে অনস্বীকার্যভাবে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আর উন্মেষ, উন্মেষের সবটাই আচ্ছন্ন এবং অব্যক্ত। উন্মেষকে এ-ভাবে চিত্রিত করার পেছনে কি লেখকের মানব-চরিত্র সম্পর্কে অনীহা অথবা অজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন?

তবু এদের মধ্যে মেজবৌ নীরজার চরিত্রে কিছু সংগতি আছে। আর তাঁর কথা দিয়েই উপন্যাসের শেষ। নিত্যপ্রসাদ পাগল হয়ে মারা গেলেন। নীরজা তাঁর মেয়েকে কাঁদতে নিষেধ করে বললেন, কাঁদিস না। কে'দে কিছুই হয়না। এই শেষ পরিচ্ছদের সুরটি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। আর এ-কথার সঙ্গে নীরজার মনের আরো একটি দিক আমাদের কাছে হঠাৎ উঁকি মারে।

প্রসঙ্গতঃ আরো একটি বিষয়ের উপস্থাপনা প্রয়োজন। সেটি হ'ল পটভূমিকার ঘটনাপঞ্জির যথার্থ অনুসরণ। সেখানেও লেখক প্রমাদের অবকাশ রেখেছেন। ফলে উপন্যাসের গল্প কোথাও দানা বাঁধেনি। বক্তব্য সর্বত্র অপরিস্ফুট এবং প্রায় সব চরিত্রই শিথিল গঠনে নতপ্রায়।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

Home-coming by Jiro Osaragi. Secker & Warburg. London. 15s.

এশিয়ার নানা দেশের শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সামান্য পরিচয় ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে—সেই সামান্য পরিচয়ও ক্লাসিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—জাপানের ক্ষেত্রে যেমন আর্থার

ওয়েলী প্রমুখ গুণীর অনুবাদ। সমকালীন জাপানের সাহিত্যের কী খবরইবা আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়? আমাদের ইংরিজী-নির্ভর জ্ঞান এখানে অচল, কেননা সমকালীন জাপানী সাহিত্যের অনুবাদ ইংরিজীতেও দুর্লভ। ব্রুষ্টার হরউইৎস্ কৃত ওসারাগির অনুবাদই যুদ্ধোত্তর কালে প্রথম জাপানী উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ। এই বই-এর প্রাথমিক মূল্য সেখানেই; চীনের সঙ্গে আমাদের চেনা সম্প্রতি বর্ধিষ্ণু; কিন্তু জাপানের সঙ্গে হালের উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই প্রথম পরিচয়। অনুবাদের স্বচ্ছন্দতা ও প্রসাদগুণ ইংরিজী অনুবাদ-সাহিত্যের আশ্চর্য প্রগতিকেই সূচিত করে--বিশেষ করে শিল্প বা জীবনের অমিল যেখানে যত বেশি, সেখানে অনুবাদ তত বেশি দুরূহ হয়ে ওঠে।

তবু হয়ত অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে বর্তমান বই অনুবাদের বেশি উপযোগী, কারণ এর নায়ক বেজায় পশ্চিমী চালের জাপানী—স্বদেশে ফিরে সে নিজভূমে পরবাসী বই কিছু নয়। বিদেশের চোখে দেখা জাপান বিদেশী ভাষায় অনেক সহজে ঠাঁই পায়। একান্তভাবে যা জাপানী তাকে ভাষান্তরিত করা আরো কঠিন।

দেশে বিভিন্ন কেলেঙ্কারীর পর কিয়োগো মোরিয়া আশ্রয় নেয় সুদূর সিঙ্গাপুরে। সেই যুদ্ধ বাধল, কঠিন ফাঁদে ফেলল তাকে তারই অঙ্কশায়িনী ছলনাময়ী সায়েকো। শান্তির পর অবশেষে যখন মোরিয়া জাপানে ফিরে এল, তখন সে মনেপ্রাণে বিদেশী। সেই পরবাসীর নিজভূমে তখন নবীন ও প্রাচীনের এক অদ্ভুত সংঘাত সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে ঘা দিচ্ছে। এই পটভূমির দিকে মোরিয়া চেয়ে থাকে, সায়েকোকে তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিদান দেয়, নিজের মেয়েকে বহুদিন পরে আবিষ্কার করে, কিন্তু অবশেষে আবার দেশত্যাগী হয়। পুরোনো জাপানের মায়ায়-ঘেরা কিয়োতো সহরের বাগানে মোরিয়ার সঙ্গে নিজের মেয়ের সাক্ষাতের দৃশ্যটি অপরূপ—প্রায় জাপানী রেখাচিত্রের মতোই শান্ত, সুস্পষ্ট অথচ যেন অতীন্দ্রিয়। চরিত্রাঙ্কনেই নাকি জাপানী উপন্যাসের—বিশেষতঃ ওসারাগির বিশেষত্ব এবং সেই বিশেষত্ব এ বইয়ের বিভিন্ন চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তবু, হয়ত বিদেশী দৃষ্টি-ভঙ্গীর জন্যই, জাপানের স্বধর্মের কোনো নিগূঢ় পরিচয় এ বইয়ে নেই, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যে বিসদৃশ সংঘাত আমাদের দেশে জীবনের নানা স্তরে প্রকট, যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সেই সংঘাতই জাপানী জীবনে আরো ভয়াবহ, আরো বিষণ্ণ ভাবে দেখা দেয়। পরাজয় এখানে কেবল যুদ্ধের হারজিতের খেলা নয়, তার গ্লানি সাংস্কৃতিক পরাজয়ের মধ্যে, প্রাচীন ও নবীনের যোগবিহীন, খেই হারানো অথচ পরস্পরবিজড়িত ব্যর্থতার মধ্যে। জানা নেই, তাই আরো সন্দেহ হয় যে জাপানের ভবিষ্যের এই সার্থক প্রতিমূর্তি কিনা, তার সমাজ-জীবনের আরো গভীরে আত্মস্থ হওয়ার কোনো নিরভিসন্দি পশ্চিমী অভিযানী দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন-প্রবহমান রয়েছে কিনা!

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

অষ্টাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা চতুরঙ্গ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩

আমেরিকার চিঠি

হুমায়ুন কবির

প্রথম দৃষ্টিতে আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে পার্থক্যগুলিই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়-- এবং পার্থক্য যে বহু রয়েছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান পৃথিবীতে যে যন্ত্রযুগ চলেছে, তার পরাকাষ্ঠা হয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। ভারতবর্ষে আজো আমরা যন্ত্রসভ্যতার বুনিয়াদ পুরোপুরি স্থাপন করতে পারিনি। ভারতবর্ষে শতকরা আশীজন লোক গ্রামবাসী, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। আমেরিকায় শতকরা পনেরো জনেরও কৃষিকাজের সঙ্গে কোন যোগ নেই—অধিকাংশ লোক নগরে সহরে জনপদে বাস করে। তবু আমেরিকা যে-ফসল উৎপাদন করে, তাতে সকলে পর্যাপ্ত খেয়ে-দেয়েও তারা পৃথিবীময় খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করতে পারে। ভারতবর্ষে কিন্তু আমরা প্রয়োজনীয় খোরাক জোটাতে এখনো পারি না, আমেরিকা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধান বা গম আমদানী না করলে আমাদের চলে না। মানুষ বা জন্তুর মেহনত ভিন্ন আমাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকায় যন্ত্রশক্তির ব্যবহারে ঘরে বাইরের সব কাজ সম্পন্ন হয়। কারখানার তো কথাই নেই, ক্ষেতে-খামারে, এমনকি গৃহস্থালির কাজেও দিন দিন যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। যন্ত্রের ব্যবহারে আমেরিকার আর্থিক উন্নতিও অসাধারণ--খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-আসাক, কাঁচামাল বা বিলাস-সামগ্রী সবই অফুরন্ত। ভারতবর্ষে আমাদের জনপ্রতি বার্ষিক আয় তিনশো টাকারও কম—আমেরিকায় বোধ হয় দশ হাজারেরও বেশী। বস্তুতপক্ষে এক মানুষ ছাড়া আমেরিকায় আর কোন জিনিষেরই অভাব নেই। আমাদের সমস্যা জনতার সংখ্যাধিক্য—বহুক্ষেত্রে উপযুক্ত লোকেরও কাজ মেলে না, বেকার হয়ে বসে-থাকতে হয়—আমেরিকার সমস্যা যে কাজ করবার মতন যথেষ্ট লোক নেই, তাই বহুক্ষেত্রে মানুষ কাজ খোঁজে না, কাজ মানুষ খুঁজে বেড়ায়।

পার্থক্যে ফিরিস্তি আরো বাড়ানো চলে। পৃথিবীর ধনীশ্রেষ্ঠ এবং দরিদ্রতম দেশের মধ্যে বহু বিষয়ে অন্তর থাকবে, তাতে বিচিত্র কি? কিন্তু আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য যেমন রয়েছে, বহু বিষয়ে মিলও তেমনি সুস্পষ্ট। দুই দেশের লক্ষ্য এবং আদর্শে প্রথম দৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও এক অন্তর্নিহিত গভীর ঐক্য রয়েছে।

দুই দেশেরই আদর্শ সাম্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সকল মানুষের জন্য সুষ্ঠ সামাজিক জীবনের ব্যবস্থা। আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, নানা সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা সকল নাগরিককে সমান সুবিধা ও সুযোগ দান, সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা উপায়ে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা দুই দেশেই জনকল্যাণ রাষ্ট্র-গঠনের চেষ্টা চলেছে। দুই দেশেই বিভিন্ন ও বিচিত্র সম্প্রদায়ের সমন্বয় ও একীকরণের ভিত্তিতে এক নতুন সুসংবদ্ধ সমাজ-গঠনের প্রয়াস সুস্পষ্ট। দুই দেশের মূল মানবিক আদর্শ এক, এবং দুই দেশেই প্রাত্যহিক জীবনে আদর্শবিচ্যুতির কমবেশী নিদর্শন মেলে।

ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা দুই-ই বিরাট দেশ। বস্তুতপক্ষে আমেরিকা ভারতবর্ষের চেয়েও আয়তনে বড়। ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনা করলে এ তফাৎ খুব সহজে ধরা পড়ে। ইয়োরোপে ঘণ্টাখানেক চললেই হাওয়াই জাহাজ একদেশ অতিক্রম করে অন্য দেশে পৌঁছে যায়। ভারতবর্ষে দিল্লী থেকে মাদ্রাজ যেতে সাত আট ঘণ্টা সময় লাগে, আমেরিকায় নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো যেতেও দিন কেটে যায়—সারাদিন চলেও হাওয়াই জাহাজ দেশের সীমানা অতিক্রম করল না, ইয়োরোপে এ-রকম ঘটা সম্ভব নয়। রেলগাড়ীতে বা মোটরে চললে আমেরিকা বা ভারতবর্ষের বিরাট আয়তন আরো ভাল করে বোঝা যায়।

বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়াও ভিন্ন রকমের। ভারতবর্ষে যেমন হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের চিরগ্রীষ্মের মৌসুমের পরিচয় মেলে, আমেরিকায়ও তেমনি কঠোর শীত এবং কঠিন গ্রীষ্মের প্রভাব সমান ভাবে উপলব্ধি হয়। দুই দেশেই পাহাড় পর্বত বনজঙ্গল অধিত্যকা উপত্যকা সমভূমির অভাব নেই।

ভারতবর্ষের মতন আমেরিকার জনসংখ্যাও বিচিত্র। বহু বিভিন্ন জাতি, দেশ, ধর্ম ও ভাষার নানা সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে বর্তমানের মার্কিন জাতি গড়ে উঠেছে। এ দেশে যেমন আর্য অনার্য দ্রাবিড় চীন শক হূন পাঠান মোগল প্রভৃতি নানা মানুষের বিচিত্র ধারার সমাবেশে ভারতীয় জাতিত্ব, আমেরিকায়ও ঠিক সেই একই ইতিহাসের পরিচয় মেলে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ এবং জাতির তো কথাই নেই -ইংরেজ ফরাসী জার্মান রুষ ইতালিয় ওলন্দাজ চেকোশ্লোভাক প্রভৃতি যত স্যাক্সন, টিউটন, ল্যাটিন বা স্লাভনিক জাতি রয়েছে, সবাই আমেরিকায় এসে ভিড় করেছে· এশিয়া আফ্রিকার বহু জাতিও আমেরিকার জনসমুদ্রে বিলীন বা বিলীয়মান হয়েছে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে এ সমন্বয় ধীরে ধীরে সাধিত হয়েছে—আমেরিকায় সব জিনিষই তাড়াহুড়ো করে সম্পন্ন হয়। গত একশো বছরের মধ্যে আমেরিকায় নানা দেশের নানা ভাষার নানা ধর্মের লোক ভেঙে চুরে এক নতুন মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

আমেরিকার বিকাশের এই যে ইতিহাস, তার প্রভাবে মার্কিন নরনারীর চরিত্রে কতগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষণ কথাটি ইচ্ছা ক'রেই ব্যবহার করেছি, কারণ একদিক থেকে দেখলে তাদের গুণ মনে করা চলে, আবার দৃষ্টিভঙ্গীর একটু বদল হলে গুণ দোষে পরিণত হয়। আমেরিকায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিষ প্রথম নজরে পড়ে সেটি হল দেশবাসীর আশ্চর্য সহৃদয়তা ও আতিথ্য। পৃথিবীর সব দেশেই সাধারণ মানুষের মনে বিদেশীর প্রতি সহানুভূতি ও সম্প্রীতির পরিচয় মেলে। সব দেশেই জনসাধারণ বিদেশীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাহায্য করবার স্পৃহা বোধ হয় অন্য দেশের তুলনায় আরো বেশী প্রবল। এ সহৃদয়তার অন্যতম কারণ আমেরিকার বিকাশের ইতিহাস। প্রধানত ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেই আমেরিকায় ভিড় করেছে।

স্বদেশে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়নি বলেই তারা দেশত্যাগী হয়েছিল। বহুক্ষেত্রেই কপর্দকহীন অবস্থায় তারা আমেরিকায় পৌঁছেচে, এবং খানিকটা নিজের পরিশ্রমে, খানিকটা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশী লোকের সাহায্যে অর্থ ও সামাজিক স্থিতি অর্জন করেছে। যারা নিজেরা দুঃখকষ্টে মানুষ, তারা সহজেই অন্যের দুঃখকষ্ট বুঝতে পারে। যারা বিদেশে বিভূঁয়ে একান্ত একাকী জীবনযাত্রা সুরু করেছে, তারা যে পরদেশীর প্রতি সহজেই সহানুভূতিশীল হবে, তাতে আশ্চর্য কি? শুধু তাই নয়। যে ভাবে প্রথম যুগে আমেরিকার সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাতে পরস্পরকে সাহায্য না করলে ধনৈশ্বর্য অর্জন তো দূরের কথা, বহু লোকের পক্ষে বেঁচে থাকাই কঠিন হ'ত। সীমাসরহদ্দের লোকেরা চিরকালই অতিথিবৎসল এবং পরস্পরের সহায়ক হয়ে থাকে। তারা হয়তো ভব্যতা জানে না, কিন্তু তাদের হৃদ্যতা এবং দরদ সুস্পষ্ট। আমেরিকার জনসাধারণের চরিত্রেও এ দুটি গুণের পরিচয় মেলে।

পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ পরস্পরের সহযোগিতা আকাঙ্খা করে, এবং তারই ফলে সমাজ গড়ে ওঠে। সামাজিক মনোবৃত্তির একটি প্রধান প্রকাশ আতিথেয়তা। খোরাকের অভাব হলে অবশ্য মনের এ স্বাভাবিক স্পৃহা ক্ষুন্ন হয়ে আসে। আমাদের দেশে আর্থিক ও সামাজিক সংগঠন বদলের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে জনসাধারণের আতিথেয়তার পরিবর্তন হচ্ছে, তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগেকার দিনে গ্রামে যখনই অতিথি অভ্যাগত আসত, তাদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি হ'ত না। রাত দুপুরে কারো বাড়ীতে উপস্থিত হলেও গৃহকর্তা অতিথি সৎকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করত। আজকাল সহরে একজনের জায়গায় দুইজন অতিরিক্ত লোকের খোরাক জোগাতে হলে গৃহস্বামী এবং বাড়ীর কর্ত্রীর ভাবনার অন্ত থাকে না। তার কারণও স্পষ্ট। পূর্বে ধানচাল তরিতরকারীর ততটা অভাব ছিল না। বিশেষ করে গ্রামে সহজেই এ সব জিনিষ মিলত। আজকাল সহরে সংসারের প্রয়োজনমত বরাদ্দ জিনিষ ওজন করে কেনা হয়—তাই হঠাৎ বেশী খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজন হলে সে দাবী মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া অভাবের সংসারে মানুষের হৃদয়ের প্রসারও কমে আসে। আমেরিকায় বেশীরভাগ লোক প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে। তাই তাদের সমাজে অতিথিসৎকারের রেওয়াজ আজও পুরোপুরি বজায় রয়েছে।

বস্তুতপক্ষে আমেরিকায় সাধারণ লোকের সহৃদয়তা ও অতিথি-প্রীতি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাদের বাড়ীর দরওয়াজা যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত। পথে কারো সঙ্গে পরিচয় হল--হয়তো হাওয়াই জাহাজে বা ট্রেনে বা বাসে পাশাপাশি বসে কথার সুরু, এবং তারই ফলে পরিচয়। অথচ সেই অল্পক্ষণের পরিচয়ের ভিত্তিতেই তারা আগন্তুককে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে বসে, বিশেষ করে দূরাগত বিদেশী অভ্যাগতের জন্য তাদের আতিথেয়তার প্রকাশ আরো বেশী দরাজ, বলে, এসে দু'চার দিন আমাদের অতিথি হয়ে থেকে যাও। সে আমন্ত্রণ কেবল লোক দেখানো মৌখিক আমন্ত্রণ নয়। গ্রহণ না করলে অনেক সময় তারা ক্ষুন্ন হয়। নিজে অথবা নিজের পূর্বপুরুষ বিদেশে এসে প্রথম যে অপরিচয় ও অসহায়তা বোধ করেছে, বিদেশী দেখলে যেন তাঁরই স্মৃতি আমেরিকাবাসীর মনে জাগে। অপরের সাহায্য এবং সহানুভূতির ফলে সেই প্রথম সঙ্কোচ ও দ্বিধা কাটিয়ে যে ভাবে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, আজ বিদেশীর প্রতি সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রসারিত করে তারা যেন সেই পূর্বঋণ শোধ করতে চায়।

মার্কিনবাসীর সহৃদয়তা ও অতিথিপ্রীতি ছাড়া আরও একটি গুণ সহজেই বিদেশীর

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্কিনসমাজে ছোটবড়র তফাৎ যে ভাবে মুছে গিয়েছে, তা সত্যি বিস্ময়কর। সামাজিক সাম্য এবং গণতন্ত্র বোধ হয় আর কোথাও এত প্রবল ভাবে দেখা দেয়নি। সব রকমের মেহনতের মর্যাদাও অন্য কোথাও এত স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। ব্যাঙ্কের বা কারখানার ম্যানেজার হয়তো মাসে দশ পনেরো হাজার টাকা রোজগার করে, কারখানার মজুরের অথবা বাড়ীর চাকরাণীর আয় হয়তো মাসে পনেরোশো বা দুহাজার টাকা, কিন্তু তাই বলে ম্যানেজার মজুর বা চাকরাণীর উপর তম্বী করে না। বোধ হয় করতে সাহস পায় না। পৃথিবীর নানা দেশের লোক নানা রকমের সভ্যতা আচারবিচার নিয়ে আমেরিকায় ভিড় করেছে বলে বিশেষ কোন সভ্যতা আচারবিচারের প্রতি তাদের মোহ কম। প্রথম অবস্থায় যখন বনজঙ্গল সাফ করে পাহাড় পর্বত কেটে তারা গ্রাম জনপদ সহরের পত্তন করেছে, তখন শ্রমবিভাগের কথা কেউ ভাবেনি, ভাবা সম্ভব ছিল না। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সামনে যখন যে কাজ এসেছে তাই করেছে, এবং তার ফলে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি বা ব্যবসায়ের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আপনা আপনি লোপ পেয়েছে।

বিরাট দেশ, ঐশ্বর্য অফুরন্ত এবং কাজের পরিমাণে লোকসংখ্যা কম বলেও মার্কিন দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তির মর্যাদার এত বিকাশ। পৃথিবীর অন্য প্রায় সব দেশেই কাজের তুলনায় উমেদার বেশী, তাই প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষ সবাইকে রুজীর ভাবনা ভাবতে হয়, কাজের সন্ধানে ঘুরতে ফিরতে হয়। মার্কিন দেশে কাজের তুলনায় লোকসংখ্যা কম বলে সেখানে মানুষ কাজ খুঁজে বেড়ায় না বহুক্ষেত্রে কাজই মানুষের অপেক্ষায় বন্ধ হয়ে থাকে। মার্কিন ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই মোটামুটি ভাবে এ কথা সত্য। মাঝে দুয়েকবার ব্যবসা বাণিজ্য মন্দার দরুণ বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু পূর্বে বেকার হলেই লোকে পশ্চিমযাত্রা করত, এবং সীমান্তদেশের অনাবাদী জায়গায় বনজঙ্গল কেটে নতুন গ্রাম জনপদের পত্তন করত। এমনি করে যখন মার্কিন দেশের লোক প্রসান্ত মহাসাগরের কূলে পৌঁছল, তখন তাদের পশ্চিমের অভিযান বন্ধ হল বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও টেকনিকের নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে নতুন ধরনের ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে উঠতে সুরু করল। মার্কিন দেশে যে পৃথিবীর অন্য সব দেশের তুলনায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেশী, কাজের তুলনায় লোকের অভাব তার অন্যতম কারণ।

লোকসংখ্যার অভাব বলে একদিকে যেমন যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধও প্রবল হয়ে উঠেছে। যেখানে মানুষকে সেধে কাজে লাগাতে হয়, সেখানে যে কৃষিজীবী মজুর সকলেই নিজেদের দাবী বাড়িয়ে তুলবে, তাতে বিচিত্র কি? পূর্বেই বলেছি যে বাড়ীর চাকরাণীও মাসে হয়তো পনেরোশো দুহাজার টাকা রোজগার করে, তার চেয়ে কম রুজী বোধ হয় কারোই নেই। একথা হয়তো খানিকটা আশ্চর্য শোনাবে, কিন্তু আমেরিকার সর্বোচ্চ বেতনের তুলনায় সর্বোনিম্ন বেতনের অনুপাত ভারতবর্ষ বা রুষদেশের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী বা ব্যবসায়ীর আয় সর্বনিম্ন কর্মচারীর আশী গুণ বা একশো গুণ, সাম্যবাদী রুষদেশেও এ অন্তর প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গুণ, কিন্তু ধনতান্ত্রিক আমেরিকায় অন্তর পনেরো বিশগুণের বেশী নয়। সকল ধরনের রুজীতেই খোরাক পোষাকের সচ্ছল ব্যবস্থা হয় বলে কারো মনে বৃত্তি বা ব্যবসায় সম্বন্ধে কোন হীনতাবোধ নেই। বাড়ীর চাকরাণী সেজেগুজে বিউইক গাড়ী চালিয়ে কাজ করতে আসে, বাড়ীতে পৌঁছে কাজের পোষাক পরে দু'তিন ঘণ্টা কাজ করে আবার পোষাক বদল করে বিউইক গাড়ী হাঁকিয়ে ফিরে যায়। কাজের সময়টুকু ছাড়া

বাকী সময়ে মনিব চাকর চারকরাণীর কোন তফাৎ থাকে না। রাস্তায় ঘাটে হোটেলে থিয়েটারে সাজপোষাক বা চলন দেখে কারো বলার সাধ্য নেই যে কে মনিব আর কে চাকরাণী। সকলেই প্রায় একই ধরনের লেখাপড়া শেখে বলে সামাজিক সাম্যবোধ আরো প্রবল হয়ে উঠে।

পৃথিবীর আর কোন দেশেই বোধ হয় এত বেশী সামাজিক সাম্যভাব দেখা যায় না। মানুষে মানুষে প্রায় সমস্ত পার্থক্যই মার্কিন দেশে দূর হয়ে গিয়েছে। কেবল বর্ণবৈষম্যের বেলা তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিগ্রো আমেরিকানদের প্রতি মার্কিন দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে যে অনাদর ও অবহেলা, মার্কিন গণতন্ত্রের পক্ষে এতবড় কলঙ্কের কথা আর কিছুই নেই। দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রোদের জন্য থাকবার জায়গা আলাদা, খাবার ব্যবস্থা আলাদা, স্কুল হাসপাতাল আলাদা, রেলগাড়ীতে পৃথক আসন। এমনকি রেল-স্টেশনের আসা-যাওয়ার দরজাও আলাদা। এক কল থেকে তারা জল খেতে পায় না, ধর্মানুষ্ঠানের জন্য গির্জা আলাদা, এমনকি মৃত্যুর পরেও আলাদা কবরস্থান। এ সম্বন্ধে দক্ষিণ অঞ্চলের বহু শ্বেত আমেরিকানের মনে কোন দ্বিধা পর্যন্ত নেই। এটাও খুবই বিচিত্র লাগে যে পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ পারশিক, আরবী, ভারতীয়, চীনা, জাপানী, দক্ষিণ আমেরিকান বা আমেরিকার আদিবাসী হলে মার্কিন নাগরিকের মনে সে জন্য কোন খেদ থাকে না, বরং বহুক্ষেত্রে বেশ খানিকটা গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে সে কথা জাহির করে, কিন্তু যদি কোনক্রমে কোথাও বিন্দুমাত্র নিগ্রোরক্তের ছোঁয়াচের সন্দেহ থাকে, তবে সে বিষয় একেবারে চেপে যায়। বস্তুতপক্ষে নিগ্রোরক্তের সম্পর্কের চেয়ে মার্কিনবাসীর পক্ষে গুরুতর অপমান আর কিছুই নেই। প্রকৃতি কিন্তু এ মনোভাবের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও দিনে দিনে জমিয়ে তুলছে। প্রায় তিন শতাব্দী একত্র বসবাসের ফলে ইয়োরোপিয়ের ঔরসজাত নিগ্রো-রমণীর সন্তানের সংখ্যা কম নয়। তাদের মধ্যে অনেকের আকৃতি প্রকৃতি চেহারায় পুরো-পুরি ভাবে পিতৃবংশের প্রভাব বিদ্যমান, বহুক্ষেত্রে নিগ্রোরক্তের কোন বহির্লক্ষণের পরিচয় মেলে না। সমাজবিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই আজ এ-কথা মেনে নিয়েছেন যে প্রতি বৎসর নিগ্রোবংশোদ্ভূত এই ধরনের প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী বর্ণরেখা অতিক্রম করে শ্বেত আমেরিকানদের মধ্যে বিলীন হয়। যোলো কোটি লোকসংখ্যায় ত্রিশ হাজার অবশ্য খুবই সামান্য অনুপাত, কিন্তু বৎসরের পর বৎসর এ ভাবে নিগ্রোরক্ত যদি শ্বেত আমেরিকানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, তবে একদিন এমন সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তির পক্ষেই অবিমিশ্র শ্বেতরক্তের গর্ব করা সম্ভব হবে না।

ঐতিহাসিক পরম্পরার ফলেই আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে শ্বেতসম্প্রদায়ের মধ্যে নিগ্রো-বিদ্বেষের প্রথম প্রকাশ। কারো প্রতি অন্যায় করলে অন্যায়কারী স্বভাবতই নিজের কার্যকলাপের জন্য অজুহাত খোঁজে, এবং ফলে নিপীড়িতের প্রতি অনুকম্পা বা সহানুভূতির বদলে বহুক্ষেত্রে বিদ্বেষ ও বিরাগের পরিচয় মেলে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার শ্বেত-সম্প্রদায় আফ্রিকার নিরীহ ও অসহায় নরনারীকে গৃহচ্যুত করেছে, দাসত্বে নিপীড়িত করেছে, এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের মানুষেতর প্রাণী গণ্য করেছে। আমেরিকা যেদিন স্বাধীন হল, সর্বমানবের সাম্য ও ঐক্যের ঘোষণাবাণী প্রচারিত করে পৃথিবীর ইতিহাসে গণতন্ত্রের নতুন যুগ প্রতিষ্ঠা করল, সেদিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষী নিগ্রোসমস্যার কথা ভোলেননি। তখনো সময় হয়নি বলে স্পষ্ট ভাবে নিগ্রোদের স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি বটে, কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী এমন ভাবে রচনা করেছিলেন যে তার পরিপূর্ণ প্রকাশে নিগ্রোদের প্রতি অন্যায় দূর হতে বাধ্য।

বস্তুতপক্ষে মার্কিন দেশে যাঁরা চিন্তাশীল ও উদারপ্রাণ, নিগ্রোসমস্যা নিয়ে তাঁদের মনে লজ্জা ও ক্ষোভের অন্ত নেই। লিঙ্কনের নাম আমেরিকার সমস্ত প্রেসিডেণ্টদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত, এবং তার একটি প্রধান কারণ যে দক্ষিণ অঞ্চলে দাসত্ব প্রথা লোপ করে তিনি নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন। প্রথম যখন এ সমস্যার উদয় হয়, তখন সম অধিকারের কথা তিনি ভাবেননি, কিন্তু একবার সমস্যা সমাধানে অবতীর্ণ হয়ে তিনি দেখেছিলেন যে জাতির যে কোন অংশকে অপমানের অর্থ সমস্ত জাতির অপমান, দেশের কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে দুর্বল রাখার অর্থ সমস্ত দেশের শক্তিহানি। আজো নিগ্রোজাতির অধিকার সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু গত বিশ বৎসরে, এবং বিশেষ করে যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ শেষে আমেরিকার নিগ্রোসম্প্রদায় যে ভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং হচ্ছে, তাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার সমাজ জীবনের এ কলঙ্ক দূর হয়ে যাবে। আজ দুবছর হল আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত করেছে, তার ফলে শিক্ষায়তনে বর্ণবিভেদের গ্লানি দূর হতে বাধ্য। যদি শৈশব থেকে শ্বেত অশ্বেত নিগ্রো অনিগ্রো বালক বালিকা স্কুলে কলেজে একই আবহাওয়ায় মানুষ হয়, তবে কালক্রমে বর্ণ বিদ্বেষ ও বর্ণবিভাগ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এ আশা অন্যায় নয়।

মার্কিন দেশের নরনারীর চরিত্রের আর একটা লক্ষণও সহজেই বিদেশীর চোখে ধরা পড়ে। মার্কিনবাসী কোন জিনিষই বেশীদিন আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় না। তারা ঘর-বাড়ী সহজে বদল করে, পোষাক আষাক তো অনবরত বদলায়, সামাজিক ব্যবস্থা বা রীতি-নীতি বদলাতেও তাদের বিশেষ আপত্তি নেই। মার্কিনবাসীর এ পরিবর্তনশীলতাও মার্কিন ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। বেশীর ভাগ মার্কিনবাসী বিদেশাগত। আমেরিকায় কারো এক পুরুষ, কারো দুপুরুষ তিন পুরুষ, বড়জোর কারো চার পাঁচ পুরুষ কেটেছে। এক পূর্বাঞ্চলে নিউ ইংলণ্ড বা নয়া ইংলণ্ড বাদ দিলে বাকী সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে বসতির পত্তন হয়েছে গত একশো বছরে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির যে সব মানুষ আমেরিকার প্রবল টানে দেশত্যাগী হয়ে বেরিয়ে এল, তাদের প্রায় সকলেই সমাজবিদ্রোহী। নিজেদের সমাজের প্রতি তাদের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। বহুক্ষেত্রে বিরাগ ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমেরিকায় এসে এইসব বিভিন্ন সমাজের বিদ্রোহী এবং অসন্তুষ্ট জনপ্রবাহ এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মিলনের ফলে কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থার বন্ধন দিনে দিনে আরো শিথিল হয়ে পড়ল। ইতালিয় রোমান ক্যাথলিক পিতামহ, রুষ সনাতনপন্থী পিতামহী প্রটেষ্টাণ্ট ইংরেজ মাতামহ ও স্প্যানিশ ক্যাথলিক বা জর্মান ইহুদী মাতামহীর পৌত্র-প্রপৌত্র যে কোন বিশেষ ধর্ম বা জাতির জন্য বিশেষ অনুরাগ অনুভব করবে না তাতে বিচিত্র কি? এ পাঁচমিশেলীর ফলে স্থাবর বা শাশ্বত জাতীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠা অসম্ভব, এবং নিত্য নূতন পরীক্ষার প্রতি আগ্রহবান হওয়া স্বাভাবিক। আমেরিকার ইতিহাসে যেভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে, তার ফলেও মার্কিনবাসীর মনে নতুনের প্রতি আগ্রহ প্রবলতর ভাবে দেখা দিয়েছে।

আমেরিকার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে যে বিরাট সম্ভাবনা, তার প্রতিক্রিয়ায়ও মার্কিনবাসী নতুনের উপাসক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় কেউই বর্তমান নিয়ে তুষ্ট নয়—প্রত্যেকেই ভাবে যে অদূর ভবিষ্যতে সকলভাবে তার উন্নতি হবেই। চাষীর ছেলে রাষ্ট্রপতি হয়েছে, মজুরের ছেলে কালক্রমে মিলের মালিক, বাড়ীর চাকরাণী ভাবে সে সে-ও একদিন চিত্রতারকা হয়ে যশ ও অর্থের উচ্চতম শিখরে উঠবে। কাজেই স্বভাবতঃ আয়ত্ত

জিনিষের প্রতি মার্কিনবাসীর মোহ নেই, অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় তার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ। মার্কিন মনোবৃত্তির এ বিশেষ প্রকাশ আজ একশো বছরেরও আগে দ্য তকভিল লক্ষ করেছিলেন। মার্কিন জাহাজ তেমন মজবুত নয় দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করায় জাহাজী উত্তর দিল যে বেশী মজবুত জাহাজ তৈরী করে কি লাভ? দশ বৎসরের মধ্যে জাহাজ নির্মাণের যে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে, তার ফলে এ ধরনের জাহাজ অচল হয়ে যাবে, কাজেই দশ বছর চলে, তার চেয়ে বেশী মজবুত জাহাজ তৈরীর কোন সার্থকতা নেই! একশো বছর আগে জাহাজের খালাসী যে উত্তর তকভিলকে দিয়েছিল, আজো তাই মার্কিন-বাসীর অন্তরের কথা। ইংরেজ রোলসরয়েস গাড়ী তৈরী করে, পঞ্চাশ বছরেও তার দেহ, তার এঞ্জিন খারাপ হয় না। আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম গাড়ীও পাঁচ সাত বছরের বেশী টেকে না— টেকবার জন্য তৈরী হয়নি। বছর বছর গাড়ী বদলের রেওয়াজ হেনরী ফোর্ডের নতুন অবদান নয়—ফোর্ডের কৃতিত্ব এই যে মার্কিন মনোভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করে তার অভিলাষ পূরণের ব্যবস্থা তিনিই প্রথম করেছিলেন।

[ক্রমশঃ]

জাপানী কবিতা

শরতের ঘাসে হাওয়ার ঝাপটা
শুভ্র শিশিরকণা
চূর্ণ রত্নহারের মত ছড়ায়।

বুনিয়া নো অসায়াসু

শিরা ৎসুইউ নি
কাজে নো ফুকিশিকু
আকি নো নো ওয়া
ৎসুরানুকি তোমেনু
তামা জো চিরিকেরু

শরৎ এসেছে অগোচরে,
বাতাসের স্বরে শুধু, কি যে শঙ্কাভাস!

ফুজিওয়ারা নো তোশিয়ুকি

আকি কিনু তো
মে নি ওয়া সায়াকা নি
মিয়েনে দোমো
কাজে নো ওতো নি যো
ও দোরো কারে নুরু

আস্কার স্থির জলে
কুয়াশা ঘনায়।
স্মৃতি অত সহজে মোছে না।

ইয়ামাবে নো আকাহিতো

আস্কা গাওয়া
কাওয়া ইয়োদো সারায্
তাৎস্ কিরি নো
ওমোই স্গ্ বেকি
কোই নি আরানাকু নি।

পথ চেয়ে থাকা হয়নি ঠিক।
ভালো হ'ত ঢের ঘুমানো, স্বপ্ন দেখা,
সারা রাত জেগে কাটান, আর এই--
মন্থর চাঁদ ডুবতে দেখার চেয়ে।

আকাজোমে এমো

ইয়াস্রা ওয়া দে
নে না মাশি মোনো ওহ্
সাইয়ো ফ্কেতে
কাতাব্কু মাদে নো
ৎসাকি ওহ্ মিশি কানা।

একাকী শুয়ে কাঁদার রাত
জানো কি কত দীর্ঘ?

কম্যাণ্ডার মিচিৎসুনার জননী

নগেকি ৎসুৎসু
হিতোরি নেরু ইয়ো নো
আকুরু মা ওয়া
ইকা নি হিসাশিকি
মোনো তো কা ওয়া শিরু।

কে যেন যায়।
সেই কি গেল
যখন মরি ভেবে
নিশীথ চাঁদ
মেঘেরা দেয় ঢেকে।

মুরাসাকি শিকিবু

মেগুরি আইতে
মিশি ইয়া সোরে তো মো
ওয়াকানু মানি
কুমো কাকুরেনিশি
ইয়োহা নো ৎসকি খানা

অস্ত যাওয়া চাঁদের মত
শীতল সে জনারে
ছেড়ে আসার পর
মেঘের গায়ে ভোরের আলো
লাগে আমার সব চাইতে বিষ।

মিবু নো তাদামিনে

আরি আকে নো
ৎসুরে নাকু মিয়েশি
ওয়াকারে ইয়োরি
আকা ৎসকি বাকারি
উকি মোনো ওয়া নাশি

গ্রীষ্মের ক্ষেতে আগাছার মত
রটনা বেড়েই চলে।
আমি আর প্রিয়া
বাহুবন্ধনে সুপ্ত।

খাকিনোমোতো হিতোমারো

হিতো গোতো ওয়া
নাৎসু নো নো কুসা তো
শিগেকু তো মো
ইমো তো ওয়ারে তো শি
তাজুসাওয়ারিনেবা

কোনো পথ নেই
কোথাও এ পৃথিবীতে
সবচেয়ে দূর পাহাড়েও মৃগ
কাতর কণ্ঠে ডাকে।

ফ্যুজিওয়ারা নো তোশিনারি

ইয়ো নো নাকা ইয়ো
মিচি কোসো নাকেরে
ওমোই ইরু
ইয়ামা নো ওকু নিমো
শিকা জো নাকানারু

পলাতক এক ঢেউএর চূড়া-ই
যেন হিমে জমে গিয়ে
পাহারায় খাড়া শাদা সারসটি
বন্দর মোহানায়।

সম্রাট উদা

আশি তাজু নো
তাতেরু কাওয়া বে ওহ্
ফুকু কাজে নি
ইয়োসেতে কায়েরানু
নামি কা তো জো ওমোউ

পাহাড়ী গাঁয়ে পাতার রাশি
　　হাওয়ায় মর্মরিত,
স্বপ্নসীমা ছাড়িয়ে কোথা
　　গহন গভীর রাতে
　　হরিণ ওঠে ডেকে।

মিনামোতো নো মোরোতাদা

ইয়ামা যাতো নো
ইনাবা নো খাজে নি
নেজামে শিতে
ইয়ো ফুকাকু শিকা নো
কোয়ে ওহ্‌কিকু কা না

বসন্তের বাগানে যেখানে
কুসুমিত পীচের আভায়
আলো-করা তলাকার পথ,
　　কে একটি মেয়ে হেঁটে যায়।

ওতোমোনো ইয়াকামোচ

হারু নো সোনো
কুরেনাই নিওউ
মোমো নো হানা
শিতা তেরু মিচি নি
ইদে তাৎসু ওতোমে

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

ভাষা বাদ দিয়ে আলোচনা অসম্ভব, অথচ ভাষা-ব্যবহারের পার্থক্য অথবা বৈপরীত্যেই সৃষ্টি হয় আলোচনার বিকৃতি ও বিভ্রান্তি। তাই ভাষার যথার্থ অর্থ অন্বেষণ যাবতীয় তত্ত্বমূলক আলোচনার প্রাথমিক কর্তব্য বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু ভাষা-ই তো বই অন্বেষণের একমাত্র পথ, কাজেই অর্থ সম্বন্ধে কোন সর্বজনগ্রাহ্য প্রত্যয় অসম্ভব। কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টির অর্থ কোনো ব্যক্তির কাছে সুনির্দিষ্ট হতে পারে, কিন্তু সেই অর্থ-ই অপর কোনো ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃত কিনা এ কথা নিশ্চিত করে জানবার কোনো উপায় প্রথম ব্যক্তির নেই।

এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল। শব্দ বা শব্দসমষ্টি কোনো কিছুর প্রতীক। ফুল বলে যে পদার্থ ফুল শব্দটা তার প্রতীক। পদার্থ যদি হয় ক, আর তার প্রতীক খ, তাহলে বলা যেতে পারে খ = ক, অথবা ক = খ। কিন্তু সর্বত্রই কি এই সম্পর্ক অবিকৃত থাকে? একটি অতি সাধারণ বাক্যালাপের অংশ ধরা যাক্। "তোমার হাতে কী?" "ফুল।" এই উত্তরের মধ্যে খ শুধু ক-ই নয়, খ = আমার হাতে ক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রতীকের সংগে তার বস্তু বা ভাব-সত্তার কোনো সর্বাবস্থায় অবিকৃত সম্বন্ধ নেই। প্রতীক বা শব্দের অর্থ তার ব্যবহারে। বাক্যগঠনরীতি অনুসারে শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচনের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, কোনো শব্দপ্রতীকের পেছনে যে একাধিক বস্তু বা ভাব থাকতে পারে সে কথা তো অভিধান-ই বলে দেয়। বলা যেতে পারে যে প্রতীকের সংগে তার বস্তু বা ভাবসত্তার সম্পর্ক এক : এক নয়, এক : বহু।

শব্দের অর্থ তো শুধু তার অভিধানগত বস্তু বা ভাব-সত্তা-ই নয়, তার সংগে মিশে থাকে আলোচনা-রত ব্যক্তিবর্গের মনের আরো অনেক কিছু। কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টির মৌলিক বস্তুসত্তা বা ভাবসত্তা সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক বোঝাপড়া থাকলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা আরোপিত যে অর্থাংশ সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পারস্পারিক স্বীকৃতি কঠিন। কোনো শব্দসমষ্টির যে অর্থ আমার কাছে নির্দিষ্ট আপনার কাছে-ও সেই অর্থ-ই নির্দিষ্ট কিনা এ সম্বন্ধে কোনো অবিমিশ্র যুক্তিনির্ভর প্রত্যয় সম্ভব নয়।

ভরসার কথা, আমাদের সব প্রত্যয় নিছক যুক্তিনির্ভর নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একের অর্থের সংগে অপরের অর্থের মিল থাকে। বস্তুপ্রতীকের ব্যবহারে অনেক সময় এই মিলের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ দেখানো যায়। যেখানে প্রমাণ সম্ভব নয়, সেখানেও শব্দব্যবহার সম্বন্ধে আমরা একটা সর্বস্বীকৃত রীতিতে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস থেকেই তত্ত্ব আলোচনা, সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস, ভাষা দিয়ে ভাষার অর্থবোধের চেষ্টা।

প্রতীকের সংগে প্রতীকধারীর সম্পর্ক একমাত্র ব্যবহাররীতিতেই স্থাপিত। রীতির বাইরে এই সম্পর্কের কোনো ভিত্তি নেই। আর রীতি যেহেতু স্থানকালপাত্রবিশেষে পৃথক, এই সম্পর্ক-ও সেই অনুসারে বিভিন্ন হতে বাধ্য। এমনকি, নিছক যুক্তির বিচারে কোনো প্রতীক প্রয়োগ-ই অপপ্রয়োগ হতে পারে না। টেবিল বলে যে জিনিষটা পরিচিত তাকে যদি কেউ চেয়ার বলে তাহলে অবিমিশ্র যুক্তি বা মূলগত সম্বন্ধের নজিরে তাকে ভুল বলা চলবে না। ভুল শুধু স্থানকালপাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ রীতির বিচারে। এই রীতির ঊর্ধ্বে প্রতীক ও

প্রতীকধারীর মধ্যে কোন অংগাংগী সম্বন্ধ নিশ্চয়ই নেই।

নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনবোধ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য প্রয়োগরীতি স্থাপনের চেষ্টাই মানুষের ভাষাসৃষ্টির ইতিহাস। এই রীতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী বলেই আমরা শুদ্ধ বা ভুল শব্দপ্রয়োগের প্রশ্ন তুলি। কিন্তু শব্দার্থ বা বাক্যার্থের রীতিনির্ভরতার কথা মনে রাখলে ভুল বা শুদ্ধ ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে অনেক নিষ্ফল উত্তেজনা ও বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

অর্থের এই আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও প্রতীক প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা কতগুলি নীতি অনুসরণ করতে পারি। প্রথমত, কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ যেন অনবাধনতার ফলে বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে। শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে সেজন্যেই বিশেষ সচেতনতা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রয়োগরীতি সর্বজনগ্রাহ্য বলে আমরা বিশ্বাস করি, সেই গোষ্ঠীতে আমাদের সেই রীতিকেই অনুসরণ করা উচিত। যদি কোনো প্রয়োজনে আমরা সচেতনভাবে এর ব্যতিক্রম করি তবে এই ব্যতিক্রমের প্রয়োজন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রোতা বা পাঠককে প্রথমেই অবহিত করা উচিত।

এই নীতি স্বীকার করার পরে অর্থবিশ্লেষণ সম্বন্ধে দু'টি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। প্রথমত, অর্থের ব্যবহারিক ভিত্তির কথা স্মরণ করে প্রতীকের কোনো তথাকথিত "আসল" অর্থ অন্বেষণ থেকে নিরস্ত থাকলে তত্ত্ব আলোচনার অনেক বিভ্রান্তি কমবে। ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা প্রস্তাব করতে পারি, কিন্তু কোনো মৌলিক অর্থের দোহাই দিয়ে কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগকেই আমরা বাতিল বা উপেক্ষা করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, অর্থনির্ধারণের চেষ্টায়, অর্থাৎ যাবতীয় তত্ত্ব আলোচনায়, এই প্রয়োগরীতির বিশ্লেষণই প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য। যদি কেউ জানতে চায় আকাশ অর্থ কী, তবে তাকে এই শব্দপ্রতীকের যাবতীয় ব্যবহার বিশ্লেষণ করে জানতে হবে কী কী বিভিন্ন অর্থে এই প্রতীক প্রয়োগ করা হয়। এই বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে যদি কোনো সাধারণ ক্ষেত্র থাকে তবে একমাত্র তাকেই মূল অর্থ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সাধারণ ক্ষেত্র খুঁজে না পাওয়া গেলে মূল বা কেন্দ্রীয় অর্থ নির্ধারণের আর কোনো উপায় নেই।

২

ভাষা ও অর্থ নিয়ে এই আলোচনার হেতু এই যে অন্যান্য তত্ত্ববিচারের মতো শিল্পতত্ত্বের আলোচনায়-ও প্রতীকপ্রয়োগ নিয়েই প্রাথমিক ও প্রধান সমস্যা। শিল্পতত্ত্ব নিয়ে এযাবৎ যতো দীর্ঘ ও জটিল তর্ক হয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভাষার অর্থ সম্বন্ধে বোঝাপড়ার অভাবেই তর্কের মীমাংসা কঠিন হয়েছে।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে শিল্পতত্ত্ব বলতে আমরা কী বুঝি। ইংরেজিতে আর্ট এবং এস্থেটিক্স্ কথা দু'টি সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয় ঠিক সেই ব্যবহারিক অর্থসমন্বিত বাংলা শব্দ আপাতত নেই বলেই মনে হয়। শিল্প কথাটার চাইতে আর্টের অর্থ আরো ব্যাপক। এই ব্যাপক অর্থের প্রতীক হিসেবে আর্ট কথাটাই বাংলায় চালু হয়ে গেছে। তবুও, যেই অর্থে এস্থেটিক্স্ আর্টের তত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব কথাটিকে আমি সেই অর্থেই ব্যবহার করছি। অবশ্য, এস্থেটিক্সের অন্যান্য বিশেষীকৃত অর্থ কোনো কোনো মহলে স্বীকৃত— যেমন, সৌন্দর্যতত্ত্ব। সৌন্দর্যের সংগে আর্টের যোগাযোগ কী সে কথা বিচার না করে, এস্থেটিক্স্ কথাটিকে আমরা একসংগে উভয় অর্থে ব্যবহার করতে চাই না। প্রথমত আমরা

আর্টের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি এবং আর্টের শাস্ত্রকে বলছি এস্‌থেটিক্স্‌—বাংলায় শিল্পতত্ত্ব। এই সাধারণ প্রতীকপ্রয়োগ গ্রহণ করে আমাদের আলোচনা সুরু।

এই প্রতীকপ্রয়োগ গ্রহণ করা হোক, এটা অবশ্য আমার প্রস্তাব। যেহেতু আর্ট কথাটা বাংলায় চালু হয়ে গেছে এবং যেহেতু ঠিক সমার্থক কোনো শব্দ আমাদের নেই, সেই হেতু এই শব্দের ব্যবহারে আমাদের আপত্তির কারণ দেখি না। প্রায়-সমার্থক শব্দের মধ্যে শিল্প বা কলা-র উল্লেখ করা যেতে পারে। আর্টের আলোচনায় আমরা সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করি, কিন্তু শিল্প কথাটাকে দৃশ্যমান এবং দর্শন-নির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রেই সাধারণত প্রয়োগ করি। কলা শব্দের প্রয়োগ ব্যাপকতর, কিন্তু আর্টের গুণ-সূচক অর্থাংশের দ্যোতক নয়, অন্তত আধুনিক বাংলায় নয়। আর্ট যেই অর্থে যাবতীয় আর্টবস্তুর গুণের নির্যাস, রস শব্দটা সেই অর্থে তুলনীয়। কিন্তু আর্টের বস্তুগ্রাহ্য দিকটা সেখানে নেই।

এস্‌থেটিক্সকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি বলা হয়েছে। কিন্তু এই সব প্রতীক সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে এদের ব্যবহারে আর্টবস্তু বা আর্টের অভিজ্ঞতার কোনো একক বা প্রধান গুণ সম্বন্ধে প্রাক্‌-বিশ্লেষণ স্বীকৃতি করে নেয়া হয়। যা আনন্দ দেয় বা যাকে আমরা সুন্দর বলি সেই সব যাবতীয় বস্তুই কি আর্টপদবাচ্য? শুধু তাই নয়। কোনো নির্বস্তুক গুণ বা কোনো ভাব-সত্তাকে আর্টের আলোচনায় প্রাথমিক স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করলে আর্টের বস্তুগ্রাহ্য বা অভিজ্ঞতা-নির্ভর দিকটা উপেক্ষা করা হয়। ভাববাদী চিন্তার প্রভাবে রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব ইত্যাদি শব্দ এমন সব যুক্তিবিমুখ ধোঁয়াটে আলোচনার সৃষ্টি করেছে যে বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনায় এদের সংস্পর্শ নিরাপদ নয়। শিল্পতত্ত্ব কথাটা অনেক বেশি বস্তুনির্ভর, শিল্পবস্তুর সঙ্গে এর যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। সে জন্যেই, আর্টের ব্যবহারিক অর্থ শিল্পের চাইতে ব্যাপক হলেও, আমার প্রস্তাব আর্টের শাস্ত্রকে বলা হোক শিল্পতত্ত্ব। শিল্পকে যদি আর্টের মতো ব্যাপক অর্থে সর্বস্বীকৃতভাবে ব্যবহার করা হয় তবে সুবিধেই হবে।

৩

আর্ট শব্দের প্রয়োগ অবশ্যই স্থানবিশেষে বিভিন্ন। সবচেয়ে ব্যাপক অর্থে, আর্টকে বলা যেতে পারে কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার বিদ্যা বা কৌশল। শুধু ছবি আঁকা বা কবিতা লেখা-ই নয়; রান্না করা, খোঁপা বাঁধা, এমনকি বেঁচে থাকা—কোনো কিছু ভালো করে করতে পারা-ই এই অর্থে আর্ট। কিন্তু আর্টতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় কতগুলি বিশেষ কাজ করতে পারার বিদ্যার কথাই আমরা মনে করি। প্রধানত—ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, বিশেষভাবে দেখবার মতো বাড়ি বানানো, নাচ, গান, কবিতা-গল্প-উপন্যাস লেখা, অভিনয় ইত্যাদি।

এসব বিদ্যায় পারদর্শিতা যেমন আর্ট, আর্টের আর এক অর্থ এই বিদ্যার ফল বা সৃষ্টি। এই পারদর্শিতার দ্বারা সৃষ্ট যে বস্তু—যাকে বলা যেতে পারে আর্টবস্তু (work of art)—আর্ট শব্দটি দিয়ে সেই বস্তু বা বস্তুসমষ্টিকেও অভিহিত করা হয়। যেমন, মুঘল আর্ট বা গথিক আর্ট। অবশ্য এরকম ব্যবহারে বস্তু এবং বস্তুর বিশিষ্টতা, উভয়কে নিয়েই প্রতীকের সাধারণ অর্থ।

তৃতীয়ত—এবং আর্টতত্ত্ব আলোচনায় এই প্রধান অর্থ বলে গৃহীত—আর্টের অর্থ এমন

কোনো প্রকৃতিগত গুণ বা গুণাবলী যা বিভিন্ন আর্টবস্তুতে বর্তমান এবং যা অন্য কোনো বস্তুতে নেই। অর্থাৎ, বিভিন্ন আর্টবস্তুর যা সাধারণ ক্ষেত্র (common ground) তাই আর্ট।

মনে হয়, সাধারণত আর্টের আলোচনায় এই ত্রিবিধ অর্থ-ই মিশে থাকে। এর মধ্যে যে অংশকে নিয়ে আমরা বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অভিজ্ঞতা-নির্ভর বিচার সুরু করতে পারি সে হোলো আর্ট-বস্তু। রং দিয়ে তৈরী ছবি, বা শব্দ দিয়ে তৈরী কবিতা।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আর দুই বস্তু আছে এই বিচারের ক্ষেত্রে। প্রথমত যে মানুষ আর্ট-বস্তু নির্মাণ করে এবং দ্বিতীয়ত যে মানুষ সে বস্তু উপভোগ করে। স্রষ্টা ও উপভোক্তা—এই দুই ব্যক্তির দিক থেকেই আর্ট-বস্তুকে দেখা যেতে পারে। যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের অন্য কোনো পথ নেই। যেহেতু উপভোক্তা-ই বেশি এবং যেহেতু প্রধানত তাদের জন্যই আর্টবস্তুর অস্তিত্ব, সেই হেতু তাদের দিক থেকেই বেশি আলোচনা।

এভাবে বিচার করলে শিল্পতত্ত্বের জটিলতা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত শিল্পতত্ত্ব নিয়ে এত সংবিরোধী এবং পরস্পরবিরোধী আলোচনা হয়েছে যে তার সাহায্যে আর্টের স্বরূপ নিয়ে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব মনে হয়। অথচ এই আলোচনার মধ্যে সিদ্ধান্তের অভাব নেই; শেষ সিদ্ধান্ত প্রচার করার উৎসাহ শিল্পতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিশেষ প্রবল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত থেকেই আলোচনা সুরু, বিশ্লেষণ থেকে নয়।

৪

আর্টের স্বরূপ নিয়ে এতাবৎ যত মত প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে দু'টি প্রধান ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমত, প্রতীক-প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন স্বচ্ছতার অভাব। তত্ত্বমূলক আলোচনায় আমরা অনেক সময় এমন সব শব্দ ব্যবহার করি যাদের বস্তু বা ভাব-সত্তার রূপ আমাদের নিজেদের মনেও স্পষ্ট নয়। এই সব শব্দ-সংকুল পথে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের অগ্রগতি কঠিন। কাব্যরসের আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর হতে পারে, কিন্তু যেহেতু রস এবং ব্রহ্ম উভয়ই অনির্বচনীয় সেই হেতু এদের সম্বন্ধে বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনা অসম্ভব। শিল্পতত্ত্বের প্রথাসিদ্ধ আলোচনায় সৌন্দর্যকেও আমরা ঠিক এমনি এক অনৈসর্গিক, অলৌকিক সত্তা বলে গ্রহণ করেছি।

এই জাতীয় প্রতীকের প্রয়োগকে উপহাস করা আমার অভিপ্রায় নয়। আমার বক্তব্য শুধু এই যে আলোচনাকে যদি আমরা জ্ঞানের বা বোধের সহায়ক করতে চাই তবে আলোচনা-কারীদের মধ্যে প্রতীকের ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া থাকা দরকার। কিন্তু যে প্রতীকের অর্থ প্রয়োগকর্তার কাছেও সুনির্দিষ্ট নয়, অপরের কাছে তার অর্থ কী ভাবে স্পষ্ট হতে পারে?

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে তত্ত্বমূলক আলোচনায় অস্পষ্টতার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এই আলোচনায় প্রতীক ও প্রতীকধারীর সম্পর্ক বেশিরভাগ সময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের দ্বারা নির্দিষ্ট নয়।

প্রতীকধারীদের প্রধানত চার ভাগ করা যায়: (১) নৈসর্গিক বস্তু (natural objects or spatio-temporal particulars); (২) বস্তুর ক্রিয়া বা ক্রিয়াধর্ম (functions of

such objects); (৩) বস্তুর গুণ (qualities of such objects); (৪) নির্বস্তুক গুণ (non-natural qualities or values)।[১] প্রথম তিনটিকে আমি ইতিপূর্বে প্রতীকের বস্তুসত্তা বলে উল্লেখ করেছি, চতুর্থটিকে বলেছি ভাবসত্তা। ভাব এখানে idea নয়, value বা মূল্য।

Fact (বস্তুসত্য) ও value (মূল্যসত্য)-র তফাত দর্শনের গোড়ার কথা। বস্তুসত্য আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ, কিন্তু চেতনা-জাত মূল্যবোধ ছাড়া মূল্যসত্যের অস্তিত্ব নেই। ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর—এসব বস্তুগুণ নয়, বক্তার মূল্যবোধের প্রকাশ।

যেহেতু মূল্যসত্যের অস্তিত্ব ব্যক্তিগত মূল্যবোধে এবং যেহেতু মূল্যবোধ প্রায়শই ব্যক্তি-বিশেষে পৃথক সেই হেতু মূল্যপ্রতীক বা ভাবপ্রতীকের (value-symbols) অর্থ বস্তু-প্রতীকের (fact-symbols) অর্থের তুলনায় অস্পষ্ট ও অনির্দেশ্য। শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় আমরা যতই না কেন বস্তুপ্রতীকের বিশ্লেষণ করি, শেষ পর্যন্ত মূল্যবিচারে আসতেই হবে। অধুনা অবশ্য মূল্যবোধকেও বস্তুনির্ভর মনস্তত্ত্ব দিয়ে সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ এখনো নৈসর্গিক বিজ্ঞানবিচারের মতো নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই শিল্পতত্ত্বে নির্বস্তুক প্রতীক এড়ানো সম্ভব নয়। অনেক আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিক beauty বা aesthetic quality জাতীয় ভাবপ্রতীক সযত্নে পরিহার করে চলেন। কিন্তু সমস্যা তাতে মেটেনি। Interinanimation of impulses বা auditory imagination জাতীয় অধুনা-প্রচলিত শব্দের বস্তুসত্তা-ও খুব স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি এক পণ্ডিত বলেছেন এস্থেটিক গুণ বলে কোনো কিছু নেই, কিন্তু এস্থেটিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে একটা কিছু থাকতে পারে। এতে অর্থবোধের বিশেষ কিছু সাহায্য হোলো বলে মনে হয় না।

শিল্পতত্ত্বে অর্থের কথঞ্চিৎ অস্বচ্ছতা অবশ্যম্ভাবী এ কথা স্বীকার করেও প্রচলিত ভাববাদী মতামতের অস্পষ্টতা সমর্থন করা যায় না। এই অস্বচ্ছতার পরিমাণ আমরা অনেক কমিয়ে আনতে পারি, এর ক্ষেত্র অনেক সংকোচিত করা যেতে পারে, যদি আমরা শব্দ-প্রয়োগ সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হই। ভাববাদী শিল্পতত্ত্বে প্রথম থেকেই সৌন্দর্য, রস ইত্যাদি কতগুলি মূল্যসত্যকে স্বীকার করে নেয়া হয়। তার পরে যে আলোচনা হয় তাতে আর বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে না—তখন একমাত্র কাজ আরো সব নির্বস্তুক শব্দপ্রতীকের জাল বুনে বক্তব্যের অভাব বা অস্পষ্টতা লুকিয়ে রাখা। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে যে সব বস্তুসত্য আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে তাদের প্রকৃতি ও সম্বন্ধ বিশ্লেষণ যদি আমাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয় তবে আলোচনা অন্তত অনেকদূর পর্যন্ত যুক্তির সোজা পথে চলতে পারে। বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকেই মূল্যবোধে আসা উচিত, প্রাক্-স্বীকৃত মূল্যসত্তা থেকে বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ অসম্ভব।

প্রচলিত শিল্পতত্ত্বের দ্বিতীয় ত্রুটি বস্তুসত্যের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা। বিভিন্ন আর্টের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন বস্তুসত্যের সংগে আমাদের পরিচয়। এই বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে আর্টের কোনো সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ কঠিন। অথচ কোনো শিল্পতাত্ত্বিক-ই একটা সাধারণ সংজ্ঞায় না এসে নিশ্চিন্ত বোধ করেন না। ফলে, এই সব সংজ্ঞায় বিভিন্ন বস্তুসত্যকে উপেক্ষা করা হয়। যে তাত্ত্বিক প্রধানত সাহিত্যের পণ্ডিত বা রসিক তিনি হয়তো সংগীত বা চিত্র-

[১] অন্যান্য প্রতীকধারীদের মধ্যে গাণিতিক সত্তা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, তিন কথাটা কিসের প্রতীক? ('বাংলাভাষা পরিচয়' পৃঃ ১৪-১৫)। Wittgenstein তাঁর *Philosophical Investigations* এই আলোচনা দিয়েই সুরু করেছেন।

কলার অভিজ্ঞতার অনেক সত্যকে উপেক্ষা করেন, তেমনি চিত্রশিল্পবিশারদদের সংজ্ঞায় হয়তো নৃত্য বা অভিনয়ের বস্তুসত্য চাপা পড়ে। অথচ প্রত্যেকেই আর্ট বলতে বোঝেন যাবতীয় আর্টবস্তুর সাধারণ প্রকৃতি বা গুণ। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য যাবতীয় আর্টের সত্য-নির্যাস।

৫

আর্ট নামধারী বিভিন্ন সৃষ্টি বা বিদ্যার কথা স্মরণ করে অনেকে তাই বলেন যে আর্ট বলে এমন কোনো জিনিষ নেই যা বিভিন্ন আর্টের মূল বা সাধারণ ক্ষেত্র। সংগীত, চিত্রকলা, কাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন আর্ট আছে, কিন্তু এদের মধ্যে এমন কোন প্রকৃতিগত যোগসূত্র নেই যা থেকে আর্টের শাস্ত্র বা তত্ত্ব বলে কোনো জিনিষ গড়ে উঠতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন যে বিভিন্ন জিনিষকে একই নামে অভিহিত করা হয় বলেই তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অক্সফোর্ডের দর্শনের অধ্যাপক গিলবার্ট রাইল উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, কোনো শিশু মনে করতে পারে যে ম্যাক্‌ট্যাভিশ্‌ নামধারী পৃথিবীর যাবতীয় লোক পাশের বাড়ীর ম্যাক্‌ট্যাভিশ্‌দের আত্মীয়। উইটগেনস্টাইন একে উপহাস করে বলেছেন, "the craving for generality"।

কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যাবে যে এই ধরনের উক্তির মধ্যে পরিহাস যতটা আছে যুক্তি ততটা নেই। ম্যাক্‌ট্যাভিশ্‌ যে ধরনের প্রতীক, আর্ট কি সেই ধরনের প্রতীক? একটা ব্যক্তিপ্রতীক, আর একটা গোষ্ঠীপ্রতীক। ব্যক্তির নামও যে গোষ্ঠীর পরিচায়ক হতে পারে এতো আমাদের দেশের অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। একাধিক ব্যক্তিপ্রতীক একরকমের হলে প্রতীকধারীদের মধ্যে কোন গোষ্ঠী-সম্পর্ক থাকতে-ই হবে এমন কথা অবশ্য নেই, কিন্তু সে সম্পর্ক বা সম্পর্কের অভাব তো প্রতীকের ব্যবহারেই নির্ধারিত।

আর্ট প্রতীকের ব্যবহারে আমরা সমগুণবিশিষ্ট বস্তুসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেই বলেই আর্ট গোষ্ঠীপ্রতীক। এই বস্তুসত্তার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যে সাধারণক্ষেত্রের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাসী সে বিশ্বাস অমূলক কিনা সে কথার বিচার একমাত্র বিভিন্ন আর্টবস্তুর বিশ্লেষণ থেকেই হতে পারে। আর এই বিশ্বাস অমূলক প্রমাণিত হলে বিশ্বাসের উৎপত্তি এবং এতকাল ধরে এর প্রচলন সম্বন্ধেও সন্তোষজনক কারণ দেখাতে হবে।

এ সম্বন্ধে অধ্যাপক রিচার্ডসের সঙ্গে আমার সামান্য পত্রালাপের সুযোগ হয়েছিল। রিচার্ডস বিশিষ্ট শিল্পতাত্ত্বিক, ভাষার অর্থ নিয়েও তাঁর বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য; কাজেই, এই পত্রালাপ থেকে কিছু উধৃতি অপ্রাসংগিক হবে না বিশ্বাস করি।

রিচার্ডস লিখেছিলেন: "The little I have written on aesthetics has all been an endeavour to show that there is no such subject: that it is generated by linguistic over-simplification!"

এর উত্তরে আমার বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে : If there is no such subject as aesthetics, what is that on which you have written while writing on aesthetics? If you mean that what you have written on is what is known as aesthetics, is not there a subject called aesthetics? Or, do you mean that although there is a subject-name there is no *real* subject-matter? How can discussion on an *un-real* subject have

real significance? . . . . . I have used the word aesthetics to mean the subject of what are known as works of art . . . . . whether there is any common ground in the different arts is itself my main enquiry. . . . . . If there is no such common ground, why have you always discussed the different arts at least seemingly as part of one subject? Why, for example, in writing on literary criticism, have you discussed the appreciation of music and painting and not the appreciation of, say, sausages? You yourself seem to have assumed a special relationship or at least the notion of such a relationship."

রিচার্ডসের পরের চিঠি সংক্ষিপ্ত : আমার প্রশ্নের কোনো যথাযথ উত্তর তাতে পাইনি। উনি লেখেন : "If you name all the varied concerns men may have with poetry, sculpture, scenery etc. 'Aesthetics', there is, of course, a subject, or a variety of subjects so named ; but I had in mind the traditional definitions of aesthetics . . . . ."

এই পত্রালাপ থেকে আমার এ ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছে যাঁরা আধুনিক অর্থতাত্ত্বিক বিচার-পদ্ধতিতে আর্ট বা এস্থেটিক্সের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাঁরাও তাঁদের অস্বীকৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অথবা ফলাফল বিশ্লেষণ করতে নারাজ। প্রচলিত মতামতের ভ্রান্তিনিদর্শনে এঁদের বিচার যত কার্যকরী হয়েছে, মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ বা অর্থান্বেষণে ততটা সহায়ক হয়নি।

৬

মূল প্রশ্ন, বিভিন্ন আর্টবস্তুর মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত সাধারণক্ষেত্র আছে কিনা; এবং যদি থাকে, তা কী? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণে প্রথম কাজ আর্টবস্তু বলে কোন কোন ধরনের জিনিষ অভিহিত তা স্থির করা। দ্বিতীয় কাজ, এই বিভিন্নবস্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ। আর্টকে বলা হয়েছে সৃষ্টি। কী সৃষ্টি করা হয়? বস্তু? অভিনয় বা নৃত্যে সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি কী? চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ইত্যাদি অধিকতর বস্তুগ্রাহ্য আর্টেও বা শিল্পীর দ্বারা সৃষ্ট কোন জিনিষ? রং-ও নয়, ক্যানভাস-ও নয়, পাথর-ও নয়। যদি বলি এই সব জিনিষের প্রয়োগে কোন বিশেষ রূপ, তাহলে প্রশ্ন হবে রূপ ছাড়া কোনো বস্তুকেই কি আমরা কল্পনা করতে পারি? কী সে রূপ যা শিল্পীরই বিশেষ সৃষ্টি? · তৃতীয়ত, বিভিন্ন আর্টবস্তুর অভিজ্ঞতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ। এই অভিজ্ঞতার সাধারণক্ষেত্র যদি হয় আনন্দ বা সৌন্দর্যানুভূতি তবে এই মূল্যবোধের প্রকৃতি আরো নির্দিষ্ট করতে হবে। পিলু ঠুংরী আর Oedipus Rex—কী মূল্যবোধে এ উভয়ই সুন্দর বা আনন্দদায়ক? তাহলে আনন্দ বা সৌন্দর্যের কী সংজ্ঞা আমরা শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় গ্রহণ করবো? চতুর্থ কাজ, এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের ফলাফল বিবৃতি।

এই বিচার-পদ্ধতির একমাত্র অবলম্বন যুক্তি ও বস্তুসত্যনির্ভরতা। যদি কোনো বস্তুসত্য সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রতিবন্ধক হয় তবে তাকে উপেক্ষা করা মারাত্মক। অভিজ্ঞতা

যদি সিম্ধান্তকে বাধা দেয় তবে সে বাধা স্বীকার করে নেয়াই ভালো; এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাদ্বারা সমর্থিত অপর কোনো সিম্ধান্ত সম্ভব হয় ততক্ষণ সাধারণক্ষেত্র সম্বন্ধে কোনো সিম্ধান্ত প্রচারের চেষ্টা না করাই ভালো। এই অসাফল্য-ই ভবিষ্যতে নতুন বিশ্লেষণকে সাহায্য করবে। বস্তুসত্যবিমুখ বিচারের আপাতসফল সিম্ধান্ত এ পর্যন্ত আর্টবস্তু এবং আর্টের প্রকৃতিকে বিশেষ অস্পষ্ট করে রেখেছে।

শিল্পতত্ত্বে কী ধরনের প্রশ্ন যুক্তি বা অভিজ্ঞতার বিচারে প্রাসংগিক এবং কী ধরনের প্রশ্ন নিয়ে ফলবতী আলোচনা সম্ভব তার যে ইংগিত এখানে দেয়া হলো তাতে শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তুর সীমারেখা নির্ধারিত হতে পারে। আর এক ধরনের প্রশ্ন আছে। যথা, সৌন্দর্য বা শিল্পরসের স্বরূপ কী, ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস এই সব প্রশ্ন নিয়ে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব নয়। কারণ এ সব প্রশ্নের প্রাক্-স্বীকৃত অনির্দেশ্য মূল্যবোধ।

আর্টবস্তু যেহেতু মানুষের সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তার দিক থেকে আর্টের বিচার-ও শিল্পতত্ত্বের বিষয়ীভূত। কিন্তু এই বিচার পৃথকভাবে করা উচিত। সংজ্ঞা নির্ধারণে অবশ্য দুই বিচারের ফলাফলই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিচারের সময় দু'টি দিককে আলাদা না রাখলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। তা ছাড়া সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবার পরেই যখন আর্ট, সৃষ্ট বস্তুর অভিজ্ঞতা-ই যখন আর্টের অভিজ্ঞতা এবং শিল্পতাত্ত্বিকের পক্ষে যখন (তিনি নিজে যদি শিল্পী না হন) সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অপরের বিবৃতির ওপর নির্ভর না করে উপায় নেই, উপভোক্তার দিক থেকে আর্টবস্তুর প্রকৃতি বিচারই শিল্পতত্ত্বের প্রধান বিষয়বস্তু।

নটি

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

এক'শ কুড়ি বছর আগেকার কথা। গোয়ালিয়ার সহরের রাজপথে রংবাহারী মিছিল বেরিয়েছে।

হাতী, ঘোড়া ও উটের পায়ের ধুলোয় সমাচ্ছন্ন গোয়ালিয়রের রাস্তা। দোকানের আলোগুলো সেই মিহি মসলিনের আড়ালে চোখে পড়ছে আবছা হয়ে, অজস্র চুমকিদার বুটির মত।

জনস্রোতের পাশ দিয়ে দিয়ে বাঁক করে ঝকঝকে পিতলের কলসীতে দুধ, আর ঘি নিয়ে চলেছে গুজারী মেয়েরা।

তরমুজ-বিক্রেতা সবুজ তরমুজের গায়ে ছুরি চালিয়ে আধখানা করে তুলে ধরে চেঁচাচ্ছে, এ-রকম তরমুজ নাকি জীবনে কেউ দেখেনি। পেয়ারার টুকরি মাথায় মুসলমান বিক্রেতা হেঁকে যাচ্ছে—আমরুদ! আমরুদ!

সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে থেকে থেকে রব উঠছে—তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! যাত্রীরা আসছে।

ভীলসা হয়ে, শিপ্রী হয়ে, ঢোলপুরের পথে, আগ্রা থেকে দলে দলে মানুষ আসছে গোয়ালিয়ারে।

তানসেনের সম্বাৎসরিক উর্স। সেই দিনে তাঁর সমাধি-প্রাঙ্গণে বিরাট জল্‌সা হবে। গায়ক গায়িকারা ঊষার প্রথম প্রহরে সঙ্গীতগুরুর সমাধিতে এসে শ্রদ্ধা জানাবেন, তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে সাধনা যেন সার্থক হয় ভক্তের।

হাতীর পিঠে হাওদা চড়িয়ে আসছেন রাজরাজড়ার সভাগায়করা। তাঞ্জামে, পালকি ও মেণায় আসছেন কাশী, লক্ষ্ণৌ, ফিরোজপুর, ঢোলপুর, রামনগর, আগ্রার সুন্দরী শীষমহল-ওয়ালীরা। কেউ গানের জন্য বিখ্যাত, কারো কালো চোখের বাঁকা চাহনি আর নৃত্যপরা ঘুঙুর-বাঁধা পায়ের তালে কোন নবাব কয়েদ হয়ে আছেন, কেউ বা শুধু রূপসী বলেই খ্যাত, তাঁর হাতের ঢালা সরাব না পেলে কাশীর বড় বড় ঘরাণার ছেলেদের সন্ধ্যাটাই মিথ্যে হয়ে যায়। পাঁচিল-ঘেরা মস্ত আঙিনায় মিঞা তানসেন ও গুরু মহম্মদ ঘোসের সমাধি এক পাশে। আজ সন্ধ্যায় আলোয় ঝলমল করছে তানসেনের মক্‌বরা।

মাটিতে মস্ত দু'টো মশাল পুঁতে সামনে দাঁড়িয়ে খবরদারী করছেন সিন্ধিয়া দফ্‌তরের কোন কর্মচারী। উর্স-এ এসে সকলে যাতে গহনাগাঁটি টাকাপত্র সাবধানে রাখেন সেজন্য তারস্বরে মিনতি জানিয়ে চলেছেন।

লাল রেশমের টোপ লাগানো বড় বড় তাঁবু পড়েছে এক পাশে। তাঁবু পড়েছে পাঁচিলের বাইরেও। সেখানে দাসদাসীরা এসে ছুটোছুটি করে; গরমজল, গরমদুধ যোগাড় করছে মনিবদের পথশ্রমের ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে।

মনিব মনিবে দেখা হ'লে ঘন-ঘন 'রহিম রহিম! রাম রহিম! রাম রাম!' শোনা যাচ্ছে। এক মনিব কানের হীরেতে ঝিলিক দিয়ে অন্য জনকে শুধোচ্ছেন,—খাঁ সাহেব এবার রাগহিন্দোল নিয়ে ফয়সালাটা হয়ে যাবে না কি? সে মনিবও অন্যমনে গলার সাচ্চা মুক্তোর

মালাটা তস্‌বীর মত ঘোরাচ্ছেন, আর বলছেন, কেন নয় মিশিরজী! তবে কি না—হায়দারাবাদে চলে যেতে হচ্ছে কিনা রাণা সাহেবের সঙ্গে।

দু'জনে দু'জনকে টক্কর নিচ্ছেন আর শিকারীর মত গোঁফের আড়ে আড়ে হাসছেন।

কোন তাঁবুতে মান করে বসেছেন কোন অভিমানিনী। বিব্রত শেঠ, করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মান দুস্তর—গত বছর আর এ বছর একই হীরের গহনা পরে তিনি গাইতে পারবেন না—কাশীর কমল যখন বছর বছর নতুন গহনা পরে আসছে।

শেঠ সাহেব মিনতি করে বলছেন—দেবী যদি প্রসন্ন হন, তবে তিনি নিবেদন করতে পারেন যে, বিজাপুরের শ্রেষ্ঠ মণিকার অম্মলচাঁদ, এবার আসল হীরে-পান্নার এক প্রস্ত গহনা নিয়ে এসেছে—শুধু কেনবার অপেক্ষা।

কোন কোন তাঁবুতে, ধুপের ধোঁয়া উঠছে মৃদু মৃদু। বিলম্বিত বেণী, শুভ্র স্বচ্ছ থান পরিহিতা মাল্‌কিন বীণা কোলে বসে মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিচ্ছেন, আর—

মুরলিয়া নাহি বোল শ্যাম নাম—

এই কথাগুলির ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছে রাগিণীপটমঞ্জরী। মনে হচ্ছে সমস্ত রজনী সাধনা করলে হয় তো প্রসন্না রাগিণী রূপ পরিগ্রহ করবেন সাধিকার ধ্যানে—

কান্তবিরহে শীর্ণা, উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণা, প্রিয়বিরহে অধীরা পটমঞ্জরী হয়ত আশীর্বাদ করবেন তাঁকে।

আবার কোন তাঁবু থেকে টুকরো টুকরো গানের বোলি ছড়িয়ে পড়ছে ফুলঝুরির মত। গায়কের রেশমের জামা ঘামে ভিজে গেছে, মুখে হাসি, আঙুলের আংটি থেকে আলো ঝিলিক দিচ্ছে, মুক্তোর মালা ওঠানামা করছে—সারেঙ্গী ও তবলা সঙ্গতকার মুগ্ধ হয়ে তারিফ দিচ্ছেন থেকে থেকে। কুশলী গায়ক, সুর ও কথাকে অবহেলে তালে তালে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন কখনো, আবার নতুন কৌশলে তাকে ধরছেন।

চন্দেরী শাড়ী, হীরামোতি, গালিচা, চন্দনকাঠের আসবাব—এই সব নিয়ে আনাগোনা করছে বানিয়ারা বড় বড় তাঁবুর সামনে, গত বছর প্রসন্ন ছিলেন বাইজীসাহেবা, কয় হাজার টাকার বিক্রী হয়েছিল। এবার যদি একবার নজর করেন তবে কিছু আসল জিনিষ দেখাতে পারেন তাঁরা।

এই জমজমাট ছেড়ে ওদিকেও কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। তার অধিবাসিনীদের—বেশ দীন হীন, চেহারা মলিন, সুখস্মৃতি যা সবই অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ তাদের কাছে একই রকম আঁধার।

কাশী, ফিরোজপুর, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রাতে একদা তাদের নাম ছিল। শেঠ ও নবাব বাড়ীতে তারা বাঁধা ছিল। নবীন যৌবন মালিকের টাকার বিনিময়ে তারা মুজরো করত শীষ ঘরে ব'সে, নাচত, গাইত, সরাব ঢালত কাঁচের পেয়ালায় আর মিঠে মিঠে কাজলাদিঠি ছুঁড়ে দিত। যৌবন ফুরিয়ে গেলে, বা মালিকের মর্জি বদলালে তাদের দিন ফুরিয়ে যেত। তখন ভাঙা নৌকোর মত, ঘাট খুঁজে খুঁজে ফিরত তারা। এই ছিল তাদের নসীব। যে নসীব নাকি দুনিয়ার মালিকও বদলাতে পারেন না।

বছরে বছরে তারাও তানসেনের উর্স-এ আসে। সম্রাটের সভার গায়ক মিঞা তানসেন, তাঁর নামেই যাদু আছে। গান ছিল তাঁর প্রাণ, আর প্রেম ছিল বিলাস, সারা-জীবনে রাগরাগিণীরা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে তাঁর ধ্যানে। ধ্যানভঙ্গে চকিতে সরে গেছে

তারা মরীচিকার মত। ধ্যানের জগতের মায়াময়ীকে বাস্তবে ধরতে পারেননি বলেই হয়ত তানসেনের ব্যক্তিগত প্রেমগুলিও ছিল খাপছাড়া, খেয়ালী আর দুর্বার। সংগীতসাধকের গুরু তানসেন, তাঁর সমাধি তীর্থ। সেই তীর্থে বছর বছর এসে মেলে বিগতযৌবনা, হতভাগিনীরা। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে সসম্ভ্রম প্রণতি জানায়, আর সমাগতদের মনোরঞ্জনের প্রয়াসে এ তাঁবু থেকে সে তাঁবু ফেরে।

এমনি এক তাঁবুর ভেতরে ধুঁয়ো-ওঠা একটা বাতি জ্বলছে। তার মলিন ছায়ায় খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে রোশান। শীর্ণ বাহু এলিয়ে পড়েছে। তিনজন সঙ্গিনী মৃদু স্বরে ফাতেহা পড়ছে, কোরাণের অমৃতবাণী শোনাচ্ছে মৃত্যুপথ-যাত্রিনীকে। রোশানের পাশে একমুঠো জুঁইফুলের মতো শুয়ে আছে মোতি। রোশানের দুই বছরের মেয়ে। এতখানি চরম দুর্ভাগ্যের ডালা তার মাথায়, তবু সে এমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ঘুমুচ্ছে যে দেখলে মৃত্যুরও দয়া হবে। বৃদ্ধ হেকিম পাশে ব'সে আছেন টুল পেতে।

মৃত্যুর কোন ধারণা তখন রোশানের চেতনায় নেই। তার দুই চোখ জুড়ে এক তরুণ যুবকের সপ্রেম চাহনি—কানে বহুদূর থেকে পরিচিত কণ্ঠে কার আকুতি—

এক নজর দিখা যাতা তো তেরে কেয়া যাতা
য়ো গরীবোঁকে মজরোঁসে গুজারনে বালে—

দিল্লীর নাচওয়ালীদের মধ্যে রোশান ছিল অন্যতমা। তার রক্তে ছিল ভরা পূর্ণিমার সমুদ্রের আকুলতা। প্রেমের আহ্বানে দেওয়ানা হ'য়ে যৌবনে তার মা ঘর ছেড়েছিল। ফিরোজপুরের নবাবসাহেবের ঘরে তার মুজরো বাঁধা ছিল। অষ্টাদশ শতক পেরিয়ে সবে ঊনবিংশ শতকে পড়েছে সে যুগ। তখন রাজারাজড়া নবাববাদশাদের রাজত্ব। নাচনে-ওয়ালীদের তখন বড় কদর। সে যুগটারই রমরমা অন্যরকম। রাজপথে ঘোড়ার খুরের সংগে টগবগ করে ওঠে জোয়ান রক্ত, তরোয়ালে তরোয়ালে, বর্শায় বর্শায় লড়াই লেগে যায়। গোলাপ চামেলী বেলীর গন্ধ-সুবাসিত সন্ধ্যা নামে, কাঁচের ঝাড়ে আলো ঝলমল করে—মখমলের তাকিয়া হেলান দিয়ে বিশ্রাম করে প্রান্তযৌবন সামন্ততন্ত্র, আর ঘুঙুরের রুণুঝুণুর সংগে রঙীন পেসোয়াজে দোল খেলিয়ে মিঠে গলায় নিক্কণ তোলে নাচওয়ালী—

তিরছি নজরেসে ময় কয়েদী বনী হুঁ—

সেই দিনের থেকে প্রাণরস আহরণ করে লতার মতো মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠল রোশান। যৌবনভারে ঈষৎ আনমিত হল দেহ, কালো চোখে অতল রহস্য নামল, প্রবালের মতো ওষ্ঠাধরের হাসিতে মিঠে সুর লাগল, রোশানের মা-কে সবাই বললো, এবার মেয়ের দৌলতে মা রাণী হয়ে যাবে।

কিন্তু অদৃশ্যে দেবতার হাতে ভাগ্যের পাশায় নতুন দান পড়ে। রোশানের জীবনে এল প্রেম।

•

সাতপুরুষের নাচওয়ালী, হৃদয় নিয়ে বেসাতি করা পেশা, কিন্তু রক্তে তার ছিল ভালবসে দেওয়ানা হবার আকুলতা। প্রেম এল দুর্বার হয়ে—সমুদ্রের মতো ভাসিয়ে নিল তাকে—অসহ বেদনা, অপূর্ব আনন্দে রক্ত-গোলাপের মত ফুটে উঠল রোশান একজনের মুখ চেয়ে। কিন্তু তার প্রেমিকের হৃদয় ছিল না।

ফিরোজপুরের তরুণ নবাব সামসুদ্দীন, সুপুরুষ, দুঃসাহসী, বে-পরোয়া। রোশানের সাথে তার প্রথম দেখা ভরা জলসায়। মা আর মেয়ে নাচের শেষে মোহর কুড়োতে

ব্যস্ত। সেই সময়ে কেমন করে যেন রোশানের নজর পড়েছিল তরুণ নবাবজাদার ওপরে, মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল রোশান।

দুরন্ত যৌবন। মাঝরাতে উটের গাড়ির পাশের থেকে রোশানকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন নবাব। বলেছিলেন,—তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দী—

এক নজর দিখা যাতা তো তেরা কেয়া যাতা
য়ো গরীবোঁকে মজরোঁসে গুজারনে বালে—

অস্ফুট চাঁদের আলোয় প্রেমাস্পদের আবেগ-টলমল চোখে যুগযুগান্তের কোন লায়লার স্বপ্নের চরিতার্থতা দেখেছিল রোশান। মনে হয়েছিল মরুতে মরুতে বালির উপরে এই মজনুকেই ডেকে ফিরেছে তার পিয়াসী মন। তাই নিশ্চিন্ত নির্ভরে ভৃঙ্গারের মত মুখ তুলে ধরেছিল সে—আর তাকে এক চুমুকে পান করেছিলেন সামসুদ্দীন।

বুড়ী মা তাকে বারণ করেছিল, বলেছিল,—বেটি ভালবেসেই আমাদের জাত মরে, ওরা শুধু ভোমরার মত উড়ে চলে যায় অন্য বাগিচায়, অন্য ফুলে। কোনো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধলি না কেন বেটি, কেন ভুল করলি?

রোশান মায়ের কথা মানেনি। নর্তকীর প্রেমে আকুল আত্মসমর্পণের বাসনা—সব বিলিয়ে না দিলে তার তৃপ্তি নেই। রোশানের মনে হত চাঁদ অফুরান, গুলবাগিচার বুলবুলের গানও অফুরান—

কিন্তু একদিন রজনী প্রভাত হল। সহসা সামসুদ্দীন ত্যাগ করলেন সহর। একটি কথা বলবার ছিল রোশানের—একটি কথা বলতে সে ছুটে গেল। তার আগের দিনই চলে গেছেন নবাব। আগ্রায় নাকি এসেছে কাশ্মীরের গুল্—ঊনিশ বছরের ঊর্বশী।

এই জীবন এক পানপাত্র, নর্তকী তাতে সিরাজ। পিপাসিত এসে তাকে গ্রহণ করে, সার্থক হয় তার যৌবন। তৃষ্ণা মিটে গেলে, যদি দাম ফেলে দিয়ে চলে যায় তৃপ্তজন, তবে নতুন করে কাজল পরো, বেণীতে মোতির ফুল গাঁথ, হীরের ঝিলিক ঠিক্‌রে উঠুক কঙ্কণে, রেমশী গাঢ়ারার প্রান্তে জরিতে ঢেউ খেলে যাক। এই জীবনদর্শন মানতে চাইল না রোশানের মন। যৌবনের উন্মেষে মন আর প্রাণ নিঃশেষ করে নিয়েছে একজন, কখনো আকুল আবেগে মনে হয়েছে তারাই দু'জন লায়লা আর মজনু। মরুভূমিতে দুরন্ত যাযাবর জীবনের পটভূমিকায় যে প্রেম সার্থক হল না, যার বেদনা বুকে বয়ে কবি বার বার ছন্দে ছন্দে মৃত্যুহীন গান গাইল, সে প্রেম তাদেরই। সে-ই সেদিনের লায়লা আর সামসুদ্দীন তার প্রেমে পাগল হতভাগ্য মজনু। কখনো গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেছে। চোখের জলে উপাধান সিক্ত করে ভেবেছে তারাই দু'জন শিরী ফরহাদ্। তার চোখের জল পলকে মুছে নিয়ে প্রেমিক বলেছে,—তোমার গালের একটি তিলের জন্যে—। পৃথিবীর প্রথম অনুভূতি প্রেম। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস। শুধু কি বিশ্বাস? প্রিয়জনকে সমস্ত গুণ আরোপ করে, তাকে সমস্ত ভালবাসা দিয়েও তৃপ্তি হয় না—এ-ও প্রেমেরই ধর্ম।

তাই রোশান অনুযোগ করল না। মায়ের সহস্র অভিযোগ মাথায় নিয়ে, সে তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়াল। দেখা করতে গিয়ে লাঞ্ছনা পেয়ে ফিরল। শিকার থেকে ফিরবার পথে, অপেক্ষমান রোশানকে দেখে ভ্রূকুটি করলেন সামসুদ্দীন। বললেন,—কে একে ঢুকতে দিয়েছে?

সেই রূঢ়কণ্ঠ রোশানের মর্মে গিয়ে বিঁধল। মুহূর্তে স্থানত্যাগ করল সে। ছি ছি সে কি ভিক্ষা করতে গিয়েছিল? দয়া চেয়েছিল? দীন ও মলিন বেশে তাকে দেখেই কি

লজ্জা পেলেন নবাব? ঘরে ফিরে এসে সে চিঠি লিখল। চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়ে সেই দিনই ফিরোজপুর ছেড়ে চলে গেল। নবাব খুলে দেখলেন—তাতে লেখা আছে,—তোমার প্রেম, হে প্রিয়, একদিন ভূষণ বলে মাথায় পরেছিলাম, আজ সেই প্রেমকে তুমি ফেলে দিয়েছ, কিন্তু আমি ত ফেলতে পারি না, তাই তাকে তিলক করে পরে ভিখারিণী হয়েছি—তাতে কি তোমার লজ্জা?

সেই রাতের স্মৃতি রোশানের চোখে বুঝি আবার ভেসে উঠল। একবার মনে হয়েছিল ঝাঁপিয়ে পড়বে যমুনার জলে। বর্ষায় যমুনা উত্তাল হয়ে কলকণ্ঠে হাত তুলে লক্ষ ঢেউয়ে নাচছে। সেই ঢেউয়ে বুঝি কার হাতছানি দেখেছিল রোশান। কিন্তু সে ত একা নয়, হৃদয়মন্থন করে চলে গেছে রূঢ় আঘাত দিয়ে এক বে-দরদী, আর সেই বেদনার অতলে তখনি একটি মধুর সম্ভাবনা অঙ্কুর হয়ে দেখা দিয়েছে। একদিন সেই অঙ্কুরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। তারই মুখ চেয়ে আত্মসংবরণ করেছিল রোশান। বড় সুন্দর পরিবেশ। বড় মধুর প্রলোভন। সামনে উত্তাল তরঙ্গময়ী কালো যমুনা। তারার অস্পষ্ট আলোতে পাহাড় ও প্রান্তরের রেখাগুলি আরো কালো—দূরে জনকোলাহলমুখর নগরী, সেই রাতে বিশ্বপ্রকৃতির কোলের কাছে একা দাঁড়িয়ে ধীরে মন শান্ত হয়েছিল রোশানের। সঙ্গতি পেয়েছিল খুঁজে, শান্তি পেয়েছিল।

তার পরের ইতিহাস পথেঘাটে ছড়ানো। কত সহরই যে ঘুরল রোশান—পথে পথে কত অনুগ্রহই যে ভিক্ষা করে বাঁচালো নিজেকে—শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ল কাশীতে। সেখানে একদিন এক ফকিরের কুটিরে জন্ম হল মোতির। নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ সেই শিশুকে দেখে রোশান একবার হাসল, একবার কাঁদল। বুকে তুলে নিয়ে বলল,—মেরি মোতি—মেরি লালী—

বিচার যে কোথায় হয়, আর কে যে বিচার করে, সে বড় আজব কথা। সত্যি বলতে কি, তার চেয়ে কোন রূপকথাই আশ্চর্য নয়! যৌবনের উদ্ধত গর্বে কত রোশানের প্রেম পদদলিত করেছিলেন সামসুদ্দীন তার হিসেব নেই। ভাইকে ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে গিয়েই বিবাদ বাধল—আর শৈশবের শুভানুধ্যায়ী ফ্রেজার সাহেবকে খুন করবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন সামসুদ্দীন। তরুণ নবাবকে ফ্রেজার বিশ্বাস করতেন ও ভালোবাসতেন। এক অন্ধকার রাতে সামসুদ্দীনের নিযুক্ত ঘাতক তাকে হত্যা করল। ফলে বন্দী হলেন সামসুদ্দীন। বিচারে প্রাণদণ্ড হল তাঁর।

সহরের খোলা জায়গায় ফাঁসীমঞ্চে উঠতে উঠতে গতজীবনের কথা সামসুদ্দীন একবারও ভেবেছিলেন কিনা কে জানে! তবে কতিপয় নর্তকী তাঁর মৃত্যুতে কেঁদেছিল, আর ফাতেহা পড়েছিল তাদেরই অনুরোধে মৌলভী। সে কথা শুনে রোশান মর্মাহত হয়েছিল। অশ্রু মোচন করেছিল গোপনে। সেই সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, আয়তনেত্র, প্রশস্ত ললাট—কোথাও কি এ হীন পরিণতির কথা লেখা ছিল?

কোন নারী মাতা হয়ে সার্থকতা পায়—কারো সার্থকতা প্রেমে। মৃত্যু সামনে নিয়েও রোশানের হত চেতনায় তার জীবনের একমাত্র সুখস্মৃতিই উৎসবের সজ্জায় সেজে উঠল।

সহসা বড় মধুর অনুভূতি হল রোশানের, বড় সুন্দর, শান্ত আর গভীর কোনো ভালবাসা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে দুই হাতে।

এ আর এক প্রেম। তার প্রেমিকের মত নিষ্ঠুর চিত্ত নয় এই অতিথি। দেহের

সমস্ত বন্ধন অস্বীকার করে সে রোশানকে টেনে নিল বলিষ্ঠ বাহুতে—, সেই শেষ আত্ম-সমর্পণের মুহূর্তে সমস্ত চৈতন্য হারিয়ে গেল রোশানের। চোখের কোণে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু।

মোতি তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সঙ্গিনীরা যখন রোশানের মুখখানা ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল. তখন মোতির ঘুম ভাঙল।

তাকে কোলে তুলে নিল মৈনু। রোশানের মায়ের আমলের চেনা সারেঙ্গীওয়ালা। বলল,—বেটি আজ থেকে তুই আমার—, তারপর বলল,—ভাবিস্ না, রোশান, সব ঠিক আছে।

উর্স-এর জন্যে অপেক্ষা না করে পরদিন ভোরেই সে মোতিকে কোলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

পথে পথে জীবন সুরু হ'য়ে গেল মোতির।

দুই

'বহিছ নির্মল সলিলে শত তটশালিনী যমুনে'—

শত তটশালিনী যমুনার উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গ দেখে কবে বৃন্দাবনের কন্যাদের মন উতলা হত সে সব দিন পুরোন কথা। সাল ১৮৪৩। পাহাড়ে বর্ষা নামলে যমুনার জল এখনও উথলে ওঠে সত্যি, কিন্তু সে জলে চাষীর মাঠ ভেজে না। বালির বুকে ক্ষীণ ধারায় চাষীর স্বপ্ন মরে যায় স্রোত না পেয়ে, গ্রীষ্মে ক্ষীণস্রোতা যমুনা আর বর্ষায় তাতে ঢল নামে।

বৃন্দাবনের প্রেমকে গল্পে গানে গাথায় নির্বাসন দিয়ে সম্রাটের প্রেমের মর্মরস্বাক্ষর-তীরে বয়ে ধন্য হয়েছে যমুনা। হীরা মুক্তা মাণিক্যের ইন্দ্রজালচ্ছটার দিনও মুখ লুকিয়েছে। আজ যমুনার দুই তীরে গ্রাম আর জনপদ। অধিবাসীরা প্রায়শ মুসলমান। সিপাহীগিরি তাদের মনের মতন পেশা। কিন্তু তরবারি হাতে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে রাজারাজড়াকে সেলাম জানাবার ভাগ্য যাদের নেই তারা আজও চাষ করে। জোয়ান হাতে চাষ ক'রে পরের গোলায় ফসল ভরে, আর ঘরে ব'সে পূর্বপুরুষের জাঁকজমকের গল্প করে। ভাগ্যের ছেঁড়া কাঁথাখানার গায়ে রঙ-বেরঙের তালি দেয়। লেখাপড়ার কথা বললে হা হা ক'রে হাসে। বলে—

ভুঁখে সে কহা
দো ঔর দো কেয়া?
কহা চার রোটিয়াঁ।

এইসব মানুষের বসতিধন্য বিঠৌলি গ্রাম এলাহাবাদের একান্ত সন্নিকটে। গ্রামের উঠতি মানুষ হচ্ছে লালা আর চৌধুরীরা। তাদের বাড়ি সু-উচ্চ মাটির প্রাচীরে ঘেরা কোঠাঘর কেল্লার মতন দুর্ভেদ্য। আলোবাতাসবিহীন, শাদা রঙ-করা কোঠাঘরে পাকা ছাদ। দাস-দাসী ছাগল-মহিষ নিয়ে সে এক সদাগুঞ্জরিত মৌচাক। পালায়, পরবে, দশেরা ও বিয়েতে লালারা হাতি বের করে জলুষ লাগিয়ে। ঘোড়ার পিঠে ব'সে গোলাপী পাগড়ি-বাঁধা সেরস্তী পেতলের পরাৎ থেকে বিতরণ করে গাঁয়ের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে গুলাবী রেউড়ি, তিলছড়ি আর সোহন হালুয়া। তাদের বাড়ির মানুষ মরলে পাথরের স্তম্ভ ওঠে শ্মশানভূমিতে। কোম্পানীর সাহেবরা কালে-ভদ্রে এলে লালাদের বাড়ি থেকে তাঁবু যায়। খানাপিনার খরচও বহন করে তারাই।

বছরে একবার ক'রে তীর্থে তীর্থে যায় লালাদের বাড়ির লোকেরা। মথুরা, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন,—সর্বত্র মন্দিরে মন্দিরে লালাদের অনেক দান আছে। দান বললে সন্ত্রস্ত হ'য়ে জিভ কাটে লালার মা ছি ছি, মানুষ হ'য়ে সে কি দেবতাকে দান করতে পারে? এমন কি ভাগ্য তার?

দান সে করে না। শুধু বিশেষ বিশেষ দিনে বুকে হেঁটে দণ্ডী কেটে মন্দিরে গিয়ে রুপোর তুলসীগাছ আর সোনার শঙ্খ মানত ক'রে আসে।

মানত পুরো হবার পর দিন আগে আগে গিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো দেয়। দেবতার আশীর্বাদ চায় তার পরিবারের ওপর : ভাগ ভালা হোয়।

সে কামনা সার্থক হয়েছে বলা চলে। শুধু নিজেদের ভাগ্য নয়। গাঁয়ের শতকরা নব্বইজনের ভাগ্য বাঁধা পড়েছে লালাদের মহাজনী খাতায়। তেজারতী সুদের কারবারের হিসাব সব ছোট ছোট নাগরী হরফে লিখে রেখেছে লালা। খাতাটা বেঁধে রেখেছে তেলচিটে দড়িতে। বকেয়া সুদ মেটাতে জীবন কেটে যায় কিষাণের, ঘরে ঘরে অনটন দেখা দেয়, এদিকে লালাদের গোলা উছলে প'ড়ে যায়, মহিষ দুধ দেয় অন্য ঘরের দেড়গুণ, সৌভাগ্যের পসরা সর্বদা ষোলকলায় পূর্ণ হ'য়ে থাকে।

হিন্দু বাসিন্দাদের মধ্যে লালাদের প্রতিপত্তিই বেশি। তাদের ঘর ছেড়ে দু'কদম এগিয়ে গেলে শুরু হবে মৌলভী সাহেবের মস্ত কোঠাবাড়ি। বড় আমীর মানুষ মৌলভী, টাটকা মেহেদি পাতার রঙের তাঁর দাড়ি। আর হাতের আঙুল জাফরাণ। বড় মিঠে গলা মৌলভীর, কথায় কথায় ফার্সি তত্ত্বকথা টেনে এনে শ্রোতাকে সমঝে দেবার কায়দা একেবারে পাকা শিকারীর মতন রপ্ত তাঁর।

দিনকাল পালটে যাচ্ছে, একথা প্রায়ই তিনি ব'লে থাকেন। সাল ১৮৪৩। চারপাশে ইংরেজদের ছাউনি। সুদূর কলকাতায় নাকি তাজ্জব সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। তাঁর শৈশবে এমনধারা ছিল না। তখন লোকে মৌলভীর নামে তিনবার সেলাম করত। ফসল, মহিষ, সোনারুপো, কাপড়চোপড় সবই নিত্য নিত্য ভেট আসত মৌলভীর ঘরে। এখন আর সেদিন নেই।

মৌলভী সাহেবের মক্তবে ফার্সি প'ড়ে কতজন লায়েক হ'য়ে গেল। প্রথমে ছেলেকে আনবার আগে বাপ এসে লক্ষ সেলাম দিল। পেছনে ছোকরা ব'য়ে এনে নামাল বড় একটা ডালা। ঘরে পালা মুরগী-মুরগা, মৌলভীর বিবির জন্যে আসলামা কাপড়, তামা-পিতলের বাসন। ছোট চোখ ক'রে দেখে দেখে মৌলভী অল্প অল্প হাসেন। তারপরে ছেলে আসে পড়তে। চার বছর ধ'রে মক্তবে ভারে ভারে কত জিনিসই যে আসে। বিকানীরের মিছরি আর লক্ষ্ণৌ-এর চিকনের থান, দিল্লীর নাগরা আর আগ্রার আতর, দেহাতের ঘি, থালা-ভরা সেউ, সীমাই আর ফালুদার নানান উপকরণ।

শেখ মসল হার্দন, সাদীর পন্দ্‌নামা, গুলেস্তাঁ, বুস্তাঁ, জোমে খাঁর জামেজল কওয়াসিন, মুনসী জানমিরের খত্, এইসব দুলে দুলে পড়ে ছেলেরা। মাটিতে আঁক কেটে শেখে আলেফ, বে, তে। ফার্সি লিখতে শেখে মুক্তার মতন গোটা গোটা অক্ষরে।

তারপর লায়েক ছেলেকে শহরে নিয়ে যায় বাবা। ভেট লাগায় চেনাপরিচিত এলেমদার সব লোক খুঁজে খুঁজে। সরকারী দফতরে হোক, বা কোন রাজা আমীরের কাছারীতে হোক, একবার ঢুকতে পারলে হয়। তখন শুধু আর্জি লেখ, হিসাব লেখ, খাতা রাখো। ওদিকে খিড়কি দিয়ে টাকা আসবে সিন্দুকে। জমি খরিদ হবে গাঁয়ে। বিবি পরবে হীরের নথ, ঝাপটা, পায়ে পরবে জরির চটি, বুড়ো বাপ মা হজ করবে বছর বছর।

বড়মানুষ হবার নেশা যাদের তাদেরই এই সব সাজে। এদিকে-ওদিকে অনেক মানুষ আছে, যারা দিনমান ক্ষেতে চাষ করছে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে। তাদের বিবিদের পর্দা থাকা বড় মুস্কিল। শিকারের মাংস শুকনো ক'রে রেঁধে চাপাটি আর ভাজির সংগে সানকীতে সাজিয়ে মাঠে পাঠায় তারা পুরুষের সংগে। ফসল ঝাড়তে বাছতে, গম ধুয়ে শুকোতে, গম পিষে আটা বানাতে, জ্বালানী কুড়িয়ে উনুন ধরাতে, মুরগী তুলে ঘরে বন্ধ করতে তাদের দিনমান কেটে যায়। সন্ধ্যাবেলা বসে বাতি জেবলে রঙিন সুতোর বিনুনী গাঁথে কেশসজ্জার জন্যে। পরবের দিনে রুপোর গয়না ঘষে মেজে পরে তারা, মেহেদি পাতার অংগরাগে রাঙায় হাত, পা, নখ।

তাদের পুরুষদের দীর্ঘ দেহ, চওড়া বুক, গৌরবর্ণ, প্রশস্ত কপাল। বাদশাহী আমলটা হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষ। বাদশাদের হ'য়ে এখানে সেখানে বেতনভোগী সিপাহী হ'য়ে ল'ড়ে বেড়াবার পর থেকে ক্রমে স্থানস্থিতি হলো। তলোয়ার খুলে রেখে হাত দু'খানা লাঙল তুলে নিল। সবই রুজির জন্যে। এ কাজেও হাতে কড়া পড়ল একদা লড়ে লড়ে যেমন পড়েছিল।

এখন চওড়া পাথর-বাঁধাই ইঁদারা থেকে ঘোড়া আর মহিষের সাহায্যে জল তুলে ক্ষেতে ক্ষেতে দেবার কাজ। ছেলের চেয়েও যত্ন ক'রে গমের চারাকে বড় ক'রে তোলার দায়িত্ব। ফসল পাকলে সোনালি-সবুজ গমের খবর নিয়ে বাতাস চ'লে যায় এদিক ওদিক। তখন হরিণ আর শুয়োর বেরিয়ে আসে আঁধারে আঁধারে। ক্ষেতে মাচার ওপর ঘর বেঁধে রাত কাটায় পুরুষেরা। নজর ঠিক ক'রে নিশানা ধরে নিয়ে অব্যর্থ সন্ধানে ছুঁড়ে দেয় বর্শা আর ভাল্লা। তীব্র আর্তনাদে জানোয়ার পিছু হটে।

কখনো কখনো আঁধারের মধ্যেও আঁধার দিয়ে গড়াদেহ হাতির পাল আসে। ভাবারের জংগল ছাড়িয়ে কুমায়ুনের পাদদেশ দিয়ে জংগল ধ'রে ধ'রে তারা নেমে এসেছে। পাকা ফসলে দারুণ লোভ।

এই দুনিয়াতে চোখ মেলবার সময় থেকে খোদার মেপে দেওয়া সাড়ে তিন হাত মাটি নেওয়া পর্যন্ত কতবারই যে লড়তে হয় তাদের! একেবারে শিশুকালের কথাটাই জানা নেই। তারপর মরদ হলে তিনবার লড়তে হবেই হবে। ছেলেবয়সে বাপের সংগে, যৌবনে স্ত্রীর সংগে আর পরে ছেলের সংগে। তা' ছাড়াও সারাজীবনে উঠতি পড়তি যে কত তার দিশা কে করে! দুনিয়ার সংগে নিত্য মোকাবিলা করতে গিয়ে কত জখম বুকে ক'রে নিয়ে ঘরে ফেরে পুরুষ কে তার মর্ম বুঝবে? মরদের মতন মরদ হ'য়ে বাঁচতে হলে দুশমন দু'টো একটা আসবেই জীবনে।

আর মোকাবিলাই যদি না হলো তবে জীবনের রঙটা কোথায়! সে কেমন তরোয়াল যাতে চোট লাগে না! সে কেমন জীবন সংগ্রামে, প্রেমে, জয়ে ও পরাজয়ে যার শতরঞ্চের এক একটা ঘরে এক একটা নতুন নতুন রঙ লাগেনি?

বিশেষ ক'রে এরকম সময়, এমনি ধারা দিন, যখন হিন্দুস্থানের মানুষের অজান্তেই দেশের ভাগ্যলিপিখানা কিনে নিয়েছে ইংরেজ। এই তো বাঁচবার সময়।

এ এক আশ্চর্য দিন, এ এক অদ্ভুত সময়। সাধারণ মানুষের ভূমিকা ক্রমেই প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠছে। এসময়টা দেখবার, জানবার আর বাঁচবার। আজকে যারা গংগার পাড়ে দাঁড়িয়ে পাঁকে পা মজিয়ে জাহাজ বোঝাই ক'রে সম্পদ বিলাতে পাঠাচ্ছে, তাদেরও প্রাণের দাম একটা হবেই হবে। সেই সময়ও আসছে। প্রস্তুতি চলেছে দেশব্যাপী রঙ্গমঞ্চে। যতদিন না সময় হচ্ছে ততদিন অবধি লাঙল চালাবে কিষাণ, সাহেবের খিদমৎগারী করবে হিন্দুস্থানের জোয়ান।

তিন

গ্রামের একান্তে আনোয়ারের ঘর। এ তল্লাটে এমন কেউ নেই যে আনোয়ারকে চেনে না। দেমাকী মানুষ আনোয়ার আর তার ছেলে খুদাবক্স্। ছেলেটার বয়স সবে চোদ্দ হবে কিন্তু চলে মাথা উঁচু ক'রে। গান গায় বে-পরোয়া গলায় আর মৌলভীর শাসনকে তিন তুড়ি দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার বাপের এত তেজ এল কি করে? ভেবে ভেবে অবাক মানে গোকুলদাস। জমি বলতেই বা কতটুকু। ক্ষেতীর চেহারাই বা কি।

সে কথা বললে দাড়ি চুমরে হা হা ক'রে হাসে আনোয়ার। হাতিকে কুঁদতে শেখালো কে? শের লড়ে কোন জোরে? দুনিয়ার মাটিতে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই তেজ তারা নিয়ে জন্মেছে। আনোয়ারের তেজও নাকি ভেতরকার জিনিস। তার বাপের গল্প আজও ঘরে ঘরে চালু।

আনোয়ারের বাপ ইউসুফ ছিল সে সময়কার খেলিয়ে। দীর্ঘ পেশল দেহ। সুঠাম শরীর আর অমিত তেজ দিয়েছিল ভগবান। কিন্তু ধনদৌলত ছাপ্পর ফুঁড়ে দেয়নি। ধন-দৌলত সে দিন রাজারাজড়ার ঘরে থাকত। তাই খেলা দেখাতো ইউসুফ। খেলা দেখাতে দেখাতে নিজেই কখন পুতুল হ'য়ে গেল ভাগ্যের হাতে, আর নতুন খেলা শুরু হলো তার জীবনে। সে বড় আজব কাহিনী, রূপকথার চেয়েও অদ্ভুত।

আনোয়ার শুনেছে তার বাবা ইউসুফ নাকি বাঘের সঙ্গে লড়ত রাজপুরের রাজবাড়িতে। চব্বিশ বছরের জোয়ান পাঠানের সেই দর্পিত ক্রীড়া দেখে মন টলেছিল রাজাসাহেবের চতুর্দশতমা পত্নী জানকীর।

জানকী যখন লুকিয়ে দেখা করেছিল তখন ইউসুফ বলেছিল, চলো পালাই। ভরসা আছে তো?

নিশ্চয় ভরসা ছিল। ভাঙা মন্দিরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জানকী জোরগলায় বলেছিল ইউসুফকে, হ্যাঁ তার ভরসা আছে।

ঊনিশ বছরের রাজপুতানী আর চব্বিশ বছরের পাঠান। মরুভূমির পটভূমিকায় প্রেম, জিঘাংসা, হত্যা ও রোমাঞ্চের দুরন্ত উন্মাদনা তাদের রক্তে রক্তে আছে। সেই ঐতিহ্য তাদের বেপরোয়া করল। স্থান, কাল, পরিবেশের কথা ভুলে গেল তারা। মনে হলো দুনিয়া তাদের পায়ের নিচে। ওপরে আকাশ, নিচে জমি, আর মানুষ শুধু তারাই দু'জন।

রক্তে রক্তে দোলা লেগে ঢেউ উঠল উত্তাল হয়ে। সেই ঢেউয়ে নৌকা ভাসিয়ে বে-দিশা ইউসুফ সুন্দরী জানকীর মুখ চেয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভাসলো। প্রেম এলো বন্যার মতন। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, বীরাওন আর মুক্তকেশ, বন্দরে বন্দরে সেই বন্যার ধাক্কায় ভেসে বেড়ালো দু'জনে। কিন্তু সেই মুক্ত প্রেমে অভিসম্পাত এল দৈবের রূপ ধ'রে। দুরন্ত গরমে সেবার যখন সর্বত্র হাহাকার উঠেছে, ক্ষেত জ্বলে যাচ্ছে, কুয়ো শুকিয়ে উঠছে, হিমালয়ের বুকে বরফ গলে তখন ঢল নামল নদীতে। রাতারাতি বন্যা এল দুর্বার হ'য়ে। ভেসে গেল বীরাওন আর সৌগড়—লক্ষ্ণৌ-এর উত্তরের সমৃদ্ধ জনপদ, আর সেই বন্যায় ভেসে গেল ইউসুফদের ঘর।

উত্তাল জলের মুখে তারা দু'জনেই ভেসে গিয়েছিল। ইউসুফকে বাঁচাতে গিয়ে গোমতীর উত্তাল স্রোতে কোথায় তলিয়ে গেল জানকী, তার একুশ বছরের যৌবন আর হাজারটা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। অচৈতন্য ইউসুফকে জল থেকে তুলেছিল নবাবের জঙ্গলের ইজারাদার আর তার মেয়ে সেবাযত্ন ক'রে বাঁচিয়েছিল। সে ঋণ শোধ করবার নয়। তাই ইউসুফ পরে বিয়ে

করেছিল তাকে।

ঘর বেঁধেছিল ইউসুফ, ক্ষেতী ধরেছিল অনভ্যস্ত হাতে। মাঝরাতে ক্ষেতের ওপর মাচা বেঁধে ব'সে শুয়োর তাড়াতে তাড়াতে তীব্র বাতাসে ভেড়ার কম্বল জড়িয়ে কাঁপত ইউসুফ, আর মনে মনে নাড়াচাড়া দিত জানকীর কথা। ঘর বেঁধে সে কী অন্যায় করেছে? জানকী কি তাকে দোষ দিচ্ছে? ঘর বাঁধতে জানকীও চেয়েছিল। রাজার রাণী হ'য়েও ইউসুফের সঙ্গে জাঁতার শব্দে মুখরিত, শিশুর কলকণ্ঠে মধুর, কাঁচের আর রুপোর চুড়ির নিক্কণে মুখর একটি সাধারণ পরিবেশ রচনা করবার কামনা ছিল তার। চাঁদের আলোতে ঘুমন্ত জানকীকে মনে হত জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া। মায়াময় তার সৌন্দর্য, ইউসুফের মনে হত বুঝি আসমানের কোন পরীকেই সে জোর ক'রে বন্দী ক'রে রেখেছে। কিন্তু জানকী তার আশঙ্কাকে দর্পিত ভ্রূকুটিতে পরিহার করত। সে রাজপুতানী, বিশ্বস্ততা তার জাতের ধর্ম। তার দাদী পরদাদী সব 'সোহাগুণা সতী'। সোহাগুণা সতী সেই হয়, যে স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করে, অনুমৃতা রমণী সোহাগুণা। 'ইমা নারীর্ বিধবা—' এই মন্ত্র সে কতবার শুনেছে।

সেই ঐতিহ্য নিয়ে বিধর্মীর সঙ্গে কেমন ক'রে ঘর বাঁধলো জানকী? ইউসুফের সাদর প্রশ্নের জবাবে জানকী কৌতুকভরা চোখে হাসতো। তার চোখেই যেন জবাব পেত ইউসুফ। ইউসুফের সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়েছে জানকী, সেখানেও সে তার ধর্মকে মেনেছে। এই ধর্ম যৌবনের। যৌবন অল্প কয়দিনের জন্যে আসে, কিন্তু তার দাবীই কী কম? রাজান্তঃপুরে বহুজনের একজন হ'য়ে কোন্ নারী সুখী হ'তে পারে? হীরের কঙ্কণ, মোতির মালায় কী সুখ বাঁধা পড়ে? ঊনবিংশ শতকের বাল্যকাল। মর্মরকোঠায়, মণিকক্ষে নারীদের শুধু প্রিয়া হ'য়ে বেঁচে থাকবার অধিকার দিয়েছে সামন্ততন্ত্র। সুন্দরী রমণী হবে প্রিয়া, এবং বংশধর আনবার জন্যে বিবাহিতা পত্নী হবে জননী।

সে নির্দেশ মেনে নিয়ে এক জীর্ণদেহ শ্লথমুঠি নৃপতির অনুগতা পত্নী হ'য়ে চতুর্দশ-লোক স্বর্গে সুখ ভোগ করবার দুরাশায় যারা সতীর মৃত্যু বরণ করে, তাদের একজন হ'য়ে থাকতে চাইল না জানকী। সে কোন একজনকে আশ্রয় ক'রে লতার মতো পুষ্পিত হ'তে চাইল। জীবনের পরমলগ্নে কোন একজনকে বরণ ক'রে তার চোখে অনন্যা হ'য়ে উঠতে চাইল। কারো জীবনে সে একমাত্র হবে, শ্রেষ্ঠ হবে, প্রেয়সী হবে, এই সত্যকেই সে ধর্ম ব'লে মানল।

তবু সব ফুরিয়ে গেল। আজ যদি অনেক ক'রেও চায় ইউসুফ কখনো তাকে আর দেখতে পাবে না। আর কখনো গোমতীতে কিস্তি ভাসিয়ে তারা বেয়ে চ'লে যাবে না বীরাওনের জঙ্গলের পাশের সেই ছোট্ট পাথরের বাড়িতে, মিঠে গলায় জানকী আর গাইবে না—ইয়াদ রাখো যো প্যার নাম সে বুলায়া—

সেই সব বসন্তের দুপুরের মতো উজ্জ্বল, মধুর, আবেশবিহ্বল দিন—বেলী চমেলী সে কোয়েল আশীক্ বনি হ্যায়—। বেলা ও চামেলীর গন্ধমত্ত কোকিলের গানের মতো মিঠে গরমের রাত, উর্দু বয়েৎ আর ব্রজবোলির গানে গানে মাতাল প্রেম, এই দুর্লভ স্বর্গ তার জীবনে এনেছিল যে মেয়ে, সে আবার বে-ঠিকানা হ'য়ে হারিয়ে গেল।

যদি কোন অদৃশ্যলোকে থাকে জানকী তবে সে নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করেছে। ক্ষমা করেছে ঘর বাঁধবার জন্যে, সাদী করবার জন্যে, শিশু আনোয়ারের জন্যে। ইউসুফের অন্য উপায় ছিল না। জানকীই যখন রইল না, তখন নতুন ক'রে জীবনটাকে মাতাল রঙে রঙিন করবার ইচ্ছাই তার চলে গেল। বিচিত্র রঙের কত ইচ্ছাই যে নিয়ে গেল জানকী, কত ইচ্ছাই

যে ভেসে গেল সেই সন্ধ্যায় গোমতীর জলে, শুধু মনে মনে চিরন্তন পুরুষের মতো শিশু ও পত্নী নিয়ে একখানা ঘর বাঁধবার সাধারণ ইচ্ছাটাই রয়ে গেল।

সাধারণ ইচ্ছা নিয়ে সাধারণ জীবন কাটিয়ে যেত ইউসুফ, কিন্তু শিকারীর মৃত্যু তেমন ক'রে আসে না। আসে না ব'লেই হয়ত জীবন হ'য়ে উঠল এক সংগ্রামক্ষেত্র। ইংরেজ সাহেবদের আনাগোনা সুরু হ'য়ে গেল গাঁয়ে।

সাহেব ছাউনি ফেলতে এলে জ্বালানী কাঠের জন্যে হামলা ক'রে ফিরত তার সেরেস্তাদার। গরীবের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যেত হাঁস মুরগী।

একদিন সেরেস্তাদার কোপ লাগালো ইউসুফের সারা বছরের বন্ধু ভাল ফলনের আমগাছটায়। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল ইউসুফ। গাছটা তখন আধা কাটা হ'য়ে গেছে। সেরেস্তাদার বলল,—পাঁচ টাকা তো মিলবেই তোর।

শুনে ক্ষেপে গেল ইউসুফ। টুঁটি ধ'রে ছিট্‌কে ফেলে দিল গুজোরী দুটোকে, যারা কাঠ কাটছিল। সেরেস্তাদার ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তার দলে ছিল আট দশজন, আর এদিকে ইউসুফ একা। অসম সেই মারামারিতে চোট লাগলো ইউসুফের মাথায়।

গাঁয়ের মানুষ ভেঙে এল। প্রাণ নিয়ে পালালো সেরাস্তাদার, কিন্তু ইউসুফ বাঁচলো না। তিনদিন তিনরাত ধরে শুধু ভুল বকলো সে, এতটুকু জল খেলো না। শেষ সময় অবধি গালাগাল ক'রে গেল সেরেস্তাদারকে।

পরে অবশ্য গোর-কাফনের টাকা দিতে চেয়েছিল সাহেব। সেরেস্তাদারকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে টাকা নেয়নি। আনোয়ারের মা বলেছিল, ও টাকা তার কাছে হারাম।

এমনি ক'রে মৃত্যুবরণ করেছিল ইউসুফ, যার হিম্মতের কথা আজও গল্প হ'য়ে আছে। যদিও তার ছেলের বয়সই পঁয়ত্রিশ হ'তে চলল।

সেই ইউসুফেরই ছেলে আনোয়ার। কিন্তু এক পুরুষেই ভাগ্যের রদবদল হ'য়ে গেছে। দাদাপরদাদার আমলে নাকি অভাব কাকে বলে তা মানুষ জানত না। যমুনা জল দিত, মাটি দিত ফসল, আর আকাশ থেকে খোদা ঢেলে দিত সুখ-সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য আর নিরাপত্তা। সেই দিন কেমন করে বদলে গেল, সেই কথাই ভাবছিল আনোয়ার—উঠোনের আমগাছটার তলায় চারপাই'টা বাঁধতে বাঁধতে।

ফসলের মৌসুম শেষ হ'লে সাহেব তাঁবু ফেলে ফেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে। তখন ভেট লাগায় তালুকদার,—জী হুজুর মেহেরবান, জিন্দ্‌গী রাখ্‌নে কা ঔর মারনে কা মালিক,—

কয়দিন গাঁয়ে খুব হৈ চৈ লেগে যায়। ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, দুধ, মধু, ঘি আর কাঠ ভারে ভারে চলে যায় সাহেবের তাঁবুতে। সাহেবের আমীন গোঁফে চাড়া দিয়ে নাগরা জুতো মস্‌মস্‌ করে বীরদর্পে গাঁয়ে টহল দিয়ে ফেরে। ছেলেরা আড়াল থেকে অবাক চোখে দেখে সাহেবকে, আর কুয়ো থেকে জল নিয়ে ফিরতে ফিরতে মেয়েরা আড়চোখে মেম্‌সাহেবকে দেখে নিজেরাই লজ্জা পেয়ে যায়।

সবই ঠিক ছিল কিন্তু দিনকে দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে সব। বদলে যাচ্ছে চুপিসাড়ে। দিনের গতিবিধি ঠিক যেন ধরা যাচ্ছে না।

এমন ধারা ছিল না দিন। গত সাত বছরের মধ্যে চার সন গেল অজন্মা,—ক্ষেতে ক্ষেতে সোনা-রং গম জল না পেয়ে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। অজন্মা গেল ত শুরু হলো

প্লাবন, পর পর তিন সনই বন্যা, যমুনা উত্তাল, ক্ষেতী জমি ঘর বাড়ি, সব ভেসে গেল বানের জলে।

বন্ধু নন্দলালের কথা মনে পড়লো আনোয়ারের। এইসব আপদ-বিপদের কথা যখনই ওঠে তখনই তার বন্ধু নন্দলাল কার্যকারণ দিয়ে বলে—কি জান, দুনিয়া থেকে 'ধরম' জিনিসটা নাশ হ'য়ে যাচ্ছে, তাই এই বিপত্তি।

হবেও বা। নইলে কত কি-ই যে আজগুবী ঘটে যাচ্ছে তার কূলকিনারা মেলে না কেন?

নন্দলালের দাদা ছগনলাল, একটানা দু'বছর মানসিক ক'রে নর্মদার জলে স্নানদান করতে গিয়েছিল গত বছর। দু'মাস আগে সে ঘরে ফিরে এসেছে। বলেছে,—হিন্দুর শাস্ত্রই বল আর মুসলমানের কোরাণই বল, কি নর্মদাগঙ্গার জলধারা কি হেরা পাহাড়ের পুণ্যধারা, সব কিছুর গুরুত্বই কমিয়ে দিয়েছে সরকার,—নতুন অংরেজ সরকার। এখন সাক্ষী মানতে, কি সাহেবের কাছে কথা কইতে, কথায় কথায় সাহেবেরা মানুষদের হলফ খাওয়ায়। ছোট ছোট বিষয়ে, পাপপুণ্য আর স্বার্থের বিচারে বিধর্মী সাহেবের নির্দেশে হলফ খেয়েছে বলেই মাথাহেঁট হ'য়েছে দুই ধর্মের। তাই বিরূপ হয়েছেন দীন-দুনিয়ার মালিক।

সবচেয়ে বড় অধর্মের কথাটা বলে নন্দলাল নিজেই হতবাক হয়ে যায়। তার কানের কাছে মুখ দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে, তোমার ধর্মে মানা নেই, তবু সেই মাংস কখনো খেয়েছ?

তোবা! তোবা! বলে, নাক কান মলেছে আনোয়ার। সেই মাংস মানে নিষিদ্ধ গরুর মাংস। কথাটাই মুখে উচ্চারণ করতে পারে না নন্দলাল।

ধর্মে মানা নেই তাই কি?

ধর্ম-ত একটা নয়, ধর্ম হাজারটা, ব্যবহারিক জীবনেও ধর্মাচরণ আছে। যে প্রতিবেশীর সঙ্গে শৈশব থেকে হেসে খেলে বড় হয়েছে, তারও মন আছে, বিশ্বাস আছে; তা-ও তুমি ভাঙতে পার না। তাতেও ধর্ম ক্ষুণ্ণ হবে। সেইজন্য একই গাঁয়ে পাশাপাশি বাস করে দশহরা আর মহরম, হোলি আর ঈদ, নির্বিবাদে পালন করেছে মানুষ। নন্দলাল বলে আর মাটিতে চোখ বিঁধিয়ে শোনে আনোয়ার।

নন্দলাল বলে যায়, আজ ত তেমনটি আর থাকছে না। সাহেবেরা নির্বিচারে আজ সেই মাংস সর্বত্র ভোজন করছে।

—সর্বত্র?

—কেন নয়? এখন কি ধরিত্রীতে এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে সাহেব নেই? এমন কি কোন গ্রাম আছে যেখানে বছরে অন্তত দু'দুবার সাহেবদের তাঁবু পড়ে না?

—গঙ্গার এপারেই কি আর ও পারেই কি!—গঙ্গা এখানে, দক্ষিণে নর্মদা। গঙ্গা যমুনার জলে স্নানে পুণ্য; জলস্পর্শ হ'লে তবে পুণ্য আসে। নর্মদা চিরকুমারী, পবিত্রতার মূর্ত প্রকাশ। নর্মদার দর্শনমাত্রে পুণ্যার্থীর পুণ্য হয়। কিন্তু সাহেবদের ব্যাভিচারে নর্মদাও আজ বিরূপ। সেখানেও চলেছে বছর বছর দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি আর বন্যা,—প্রকৃতির খামখেয়ালী অত্যাচার। একমুষ্ঠি অন্নের স্বপ্ন চোখে নিয়ে সেখানে মাঠের রাজা কিষাণ কিষাণীর হাত ধ'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে পথে। সাগরশহরের রাজপথে তারা কাতার দিয়ে পড়ে মরেছে। মায়ের কোলে মরেছে ছেলে, বুড়ো বাপের অন্ধের লাঠি তার

সোহাগী মেয়ে মরেছে পাশাপাশি।

নন্দলালের চোখ রক্তজবা। বলে,—ভক্তজনের ওপর দেবতা কি কখনও বিরূপ হয়? তবে কেন হলো এই মহাপাতক? কোন পাপে? কার পাপে?—ঐ সাহেব,—সব করেছে ঐ সাহেবরা।

আনোয়ার ভাবে, নন্দলাল যে কথা বলে, আজ অনেকেই সেই কথা বলাবলি করে। সেদিন দরগার ফকির সাহেবের কথায় আনোয়ার জেনেছে, ন্যায়ধর্ম যে জলাঞ্জলি দিয়েছে সে ত মহাপাতক বটেই, কিন্তু সেই মহাপাতক বরদাস্ত করে যারা আজ মুখ বুজে আছে তারাও মহাপাপী। এ-দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি তাই তাদের কপালে চিরকালের মত বরবাদ। সুতরাং আমি তুমি, সকলেই দোষী। রাজার পাপে নষ্ট হয়েছে রাজ্য, আর সেই রাজ্যের প্রজা হয়ে সাধারণ মানুষেরও দুঃখকষ্টের পরিসীমা নেই আজ।

তাই প্রকৃতি বিমুখ। মানুষের এই নিদারুণ দুঃখের দিনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে অভিমানে।

এই ত কয়েক বছর আগেকার কথা। কি ফলন আর কি ফসল। সমৃদ্ধির ভারে গাছ লুটিয়ে পড়ল ভুঁয়ে। এলাহাবাদ আর বান্দা জেলার মানুষ বলল, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন ফসল কেউ চোখে দেখেনি। মেহনতী মানুষ জিরোবার ফাঁকে ফাঁকে কত গান বেঁধে বৌ-কে শোনাল, এই ফসল থেকেই তার বৌ-এর হাত-ভরতি চুড়ি হবে, গলায় উঠবে রুপোর হাঁসুলি, ইদ্-উল-ফিতর আর ছট পরবের দিনে নতুন নতুন ঘাঘরা আসবে হাট থেকে। সেই সুখের দিনে পায়ের জিঞ্জরা মল কেমন করে বাজবে! সেই ছন্দে গান গাইল কিষাণ—; আর কালো ভুরু চাঁদের মত বাঁকিয়ে পিয়ারা বৌ শাসন করল তাকে দশজনের চোখ এড়িয়ে, ফাঁকে ফাঁকে।

সন্ধ্যাবেলা উঠোনে চারপাই-এ বসে কত কথাই যে মনে এল কিষাণ কিষাণীর। মনে হল, ভাঙা ঘরে ছাউনী পড়বে, পুরোনো ঋণ শোধ হবে, দাওয়াৎ দেবে একদিন বন্ধুজন ডেকে। পরবের দিনে ছেলেমেয়ের হাতে ইচ্ছামত গুলাবী রেওড়ি, তিলুয়া আর সোহন-হালুয়া কিনে দেবে।

এইসব একান্ত ইচ্ছার সূত্র ধরে দু'টি মন কাছে এল, কত সন্ধ্যা মন্থর হলো ভাষাহারা অনুভূতিতে,—নিত্যকার ব্যবহারে মলিন ভালবাসা সুখের আশ্বাসে উজ্জ্বল হলো।

ভাব পেল না ভাষা,—কথা খুঁজে না পেয়ে কিষাণ কিষাণীর হাতে হাত বুলিয়ে ডাকল, সেই সেদিনের কোমল হাতখানি আজ এমনিধারা শুকিয়ে গেলেও কাল আবার ডৌল ফিরে আসবে। আর কিষাণী-বৌ সগর্বে ভাবল, গমের ক্ষেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যখন ফসল কাটতে শুরু করবে মানুষ তখন সে দশজনের মধ্যে সেরা। এমন পুরুষ কোন ঘরে আছে?

কিন্তু ভাগ্য এমন, ফসলে রং-ও ধরল আর কোথা থেকে বাতাস বয়ে আনল মৃত্যুর বীজ। গমের শীষে রাতারাতি জাফরাণ রঙের আবরণ পড়ে গেল। তিন দিনে সেই রং গাঢ় বাদামী হয়ে উঠল, আর ফসল ঝরে পড়ল মাটিতে ফোঁপরা হয়ে যেন ভেতর থেকে কে শুষে নিয়েছে। ফসলের মড়ক। এমনি ধারা নাকি ঘটেছিল অনেক অনেক বছর আগে, যখন 'হেস্টিন' সাহেব অযোধ্যার বেগমদের ওপর জুলুম করেছিল, সেই বছর।

খাটিয়া-বাঁধা শেষ হ'তেই উঠে দাঁড়ায় আনোয়ার। পিঠটা সোজা ক'রে হাঁক দেয়,—লাল!

সু-উচ্চ কণ্ঠে ঝংকার দিতে দিতে ঢুকল পরী। জল ভরা তামার সোহরাইটা দুম্

করে নামিয়ে রাখল ঘরে আর বক বক করে বাতাসকে শোনাতে লাগল,—এই রকম করে সংসার চালানো তাকে দিয়ে হবে না। ঘরে যে মানুষটা আছে, সেত থাকা না থাকা সমান! এমনই সে বীতস্পৃহ পরীর সম্পর্কে। একটা ছেলে, সে-ও একেবারে অবাধ্য। জ্বালা কি তার কম! এই যে পানি আনতে গিয়ে নিত্যি গোলমাল, কে তার ফয়সালা করে?

লালার বৌ-এর এত অহংকার যে কুয়োতলা জুড়ে বসেই থাকবে আর গল্পই করবে। কেন পরী কি তার দাসী? তার সংসার নেই, কাজ নেই? যমুনার নানীরই বা কি আক্কেল! দুতৌলী আটা ধার দিয়েছিল কবে, সে কথা কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে শোনাতে হয়?

মুখ টিপে হেসে আনোয়ার বলে,—এত সাহস পায় কোথা থেকে মানুষ!

—পাবে নাই বা কেন? আমার সোয়ামী ত আর তালুকদার না! আমার নসিবই এমনি।

—আমার সোয়ামীত অরে তালুকদার না! আমার নসিবই এমনি।

রসিকতায় আনোয়ারও কম যায় না। পরীর কাঁধে হাত রেখে বলে,—দে নাম লিখে দে। যমুনার নানীকে হাজতে পাঠাই। লালার বউকে হজিমত দেই। বড় আস্পর্ধা বেড়ে গেছে সব!

আনোয়ারের হাত ঠেলে দিয়ে পরী ঝাঁঝ দিয়ে বলে,—এখন খেলা করবার সময় নয়। অনেক কাজ আমার। এক-উঠোন শুকনো পাতা ঝাড়ু দিতে হবে, রুটী সেঁকতে হবে, ছাগল দুটো তাড়িয়ে আনতে হবে ক্ষেত থেকে।

—কাজে যেতে হয় যা না, ভারী কাজ দেখানেওয়ালী হইছিস।—বলল বটে কথাটা কিন্তু পরীকে ছাড়ল না আনোয়ার। চিবুকটা তুলে সে নিরীখ করে দেখল। বলল, মনে পড়ে? সেই ঘর করবি না ব'লে ঘাসের গাড়ির পেছনে চেপে বাপের কাছে পালিয়েছিলি?

—আর তুমি যে ক্ষেত পালিয়ে ভাব করতে গিছলে?

সে সব পুরোনো দিনের কথা ভেবে পরীর চোখে মেদুর স্বপ্ন নামতো যদি না ঘরে ঢুকত তার ছেলে, নাচতে নাচতে।

—মা ক্ষিদে পেয়েছে খেতে দে। ত্রস্তে সরে গেল পরী আনোয়ারের হাত ছাড়িয়ে, আর আনোয়ার গেল বাজারতলা। সেখানে আজ মস্ত জমায়েৎ আছে।

একদিন এ অঞ্চলের মুসলমান কিষাণরা ছিল সিপাহী, বাদশাহী আমলের ফৌজ। জমি মিলেছিল নবাব বাদশাহের কাছে। তাই ধরেছিল ক্ষেতী। এখন জমি চাষ করে আর পড়তা থাকে না। তার ওপর পর পর কয়েক বছর ধাক্কা খেয়ে রুজীর জন্য চিন্তিত হ'য়ে উঠেছে সকলে। সময় বুঝেই ফৌজী কাজের খবর নিয়ে এসেছে নওলপ্রসাদ এলাহাবাদ থেকে। নতুন কথা বলবে সে।

চার

গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে সোজা বাজারতলার দিকে। পাশে সু-উচ্চ শিবমন্দির। এ মন্দিরে ঢোকবার এক্তিয়ার নেই আনোয়ারের। তবু সে জানে শ্বেতপাথরের মেজেতে নাগরী হরফে—পরম সৌভাগ্যবতী অযোধ্যাকুমারীর নাম লেখা আছে।

অযোধ্যাকুমারী হচ্ছে বুড়ো লালার পিসী। সে কি আজকের কথা। সতী হয়েছিল সে। তার আগে পরে আরও অনেকে সতী হয়েছে। নদীর ধারে সারি সারি চৌড়া আছে

তাদের নামে। তবু অযোধ্যাকুমারী তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তার চৌড়া সব চেয়ে উঁচু।

সকালে সন্ধ্যায় স্নান করে ফিরবার পথে হিন্দু মেয়েপুরুষ সেখানে জল ঢালে, প্রণাম করে, আর পুণ্যদিনে মিঠাই ফুল রাখে।

লালাদের ছেলে মাখনলাল আনোয়ারের শৈশবের সাথী,—ছোটবেলার খেলুড়ী। যমুনার চর পেরিয়ে যখন তারা তরমুজ চুরি করতে যেত, তখন নৌকোয় বসে মাখনলাল বলত,—সতী হ'লে কি হয় জানিস? পঁয়ত্রিশ কোটী বছর ধরে সতী স্বর্গে থাকে। সতীর মা, বাপ, আর স্বামীর বংশ চোদ্দজন্মের জন্য পবিত্র হয়।

এমনই ভাগ্যের পরিহাস, মাখন যখন চোদ্দ বছরের তখন তার মাকে সবাই ধরে বেঁধে সতী করালে। একমাত্র ছেলে মাখন, তবু তার বাবা অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে এলাহাবাদে থাকতো। মা ছাড়া কিছু জানতো না মাখনলাল। বংশমর্যাদা কম ছিল বলে শ্বশুরঘরে বড় ভয়ে ভয়ে আর মুখচোরা হয়ে দিন কাটাতো মাখনের মা। শহরেই মরেছিল মাখনের বাপ। স্বামীর ব্যবহৃত নাগরাজোড়া, যার দাগ নাকি মাখনের মায়ের শরীরটাকে জখম আর মনটাকে ভীতু করে রেখেছিল ষোল বছর ধরে, তাই বুকে করে মরতে গেল সে। তার শ্বশুরবাড়িতে চিরকাল ধরে এমনিধারাই ঘটেছে। এইটাই রীতি।

অযোধ্যাকুমারী ছিল মাত্র বছর দশেকের মেয়ে। কিন্তু তবু সে রেহাই পায়নি। স্বামী মরাতেই সে আমের ডাল হাতে লাল কাপড় পরে পিঁড়িতে বসে বলেছিল, সৎ সৎ সৎ। শেষ সময় ভয় পেয়েছিল। লাফিয়ে উঠে পালাতে চেয়েছিল বাপের কাছে। তবু সেই বাপই তাকে জোর করে ধ'রে এনে চিতায় তুলে দিয়েছিল। ঢাক ঢোলের শব্দে তার কান্না শোনা যায়নি। ভাঙ-এর নেশায় হাসতে হাসতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে সে, সেই নাকি তার আসল রূপ। দশবছরে সতী হয়ে পরিবারকে অতুল পুণ্য দিয়ে গিয়েছে অযোধ্যাকুমারী। স্বামীর ভাগের বিশাল সম্পত্তি পেয়ে তার দেওররা চৌড়া তুলে দিয়েছে যমুনার তীরে। আর গাঁয়ে মন্দির তুলে দিয়েছে তার বাপ।

অযোধ্যাকুমারীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মাখনের মাকে বুঝিয়েছিল তার শ্বাশুড়ী ননদ। বলেছিল, মাখনলাল ত' আর ছোট নেই! কতজন যে কচি কচি ছেলেমেয়ে রেখে চলে যাচ্ছে! মাখনের মা ভাঙ আর আফিং-এর নেশায় তখন মাতোয়ারা। কিছু তার কানে ঢুকেছিল, কিছু ঢোকেনি। ধ্বজা উড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে, কড়ি ফুল আর মিঠাই ছড়িয়ে বড় ধুমধাম করে তারা নিয়ে গিয়েছিল মাখনের মা-কে। ভাসুর খুলে নিয়েছিল গহনা, আর শ্বশুর তার হাত ভরে তামার পাই ঢেলে দিয়েছিল। দান করুক বউ, অর্জন করুক মহাপুণ্য। হুঁস ফিরেছিল মাখনের মা-র শেষ সময় ছেলের নাম ডেকে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। দশখানা গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসেছে চারদিক থেকে। ঢাকে ঢোলে ঝনঝনিয়ে বাজনা উঠছে। ধূপের ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ক'হাজার লোক সমস্বরে জয়ধ্বনি করছে। জ্বলন্ত চিতায় ঘৃতাহুতি দিতে দিতে পুরোহিত উচ্চারণ করছেন, অনশ্রয়ো অনমীবাঃ সুশেবা আরোহন্ত......।

সেই রাতে যখন সবাই ঘাটে বসে হল্লা করছে, তখন মাখন পালিয়ে এসেছিল আনোয়ারের বাড়িতে। আনোয়ারের মায়ের কোলে মাথা গুঁজে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল আর জাতের মুখে তিনবার পদাঘাত করেছিল।

সেই থেকে মাখনলাল ক্রীশ্চান হয়ে গেছে। গাঁয়েও আর ফেরেনি। সবাই জানে সে কানপুরে থাকে। বুড়ো পাদ্রী সাহেবের দৌলতে ফারসী আর ইংরেজী শিখে ছোট মুন্সী হয়েছে। সাহেবের সঙ্গে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে দোভাষীর কাজ করে। তা'ছাড়া হিসাব

রাখে, খাতা দেখে। অনেকে বলে, তার নামটাও নাকি পরে বদলে গেছে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বাজারতলা চলল আনোয়ার।

সকালবেলা। নদীতে স্নান করে ঘটি থেকে জল ছিটিয়ে আশপাশের সমস্ত পথ শুদ্ধ করতে করতে আসছে শিবমন্দিরের পুরোহিত। উচ্চকণ্ঠে দোঁহা গাইতে গাইতে আসছে সে—কিরপা হোই রাঘব রাম সে উধার ভৈল সন্তাপী—। পাথর-বাঁধানো পথের দু'পাশে নিচু দু'তলা বাড়ি। নিচের ঘরে বসে বুড়ো দর্জি সেলাই করছে। মৌলভীসাহেব চাবির গোছা হাতে মক্তবের দরজা খুলতে চলেছেন। শাক, সবজী, দুধ আর ঘিয়ের ভার মাথায় নিয়ে ঘাঘ্‌রা দুলিয়ে উচ্চকণ্ঠে গল্প করতে করতে চলেছে মেয়েরা। যমুনার নানী জাঁতা ঘোরাচ্ছে ঘড় ঘড় শব্দে।

বাজপোড়া জামগাছটা পেরিয়ে বাজারতলা পেঁছিল আনোয়ার। প্রথমেই চোখে পড়ল চারপাই-এর উপর দাঁড়িয়ে মোটা নওলপ্রসাদ চীৎকার ক'রে কি বলছে।

মস্ত বাঁধানো চক। তারই উপরে দাঁড়িয়েছে নওল। ঘিরে বসেছে সবাই। সাদা গোল চিকণের কাজ-করা টুপি মাথায় এসেছেন সম্মানিত বৃদ্ধ গ্রামবাসীরা। কি বলছে নওল? ফৌজী জীবনের কথা বলছে সে। বলছে,—চাকরী মিলবে, ছুটি মিলবে, বুড়ো হলে পেনসিল-ও মিলবে। সেখানে নিরাপত্তা আছে, টাকা আছে, কদর আর খাতির আছে।

কানে কানে হাফিজকে জিজ্ঞাসা করল আনোয়ার,—নওল কবে থেকে এত বিশ্বাসী মানুষ হলো?

হাফিজ বলল,—জাতপাঁত পুছে কোঈ? জনাও পরকে ব্রাহ্মণ হোই। শহর থেকে ঘুরে এসেছে, ওর বৌয়ের চাচা কানপুরের রিসালাদার। তাতেই ওর ভোল বদলে গেছে। থলি ভরে টাকা এনেছে। নিজের ঘোড়া চেপে এসেছে। গায়ে শাল, পায়ে নাগরা উঠেছে।

নওল বোঝাতে লাগল,—কিষাণ হয়ে জন্মেছ যখন, তখন ধার মাথায় করেই এসেছ। কর্জ্ হ্যায়মর্দন-ই-শোহর। ধার হচ্ছে পুরুষের মনিব। ধার শুধ্‌তে শুধ্‌তে মরে যাবে—আর ধার রেখে যাবে ছেলের ঘাড়ে। শুধু ক্ষেতী করে চলেছে আমাদের বাপ দাদারা। তখন একটাকা রোজগার করলে তিনমাস খেয়েছে মানুষ। এখন পড়েছে টাকার দিন। টাকা আনতে হবে।

জমায়েত থেকে সাড়া উঠল মৃদুগুঞ্জনে। এ-কথায় সকলেই সাড়া দিচ্ছে। টাকার দরকার সকলেরই আছে।

আবার নওলপ্রসাদের কণ্ঠ বেজে উঠল,—ফৌজী জীবন বড় সম্মানের। নবাব সাহেবের যত প্রজা সবাই আজ সেরা ফৌজী সিপাহী। সেইদিন আর নেই, যে পুরোবাট্টা দেবে বলে আধাবাট্টা দিয়ে ঠকাবে। সে হয়েছিল বটে একসময়ে। তখন মনের দুঃখে সিপাহীরা দলে দলে চাকরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এখনকার সাহেবরা বড় ভালো। সব পুরো বাট্টার চাকুরী, দেশঘরের কাছে। কোন ভাবনাই নেই।

নওলপ্রসাদের কথাগুলোয় সত্যিই যেন কোন আশার বাণী শুনতে পেল আনোয়ার। বড় দরকার হয়ে পড়েছে টাকার। বড় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে জীবন।

সেইদিনকার কথা নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে শুরু হলো আলোচনা। তারপরেই এল বিদায়ের পালা। ঘরে ঘরে বিদায় নিয়ে মানুষ চলল যমুনা পেরিয়ে দল বেঁধে। খেয়ানৌকোর ছই-এ বাতি জ্বালিয়ে রাতারাতি কত মানুষ গেল পার হ'য়ে।

ইতিহাসের পাশাতেও নতুন করে দান পড়ছে। কালের অমোঘ বিধানে নির্বাসিত হ'তে চলেছে সেইসব দুর্লকি চালের দিন। ঠগী আর পিণ্ডারীর অত্যাচারে থরোথরো বুক মুসাফির, তীর্থ ও হজ যাত্রী। উটের পিঠে ইস্তাম্বুলী কার্পেট চাপিয়ে বেদুইনী পোশাক-পরা আরবী সওদাগর, পিতলের তাঞ্জামে বসে মিছরী আর ফল বিতরণে পুণ্যার্জনে ব্যস্ত প্রসন্ন সহাসনয়না রাজপুতানী, তাদের দিন চলে যাচ্ছে। পেঁৗছে গেছে নতুন মানুষ। হিন্দুস্থান তাদের। হিন্দুস্থানের কোটি কোটি মানুষ তাদের প্রজা। ফৌজ তাদের প্রয়োজনের হাতিয়ার।

এক রাত্তিরে চলে গেল আনোয়ার। গেল দুরাশায় বুক বেঁধে। পরীর কাকুতি মিনতি, খুদাবক্সের চোদ্দবছরের জীবনের ভালোমন্দের ভাবনা, এই সব চিন্তা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করল সে।

নাম লেখাতে গেল যে মানুষ সে আর ফেরে না। আজ গেল, কাল গেল, দশটা দিন কেটে গেল, তার দেখা নেই। পরী শুধু দোয়াভিক্ষা করে। কোন্ আসমানে বসে আছে খোদা তার কানে যায় না।

খবর এল মাঝরাতে। কার সাড়া পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল পরীর। দোর ঠেলছে কে? কোন জানোয়ার নয়তো? ভাল্লাখানা টেনে নিল পরী। তখন আনোয়ারের গলা শোনা গেল—পরী, পরী......

দোর খুলে আনোয়ারকে দেখে পরীত অবাক। পা থেকে হাঁটু অবধি কাদা আর রক্ত। ধুলি ধূসরিত দেহ। ত্রস্ত চাহনী।

—কি হয়েছে?

মস্ত অপরাধ করেছে আনোয়ার। ফৌজ থেকে পালিয়েছে। তার চেয়ে বড় অপরাধ ফৌজের দফতরে নেই। জাফর আর হবিব-ও পালিয়েছে। তারাও তার সঙ্গে ছিল।

চৌকীতে বসল আনোয়ার। ভাঙা জবানীতে ব'লে গেল গত ক'দিনের ঘটনা। সরকারী কাগজে যখন টিপছাপ দিল অন্য সকলে, একা আনোয়ার নাম সই করল উর্দুতে। সাহেব খুসী হয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন লেখাপড়া যখন জানে তখন তার উন্নতি তাড়াতাড়িই হবে।

তারপর দেখা গেল তাদের গতিবিধির ওপর সাহেবদের কড়া নজর। সকলেরই মনে প্রশ্ন জাগল—নজর কেন? সন্ধে নাগাদ আসল খবর ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। তাদের সুদূর পাঞ্জাবে যেতে হবে। খবর পাওয়া গেল কিছু বরখাস্ত সিপাহীর কাছ থেকে। এই নতুন আমদানী-ফৌজের সঙ্গে যাতে তারা না মিশতে পারে সেদিকে সাহেবদের কড়ানজর ছিল, তবু খবরটা রোখা গেল না। জানা গেল টিপছাপ দিয়েছে যে সর্তে, তাতে নাকি হিন্দুস্থানের সর্বত্র বিনা আপত্তিতে যাবার কথা বিশেষ ক'রে লেখা ছিল।

—একথা ত' নওলপ্রসাদ বলেনি?

—বলবে কেন? সে সাহেবদেরই লোক। ফৌজের জন্যে সিপাহী জোগাড় করাই তার পেশা। কিন্তু বেইমানী করে নওল-ও পার পায়নি। পিঠ সোজা করে দাঁড়াল আনোয়ার। চালাঘরখানাতে তাকে আর ধরছে না এমনই বিরাট মনে হচ্ছে তাকে। সে বলল,—সে বেইমানকে আমি খতম ক'রে দিয়েছি। ছোরাখানা তার বুকের এদিক ওদিক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। দুনিয়ার আলোতে তাকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। তাকে খুন ক'রে তবে আমরা

পালিয়েছি। ফৌজ আমাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে।

তারপর বলল,—তারা তিনদিন ধরে পালাচ্ছে। রাতে রাতে গা ঢাকা দিয়ে পথ চলে চলে এতদূর এসেছে। বড় বিপদ সামনে। সে-বিপদের চেহারা সে জানে না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে যে তাকে এখনি পালাতে হবে।

—কতদিনের জন্যে?

—তা সে বলতে পারে না। হবে মাস কয়েকের জন্যে।

—তবে আজ রাতে বিঠৌলীতে এল কেন আনোয়ার? বিঠৌলী ত বড়রাস্তার ওপরেই। গতবছরই কানাত পড়েছিল বিঠৌলীর পাশে—শিকার করতে এসেছিল মিলিটারী সাহেব। যার মেম ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াত!

সে-সব কথা আনোয়ারও জানে। জাফর আর হবিব গাঁয়ের কাছে আসেনি। রাতারাতি যমুনা পেরিয়ে তারা সাসারামের পথ ধরবে। সে একা এসেছে। পরী আর খুদাবক্সকে একবার না দেখে চলে যেতে তার মন সরছিল না।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনেই কেমন যেন ভাষাহারা হ'য়ে গেল। হঠাৎ সমস্যা ফেনিয়ে উঠল নতুন ক'রে। নতুন প্রশ্ন দেখা দিল। সহজ নিরুদ্বেগ জীবনের সাধারণ সুখদুঃখের প্রশ্নগুলো বাতিল হ'য়ে গেল। সেই পরী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যার রূপ গুণ অনেকের চেয়েই খাটো বলে সে জেনে এসেছে এতদিন। অতি সহজে সে গ্রহণ করেছে পরীর সেবাযত্ন। দিনের পর দিন দুইখানি নিরলস হাতে পরী তার ঘরের কাজ করেছে, ছেলেকে দেখেছে, চাপাটি সেঁকে ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে তাকে ফসল কাটার মৌশুমে। রাত জেগে বাতির সামনে ব'সে কাপড় রিপু করেছে, টুপিতে তালি দিয়েছে, নয়তো পরবের দিনে পরবার জন্য নিপুণ হাতে লাল রেশমের কুর্তায় সল্‌মা চুমকি বসিয়েছে সযত্নে।

আজ এতবছর পরে যেন আনোয়ারের চোখে পড়ল পরীর চেহারায় সে লাবণ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, কপালে রেখা পড়েছে, চুল পাতলা হয়ে এসেছে, হাত দু'খানায় অনেক পরিশ্রমের স্বাক্ষর। তবু এই নারীর সঙ্গেই তার জীবন জড়ানো আর একে ছেড়ে যেতে হবে ব'লেই তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তগুলির বিহ্বলতা কাটিয়ে পরী বলল,—জল এনে দিই, হাত পা মুখ ধোও।

—সময় নেই পরী।

—একটু কিছু খাবে না?

—সময় নেই।

কেন সময় হবে না? এতটুকু বিশ্রাম করবে না, একটু কিছু খাবে না, এ কি রকম বিদায় গ্রহণ আনোয়ারের? তিন বছর ধরে উপোসের কষ্ট অনেক জেনেছে পরী। দেখেছে, তারা যখন উপোষ করেছে, তখনও গাঁয়ের কোন কোন ঘরে সমারোহ করে দশেরা আর রামনবমী হয়েছে। ঈদ আর সবেবরাতে কোন কোন বাড়িতে ধুমধাম হয়েছে। বাজী পুড়েছে, নতুন কাপড়ের সওগাত আর নানা রকম মিঠাই এসেছে সহর থেকে রঙীন কাগজ ঢাকা ঝুড়ি বোঝাই হ'য়ে। সে সব দিনে এই স্বামীই তাকে কত অপমান করেছে। খাবারের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কথায় কথায় মেরেছে ছেলেটাকে। সন্ধ্যেবেলা জল আনতে গেলে লালাদের বুড়ী দাদী দরদীর মত স্পর্শ বাঁচিয়ে আটা ঢেলে দিয়েছে তার আঁচলে, আর তাই জানতে পেরে আনোয়ার গালাগালি করেছে।

তবু এ দুঃখ-ও দুঃখ নয়, এই মনে ভেবে সুদিনের ভরসায় বুক বেঁধেছিল পরী।

যাই হোক না কেন, মরদ ত ঘরেই আছে। এতদিনে সেই ভরসা তার চলে যায় বুঝি। নিরাশ্রয় হবে পরী আর খুদাবক্স্, বেঁচে থাকবে পরের দোয়া ভিক্ষা করে।

স্বামীর হাঁটুতে মাথা রেখে মাটিতে বসে কাঁদতে আরম্ভ করল পরী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার দমকে শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। তখন নীচু হয়ে তাকে তুলতে গিয়ে সেই মাটিতেই ব'সে পড়ল আনোয়ার। পরীকে টেনে নিল কাছে।

জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে ঘরে। ভাঙাঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোতে কতক্ষণ ধ'রে যে বৌ-কে দেখল আনোয়ার! তামাটে লাল মুখ পরীর। বেণীর সামনে গোছা ধরা রুক্ষ চুল। কবে সাদী হয়েছিল তখন এমন করে টান অনুভব করেনি সে। অনেক গলতি জমেছিল পরীর কাছে। তাই বুঝি এই রাতটাকে মিলিয়ে দিয়েছে খোদা।

চাঁদ যখন হেলে পড়েছে তখনো ঘুমন্ত আনোয়ারের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল পরী। স্বামী বলেছে- তুলে দিবি আমাকে। আঁধারে আঁধারে চলে যাব। বললেই কি সে ঘুম ভাঙাতে পারে? এখনও ত রাত রয়েছে। নিজেও হেলান দিল পরী।

সেই ঘুম না ভাঙলেই বুঝি ভাল ছিল। ভাঙল রোদের তাপে, ঘোড়ার পায়ের শব্দে আর দশজন মানুষের গলার উল্লাসের চীৎকারে।

সব বুঝে লাফিয়ে উঠে আনোয়ার খুলে নিল তার ছোরা। বেরিয়ে আসতে না আসতে চীৎকার করে উঠল ফিরিঙ্গী অফিসার। পরী কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরল তার স্বামীকে। এক ঝট্‌কায় পরীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আনোয়ার চেঁচিয়ে উঠল,—চলে আয় কে মরদ্ আছিস্!

সমস্ত শরীরটা ফুলে উঠল তার। আগুন জ্বলতে লাগল চোখে। এই মানুষকে চেনে না পরী। অনেকদিন আগে আনোয়ারের বাপ বাঘের সঙ্গে মোকা নিত। আজ আনোয়ারের রক্ত সেই কথা স্মরণ করেছে। তার রক্তেও জ্বালা ধরেছে।

কাঁটার ঝোপ, শুকনো নালা, গমের ক্ষেত বনজঙ্গল, আঁধারে আঁধারে সেইসব পেরিয়ে ডেভিড্‌সন আজ তিনরাত ধ'রে তিনটে নেটিভ বদমায়েসের খোঁজে খোঁজে আসছে। তিনটের বদলে দশটাকে লটকে দিলেই হ'ত, কিন্তু জোনাস্ সাহেব ক্ষেপে আছে। সেই তিনটেকেই চাই। এই লোকটাই নাকি দলের সর্দার, সবাই তাই বলছে। আনোয়ারকে দেখেই জঘন্য একটা গালি দিয়ে বন্দুক তুলে ধরল সে।

আনোয়ারের ছোরাখানা ততক্ষণে অব্যর্থ লক্ষ্যে গেঁথে বসেছে সবচেয়ে সামনের সিপাহীটার গলায়। ভাল্লাটা হাতে ধরিয়ে দিল খুদাবক্স্। কিন্তু প্রতিপক্ষকে ফিরে আঘাত হানবার দ্বিতীয় সুযোগ মিল্‌ল না তার। ডেভিড্‌সনের গুলি তার আগেই বুকে বিঁধে গেল।

সকালের প্রশান্তি টুটে ছিঁড়ে ফেলে পরী আর খুদাবক্সের আর্তনাদ ফেটে পড়ল। আনোয়ারের জোয়ান দেহটার ওপর দিয়ে সারিসারি চলে গেল ঘোড়াগুলো। ছিট্‌কে পড়ল আনোয়ারের বিশাল দেহ। রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল ধুলোর ওপর।

ততক্ষণে বিপদের সঙ্কেত পৌঁছে গেছে গ্রামের ঘরে ঘরে। সবচেয়ে আগে ছুটে এল গ্রামের মদনমোহনের সেবাইত পরমেশ্বর মিশ্র। বলিষ্ঠ বাহুতে তুলে ধরল আনোয়ারের মাথা, হাফিজ ধরল পা। চারপাইটা টেনে এনে গায়ের চাদরখানা তাতে ফেলে দিল বুড়ো লালা।

জলের ঝাপটা দিতে দিতে জমি ভিজে গেল, কিন্তু চাদরটার বাঁধন না মেনে রক্ত উঠতে

লাগল ঝলকে ঝলকে। কিছুক্ষণ বাদে চোখ খুলল আনোয়ার আর খুদাবক্স্ ঝুঁকে পড়ল সামনে।

কি বলতে চাইছে তাকে আব্বা। ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প। কান পাতল খুদাবক্স্।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নিচু, ভাঙা, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে আনোয়ার বলল,—বেটা বেটা লাল!

—আব্বাজান!

—তুই বদলা নিস্...আমায় খুন করল...ভুলিস্ না!

—কভি নহি আব্বা!

—ভুলনা মৎ!

কথাটা প্রায় জোরে বলল আনোয়ার। মৃত্যুর আক্ষেপে অস্থির আঙুলে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল বাঁধন। দু'টো তিনটে ধারায় ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত উঠে এল। সমস্ত শরীরটা থর থর ক'রে কেঁপে স্থির হ'য়ে গেল।

পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল খুদাবক্স পিতার বুকে। পরী তখনো অচৈতন্য।

সে রাত ধরে ভীড় লেগেই রইল বাড়ির উঠোনে। গোর-কাফনের বন্দোবস্ত তৈরী, মৌলভী সাহেব ফাতেহা পড়লেই হয়। মৌকা বুঝে বেঁকে বসল মৌলভী। বলল,—আমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে সে? অপমান করেছে গোঁয়ার্তুমি করে।

মৌলভীর জবাব শুনে গোঁয়ার হাফিজ গিয়েছে, শাসিয়ে এসেছে মৌলভীকে চড়া গলায়। ঘর পুড়িয়ে দেবে, ক্ষেত লুঠে নেবে, এই সব শাসানি শুনে মৌলভী সাহেব এসেছেন শেষ পর্যন্ত।

নিজের বোনা আমগাছের তলায় গোর দেওয়া হলো আনোয়ারকে।

খবর পেয়ে ভোরের দিকে মোষের গাড়ি হাঁকিয়ে এল পরীর চাচা। সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—আমার কাছে চল্ বেটি, দু'জনে থাকব।

খুদাবক্স্-ও নানার কথায় সায় দিল। বলল,—আমি ত বেরিয়ে যাব, তুই কার কাছে থাকবি মা? নানার কাছেই যা।

পরী ছেলেকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। কিন্তু অনমনীয় সংকল্পে ঘাড় বাঁকিয়ে রইল ছেলে। সে যে বাপের যোগ্য সন্তান, তার প্রমাণ তাকে দিতেই হবে। নইলে উঠোনের কবরের দিকে সে কেমন ক'রে চাইবে? বাপকে মনে মনে কি জবাবদিহি করবে? বাপের কথা, বাপের চাহনি তার মনে নিরন্তর চাবুক মারছে। তার পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব। সে চলে যাবে দূরদূরান্তে।

অগ্নিশিখার মত পবিত্র, উজ্জ্বল সেই কিশোর মুখ। পরী সেদিকে চেয়ে কেঁদে উঠল,—ওরে তুই কি করবি?

—পাঠান কখনো চিন্তা করে না মা। হিম্মৎ থাকলে আপনি থেকে রুজী এসে ধরা দেয়।

আনোয়ার থাকলে যেমন করে বোঝাত, ঠিক তেমনি ক'রে পরীকে বোঝাল খুদাবক্স্। পরী বলল,—বেশ। আমি কিন্তু এ-ভিটে ছেড়ে নড়ব না। ঘরে চেরাগ দেবে কে?

খুদাবক্সকে বোঝাতে এল পড়শীরা। হাফিজ, সুজন, বিষাণ সিং, লালা। সবাই বলল, তাদের ভরসায় পরী থাকুক। তারা খেয়ে পরে বেঁচে থাকলে পরীর-ও কোন অভাব হবে না।

খুদাবক্সকে নিয়ে যাবে নন্দলাল। আনোয়ারের বাল্যবন্ধু সে। রাত জেগে ছেলের

জামাকাপড় রিপু করল পরী। গুছিয়ে বেঁধে দিল পোঁটলা করে। কোমরে দিল বাপের ছোরাখানা।

রওনা হবার সময় ভোররাতে। ডাকতে এল নন্দলাল। নদীতে খেয়া নৌকো চলেছে ভেসে। ঝাপ্‌সা চোখে খুদাবক্স্ দেখতে লাগল মা-কে। অর্জুন গাছের ডাল ধ'রে কপালে হাত দিয়ে সে চেয়ে আছে, সে যেন শুধু তার মা-ই নয়। সে যেন তার গ্রামখানি। গ্রামখানাই যেন তাকে বিদায় দিতে এসেছে ভোরবেলা।

নৌকো ওপারে ঘাটে পেঁছিতে সে পা দিল নতুন মাটিতে—নতুন জীবনে।

পাঁচ

প্রায় পনেরো দিন ধরে পথ চলল নন্দলাল আর খুদাবক্স্। পথে পথে সরাইখানা। পথচলতি বন্ধুদের বিশ্বাস করতে নেই। ঠগীদের অত্যাচার বন্ধ হয়েছে কিন্তু ডাকাত খুনে আর বাটপাড়ের ভয় পদে পদে।

বান্দাতে পেঁছে কৈন নদীর তীরে খুদাবক্স্‌কে আশ্চর্য সব জিনিষ দেখাল নন্দলাল। বলল,—নদীর মাঝখানে যে লাল সবুজ আর গেরুয়া রঙের পাথর দেখছিস না, ওর প্রত্যেকটি মন্তর পড়া। দেখবি? কথাটা শেষ করেই সে আছড়ে একটা ছোট পাথর ভেঙে ফেলল। তার মধ্যে সত্যি সত্যিই সব চিত্রবিচিত্রিত রেখা। মঞ্জুল ভঙ্গীতে লীলায়িত কোন নৃত্যপরা রমণীর ছবি, কোনটায় অরণ্যের ওপর পূর্ণচন্দ্রের প্রহরার চিত্র। নন্দলাল বলল,—কৈন নদীতে পূর্ণিমা তিথিতে নেমে আসেন স্বয়ং চন্দ্রদেব। জলের জিনপরীদের সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ লীলাখেলা করে চলে যান। অরা সেই কারণেই পাথরে ছবি পড়ে যায় এমনিধারা। এমনি সব আশ্চর্য রূপকথার গল্প বলে তাকে ভুলিয়ে রাখল নন্দলাল। মানুষবাঘের কথা, বান্দার রাজার মন্তর পড়া পোষা কুমীরের কথা, এমনি সব গল্পকাহিনী।

হামীরপুর, বান্দা আর ছত্তরপুর পেরিয়ে পনেরোদিন বাদে তারা অরছায় এসে পৌছল। সন্ধ্যার দিকে সারা শহর ঢুঁড়ে নন্দলাল টিকমগড়ে তার বন্ধু পরন্তপের ডেরা খুঁজে বার করল।

বিরাটকায় চওড়া চেহারা পরন্তপের। জোড়া গোঁফ চুমরে উঠে গেছে কানের পাশ দিয়ে। পরনে যোধপুরী আর পায়ে পেতলের ফুল বসান নাগরা জুতো।

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর হো হো করে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসতে লাগল পরন্তপ। বলল,—আরে মুসলমান পাঠানকে আমি ছোঁব? খুদাবক্সের দিকে ঢালের মত হাতখানা এগিয়ে ধরে বলল,—একবার পাঞ্জা লড়ে যাও বেটা, দেখি এলেম্?

নন্দলাল বলে,—কি জী, চাকরী ছেড়ে দিলে কেন সরকারের?

পরন্তপ ভ্রূকুটি করে বলে,—আরে ভাই চৌহান কখনও নোকরী করে? চাকরী কি?—দুবেলা শুধু লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্, পরেড্ লাগাও উর্দি পরো,—আর ঐ গোঁয়ার শুয়োর-খেকো ফিরিংগী বলে কিনা, ট্রেন্‌সান! তিন মাস চালালাম ভাই, তার পর একদিন কৌড়ি গাছের ফল খেয়ে খুব বমি করলাম। সাহেব ডাক্তার বলল, হায়জা হ'য়ে গেছে, একে ছুটী দিয়ে দাও নয়ত ছাউনীতে মড়ক লাগবে।—আরে ভাই চৌহান কভি কাম করতা? আবার হো হো করে হাসতে লাগল পরন্তপ। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল,—আর কাজ যে করব, সে কার জন্যে? বৌ সেই উদয়পুরের কাছে তার মোষ নিয়ে পড়ে আছে।

আমাকে ছেড়ে দেবে তবু চারটে মোষের মায়া ছেড়ে আসবে না। ছেলেটাকে সাদি করালাম তা এমনি নসিব যে বৌ তাকে মন্তর করে বশ করে নিল। তব বোল ভাই খাঁ সাহেব কার জন্যে মান ছোট করব? কোই শের হ্যায় যার নোকর হব আমি? বলেই, আবার সেই হাসি। পরন্তপ বলে যায়,—ভাই খাঁ সাহেব খুদাবক্স্, এসব তুমিও একদিন বলবে, তবে আমার মত বুড়ো হ'লে। এখন তোমার শেখবার সময়, খাটবার সময়, লড়বার সময়। পুরুষের ত হিম্মত-ই বল, হিম্মত-ই মরদান, হারায়া দরদ—।

নিঃশব্দে হাসতে লাগল নন্দলাল। বলল,—কথায় কথায় শের বলবার অভ্যাসটা দেখছি আজও তোমার রয়ে গেছে!

পরন্তপ বলল,—নিশ্চয় নিশ্চয়—মসল্ল-ই—মরাফ পরায়া য়ে জবান্ না—। শেরত কথার গহনা। ও তো পরাতেই হবে।

পরদিন সকালে খুদাবক্সকে স্নান করিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে জামাজোড় পরিয়ে নিয়ে গেল পরন্তপ অর্জুন সিং পওয়ারের কাছে। অর্জুন সিং-এর বাড়িতে সেদিন তুলসী শালগ্রামের বিবাহ। বড় ভীড় আর জোর খাওয়া-দাওয়া।

অর্জুন সিং-কে দেখেই হাসতে হাসতে গালাগালি করে সম্ভাষণ সুরু করল পরন্তপ, আরে লুঠেরা, আরে ডাকু, আরে পওয়ারের বেটা, আতর গুলাব নিয়ে আয়, আদর যত্ন কর, পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া, বসা,—দেখ তোর জন্যে কি এনেছি!

দুই জোয়ানে জাপটাজাপটি কোলাকুলি করে সম্ভাষণ হল। তার পর খুদাবক্সকে পরন্তপ বলল,—সেলাম লাগাও বেটা, এখানেই তোমার কাজ মিলে গেল। বন্দুক ছুঁড়বে, ঘোড়া চড়বে, তরোয়াল চালাবে, এইসব শিখবে। দেখো ভাই অর্জুন, যা শেখবার তাই শিখিও. তোমাদের আবার নিজের মত কতকগুলো খেলা আছে, সেগুলো যেন শিখিও না।

গোপন কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে, অস্বস্তি বোধ করে অর্জুন। বলে,—কি যে বল তুমি! সে সব যা হবার হয়ে গেছে।

পরন্তপ হাসতে হাসতে বলল,—যা করতে হয় সামলে কর, তোমাদের আবার অভ্যেস হয়ে গেছে কিনা, তাই মুস্কিল! রাজপুত সর্দার, লড়াই কর, খেতী করাও, শিকার খেল; তা না হাজার রকম চোরা কাজ করবে আর লুঠ করবে, এ সব কি কখনো রাজপুতের কাজ?

অর্জুন সিং মাথা নেড়ে বলল,—না না আমি ফৌজ বানাতে চাই। রাজার মোহর মিলেছে। তিন শ' ফৌজ আমি রাখব। লোক খুঁজছি সেই জন্যে।

কাজ হয়ে গেল খুদাবক্সের।

পাঁচ বছর ধরে শুধু নবীশ রইল খুদাবক্স্। তন্‌খা মিলল না তার। মিলল শুধু ঘোড়া বন্দুক আর তলোয়ার। রাজপুত ছেলে প্রতাপের সঙ্গে তার ভারী মিলমিশ হয়ে গেল। সারাদিন হাজারটা কাজ। হাজারো ব্যাপারে সাগরেদী করাই হচ্ছে ছোটদের কাজ। তা'ছাড়া ঘোড়াকে যত্ন করা, তাকে পোষমানানো, ডলাইমলাই—সবই শিখবার জিনিষ।

কিন্তু কেমন যেন একটা রহস্যও আছে। মাঝে মাঝে যখন সরকারী তহশীলদার খাজনা নিতে আসে, তখন খাওয়াদাওয়ার ধুম প'ড়ে যায়। নাচওয়ালী এসে নাচে। তার জুড়ি সঙ্গৎ লাগায়। সে আসরে তাদের সবার ডাক পড়ে। শুধু কখনো যদি রাতে খবর আনে দূত, তখন রাতারাতি দশ বারোজন ঘোড়াসওয়ার ছুটে বেরিয়ে যায়। কখনো বিশ পঁচিশ চল্লিশজনও যায়। রাত্তিতে যায় আবার ভোর না হতেই ফিরে আসে ঘোড়ার পিঠে

থলি বেঁধে, জামায় রক্তের দাগ লাগিয়ে। মালিকের সঙ্গে তখন তাদের কথাবার্তা হয় দোর বন্ধ ক'রে ফিসফিসিয়ে।

কি করতে যায় ওরা,—এই প্রশ্ন ক'রে একদিন ধমক খেল খুদাবক্স্‌। গর্জন সিং ডেকে এনে খুব কষে ডেঁটে দিল। বিশ্রী একটা গাল খেয়ে অপমানে চোখ জ্বলে উঠল তার। বলল,–খবরদার! আমি পাঠানের বাচ্চা, মনে রাখবে।

গর্জন সিং বলল,—কি করবি তুই? শির নিবি?

নিলে নিতে পারতো মাথা, এমনই খুন চেপে গিয়েছিল খুদাবক্সের। কিন্তু তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গেল প্রতাপ। ভুলিয়ে-ভালিয়ে বলল,—ভালুকের বাচ্চা ধরেছে জালিম, দেখবি চল।

প্রতাপ ভালুকের বাচ্চা দেখাবে বলে খুদাবক্সকে অনেক দূরে নিয়ে গেল; বেতোয়ার ক্ষীণধারা পেরিয়ে যেখানে বালির মস্ত চরটা এক প্রান্তে জঙ্গল ছুঁয়েছে। সেইখানে পৌঁছে একখানা বড় পাথর দেখিয়ে বলল,—বোস!

না বসব না, কৈ কোথায় জালিম!

—জালিম হাটে গেছে আজ! বস না তুই!

প্রতাপের অনুরোধে শান্ত হয়ে বসল খুদাবক্স্‌।

সামনের দৃশ্য যেমন শান্ত, তেমনই সুন্দর। সাদা সাদা বালি চিক্‌ চিক্‌ করতে করতে হঠাৎ আলোয় ঝলকে উঠছে দূরান্তে। মাঝখানে ক্ষীণ অথচ স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে গেছে। বালির ওপর পায়ের দাগে দাগে রাস্তা হয়ে গেছে। প্রতিদিন এখানে সকাল ও সন্ধ্যায় গাঁয়ের মেয়েরা ঝক্‌ঝকে পেতলের কলসী একটার উপর একটা সাজিয়ে বিচিত্র রংয়ের ঘাঘ্‌রা দুলিয়ে জল নিতে আসে। কেউ সঙ্গে আনে হাত ধরে ধরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, ভাইবোন। জল কম নদীতে, তাই বিপদ তেমন কিছু নেই। এখন দুপুর, কাছেপিঠে কেউ কোথাও নেই। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। বাতাসে থেকে থেকে চাবুকের শিষ শোনা যাচ্ছে। তৃষ্ণার্ত একটা কুকুর শরীর ডুবিয়ে জল খাচ্ছে নদীতে, আর লালচে হলুদ ডানায় জল ঝাপটে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উঠছে আর নামছে একটা হীরামন পাখী। মস্ত ঠোঁট গলায় গুঁজে বসে আছে একজোড়া কাঁকপাখী। চোখ এক চুল ফাঁক করে ওরা নদীতে ছোট ছোট রুপোলী মাছের গতিবিধি লক্ষ করছে। জামগাছটার ডাল বেয়ে উঠছে আর নামছে কাঠবেড়ালী।

রোদ হেলে পড়েছে। এই অপূর্ব পরিবেশে যা বলে গেল প্রতাপ, তা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি ভয়াবহ। খুদাবক্স এক দৃষ্টে চেয়ে রইল আর বন্ধু বলে চলল,—অনেকদিন আগে, অর্জুনের মত সব পওয়ার সর্দাররা 'ভূঁইয়াবৎ' করেছে মারাঠা রাজার বিরুদ্ধে। 'ভূঁইয়াবৎ' বলতে বোঝায় জমির জন্যে লড়াই, কিন্তু পওয়ার সর্দারদের স্বেচ্ছাচারী অভিযানগুলো ছিল লুঠপাট, খুনজখমেরই নামান্তর মাত্র। চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টি করে এরা নিজেদের গোলা বোঝাই করত। আজ আর তারা 'ভূঁইয়াবৎ' করে না বটে, কিন্তু অর্জুনের পুরোন দল আজও ভাঙেনি। এদের মধ্যে অনেকেই পুরোন ঠগী বা পিন্ডারী। লুঠতরাজে ওস্তাদ। সরকারী ডাক, খাজনা লুঠ করে এরা। আগ্রা-সাগর সড়ক ধরে যে যাত্রীরা যায়, তাদের সুবিধেমত খুনজখম করে এরা লুঠে আনে সোনারুপো। এইসব কথা যে তোকে বলেছি, তা যেন বেরিয়ে না পড়ে। তাহ'লে ওরা আমাকে খতম ক'রে দেবে। ক'দিন থেকেই বুঝতে পারছি, এবার তোকে নিয়ে এরা বেরুবে।

শুনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল খুদাবক্স। তারপর প্রতাপের কাঁধে হাত রেখে

বলল,—সম্‌ঝে দিয়ে দোস্তের কাজ করেছ।

দুই বন্ধু মহল্লায় ফেরবার পথে ঘোড়া ছুটিয়ে অরছা'র লোককে আসতে দেখল। অর্জুন সিং নিজে এসে নিয়ে গেল তাদের। প্রতাপ নীচু গলায় বলল,—অরছাতে এদের অনেক লোক আছে। প্রায়ই খবর দেয় তারা। দো লুঠেরা চাচেরা ভাই। আজ রাতে একটা কিছু হবে।

সন্ধ্যেরাতে ডাক পড়ল খুদাবক্সের। অর্জুন সিং বলল,—আজ রাতে শিকার খেলতে যাবে সব। তুমি গর্জন সিং-এর কাছে থেকো। সে যা বলে তাই শুনবে।

সেই রাতের কথা পরে যখন খুদাবক্স্ স্মরণ করেছে, তখন শুধু লজ্জাই পেয়েছে, নিজের বিবেকের কাছে মাথাটা নিচু হয়ে গেছে। বড় লজ্জার আর কলঙ্কের স্মৃতি সিঞ্চিত সেই রাত।

সেই রাতে তারা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল বড়োয়া সাগরের দিকে। হাজারটা প্রশ্নের জবাবেও গর্জন সিং, মহবুব বা শান্তিপ্রসাদ তাকে কিছু বলেনি। আবছা তারার আলোয় এদিক ওদিক নজর রেখে ধূর্ত নেকড়েবাঘের মত জ্বল্‌জ্বলে চোখে তারা এগোচ্ছিল। দূর থেকে কয়েকটা টিম্‌টিমে আলো চোখে পড়তেই তারা সেই দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল।

অজানা উত্তেজনায় বুক কাঁপছিল খুদাবক্সের। নাঙ্গা তরোয়াল হাতে তার সঙ্গীরা যখন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত নিদ্রায় শায়িত কয়জন যাত্রীর উপর তখন সে কিছুতেই এগোতে পারেনি। আর্ত নারীকণ্ঠের ক্রন্দন, শিশুর ভয়াতুর আর্তনাদ আর গর্জন সিং-এর ছোরার আঘাতে পুরুষ কণ্ঠের যন্ত্রণার চীৎকার তাকে বিদ্যুতের কশাঘাত করেছিল। গাছের ডালে ঝুলোনো বাতির আলোতে তার সঙ্গীদের দেখাচ্ছিল যেন যমদূতের মত। খুনী! বেইমান! ব'লে সে সজোরে আঘাত করেছিল শান্তিপ্রসাদের হাতে। সুজন সিংহের হাতে চোট মেরে ফেলে দিয়েছিল তরবারি।

—ওরে বেওয়াকুফ! পাঠানের কলঙ্ক! ব'লে তাকে পাল্‌টা মেরেছিল গর্জন সিং। খুন চেপে গিয়েছিল খুদাবক্সের মাথায়। অসম সাহসে সে লড়েছিল তার চারজন সঙ্গীর বিরুদ্ধে। দূর থেকে শোনা গিয়েছিল কার পরুষ কণ্ঠের হুঙ্কার—কো...ন্...হ্যা...য়......

অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল। মশালের আলো কাছে আসছিল, আঁধারের বুকে নাচ্‌তে নাচ্‌তে। গর্জন সিং শ্বাপদের মত দাঁত ঝল্‌কে বলেছিল,—মর এবার দুশ্‌মনের হাতে। ব'লে প্রবল বেগে তরোয়াল মেরেছিল তার কাঁধে। লোহার জালে বেধে গিয়েছিল তরোয়াল।

তখন সামনের আঁধার থেকে সাঁই সাঁই করে ছুটে এসেছিল এক ঝাঁক বর্শা। তারই একটা লেগেছিল খুদাবক্সের পায়ে। মাথা টলে পড়ে যেতে যেতে হাজারখানা বর্শার চেয়ে-ও বিদ্ধ করেছিল তাকে বালককণ্ঠের আর্তনাদ—পিতাজী! পিতাজী!—সেই আর্তনাদের সঙ্গে চেতনা হারাতে হারাতে খুদাবক্সের বুক বিদীর্ণ করে একখানা পুরোনো ছবি ভেসে উঠেছিল—মনে পড়েছিল পাঁচ বছর আগেকার এক সকালে সাহেবের ঘোড়ার খুরে খুরে আনোয়ারের জখম দেহ ধাক্কা খাচ্ছে আর তার নিজের কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ উঠে চিরে ফেলেছে আকাশ। অজান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল—; হায় আল্লা! তার পরই রাশি রাশি আঁধারের বুকে ডুবে গিয়েছিল সে।

জ্ঞান হ'লে, প্রথমে তার মনে হল, যেন অতল আঁধারের বুক থেকে আস্তে আস্তে

উঠছে সে। কে যেন তাকে ঠেলে ধরছে ওপারের দিকে। কে তাকে বলল,—দেখি, মুখ তোল, জল খাও।

কষ্টে চোখ মেলল খুদাবক্স। দেখল দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দেহ, শ্যামকান্তি এক প্রৌঢ় পাঠান। ঈষৎ রক্তিম দুই চোখে কৌতুক, ক্ষমা আর মমতা নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছেন।

শিশুর মত বিস্ময়ে তাকাল খুদাবক্স তাঁর দিকে। বুঝল সে এক চারপাই-এর ওপর শুয়ে আছে। মাথার ওপর ছাদ। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল,—পিয়াস।

তার মুখে জল দিলেন তিনি। সে উঠে বসতে চাইতেই তাকে শুইয়ে দিলেন সযত্নে। বললেন,—কি খাঁ সাহেব, একেবারে ঠিক হয়ে গেছ? উঠে বসতে ইচ্ছে করছে?......সামাদ্! ছুট্তে ছুট্তে এল গৌরবর্ণ, ছোটোখাটো একজন বৃদ্ধ। পিতলের ঘটিতে কি যেন এনেছে সে। সসম্ভ্রমে বলল—ওস্তাদ!

—আরে কেমন হেকিম তুমি? রুগী কি খাবে এখন? নাকি আজও এলাচদানা আর গরমজল? তোমার কেতাব কি বলে?

—আজ দুধ দেব হুজুর। খাস্ বিকানীর মিছরী দিয়ে দুধ জ্বাল দিয়েছি।

কৌতুকভরা চোখে প্রৌঢ়পুরুষ বললেন,—এই জঙ্গলে মহিষ কোথা থেকে পেলে সামাদ? তোমার কেতাবের পাতার মধ্যে বাঁধা ছিল নাকি?

—খাস্ হেকিমী কায়দায় মিলল হুজুর। কাল গাঁয়ের তালুকদারকে সাপে কেটেছে। নির্বিষ সাপ। তবু খানিকটা চিকিৎসা করলাম। আজ সকালে এসে বলছে,—হেকিম সাহেব, তুমি জমি নাও, বাস করো আমার গাঁয়ে। আমি বললাম জমি নিতে আমার কেতাবে মানা। তখন ফিরে গিয়ে দুধ, মিছরী, দুটো খাসি পাঠিয়ে দিয়েছে।

—বেশ! বেশ! আর কিছু দেয়নি'ত সামাদ?

—তোবা তোবা, ব'লে নাক মল্ল সামাদ। বলল—হুজুর হেকিমী ক'রে পয়সা-কড়ি নেওয়াত' আমি ছেড়ে দিয়েছি।

ছোট পেয়ালা করে খুদাবক্সের গলায় দুধ ঢেলে দিল সামাদ। উষ্ণ আরাম খুদাবক্সের সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙ্ল যখন তখন আঁধার। মনে হলো অনেক রাত হয়েছে। তার পাশে বসেছিলেন সেই প্রৌঢ় পুরুষ। বললেন,—কাল থেকে ঘুমোচ্ছ, এবার ওঠ।

তাঁর সাহায্যে উঠে হেলান দিয়ে বসল খুদাবক্স্। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন,—শোন, তুমি আমার বন্দী। আমি কে, তা জান? আমি গুলাম ঘোস খাঁ। ঝাঁসীরাজের সর্দার গোলন্দাজ। তারপর কিছুক্ষণ ধ'রে শুধু গালাগালি দিয়ে গেলেন তাকে। বললেন,—পাঠান নামের কলঙ্ক তোমরা। কতকগুলো লুঠেরা ডাকাতের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুঠ করছ নিরস্ত্র যাত্রীকে, সেদিন খুন করেছ দু'দুটো লোক, একটা বাচ্চা, সরম আসে না মনে? তোমার জান আমি বাঁচিয়েছি বটে কিন্তু এই রকম জান থাকলেই কি, গেলেই বা কি? জান-ই কি সব? হুঁস, মান,—এ সবের কোন দরকার নেই? না কি তুমি বে-হুঁস আর বে-ইমান? এখন তোমাকে যদি ফাঁসিতে লটকাই? গুলী করে মারি? জখম করে জঙ্গলে ফেলে দেই বাঘের মুখে, চাই বেতোয়ার চড়ায় পুঁতে ফেলি? তোমার কোন মনিব তোমাকে বাঁচাবে?

জবান সামাল! আত্মবিস্মৃত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠল খুদাবক্স—খবরদার, সব কথা সত্যি নয়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল নিজের কথা খুদাবক্স।

সব কথা শুনে গুম্ হয়ে রইলেন গোলাম ঘোস। একটু পরে বললেন,—কাজ করবে?

—হ্যাঁ করব।

—বিশ্বাস রাখতে পারবে?

—পরখ করুন!

—বেশ, দেখে নেব আমি। রাজ্যে কিছু বদমায়েস লুঠেরা আছে জানি। প্রায়ই আমাকে টহল দিতে হয়—এখানে সেখানে। শোন, আমার সঙ্গে সাগরেদী করতে হবে তোমাকে কমসে কম তিন বছর। তারপর তোমাকে নিয়ে যাব ঝাঁসী। রাজাকে ভেট লাগাবে, তারপর শহরে থাকবে। বাইশটা কামান আছে আমার তাঁবে, দেখাশুনো খবরদারি করি। সাগরেদী মঞ্জুর করিয়ে দিচ্ছি আমি রাজার মোহর আনিয়ে। পঁচিশ সিক্কা টাকা তলব মিলবে, রাজী?

রাজী খুদাবক্স। উৎসাহে আনন্দে তার হাত থর থর করে কাঁপতে লাগল আর তার মুখ থেকে জীবনে এই প্রথম কৃতজ্ঞতায় নতি স্বীকারের কথা বেরুল,—গরীব পরোয়ার সালামত্, আপকা শির পর সালামত্ রহে।

পরে ফৌজ নিয়ে অর্জুন সিং-এর ডেরায় পেঁছেছিল ওস্তাদ। পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে খুদাবক্স্। কিন্তু পাখী তার আগেই উড়ে গেছে।

এক বিস্তীর্ণ দগ্ধ ছাউনী তাদের চোখে প'ড়ল। সমস্ত মাল হটিয়ে নিয়ে গোলায় ঘরে আগুন দিয়ে তারা সেই রাতেই পালিয়ে গেছে। কিন্তু প্রতাপ? তার কি হলো?

গ্রামবাসীরা জানাল, প্রতাপের দেহ পরে জঙ্গলে মিলেছিল। লাস দেখে প্রথমটা তারা তাকে চিনতে পারেনি। পরে একটা কবচ দেখে ঐ গাঁয়ের একটা লোক তাকে সনাক্ত করেছিল। অর্জুন সিং-এর দলের লোকরাই খতম করে রেখে গিয়েছিল প্রতাপকে।

সব শুনে গভীর এক মর্মবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল খুদাবক্স্। তারপর দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে প্রিয় বন্ধুর উদ্দেশে। অস্ফুটে বলল,—বদ্‌বখত্!

ওস্তাদের কাছে ছুটি নিয়ে গাঁয়ে ফিরতে ফিরতে খুদাবক্সের অনেকবার মনে হয়েছিল বন্ধুর কথা। ফর্সা লম্বা ছিপছিপে চেহারা, কোমল দেহ আর ঈষৎ ভীরু স্বভাব। কিন্তু সে তাকে ভীষণ ভালবাসত। মা বাপ হারিয়ে রুজীর খাতিরে চাচার দলে যোগ দিয়েছিল প্রতাপ, কিন্তু ঠিক এ পেশা যেন তার নয়। সে কথা বুঝেছিলেন হয়ত খোদাতাল্লা। তাই উনিশ বছরেই ডাক পড়ল তার। মৃত্যু এল অতর্কিতে।

মনে মনে স্বার্থপর চিন্তা এল খুদাবক্সের। তার যেন মৃত্যু অমন করে না আনেন খোদা। যেন আসে সামনাসামনি, যেন তাকে চেনা যায়। তার বাপদাদার মত সে-ও যেন তাকে স্পষ্ট দেখতে পায় আর লড়তে পারে।

বিশদিন ধ'রে পথ চলে, বিঠৌলীর শিবমন্দিরের ত্রিশূল দেখা গেল। সন্ধ্যারাগে ঝক্‌ঝক্ করছে। নদী পেরিয়ে খেয়াঘাট থেকেই প্রায় ছুটতে লাগল খুদাবক্স। পাঁচ বছর বাদে ফিরছে সে। ধুলো, ঘাস, ক্ষেত আর সেই বাঁধানো কুয়োতলা, সবাই যেন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

আমগাছের তলায় নিত্যকার মত চেরাগ জেবলে দিয়ে ছেলের জন্যে দোয়া চাইছিল পরী। পাঁচ বছর ধ'রে রাতদিন কেঁদে কেঁদে পরীর চোখের চাহনি ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। একা

ব'সে ছেলের কথা ভেবে ভেবে তার মনটাও হয়েছে পালকের মত হালকা। এক জায়গায় থেমে চিন্তা করে না। হাজারটা চিন্তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেরে। একবার খোদার কাছে প্রার্থনা জানায়, একবার স্বামীর কাছে মনে মনে বলে--কেমন করে যেন দুটো প্রসঙ্গই এক হয়ে গেছে তার। মনে মনে স্বামীর কাছে অনেক প্রার্থনা জানায় পরী—ছেলে যেন ভালো থাকে, ছেলে যেন সুস্থ থাকে, কোন অমঙ্গল যেন স্পর্শ না করে তাকে। আজ-ও রোজকার মত চেরাগটা নামিয়ে রেখে, দরজায় এসে দাঁড়াল পরী। আবছা আঁধারে ক্ষেতের পথ ধ'রে কে আসছে? তার স্বামীর মত পরিচিত হাঁটবার ভঙ্গী, তেমনি ক'রে পেছনে ঝাঁকিয়ে কপালের চুল পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে?

তবে খুদাবক্স! সহসা বুকের কাছে হাতটা মুঠো করে চেপে ধরল সে। হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে বুঝি, এমনই ধড়াস্ ধড়াস্ করছে উত্তেজনায়। দুই হাত মেলে, সদ্যকাটা গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে পাগলের মত ছুটে চলল পরী। পাঁচ বছর আগে সাহেবের ঘোড়ার খুরের ধাক্কা লেগে বুক তার জখম। ছেলের কথা ভাবতে গেলেই তাজা খুন উঠে আসে গলাদিয়ে, সে-সব কথা ভুলেই গেল সে। ছুটে চলল বিদ্যুৎবেগে, রুক্ষ চুল উড়ে ঝাপ্‌টাতে লাগল চোখে মুখে।

ছেলের বুকে আছ্‌ড়ে পড়ে কেঁদে উঠল পরী, আর মা-কে জড়িয়ে ধুলোর ওপর ব'সে পড়ল খুদাবক্স। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

সেই নীরব অশ্রুধারায় তর্পণ হলো আনোয়ারের। সন্ধ্যার নীরব প্রশান্তি ভেঙে ডানা ঝাপ্‌টে এক ঝাঁক টিয়াপাখী উঠল আকাশে। এক মুঠো পান্নার টুকরোর মত ছড়িয়ে পড়ল তারা।

ছয়

পলাশে আবীরে মাতাল ভরা ফাল্গুনে হোলির সকাল। কেল্লার ওপরে নহবৎখানায় সানাই ধরেছে রাগ হিন্দোল।

কেল্লার পাশে বড় দরোয়াজা। দুইদিক থেকে লৌহ কপাট সবল হাতে টেনে খুলে মস্ত দু'খানা পাথর গড়িয়ে তাতে ঠেকা দেয়া হলো। দু'জন চোব্‌দার সামনের দিকে আভূমি প্রণত হ'য়ে সেলাম জানাল। প্রভাতসূর্যের রশ্মি এসে পড়েছে ঘোস-এর লাল মুরেঠায়। প্রত্যভিবাদন জানাতে সওয়ারের উষ্ণীষ ঈষৎ ট'লে গেল চকিতে। তেজে শক্তিতে দুরন্ত ঘোড়ার লাগাম টেনে ধ'রে শহরে প্রবেশ করলেন গোলাম ঘোস, সঙ্গে খুদাবক্স।

প্রৌঢ় ঘোসের কালো চুলে সামান্য পাক ধরেছে। অন্যথায় শালপ্রাংশু সেই বিশাল দেহের কোথাও এতটুকু চিড় খায়নি। সগর্ব স্নেহে তিনি তাঁর তরুণ সঙ্গীকে পাশাপাশি আগলে নিয়ে চলেছেন, আর মাঝে মাঝে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন।

স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যে খুদাবক্সের চেহারাও তারিফ করবার মত। অবহেলে লাগাম ধরে সে শিশুর কৌতূহলে দশদিক দেখতে দেখতে চলেছে। স্বচ্ছ দুই বড় বড় চোখে শত জিজ্ঞাসা গোলাম ঘোসের মুখ ছুঁয়ে কেল্লার বুরুজে বুরুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বল্প শ্মশ্রু আর পাতলা গোঁফ নওজোয়ান পাঠান যুবকের মুখে বেশ একটা সুডৌল পরিণতি এনেছে। খুদাবক্স্ আজ খুব খুসী।

নগরীতে আজ হোলির উৎসব। হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়—উত্তাল আনন্দের হররা

উঠছে পথে-ঘাটে, অঙ্গনে, অলিন্দে। খুনখারাবি রং-এর জনস্রোত রাজপথে বাড়ি খেয়ে অলিগলিতে ঢুকে পড়ছে মহা উল্লাসে—

হাসত জনকপুরকে লোগ
কব আহিয়ে রাম দেখব ভর নজরি।

দশজন ঘোড়সওয়ার সামনে পেছনে ভাল্লা উঁচু করে প্রাসাদের দিক থেকে এগিয়ে এল। মাঝখানে একটি ঝক্‌ঝকে পিতল ও রুপোর কাজ করা তাঞ্জামে আবীর মিষ্টান্ন ও কুংকুমের থালি সাজানো। তাঞ্জাম চলেছে সাহেবের ছাউনীতে, রাজার উপঢৌকন নিয়ে।

ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্,—ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে ভালুক নাচাচ্ছে বাজীওয়ালা। গয়না পরো, গয়না পরো,—ভালুক গহনা পরছে হাতে, গলায়, মাথায়। চলো শ্বশুরাল—ভালুক হেলে-দুলে শ্বশুরবাড়ি চলেছে। বিবি গোস্সা করো, রোনে লাগ,—অমনি মাটিতে লুটিয়ে মুখ ঘসে কাঁদতে লাগল ভালুক, আর উল্লাসে গুঞ্জন করে হাততালি দিয়ে উঠল ছেলে-মেয়েরা।

দেখো বেটা রাণীমহাল। ঘোসের কথায় চমকে তাকায় খুদাবক্স রাণীমহালের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের একতলার জাফরীর ফাঁক দিয়ে কে যেন পিচকিরী ছুঁড়ল। লালে লাল হয়ে গেল গোলাম ঘোসের শুভ্র পরিচ্ছদ।

আবীর মেখে লাল হয়ে বাহকেরা ব'য়ে আনল কার স্বর্ণখচিত পাল্কী। সম্ভ্রমে জনতা সরে গেল দু'ধারে। গোলাম ঘোস অভিবাদন জানালেন নিচু হ'য়ে। খুদাবক্সকে চাপা গলায় বললেন, বাঈসাহেবা। সসম্ভ্রম ভয়ে মাথা নীচু করল খুদাবক্স্।

তাঞ্জামের জরির পর্দা এতটুকু ফাঁক করে ধরে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন রাণী। ইনিই বাঈসাহেবা, মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ। পবিত্র হোলির দিনে লছমীতাল মন্দিরে পূজা দিতে চলেছেন।

এবার হালোয়াই পুরা মহল্লা। পথের দু'পাশে সমৃদ্ধ বিপণি। কিন্তু দোকানপাট আজ সব বন্ধ। কেনাবেচা নেই। রাস্তার দু'ধারে শুধু পত্রপুষ্পের মালা, পথ গুলাল রং-এ পিছল, গোলাপ চন্দনের গন্ধে বাতাস মন্থর।

বুন্দেলা নারীর চলনে ঠমক বেশী। কলহাস্যে তারা চলেছে পদব্রজে আঁচলে আবীর নিয়ে। মাথায় পুষ্পাভরণ, পীত রেশমের শাড়ী পাক দিয়ে পরে মরাঠা কুলবধূরা পাল্কীতে চলেছেন দাসী নিয়ে। বাজারতলায় ভিড়ের মাঝখানে চীৎকার ক'রে রায়সো গাইছে ছেলেরা। আর হাজারটা মিশ্রিত গোলমাল মন্থন করে থেকে থেকেই ঐকতান ধ্বনি উঠছে,—হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়।

ওস্তাদ বলতে বলতে চলেছেন,—দেখ বেটা ঐ বাগিচা দেখ। আশেপাশে কোথাও তুমি ঝাঁসির মত সুন্দর শহর দেখতে পাবে না। ঐ দেখ, কমলালেবুর বাগান, গুলবাগিচা।

খুদাবক্স্ দেখে আর মুগ্ধ হয়। ফাগুয়ার রঙ-এ রঙীন হ'য়ে ওঠে তার তাজা মন।

শ্যামবর্ণ চেহারার এক স্থূলকান্তি ব্রাহ্মণ কয়টি কিশোর শ্রোতার সঙ্গে হস্তাঙ্গুলির মুদ্রাসহকারে দুরূহ এক তত্ত্বের জট ছাড়াতে ছাড়াতে আসছিলেন। গোলাম ঘোস তাঁকে সম্ভাষণ করেন,—কি শাস্ত্রীজী, হলো কি?

সুপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করে বলেন,—বড় সমস্যা খাঁ সাহেব, তোমার গোলাগুলীতে এর কোন সমাধান হবে না।

—বলেই দেখুন না। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধ'রে ঝুঁকে পড়ে ঘোস।

ব্রাহ্মণ হেসে বলেন,—পজনেশ কি কবিতা লিখেছেন খাঁ সাহেব কিছুতেই ছন্দে মিলছে না। তাই ঝগড়া করতে করতে চলেছি—

কোমলতন ললিত নৈন বসত নিশি বাসর মন
প্যারী হমারী লাজ ফুলওয়ারী হ্যায়—

ঘোড়া থামিয়ে গোলাম ঘৌস হাসতে থাকেন। বলেন,—চমৎকার মিলেছে।

—না না এখানে নয়। আগের পয়ারে বলছে,

ভন পজনেশ এক ক্ষত্রাণী সে
হম ভি চুকে—

জাত বলেই ত বেমিল করে দিল লোকটা। বুঝছেন না, সন্ধ্যাবেলা শোনাব যখন, রূপা ত কোরিণ কিনা জাতে, কেমন করে বলুন ত মেলাই? বড় সমস্যা খাঁ সাহেব, সে তুমি ঠিক বুঝবে না। তারপর এতদিন কোথায় থাকা হয়েছিল?

—রাজার জন্যে বাঘ পুষছিলাম।

-তারপর?

—নিয়ে এসেছি।

—শিকারখানার জন্যে ত? তা কি বাঘ? বড় না গুলে?

খুদাবক্সের দিকে চেয়ে ঘৌস বললেন,—সেই ত মুস্কিল নারায়ণজী, বুঝতে পারছি না। বাঘের বাচ্চাই হবে। এখন কোন শিকারখানায় যে দেবো—

নারায়ণরাও বললেন,—কপালও করে এসেছিলে খাঁ সাহেব। বাঘ ধরছ, কামান দাগছ, এদিকে পজনেশ যে কি হাঙ্গামা বাধিয়ে রাখল, কি করি বল ত? প্যারী হমারি রূপা কোরিণ হ্যায়, বললে কি আর মেলে? আর লিখলেই হলো? ব'সে ব'সে খাতা লিখতিস ইন্দোরে খজুরীবাজারে, সে সব ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখতে গেলি কেন?

চলে গেলেন নারায়ণ শাস্ত্রী। বড় রসিক মানুষ। প্রেমিক স্বভাবের জন্যেই তাঁর নানান সমস্যা। সে সব সমস্যার হাত থেকে তাঁর মুক্তির আশাও নেই। আর মুক্ত অবস্থাটা তাঁর হয়ত খুব পছন্দও নয়।

বেলা বাড়ছে। বাতাস গরম হ'য়ে উঠেছে পথে পথে হোলির কোলাহল উঠছে উন্মত্ত তরঙ্গের মত। চারপাশে গুলাল রঙ, আনন্দের হররা আর রায়সো গানের সুরে ভরপুর। খুদাবক্সের মনেও সেই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগে। ঘোড়ার পিঠে দুলকি চালে চলতে চলতে সে-ও গুণ-গুণ করে গান গাইতে লাগল।

সামনেই এক বিশাল দরওয়াজা। মনের খুসীতে তার ভেতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিতেই সামাল সামাল, হায় হায় করে চেঁচিয়ে উঠল লোকে। কি হয়েছে কিছু বোঝবার আগেই খুদাবক্সের ঘোড়া সামনের দু'খানা পা শূন্যে তুলে ঘুরে গিয়ে অতিকষ্টে সামলে নিল, আর সামনে তাঞ্জামসমেত বাহকেরা হুড়মুড় করে পিছু হ'টে গেল। বোঝা গেল, রক্ষে পেয়ে গেল একটি বিপর্যয়।

একটি মাত্র নিমেষ কিন্তু মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডে তার জের কাটতে বহুক্ষণ সময় লাগে। তাঞ্জামের আরোহিণী অস্ফুট আর্তনাদে দু'আঙুলে পর্দা সরালেন। আর সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল খুদাবক্স। দেখল, চাঁদের মত পান্ডুর গৌরবর্ণা, ঈষৎ লম্বা মুখে তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূ, রক্তগোলাপে রচিত ওষ্ঠাধর, চম্পকবর্ণ পেশোয়াজে ও ওড়নীতে সেই গৌরতনু বেষ্টিত, কপালে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ বেণীর বন্ধন অমান্য করে ছড়িয়ে প'ড়েছে। আরোহিণীর

বিস্মিত চোখ খুদাবক্সের চোখে বাঁধা পড়ল। ভ্রূকুটি করলেন তিনি।

চঞ্চল কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু সেই মুহূর্তের একখানি ছবি অনভিজ্ঞ যুবক অশ্বারোহীর মনের পটে অক্ষয় রেখায় ধরা পড়ল। রেখাপাতের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল রঙ। প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠল সেই ছবি।

তাঞ্জামের পর্দা টেনে দিলেন বিজয়িনী। মহাকালের প্রসন্ন দক্ষিণপাণি-বিচ্যুত অমর একটি ক্ষণ নিমেষে ফুরিয়ে গেল। খুদাবক্স অশ্ব সংযত করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। তাঞ্জাম চলে গেল।

সপ্রশংস কণ্ঠে দ্বাররক্ষী বলল,—মোতি! মোতিবাঈ।

মোতি, দুই অক্ষরের একটি নাম বুকে নিয়ে খুদাবক্স্ সেদিন কেল্লায় ফিরল।

পরে, অনেক পরে, সেই ছবির সঙ্গে উপমা মিলিয়ে অনেক ছবি তার মনে এসেছে। অনেক শ্যের, অনেক 'গজল', অনেক গানের কথাই মনে হয়েছে তার। কিন্তু সেই ছবির পাশে অন্য কোন ছবি তার কাছে সুন্দরতর বলে মনে হয়নি।

সন্ধ্যাবেলা। নাটকশালায় হাজার বাতির ঝাড় জ্বলছে। মেঝেতে লাল গালিচা পাতা, তাতে পা ডুবে যায় চলতে গিয়ে। সামনে সারি সারি কুর্শী বসানো। অনেক সমঝদার লোক বসে অপেক্ষা করছেন। একটু পরে শুরু হবে নাচ গান।

শীষঘরে শিঙ্গার শেষ করে বসেছিল মোতি। মন তার বে-দিশা। অন্যতমা নর্তকী জুহী মোতির পায়ে ঘুঙুর বেঁধে উঠে দাঁড়াল। অন্যদিন মোতি কত কথা কয়। চঞ্চল চোখে ভ্রূভঙ্গিমায় কত নাচের বোল আওড়ায়। কিন্তু আজ মোতি একটা কথাও বলছে না। হাসিখুসী একটা লোক মনমরা হয়ে চুপচাপ থাকবে, জুহীর ভাল লাগে না। বলে,—আকাশ পাতাল কি ভাবছ অমন!

জবাবটা আসে সুগন্ধ বাতাসের ভিজে ঝাপটার মত,—হ্যাঁরে জুহী, আজ সকালে আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল রে!

মোতির কথায় প্রাণ পায় জুহী। তা'হলে তেমন কিছুই ব্যাপার নয়। চটুল হেসে বলে,—সখী চুলও বাঁধোনি কাজলও পরোনি; গেলে আর অমনি স্নান সেরে এলে লছমীতাল থেকে। তাই বলি দেখাচ্ছিল যেন ঠিক রাগিণী আসাবরী,

শ্রীখণ্ডে শৈল শিখরে শিখিপুচ্ছ বস্ত্রা
মাতংগমৌক্তিকমনোহরহারবল্লী—

কেন কি হয়েছে? আবার প্রিয় প্রতীক্ষায় চকিতনয়নাও বটে—

—চুপ চুপ। অধরোষ্ঠে অঙ্গুলিশাসনে চুপ করতে বলে মোতি জুহীকে।

জুহী কিন্তু বারণ মানে না। চোখ নাচিয়ে ভ্রূ বাঁকিয়ে বলে,—কেন চুপ করবো বল? তুমি হলে বুন্দেলখণ্ডের সেরা রূপসী মোতিবাঈ। তোমাকে দেখলেই লোকে চকিত হবে; আর তোমার মন যে পাবে—

অতর্কিতে নাট্যশালার দাসী এসে ঢুকল শীষঘরে। হাত নাচিয়ে জানাল আজ বহু সমজদার লোক এসেছে নাচ দেখাতে। সবাই অপেক্ষা করে ব'সে আছে। শিগগির যাও, জলদি কর।

ঘুঙুরের নিক্কণ তুলে ত্রস্তে চলে গেল মোতি। নাট্যশালার পর্দা আস্তে আস্তে সরে গেল।

মোতি নয়, শ্রীরাধিকা। মাথায় সোনালী ওড়না, পরনে ঘননীল ঘাগরা। বঙ্কিম ঠমকে কলসী কাঁখে নিঃসীম আঁধারে যমুনায় জল আনতে চলেছেন। রাজভয় আছে লোকভয় আছে, তাছাড়া ঘরে রায়বাঘিনী ননদ,—তাই কুণ্ঠিত ভীরু পদক্ষেপ। গৌর সুন্দর পায়ে রুপোর ঝাঁঝরা ক্ষীণ রেলা তুলে একটি সরল রেখায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেল মোতি মঞ্চের মাঝখানে। দুলে উঠল কণ্ঠহার—মতির মালা। মরালগ্রীবা ভঙ্গিমায় কর্ণাভরণে বিজুরি খেলে গেল। সারেঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে মোতিও পুকার দিয়ে উঠল,...প্রেম সে বাওরী রে...। রাধা ভয়ি প্রেম সে বাওরী—।

কাঁখের কলসী মাটিতে নামিয়ে রেখে গান করতে করতে রূপাতীত লোকে চলে গেল মোতি। মোতি আর এখন মোতিতে নেই।

সারাদিন কোকিল ডেকেছে, আবীর খেলেছে সখীরা। রাধা তখন ঘরে ছিল। প্রিয় তাকে ডাকেনি তাই সে বাইরে আসেনি। এখন এই নিশীথে সে বাঁশী শুনে আকুলপারা বেরিয়ে এসেছে, যমুনার তীরে একা একা পথ খুঁজে ফিরছে। কিন্তু কোথায় তার সেই প্রিয় সখা? তবে কি এই পূর্ণিমারজনী ব্যর্থ হয়ে যাবে? রাধিকার অন্তরে যে আজ অফুরন্ত আবীরের উৎস, কুঙ্কুমের সঞ্চয়! সেই রঙ তার প্রিয় কি গ্রহণ করবে না? তাই মোতি গাইছে;...প্রেম সে বাওরীরে......।

গানের সুরে সুরে আর নাচের মুদ্রার ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে শুনছিল আর দেখছিল যারা তাদের যেন কোন কল্পলোকে নিয়ে গেল মোতি!

ভাল লাগল সকলেরই কিন্তু পাগল হল এক খুদাবক্স। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল,—বহুৎ খুব!

নাট্যশালায় গণ্যমান্য রাজপুরুষদের সামনে নর্তকীকে বাহবা দেবার রেওয়াজ ছিল না। তাই মোতি নাচ থামিয়ে ঘুরে তাকাল। দেখল, সকালের সেই অশ্বারোহী।

খুব বেমানান হয়ে গেছে মন্তব্য। রাজপুরুষদের সামনে এটা প্রত্যক্ষ বেয়াদবির সামিল। সকলেই খুদাবক্সের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। খুদাবক্সের নাক কান লাল হয়ে উঠল অপমানে। চকিতে সে নাট্যশালা থেকে উঠে চলে গেল। একটু পরেই আবার শুরু হলো নৃত্যগীত, রাজার নির্দেশে।

দোলপূর্ণিমার মধ্যরজনী। মোতির শয়নকক্ষে বাঁধভাঙা চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে। আর তারই মাঝখানে শুভ্রবসনা মোতি মূর্তিমতী রাগিণীর মত দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালে রাজপুত চিত্রকরের আঁকা পট। বেদীতে তানপুরা। কুলুঙ্গীতে ঘুঙুর।

মাটিতে আজ আকাশের চাঁদ গলে গলে পড়ছে। পৃথিবী মায়াময়। ধীর পদক্ষেপে ঝরোকায় এসে দাঁড়াল মোতি।

দূরে কোন এক পান্থ মিঠে গলায় গান গাইছে, নিদ নাহি আবত সৈঁয়া—আঁখিপাতে ঘুম নেই।

মোতির চোখেও আজ ঘুম আসছে না।

ঘুম নেই শুধু ক্লান্তি। পুষ্পবল্লরীর মত নিজেকে বিছিয়ে দিল মোতি মাটিতে। উপুড় হয়ে শুয়ে কাত ফিরে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল অনিমিখ।

নাচনেওয়ালী সে। তবু তার যৌবন আজও সদ্য ফোটা ফুলের অনাঘ্রাত। যে গুল-বাগিচায় কোন বুলবুল এসে বসেনি, তারই মতো একান্তে প্রতীক্ষা করে বসে আছে মোতি।

মনে পড়ল মোতির সেই নওজোয়ান অশ্বারোহীর মুখ। সকালে ও সন্ধ্যায়, দু' দু'বার দেখেছে তাকে। ঘুরে ফিরে তার কথাই মনে পড়তে লাগল মোতির বার বার। কে সে? কোথায় ঘর? কেন সে অমন করে তাকাল? নাচের জলসায় আদব ভুলে গিয়ে কেন সে আজ রাজার সামনেই তাকে তারিফ ক'রে বাহবা দিয়ে উঠল?

মোতির মনে আজ শুধু তার কথাই জেগে আছে। জেগে আছে আর থেকে থেকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। আর সেই ঝঙ্কারে আজ মোতি অপরূপ রাগরাগিণী শুনতে পাচ্ছে।

মাটির বুকে নিঃশ্বাস ফেলে মোতি অস্ফুটে ব'লে ফেলে,—নজরোঁসে নজর মিলিতো দিল হি বাওরী—

কথাটা বলে নিজেই নিজেকে ভৎর্সনা করে মোতি। এমন নিলাজ হ'য়ে কার কথা ভাবছে সে? 'শ্যায়ের' পাঠাচ্ছে কার উদ্দেশে?

ঘুম এল মোতির চোখে অনেক রাতে। আর তার অকলঙ্ক সুন্দর মুখ চেয়ে জেগে রইল চাঁদ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সমাজবাদী পরিকল্পনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব

সুচিন্তিত সুলিখিত আটটি প্রবন্ধের সমষ্টি।[১] প্রকর্ষিত চিত্তের ফল, শাঁসালো কিন্তু দুষ্পাক নয়। ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাতত্ত্ব—এই সব বিবিধ ক্ষেত্র থেকে আহরিত তাদের রস। কিন্তু রসের বাড়াবাড়ি নেই কোথাও, অন্য দিকে যেমন তত্ত্বকথার কচকচানি কিংবা বিদ্যা ফলানোর চেষ্টা একেবারে অনুপস্থিত। বাংলা প্রবন্ধের লঘুচিত্ত-চাপল্যে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা খুব সোয়াস্তি বোধ করবেন না এই বই পড়তে, আবার যাঁরা চিন্তারাজ্যে নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের আশা নিয়ে আসবেন তাঁরাও একটু হতাশ হবেন। এ প্রবন্ধসমষ্টির যে গুণটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে তাদের বিষয়বৈচিত্র্য, সেই সব বিচিত্র ক্ষেত্রে লেখকের স্বচ্ছন্দ বিহার, তাঁর প্রকাশ ভঙ্গীর স্বচ্ছতা। হুমায়ুন কবিরকে যাঁরা রাজনৈতিক নেতা কিংবা আমলাতন্ত্রের একজন পুরোধা বলে জানেন তাঁরা এ বই পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হবেন। বিস্মিত হবেন এই ভেবে যে তাঁর নিরেট কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি কোন্ কৌশলে চিৎপ্রকর্ষের এতখানি অবকাশ সৃষ্টি করলেন; আনন্দিত হবেন উপযুক্ত রোদবৃষ্টি না পেয়েও ফলন এত ভাল হয়েছে দেখে।

মলাটেই বলা হয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপলব্ধি প্রবন্ধগুলিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সেই সঙ্গে সামাজিক বিধানের প্রয়োজন বিষয়েও লেখক খুবই সচেতন। এবং উভয়ের মধ্যে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির মধ্যে দুর্নিবার সংঘাতটিও তাঁর চোখের সামনে সর্বদা উপস্থিত। প্রকাশকের ঘোষণা অনুযায়ী এই প্রসঙ্গ বা সমস্যার ছায়াপাত সমস্ত প্রবন্ধে থাকলেও যে-প্রবন্ধগুলির এটাই প্রধান আলোচ্য সেগুলির বক্তব্য বিষয়ে কবিরের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য ও অনৈক্য নিয়েই এই পর্যালোচনা।

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে গণতন্ত্র বিভিন্ন রূপ ধারণ করলেও তাদের মধ্যে একটি ঐক্য ধরা পড়ে। সেই ঐক্যের সন্ধান দিতে গিয়ে কবির বলেছেন :

"The one thing that distinguishes all the different political systems and ideologies which we call democratic is the urge to establish an equivalence if not identity between duties and rights." (p. 27)

আরো একটু বিশদ করে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যকে কবির দুটি সূত্রে বিশ্লিষ্ট করেছেন :

"(*a*) The attempt to establish the equality of rights and duties for all members of a community, (*b*) the attempt to make all rights and duties coincident."

প্রথম সূত্রটি সহজেই বোঝা যায়, কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই সেখানে। দ্বিতীয়টি আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়, অথবা বলা ভাল যে তার যে-অর্থ পরিষ্কার সে অর্থে তাকে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে আমি মানতে পারি না। দুটি পদার্থের মধ্যে 'সমীকরণ',

---

১ Humayun Kabir—Science, Democracy and Islam and Other Essays, pp. 126. George Allen & Unwin. 12*s.* 6*d.*

'তাদাত্ম্য' বা 'সমপাত' সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দুটি পদার্থ একই, অন্তত একই পদার্থের দুই ভিন্ন রূপ। কিন্তু কবির নিশ্চয়ই বলতে চাননি যে একই ব্যাপারকে একাধারে কর্তব্য এবং অধিকার বলে গণ্য করা যেতে পারে, একদিক থেকে দেখতে গেলে যা আমাদের অধিকার, অন্যদিক থেকে তাই কর্তব্য। খুব সম্ভব তিনি যে-সম্পর্কের কথা ভাবছেন সেটাকে লাস্কির ভাষায় correlation বলা যায়—কবির নিজেও ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে correlation- এর অর্থ হবে অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ—অধিকার-লাভের জন্যই কর্তব্যপালন, কর্তব্যপালনের জন্যই অধিকারলাভ। সমাজ যদি আমার কতকগুলো অধিকার স্বীকার করে তাহলে সমাজের প্রতি কতকগুলো কর্তব্য আমাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। প্রাপ্য এবং দেয়র মধ্যে একটি সমতা থাকা সংগত বইকি। কিন্তু ঐ 'কর্তব্যপালনের জন্যই অধিকারলাভ' কথাটা নিয়ে একটু গোল বাধে, অথচ অনেক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও সমাজসেবী ওটার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। গান্ধীজির কাছে তো সেটা ধর্মেরই সামিল ছিল; লাস্কিও বলছেন :

"My rights are built always upon the relation my function has to the well-being of society, and the claims I make must, clearly enough, be claims that are necessary to the proper performance of my function". (*Grammer of Politics*, p. 95).

সমাজের কাছ থেকে আমার সমস্ত অধিকারের দাবী শুধু এইজনাই যে সমাজের হিত-সাধনে আমি আত্মনিয়োগ করব—একথা যদি বা সত্য হয়, গণতন্ত্রের বিশেষ ধর্ম তাকে বলা যায় না। ডিকটেটরী রাষ্ট্রেও অধিকার ও কর্তব্যের এই ধরণের সমীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়, বরঞ্চ আরও বেশী দেওয়া হয়। ফাশিস্ট ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রেই ব্যক্তি সমাজের অংগ এবং অংগ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ব্যক্তির স্বকীয়তাবিকাশের এবং স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য কোনো বিশেষ অধিকার সমষ্টিবাদী সমাজ গ্রাহ্য করে না। কর্তব্যের জন্য অধিকার—এটা সমষ্টিবাদেরই মূলমন্ত্র হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির জীবনের সব ধারাই সমাজের খাতে প্রবাহিত হবে এমন কোনো কথা নেই। শুধু জৈবিক সুখসম্ভোগের কথা আমি বলছি না; আমার জীবনের যা শ্রেষ্ঠ ফসল তাও সমাজের নৈবেদ্য সাজাবার জন্য নয়, অন্তত সবটা নয়। আমি যেখানে শিল্পী বা জ্ঞানী, ভগবানের বা মুক্তির সন্ধানী, সেখানে আমার সাধনার মূল উৎস সমাজ-হিতৈষণা নয়—যদিও আমার সাধনা সফল হলে সমাজের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। আমি কিছু হতে চাই বা পেতে চাই—এই সব অধ্যাত্মকর্মের মূল প্রেরণা তাই, অন্যকে কিছু দেবার তাগিদ সেখানে গৌণ, অবচেতন। হার্টম্যান এ ধরণের চারিত্র্যগুণের নাম দিয়েছেন 'radiant virtue। এমন সব গুণী বা সাধকের কাছ থেকে অন্যেরা আলো পেতে পারে যেমন করে প্রদীপ থেকে লোকে আলো পায়। গ্রহীতা আছে একপক্ষে কিন্তু অন্যপক্ষে কোনো দাতা নেই, আপন তেজে পুড়েই সে আলো দিয়েছে, দান না করেই সে ধন্য করেছে। অনেক আগে ব্র্যাডলীও চরিত্রের এইসব ব্যক্তিক বা আত্মস্থ সদ্‌গুণের সংগে সামাজিক বা পরার্থী সদ্‌গুণের পার্থক্য নির্দেশ করে গিয়েছিলেন, এবং সেই সূত্রে একটি স্মরণীয় বাক্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন :

"Man is not man at all unless social, but man is not much above the beasts unless more than social." (*Ethical Studies*, p. 223)

বলাবাহুল্য যে মরুভূমি বা তুষারপর্বতে যদি বা কোনো মানুষ একাকী বাঁচতে পারে,

সেখানে একা বসে সে জ্ঞানান্বেষণ কিম্বা শিল্পচর্চার কোনো প্রেরণা অনুভব করবে না—করলেও নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু আবশ্যক তার গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবে না সে প্রেরণা। বহুলোকের, বহুবংশের যৌথ ও পরস্পরসাপেক্ষ চেষ্টার প্রয়োজন এই সবের বৈদগ্ধ্য-সাধনের জন্য। কিন্তু সমাজনির্ভর হলেও জ্ঞানী ও শিল্পীর সাধনা মূলতঃ সমাজমুখিন্ নয়। অথচ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের এই সমস্ত একান্ত ব্যক্তিক ক্ষেত্রেও সমাজের কাছ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সুবিধা (রাজনীতির ভাষায় 'rights') দাবী করব বইকি। লাস্কি নিজেও স্বীকার করেছেন যে,

"rights are those conditions of human life without which no man can seek in general to be himself at his best."

এবং একথা সমষ্টিবাদী সমাজের বাইরে নিশ্চয়ই কেউ বলবে না যে সামাজিক মঙ্গল-সাধনই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে a man can seek to be himself at his best. প্রত্যুত্তরে অবশ্য এমন যুক্তি দেখানো সম্ভব যে সমাজ যখন বহু ব্যক্তির সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয় তখন আমি আমার নিজের ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণতাসাধনে সমাজেরই হিতবিধান করছি। সুতরাং এক্ষেত্রেও সমাজের কাছ থেকে আমার অধিকারের দাবী সামাজিক কল্যাণার্থেই। যুক্তিটা এক হিসাবে ঠিক। তবু এটা মনে রাখা ভাল যে আমাদের কর্মপ্রেরণার একভাগের লক্ষ্য অন্যকে কিছু দেওয়া, অন্যভাগের লক্ষ্য নিজে কিছু হওয়া বা পাওয়া, এবং উভয় বিভাগে আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমাদের অধিকারের স্বীকৃতি দাবী করি। বরঞ্চ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকারকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই সব রাষ্ট্রে নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই লাস্কির এই উক্তি সত্য যে liberty is a product of rights. একনায়কতন্ত্রেও কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত হয়—যথা উপযুক্ত বেতনসহ কর্মের অধিকার, পঙ্গু হলে পেন্সনের অধিকার, সন্তানের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু এইসব অধিকারের উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অঙ্গরূপে পুষ্ট করা, রাষ্ট্রের সেবার জন্য প্রস্তুত করা; ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বকীয় যে-মর্যাদা তার যথোপযুক্ত স্বীকৃতি নেই সমষ্টিবাদী সমাজে।

কবির যথার্থই বলেছেন যে একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থার নামই গণতন্ত্র নয়, যদিও সেই বিশেষ শাসনব্যবস্থা (অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনবিধি রচনা ও শাসনকার্য চালনা) না থাকলে গণতন্ত্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের অন্য আবশ্যিক শর্তরূপে কবির নির্দেশ করেছেন মোট সামাজিক আয়ের সমান বণ্টন, অন্তত বণ্টন-ব্যবস্থায় বিরাট কোনো অসাম্য না থাকা। এই ধনসাম্য যদি স্থাপন করা হয় উৎপাদনোপকরণের উপর সমষ্টীকৃত আধিপত্য ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা তবে তা সমাজবাদ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো মনীষী মনে করেন যে গণতন্ত্র ও সমাজবাদের মধ্যে একটি মৌল বিরোধ রয়েছে, কবির তা মনে করেন না। আগেই বলেছি যে এটাই বর্তমান গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করবার আগে আমি গণ-তন্ত্রের আরো দুটি মূল শর্ত বা ভিত্তির কথা বলতে চাই—যার গুরুত্ব পূর্বোক্ত দুটি শর্তের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়।

কেবলমাত্র শাসনবিধি ও অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় গণতন্ত্র। তার ভিত্তি আরো গভীরে। মানুষের মনের একটি বিশেষ মেজাজ বা দৃষ্টিভঙ্গীর এবং একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্য ব্যতীত গণতন্ত্রের পূর্ণ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সে মেজাজের গোড়ার

কথা হোল tolerance— বাংলায় যাকে পরমত-সহিষ্ণুতা বলা হয়। কিন্তু টলারেন্সের অর্থ কেবল পরের মত সহ্য করা নয়। নিজের বা নিজের দলের মত ও পথ আমার বা আমাদের কাছে আপাতত যত সত্য বলেই প্রতিভাত হোক, তাকে অমোঘ কি অকাট্য জ্ঞান না করা, এবং অন্যের বা অন্যদলের মত ও পথ আপাতত যতই মিথ্যা অথবা অসৎ মনে হোক তাকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখা, হয়ত তাই একদিন সত্য এবং সৎ বলে নিজেকে সপ্রমাণিত করতে পারে এমন একটি সন্দেহভাবকে মনের কোণে স্থান দেওয়া—এ সবই টলারেন্স শব্দার্থের অন্তর্ভুক্ত। গণতন্ত্র কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও রুচি অনুযায়ী চলার নীতি স্বীকার করে; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভের ফলেই কোনো মত সত্য এবং কোনো রুচি বরেণ্য বলে প্রতিপন্ন হয়ে যায় না। কাজেই সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকেও প্রমাণ করবার বা বিপরীত পক্ষকে দিয়ে মানিয়ে নেবার সর্বদাই সুযোগ দিতে হবে যে তাদের মতই সত্য এবং তাদের আদর্শই শ্রেয়। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, অন্যদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মান—এই যুগল স্তম্ভের উপর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

স্বমতের যাথার্থ্য ও পরমতের ভ্রান্তি সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহভাব যেমন গণতন্ত্রের প্রতিকূল, তেমনি সব সত্যকেই আপেক্ষিক ও সব আদর্শকেই ক্ষণিক জ্ঞান করা-রূপ সর্বগ্রাসী সন্দেহবাদও গণতন্ত্রের বিনাশের কারণ হতে পারে। ভৌগলিক মরুভূমিতে যেমন মানুষের শরীর বাঁচে না, আধ্যাত্মিক মরুভূমিতে তেমনি মানুষের চিত্ত নিতান্ত অসহায় ও দিশেহারা বোধ করে। মনের মাটিতে কোনো ধ্রুব আশ্রয় যদি কোথাও না থাকে তাহলে যে মানুষ অধ্রুবতার মধ্যেই স্থির থাকতে পারে এমন নয়, সে তখন ব্যাকুল হয়ে যে-কোনো প্রকারের আপ্তবাক্যকেই আঁকড়ে ধরতে ছোটে—যদি সে বাক্যের পেছনে গলার, সংখ্যার বা রাজশক্তির জোর থাকে। তা ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারী সর্বভুক শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে কোনো নাগরিক যখন নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয় তখন সে কেবল তার ছোটখাট সুখদুঃখ বা বৈষয়িক লাভক্ষতির কথাই ভাবে না। জীবনে সে যে সত্যকে ধ্রুব বলে গ্রহণ করেছে, যে আদর্শকে মহান বলে বরণ করেছে, তার প্রতিই যখন আঘাত আসে—সে আঘাত কোনো সর্বাধিনায়কের হাত থেকেই আসুক আর সংখ্যাগুরু কোনো দলের হাত থেকেই আসুক—তখনই তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার প্রকৃত শক্তি সে খুঁজে পায় নিজের মধ্যে। যদি আপন মতের প্রতি কোনো আস্থাই কোথাও না থাকে, অর্থাৎ সেটাকে যথার্থ সত্য বলে বিশ্বাস না করে হাজারটা মতের একটা মত মাত্র ভাবি, তবে তার জন্য প্রাণ কেন কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত দিতে কেউ এগিয়ে আসবে না। এমন অবস্থায় যদি কোনো দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজপুরুষ বা রাজনৈতিক দল সত্যাসত্য ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি চূড়ান্ত-ভাবে নির্ধারণ করে দেওয়ার দাবী জানায় তবে সে দাবী প্রতিরোধ করবার শক্তি এবং প্রেরণা ক'জনের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে.?* নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ী-নিরপেক্ষ সত্যে বিশ্বাস রাখা অথচ পরমতকে সর্বদা অবিচলিত ঔদার্যে ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করা, ভ্রান্ত জেনেও তাকে অবজ্ঞা না করা—একই চিত্তে এই দুই আপাতবিরোধী মনোভাবের সহভাবিত্ব অত্যন্ত দুঃসাধ্য সে কথা মানতেই হবে। পনেরো আনা লোক হয় কোনো সার্বজনীন সত্য বা শ্রেয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, জনে জনে সত্যের ও শ্রেয়ের প্রতিমানকে ভিন্ন জ্ঞান করে, নতুবা নিজের মত ও আদর্শকে চূড়ান্ত সত্য জেনে অন্যের মতবিশ্বাসের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। অথচ

*এই প্রসঙ্গের বহুতথ্য-সংবলিত আলোচনা পাওয়া যাবে Polanyi-র *The Logic of Liberty* নামক গ্রন্থে।

কোনো একটি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্য আছে একথা মানার সঙ্গে সঙ্গে এটা মোটেই অবধারিত হয়ে যায় যায় না যে আমিই সে সত্যে পৌঁছে গেছি, অন্য মতাবলম্বীরা সবাই ভ্রান্তির তিমিরে মগ্ন। নিরপেক্ষ সত্যের যেমন চরম মূল্য স্বীকার্য, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মতন করে নিজের সাধ্য অনুযায়ী সে সত্যান্বেষণের স্বাধীনতার মূল্যও তেমনই চরম, কোনো অবস্থাতেই তার ব্যত্যয় বা লাঘব ঘটতে দেওয়ার মত সর্বনাশা বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়।

কাজেই গণতন্ত্রের দুটি বাহ্য শর্ত রাষ্ট্রক্ষমতার এবং সামাজিক উৎপাদনের সমবণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি মানসিক ভিত্তি পরমসহিষ্ণুতা এবং জাগ্রত সত্য ও শ্রেয়বোধকেও আমি সমান প্রাধান্য দিই। তার মানে এই নয় যে বাস্তবিকক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রগুলিকে আমরা গণতান্ত্রিক বলে জানি তাতে উল্লিখিত সবকটি শর্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, বা কোনো শর্তই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। গণতান্ত্রিকতার দাবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বোধ করি সবচেয়ে সোচ্চার এবং আত্মপ্রসন্ন। গণতন্ত্রের পূর্বোক্ত শর্তগুলির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় শর্ত সেখানে ক্ষীণ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শর্ত প্রায় অনুপস্থিত। গণতন্ত্র আদর্শগতভাবে কি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার চেহারা কি রকম এদুটো প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট হলেও এক নয়। কবিরের সঙ্গে আমি একমত যে, "In addition to the natural fluidity of content in any concept, we have here an additional element of uncertainty in the natural human tendency to confuse ideals with actual conditions." (p. 26) বলাবাহুল্য উপরে আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শেরই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি, গণতান্ত্রিক বাস্তবের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়নি।

এইবার গণতন্ত্রের প্রথম দুটি শর্তের অন্বয় বা অন্বয়াভাবের সমস্যায় ফিরে আসা যাক। কোনো সন্দেহ নেই যে বংশমর্যাদার অসাম্য যেমন অধিকাংশের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছিল মধ্যযুগে, তেমনি আজ অর্থনৈতিক সুযোগের অসমতা অধিকাংশের দেহমনের বিকাশকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এই দিক থেকে বিচার করলে স্বাধীনতা যে সাম্যের উপর নির্ভরশীল সেটা বুঝতে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার করে না। আর্থিক সাম্য যদি দেবতার বরস্বরূপ পাওয়া যেত এবং কোনো মন্ত্রবলে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হোত তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু মুস্কিল এই যে স্বাধীন সমাজে ধনবণ্টনের সমতা যদি বা স্থাপিত করা হয়, সেটা দুদিনেই লুপ্ত হয়ে যায় কারণ যারা প্রকৃতির একচোখোমির ফলে অসমান অর্থাৎ অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও স্থূল-বিবেক তারা মাঝারি মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের তহবিলে সামাজিক ধনোৎপাদনের মোটা অংশ তুলে নিতে বিলম্ব করবে না। কাজেই ধনসাম্যকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে আর্থিক জীবনযাত্রাকে নানাবিধ নিয়মে বাঁধতে হয়, স্বেচ্ছাচারী প্রতিযোগ নীতির স্থলে কেন্দ্রীয় পরিচালনার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এবং তখনই ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে বলে রব ওঠে। সে রব শুধু ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থশিবিরের রণদামামা থেকেই ওঠে না। কবির যখন বলেন : "Liberty and security may be regarded as the systole and diastoleof the human mind" তখন একটি বিমূর্ত তত্ত্ব হিসাবে সেকথা মেনে নিতে বাধা নেই। কিন্তু প্রয়োগকালে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়, কবিরের সুন্দর উপমাটিতে তার নিরসন খোঁজা বৃথা।

একটি বিরাট রাষ্ট্রে গোড়া ঘেঁষে সমাজবাদ পত্তন করবার পূর্ণোদ্যম চেষ্টা চলেছে গত চল্লিশ বছর ধরে, অনেক পরিমাণে সে চেষ্টার সফলতা আজ অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে এও

দেখা গেছে যে উক্ত রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং rule of law নামক আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাসের বহুযত্নলালিত ছোট চারাগাছটিকে মুচড়ে ফেলা হয়েছিল, আমলাতান্ত্রিক ব্যভিচারে কিংবা অধুনা যার নাম দেওয়া হয়েছে cult of personality তারই তাণ্ডবলীলায় শিল্পসাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যাত্মবিকাশের যাবতীয় ক্ষেত্র নিষ্ঠুর ভাবে পদদলিত হয়েছিল। ছ'মাস আগে পর্যন্ত এ নিয়ে তিক্ত বাদানুবাদ চলত, আজ তার ভয়াবহ ইতিবৃত্ত স্বয়ং ক্রুশ্চেভের মুখে উদ্ঘাটিত হোল। সমাজবাদের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই প্রত্যাহার কেমন করে সম্ভব হোল আজ সে প্রশ্ন সমাজবাদের শত্রুমিত্র সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ কি কেবল স্তালিনের ক্ষমতামদমত্ত স্বেচ্ছাচারের ফল; নানা ঐতিহাসিক কারণে সোভিয়েট সাম্যবাদ যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল তারই দুষ্ট প্রত্যঙ্গ; চারিদিককার সাম্রাজিক শক্তিগুলির হিংস্র আক্রমণের পৌণঃপুনিক চেষ্টা এবং আভ্যন্তরীন বিপ্লব ঘটাবার অবিরাম ষড়যন্ত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া; নাকি সমাজবাদের অন্তরেই এসবের বীজ নিহিত ছিল?

আগেই বলা হয়েছে যে সমাজবাদ বলতে কেবল ন্যায়নীতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্যের উচ্ছেদ, ধনের সমবণ্টন প্রভৃতি কয়েকটি উচ্চ আদর্শই বোঝায় না, সেই সব আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ার একটি বিশেষ পদ্ধতিও সমাজবাদের অভিধাভুক্ত। সে পদ্ধতির মূল কথা হোল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত অর্থনীতি। অবশ্য আজকের দিনে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা কেবল সমাজবাদের মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধনিকতন্ত্রও শত্রুর কাছে পাঠ নিয়েছে, laissez faire বা অবাধ অর্থনীতি পরিত্যাগ করেছে, সরকারী নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের বুদ্ধিজীবি অধিবক্তারা (উদারপন্থী নামেই তাঁরা পরিচিত, অন্তত পরিচিত হতে ইচ্ছুক) বলেন, তাঁরা যে-নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী তার সঙ্গে সমাজবাদী নিয়ন্ত্রণের প্রভেদ শুধু মাত্রাগত নয়, গুণ-গত। ক্লাসিকাল অর্থবিজ্ঞানীরা তাঁদের বিজ্ঞানের যে সব নিয়ম আবিস্কার করেছিলেন সেগুলি একটি আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার নিয়ম, কোনো বাস্তব সমাজে তা সম্পূর্ণ খাটে না। খাটে না কেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা কয়েকটি বিঘ্নবিপত্তির (frictions and disturbances এর) কথা বলেছিলেন। উদারপন্থীদের মতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই বিঘ্নগুলি দূর করে এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রণয়ন করা যেটা তাঁদের বিজ্ঞান-সম্মত, যেখানে ক্লাসিকাল ইকনমিক্সের নিয়মগুলি অবিকৃত ও অব্যতিক্রান্তরূপে প্রযোজ্য। আরও একটু বিশদ ক'রে বলা যায় যে উদারপন্থী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনিকপক্ষে সর্বগ্রাসী একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তোলাতে বাধা দেওয়া এবং শ্রমিকপক্ষে যাতে কেউ প্রাণের দায়ে কোনো চুক্তি বা শর্ত মানতে বাধ্য না হয় তার ব্যবস্থা করা (prevention of necessitious bargaining)। এর সঙ্গে সমাজবাদী নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য সুস্পষ্ট। লিপম্যানের ভাষায় দুই নীতির মূল প্রভেদ হচ্ছে :

"In the liberal philosophy the ideal regulator of the labour of mankind is the perfect market; in the collectivist philosophy it is the perfect plan imposed by the omnipotent sovereign." (Lippmann.—*The Good Society*, p. 236)

কিন্তু ক্রমশই প্রমাণিত হচ্ছে যে উদারপন্থীরা এই পার্থক্যকে যত দুর্লঙ্ঘ্য জ্ঞান করেছিলেন কার্যক্ষেত্রে তা তত দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রনেতারা এত দিনকার

অভিজ্ঞতায় হৃদয়ঙ্গম করতে বাধ্য হয়েছেন যে অর্থনীতি থেকে মার্কেটের প্রভাব নাকচ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। বাজারের সঙ্গে উৎপাদন ও বণ্টনের সম্পর্ককে সর্বদা চোখের সামনে না রাখলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অরাজকতা ঘটে। অপরপক্ষে উদারপন্থী রাষ্ট্রগুরুরা বুঝতে পারছেন যে একবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার প্রয়োজন স্বীকার করলে তার পরিধি ও গভীরতা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলতে হয়, কোথাও থামতে চাইলেই ঠিক সেইখানটায় থামা যায় না, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তার পরের পদক্ষেপকে অনিবার্য করে তোলে। বিপদ সেইখানে।

এই বিপদের মধ্যে অভয়বাণী শোনা যায়-যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে কেবল অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলিকে আনলেই চলবে, জীবনের অবশিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবার কোনো প্রয়োজন ঘটবে না। অর্থাৎ সমাজজীবনের স্থূলবিভাগে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে রাজী থাকি তাহলে ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ম ও সুকুমার বিভাগগুলিতে আমাদের স্বাধীনতা আরো পরিপূর্ণ এবং নিরঙ্কুশ হবে। কিন্তু আর্থিক ও পারমার্থিক স্তরগুলিকে এমন একান্ত পৃথক জ্ঞান করা ভুল। মার্ক্সের ভাষায় একটাকে সামাজিক ইমারতের ভিৎ এবং অপরটাকে তার চূড়া বল্লে খুব লাগসই উপমা দেওয়া হয় না যদিও, তবু এটা তো অবিসংবাদিত যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সংস্কৃতির সূক্ষ্মতম বিকাশও উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-উপকরণের যথোপযুক্ত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। এবং মোট উৎপন্ন ধনের কত ভগ্নাংশ সামাজিক ব্যয়ের কোন খাতে প্রবাহিত হবে, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে তার চরম নির্ধারক হবেন কোনো এক শাসন-পরিষদই। ভাববার কথা এই যে সমগ্র অর্থনীতির উপর যাদের অধিকার নির্ব্যূঢ় হবে সামাজিক সংস্কৃতির চাবিকাঠিও তাদের হাতেই গিয়ে পড়বে, কারণ

"economic control is not merely control of a sector of human life which can be separated from the rest, it is the control of the means of all our ends." (Hayek—*Road to Serfdom*, p. 68).

অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনুষঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা অনিবার্য না হলেও দুর্নিবার হয়ে ওঠে, উৎপাদনশক্তির সমষ্টীকরণ চুম্বকের মত টেনে আনে চিন্তাশক্তির সমষ্টীকরণকে। অত্যন্ত সুব্যবস্থিত পরিকল্পনা-চালিত সমাজে মৌলিক মতবিরোধ বা দ্রুত মতপরিবর্তনের অবকাশ নেই। এবং দেশব্যাপী ও দূরদর্শী কোনো পরিকল্পনা গৃহীত হলে তাকে কাজে পরিণত করবার জন্য যত গভীর ও ব্যাপক ঐকমত্যের প্রয়োজন, দেশের অধিকাংশ লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অতখানি একমত হতে পারবেন এ আশা দুরাশা। ফল হবে এই যে কতিপয় বুদ্ধিমান প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যখন এই প্রয়োজনীয় ঐকমত্যে পৌঁছবেন তখন তাঁদের সেই মত অধিকাংশকে মেনে নিতে বাধ্য করা হবে বলে বা কৌশলে। তাছাড়া আমাদের সকলের জীবিকার একমাত্র নির্ভর হবে সরকারী নিয়োগপত্র, কাজেই আমলাতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ, রুচি ও খেয়ালের প্রতি আনুগত্য ছাড়া কারুর উপায় থাকবে না। এখন তো তবু একজন বা একদল কর্তার বিরাগভাজন হলে অন্য কর্তার অধীনে কর্ম পাওয়ার আশা আছে, তখন জনগণের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা হবেন সরকার। ত্রত্স্কীর সাবধানবাণী আমরা স্মরণ করতে পারি :

"In a country where the sole employer is the State, opposition means death by slow starvation. The old principle—who does not work shall not eat has been replaced by a new one: who does not

obey shall not eat."

ইত্যাকার অধুনা-প্রদর্শিত অনেকগুলি যুক্তির বিভীষিকার সম্মুখে কবিরের ভরসা যে "planning need not necessarily be imposed from above' একটু দুর্বল শোনায় বইকি। কবির বলতে চান,
"Just as the political decisions of a democracy are the inter play of the inclinations, wills and decisions of a multiplicity of individuals, the planning of Welfare State can be the result of the wishes, desires and hopes of all its citizens." (p. 56)

উদ্ধৃত বাক্যের উপমানটিও পূর্ণ বাস্তবরূপে দেখা দেয়নি কোথাও, উপমেয়র অস্তিত্ব তো একেবারেই কল্পরাজ্যে। কিন্তু যতই দূরবর্তী এবং দুরূহ হোক কোনোটাই অসম্ভব নয়। তবে সম্ভব করতে হলে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ উভয় বিষয়ে এবং উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে আরো অনেক ভাবতে হবে, জানতে হবে। ডিকটেটরী রাষ্ট্রে পুরোদস্তুর প্ল্যানিং-এর বাস্তব চেহারা ইতিমধ্যেই একাধিক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, তার দোষগুণ দুই-ই আজ আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত। গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিকল্পিত অর্থনীতির পূর্ণ পরীক্ষা এ পর্যন্ত কোথাও হয়নি; ব্রিটেনে, সুইডেনে, নিউজিল্যাণ্ডে যেটুকু চেষ্টা চলেছিল তা জন্মেই অনেকটা স্থগিত, কতকটা প্রত্যাহৃত। ভারতবর্ষে সম্প্রতি খুব ঘটা করে সমাজবাদী অর্থনীতির সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু সূত্রপাতই। সেপথে এগুতে হলে যোজনা-সংসদের উচ্চাভিলাষকে আরো খাটো করে নিতে হবে, নাকি ভারতীয় গণতন্ত্রের কচি চারাগাছটি মাড়িয়ে এগুব আমরা—তার উত্তর ভবিষ্যতই দিতে পারে। এই যাত্রারম্ভের শুভমুহূর্তে যাঁরা কবিরের মত (আমিও নিজেকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করি) গণতান্ত্রিক রজানীতি ও পরিকল্পিত অর্থনীতির সাযুজ্যে বিশ্বাসী অথচ তার পর্বতপ্রমাণ দুরূহতা সম্বন্ধে সচেতন, তাঁদের বিশেষরূপে বুঝে দেখা দরকার গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার আদর্শ ও পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কী, ডিকেটটরী পরিকল্পনা থেকে তার জাতরক্ষা কেমন করে কোন্ পথে সম্ভব হতে পারে।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দুইপ্রকার পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ, যদিও সে পার্থক্যের কথা সর্বদা চোখের সামনে রাখা সহজ নয়। সহজ না হলেও অত্যাবশ্যক। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই পরোৎকর্ষ-সাধন; ধনোৎপাদন ও বণ্টনের সমষ্টীকরণ, শিল্প ও কৃষিকর্মের প্রভূত উন্নতি, সার্বিক প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা—সমস্তই তার উপায় মাত্র। অন্য পক্ষে, এ যাবৎ যে দুটি প্রধান সর্বাধিনায়কী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পরিচয় আমরা পেয়েছি তার মধ্যে ফ্যাশিস্ট প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ একটি জাতিকে পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সর্ববিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিপন্ন করা, এবং কম্যুনিস্ট প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পণ্যোৎপাদনের অভাবনীয় প্রসার, প্রাকৃত শক্তিকে জয় করে মানুষের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগানো। মার্ক্সীয় দর্শনের একজন আধুনিক অধিবক্তার ভাষায়,
"The ever-increasing development of all the productive forces and the resultant improved living standards for all people are at one and the same time the index of social evolution and the rational goal of mankind." (Howard Selsman—*Socialism and Ethics,* p. 112).

কবির এই প্রশ্নটি তুলেও এড়িয়ে গেছেন। বরঞ্চ তাঁর বিবেচনায়
"it would not be proper for the State to raise these questions

(about the increase in the happiness, peace and contentment of the individual), its business is to provide the material conditions which make good life possible." (p. 53)

রাষ্ট্রের 'business' সুষ্ঠু জীবনের জড় উপাদান মজুদ করাই হতে পারে, কিন্তু তার যাবতীয় কর্মের এই লক্ষ্যটি তার চরম লক্ষ্য না উপলক্ষ্যমাত্র এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার স্বরূপ গণতান্ত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে নায়কতান্ত্রিক লক্ষণাক্রান্ত হতে পারে। শুধু পূর্ণ ও মুক্ত জীবনের অর্থনৈতিক উপকরণ পর্যাপ্ত বা প্রচুর করে দিলেই চলবে না (অবশ্য তা না করলেও চলবে না); তেমন জীবনের পথে রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক কিংবা শিক্ষাপদ্ধতিগত বিঘ্ন কোনো দিক থেকে আসছে কি না তার প্রতিও তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চরম উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতাই। এই planning for freedom-এর গণতান্ত্রিক আদর্শকে তুলনা করা যেতে পারে বামপন্থী সর্বাধিনায়কী সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য planning for plenty-র সঙ্গে। ঐ দুই প্রকার প্ল্যানিং পরস্পরনির্ভরশীল হলেও এক নয়। স্বাধীনতার ভক্তরা অবশ্য দারিদ্র্যসমস্যার সমাধান উটপাখীর কায়দায়ই করতে চেয়েছেন বরাবর; এবং নায়কতন্ত্রবাদিরা মাত্র ছ'মাস আগে প্রথম আবিষ্কার করলেন যে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য ঘটাতে গেলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবৃদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। মার্ক্‌স্‌ যদিও সাম্যবাদের চরম উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিলেন:

"That development of human powers which is its own end, the true realm of freedom, which, however, can flourish only upon that realm of necessity as its basis"

কিন্তু এই আন্দোলনের পরবর্তী নেতা ও ভাবুকরা উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে একটি মর্মান্তিক গোলযোগ বাধিয়ে বসলেন। কারও অবিদিত নেই যে সাম্যবাদী পরিকল্পনায় শিল্পসাহিত্য দর্শনবিজ্ঞান অর্থনৈতিক উন্নতির অস্ত্ররূপে গণ্য হয়ে থাকে, ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্তত এ যাবৎ তাই হয়ে এসেছে।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে কবির তার সঙ্গে সকলের, অন্তত অধিকাংশের, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জড়িত করবার কথা বলেছেন। যে-কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের ইচ্ছা ও রুচি স্বভাবতই এত বিচিত্র, বিভিন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী যে সে সমস্তকেই অক্ষুণ্ণ রেখে কোনো একটি সুষ্ঠু প্রয়োগসম্ভব পরিকল্পনায় স্থান দেওয়া যায় না। অথচ মোটামুটি ভাবে, সম্পূর্ণ না হোক প্রায়িক, মতসঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজবাদী পরিকল্পনা কল্পলোকেই বাস করবে। সমস্যাটি অবশ্য গণতন্ত্রেরই সমস্যা। নায়কতন্ত্র তার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছে শাশ্বত ক্ষাত্রধর্মের মধ্যে। তবে তাদের নির্ভর যে কেবল বিধানকর্তার স্থূল সামরিক প্রতাপের উপর এমন নয়। আধুনিক বিজ্ঞান যেসব নূতনতর সূক্ষ্মতর বেসামরিক অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছে সেগুলির ব্যবহারেও তারা সিদ্ধহস্ত। পাঠশালা থেকে উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের চিত্ত এমন মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলে condition করা হয়-যে কোনো বিষয়ে কর্তৃবাক্য উচ্চরণ করতে শুধু যে তাদের সাহসের অভাব ঘটে তা নয়, স্বেচ্ছাচরণের প্রবৃত্তিই তাদের মনে বিনষ্ট হয়ে যায়, বাধ্যতার অভ্যাসকে স্বভাবের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, হুকুম এবং তামিলের মধ্যবর্তী মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বিলুপ্ত হয়ে অবশিষ্ট থাকে কেবল একটি স্নায়বিক ঘাত, একটি বৈদ্যুৎ-রাসায়নিক তরঙ্গ। তা না হলে দুই দশক জুড়ে স্তালিনী ব্যক্তিচর্চার দানবিক পর্ব এমন

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারত না।

পক্ষান্তরে, গণতান্ত্রিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করে মতসাম্যে পৌঁছবার সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি এখনও অনাবিষ্কৃত এবং গবেষণাধীন। সুখের বিষয় যে এই গবেষণার গুরুত্ব গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনীষিরা ইদানীং উপলব্ধি করেছেন।* তাঁদের আশু সাফল্যের উপর গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যদি কোনো পথ তাঁরা দেখাতে না পারেন তবে নায়কতন্ত্রের কাছে গণতন্ত্রের আত্মসমর্পণ অথবা আত্মস্বরূপ-সমর্পণ অবশ্যম্ভাবী।

উনিশ শতাব্দীর উদারপন্থীদের ধারণা ছিল যে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতির আদর্শরূপ হচ্ছে তাই যাতে ব্যক্তির উপর বাইরে থেকে কোনো চাপ পড়ে না, যাতে সমস্ত সামাজিক প্রভাব এড়িয়ে সে নিজের অন্তরের গভীরেই খুঁজে পাবে তার পূর্ণতার আদর্শ এবং সে পূর্ণতা-বিকাশের স্বকীয় রীতিনীতি। কিন্তু এ একেবারে অসম্ভব। সমাজের প্রভাব ব্যক্তির উপর পড়েই, শুধু তাই নয়, সে প্রভাবের মধ্যেই তার ব্যক্তিস্বরূপ ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে। মানুষের মন তো আকাশ থেকে নেবে আসে না, আপন পরিণত রূপ নিয়ে মায়ের পেট থেকেও জন্মায় না। পরিবারের, শিক্ষকমণ্ডলীর, বন্ধুবান্ধবদের, সহকর্মীদের, বৃহত্তর সমাজের এবং পূর্বপুরুষাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় আদান-প্রদানের ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে ব্যক্তিচরিত্রের রূপ ও রেখা ফুটে ওঠে—যদিও তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপটি অনন্য, সমাজের ছাপমাত্র বা সামাজিক প্রবাহের বুদ্বুদমাত্র নয়। সামাজিক প্রভাবকে কতক পরিমাণে কাটিয়ে উঠবার, কতকাংশে বর্জন করবার শক্তিও ব্যক্তির আছে। কিন্তু সমাজের প্রভাব থেকে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করা বা রাখার প্রস্তাবকে কবিকল্পনা বলবার মানে এই নয় যে সর্বাধিনায়কী রাজনীতির উল্টো চেষ্টাকে আমরা সমর্থন করব, চাইব একটি পূর্বকল্পিত ছকে ফেলে প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত স্বরূপটি গড়ে তুলতে। এটা সম্ভব হলেও ভয়াবহ। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাম্য হচ্ছে একটি মধ্যপন্থার সন্ধান, যাতে ব্যক্তি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীনও নয়, সম্পূর্ণ অতীতও নয়। তাদের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বিভিন্ন ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সৌসামঞ্জস্য স্থাপন করার চেষ্টা, এবং তাদের স্বাতন্ত্র্যকে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ বলে ধিক্কৃত ও বিলুপ্ত করে সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করার সংকল্পের মধ্যে প্রভেদ অপরিমেয়।

মানুষ অভ্যাসের দাস, শৈশবকাল থেকে যেসব শিক্ষা-দীক্ষা উপদেশ-অনুশাসন সে পেয়ে আসছে তার আচার-ব্যবহার অনেকটা সেসবের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যতাভিমানী মানুষের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া খুব সহজ নয়। স্বকীয় আদর্শে, স্বকীয় রুচি অনুসারে সম্পূর্ণ নিজের মত করে আচরণ করতেও শিখতে হয়, শিক্ষাচালিত না হওয়ার জন্যেও এক-রকমের উল্টোশিক্ষার প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সমাজ এই দুই প্রকার শিক্ষাকেই মূল্যবান জ্ঞান করে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে ঠিক নিজের মত হতে শেখায়, পাঁচজনের মত হতেও শেখায়; তার ব্যক্তিস্বরূপের স্বতস্ফূর্ত বিকাশের পথেও তাকে এগিয়ে দেয়, আবার তার ব্যক্তিসত্তায় সমাজস্বরূপকে আত্তীকৃত করতেও সহায়তা করে। ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা ততক্ষণই মূল্যবান যতক্ষণ সে অপর কোনো ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততাকে আঘাত না করে, এবং ব্যক্তির সমাজীকরণ—যাকে তার সভ্যতাও বলা যেতে পারে—ততক্ষণই শুভ যতক্ষণ সভ্যতার মুখোশ তার ব্যক্তি-স্বরূপকে কুণ্ঠিত বিকৃত বা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত না করে ফেলে।

---

* পাঁচ বছর পূর্বে প্রকাশিত Mannheim-এর *Freedom, Power and Democratic Planning*-কে এই গবেষণার একটি প্রধান স্তম্ভ মনে করা যেতে পারে।

চলচ্চিত্র

চলাচল— অসিত সেন।

অমিট্ ভালবাসল লাবণ্যকে, কিন্তু বিয়ে করল কেটিকে। একদিকে রোমান্স, আরেকদিকে গার্হস্থ্যাশ্রম। ঘড়ার জলে রান্না চলবে, দীঘিতে সাঁতার দেবে মন। পরে কী হল সেকথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। বললেই বিপদ। লাবণ্যকে ভালবাসা নিয়ে কেটির মন অনবরত খচখচ করবে, আর লাবণ্যকে না পাওয়ার ক্ষোভে অমিট্ শান্তি পাবে না। রোমান্সের দীর্ঘ উত্তাপে বাষ্প হয়ে যাবে, গৃহস্থালীর ঘড়া যাবে ভেঙে। সাধুজনেরা বলে থাকেন কামই প্রেম, প্রেমই কাম; বিজ্ঞানীরা বলেন জৈব ও সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যেই প্রেম বিধৃত। তাই "শেষের কবিতা"র শেষ এত অবাস্তব। যেখানে গোড়ায় গলদ সেখানে শেষেই তা সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পায়।

তবু "শেষের কবিতা" পড়তে পারি, এমন কি 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'-ও "শেষের কবিতা" পড়া হবে। যে পড়বে সে কিছু আনন্দ পাবে। বুদ্ধদেব বসুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঠাট্টা মনে করে যে আমোদ পেতে পারে তা ছাড়াও সাহিত্যিক আমোদ পাবে। সেটা হচ্ছে স্টাইলের আমোদ। রীতির রহস্যে যে আমোদ পাওয়া যায় সেটা গল্পের মোচড়ে নয়, কলমের আঁচড়ে। নিছক লেখার জোরে যা খুশী চালিয়ে দেওয়ার এক নিদর্শন "শেষের কবিতা"। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য লেখকের হাতে পড়লে "শেষের কবিতা" পড়ার উপযুক্ত হত কিনা সবিশেষ সন্দেহ। এ ব্যাপারে অযথা গুরুত্ব আরোপ না করেও বলা চলে যে বাজারে "শেষের কবিতা" নামে যে ছবিটি বেরিয়েছিল, গল্প না বদলালেও তা "শেষের কবিতা" হতে পারত না, কারণ তাতে স্টাইল ছিল না, ছিল কাঁচা হাতের হিজিবিজি।

শুধু স্টাইলের জোরে ছবি তৈরী করতে পারেন এমন প্রতিভাধারী পরিচালক আমাদের দেশে কেউ আছেন কিনা জানি না। সত্যজিৎ রায় যদি কখনো বাজে গল্প নিয়ে কসরৎ করেন তাহলে তার ফলাফলের প্রতীক্ষা করব।

এইজন্য 'চলাচল' দেখেও আমার একটি চিরাচরিত ধারণা বিসর্জন দিতে পারলাম না। সেটি হচ্ছে এই যে কেবল ছবি তৈরীর ছলাকলার দিক থেকে দেখলে গল্প কিছু নয়, গল্প বলাটাই সব। প্রথমে মনে হয়েছিল যে এবার এ-ধারণা ছেড়ে দিতে হবে, কারণ 'চলাচলের' মত গল্প একেবারেই অচল। পরে ভেবে দেখলাম আমার আগের ধারণাই ঠিক, প্রশ্ন কেবল প্রতিভার তারতম্যের। হয়'ত রবীন্দ্রনাথ 'চলাচলে'র গল্পকেও স্টাইলের জোরে পড়বার মত করে তুলতে পারতেন।

এককালে বাংলাদেশে যক্ষ্মা, প্রেম ও সাহিত্যের মধ্যে খানিকটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। যক্ষ্মাকে তখন অনেকেই বিভীষিকা বলে দেখেনি, প্রেমের প্রথম সোপান বলে মনে করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অতসীমামী" কতকালের কথা। যুদ্ধের দুর্ভিক্ষের ধাক্কা খেয়ে বাংলা সাহিত্য সাবালক হয়ে গেছে, আজ আর কেউ যক্ষ্মারোগীর প্রেম নিয়ে গল্প লিখতে বিশেষ সাহস পান না। লিখলেও তাতে রোমান্সের আমেজ থাকা প্রায় অসম্ভব। কোনো রুগীর প্রেমই যে খুব স্বাস্থ্যকর নয়, জীবনের অনুকূল নয় একথা কিছু সাবালকত্ব এলে বোঝা কঠিন থাকে না। এটা অবশ্য সাহিত্যের কথা বলছি। ডাক্তারেরা "অতসীমামী"-র যুগেও নিশ্চই রাজযক্ষ্মা আর রোমান্স-রোমাঞ্চ একপদে ভাবেননি। এক্স-রে প্লেটে অনেক ফুটো ফুসফুস দেখে আর অনেকের শরীরকে চুলচেরা করে নিশ্চই স্বাস্থ্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধা জন্মায়। অথচ অসিত সেনে-এর মধ্যে কিছু ক্ষমতা আছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু ক্যামেরার কাজে নয়, কোথাও কোথাও চিত্রনাট্যের ও পরিচালনার মধ্যেও সে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে। সিনেমা আর সাহিত্য যে এক জিনিস নয় তা তিনি ধরতে পেরেছেন, তাই মাঝে মাঝে তাঁর কাজে বিশুদ্ধ সিনেমার খোঁজ পাওয়া যায়। যেমন অবিনাশ-এর মৃত্যুর দৃশ্য থেকে শুরু করে মণ্টুর এসে বৌদিকে খবর দেওয়া পর্যন্ত। একটি জোরালো রেখার মতো ঘটনা এখানে এগিয়ে গেছে। তা ছাড়া detail-এর ব্যবহারে মুন্সীয়ানা আছে, বাস্তব দৃশ্য তৈরীর ক্ষমতা আছে। রেল লাইনের ধারে অবিনাশের বাড়ীখানা জীবন্ত। বহির্দৃশ্যের আরো অনেক ঘটনা মনে রাখার মত। কলেজের ক্লাস, করিডরে

কথাবার্তা, হাসপাতালের অপরেশনের দৃশ্য রচনায় একটা বিশ্বাস্য ভাব আছে। ঘটনা ও সংলাপ যেখানে স্বাভাবিক সেখানেই অভিনয় ভাল, যেখানে ধরা ধরা গলায় ঘাড় কাত করে আদর্শবাদ সেখানে তাকে আর কে রক্ষা করতে পারে!

মোট কথা একটা অবিশ্বাস্য রকমের অবাস্তব, অতিরিক্ত ঘটনাবহুল এলোমেলো মথা-ঘোরানো গল্পকে নিয়ে বেশ আধুনিক বাস্তব চলচ্চিত্রধর্মী টেকনিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।

নির্মলকুমারের একটি চোখের ওপরের পাতা একটু ঝুলে পড়া (যেটা villain-এর চরিত্র-সৃষ্টিতে কায়দায় রপ্ত করতে হয়), এদিকে সরমার প্রতি গোড়ার বাবহারও ফাজিল ছোকরার মত, এতে কোনো দার্শনিক ভাবালুতা দেখা যায় না। অথচ সরমা তারই প্রেমের ভারে প্রপীড়িত। সরমার ভালর জন্য সে অন্যের সঙ্গে তার বিবাহ ঘটাল, আদর্শের এর চেয়ে পরাকাষ্ঠা আর কী হতে পারে। জীবনে যদিবা কেউ এমন কাজ করে তবে সে নিশ্চয় গা-ঢাকা দেয়, স্বেচ্ছায় নিজেকে ও প্রেমিকাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সেইখানে ওৎ পেতে থাকে না এবং অনবরত বাড়ীতে আনাগোনা করে না। আর ডাক্তার (তা সে মহিলা হলেও) রুগীকে দেখে পরীক্ষা না করে স্টেথস্কোপ বার করে না। ডাক্তারীর রীতিই এই যে তাতে রুগীর প্রতি বন্ধুত্বটা বাইরের, রোগের সঙ্গে লড়াইটাই আসল। জীবনের রূঢ় বাস্তবতার এত কাছাকাছি তারা আসে যে তাদের আদর্শবোধ (যদি থাকে) কাজে-ই প্রচ্ছন্ন থাকে, কথায় শোনা যায় না, বরঞ্চ কথায় খানিকটা সিনিসিজমই প্রকাশ পায়—এবং সেটাই স্বাভাবিক। পাহাড়ী সান্যাল এবং অরুন্ধতী তা করেন না কারণ তাঁরা আসলে ডাক্তার নন; ডাক্তার চন্দ্র সেই আদ্যিকালের ছাঁচে-ঢালা, ভাবে-ভোলা প্রফেসর, আর সরমা চিরাচরিত বাংলা ছবির ভাবার্দ্র নায়িকা। ডাক্তারীর গোটা ব্যাপারটাই বাইরে থেকে চাপানো, ক্যামেরার কেরামতির আর নতুনত্বের খাতিরে। জরামৃত্যুর মধ্যে বাস করে জীবনের পোড়খেয়ে যে চরিত্র তৈরী হয়, এরা সে জাতের চরিত্রই নয়। অসিত সেন অনেক বিদেশী ছবি দেখেছেন। অন্যদের মত তা থেকে চোরাই মাল আমদানী করেননি, অনেক জিনিস আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন গল্প কী করে তাঁর মনে লাগল এটা ভাববার বিষয়।

আসল কথা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের থেকে বাংলা চলচ্চিত্র অনেক পিছিয়ে আছে, তাই বিশবছর আগে যা সাহিত্যে চলেছে তা আজকের চলচ্চিত্রে দেখি। বাংলা ছবিতে এখন "অতসী-মামী"র যুগ হতে কোনো বাধা নেই। নিছক্ টেকনিক অনেকটা বাইরে থেকে শেখা যায়, কোনো উপলব্ধিকে বাদ দিয়েই। কিন্তু টেকনিক আর স্টাইল এক জিনিস নয়। মন আর মেজাজের মধ্যদিয়েই স্টাইল জন্ম নেয়, আর টেকনিক একটা যান্ত্রিক বুদ্ধিগত ব্যাপার। অসিত সেন চলচ্চিত্রের টেকনিককে অনেকটা ধরে ফেলেছেন। কিন্তু মন-মেজাজের ঘরে ফাঁক, সেজন্যেই সেখানে তাঁকে বাংলা ছবির সাবেকী কাঁচা সাহিত্যের মনোভাবে আশ্রয় নিতে হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পই ভাবের ব্যাপারে এক, কিন্তু রূপের ব্যাপারে আলাদা। দুটোই সমান জরুরী। প্রত্যেক শিল্পকে যেমন তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তেমনি সব শিল্পের যে সংবেদন তাকেও প্রকাশ করতে হবে। এই দুয়ের সংযোগেই তার সার্থকতা। অন্য শিল্পের থেকে চলচ্চিত্রের পার্থক্যের দিকটা যেমন জরুরী, মিলের দিকটাও তেমনি। অসিত সেনের ছবিতে পার্থক্যের দিকটা কিছু কিছু দেখা যায়, মিলের ঘর শূণ্য। তাই তার সাহিত্য-ভাব কাঁচা।

অন্যান্য শিল্পের রসায়নে চলচ্চিত্র-শিল্পের উৎপত্তি, সেগুলি মন্থন করেই চলচ্চিত্রের চাবি-কাঠির সন্ধান মেলে। আজকের অন্যান্য শিল্পের মান যে স্তরে উঠেছে, সে স্তরে না পোঁছে কেবল যান্ত্রিক আঙ্গিক দিয়ে চলচ্চিত্রের সার্থকতার ভরসা নেই। তাই বাংলা ছবির অচলায়তন ভেঙেছে 'পথের পাচালী'; আর 'চলাচল'-এর আসল বাসা তার ভেতরেই।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

আধুনিক সাহিত্য

আধুনিক প্রেমের কবিতা

অপর লেখকের রচনা-সঙ্কলন একপ্রকার সাহিত্য সমালোচনা বৈকি! রচনা নির্বাচনে কোন কোন সঙ্কলনকর্তা এমন পরিচ্ছন্ন ও প্রশিক্ষিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন, এমন নিঃসংশয়ে তাঁদের সঙ্কলন অপর পাঠকের রুচি উন্নয়নের হেতু হয়েছে, যে লক্ষণীয় সমালোচনার সঙ্গে তাঁদের সংকলনকর্ম অনায়াসেই তুলনীয় হতে পারে। ষোল বছর পূর্বে প্রকাশিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" আমাদের সাহিত্যের প্রশংসার্হ সঙ্কলনগ্রন্থ, আর সে-গ্রন্থের যুগ্ম সম্পাদকের একজন ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। অতএব আইয়ুব মহাশয়ের সম্পাদনায় "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা" নামক যে সঙ্কলন-গ্রন্থখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে--সিগনেট প্রেসের সুরুচিবান প্রকাশন আনুকূল্যে -সে-গ্রন্থ সম্বন্ধে কাব্যানুরাগী মাত্রেই নিশ্চয় উৎসাহিত ও উৎসুক বোধ করবেন।

উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের দ্বিতীয় কারণও আছে। আইয়ুব মহাশয় তাঁর প্রথম সঙ্কলন-গ্রন্থের ভূমিকার শেষাংশে লিখেছিলেন :

> "তিনি (বুদ্ধদেব বসু) যে এখনো প্রেমের কবিতা লিখছেন এটা সৌভাগ্য বলেই গণ্য করি। বিষ্ণু দে'র সতর্কবাণী সত্ত্বেও যে 'প্রেমে পতন ছাড়া আর কিছুই নেই', আশা করি আমরা এখনও প্রেমে পড়ে থাকি। অথচ ঐ কথাটা উল্লেখ করতে আধুনিক কবিরা ঘৃণা বোধ করেন, যদি না ব্যঙ্গের গরজ থাকে। অবশ্য যে-সাহিত্য 'সখি, কী পুছসি অনুভব মোয়', 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিলু', 'হে নিরুপমা', 'বোলো, তারে বোলো', কিম্বা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য অনবদ্য গানে সমৃদ্ধ, সে-সাহিত্যে প্রেমের কবিতার অকুলান আছে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তাই বলে কি ঐ শব্দটা কাব্য সাহিত্য থেকে আজ একেবারেই নির্বাসিত হয়ে যাবে, সব জিনিষের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যখন আমরা বিশ্বাসী, তখন কেমন করে বলতে পারি যে মানুষের প্রেম বৃত্তিটাই যুগে যুগে অবিকল থাকে। নতুন কবিরা যদি নতুন করে প্রেমের কবিতা না লেখেন তাহলে আমাদের মনের কথা মনেই থেকে যায়, প্রকাশের আনন্দ পায় কেমন করে?"

এ-ভূমিকা লেখার ষোল বছর পরে আজ যখন আইয়ুব মহাশয় বিগত পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতার সঙ্কলন সর্বজন সমক্ষে উপস্থিত করেছেন, তখন স্বতঃই অনুমান হয় যে তাঁর মতে নতুন কবিরা নতুন করে প্রেমের কবিতা লিখেছেন ও লিখছেন আর সে কবিতাগুলি কাব্যবিচারে সার্থক। যিনি ষোল বছর পূর্বে নতুন কবি রচিত প্রেমের নতুন কাব্যের প্রত্যাশায় ছিলেন, তাঁর সংস্কৃতিবান প্রত্যাশা কী পরিমাণে আজ পরিতৃপ্ত হয়েছে সে-বিষয়ে আমি অন্তত উৎসুক বোধ করেছি।

যে কোন কাব্য-সঙ্কলনের নির্বাচন নির্ভর করে সঙ্কলনকর্তার নিজস্ব রুচির উপরে। যেহেতু রসানুভূতি চরম বিচারে অনুভবকারীর রুচিসাপেক্ষ, আর রুচি ব্যক্তিস্বরূপের, personality-র, অচ্ছেদ্য অংশ, সেহেতু আমার নির্বাচন আমার অনন্য রুচির প্রতিবিম্ব,

আপনার নির্বাচন আপনার রুচির। যে-কাব্য কালপ্রবাহে ধৌত হয়ে, সুধীজনীন ঐকমত্য (আইয়ুব মহাশয়ের উক্তির অনুসরণ করছি) লাভ করেনি, সে-কাব্য সম্বন্ধে রুচিবৈষম্য তো প্রবল হবেই। বিচক্ষণ ম্যাথিউ আর্নল্ড এ-কারণে তাঁর "স্টাডি অব পোইট্রি" প্রবন্ধে সমসাময়িক কাব্যের অগ্নিসংকুল ক্ষেত্র সাবধানে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সমসাময়িক কাব্য-বিচারের দুঃসাহসিকতা সম্বন্ধে আইয়ুব মহাশয় খুবই সচেতন—তাঁর "পূর্বলেখ" (শব্দটি কি এস্থলে সুখপ্রযুক্ত হয়েছে?) দ্রষ্টব্য। কোনো সহৃদয় শিষ্ট সমালোচক নিশ্চয় আশা করবেন না যে তাঁর ও আইয়ুব মহাশয়ের নির্বাচনরুচি হুবহু একপন্থী হবে।

কিন্তু হুবহু ঐকমত্য যদি না-ই বা হল, "সাম্প্রতিক রচনার পরখে অতি নৈকট্যের ফলে" দৃষ্টিভেদ যদিও বা ঘটে, সর্বসম্মতির আশা বা দাবী সংকলনকর্তা যদি না-ই বা রাখেন, তবুও সংকলনকর্তার সামাজিক দায়িত্ব হ্রস্ব বা অন্তর্হিত হয় না। আমার খুশিমতো আমার ঘরে বসে যে সংকলন তৈরী করলাম তার নির্বাচনে আমার অনন্য রুচিই একমাত্র মানদণ্ড। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমি সংকলনটি জনসাধারণ্যে প্রকাশ করলাম, সে-মুহূর্তে আমার রুচি সাধারণ রুচির ব্যাপকতার কাছাকাছি আসতে বাধ্য। যদি আমার রুচিতে ও সাধারণ রুচিতে—সামাজিক রুচির যেটি norm, মানদণ্ড—পার্থক্য বড়ই প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে সংকলন ভূমিকায় সে-পার্থক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া সংগত। সংকলনকর্তা ও পাঠকের মধ্যে একটা সৌজন্যের সম্পর্ক থাকা দরকার।

আমার এ-তর্ক আইয়ুব মহাশয়ের "পূর্বলেখ" ও "কবিতা ও প্রেম" শীর্ষক ভূমিকা-স্বরূপ প্রবন্ধ নিয়ে যতটা, বস্তুত তাঁর নির্বাচন সম্বন্ধে ততটা নয়। আমি সংকলনকর্তা হলে আমার নির্বাচন কিছু ভিন্ন ধরনের অবশ্যই হত, কিন্তু সমালোচক হিসাবে আমি একথা মানব যে আইয়ুব মহাশয়ের নির্বাচন তাঁর সুরুচির পরিচায়ক আর এ-নির্বাচন আমি যাকে সামাজিক রুচির norm বলে জানি তার নিকটবর্তী। নির্বাচন সম্বন্ধে আমার সামান্য যে কয়েকটি আপত্তি আছে এখানে তার উল্লেখ করছি। অন্নদাশংকর রায়ের "ক্রীড়ো" কি "বরণীয় রচনা"? অপরাজিতা দেবীর কাব্যগ্রন্থে "অভিমানিনী"র চেয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা নিশ্চয় পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের "ধান কাটা হয়ে গেছে" কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা বলার মতো কোন পাঠগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আমি তো পাইনি। "হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ" এ-ছত্রটিকে সপ্রেম উক্তি ভাববার কী কারণ থাকতে পারে? অনুরূপ আপত্তি বিষ্ণু দে'র "আলেখ্য (২)" সম্বন্ধে। সুন্দর কবিতা, কিন্তু বিশেষ করে প্রেমের কি? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "বধূ" কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা বললে কি কবির শিল্পৈষণাকে খর্ব করা হয় না? আমার সব চেয়ে বড় আপত্তি রবীন্দ্রনাথের "ভক্ত" কবিতা সম্পর্কে। যে-অবোলা জীবের "অহেতুক প্রেম" লক্ষ্য হওয়াতে "সৃষ্টি মাঝে মানবের সত্য পরিচয়" কবির হৃদয়ংগম হয়, তাকেও যদি প্রেম বলতে হয় তাহলে প্রেমের সংজ্ঞার্থ যায় বদলে। মনুষ্যেতর প্রাণীর সংগে স্নিগ্ধ সম্পর্ক, গাছপালা, চাঁদ নক্ষত্র, এমনকি রাস্তাঘাট সম্বন্ধেও নিবিড় প্রীতি, কেউ কেউ অনুভব করে থাকতে পারেন, করে থাকেনও, কিন্তু সেই প্রীতি ও সম্মোহকে প্রেম নামে অভিহিত করার পূর্বে আইয়ুব মহাশয়ের উচিত ছিল পাঠককে যথাযোগ্য নোটিশ দেওয়া। প্রেম বলতে যদিচ কেউ কেউ একটা দেহোত্তর বিমূর্ত শক্তি বুঝেছেন, যথা,—প্লেটো, স্পেনসার, শেলি—তবুও জগতের অধিক সংখ্যক মানুষ বুঝেছেন নরনারীর যৌন আকর্ষণ। সে-আকর্ষণে সহস্র বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, তার অসংখ্য প্রকারভেদ থাকতে পারে—প্রত্যেক সার্থক প্রেমিকের প্রেমবোধ অনন্য—আসল

কথা সে-আকর্ষণের গোড়ায় যৌনচেতনা, হয়তো বা সুপ্ত হয়তো বা প্রকট, হয়তো বা আদিম অসম্বৃত, হয়তো বা সৌকুমার্যে পরিশীলিত। প্রেমের উৎস যৌনচেতনায়, যদিচ প্রেম (বিশেষত আধুনিক সভ্যতার প্রেম) ও যৌনপ্রবৃত্তি সমার্থক নয়। আইয়ুব মহাশয় এ তথ্য জানেন না এমন কথা বলা অসহ্য ধৃষ্টতা মাত্র এবং যদিও তাঁর ভূমিকার শেষাংশে প্রেমানুভূতি সম্পর্কে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়েছেন, যদিও তার উক্তি আমি অন্তত মেনে নেব যে "প্রেমের সঙ্গে কোনো এক বা একাধিক জৈববৃত্তির সমীকরণ হয় অপবিজ্ঞান নয় অতিবিজ্ঞান", তবুও "প্রেমাস্পদ" ও "প্রিয়া" এই দুটি শব্দের পৌনঃপুনিক উল্লেখে একথাই প্রমাণ হয় যে আইয়ুব মহাশয়ের সংজ্ঞায় নর ও নারীর আকর্ষণেই প্রেমের সত্তা। অতএব প্রেমের কবিতার সংকলনে কুকুরের প্রভুপ্রীতিঘটিত কবিতার অন্তর্ভুক্তি নিতান্তই উদ্ভট খামখেয়াল, আর -আইয়ুব মহাশয় মাফ করবেন—সে-খামখেয়াল হাস্যকরও বটে।

২

পূর্বে বলেছি সংকলনটির কবিতা নির্বাচন আমি মোটের উপরে প্রশংসার্হ মনে করি। তবুও সক্ষোভে বলতে হচ্ছে যে "কবিতা ও প্রেম" শীর্ষক ভূমিকা-স্বরূপ প্রবন্ধটির অনুরূপ প্রশংসা করতে পারছি না। প্রবন্ধটির প্রথম ও দীর্ঘতর অংশে কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু সুষ্ঠু আলোচনা আছে সেটুকু আইয়ুব মহাশয়ের পূর্বতন সংকলনের ভূমিকাতেও পাওয়া যায়, পাওয়া যায় বরং অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষায়। বর্তমান প্রবন্ধটির ভাষা, আমার মনে হল, অস্বচ্ছ, অযথা বক্র, প্রয়াসক্লিষ্ট। ভাষা সব সময় যথাযথ (precise) হয়নি। প্রাসঙ্গিকতার (relevance) অভাবও লক্ষ করেছি। যে কথাগুলি স্বকীয় দায়িত্বে অনায়াসে বলা যেত, কেননা সেগুলি আজ বহুজনবিদিত, সেগুলি স্বকীয় দায়িত্বে বলার মতো আত্মপ্রত্যয় আইয়ুব মহাশয়ের মতো সুধী দর্শনবিদের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি, সে-সব কথার স্বপক্ষে আইয়ুব মহাশয় কেন যে ভূরি ভূরি "অথরিটি" মানতে গেলেন তা বুঝলাম না। মালার্মে, মার্কস্, হেগেল (কান টানলে মাথা আসে), ক্রোচে, কলিংউড, ওয়াইট্‌হেড্ (পূর্বতন সংকলনে দার্শনিকপ্রবরের নাম শুদ্ধমতে উচ্চারণ করার পরে বর্তমান ভূমিকায় আইয়ুব মহাশয় সহসা কি কারণে জার্মান-ঘেঁষা অশুদ্ধ উচ্চারণের পক্ষপাতী হলেন ?), মিড্‌ল্‌টন্ মারি, অবশ্যই এলিয়ট, এবং কাসিরের্ (হ্যাঁ, কাসিরের্, কেননা অধুনা তিনি নবতম)- বড় অথরিটি অনেকেই উপস্থিত। মারিত্যাঁ, স্বোয়াইট্‌সার, কিএরকেগার্ড, উইটগেনস্টাইন- এঁরাও উপস্থিত থাকলে ১৯৫৬ সালের প্রামাণ্য অথরিটির সভা সম্পূর্ণ হত। এত অথরিটির সঙ্গে থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় বিধান, শঙ্করবেদান্ত, অনেকান্ত-বাদ, লজিক্যাল পজিটিভিজ্‌ম্, গ্রীক অনুকরণবাদ ("অনুকার" কেন ?), কলাকৈবল্য, ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ মিলে "পরিস্থিতি" সাধারণ কাব্যামোদীর পক্ষে বড়ই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে কয়েকবারই মনে হয়েছে কত ভালোই না হত যদি আইয়ুব মহাশয় কাব্যস্বরূপ সম্বন্ধে নিষ্ফলা নিঃসিদ্ধান্ত আলোচনায় নিযুক্ত না হয়ে খাঁটি সাহিত্যিক আলোচনায় মনোনিবেশ করতেন—বাংলায় প্রেম-কাব্যের ঐতিহ্য, কাব্যে প্রতিফলিত বঙ্গীয় প্রেমের বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রতিক কাব্যে প্রেমের শিল্পরূপ, এ ধরনের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা। সম্ভবত এ-ধরনের আলোচনায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুযোগ থাকত না কিন্তু ব্যবহারিক বিচক্ষণতার অবকাশ থাকত। সম্ভবত এ-আলোচনা পাঠ্যপুস্তকগন্ধী হয়ে

পড়ত, কিন্তু তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হত না, সে-আলোচনা হত সাবয়ব (concrete), প্রত্যক্ষ, সংকলিত কবিতাগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কশীল।

প্রবন্ধটির অনেকগুলি আপত্তিকর লঘুসূত্র উক্তির মধ্যে অল্প কয়েকটির উল্লেখ করছি : "মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌স্‌-এর ভাষায় তাকে [মানব সম্বিতকে] জড়জগতের মুকুর-বিম্ব বলা **অবশ্য** সোহহংবাদেরই উল্টোপিট, এবং **ভ্রান্তিবিলাসে** দুই-ই তুল্যমূল্য।" (বড় অক্ষর আমার করা)—মার্ক্‌স্‌বাদ ও বেদান্ত দুই-ই লেখক যদি বা চর্বণ করে থাকেন—কোন প্রমাণ পাইনি তার, আর খুব সুসাধ্য নয় সে কাজ—দুটি দার্শনিক মতবাদেই ভ্রান্তি, শুধু ভ্রান্তি নয় ভ্রান্তিবিলাস, আর সে-ভ্রান্তিবিলাসের স্বরূপ উভয় মতবাদে তুল্য, এহেন নির্দ্বিধ উক্তিতে, লেখকের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে নিদারুণ সংশয় জাগে। "আমি অনেকান্তবাদে বিশ্বাসী। **অবশ্য** এই অনেকান্ত সত্যগুলি সকল বিরোধ ও বিচ্ছেদের শেষে **হয়তো** কোনো এক মহা-সত্যে গিয়ে মিলে যায়। কিন্তু সে তো ধর্মবিশ্বাসের কথা, যোগজ প্রত্যক্ষের ব্যাপার। ব্যাপার। আমাদের মুখে সে-কথা শোভা পায় না।"—"অবশ্য" ও "হয়তো"র মর্মান্তিক যোগাযোগ ছেড়েই দিলাম। অনেক সত্য মিলে গিয়ে এক মহাসত্যে মহীয়ান হয়ে উঠতে পারে একথা কেবল ধর্মবিশ্বাসের কথা নয়, মেটাফিজিক্‌সের কথা ঠিক ততটাই যতটা প্লুরালিজ্‌ম্‌--সে-কর্তও ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে-লেখক তাঁর এই বাক্য-গুলির মধ্যে যুক্তিবিরোধিতা লক্ষ করেননি।

"প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকরাই মেনে নিতে পারেননি।" —পরবর্তী কোন্‌ উল্লেখযোগ্য গ্রীক দার্শনিকরা? আরিস্‌টট্‌ল্‌ স্বয়ং অনুকরণবাদের সমর্থক, বস্তুত অনুকরণবাদের সাহায্যেই তিনি প্লেটোর বিখ্যাত কবি-বিরোধের মীমাংসা করেছেন। তাঁর এ-মীমাংসা পরবর্তী কালে গ্রীসে, রোমে, মধ্যযুগীয় খৃষ্টানী শাস্ত্রপীঠে, আরব চিন্তাজগতে ("পোয়েটিক্‌স্‌" গ্রন্থটির জন্য আমরা আরবদের কাছে ঋণী), রেনেসাঁস ইতালীতে, সতেরো আঠারো শতকের ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে, প্রায় অপ্রতিহত প্রাধান্য লাভ করেছিল। আরিস্‌টট্‌ল্‌-পরবর্তী প্লটাইনাস ও ক্রাইসস্‌টম্‌ অনুকরণবাদ অগ্রাহ্য করেননি, অনুকরণবাদের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

অন্যত্র (২১ পৃষ্ঠায়) আইয়ুব মহাশয় ঊনিশ শতকের একটি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করে বলেছেন এ-মতবাদ "সুখবাদী অপব্যাখ্যা", এ-মতে বলা হয় "আমাদের মহত্তম কর্মেরও চূড়ান্ত অভিপ্রায় আত্মতুষ্টি"। অনুমান হয় ওয়াল্টার পেটারের মতবাদ লেখকের স্মৃতিপথে উদিত হয়েছে। পেটারের এই মত আদৌ ব্যাপকগ্রাহ্যতা লাভ করেনি এবং সমগ্র ঊনিশ শতকের মূল দর্শনধারাগুলি—যেগুলির সঙ্গে বেন্‌টাম্‌, মিল, স্যাঁৎ সিম, কোঁৎ, স্পেন্সার, মার্ক্‌স্‌ প্রভৃতি নাম জড়িত—আত্মতুষ্টির বিপরীত পথেই চলেছিল। কলা-সৃষ্টির অপব্যাখ্যাকারী কোন্‌ কোন্‌ সাহিত্যিকের কথা আইয়ুব মহাশয় ভাবছেন জানি না, সম্ভবত বেয়ার্ড্‌স্‌লে-ওয়াইল্‌ড্‌-সিমন্‌স্‌ গোষ্ঠীর কথা, কিন্তু এঁদের তরলচরিত্র উন্মার্গ-প্রবণ আচরণের সঙ্গে পেটারের দর্শন জুড়ে দেওয়াতে না পেটারের প্রতি সুবিচার হয়েছে ("মারিয়াস্‌ দি এপিকিউর" পঠিতব্য) না ওয়াইল্‌ড্‌ গোষ্ঠীর প্রতি। আরো দুর্বিচার হয়েছে "এই সুখবাদী অপব্যাখ্যা"র সঙ্গে ড্রাইডেনের উক্তির আকস্মিক সম্পর্ক স্থাপনে। Dulci ও Mtile এ-দুয়ের সম্পর্ক বিষয়ে শিল্পরসিক মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই অবহিত, ড্রাইডেনের কাল থেকে নয়। Dulci-পন্থীদের "সুখবাদী অপব্যাখ্যা"কারীদের সমগোত্রীয় করায় বড়ই দার্শনিক অনবধানতা প্রকাশ পেয়েছে। অনবধানতাবশত প্রবন্ধকার

আরেকটি মন-গড়া কথা বলেছেন যে সাহিত্যিক সুখবাদীদের "পক্ষে **স্বভাবতঃই** [বড় অক্ষর আমার করা] একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রুদ্র বা করুণ রসাত্মক সাহিত্য, *King Lear, Crime and Punishment*, "শ্যামা" প্রভৃতির মূল্যায়ন।" আশ্চর্য, আশ্চর্য উক্তি! আমার যে সামান্য পড়াশুনো আছে তাতে এমনি ধারণা কখনো হয়নি যে আনন্দমার্গী সাহিত্যিক ("সুখবাদী" কথাটি আমার মনঃপূত হচ্ছে না) উপযোগবাদী সাহিত্যিকের তুলনায় রুদ্র বা করুণ রসাত্মক সাহিত্যের মূল্যায়নে অধিক বিভ্রান্ত। বহু ঐতিহাসিক নজির দেখিয়ে বর্তমান আলোচনা ভারাক্রান্ত করব না, শুধু একটি প্রশ্ন মনে আসছে, শেক্‌স্‌পীয়রের লীয়র সম্বন্ধে নির্বোধ উক্তি করেছিলেন কে, বিশুদ্ধ কলাবাদী ব্র্যাড্‌লি, অথবা নীতিমার্গী টলস্টয়?

৩

এতদূর লেখার পরে মনে হচ্ছে প্রবন্ধটি অসন্তোষপ্রধান হয়ে পড়েছে। অসন্তোষ প্রকাশের জন্য আমি দুঃখিত নই কিন্তু প্রবন্ধে দুর্বিনয় বা ধৃষ্টতা থেকে থাকলে পরিতাপের বিষয় হবে বৈকি! অসন্তোষের কারণ স্বচ্ছ। অনেকের মতো আমি আইয়ুব মহাশয়ের মনস্বিতার অনুরাগী। আলোচ্য কাব্য-সংকলনের সম্পাদনাকর্মে তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিলাম অনেক, বিশেষত যে-ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বতন সম্পাদনার নজির বর্তমান। এ-জন্যেই "কবিতা ও প্রেম" শীর্ষক প্রবন্ধটির বহুমুখীন দুর্বলতা পীড়াদায়ক। আমার ভরসা সংকলনখানির আরো অনেক সংস্করণ হবে আর আইয়ুব মহাশয় তখন বিচার করে দেখবেন প্রবন্ধের লঘুগ্রন্থিগুলিকে দৃঢ় ও ভারসহ করা যায় কিনা।

ভূমিকা-স্বরূপ প্রবন্ধটির মূল্য যা-ই হোক, সংকলনটি মোটের উপরে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতগুলি শিল্পসমৃদ্ধ কবিতা, যার সব কয়টি একই মূল উৎসজাত, একই সংকলনগ্রন্থে আমাদের কাছে পরিবেশন করার জন্য কাব্যানুরাগী পাঠক মাত্রেই আইয়ুব মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

৪

শিল্পজগতের চিরন্তন কিন্তু সীমিত কয়েকটি বিষয়বস্তুর অন্যতম প্রেম। প্রেমের অভিব্যক্তি নেই এমন কোন শিল্পরূপ নেই। প্রেমের অভিব্যক্তি নেই এমন কোন সাহিত্য আছে বলে আমি জানি না। কাব্যে হৃদয়াবেগের প্রকাশ, আর প্রেমানুভূতিতে হৃদয়াবেগ পরিস্ফুট। সে-কারণে লিরিক কাব্য প্রেমপ্রবল, অন্যান্য প্রকার কাব্যেও প্রেমের উপস্থিতি অল্পবিস্তর অবধারিত। মানুষের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অসংখ্য কোটি নরনারীর হৃদয় যে-প্রেমানুভূতিতে উদ্বেল হয়েছে, কাব্যে ও অন্যান্য শিল্পে সে-প্রেমানুভূতির যতটুকু প্রকাশ আমাদের আয়ত্তসাধ্য, সে-প্রেমানুভূতির কয়েকটি মূলরূপ (type) আমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারি। প্রেমোপলব্ধির বিস্ময়, হর্ষ, উন্মাদনা, ব্যাকুলতা, তার মিলন, বিরহ, তার সম্ভোগ, তার বিক্ষোভ, প্রেমিকের অভিমান, অভিসার, সঙ্কোচ, শঙ্কা, প্রেমের আরো কতনা সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য, কোন না কোন সজ্জায় সর্বদেশের সাহিত্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের জাতিভেদ নেই, দেশভেদ নেই, প্রেম কালসীমিত নয়। প্রেমের আবরণ মানবিক। প্রবৃত্তির

যে-অবিচ্ছেদ্য কারাগারে মানুষকে নির্মম বিধাতা বন্দী করেছেন, যৌনলিপ্সার সে-কারাগার থেকে মুক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকেই বলি প্রেম নামক সভ্য চিত্তবৃত্তি। অন্যান্য আরো কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে মার্জিত তদনুরূপ চিত্তবৃত্তিগুলির যে সম্পর্ক, প্রেম ও তার মূল যৌনবোধে সে-সম্পর্কই বিদ্যমান। মূলকে ভুলে যাওয়া তেমনই অবাস্তব যেমন মূলেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা। শিকড় ছাড়া গোলাপ ফোটে না কিন্তু গোলাপ শিকড়ও নয়। প্রেমে যৌনচেতনার পরম রূপান্তর। যদি এ-রূপান্তরের কৃতিত্ব দিই মানুষকে তাহলে—বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে—বিনা দ্বিধায় বলব, স্রষ্টার চেয়ে অধিক সৃষ্ট-র মাহাত্ম্য।

প্রেমের সৌকুমার্যে সভ্যতার মানদণ্ড। প্রেম দেশকালোত্তর, বিশ্বজনীন। প্রেমে প্রেমিক আপন মানবিকতা পরিস্ফুটরূপে উপলব্ধি করেন। সার্থক প্রেমে মানুষের মহত্ত্বলাভ হয়, আর সে জন্যই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির এষণা যখন মানবোত্তর চিত্তবৃত্তিতে পরিশোধিত হয় তখনই তাকে বলি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি। তুলসীদাসের কাহিনী, ইংরেজ কবি ডান্-এর কবিকর্ম, বস্তুত বহু যৌনপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম সংক্রান্ত কবিতায় তুলনাত্মক আলোচনা থেকে অনুমান হয় যে নারীপ্রেমের sublimation-এ ঈশ্বরপ্রেম।

প্রেমের এই সংক্ষিপ্ত স্বরূপচিন্তন থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। যদি লক্ষ রাখি প্রেমের গূঢ় আবেগের প্রতি, তাহলে সে-আবেগের প্রকাশ যে-কোন ভাষায় যে-কোন কালে সমতুল্য। যে ইহুদী যুবতী একদা By the Waters of Babylon অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন তাঁর সমগোত্রীয়া তরুণী পরবর্তীকালে অন্য দেশেও চিত্তবৈকল্য বোধ করেছিলেন। "মৈমনসিংহ-গীতিকা"-র প্রণয়িনীতে ও ইংরেজি ব্যালাড-কাব্যের প্রেমিকায় কোন দুস্তর ব্যবধান নেই। বিদ্যাসুন্দর ও অভিড্, দাশু রায় ও ভিক্টরীয় স্ট্রীট সিংগারস্, পেত্রার্ক ও কোন কোন বৈষ্ণব কবি, তুল্যভাবে প্রকাশ করেছেন প্রেমের বেদনা ও আনন্দ।

কিন্তু বিশ্বজনীনতা প্রেমের শিল্পরূপের সবখানি কথা নয়। প্রেমের গূঢ় স্বরূপ দেশকালোত্তর বিশ্বজনীন বটে, কিন্তু যেহেতু প্রেম প্রেমিকেরই চিত্তবৃত্তি, আর প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি ও চরিত্র তদীয় আবেষ্টনীর সঙ্গে জড়িত, সেজন্য প্রেমের বহিঃপ্রকাশে দেশকাল-প্রভাব, অনন্যতা, অতুলনীয়তা বিদ্যমান। অভিড্ ও ভারতচন্দ্রে মৌল প্রেরণা তুল্য, অথচ সে-প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ একক্ষেত্রে আঠারো শতকী বঙ্গীয়তায় ও অপরক্ষেত্রে রোমান চারিত্র-ধারায় সুরভিত। বস্তুত প্রেমের কাব্যে তিনটি ভাবস্তরের সংযোজনা লক্ষণীয়। স্তরগুলি পৃথক ও স্বসম্পূর্ণ নয়, বরঞ্চ তারা বিস্ময়কর ও প্রায়-অবিশ্লেষণীয় উপায়ে নিয়ত একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। সতর্ক ও সংবেদনশীল পাঠক প্রেমের কাব্যে আবিষ্কার করবেন প্রেমের ঐকান্তিক অনন্যতা—যা কেবলমাত্র ঐ বিশেষ প্রেমবিষয়ক কাব্যেই উপস্থিত: প্রেমের দেশকালধর্মিতা—যা ঐ কাব্যের জড়জাগতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবধন্য; প্রেমের বিশ্বজনীনতা যার গূঢ় মৌলচেতনা দেশকালোত্তর, যা ব্যক্তির ও সসীমের ওপারে ভূমার বিশালতায় নিবেদিত। এ তিন স্তরের মায়াবী মিশ্রণ সে-পাঠকের লক্ষীভূত হবে যিনি বাংলা প্রেমের কাব্য সবিস্তারে ও নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করবেন।

আশা ছিল আইয়ুব মহাশয়ের সম্পাদকীয় রচনায় বাংলা প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অন্তত কিছু ইশারা পাব। সে-ঐতিহ্যের জ্ঞান না থাকলে আলোচ্য সঙ্কলনের কবিতাগুলির মূল্যায়ন দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে। আইয়ুব মহাশয় আমাদের সে-আশা পূর্ণ করেননি। ক্ষোভের বিষয়। ক্ষোভের বিষয় কেননা বর্তমান সম্পাদনাকার্যে এমন কোন প্রমাণ পেলাম

না যাতে বলতে পারি যে যে-পরিমাণে সম্পাদকের রুচি প্রশংসনীয় তাঁর সমালোচনা-কুশলতা সে-পরিমাণেই আদরণীয়। বিষয়নিষ্ঠ সংকলনগ্রন্থের ভূমিকা লেখার সুন্দর নমুনা আইয়ুব মহাশয় পেতে পারতেন লর্ড ডেভিড সেসিল সম্পাদিত "অক্সফোর্ড বুক অব্ ক্রিশ্চিয়ান্ ভর্সে"। যে-কর্তব্য আইয়ুব মহাশয় অসম্পূর্ণ রেখেছেন তার দায়িত্ব আমার এ-আলোচনার প্রচলিত বৃত্তসীমা ছাড়িয়ে গেছে। আশা রাখছি আইয়ুব মহাশয়ের ও আমার চেয়ে অধিকতর সুধী, অধিকতর কর্তব্যনিষ্ঠ কাব্যালোচকের কাছে আমরা কোনদিন পাব প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা। বর্তমানে সে-বিষয়ে সামান্য দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করেই আমি ক্ষান্ত থাকব, মন্তব্যগুলি এম্পিরিক্যাল উক্তি মাত্র, কৃতসংকল্প গবেষণার অবধারিত সিদ্ধান্ত নয়। মনে হয় বাঙালী চিত্ত প্রেমানুভূতির সহজ ও উর্বর ক্ষেত্র। প্রাক্-বৈষ্ণব যুগে দেশে প্রেমকাব্য কি পরিমাণে চল্‌তি ছিল জানি না, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু নরনারীর প্রেমবিষয়ক কাব্যের উদাহরণ দেশী ও বিদেশী অন্য অনেক কাব্যেই যথা হিন্দী, ইংরেজি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে নিতান্ত বিরল। সংস্কৃত কাব্যে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ডাঃ নীহার রায় মহাশয়ের ইতিহাসগ্রন্থের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালী জীবনের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে এমন অনুমান সংগ্রহ অসংগত হবে না যে সে-সব যুগে বাঙালীজীবন ছিল প্রেমানুভূতির অনুকূলে, আর হয়তো সে-অনুভূতি বাঙালীর তৎকালীন সাহিত্যে, বিশেষত গানে, প্রকাশ পেয়েছিল যদিচ সে-সাহিত্য আজ অবলুপ্ত, বিস্মৃত। বৌদ্ধ প্রভাবে সামাজিক জীবন ছিল অনেকাংশে ডেমোক্র্যাটিক। শ্রেণীবৈষম্য উগ্র, এমনকি প্রকট, ছিল বলে মনে হয় না। নরনারীর স্বচ্ছন্দ মেলামেশায়—অন্ততপক্ষে গ্রামাঞ্চলে, অর্থাৎ দেশের প্রায় সর্বত্রই—তেমন কোন বাধা ছিল না। যে-অসংখ্য অন্তর্নিষেধে (inhibition) বর্তমান সমাজ অহর্নিশি দ্বিধাবিভক্ত, তার নিষ্পেষণে মানুষের চিত্তবৃত্তিগুলি (বিশেষত, নরনারীর সামাজিক সম্পর্কসংশ্লিষ্ট চিত্তবৃত্তিগুলি) স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য হারায়নি। কৃষিকর্মে, নৌকর্মে, গ্রাম্য সমাজের বহু বৃত্তিতেই নর ও নারী কাজ করত সমতালে, তাদের মেলামেশায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল কমই। অনুমান করতে পারি সেকালে প্রেমের নিগড়ে আবদ্ধ হত বহু তরুণ তরুণী, অনেকে হয়তো গান বাঁধত, পালাগান অথবা গীত, আর সে-গানের মাধ্যমে প্রকাশ করত আপন প্রেমানুভূতি। আরো অনুমান হয় সে-প্রেম ছিল ঘরোয়া প্রেম, সাধারণ মানুষ মানুষীর প্রেম। কোনো উত্তুঙ্গ amor intellectualis dei নয়, যে-নির্বস্তুক প্রেমের ধারণায় চিত্তবৃত্তি চলে যায় জড়জগতের অতীত কোন মনোনির্ভর রাজ্যে সে-প্রেম নয়, বরঞ্চ প্রত্যক্ষ প্রিয় বা প্রিয়ার সদেহী প্রেমই অনুক্ষণ যে-প্রেমের কাম্য, যে প্রেম "বিবাহের চেয়ে বড়ো" নয় বরঞ্চ বিবাহে ও গার্হস্থ্যধর্মে আবিষ্কার করে প্রেমের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক পরিণতি, যে-প্রেম প্রিয়তম বা প্রিয়তমার সঙ্গে সুখনীড় রচনার কল্পনায় বর্ণাঢ্য, সেই কখনো সলজ্জ সঙ্কুচিত ভীরু মৃদুবাক্, কখনো উচ্ছ্বসিত বলিষ্ঠ কথনবিলাসী প্রেম সে-কালের বাংলা সমাজে অজ্ঞাত ছিল এমন অনুমান হয় না কেননা সে-প্রেমের রেশ বাজে বৈষ্ণবোত্তর প্রেমকাব্যে, পল্লীকাব্যে, আজ অবধি। সেকালের প্রেমকাব্যের উদাহরণ যদিচ সাহিত্যের ইতিহাসে পাই না, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি সেকালের সামাজিক ইতিহাস ও আধুনিক কাব্য-প্রকৃতির তুলনাত্মক আলোচনায়।

এই ঘরোয়া প্রেমের সঙ্গে অবশ্য অনেক সময় মিশেছে sophisticated নাগরিক প্রেম। সংস্কৃত প্রেমকাব্যের প্রভাব নিশ্চয় সেকালেও আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করেছিল। কালক্রমে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে (অন্যান্য অনেক সাহিত্যের বেলায়ও তাই)

দেখা দিল শ্রেণীচেতনাজনিত এক দ্বৈততা, সাহিত্যের ও লোকসাহিত্যের, বর্ণসাহিত্যের ও নির্বর্ণসাহিত্যের, দ্বৈততা। রবীন্দ্রনাথে ও ভাটিয়ালির অখ্যাতনামা রচয়িতায় যে-পার্থক্য সে-পার্থক্যই বর্তমান সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে। যাকে বলি সাহিত্য, নানা কারণে তা নাগর সভ্যতায় গ্রাহ্য ও লিপিবন্ধ হয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে এসেছে আমাদের কাছে, ইতিহাসে তার স্থান নির্দেশিত। যাকে বলি লোকসাহিত্য তা জন্ম নিয়েছে, বেড়ে উঠেছে, শক্তি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে দূরে, তা প্রচলিত হয়েছে লোকমুখ থেকে লোকমুখে কিন্তু অধিক স্থলেই তা লিপিবন্ধ হয়নি কেননা কবিগণ ও শ্রোতাগণ লেখনব্যাপারে ছিলেন সমান রকমে অপারগ। কালের কৃষ্ণচ্ছায়া থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত এই লোকসাহিত্যের যে-সামান্য অংশ আমাদের কাল অবধি পৌঁছেছে তা থেকে প্রাচীন প্রেমকাব্যের ধারা সম্বন্ধে কিছু আনুমানিক ধারণা করা সম্ভব। সে-প্রেমের ধারা স্নিগ্ধ, নম্র, অনুগ্র, সে-প্রেম বাংলার গ্রামীণ জীবনের পরিবেশের সঙ্গে একান্তে মিশ্রিত, যে-পরিবেশ এক হিসাবে বড়ই অবিচিত্র অথচ বাঙালীর পক্ষে যার আকর্ষণ ও নবত্ব নিরবশেষ, সে-প্রেম ঘর বাঁধার অভিলাষী, ঘর ভাঙে না; সে-প্রেম বিরহ, ব্যর্থতা বিনাশ নিয়ে আসতে পারে কিন্তু আত্মায় জ্বালা ধরায় না। এ-প্রেমের আভাস পাওয়া যায় মৈমনসিংহ গীতিকায়, কোন কোন মঙ্গলকাব্যে, ঠাকুরমা ঠাকুরদার গল্পে।

প্রেমের অভিব্যক্তি সাধারণ লোকচিত্তে যেমন হয়েছিল, সমাজের উচ্চস্তরের সংস্কৃত-চিত্তে তেমনটি হয়নি বলেই মনে হয়, যখন লোকসাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব-কাব্যের তুলনা করি। লোককাব্যের প্রেম দেহ-সমুখ কিন্তু দেহ-সর্বস্ব ছিল না, কিন্তু যেটুকু দেহচেতনা লোককাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, মনে হয় মার্জিতকাব্যে সেটুকু প্রকাশ সম্বন্ধেও কবিরা কোন প্রকার নিষেধ সচরাচর বোধ করতেন। ব্যক্তিগত প্রেম প্রকাশ সম্বন্ধে যেন একটা খুঁতখুঁতি, একটা বাধা বোধ করতেন মার্জিত কবি। এই নিষেধজ্ঞান কোন সামাজিক কারণে অথবা ধর্মীয় কারণে নিহিত কিনা, অথবা তদানীন্তন নন্দনচেতনার সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল কিনা বলা আমার সাধ্য নয় কিন্তু মনে হয় এরকম কোন নিষেধজ্ঞানের বশবর্তী হয়েই ষোল শতক ও তৎপরবর্তী কালের অগণিত কবি সরাসরি ব্যক্তিগত প্রেমকাব্য রচনায় নিযুক্ত না হয়ে আপন প্রেমানুভূতি প্রকাশের জন্য অবলম্বন করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান। কৃষ্ণ-ভক্তি অবশ্য হিন্দুধর্মের গভীর ও ব্যাপক তত্ত্ব। সে-তত্ত্বের আধ্যাত্মিক সংকেত ও ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে, হিন্দী সাহিত্যে, বাংলাতেও। এ-কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ পাওয়া যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনে, আর এ-ও লক্ষ করি যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাব্য ছাড়া যেন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রেমকাব্য তখনকার দিনে মার্জিত সাহিত্যে ছিল না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম মার্জিত সাহিত্য থেকে উপচে পড়েছিল লোকসাহিত্যেও। বাঁশি বাজানো কালিয়ার মোহ নিয়ে গান বেঁধেছিল অনেক অজ্ঞাতনামা কবি—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। অনুমান হয় যে বৈষ্ণবকাব্যে ধর্মীয় তত্ত্বটা সব সময়ে কবির কাছে (পাঠকের কাছেও) সে-পরিমাণে মুখ্য ছিল না যে-পরিমাণে ছিল তার মানবিক প্রেমলীলার আবেদন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনীতে মিলল বাঙালীর প্রেমভাবনার ধ্রুব রূপক। স্ব-নামে, স্ব-রূপে যে-প্রেম ব্যক্ত হয়নি, তার নিষেধশঙ্কাহীন প্রকাশ পেলাম এই সর্বজনগ্রাহ্য রূপকে। দেবতার প্রেম হল মানুষ-মানুষীর প্রেম। আর বৈষ্ণবযুগের নব্যন্যায়শিক্ষিত, বিশ্লেষণপটু, রসশাস্ত্রবেত্তা, মার্জিত কবি নরনারীর প্রেমের কত না সূক্ষ্ম ও সুকুমার রূপের সন্ধান পেলেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমে! প্রেমের আনন্দ ও বেদনার, মিলন ও বিরহের, অভিমান ও সমর্পণের কত ভাগ ও

অনুভাগ, কত মিশ্র অনুভূতি, ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করল, সুনির্ধারিত হল কোন্ কোন্ পরিবেশে সে-সব প্রেমাচরণ সমুচিত! প্রেমাভিব্যক্তির বৃহত্তম ও জটিলতম convention সৃষ্ট হল বাঙালীর কীর্তনসংগীতে। প্রেমকাব্যের এত পরিমার্জন ও নিয়ন্ত্রণ, এমন বহুপল্লব প্রকাশ ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় কাব্যেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, আমি অনন্ত পাইনি "রোমান্ দ্য লা রোজ"-এ অথবা পেত্রার্কের কাব্যে।

আমার মনে হয় বাংলা প্রেম-কাব্যে দুটি সুস্পষ্ট ধারা : একটিকে বলি সহজ ঘরোয়া প্রেম, অপরটি অতি সচেতন, পরিমার্জিত, রূপকপরায়ণ, নাগর প্রেম। দেহপ্রবল প্রণয়ের যে-প্রকাশ ভারতচন্দ্রে তাতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যতটা, সহজ প্রেমধারার প্রভাব সম্ভবত তার চেয়ে কম নয়, আর অবশ্য প্রবল তো ছিলই তদানীন্তন সামাজিক আচরণ ও রুচির প্রভাব। ঊনিশ শতকে ভব্যসাহিত্যের রুচি ও গতি বদলালো অনেক পরিমাণে। নবলব্ধ ইংরেজি শিক্ষায় মার্জিতরুচি কাব্যানুরাগী লোকসাহিত্য সম্বন্ধে বোধ করলেন উন্নাসিক অবজ্ঞা, লোকসাহিত্য দরিদ্র কুটুম্বের মতো দিনযাপন করতে লাগল সাহিত্যের ইমারতের এক অন্ধকার কুঠুরিতে। ঈভাঞ্জেলবাদী খৃষ্টধর্মের ও বাঙালী ব্রাহ্মধর্মের অতি নৈতিক প্রভাবে প্রেমকাব্য সম্বন্ধে ইংরেজিনবিশ বাঙালীর শুচিতা ও সংকোচ বাড়ল প্রচণ্ড রকমে। সমসাময়িক ইংরেজি কাব্য থেকেও তেমন কোন সাহায্য পাননি বাঙালী কবি। মনে রাখতে হবে যে ঊনিশ শতকে কীট্স্, রোসেটি ও সুইনবর্ণ ছাড়া অন্য সব ইংরেজ কবির প্রেম-কাব্য দেহচেতনা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, সংকুচিত, নির্লিপ্ত। শেলির প্রেম বিদেহী, ভাবলোকবাসী। কীট্স্ সম্বন্ধে আধুনিক মূল্যায়ন তখন বলবৎ ছিল না; একথা রোসেটি সম্বন্ধেও খাটে। টেনিসনের প্রেম সুশ্লীল কিন্তু রক্তাল্পতায় পীড়িত। ঊনিশ শতকের বাঙালী যে ব্রাউনিং বা রোসেটির কাব্য বিশেষ পড়তেন তেমন মনে হয় না। সে যাই হোক, এমন অনুমান সম্ভবত অসংগত হবে না যে সদ্যোলব্ধ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সে-যুগে প্রেমকাব্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্ত ছিল শুচিতাক্লিষ্ট ও অনাগ্রহী। বাঙালী তখন মিল্ ও স্পেন্সার্, কোঁৎ ও কার্লাইল্, রাস্কিন ও জর্জ এলিয়ট প্রভৃতির বিশিষ্ট চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত, অতি "সীরিয়াস্"-মনস্ক গ্রন্থোৎসাহী বাঁধা পড়েন না প্রেমকাব্যের লঘু ও চপল মায়ায়। বস্তুত ঊনিশ শতকের বাংলা কাব্যে প্রেমের স্থান মহৎ ও স্মরণীয় নয়। বিহারীলাল থেকে প্রেম আবার পেল সার্থক ও বরণীয় কাব্যবিষয়ের মর্যাদা, সে মর্যাদা আরো ঘনীভূত হল, মহত্তর হল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। প্রেমকাব্যের আবার এক ধারা বেড়ে উঠল বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, এ-ধারা প্রধানত ভাববিলাসী, সচরাচর দেহচেতনা ও জড়জাগতিক স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে, যদিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তীব্র আবেগশীল দেহচেতন অলজ্জ প্রেম অনুপস্থিত নয়। এ-প্রেমবোধ বৈষ্ণব-কাব্যের মতো রূপকপরায়ণ বক্রার্থ-নির্ভর নয় বটে, এ-কাব্যের প্রিয় বা প্রিয়তমা মানুষ মানুষী বটে, মানুষের বেশে দেবদেবী নয়, কিন্তু তবুও এ-কাব্যে বাস্তব প্রত্যক্ষ তথ্য এড়িয়ে প্রধানত প্রেমের ভাবরাজি নিয়ে ব্যস্ত থাকার নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ করি। উচ্ছ্বাস ও আবেগের সূক্ষ্মতা, তীব্রতা, নিবিড়তা, প্রাবল্য, সবই পাওয়া যায় প্রেমকাব্যের এই ধারায়, অনুভূতির এত সুকুমার শিল্পরূপ অন্য প্রেমকাব্যে বিরল বটে, তবুও বলতে হয় যে এ-কাব্যের প্রেমে অবয়বতার (concreteness) অভাব। এ-প্রেমাবেগ উচ্ছ্বিত হচ্ছে শরীরী প্রিয় বা প্রিয়ার জন্য নয়, ভাবলোকবাসী প্রেমের জন্য, মানসসুন্দরীর জন্য। এ-নিরবয়ব প্রেম কয়েক দশকের জন্য বাংলা কাব্যের প্রধান প্রেমবস্তু হয়ে উঠ্ল, পূর্ববঙ্গীয় কবি গো[illegible] প্রত্যক্ষ সাবয়বী

প্রেম কোনরকম প্রতিযোগিতা করতে পারল না এর সঙ্গে, হয়তো যেহেতু রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর করণকৌশল, তাঁর ভাষা রীতিমতো অপকৃষ্ট, অথবা যেহেতু তাঁর সাবয়বী প্রেমে তৎকালীন সাহিত্যিক রুচি সন্তুষ্ট হয়নি।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রেমকাব্যের ধারা কোন্ পথে চলল? সে-প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে জানতে হবে রবীন্দ্রোত্তর কবি কারা? লক্ষ করছি যে "আধুনিক বাংলা কবিতা" ও "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা" নামক দুখানা কাব্য-সংকলনেই রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত, যথাযোগ্য গৌরবেই উপস্থিত যদিও প্রথম সংকলনের অন্যতম সম্পাদক বলছেন, "রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে অল্পবিস্তর যাঁরা মুক্ত হয়েছেন বা হতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরই লেখা থেকে এ-সংকলন, অথচ এখানে সর্বাগ্রে পাওয়া যাবে সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথকে।" বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই রবীন্দ্রোত্তর যুগবাসী, তাঁর শেষ দশ বারো বছরের কাব্যে তিনি স্বয়ংই রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত কেননা প্রায় সপ্ততিবর্ষবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ স্বীয় দীর্ঘ-অনুসৃত সাহিত্যধারায় যে নূতন মোড় দিলেন তার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে কোথায়ও মিলবে বলে মনে হয় না। "মহুয়া"-তে বাংলা প্রেমকাব্যের এক আশ্চর্য নূতন বিকাশ ও পর্যায়। প্রেম এখন সাবয়ব। প্রেমিকা এখন ভাবলোকবাসিনী মানসসুন্দরী নয়, মর্ত্যের স্পর্শসাধ্যা নারী, প্রেমানুভূতি এখন উচ্ছ্বাসের চেয়েও বড়ো, এখন ইন্দ্রিয়াধিগম্য। রবীন্দ্রনাথে প্রেমের কাব্য কত পর্যায়ে বিবর্তিত হল সে-এক চিত্তহারী অনুসন্ধান, সে-অনুসন্ধান এখনো হয়নি কিন্তু আশা করছি অচিরেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের শেষের দিককার কবিতা নবীনতর কবিদের কাছে পথিকৃৎ সর্বতো-ভাবেই। যে-সাবয়বতা, প্রত্যক্ষতা, বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের "পূরবী"-পরবর্তী প্রেমকাব্যে পাই, রবীন্দ্রোত্তর প্রেমকাব্যেও সে সব গুণই বর্তমান যদিও প্রত্যেক কবির হাতে গুণগুলি অল্পবিস্তর বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রোত্তর প্রেমকাব্য, আমার বিবেচনায়, মোটামুটি দুঅংশে ভাগ করা যায় সাল-তারিখের ক্রম অনুসারে। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের যাঁরা অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ, যাঁরা অধুনা প্রবীণ ও অল্পবিস্তর লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁরা উত্তরতিরিশের লেখক, উত্তরতিরিশে (অর্থাৎ "পূরবী"-পরবর্তী দশকে) তাঁরা কবিসভায় আসন গ্রহণ করেন। আর যাঁরা এখনো বয়সে ও কবিকর্মে তরুণ, উত্তরচল্লিশে তাঁদের কবিকৃতির সূত্রপাত। কবি হিসাবে জ্যেষ্ঠতর কবিগণ স্বভাবতঃই বয়ঃকনিষ্ঠদের চেয়ে উৎকৃষ্ট—স্বকীয় শক্তি ছাড়াও দীর্ঘতর আত্মপ্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা। জ্যেষ্ঠ কবিদের প্রেমকাব্যের যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটি আসলে তাঁদের সমগ্র কাব্যবৈশিষ্ট্যেই নিহিত,—এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির প্রয়াস তীক্ষ্ণরূপে আত্মসচেতন। ভাষায়, ছন্দে, রূপকল্প-প্রয়োগে, বাক্‌ভঙ্গীতে ও মনোভঙ্গীতে এঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির যে-চেষ্টায় নিরত সে-কঠিন চেষ্টার ক্লেশলক্ষণ এঁদের কাব্যে প্রায়ই লক্ষণীয়, এঁদের প্রথম জীবনের কাব্যে তো বটেই, পরিণত কাব্যেও। এঁদের কয়েকজনা যে অতীব কুশলী ও শক্তিশালী কবি সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই তবুও এক হিসাবে এঁদের জন্ম-তারিখ গেছে এঁদের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের মতো মহা প্রতিভাবান কবিকে পেয়ে যে-দেশ ধন্য হয়েছে সে-সৌভাগ্যের জন্য সে-দেশকে কিঞ্চিৎ মূল্য দিতে হবে বৈকি! সাহিত্যের ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে যে মহৎ প্রতিভার তিরোধানের পরে আসে ক্লান্তিকাল, সাহিত্যচিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীর অস্থিরতা। নবীন কবিদের প্রধান প্রয়াস সর্ববিস্তারী পূর্বতন অমোঘ প্রতিভার অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া। নবীন কবিদের এ-প্রয়াসের ফলে নবীনতর কবিগণ চলতে পারেন স্বকীয়তার পথে।

যে-ভাবধারা, যে-শিল্পধারা, যে-সাহিত্য প্রকরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে সংযুক্ত, সে-ভাব, সে-শিল্প, সে-প্রকরণ উৎকর্ষের উচ্চতম-সম্ভব স্তরে পৌঁছেছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যে, তার মধ্যে আরো উচ্চতা অর্জন করা অন্য কারুর সাধ্য ছিল না। এক হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিল্পের কতকগুলি বিশেষ দিক যেন পৌঁছল নিঃশেষিতপ্রগতিরুদ্ধ পথে। "সম্মুখে রুধিয়া পথ রবীন্দ্র ঠাকুর"। রবীন্দ্রোত্তর নবীন কবিগণ সে-কথা বুঝতে পেরেছিলেন, সে-কথা বুঝতে পেরেই তাঁরা বেরোলেন নূতন পথের সন্ধানে। নবীন কবিদের মধ্যে যাঁরা জ্যেষ্ঠ, আমার মূল্যায়নে, তাঁদের জনকয়েক নিশ্চয় এ-সন্ধানে কৃতকার্য হয়েছেন, তবুও তাঁদের প্রয়াসশ্রম ও কৃতি, তাঁদের শক্তি ও সাফল্য, উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান রয়ে গেছে। রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তি তাঁরা পেয়েছেন বটে, অন্তত কিয়দংশে, কিন্তু মহৎ সৃষ্টির সহজ আনন্দ তাঁদের কাব্যে প্রায়শ অনুপস্থিত। উপরন্তু মুক্তিলাভের চেষ্টায় তাঁরা এক কঠিন অন্তঃসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁরা বেড়ে উঠেছেন যে-রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে, যে-রবীন্দ্রিক আবহাওয়ায় তাঁদের চিন্তা ও শিল্প পরিপুষ্ট, তা থেকে নিজকে অপসারিত করা দুঃসাধ্য ও তীক্ষ্ণরূপে আত্মসচেতন কর্ম তো বটেই, সে-অপসরণের ফলে যে-সাহিত্য সৃষ্ট হয় সে-সাহিত্যে শৈল্পিক সততা ও স্বকীয়তা যে-পরিমাণে প্রশংসনীয়, সৃষ্টির আনন্দ সে-পরিমাণে অনাবিল নয়। রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠদের মধ্যে প্রেমস্পৃহার চেয়ে কারুস্পৃহা অধিকতর মুখ্য। বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আর কেউই স্বভাবত বিশুদ্ধ প্রেমকাব্য বড় একটা লেখেন না। রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির অস্বচ্ছন্দ প্রয়াসে এই কবিগোষ্ঠীর কাব্য অনেক সময়ই মিশ্রিত বিষয়পরায়ণ। প্রেমকাব্যেও প্রেমের সঙ্গে তাঁরা মিলিয়ে নেন অন্য বিষয়, যথা, আবেষ্টনী-চেতনা, ইতিহাসবোধ, রাজনৈতিক ধারণা। শুদ্ধ অনুভূতি নয়, মননমিশ্রিত অনুভূতি এঁদের শিল্পবিষয়। পরিতাপের বিষয় সে-মনন অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্টই পরানুকারী, স্বায়ত্তবিহীন।

এই নিত্য সচেতন, প্রয়াসপীড়িত কাব্যের সুফল ভোগ করেছেন নবীনতর কবিরা, যাঁরা ১৯৪০-এর পরে কবিতা লিখছেন। এঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য দেখছেন কিঞ্চিৎ দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, এঁদের রবীন্দ্রভক্তি জ্যেষ্ঠদের মতো না আবেগবিহ্বল না শ্লেষবিকৃত, রবীন্দ্রপ্রভাব এঁদের কাছে নাগপাশ নয়, উদ্দীপক পূর্বদৃষ্টান্ত। বাংলা কাব্যের যে-ঐতিহ্য এঁদের কাছে পৌঁছেছে তাতে রবীন্দ্রনাথ শেষ অধ্যায় নন, তাঁর পরেও আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি। এঁদের কাব্য যে রবীন্দ্রপ্রভাবপীড়িত নয় সেজন্য আশা করি, জ্যেষ্ঠদের কাছে এঁরা কৃতজ্ঞ। কাব্যকরণের সব কৌশল এঁদের জানা নেই, কাব্যের রূপকল্প ও গঠনকারুর জন্য এঁরা প্রায়ই জ্যেষ্ঠদের কাছে ঋণী। কবিকৃতিতে এঁদের অপ্রবীণতা ঘুচবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, কিন্তু যতদিন শিল্পপ্রবীণতা তাঁদের আয়ত্ত না হচ্ছে ততদিন ও, আমার বিবেচনায়, তাঁদের প্রেমকাব্যে (তার যতটুকু নিদর্শন আবু সয়ীদ আইয়ুব মহাশয় সম্পাদিত সঙ্কলনে পেলাম) আকর্ষণী শক্তি প্রচুর। সে-আকর্ষণের উদ্ভব তাঁদের স্বাধীন, অন্তর্নিষেধোত্তর প্রেমানুভূতিতে। বিগত পনেরো বছরে যে সব বয়ঃকনিষ্ঠ নবীন কবি প্রেমকাব্য লিখছেন তাঁদের সম্বন্ধে আমার এই অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উক্তির চেয়ে বিস্তৃততর ও যোগ্যতর বিশ্লেষণ ও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ও সমুচিত।

অমলেন্দু বসু

পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা—আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত। সিগনেট প্রেস। দাম চার টাকা।

সমালোচনার উত্তর

এ সংকলনের ("পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা"র) কাব্য-নির্বাচন শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসুর কাছে "সুরুচির পরিচায়ক" এবং "মোটের ওপর প্রশংসনীয়" মনে হয়েছে—এটা সংকলনের সৌভাগ্য, সংকলনকর্তারও। ছ'টি কবিতা সম্পর্কে অবশ্য তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। সবচেয়ে "বড় আপত্তি" রবীন্দ্রনাথের 'ভক্ত' নামক কবিতার নির্বাচনে, কারণ এর বিষয়বস্তু প্রেম নয় এবং "প্রেম বলতে জগতের অধিকসংখ্যক মানুষ বুঝেছেন নরনারীর যৌন আকর্ষণ"। বসুমহাশয়ের এই পরিসংখ্যান যদি যথার্থ হয় তাহলে আমি জগতের সংখ্যান্যূন দলে পড়ি। কিন্তু এ-সম্পর্কে পাঠককে কোন নোটিস দিইনি তাঁর এ অভিযোগ অহেতুক। ভূমিকার দ্বিতীয় অংশে সাত পৃষ্ঠা জুড়ে যা লিখলাম সেটা ঠিক এই জাতীয় নোটিস—এমন কি নোটিসের বাড়াবাড়ি নয় কি? প্রেম বলতে আমি বুঝি উপলব্ধি, আবেগ ও এষনার একটি বিশেষ প্যাটার্ন যার প্রকৃতি আমার প্রবন্ধে বোঝাবার কিছু চেষ্টা করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এবং ঠিকমত যা বোঝান অসম্ভব। এসব বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে অভিজ্ঞতার সমতা না থাকলে বক্তব্য ধোঁয়াটে ঠেকবেই। এই হৃদয়াবেগটি সাধারণত নরনারীর যৌন আকর্ষণ থেকে সঞ্জাত হলেও সেই আকর্ষণের পরিধি ছেড়ে চলে যায় অনেক দূরে। বসুমহাশয় নিজেই তাঁর পূর্বোদ্ধৃত ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সংজ্ঞাটিকে প্রায় উল্‌টে দিয়ে অন্যত্র লিখছেন, "যৌনলিপ্সার কারাগার থেকে মুক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকেই বলে প্রেম নামক সভ্য চিত্তবৃত্তি"। তিনি মানবেন কিনা জানি না যে এই সভ্য চিত্তবৃত্তির বিকাশ এমন সব ক্ষেত্রেও দেখা যায় যেখানে আদৌ কোন যৌন আকর্ষণ নেই, থাকার হেতুও অবর্তমান। ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুভূতিকে অবিকল নারীর প্রতি পুরুষের কিংবা পুরুষের প্রতি নারীর অনুভূতির রূপকল্পে ভাবা হয়েছে সব দেশেই—আমাদের দেশে বোধ করি সবচেয়ে বেশী। শুধু যে অন্যেরা ভেবেছেন তা নয়, ভক্ত নিজেই ভগবানকে প্রিয়া বা প্রণয়ীরূপে উপলব্ধি করেন, অনুভব করেন। কোনো এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি বিদ্যাপতির 'হরি হে হমর দুখ ক নহি ওর' গীতিকবিতাটিকে ভক্তি-কাব্যের নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা সাহিত্য বিভাগের একজন কৃতী ছাত্র আপত্তি
যে ওটি প্রেমের কবিতা, ভক্তির নয়। পাঠক কি নিশ্চয় করে বলতে পারেন
ভক্তিরসের না আদিরসের? শুনেছি রবীন্দ্রনাথ এই গানে সুর দেবার সময় 'কামদারুণ' কথাটাকে পালটে 'বিরহদারুণ' করেছিলেন। আমার বিশ্বাস তাতে এর ভাবৈশ্বর্য খানিকটা খর্ব হল।

শুধু তোমার বাণী নয় হে বন্ধু হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।—

ভক্তিকাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, প্রেমকাব্যেরও,—কারণ ভক্তির ভাববিন্যাসকে এখানে প্রেমের ভাববিন্যাসের ছকে ফেলা হয়েছে। এমন একটি কবিতা আলোচ্য সংকলনে অনায়াসে স্থান পেতে পারত। তবে প্রেম ও ভক্তিরসের এই অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়তা অতি পরিচিত বলে বিশেষ করে এই জাতের কবিতা নির্বাচন করতে আমি খুব আগ্রহী হতাম না। প্রকৃতি সম্বন্ধে ঠিক এই ধাঁচের হৃদয়াবেগের প্রকাশ কোনো কবিতায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না, যদিও ওয়াড্‌স্বার্থ, শেলী এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা এর খুব কাছ ঘেঁসে যায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে অবশ্য প্রকৃতিপ্রেম মানুষীপ্রেমের রূপ নিয়েছে ('কেন পান্থ এ

চঞ্চলতা'—ইত্যাদি), অনেক গানে প্রকৃতিপ্রেম ও মানুষীপ্রেম একাকার না হয়েও ওতপ্রোত-ভাবে মিশেছে, পরস্পরের পটভূমিকারূপে কাজ করেছে। এইসব গানের তুলনা নেই কোথাও। সাম্প্রতিক সাম্যবাদী কাব্যে দেশপ্রেম ও সমাজপ্রেমের ভাববিন্যাসও নরনারীর প্রেমের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে, অনেক সময়ে ধোঁকা লাগে কবিতাটির উদ্দিষ্ট সমাজ না প্রিয়া। তবে এর চেয়ে সার্থকতর আমার মনে হল সেইসব বামপন্থী কবিতা যেখানে প্রেমানুভূতি অব্যর্থ অথচ সমাজ-বোধের মধ্যে বিধৃত ও তার দ্বারা ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

এ-সবে তবু আমরা অভ্যস্ত হয়ে আসছি। চমক লাগাল প্রভুর প্রতি কুকুরের হৃদয়াবেগকেও এমন সমুজ্জ্বল মানুষীপ্রেমের অনুভূতির ছকে ফেলা যায় দেখে। 'ভক্ত' কবিতাটির নায়ক যে কুকুর সেটা তো প্রথম ছত্রেই বলা আছে। কিন্তু কবিতায় ব্যক্ত অনুভূতির প্যাটার্নটা মানবিক এবং মানুষী প্রেমের। 'ভালোমন্দ সব ভেদ করি দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে'—এ কি ভক্ত কুকুরের মনের কথা না প্রেমিক মানুষের? 'যারে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম, অসীম চৈতন্যালোকে পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা'—একে কুকুরের হৃদয়ানুভূতি বলে ঠাহর করতে হলে কষ্টকল্পনার প্রয়োজন, মানুষের প্রেমের প্রকাশ না ভাবাই শক্ত। নরনারীর প্রেমের যে-রূপকল্প রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল সেটি তিনি কুকুরের চেতনায় আরোপ করেছেন। মনোবৈজ্ঞানিকের পক্ষে তা প্রমাদ, কিন্তু কবির সে অধিকার দেবদত্ত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে তা সত্ত্বেও (অথবা তার জন্যই) কবিতাটি অতীব রসোত্তীর্ণ। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে প্রেমানুভূতির এমন সুন্দর অভিব্যক্তিকে আমি অবহেলা করতে পারিনি।

সোজাসুজি এবং নির্ভেজাল প্রেমের প্রকাশ গত দু'হাজার বছরে এত প্রচুর পরিমাণে এত উৎকৃষ্ট রূপে হয়ে গেছে যে ঠিক সেইরকম প্রকাশ কোনো সমকালীন কবির রচনায় দেখলে আমাদের ঈষৎক্লান্ত সংবেদন-শক্তি সম্পূর্ণ সাড়া দিতে চায় না। যেসব কবিতায় অন্যজাতীয় চেতনার মধ্যে প্রেমের অনুভূতির একটু স্পর্শ বা অনুরণন মাত্র পাওয়া যায়, বা অন্যকথা বলতে গিয়ে প্রেমের কথা যেখানে হঠাৎ এসে পড়েছে, এসেও সমস্ত জায়গা জুড়ে বসতে সাহস পাচ্ছে না, সসংকোচে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে—আমার ব্যক্তিগত রুচিতে তেমন কবিতাই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতারূপে প্রতিভাত হয়। এমন কয়েকটি কবিতার নির্বাচনে বসু মহাশয় এবং অন্য কোনো কোনো সমালোচক খুশি হননি, কিন্তু আমি তাতে দুঃখিত নই। বরঞ্চ আমার দুঃখ এই যে এই ধরণের কবিতা সংখ্যায় এত কম, পাঠকের রুচিকে খাতির করতে গিয়ে আমি নিজের রুচিকে কতকটা খর্ব করলাম।

বসু মহাশয় যে আমার "ভূমিকাস্বরূপ প্রবন্ধটি"র (ভূমিকার ভূমিকা বললেই ভালো হোত) উপর চোখ বুলিয়েই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন সেটা খুবই স্পষ্ট। এর কারণ নিশ্চয়ই আছে, কারণ বিনা তো আর কার্য হয় না। কিন্তু সেই কারণ অথবা কারণসমষ্টি যে কী তা তাঁর লেখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ঠিক বোঝা গেল না নিম্নলিখিত সম্ভাব্য কারণ-সমুদয়ের মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি তাঁর মনে অসন্তোষ জাগিয়েছে।

(১) প্রবন্ধের বিষয়টি তাঁর পছন্দ হয়নি।

(২) বিষয়টি ভাল কিন্তু এ বইয়ের ভূমিকারূপে ঐ বিষয়ের অবতারণা অসংগত হয়েছে।

(৩) বিষয়ও ভাল, এখানে তার আলোচনাও চলত, কিন্তু আমি যা লিখেছি সেটা বাজে।

(৪) আমার মতামত বা সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে অগ্রাহ্য ঠেকেছে।

(১) এ নিয়ে কোনো তর্ক চলে না, অথবা বলা উচিত যে বহুদেশকাল জুড়ে এ তর্ক চলে আসছে, আজও তার মীমাংসা হয়নি। এক পক্ষের মত—সাধারণভাবে দার্শনিক গবেষণার এবং বিশেষভাবে কাব্যতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার কোনই মূল্য নেই; বিপক্ষ বলেন (খুব সম্ভব এঁরা সংখ্যালঘু) এসব জিনিষের মূল্য অত্যধিক। বসু মহাশয় যদি প্রথম দলে পড়েন, আমি দ্বিতীয় দলে পড়ি। অতঃপর নমস্কারান্তে আমরা যে যার পথে এগুতে পারি। "নিস্ফলা", "নিঃসিদ্ধান্ত", "অবয়বহীন" বিশেষণগুলি তিনি সাধারণভাবে কাব্যজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন, নাকি বিশেষ করে আমারই রচনার উদ্দেশ্য—সেটা অব্যার্থসূচক ভাষায় বলা হয়নি। খুব সম্ভব দ্বিতীয়টাই। প্রথমটা হলে তার সপক্ষে কোনো যুক্তি পেলাম না তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনায়।

(২) কাব্যস্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা না করে "বাংলায় প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য, কাব্যে প্রতিফলিত বঙ্গীয় প্রেমের বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রতিক কাব্যে প্রেমের শিল্পরূপ, এ ধরণের কয়েকটি বিষয়ে" আমি মনোনিবেশ করিনি বলে বসু মহাশয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সমালোচ্য পুস্তকের ভূমিকাতে ঐ সব বিষয়ের একটি সুযোগ্য আলোচনা থাকলে যে ভালো হত সে কথা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু তেমন লেখা লিখতে তো আমি অধিকারী নই। পরধর্ম ভয়াবহ জেনেই সে চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলাম। "খাঁটি সাহিত্যিক আলোচনা" আমার ক্ষমতার অতীত এবং চিত্তধর্মের প্রায় বিপরীত। আমার চোখের সামনে *Oxford Book of Christian Verse*-এর ভূমিকার সদ্দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন বসুমহাশয়, কিন্তু বৃথাই। ইংরাজি প্রবাদবাক্যে মাঝ দরিয়ায় ঘোড়া বদল করতে নিষেধ আছে; মাঝ বয়সে পৌঁছে পূর্বসাধনায় স্থির থাকাই ভাল। যৌবনকালেই মানুষ ভাবে সে সব্যসাচী। প্রৌঢ় বয়সের আশাভঙ্গ তাকে জানিয়ে দেয় কোনো একটি বিষয়ে সামান্য একটু সিদ্ধিও কত দুর্লভ। বসুমহাশয় স্বয়ং কষ্ট করে আস্ত একটি বিকল্প ভূমিকাই লিখে দিয়েছেন। আমি যা লিখতে পারতাম না তিনি তা লিখে দিয়ে ভালই করেছেন; এসব ব্যাপারে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা তার গুণাগুণ বিচার করবেন, এবং ভাবী সংকলনের প্রকাশকরা সেদিকে মনোযোগী হবেন। কিন্তু এ জাতীয় লেখায় পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সুযোগ নেই অথবা কম, তাঁর এই উক্তিটা মানতে পারলাম না। সুযোগ বরঞ্চ বেশি। এর যথেষ্ট প্রমাণ বসুমহাশয় নিজেই দিয়েছেন (দেশীবিদেশী, বিদেশীই অধিক, প্রায় তিরিশটি নামের উল্লেখ আছে তাঁর সমালোচনার এই অংশে)। আরো প্রমাণ দিতে চাইলে বিষয়ের দিক থেকে কোনো বাধা পেতেন না। সমালোচক লিখছেন, "ক্ষোভের বিষয়, কেননা বর্তমান সম্পাদনাকার্যে এমন কোনো প্রমাণ পেলাম না যাতে বলতে পারি যে-পরিমাণে সম্পাদকের রুচি প্রশংসনীয় তাঁর সমালোচনা-কুশলতা সেই পরিমাণে আদরণীয়"। শূন্য থেকে কোনো কিছুর প্রমাণ পাওয়া দুঃসাধ্য বটে। আমার "সম্পাদকীয় রচনায়" কাব্যজিজ্ঞাসা আছে, কাব্যসমালোচনা একেবারে অনুপস্থিত। সেই অনুপস্থিত সমালোচনার কুশলতা বসুমহাশয়ের কাছে আদরণীয় ঠেকেনি এটা খুব আশ্চর্য নয়।

কাব্যসমালোচনায় যদি আমি অপারগ কাজেই পরাঙ্মুখ হই তবে কোনো ভূমিকা না

লিখলেই তো হত। আমারও ইচ্ছা তাই ছিল, কিন্তু প্রকাশক মহাশয় কিছুতেই মানলেন না। বললেন আমার কাছ থেকে একটি ভূমিকা তাঁর চাই-ই, সাহিত্যিক না হয়ে দার্শনিক হলেও আপত্তি নেই। আমার তরফে যা বলার আছে তা দু'টি প্রশ্নের আকারেই বলি। প্রেমের কবিতা যাঁরা পড়েন, প্রেম ও কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই কি তাঁদের মনে কখনও জাগে না? ঐ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনায় যোগ দেওয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হতে পারে, কিন্তু সেরকম আলোচনা একেবারে অপাঙক্তেয় হবে কি? আর একটি কথা। কবিতার সাহিত্যিক বিচার ভালো মন্দ মাঝারি অনেকে অনেক রকম করছেন; তার স্বরূপজিজ্ঞাসা, আর কিছু না হোক, বিরল তো বটেই। বাংলা প্রবন্ধে সর্বত্র ইতিহাসের ছড়াছড়ি দেখে আমি বড় হতাশ বোধ করি। দু'এক শতাব্দী বা সহস্রাব্দী পেছনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আর কতকাল পথ চলব আমরা?

(৩) সাধারণ ভাবে যদি বসুমহাশয় বলেন যে আমার লেখাটি নিকৃষ্ট হয়েছে, তবে তাঁর সে তিরস্কার আমি নীরবে মেনে নেব। বিশেষভাবে তিনি কয়েকটি দোষ এবং "দুর্বলসূত্র" দেখিয়েছেন; তার উত্তরে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।

বসুমহাশয় বলেছেন আমার এ লেখার কোনো কোনো অংশে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ ঘটেছে। ঠিক কোন্ অংশগুলি তাঁর মতে অপ্রাসঙ্গিক তা তিনি জানাননি। জানালে আমি দেখাতে চেষ্টা করতাম ঐ অংশগুলি কোন্ সূত্রে অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত, সমগ্র প্রবন্ধে তাদের স্থান ও প্রয়োজন কোথায়। প্র্যাগ্ম্যাটিজ্ম্, পজিটিভিজ্ম্ প্রভৃতির অবতারণায় তাঁর আপত্তি আছে বোঝা গেল, কিন্তু ঐসব বিষয়ে আমি কোনো আলোচনাই করিনি। উল্লেখমাত্র করেছিলাম চল্তি মতের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে সেইটা শুধু নির্দেশ করবার জন্যে। এই হাওয়ার প্রতিকূলে কিছু বলা আবশ্যক ছিল, কারণ কাব্যবিষয়ে আমার বক্তব্য ঐ হাওয়াতে টিকতে পারে না।

বসুমহাশয়ের আর একটি অভিযোগ এই যে এ-প্রবন্ধে উল্লিখিত নাম ও উদ্ধৃত বাক্যের বাহুল্য দেখা যায়। কিছু বাহুল্য সত্যিই ঘটেছে—নিছক আলস্যের ফলে। সেটা দোষের। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার জন্য দায়ী দার্শনিক বিচারের একটি সাধারণ অসুবিধা এবং সেই সঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অক্ষমতা। আমার বক্তব্য যদি খুবই অভিনব হত, অন্তত আহরিত অংশের পরিমাণ অত্যল্প থাকত—অর্থাৎ আমি যদি একজন দার্শনিক প্রতিভা হতাম (কোনো শতাব্দীতেই তাঁদের সংখ্যা দু'চার জনের বেশী নয়) তাহলে অন্যসব মতকে অগ্রাহ্য করে আমি সোজাসুজি নিজের মতটাই ব্যক্ত করে যেতাম। কিন্তু এপথে আমি একজন সামান্য পদাতিক, কোনো অর্থে মহারথী নই। আমার মতের অধিকাংশ খণ্ড-অংশ অন্যের কাছ থেকে পাওয়া, কেবল সমগ্রের বিন্যাসটাই আমার স্বকীয়। তাই প্রত্যেকের কাছে না হোক অন্তত প্রধান উত্তমর্ণ যাঁরা তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করবার নৈতিক দায়িত্ব আমার আছে, এবং যাঁদের আমি খুব নিকটবর্তী তাঁদের সঙ্গে আমার মতের যেটুকু প্রভেদ সেটা নির্দেশ করবার স্বাভাবিক প্রয়োজন। তাছাড়া দার্শনিক কোনো বিচারই সরাসরি সিদ্ধ বা পুরোপুরি অসিদ্ধ নয়; সর্বত্রই কিছু সত্য কিছু ভ্রান্তি, কিছু যুক্তি কিছু খেয়ালের মিশোল পাওয়া যায়। মাত্রাভেদ অবশ্য আছে। এবং একজন দার্শনিক কোন্ মতটিকে বরণ বা গঠন করবেন সেটা শেষ পর্যন্ত অনেকাংশে নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের উপর, তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপর। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার মনে হয় দার্শনিক বিচার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং শিল্পসৃষ্টির মধ্যবর্তী। তাই কোনো দার্শনিকের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী মতামতের কতটুকু

গ্রাহ্য এবং কতটুকু খণ্ডনীয় ও বর্জনীয় তার নির্দেশ দার্শনিক বিচার-পদ্ধতিরই অঙ্গীভূত। চূড়ান্ত প্রমাণ যেখানে মরীচিকা, সেখানে তুলনামূলক বিচার এবং বিতর্কই পথ। কাজেই বহু নাম ও মতের উল্লেখ অনিবার্য। ছিদ্রান্বেষী বলতে পারেন এটা পাণ্ডিত্য-প্রকাশ; জ্ঞানান্বেষী তার অন্যাবিধ প্রয়োজন অনুভব করবেন।

রইল উদ্ধৃতি। বসুমহাশয় বলেছেন যে যে-সব কথা আমি নিজের দায়িত্বে বল্‌তে পারতাম কিন্তু বলতে সাহসী হইনি সেসবের জন্য পরের সমর্থন ভিক্ষে করেছি। উক্তিটা অকরুণ, কিন্তু তাতে আপত্তি নেই। আপত্তি এই যে এখানেও তাঁর উক্তিতে যাথার্থ্যের অভাব ঘটেছে। আমার অধিকাংশ উদ্ধৃতি সাহিত্যের সেইসব দুলাল বাক্যের যার সমর্থন অন্যেরা খোঁজেন কিন্তু আমি যেগুলিকে খণ্ডন, সংশোধন বা চলতি অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। মালার্মে, এলিয়ট, ওয়াড্‌র্স্বার্থ, অভিনব গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, মার্ক্‌স্‌, হেগেল, পার্কার, ড্রাইডেন এই পর্যায়ভুক্ত। কয়েকটি উদ্ধৃতি আছে এমন সব বাক্যের যার দ্বারা ভিন্ন মতাবলম্বী পূর্বাচার্যরা নিজের বিঘোষিত মত নিজেই খণ্ডন করেছেন—যথা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের জবানীতে অভিনবগুপ্ত, ক্লাইভ্ বেল, এ, সি, ব্র্যাড্‌লী, ক্রোচে। এসব বাদ দিলে মাত্র চারপাঁচটি উদ্ধৃতি থেকে যায় যা আমার স্বপক্ষের—তার মধ্যে দু'টি পদ্য। এই উদ্ধৃতিগুলি সুন্দর এবং লাগসই বলেই আমার পক্ষে লোভনীয় হয়েছিল, নইলে আমার বক্তব্যের **সমর্থনে** তাদের টেনে আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বাদ দিলেও সে বক্তব্য [illegible] দুর্বল হয় না।

বসুমহাশয় প্রবন্ধের মধ্যে "অনেকগুলি দুর্বলসূত্র" খুঁজে পেয়েছেন। সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

(ক) "প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকরাই মেনে নিতে পারেননি"—আমার এই উক্তিতে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আপত্তি আছে। তিনি বলছেন যে এ্যারিস্টট্‌ল্‌-পরবর্তীরা "অনুকরণবাদ অস্বীকার করেননি, অনুকরণবাদের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।" আমি তো বলিনি যে পরবর্তীরা অনুকারবাদ ("অনুকরণবাদ") অস্বীকার করেছিলেন, আমি লিখেছিলাম তাঁরা "**প্রাচীন গ্রীকদের** অনুকারবাদ মানতে পারেননি।" এই বড় অক্ষরের বিশেষণ পদটিকে বিলুপ্ত করে দিয়ে বসুমহাশয় অনর্থক ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া করতে উদ্যত হয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক অনুকারবাদ বলতে আমি কী বুঝি, "প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিকৃতি," "প্রতিবিম্বকে বিম্বের অবিকল অনুবর্তী করা," প্রভৃতি বাক্যাংশের মধ্যে কি সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়নি? বসুমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে ঠিক এই ধরণের অনুকারবাদ স্বয়ং এ্যারিস্টট্‌ল্‌ মানেননি; আরো পরবর্তীরা তো এর থেকে আরো দূরে সরে গিয়েছিলেন। প্লটাইনাসের লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত নই, তাঁর সম্বন্ধে ক্রোচের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি : "The mystical view, which considers art as a special mode of self-beatification, of entering into relation with the Absolute, with the Summum Bonum, with the ultimate root of things, appeared only in late antiquity, almost at the entrance to the Middle Ages. Its representative is the founder of the neo-Platonic school, Plotinus." (*Aesthetic*, p. 162) । এটা কোনো অর্থে প্রত্যক্ষ-বস্তুর অনুকরণমূলক শিল্পব্যাখ্যা নয়। 'অনুকারবাদ' সংজ্ঞাটি অবশ্য বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল—বলতে গেলে সংজ্ঞিতের খোল-নলচে দুই-ই পালটে দিয়ে। ইতিহাস থেকে

কাব্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল্ বলেছিলেন, ইতিহাসের কারবার 'বিশেষ' অর্থাৎ particular-কে নিয়ে, কাব্যের আধেয় 'সামান্য' (universal)। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্বিষ্টও সেই 'সামান্য'ই : তবে দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? অ্যারিস্টটল্ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। অনুকারবাদকে বিশেষ বস্তু থেকে সামান্য ভাবের (idea) দিকে নিয়ে গিয়ে অ্যারিস্টটল্ দুটি ভুল করলেন। প্রথমত, সামান্যের অনুকরণ বলতে স্পষ্ট কিছু বোঝায় না; দ্বিতীয়ত, কোনো সোজা অর্থে 'সামান্য' কাব্যের বিষয় নয়, যেমন কিনা তা বিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু এইসব তর্ক তুলে পরিস্থিতি আবার জটিল করে ফেলতে চাই না।

(খ) মার্ক্স্ এঙ্গেল্সের ভাষায় মানবচিত্তকে জড়জগতের মুকুর-বিম্ব বলা সোহংবাদের উল্টোপিঠ এবং ভ্রান্তিবিলাসে দুইই তুল্যমূল্য—আমার এই উক্তিতে বসুমহাশয় বিষম চটেছেন। তিনি যদি মার্ক্সবাদের প্রত্যেকটি সূত্রকে বেদবাক্য জ্ঞান করেন কিংবা সলিপ্সিস্ট মতাবলম্বী হন তবে চটবার কারণ তাঁর আছে। কিন্তু পৃথিবীর কোনো মতবাদের কোন একটি খণ্ডাংশকে ভ্রান্ত বলার আগে সেই মতবাদ সম্বন্ধে বক্তা কতখানি বিদ্যা অর্জন করেছেন দলিল-দস্তাবেজ সহ তার প্রমাণ বসুমহাশয়ের নিকট উপস্থাপিত করতে হবে—এ দাবীটা বাড়াবাড়ি। একটু ধৈর্যের সঙ্গে প্রবন্ধ পাঠ করলে বসুমহাশয় লক্ষ্য করতেন যে কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আমি মার্ক্স্বাদের একটি মূল প্রত্যয়ের (বিশ্বজগতের ডায়লেক্টিক্ বিকাশের) প্রতি সবিস্তারে আমার আন্তরিক আস্থা জ্ঞাপন করেছি। এখানে অবশ্য আমার একটি ত্রুটি স্বীকার করা কর্তব্য। 'সোহংবাদ' শব্দটা যে আমি solipsism-এর বাংলা পারিভাষিক প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছিলাম (আমার উদ্ভাবনা নয়, শব্দটি কোনো পূর্বসূরীর লেখা থেকে সংগৃহীত—খুব সম্ভব সুধীন্দ্রনাথ দত্তের), এটা সুস্পষ্টরূপে পাঠককে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল বিশেষ করে এইজন্য যে সোহংবাদের আর একটি প্রচলিত অর্থ বেদান্ত। এবং বেদান্তের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই, বেদান্ত সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। শুনেছি বৈদান্তিক অনেকগুলি মতের মধ্যে একটি মত দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ নামে পরিচিত, এবং সেটি সলিপ্সিজমের খুবই কাছাকাছি। কিন্তু অন্য কোনো বৈদান্তিক মতকে বা এই মতের solipsist epistemology ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গকে আমার বক্তব্য স্পর্শ করে না।

(গ) "অবশ্য ও হয়তো-র মধ্যে মর্মান্তিক গোলযোগ" বাধে যদি 'অবশ্য' শব্দটি 'নিশ্চয়ই' অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাংলায় ও দুটি শব্দ সর্বদা সমার্থবাচক নয়। 'অবশ্য' অনেক ক্ষেত্রে বাক্যটির উপর একটু জোর দিয়েই আপন কর্তব্য সমাধা করে, বিবক্ষিত ব্যাপারের সম্ভাব্যতার মাত্রা ষোল আনা কি তার চেয়ে অনেক কম সেটা নির্দেশ করবার দায়িত্ব নেয় না। ইংরেজিতে certainly আর of course -এর পার্থক্য এর সঙ্গে তুলনীয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক : 'আমাদের দলের অনেকেই সভায় উপস্থিত থাকবেন, অবশ্য আমি ঠিক সময়ে হয়ত পৌঁছুতে পারব না।' অবশ্য-এর প্রয়োগ কি এখানে ব্যবহার-সিদ্ধ নয়? আমি জোর করে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু প্রশ্নটা ইডিয়মের, লজিকের নয়।

মনিজ্ম্ও যে মেটাফিজিক্সের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে তাতে আর সন্দেহ কি, বি. এ. ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকই তার প্রমাণ। কিন্তু প্লুরালিস্টরা বরাবরই বলে এসেছেন যে মনিজ্ম্-এর মূল কথাটা যুক্তি-নির্ভর নয়, যোগজ প্রত্যক্ষের ব্যাপার, মিস্টিক্যাল। জেম্স্ এক জায়গায় লিখেছেন : 'To interpret absolute monism worthily, be a mystic'. রাসেলের অভিমতও তাই ('Mysticism and Logic' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। এবিষয়ে আমি

মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করেছি মাত্র, কোনো মৌলিক মূর্খতার পরিচয় দিইনি।

বসুমহাশয় বলেছেন, এসব তর্ক বাদ দিয়েও আমার যে উক্তিটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন তার বক্তব্যে খুব একটা যুক্তিবিরোধ আছে। কোথায়? কাব্যের সত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যকে আমরা মেলাতে পারি না। যোগী যদি বলেন যে তিনি পারেন তবে তাঁর কথা যথার্থ হতেও পারে, কিন্তু তাঁর সেই অদ্বৈত মহাসত্যটি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিগম্য। সুতরাং আমরা তা মানব কেন? আমাদের অভিজ্ঞতার সীমানায় অনেকান্ত সত্যগুলিই স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরম, 'তাহার উপরে নাই'।—এর মধ্যে যুক্তিবিরোধ আবিষ্কার করা 'বিস্ময়ের বিষয়' বটেই।

(ঘ) আর্টের সুখবাদী ব্যাখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত নিদর্শন হিসেবেই ড্রাইডেনের উক্তিটি ব্যবহার করেছিলাম, এই ব্যাখ্যার ইতিহাসে ড্রাইডেনের স্থান নির্দেশ করা আমার অনভিপ্রেত এবং আমার রচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। স্মরণশক্তি ক্ষীণ বলে ইতিহাস নামক বস্তুটাকে আমি বড় ডরাই। তবু এটুকু জানি যে উক্ত মত গ্রীক আমলেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আসল কথায় আসা যাক। শিল্পের সুখবাদী ব্যাখ্যা-কর্তাদের পক্ষে 'স্বভাবতঃই একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কিং লীয়র, শ্যামা প্রভৃতি ট্র্যাজেডির মূল্যায়ন'—আমার এই মন্তব্য পড়ে বসুমহাশয় এমন "আশ্চর্য আশ্চর্য" হয়ে উঠলেন কেন? পৃথিবীতে এত বিচিত্র বস্তু থাকতে একজন সামান্য লেখকের একটি নিরীহ উক্তিতে এতখানি বিস্ময়বোধ খরচ করে ফেলা ভালো নয়। শব্দপ্রয়োগ ব্যাপারে বসুমহাশয় আবার তাঁর অভ্যস্ত অনবধানতা এবং precision-এর অভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সুখবাদী ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি একটি মন্তব্য করলাম, বসু-মহাশয় প্রচণ্ড আপত্তি তুলে বললেন যে আনন্দবাদী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সে মন্তব্য খাটে না! এখানে 'সুখে'র জায়গায় 'আনন্দ' শব্দটা বসিয়ে দিলে যে মূল উক্তি একেবারে অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। সাদাসিধে অর্থে সুখ জাগানই আর্টের উদ্দেশ্য—এমন কথা বললে ট্রাজেডির কোনো সৎ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অধিক মাত্রায় সুখ, অবিমিশ্র সুখ, স্থায়ী সুখ ইত্যাদি বললেও সম্ভব হয় না। অগত্যা 'সুখ' কথাটা সম্পূর্ণ বর্জন করে রসানন্দ, হ্লাদ প্রভৃতি ভিন্নার্থ বাচক শব্দ, কাজেই ভিন্ন পর্যায়ের অনুভূতির মধ্যে আর্টের তাৎপর্য খুঁজতে হয়। রসের অনুভূতি যেমন সাধারণ সুখদুঃখের ভাবগ্রামের বাইরে পড়ে, প্রেমের অনুভূতিও তেমনি। এই তো ছিল আমার মোটা বক্তব্য। এতে পরম বিস্ময়েরই বা কি দেখলেন বসুমহাশয়, এবং "ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস"ই বা কোথায় পেলেন?

(৪) এক জায়গায় বসুমহাশয় বলছেন আমার এই প্রবন্ধ "নিঃসিদ্ধান্ত", অন্যত্র লিখছেন যে এতে "কাব্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু সুষ্ঠু আলোচনা আছে সেটুকু আইয়ুব মহাশয়ের পূর্বতন সংকলনের ভূমিকাতেও পাওয়া যায়।" হয়ত সময়াভাবে দু'টোর কোনো প্রবন্ধই তিনি আগাগোড়া পড়েননি, খুব সম্ভব কোনোটার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেননি। নইলে ওরকম দু'টি অযথার্থ মন্তব্য তিনি করতেন না। আগের সংকলনের ভূমিকার প্রথম অংশে (যেখানে কাব্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে) আমি কবিতার সংজ্ঞা, সৎকাব্যের প্রতিমানাদি বিষয়ে তিনটি প্রতিভূ মতের উল্লেখ করেছিলাম—শুধু এইটুকু দেখাবার জন্য যে এ-ব্যাপারে কত গভীর মতানৈক্য বিদ্যমান, এবং কোনো ঐকমত্যে পৌঁছবার সম্ভাবনা কত সুদূর-পরাহত। অথচ "কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অংশতঃ কোনো মতস্থৈর্য না ঘটলে কবিতার ভালোমন্দ যাচাই করা নিতান্ত ব্যক্তিগত খামখেয়াল, তাতে সর্বজনীনতার দাবী হয় মূঢ়তা নয় অহংকার" ("আধুনিক বাংলা কবিতা", পৃ ৷৷০)। বর্তমান সংকলনের ভূমিকাতে

আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি খুব প্রাথমিক এবং সাদামাটা মত (প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ) থেকে আরম্ভ করে ডায়লেকটিকের ঘোরা সিঁড়ি বেয়ে এমন মতে উপনীত হয়েছি যাকে আমি নিজে সমর্থন করতে পারি। সে মতটাই এ প্রবন্ধের প্রথম অংশের সিদ্ধান্ত। সেটার অস্তিত্বমাত্র যখন বসুমহাশয়ের চোখে পড়েনি তখন সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ এখানে অমার্জনীয় হবে না আশা করি—যদিও আমার মূল প্রবন্ধটাই যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত, এবং তার স্বল্প পরিসরের মধ্যে অনেকগুলি কথা সন্নিবিষ্ট করবার চেষ্টার ফলেই প্রসাদগুণবর্জিত হয়েছে।

কাব্য বহির্জগতের অনুকরণ না হলেও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটি অখণ্ড বোধের মধ্যে গ্রহণ ক'রে যে মূল্যবোধের দ্বারা অভিষিক্ত হয় কবিচিত্ত, কবিতার মূল্য সেই পরম-মূল্যেরই প্রতিচ্ছায়া। গ্রীকদের সম্পূর্ণ বিষয়গত মিমেটিক্ মতবাদের এ্যান্টিথিসিসরূপে উল্লেখ করেছিলাম একটি বিষয়ীগত মতবাদের—আধুনিক কালের প্রসাদ-লালিত (যদিও আমাদের দেশের পক্ষে প্রাচীন) এক্সপ্রেশানিস্ট্ থিয়োরীর। উক্ত দুই মতের সংগতিরূপে যে তৃতীয় মতটি আপনি দানা বাঁধে তার মূল কথা হল এই যে কাব্য বহির্জগতের প্রতিবিম্ব বটে, কিন্তু তার উপরিতলবর্তী দিনানুদৈনিক খণ্ডরূপের নয়; তার গভীরতর ও সমগ্রতর রূপই কবিচিত্তে উপলব্ধ হয়ে তাঁর কাব্যে অভিব্যক্ত হয়। আবার এও সত্যি যে কাব্য কবির অন্তরের প্রকাশ, কিন্তু সে অন্তর্চেতনা শূন্যে দোদুল্যমান, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ কিছু নয়। বস্তুকে নিয়েই চেতনা। তবে বস্তু ও চেতনা একেবারে অসম্পৃক্তও হতে পারে না, একেবারে অভিন্নও নয়। বিজ্ঞান চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব বস্তুসত্তাকে আমাদের ভাবনা-বেদনা থেকে পৃথক করে স্বাধীন করে দেখতে; কবির মন চায় বাইরের জগতের সঙ্গে নিবিড় সাহিত্য। এই দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্ক কাব্যানুভূতির বৈশিষ্ট্য, প্রেমেরও। প্রেমিকের উপলব্ধিতে তার প্রেমাস্পদের স্বরূপও তেমনি—সত্য কিন্তু সার্বজনীন নয়, বিষয়গত অথচ বিষয়ীর অনুভবসাপেক্ষ। এটাই প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে যোগসূত্র। আগের প্রবন্ধে আমি যে কাজটা সযত্নে এড়িয়ে গেছি, এখানে (বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অংশে) সেই দুরূহ কাজে প্রযত্নবান হয়েছি—অর্থাৎ কাব্যের মূল্য সম্বন্ধে একটি মত দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়ে আমার কোনো সিদ্ধান্ত নেই না বলে, আমার সিদ্ধান্তটি বসুমহাশয় গ্রহণ করেননি বললেই তাঁর উক্তি যথার্থ হত। কিন্তু তাহলে আমার যুক্তি ও উক্তির বিরুদ্ধে (এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণতঃ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, কতক পরিমাণে তা পাঠকের সমদৃষ্টি ও সমানুভূতি উদ্রেকের উপর নির্ভরশীল) তাঁর কী বলবার আছে, কাব্যজিজ্ঞাসায় কোন্ বিকল্প সিদ্ধান্তটি তাঁর মতে গ্রাহ্য—সে-সব কথা জানাবার দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারতেন না।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

পুনঃ :

সম্প্রতি শ্রীমান সুরজিৎ দাশগুপ্তের সমালোচনায় (উত্তরসূরী, শ্রাবণ-আশ্বিন. ১৩৬৩) একই রকম ভুল দেখে আশ্চর্য হলাম। তিনিও ধরে নিয়েছেন যে আমি যতগুলি মতের উল্লেখ করেছি সব আমারই মত, এবং যতগুলি উদ্ধৃতি দিয়েছি সব আমারই বক্তব্যের

সমর্থনে। অতঃপর তিনি ঐগুলির মধ্যে পরস্পর-বিরোধ, কিংবা উল্লিখিত মত বা উদ্ধৃত বাক্যের সঙ্গে আমার বক্তব্যের বিরোধ আবিষ্কার করে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। শিল্পে কোনো গূঢ় অর্থের ইঙ্গিত নেই, তার রূপ রেখা ও ধ্বনির মাধুর্যেই তার মূল্য—এমন শিল্প ব্যাখ্যাকে আমি বলেছিলাম কাব্যবিচারে দেহাত্মবাদ। এই মতটি স্পষ্টতঃই আমার নয়, এবং ডেকরেটিব আর্ট্ ছাড়া অন্য কোনো আর্টের বেলায় খাটে না। উচ্চাঙ্গের শিল্প-রচনার আঙ্গিক আমার মতে (এবং আরো অনেকের মতে) "অর্থব্যঞ্জনাঘন"। সেই অর্থ-জিজ্ঞাসায় তারপর আমি এগিয়েছি। শ্রীমান দাশগুপ্তের মত কাব্যপাঠকের পক্ষে এইটুকু বোঝা সম্ভব হয়নি কেন?

ওয়ার্ডস্বার্থের উদ্ধৃত বাক্যে (poetry is emotion recollected in tranquillity) আমি দুটি ভুল দেখিয়েছিলাম। প্রথমতঃ কাব্যে যা ব্যক্ত হয় তা recollected কিছু নয়, "একান্তই উপস্থিত"। দ্বিতীয়ত, "প্রাত্যহিক জীবনের হৃদয়াবেগের পর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না," তা মনের অন্য কক্ষের ব্যাপার, নৈর্ব্যক্তিক, সাধারণীকৃত, ইত্যাদি। এই শেষের কথাগুলির প্যারাফ্রেজ করে সুরজিৎ লিখছেন "তা যদি হোল তা'হলে কাব্যকে emotion recollected in tranquillity বলা যায় কেমন করে।" শ্রীমানের পক্ষে কেমন করে ভুলে যাওয়া সম্ভব হোল যে :—(১) উক্তিটি আমার নয় ওয়ার্ড্স্বার্থের; এবং (২) তিনি আমার বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলেছেন, ওয়ার্ড্স্বার্থের বিরুদ্ধে আমার আপত্তির একাংশ অবিকল তাই।

সুরজিৎ ঠিকই বুঝেছেন যে "প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে সম্পাদকের ধারণা স্বচ্ছ নয়।" প্রেম সম্বন্ধেও না, কবিতা সম্বন্ধেও না। আশা করেছিলাম তিনি আরো বুঝবেন যে ঐসব বিষয়ে ধারণা স্বচ্ছ করতে আমার আগ্রহ আন্তরিক, এবং সাধনা শ্রমবিমুখ নয়। সিদ্ধি অবশ্য এখনও সুদূর। প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে কাদের ধারণা যে স্বচ্ছ তা আমি জানি না, আমার সমালোচকদের যে নেই সেটুকু বলতে পারি। পূর্বোক্ত দু'জন সমালোচকের কথাই ধরা যাক—এঁদের সমালোচনা নিয়েই কথা হচ্ছে যখন। দেখছি রবীন্দ্রনাথের "ভক্ত" কবিতা বিষয়ে এঁরা একমত: সেটা প্রেমের কবিতা নয়। এই কবিতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পূর্বে জানিয়েছি। বসুমহাশয়ের মতে বিষ্ণু দের 'আলেখ্য' প্রেমের কবিতা নয়, কিন্তু তাঁর 'ঘোড়সওয়ার' প্রেমের কবিতা। দাশগুপ্ত মহাশয়ের মত ঠিক উল্টো। বসু মহাশয়ের মতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নির্বাচিত সব কবিতাই প্রেমের কবিতা; দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে তাঁর "নান্দীমুখ" প্রেমের কবিতা নয়। তিনি কি ঠিক জানেন যে ঐ কবির "শর্বরী" তাঁর স্বকীয় সংজ্ঞা-অনুযায়ী প্রেমের কবিতাই, "প্রেম তত্ত্ব নিয়ে রচিত" নয়? এই সমালোচকের মতে বুদ্ধদেব বসুর "কবিমশাই"-ও প্রেমের কবিতা নয়; বসু মহাশয়ের ঐ কবিতাকে প্রেমের কবিতা বলতে কোনো আপত্তি নেই। জীবনানন্দ দাশের "ধান কাটা হয়ে গেছে"-কে দুজনই বাদ দিতে চান, কিন্তু ভিন্ন কারণে। বসু মহাশয়ের মতে কবিতাটি ভালই, কিন্তু প্রেমের কবিতা নয়; দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে কবিতাটি বাজে, তাতে কবির সুনাম বিপন্ন হয়।

রুচিভেদ স্বাভাবিক, পররুচি-সহিষ্ণুতা বিরল, কিন্তু একেবারে তথ্যাতথ্য-জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মত অধৈর্য বিস্ময়কর। কিরণশংকর সেনগুপ্তের কোনো কবিতা নির্বাচিত হয়নি বলে শ্রীমান সুরজিৎ দাশগুপ্ত উষ্মা প্রকাশ করেছেন, অথচ সংকলনের সূচিপত্রে এই কবির নাম আছে, ১৬৩-১৬৪ পৃষ্ঠায় তাঁর কবিতা রয়েছে। অজিত দত্তের "আর সব

রচনা বাদ দিয়ে 'নষ্টচাঁদ' নেওয়া হয়েছে”—এই উক্তিও তথ্যের ধার ধারে না, কারণ অজিত দত্তের আরও দুটি কবিতা এই সংকলনে বর্তমান।

কবিতা সরল ও নির্ভার হবে, 'সর্বত্রগামী' হবে; এবং গদ্যেই থাকবে নানা দুরূহ জটিল ও জ্ঞানগুরু বিষয়ের আলোচনা, বিষয়-অনুযায়ী অধিকারভেদ কতক পরিমাণে মেনে নেবে গদ্য—এটাই স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু এ এক অদ্ভুত যুগে আমরা বাস করছি যখন কবিরা দাবী করেন (এবং সে দাবী সমালোচকরা সোৎসাহে সমর্থন করেন) যে প্রত্যেকটি কবিতা পাঁচবার করে পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে পাঁচ মিনিট ধরে ভাবতে হবে, নইলে কবিতা হবে হেঁয়ালি; তীক্ষ্ম ও সজাগ বুদ্ধি এবং প্রভূত জ্ঞানভাণ্ডার না থাকলে কবিতা-পাঠে অধিকার জন্মাবে না কারো। অথচ গদ্যে পৃথিবীর গভীরতম সমস্যার আলোচনা করতে গেলেও সে গদ্য চোখ বুলিয়েই বুঝে ফেলা যাবে, পাঠকপক্ষে বিন্দুমাত্র শ্রবণ-মনন না থাকলেও যদি কোনো পাঠক কোথাও কিছু বুঝতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করেন তবে যত দোষ সব প্রবন্ধকারের। কবির কোনো প্রসাদগুণ থাকা অনাবশ্যক, পাঠক-কেই নিজগুণে বা বিশ্বকোষ ঘেঁটে কবিতার মর্মোদ্ঘাটন করতে হবে। মনে হয় এঁরা যেন ধরেই নিচ্ছেন যে পদ্যরচনা পড়বার বেলায় পাঠক হয়ে উঠবেন বিশিষ্ট এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ, আর গদ্যরচনা পড়বার বেলায় হয়ে যাবেন সাধারণ অর্থাৎ যে কোনো 'দুরূহ' বিষয়ে প্রবেশাধিকারের অযোগ্য। তেমন সাধারণ পাঠককে যদি গদ্য-প্রবন্ধকার তাঁর প্রসাদগুণেই প্রসন্ন করতে না পারেন তাহলে সেই লেখকের “শির লে আও।” প্রাক্তন কাব্যের অনুরাগীরা এ দাবী করলে তবু তাঁদের দাবীতে একটা সামঞ্জস্য থাকে, বলা যায় তাঁরা সর্বত্রই সহজিয়াপন্থী, সরল রেখায় চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক কবি ও কাব্যানুরাগীদের মুখে এ-হেন দাবী বড় অদ্ভুত শোনায়।

আ. স. আইয়ুব

সমালোচনা

The Domestic Servant Class in 18th Century England. *By* J. Jean Hecht. Routledge & Kegan Paul. London. 25*s*.

সামাজিক ইতিহাস রচনায় যাঁরা সিদ্ধহস্ত তাঁদের মধ্যে ইংরেজ ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান অন্যতম। এক্ষেত্রে জীন হেখ্‌ট একেবারে নবাগত না হলেও, অভিজ্ঞতায় নবীন। তাঁর অনুসন্ধানী মনের নবীনতা বিস্ময়কর। সমাজের অনাদৃত আনাচকানাচ থেকে এমন সব উপকরণ তিনি সংগ্রহ করতে পারেন, ঐতিহাসিকের কাছে যা অমূল্য সম্পদ। সেই ধরনের উপকরণ আহরণ করে জীন হেখ্‌ট সম্প্রতি যে 'অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের গৃহভৃত্যশ্রেণীর' ইতিহাস রচনা করেছেন, তা সমাজেতিহাস-সাহিত্যের সম্ভার নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করবে।

ট্রেভেলিয়ান তাঁর বিখ্যাত বইয়ের* ভূমিকায় সামাজিক ইতিহাসরচনার লক্ষ্য, পদ্ধতি, উপকরণ-সন্ধান, নির্বাচন ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছেন, তা আলোচ্য বই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, সামাজিক ইতিহাসের 'নেগেটিভ' সংজ্ঞা হ'ল, যা রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, তাই সামাজিক ইতিহাস। তারপর কথাটাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কোন জাতির ইতিহাস থেকে রাজনীতি বর্জন করা অবশ্য শক্ত, কিন্তু জাতির ইতিহাসের নামে সমাজবর্জিত রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত এত বেশি রচনা করা হয়েছে যে এখন তার অভাবপূরণের জন্য বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করাও দোষের নয়। আমাদের জীবদ্দশায় তৃতীয় আর-এক ধরনের ইতিহাসরচনার প্রচলন হয়েছে, তার নাম অর্থনৈতিক ইতিহাস। তার ফলে অবশ্য সামাজিক ইতিহাসরচনার সুবিধা হয়েছে যথেষ্ট। কারণ বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য থেকেই বিশেষ বিশেষ সামাজিক জীবনযাত্রার উদ্ভব হয় এবং সেই বিশেষ সমাজ-জীবন থেকে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি হয়। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে, সমাজেতিহাস ভিন্ন অর্থনৈতিক ইতিহাসের বন্ধ্যাত্ব ঘোচে না এবং রাজনৈতিক ইতিহাস জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করাই সামাজিক ইতিহাসের লক্ষ্য নয়। তার নিজস্ব কর্তব্যও কম নয়। অতীত কালের লোকজন কিভাবে প্রাত্যহিক জীবনযাপন করত, কি চিন্তা করত, কল্পনা করত, ধর্ম শিক্ষা সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে কেমনভাবে তাদের সংস্কৃতি প্রকাশ হত—এসব বিষয় সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু অতীতের এসব কথা জানা কত কঠিন। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদরা প্রাচীন দলিলপত্র, চিঠিপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি ঘেঁটে অতীতের কত অজানা তথ্য পুনরুদ্ধার করেছেন। কেবল এইগুলি পাঠ করতে যে কোন লোকের সারাটা জীবন কেটে যেতে পারে। তারপরেও মনে হয়, এসব তথ্যও

* G. M. Trevelyan—*English Social History*.

যথেষ্ট নয়। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রত্যেকের জীবনকাহিনী জানা যেত, তাহলে সামাজিক ইতিহাস রচনার সুবিধা হত। তা যখন জানবার উপায় নেই তখন সমাজেতিহাস রচয়িতাকে কয়েকটি বিশেষ-নির্বাচিত বিষয়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সমগ্র সামাজিক সত্যের সম্পূর্ণ জটিলতা তাতে প্রকাশ পেতে পারে না। কিন্তু তা ছাড়া পথও নেই। ট্রেভেলিয়ানের নিজস্ব উক্তি হল :

> The generalisations which are the stock-in-trade of the Social historian, must necessarily be based on a small number of particular instances, which are assumed to be typical, but which cannot be the whole of the complicated truth.

এ-উক্তির অর্থ সমাজেতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের অনুধ্যেয়। সুনির্বাচিত তথ্য ও 'টিপিক্যাল' তথ্য-গ্রন্থন ভিন্ন সামাজিক তথ্যের অগাধ সমুদ্রে ঐতিহাসিকের লক্ষ্যতরী দিকভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা। একশ্রেণীর ঐতিহাসিক আছেন, তথ্যের যান্ত্রিক ক্যাটালগিং যাঁরা পবিত্র কর্তব্য মনে করেন। দিকনির্ণয়ের, অথবা সংশ্লেষণের পক্ষপাতী নন তাঁরা। আমাদের দেশে এখনও ঐতিহাসিক এষণা চর্বিত তথ্যচর্বণের এই আদিম স্তরে নিবদ্ধ।

> At bottom, I think, the appeal of history is imaginative. Our imagination craves to behold our ancestors as they really were, going about their daily business and daily pleasure. Carlyle called the antiquarian or historical researcher 'Dryasdust'. Drysdust at bottom is a poet.

ট্রেভেলিয়ানের এ-উক্তি অবিস্মরণীয়। ধূলিরুক্ষ তথ্যান্বেষী যদি কবি-কল্পনাবর্জিত হন, তাহলে সামাজিক ইতিহাসরচনার স্পৃহা তাঁর ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। জীন হেখট 'ড্রাই-অ্যাজ-ডাস্ট' অন্বেষক হয়েও কবিধর্মী। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ সমাজ থেকে তাই এমন একটি 'টিপিক্যাল' বিষয় তিনি নির্বাচন করেছেন, যা আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য হলেও, তখনকার জীবনযাত্রার বহু আবছা-অজানা দিকগুলিতে অপ্রত্যাশিত আলোকসম্পাত করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজেতিহাসের অন্বেষণক্ষেত্রের সাংস্থানিক চিত্র যে কত জটিল এবং অনুজ্জ্বল রেখায়নে পরিক্ষিপ্ত, জীন হেখটের আলোচ্য গ্রন্থপাঠে তার আভাস পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের গৃহভৃত্যশ্রেণীর জীবনেতিহাস, তাৎকালিক সমাজের সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষের জীবনকে নানাদিক থেকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর বিশ্লেষণরশ্মির তীব্র বিচ্ছুরণে সাম্প্রতিক সমাজের অস্থিবিন্যাসের আকালিকতা বা অ্যানাক্রনিজ্‌ম পর্যন্ত ধরা পড়েছে। এইখানেই তাঁর সমাজেতিহাস রচনার প্রয়াস সার্থক হয়েছে মনে হয়।

সামাজিক ইতিহাসরচয়িতার তল্লাসযোগ্য তথ্যকন্দরের মধ্যে প্রধান হল, দিনপঞ্জী স্মৃতিকথা চিঠিপত্র, প্রাচীন পত্রিকা ও সংবাদপত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সাহিত্য। জীন হেখট সব কটি কন্দর থেকেই পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 'ভূমিকায়' তিনি বলেছেন :

> A good deal of the material employed in the study has been extracted from the usual quarries of the social historian: diaries, memoirs, letters, magazines, newspapers, the accounts of travellers, and literary works. Much has also been taken from pamphlets and treatises on social and economic problems of the day. And, of course, a wealth of data has been drawn from contemporary works on service, servants, and household management.

প্রথম অধ্যায়ে হেখট ভৃত্যদের 'চাহিদা' ও 'সরবরাহ' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে বিভিন্ন চাকুরিজীবীশ্রেণীর মধ্যে ভৃত্যশ্রেণী বৃহত্তম শ্রেণী ছিল। মধ্যযুগ তখন অস্তমিত, তা সত্ত্বেও গৃহভৃত্যের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কি? এই সময় ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যে অতিদ্রুত পরিবর্তন হয়, তার ফলেই ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদা বাড়তে থাকে এবং চাহিদা অনুপাতে সরবরাহও ক্রমে বৃদ্ধি পায়। শিল্পবাণিজ্যের বিস্তারের ফলে সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়। একদা যারা অখ্যাত ও অজ্ঞাত ছিল সমাজে, অর্থোপার্জনের নানারকম স্বাধীন সুযোগ পেয়ে তারা নিজেদের শ্রেণীমর্যাদা স্থাপনে সক্ষম হয়। নতুন নতুন ধনিক অভিজাত বংশ গড়ে ওঠে। নতুন ঘরবাসী, নতুন পরিবারের সংখ্যা বাড়ে। বাণিজ্যযুগের নতুন সঙ্গতিপন্ন বণিকশ্রেণী আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় সেকালের লর্ড-ডিউকদের হার মানাতে চান। তাঁদের জন্য বিলাসিতার সমস্ত উপকরণের চাহিদা বেড়ে যায়। এই সব উপকরণের মধ্যে ঘরবাড়ী আসবাবপত্তর পোষাক-পরিচ্ছদের মতন চাকরচাকরাণীও অপরিহার্য। নতুন ধনিক বণিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাসিতার বাসনা চরিতার্থের জন্য চাকরশ্রেণীর চাহিদা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাড়তে থাকে। দুদিকের চাপেই বাড়তে থাকে। এদিকে নতুন অভিজাতশ্রেণী জাঁকজমকের বাহুল্যের জন্য যেমন লালায়িত হয়ে ওঠেন, তেমনি ওদিকে বনেদী অভিজাত যাঁরা, তাঁরা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর 'চ্যালেঞ্জে' নিজেদের অপসৃয়মান সামাজিক মর্যাদারক্ষার জন্য আরও বেশি সচেতন হন। সামর্থ্যের অতীত হলেও, চাকর পোষার প্রয়োজন তাঁরা আরও বেশি করে অনুভব করতে থাকেন। শিল্পবাণিজ্যযুগের নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে, উদীয়মান ও অস্তমান অভিজাতশ্রেণীর এই মর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, দুই শ্রেণীর পক্ষ থেকেই চাকরশ্রেণীর চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে তাই চাকুরিজীবীদের মধ্যে গৃহভৃত্যরাই প্রধান হয়ে ওঠে।

যে পরিবারে চাকরচাকরাণীর সংখ্যা যত বেশি, সেই পরিবারের সামাজিক মর্যাদা তত বেশি। চাকরই মর্যাদার প্রামাণ্য মানদণ্ড। স্কুলের ছাত্রছাত্রী বালকবালিকারাও সে-সম্বন্ধে সচেতন। জনৈক পাদরি সাহেবের কন্যা তাঁর বাল্যজীবনের স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> I was interrogated by many of the young ladies as to the station of my father, or rather respecting the figure he made in the world. 'Does your papa keep a coach'?—'No'—'How many servants have you?'—'Four'—'Dear; only think Miss's papa does not keep a coach, and they have only four servants. (*Memoirs of the Life of the Late Mrs. Catherine Cappe*, 1824, p. 40, Quoted by Hecht).

মধ্যযুগের লর্ডদের তুলনায় নবযুগের উচ্চশ্রেণীর চাকরের বিলাসিতা অবশ্য অনেক কম ছিল। তখন লর্ডদের পরিবারে শতাধিক ভৃত্যপোষণ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে ওয়ারিকের আর্ল ৬০০ জন চাপরাসী নিয়ে পার্লামেণ্টে যেতেন। তাঁর চেয়ে ক্ষুদ্রতর জীব, কেণ্ডলের ডেপুটি-স্টিউআর্ড যেতেন ২৯০ জন চাপরাসী নিয়ে। ক্রমে এই চাকরের সংখ্যা এই সব পরিবারে কমতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে গড়পড়তায় শ'খানেকে দাঁড়ায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও কমে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায়, পরিবারপ্রতি ভৃত্যসংখ্যা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরিবারের আয়তনহ্রাসের সঙ্গে তুলনা করলে এ-সংখ্যাও যথেষ্ট বেশি। জীন হেখট অনেক পরিবারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে দশ থেকে পনেরকুড়িজন ভৃত্য প্রতিপালিত

হত। পরিবার ও ভৃত্যসংখ্যার তালিকা দিয়ে হেখট তা ভাল করেই প্রমাণ করেছেন।

প্রত্যক্ষ তথ্যাশ্রিত বিশ্লেষণ ছাড়াও হেখট সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যয় প্রয়োগ করে সমস্যাটি বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, নাগরিক সমাজে, লণ্ডনের মতন বর্ধিষ্ণু শহরে, ভৃত্যসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে ব্যক্তিগত সম্পর্কশূন্য সমাজে বাহ্যরূপের পরিচয়টাই প্রধান হয়ে ওঠে। নাগরিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার নৈর্ব্যক্তিকতা। মধ্যযুগের গ্রাম্যসমাজের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিসম্পর্ক ও কুলগত পরিচয়ের বন্ধন অনেক দৃঢ় ছিল। সেখানে বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন হত বিলাসিতার জন্য বা পদমর্যাদার জন্য, আত্মপরিচয়ের জন্য নয়। নাগরিক সমাজে 'ব্যক্তি' হিসেবে সকলেই অজ্ঞাতকুলশীল। কৌলিক পরিচয়ের মূল্য সেখানে অল্প ও সতত পরিবর্তনশীল। বস্তুত, নৈর্ব্যক্তিক নাগরিক সমাজে নৈকষ্য কৌলীন্যের দাবি তাঁদেরই গ্রাহ্য হয় যাঁদের বাইরের বিত্তসমারোহ যত বেশি। সুতরাং নতুন শহরে আভিজাত্য ও ভদ্রতার উপচারবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। আত্মমর্যাদা ঘোষণার তাগিদে লণ্ডনের মতন শহরে তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভৃত্যশ্রেণীর কলেবর স্ফীত হয়েছিল। মধ্যযুগের বড় বড় বনেদী যৌথ পরিবার ভেঙে ক্ষুদ্রায়তন হলেও এবং তার পোষ্য ভৃত্যসংখ্যা পূর্বের তুলনায় কমে গেলেও, সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্যাসে যেহেতু বিত্তবান শিল্পপতি, বণিকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তের সংখ্যাপ্রাধান্য বাড়ছিল, সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছিল, সেই হেতু চাকরচাকরাণীর মোটসংখ্যাও চাহিদানুপাতে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল। এই সময় তাই সর্বশ্রেণীর চাকুরিজীবীর মধ্যে চাকররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল।

ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদাবৃদ্ধির সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ করে জীন হেখট তার সরবরাহের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের এই অংশটুকু, পুরাতন সমাজের ভাঙন ও নতুন সমাজের গড়নের ইতিহাসের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে। ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি যাঁদের আছে তাঁরা ইতিহাসের ভাঙাগড়ার অন্তর্নিহিত এই ছন্দটিকে আবিষ্কার না করে তৃপ্ত হন না। তা না করতে পারলে, স্তূপীকৃত তথ্যের পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করবার পরেও চারিদিকে চেয়ে কেবল অর্থহীন শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। জীন হেখট প্রধানত সমাজবিজ্ঞানী, তাই তিনি এই ধরনের শূন্যবাদী ইতিহাসচর্চার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। আলোচনার প্রত্যেক স্তরে তথ্যানুগ হয়েও তিনি তাঁর প্রমাণ দিয়েছেন যথেষ্ট।

সমাজের কোন্ স্তর থেকে এই ভৃত্যশ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে হেখট দেখেছেন যে গ্রামের কৃষকশ্রেণীর স্তর থেকেই চাকরচাকরাণীর আমদানি হত বেশি। তার মধ্যে চাষীদের ছেলেমেয়ে ও ক্ষেতমজুররাই প্রধান। গ্রামের ভূস্বামীরা নিজেদের জমিদারীর অধীন চাষীপ্রজাদের ভিতর থেকে চাকরচাকরাণী রেক্রুট করতেন, কারণ তাতে ভৃত্যদের বশ্যতা ও প্রভুভক্তি সম্বন্ধে তাঁরা অনেক বেশি নিরুদ্বিগ্ন হতে পারতেন। ক্ষুদে জমিদার, অর্থাৎ এখনকার গাঁতিদার জোত্দারদের সমকক্ষ যাঁরা, তাঁরা অনেক সময় আশপাশের কোন বড় জমিদারী থেকে ভৃত্য নিয়োগ করতেন, দূরাঞ্চলের লোক পছন্দ করতেন না। তারও কারণ ছিল ঐ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা। লক্ষণীয় হল, গ্রামের এই শ্রেণীর লোক যারা চাকরের পেশা গ্রহণ করত, সাধারণত তারা গ্রামাঞ্চলে থাকতে চাইত না, শহরে আসতে চাইত। শহরের ভৃত্যপালকরাও গ্রামের ভৃত্য নিয়োগ করতে

চাইতেন, তার কারণ শহরের ভৃত্যদের কুকর্মপ্রবণতায় তাঁরা বিচলিত হতেন। তা সত্ত্বেও অবশ্য অভিজ্ঞ শহুরে চাকরদের বিশেষ কর্মদক্ষতার জন্য চাকরির অভাব হত না। মুখ্য ভৃত্যের কাজ গ্রাম্যরা পেত না, শহুরে চাকরের অধীনে ছোট পদে বহাল হয়ে তাদের কাজ করতে হত।

গ্রাম্য ভৃত্যরা গ্রামে না থেকে শহরে আসতে চাইত একাধিক কারণে। শহরের আকর্ষণ গ্রামের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি ছিল এবং তার বৈচিত্র্যও ছিল। শহরের বেতন, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জীবনযাত্রা ভৃত্যশ্রেণীরও কাম্য হওয়া স্বাভাবিক। শহরের ভৃত্যরা ছুটির দিনে গ্রামে ফিরে গিয়ে এই সব নাগরিক সুখের কথা গ্রাম্য মজলিসে বর্ণনা করত। গ্রাম্য ভৃত্যদের নগরাকর্ষণ আরও তীব্র হত তাতে। সমসাময়িক একজন লেখক এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

> The plough-boys, cow-herds, and lower-hinds, are debauched by the appearance and discourse of those coxcombs in livery, when they make their summer excursions. They desert their dirt and drudgery, and swarm up to London, in hopes of getting into service, where they can live luxuriously and wear fine clothes. (Smollet's *Humphry Clinker,* Works, VII, 108, quoted by Hecht.).

এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলের নতুন 'এনক্লোজার' নীতিও ভাসমান ভৃত্যশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হয়েছিল। পুরাতন গ্রাম্যসমাজের ভিত্ ভেঙে দিয়েছিল এনেক্লাজার নীতি। ভূসম্পত্তির অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই যে এক-এলাকাভুক্তির অভিযান, এর আঘাত স্বল্পবিত্ত দরিদ্র খণ্ডভূমির মালিক প্রজাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। তারা কৃষিজীবী থেকে শ্রমজীবীশ্রেণীতে রূপান্তরিত হল। একীকরণের ফলে যেখানে আবাদী জমি চারণভূমিতে পরিণত হল (পশমব্যবসায়ীদের ভেড়ার পালের জন্য), সেখানে গ্রাম-কে-গ্রাম উৎসন্নে গেল। গ্রামবাসীরা নগরাভিমুখী হতে বাধ্য হল। নতুন নগরে কারখানার মজুরের চাইতেও তখন গৃহভৃত্যের চাহিদা বেশি। কারখানা বসছিল, কিন্তু তার চাইতে আরও দ্রুত হারে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বাড়ছিল। সুতরাং মজুরশ্রেণীর তুলনায় ভৃত্যশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছিল লণ্ডনে ও তার আশেপাশে। নবযুগের সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের প্রথম পর্যায়ের এই বৈশিষ্ট্যটি জীন হেখট সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রমশিল্পের ও কলকারখানার ক্রমিক প্রসারের ফলে ভৃত্যশ্রেণী ধীরে ধীরে শ্রমজীবীশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে তার জন্য পরিবারে ভৃত্যসংকট দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা, ইংলণ্ডে উনিশ শতকের প্রথম পাদে শিল্পবিপ্লব সার্থক হলেও, শেষপাদ থেকে এই লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে যেমন সম্প্রতি নাগরিক পরিবারে, একই কারণে, এই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে।

কেবল কৃষকশ্রেণীর স্তর থেকেই ভৃত্যের আমদানি হত না, গ্রামের কারুশিল্পী, দোকানদার ও কারিগরদের মধ্য থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে হত। এ-সম্বন্ধে হেখট তথ্য-প্রমাণসহ উক্তি করেছেন :

> In addition to the agrarian population the artisan class of the rural regions also contributed to the supply of domestics . . . In London, too, and in the smaller towns, the children of craftsmen and manufacturers were taken as domestics. Thus, arguing in 1763 that certain industries

were undermanned, an essayist lamented the diversion of young hands from productive work: (*London Chronicle*, 1763, XIII, Quoted by Hecht).

নাগরিক আকর্ষণ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে গ্রাম্য পেশার বংশানুক্রমিক বন্ধন ছিন্ন করেও শিল্পীকারিগরদের মন নগরাভিমুখে ধাবমান হত। কেবল নাগরিক বিলাসিতার ও স্বাচ্ছন্দ্যের বৈচিত্র্যই যে একমাত্র আকর্ষণ ছিল তা নয়, তার চাইতে আরও অনেক বড় আকর্ষণ ছিল নতুন নাগরিক সমাজের আন্তঃশ্রেণিক গতিশীলতা (ইণ্টার-ক্লাস মোবিলিটি)। গ্রাম্য শ্রেণীবিন্যাস নিশ্চল, নাগরিক শ্রেণীবিন্যাস সচল। গ্রাম্য কর্মকারের গ্রাম্যসমাজের শীর্ষস্তরে আরোহণ করার কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। নাগরিক সমাজে সে স্বচ্ছন্দে জীবনসংগ্রামের সাফল্যের জোরে শীর্ষস্তরে উঠতে পারে। নগরজীবনের এই বন্ধনহীন গতিশীলতাই ছিল প্রধান আকর্ষণ, যার জন্য কেবল কৃষিজীবীরা নয়, শিল্পজীবীরাও নগরে এসে ভিড় করত এবং প্রথমে ভৃত্যশ্রেণীভুক্ত হয়ে নগরবাসের ব্যবস্থা করত।

নানারকমের গ্রাম্য মেলায় ও হাটবাজারে কিভাবে চাকুরিপ্রার্থী চাকরচাকরাণীদের সমাবেশ হত, জীন হেখট তারও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। পরিবারের কর্তারা এই সময় মেলায় ও বাজারে গিয়ে, দরদস্তুর করে, চরিত্রপত্র দেখে, ভৃত্য পছন্দ করতেন। শহরের কাছাকাছি সরাইখানাতেও ভৃত্যরা এসে জমা হত। গ্রাম্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আসত তারা এবং শহরবাসীরা সরাইয়ের মালিকের কথায় তাদের কাজে নিয়োগ করতেন। রেজিস্টার আপিসও ছিল ভৃত্যদের জন্য। মালিক ও ভৃত্যরা উভয়েই 'ফি' দিয়ে নাম লিখিয়ে রাখত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভৃত্য মালিক পেত, মালিকও ভৃত্য পেত। এই সব নিয়োগকেন্দ্র দুর্নীতির প্রশ্রয়ও দিত যথেষ্ট। গ্রাম্য মেয়েরা, যারা চাকরাণীর কাজের সন্ধানে আসত শহরে, তাদের জাল মালিকের হাত দিয়ে নগরের বারাঙ্গনাপল্লীতে চালান করারও কোন অসুবিধা হত না।

ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদা ও সরবরাহ-সমস্যার নানাদিক সম্বন্ধে আলোচনা করে, হেখট পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যথাক্রমে "ভৃত্যদের পদবিন্যাস", "প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক", "ভৃত্যদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য", "আমোদ-প্রমোদ অবসর", "আর্থিক পুরস্কার" ও "সামাজিক অগ্রগতি" সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কেবল জ্ঞাতব্য তথ্যের দিক থেকে নয়, সামাজিক ইতিহাসের ধারা-বিশ্লেষণের অপূর্ব নৈপুণ্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি অধ্যায় বারংবার পঠিতব্য। এত তথ্য এবং তথ্যান্তর্গত ভাবসম্পদ এত সমৃদ্ধ যে সমালোচনার স্বল্প-পরিসরে তার আভাস দেওয়াও দুরূহ।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে আমার মনে হয়েছে। এই অধ্যায়ে জীন হেখট প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, কিভাবে এই ভৃত্যশ্রেণী তখনকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। দেবতার বাহনের মতন, সমাজের উচ্চশ্রেণীর বাহন হয়ে, নিজেদের অনুচীকির্ষার জন্য, ভৃত্যরা প্রভুদের 'মডেল' হয়ে সমাজে চলতে চেয়েছে। সে-বাসনা হাস্যকর হলেও, অদম্য এবং তার প্রকাশও অপ্রতিরোধ্য। উচ্চশ্রেণীই সমাজে সংস্কৃতির ধারক, কিন্তু তার বাহক সেই শ্রেণী-বহির্ভূত সাধারণ মানুষ। ভৃত্যশ্রেণী এই বাহকদের মধ্যে এক সময় নাগরিক সমাজে অগ্রগণ্য ছিল। উপরতলার আচরিত সংস্কারের পরিচয় নিচের তলায় তারা বহন করে

আনত এবং সাংস্কৃতিক প্রসার ও লেনদেনের পথ প্রশস্ত করে দিত। কি ভাবে করত?

> In one way or another, then, the subordinate classes gained a certain familiarity with the manners of the elite; and for the most part, they sought to imitate it as closely as possible. This was natural. In virtually all societies that possess social solidarity the highest social strata tend to be taken as models by the strata beneath. Imitation may not be carried very far; in fact, where there are specific tabus against it, or where there are wide fissures in the social structure, it may scarcely occur at all. Nevertheless, the tendency normally exists; and in eighteenth-century England it existed under optimum conditions (Pp. 203-204).

হেখটের এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তি প্রণিধানযোগ্য। সংস্কৃতির বাহক হিসেবে ভৃত্যশ্রেণী, সমাজের উপরের স্তর থেকে সাধারণ স্তরে, কোন্ জাতীয় উপাদান বহন করে নিয়ে যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে অনেকে কৌতূহলী হতে পারেন। তথ্যপ্রমাণসহ জীন হেখট এ-সম্বন্ধে উত্তর দিয়েছেন যে, পোষাক-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা, আচারব্যবহার, অভ্যাস, ধ্যানধারণা, সবই ভৃত্যরা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক আদর্শ থেকে হ্যাট্ পরার ভঙ্গি পর্যন্ত ভৃত্যদের মধ্য দিয়ে সমাজে প্রচলিত হওয়া সম্ভব :

> The cultural elements thus relayed were of all sorts: articles of clothing, gestures, moral values, ideas. A new attitude towards church or state was as likely to be passed on as a new way of cocking a hat . . . During the whole of the preceding century servants had been similarly effective in disseminating their employers' views (Pp. 221-222).

গৃহভৃত্যশ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক ভূমিকা উদ্ঘাটনে জীন হেখট সফল হয়েছেন এবং এই সাফল্যের মধ্যেই তাঁর ভৃত্যশ্রেণীর সামাজিক ইতিহাসরচনা সবচেয়ে বেশি সার্থকতা লাভ করেছে। সংগৃহীত তথ্যস্তূপের ভিতর থেকে তিনি সমাজেতিহাসের অন্তঃসলিলা প্রাণপ্রবাহটি খনন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন এবং চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। একাজ সম্ভব হয়েছে, কারণ হেখট কেবল ইতিহাসের অনুরাগী নন, সমাজবিজ্ঞানেরও অনুশীলক। তাই যে অন্তর্দৃষ্টি ও তথ্যোত্তীর্ণ কল্পনাশক্তি ভিন্ন কোন ইতিহাসেষণাই কখন সার্থক হতে পারে না, হেখটের তা অভাব হয়নি। আমাদের দেশের ইতিহাসরচনা এখনও তথ্য-সংকলনের প্রাথমিক স্তরে আবদ্ধ। ঐতিহাসিকদের একপেশে বিশেষজ্ঞতা তথ্যাতিরিক্ত কল্পনার পরিপন্থী। তাই এদেশে 'ক্রনিকেল' শ্রেণীর ইতিহাস যত লেখা হয়েছে, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস তার শতাংশের একাংশও হয়নি। যাঁরা ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন এবং ইতিহাসের ছাত্র, তাঁদের সকলেরই কর্তব্য এই অন্বেষণ-বিশ্লেষণ পদ্ধতির পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে সংযোগ রাখা। যে-ভৃত্যশ্রেণী হেখটের আলোচ্য বিষয়, তারা ইংলণ্ডের ও লণ্ডনের। আমাদের বাংলাদেশে ও কলকাতা শহরেও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এই ভৃত্যশ্রেণীর বিচিত্র সমাগম ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল। তার ইতিহাস রচনা করতে পারলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি বড় অধ্যায় রচনা সম্পূর্ণ হতে পারে, এবং সমাজের নানাদিক ভৃত্যদের জীবনালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। জীন হেখটের বইখানি পড়তে পড়তে এই কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছিল।

বিনয় ঘোষ

সাহিত্য-চিন্তা—শিবনারায়ণ রায়। মিত্রালয়। কলিকাতা। দাম চার টাকা।

শিবনারায়ণ রায়ের চিন্তা সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মানবধর্ম, মানুষের বিকাশ এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের অগ্রগতির সমস্যা তাঁর পুস্তকের চিন্তার অন্তর্গত। যেহেতু মানুষের সব-কিছু নিয়েই সাহিত্যের কারবার, সেই হেতু কোনো চিন্তাই সাহিত্য-চিন্তার বাইরে নয়—এই বিশ্বাস থেকেই বোধ হয় তিনি তাঁর আলোচনাকে প্রচলিত সাহিত্য-ব্যাপারের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। আর মনুষ্যধর্ম ও সমাজের যাবতীয় সমস্যার মূল প্রকৃতি এবং সমাধানের পথ সম্বন্ধে তাঁর নিঃসংশয় প্রতীতি, তাঁকে এই বৃহত্তর ও আপাতদৃষ্টিতে গভীরতর আলোচনায় উৎসাহিত করেছে। তদুপরি, লেখক পণ্ডিতম্মন্য এবং পাণ্ডিত্য-বিলাসী। তার ফলে তিনি আলোচনার মধ্যে বিষয়গত যাথার্থ্যের সংযমের চেয়ে চিন্তার দ্বিধাহীন বিচরণ এবং পাণ্ডিত্যের রোমহর্ষক ব্যাপ্তিকেই বেশি মূল্য দিয়েছেন। ডুয়েরের-এর ড্রয়িং আর লেওনার্দোর স্কেচ, প্রোটাগোরাসের মানবীয় মূল্যবোধ আর লোরেঞ্জো ভালার সম্ভোগ-তত্ত্ব, আরিওস্তোর অর্লান্দো ফুরিওসো আর পাঁতাগ্রুয়েল-এর আজব কাহিনী, সিয়েহ্‌ হো-র শিল্প-সূত্র আর উচ্চেল্লো-র পরিপ্রেক্ষিতবোধ, এমন কি "মুশা হতে মহম্মদ, যাজ্ঞবল্ক্য হতে যীশু"—কেউ-ই বা কিছু-ই এই আলোচনা থেকে বাদ যায়নি।

তা হলেও, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এত সব বিভ্রান্তিজনক নাম ও উদ্ধৃতির মধ্যেও লেখকের মূল বক্তব্য একেবারে চাপা পড়েনি। বক্তব্য-প্রকাশের উগ্রতা এবং নিরন্তর পুনর্বিবৃতি বক্তব্যকে স্পষ্ট রাখতে সাহায্য করেছে।

আলোচনা সুরু প্লেটোর বহু-বিশ্লেষিত এবং অধুনা বহু-নিন্দিত সাহিত্য-বিচার থেকে। প্লেটোর সত্য-দর্শন ভ্রান্ত, কারণ "সত্য জ্ঞানের উপাদান এবং শেষ পর্যন্ত সব জ্ঞানই ইন্দ্রিয়নির্ভর"। জ্ঞান ইন্দ্রিয়নির্ভর বলেই সম্পূর্ণ বা নিত্য নয়, বিকাশধর্মী। সত্য আপেক্ষিক। কিন্তু তথাকথিত মহাপুরুষ বা দার্শনিকরা আংশিক জ্ঞানকে নিত্যসত্য বলে প্রচার করেন এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির নির্দেশ বলে এই জ্ঞানকে সর্বজনগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন। সাহিত্যিক অভিজ্ঞতানির্ভর, আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল সত্যকে অনুসরণ করেন; তিনিই প্রকৃতভাবে সত্যসন্ধ। তাঁর চোখে প্রতি ব্যক্তি অনন্য, অদ্বিতীয়, মূল্যবান; তাঁর কাছে ব্যক্তির বিকাশই প্রথম ও শেষ কথা। এই বিকাশের অবলম্বন ব্যক্তির যুক্তিবুদ্ধি ও মুক্তিস্পৃহা। এই ব্যক্তিবিকাশের ব্যাপক সূচনা য়ুরোপের রেনেসাঁস আন্দোলনে। রেনেসাঁসের জীবনদর্শন থেকেই আমাদের পথনির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। এই জীবনদর্শনের মূল কথা এই যে মানুষ-ই সবকিছুর মাপকাঠি এবং মানুষই মনুষ্যত্বের একমাত্র উৎস। প্রতি মানুষের মনে অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে—তার বিকাশের প্রকৃষ্ট পথ আত্মবিলোপ নয়, সম্ভোগ। পরম আদর্শ কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা নয়, মানবতন্ত্রের আদর্শ বৈশ্বিক মানব।

প্রথম দুটি প্রবন্ধে লেখক প্রধানত এই বক্তব্যই প্রচার করতে চেয়েছেন, এবং এই বক্তব্য-ই লেখকের অন্যান্য প্রত্যয় ও বিশ্লেষণের ভিত্তি। এই বক্তব্যের প্রকাশে ও বিশ্লেষণে মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতা এবং প্রচলিত দর্শনের মূঢ়তা নিয়ে লেখক বহু ব্যঙ্গ করেছেন এবং নিজের মতকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে সজোরে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ঘোষণা যত প্রবল, লেখকের বিশ্লেষণ তত দৃঢ় নয়। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-ই বিচারের এবং বিচার-নিষ্ঠ সিদ্ধান্তের একমাত্র উপাদান এ কথা লেখক শুধু স্বীকার-ই করেননি, এই কথাই প্রচলিত প্রত্যয় সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় পরিহাসের অবলম্বন। কিন্তু লেখকের নিজের সিদ্ধান্ত-

গঠনে এই কথার যথেষ্ট স্বীকৃতি নেই। প্রথম প্রশ্ন, অভিজ্ঞতার সংজ্ঞা কত ব্যাপক? লেখক ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকেই অভিজ্ঞতার সমগ্র সত্তা বলে গ্রহণ করেছেন এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োগেই জ্ঞানের উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। বুদ্ধি কি তাহলে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বস্তু? এ-কথাও পাই যে অভিজ্ঞতা থেকেই বুদ্ধির বিকাশ। তাহলে বুদ্ধি কী বস্তু? জ্ঞানের সত্যতার ভিত্তি কি অভিজ্ঞতা, না বুদ্ধি, না বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার মিশ্রণে কোনো তৃতীয় গুণ বা সত্তা? জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণে যদি বুদ্ধির কোনো দান থাকে এবং বুদ্ধি যদি অভিজ্ঞতার আগের বা বাইরের কোনো জিনিষ হয় তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই সত্যের একমাত্র ভিত্তি এমন কথা বলা যায় না।

এটা কূটতর্ক নয়, যে কোনো তত্ত্ব আলোচনার প্রাথমিক সমস্যা। অভিজ্ঞতাকে যদি সত্যের একমাত্র ভিত্তি বলতে হয়—বলা উচিত বলেই আমি মনে করি—তবে অভিজ্ঞতার অর্থ আরো ব্যাপকভাবে ধরতে হবে। বিশ্বাস, তথাকথিত বিশুদ্ধ প্রত্যয়, যাবতীয় কল্পনা, মূল্যবোধ—এ-সবই ব্যক্তির সমগ্র অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। সমগ্র চেতনাই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র; এই ক্ষেত্রে অস্তিত্ববান সব কিছুই অভিজ্ঞতার উপাদান। যিনি সত্যসন্ধিৎসু তাঁর পক্ষে কোনো অভিজ্ঞতাকেই উপেক্ষা করবার উপায় নেই। বিশ্লেষকের কাছে চার্বাক ও শঙ্কর, প্রোটাগোরাস ও প্লেটো, ভল্‌টেয়ার ও প্যাসকাল—সকলের অভিজ্ঞতাই সমভাবে অস্তিত্ববান এবং সমগ্র সত্যের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই সমগ্র চেতনা এবং চেতনাচালিত কর্ম নিয়েই সাহিত্য-সৃষ্টি। সাহিত্যিক সেই হিসেবেই সত্যসন্ধ।

এ কথা স্বীকার করেও বস্তুসত্তা ও মূল্যসত্তার প্রভেদ নির্ধারণ সম্ভব। যে সত্তা আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ আর যে সত্তা আমাদের চেতনা-সৃষ্ট মূল্যবোধের অভিব্যক্তি তার প্রভেদ সম্বন্ধে অবহিত হলে বিশ্লেষণের পথ সুগম হয়। মূল্যসত্তায় বস্তুসত্তার মতো চেতনা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আরোপ করার ফলেই ভাববাদী চিন্তার অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তি এড়াবার একমাত্র পথ বস্তুসত্তা থেকে আলোচনা সুরু করে মূল্যসত্তার প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা। কিন্তু ভাববাদী চিন্তার দুর্বলতা সম্বন্ধে শিবনারায়ণবাবু বিশেষভাবে সচেতন হলেও তার নিজের আলোচনা এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। তার ফলে, প্রচলিত ভাববাদী দর্শনের মূল্যসত্তা বর্জন করে তিনি যখন নতুন মূল্যসত্তাকে গ্রহণ করেছেন তখন এই সত্তার ভিত্তিকে বস্তুসত্তার অস্তিত্বের মতোই অবিচল বলে গ্রহণ করেছেন।

শিবনারায়ণবাবু বার বার বলেছেন যে মানুষ-ই মানুষের মূল্যবোধ বা নীতিবোধের একমাত্র উৎস। কিন্তু ভাববাদী দর্শনেও কি অন্য কোনো উৎস আছে? ব্রহ্ম, বা দেবত্ব—এ-ও তো মানুষের মূল্যবোধের-ই সৃষ্টি। এর যেমন কোনো বস্তুভিত্তি নেই, মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বা বিকাশের-ই কি কোনো বস্তুভিত্তি আছে? যে অর্থে আছে, শিবনারায়ণ রায় কি সে অর্থ গ্রহণ করবেন? সেই অর্থে মানুষ যেমন দয়াশীল বা বীর্যবান হতে পারে তেমনি নির্মম ও দুর্বল, অক্ষম হতে পারে। কোনো সম্ভাবনাকে আমরা মূল্যবান বা শ্রেয় মনে করি, কোনোটাকে মনে করি অবাঞ্ছনীয়। এ তো আমাদের মূল্য-বিচার। যে পরিণতি বাঞ্ছনীয় বা মহৎ, মানুষের "অন্তর্নিহিত" সম্ভাবনা সেই দিকে এমন কথা মনে করার কি কোনো বস্তুভিত্তি আছে? যে সম্ভাবনাকে আমরা কাম্য বা শ্রেয় মনে করি সেই সম্ভাবনার সার্থকতা-ই মনুষ্যত্বের বিকাশ এমন কথায় কারুর আপত্তি হবে না। কিন্তু কাম্য বা শ্রেয় যে কী সে প্রশ্নের সমাধান-ই তো মূল্যবোধের প্রকাশ।

অথচ, মানুষের বিকাশের কথা বলতে গিয়ে কতগুলি মূল্যসত্তার বিকাশের সম্ভাবনাকে

লেখক প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অমোঘ বলে ধরে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়। বলা হয়েছে যে ব্যক্তির স্বকীয় সম্ভাবনার বিকাশই সমাজ-সংগঠনের আদর্শ। যে ব্যক্তির বিকাশের সম্ভাবনা হিংসা ও দ্বেষে সেই ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করা কি কাম্য? যদি বলা হয় এই সব অবাঞ্ছনীয় পরিণতির দিকে মানুষের কোনো স্বাভাবিক প্রবণতা নেই, এবং "অন্তর্নিহিত" সম্ভাবনা জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি শ্রেয়বস্তুর দিকে, তবে অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। স্বাভাবিক বৃত্তি যে কী, আর তথাকথিত স্বাভাবিক বৃত্তির মধ্যে মূল্যবোধ দ্বারা নির্দিষ্ট অনুশীলনের ক্রিয়া কি পরিমাণ, এ প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন।

আসলে, মানুষের "গূঢ়" বা "অন্তর্নিহিত" সম্ভাবনা সম্বন্ধে লেখকের ধারণা প্রায় আধ্যাত্মিক রহস্যে আবৃত। আর এই ধরনের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকাশকেই তিনি যুক্তি-গ্রাহ্য, বিশ্লেষণ-নির্ভর তত্ত্ব বলে পরিবেশন করেছেন। "আত্মার পাপড়ি সংখ্যাহীন", "সত্যের অনুসন্ধানে সত্তার মুক্তি" ইত্যাদি আপাত-গভীর উক্তিতে লেখকের আত্মতৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু বস্তুনির্ভর বা যুক্তিনির্ভর বিচার-বিশ্লেষণ হয় না। মুক্তির দোহাই দিয়েই যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের দায়িত্ব শেষ হয় না।

যুক্তি শিবনারায়ণবাবুর বড়ো অবলম্বন নয়, প্রধান অবলম্বন বিশ্বাস। তিনি মানুষের অবশ্যম্ভাবী শ্রেয় সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, সম্ভোগের মহৎ ফলে বিশ্বাসী, মুক্তিস্পৃহায় বিশ্বাসী। বিশ্বাস ছাড়া আমাদের কারুরই গতি নেই, এবং আমাদের বিশ্বাস যদি অপরের বিশ্বাসের সঙ্গে না মেলে তাহলে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ না হওয়াই ভালো। কিন্তু কেউ যদি এই বিশ্বাসকেই বস্তু-অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বলে প্রচার করেন, আপত্তি উঠবে সেখানেই।

মানবতন্ত্রের মূলগত বিশ্বাস যা-ই হোক্ না কেন, এর বিকৃতি ও বিশ্লেষণে যখন যুক্তি ও বস্তুসত্যের বিকৃতি ঘটে তখন মনে হয় শেষ পর্যন্ত সব তন্ত্র-ই সমগোত্রীয়। যুক্তির বিকৃতি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করেছি। বস্তুসত্যের বিকৃতি-ও কম পীড়াদায়ক নয়। এই বিকৃতির মধ্যে-ও যথেষ্ট নিপুণতা নেই। তার ফলে পরস্পরবিরোধী উক্তির প্রাচুর্য। পশ্চিমী রেনেসাঁসের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই নাকি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার যাবতীয় প্রগতিমূলক চেষ্টা ও সৃষ্টি; অথচ লেখক অন্যত্র দুঃখ করেছেন যে রেনেসাঁসের সত্যান্বেষণ আর "বীর্যান্বিত ভোগবুদ্ধি"-র কোন চিহ্ন মেলে না ভিক্টোরিয় ইংরেজ-সমাজে। তাহলে কারা নিয়ে এলো আমাদের দেশে রেনেসাঁসের ঐতিহ্য? লেখক তো স্পষ্ট করেই বলেছেন "আমাদের সাহিত্যকল্পনা পুষ্ট হয়েছে স্কট-ওয়র্ডসোয়র্থ-টেনিসন-ডিকেন্সের ঐতিহ্যে"। যে দীনবন্ধু মিত্রের অশ্লীলতার প্রশংসায় লেখক উচ্ছ্বসিত, তিনি কি "পেত্রার্ক বোকাচ্চিও হতে শেক্সপীয়র সর্ভান্তেসের" ঐতিহ্যে পৃথক-ভাবে পুষ্ট?

য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের অভ্যুদয় ও বিকাশের যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন সে পরিচয় লেখকের মত সমর্থনের জন্য বিশেষভাবে সাজানো। ইতিহাস যে রেনেসাঁসের যুগের কথা বলে তার গতি ও প্রকৃতি এত সরল নয়। কিন্তু বস্তুসত্যের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করলে মত প্রচারের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকে না। কাজেই, অংশকে বা বিশেষ কতগুলি গুণকেই লেখক সমগ্র সত্য বলে পেশ করেছেন।

আর যেহেতু পৃথিবীর বা মানুষের ইতিহাসের যাবতীয় বস্তুকে লেখক এই রেনে-সাঁসের দান বলে ধরেছেন, সেই হেতু কান্ট মিলেছেন দেকার্ত-লকের সঙ্গে, দান্তে হয়েছেন চসারের সমগোত্রীয়। আর একই কারণে উপেক্ষিত হয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় শিল্প-

সাহিত্য সৃষ্টি যার প্রেরণা আধ্যাত্মিক, এমন কি ধর্মমূলক, মূল্যবোধ। যেখানে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি সেখানে এই সব সৃষ্টির মধ্যেও লেখক রেনেসাঁসের প্রভাব ও লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন।

অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত—মনুষ্যসমাজের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রেনেসাঁসের ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া পৃথিবীরও গতি নেই, বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষেরও গতি নেই। সব চেয়ে হাস্যকর সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসী সাধনার মোট সুফলের ইতিবৃত্ত—ইংলণ্ডের শ্রমিকসংগঠন আর মার্কিন দাসপ্রথার উচ্ছেদ। পর্বতের মূষিকপ্রসব। ছ'শো বছরের পৃথিবীর ইতিহাসে যাবতীয় পরিবর্তনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা মূল্য সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্ত সম্ভব হতে পারে এ কথা ভাবা কঠিন।

এসব বক্তব্য চাঞ্চল্যকর, কোনো কোনো জায়গায় রীতিমতো হাস্যকর হলেও অস্পষ্ট নয়। অবশ্য, "বিকাশ", "সম্ভাবনা" ইত্যাদি কথার ব্যবহারে অনেক অস্পষ্টতা আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু বক্তব্যের অস্পষ্টতা সব চেয়ে পীড়াদায়ক "ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক" শীর্ষক তৃতীয় প্রবন্ধে। শব্দপ্রয়োগের কোনো সংযম, অর্থকে নির্দিষ্ট করার কোনো চেষ্টাই নেই এখানে। "প্রকাশের আকুতিহীন রূপ", "রূপের মধ্যে সত্তার উন্মোচন", "ব্যঞ্জিত সমন্বয়ে বিভেদের আশ্রয়", "চিত্তের মুক্তি", "প্রকাশের আক্ষেপ"—এই জাতীয় কথার রহস্যালোকে একবার প্রবেশ করলে বোঝা যায় কেন জনৈক আধুনিক দার্শনিক শিল্পতত্ত্বের আলোচনাকে বলেছেন "boring . . . . . and largely bogus"। তবুও, এ কথা জানা গেল যে "রোমাণ্টিকের দৃষ্টিতে সব অর্থসমৃদ্ধ প্রচেষ্টার মূল উৎস ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধে।" আগের আলোচনার আলোকে মনে হতে পারে ব্যক্তি-স্বকীয়তার চরম মূল্যে বিশ্বাসী লেখক তাহলে এই রোমাণ্টিক মার্গেরই লোক। কিন্তু ক্লাসিক-কে বর্জন করতেও লেখক রাজী নন; তার ধর্ম সমন্বয়ের। "উভয়েরই উদ্ভব দ্বৈতে, সার্থকতা অদ্বৈতে।" তবুও, লেখার ঝোঁক থেকে মনে হয় রোমাণ্টিক ব্যক্তি-স্বকীয়তার বোধই লেখকের মূল্যবোধের প্রধান আশ্রয়।

কিন্তু এ ধারণা বদ্‌লাতে হয় পরবর্তী প্রবন্ধে এসে। এখানে দেখি রোমাণ্টিক নিন্দনীয়; রেনেসাঁসী জীবনদর্শনের সঙ্গে "রোমাণ্টিক সত্যবিমুখতা", "রোমাণ্টিক ভাবালুতা"-র দুস্তর প্রভেদ। যাই হোক্‌, এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বাংলাসাহিত্যের জীবনবিমুখতা, যার পরিচয় আমাদের শ্লীলতাবোধে। সম্ভোগবিদের অন্যতম কাম্য খিস্তির ভাষা। যে বঙ্কিমের প্রবন্ধ-উপন্যাসকে রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের পরিচায়ক বলে লেখক পূর্বে উল্লেখ করেছেন, সেই বঙ্কিমকে এখন বর্জন না করে উপায় নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের লেখার মধ্যে কিছু গ্রাম্য-রসিকতা পাওয়া যাওয়ায় বিদ্যাসাগর রেনেসাঁস আর ফরাসী সাহিত্যের বিচারে জাতে উঠেছেন। দীনবন্ধু মিত্র তো আছেন-ই, আর শেক্সপীয়র-এর দু'একটা বাছা উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

বাকী প্রবন্ধের বিষয়—চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে, কবিতার কান, আধুনিক কবিতা ও পাঠক। এদের বিস্তারিত সমালোচনা এখানে সম্ভব নয়। লেখকের মূল বক্তব্য ও আলোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে পরিচয় এ পর্যন্ত দিতে চেষ্টা করেছি সে পরিচয়ই বর্তমান পুস্তকের সমালোচনায় যথেষ্ট মনে করি।

মুক্তিস্পৃহা, বিশ্বমানবতা ইত্যাদি আদর্শ সাহিত্য-বিচারে না আনাই ভালো। এ-সব কথা যত সহজে বলা হয় এদের অর্থ তত সহজে পরিষ্কার হয় না। বক্তব্যকে পরিষ্কার

করে বিবৃত করা এবং বিষয়গত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা পণ্ডিতদের পক্ষেও লজ্জার বস্তু নয়। আর, বিদেশী নাম বাংলায় লেখার সময় বানানের অভিনবত্বের দিকে চেষ্টা না করাই ভালো। তা ছাড়া এই নামোল্লেখ যদি অপরিহার্যও হয় তবে একটু ভেবে-চিন্তেই নামগুলি বাছা ভালো। হেগেলের সঙ্গে হার্বার্ট রীডের নাম না করাই ভালো, "এরাজমুসের সঙ্গে বিদ্যাসাগর চরিত্রের গভীর মিল" আর একটু বিশ্লেষণ করে দেখা ভালো। "বলজাক-স্তাঁদালের উপন্যাস, দেগা-সেজানের চিত্রকলা, বেটোফেনের সংগীত, ইবসেনের নাটক, রোদ্যাঁর ভাস্কর্য, চেহফের গল্প, মন্তেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ, জুলিয়ান হাক্সলী এরিক ফ্রোমের নীতিবিচার—এ সবই ওই (রেনেসাঁসী) জীবনবোধের বিচিত্র প্রকাশ"—এই ধরনের উক্তি কোনো পরিণতবুদ্ধি, বিচারনিষ্ঠ লেখকের পক্ষে গৌরবের নয়। এই সব অনায়াস তুলনা আর বিভিন্ন নামের চাঞ্চল্যকর যোগাযোগ দেখে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট দিনের কথা মনে পড়ে। এক অধ্যাপকের নির্দেশে একবার এলিয়টের সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল। সুরু করেছিলাম এলিয়টের সঙ্গে প্লেটোর এক অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। কিন্তু মাস্টারমশাই আমার বৈদগ্ধ্যে অভিভূত হলেন না। বিশেষ বাক্-সংযমী তিনি। কোনো মন্তব্য না করে শুধু খাতার একদিকে এই উদ্ধৃতিটি লিখে রেখেছিলেন: "I tell you Captain, if you look in the maps of the 'Orld, I warrant you sall find in the comparisons between Macedon and Monmouth, that the situations look you, is both alike. There is a river in Macedon, and there is also moreover a river at Monmouth, it is call'd Wye at Monmouth: but it is out of my prains, what is the name of the other river: but 'tis all one, 'tis alike as my fingers is to my fingers, and there is salmons in both."

এত সব সত্ত্বেও যদি আলেকজাণ্ডার আর পঞ্চম হেনরী তুলনীয় না হয় তা'হলে তো পাণ্ডিত্যের পরিধি আর কল্পনার বিস্তার দেখানো কঠিন হয়ে পড়ে।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

The Three Voices of Poetry. *By* T. S. Eliot. Published for the National Book League. Cambridge University Press, London.
The Literature of Politics. *By* T. S. Eliot. Foreword by the Right Honourable Sir Anthony Eden K.G., M.C., M.P. Conservative Political Centre.

এলিঅট্ সাহেবের আমি প্রাচীন ভক্ত। তাই তিনি কোথায় কি লিখলেন বা বললেন জানতে পারলে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আজকাল শুনছি ঊনত্রিশ সালের অর্থবিপাক নাকি আমাদের মধ্যবিত্ত মনে কশাঘাত করেছিল, কিন্তু আমার মনে আছে যে বিশত্রিশ দশকে অন্তত বইটই পাওয়া যেত অনেক সহজে এবং সস্তায়। গত যুদ্ধের সময় থেকে দেখছি বই পাওয়া-না-পাওয়া কপালের ব্যাপার, অন্তত আমার চেনা সব বইএর দোকানের পাড়ায়।

শুনেছি দিল্লীতে বোম্বাইতে নাকি তবু বইটই পাওয়া যায়।

এলিঅট্ সাহেবও তাঁর ভক্তদের কষ্ট দেন, তিনি হঠাৎ হঠাৎ বই প্রকাশ করেন এখানে ওখানে, সে বই প্রথমদিকেই পাওয়া দুষ্কর, পরে তো পাওয়াই যায় না। তিনি আবার নাকি বই প্রত্যাহারও করেন, যেমন করেছেন "আজব দেবতাদের সন্ধানে" নামক পুস্তকটি। "ক্লাসিক কাকে বলে" বইটি পাওয়া গেলেও ভর্জিল সম্বন্ধে ভাষণ বা মিল্‌টন বা ইএট্‌স্ সম্বন্ধে লেখাটি পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। "কবিতার সংগীত" নামক অত্যন্ত মূল্যবান বক্তৃতাটিও দুর্লভ। তবু পেংগুইন এলিঅটের গদ্যের এক চয়নিকা বার করে আমাদের উপকার করেছেন, যদিও তার সম্পাদকের রুচি স্বভাবতই যাকে বলে প্রাতিস্বিক বা ব্যক্তিগত ব্যাপার। "কবিতা ও নাটক" পুস্তকটির সংগে "কবিতার তিনটি গলা" পুস্তিকাটি পড়লে লাভবান হওয়া যায়। এমনকি অনেক পাঠক বা সমালোচক অবাক হবেন যে এলিঅটের মতো সৎ কবি ও বিদগ্ধ সমালোচকও কবিতায় গলার একাধিক রকমফের সম্ভব মনে করেন। আজকাল অনেক তথাকথিত শুদ্ধকবিতাবিলাসী বুদ্ধিমন্য-তাবাদী পত্রিকায় প্রচারিত দেখি কবিকণ্ঠের এক রকম একেশ্বরবাদ। বলাই বাহুল্য এ একেশ্বরবাদ ছদ্মবেশী, এ বৌদ্ধ শূন্যবাদ তো নয়ই, এমন কি বস্তুত একেশ্বরবাদও নয়, এ শুধু এক রাজনীতির পক্ষপাতের বিরুদ্ধে আরেক সন্ত্রস্ত রাজনীতির প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ।

এলিঅট্ এ বিষয়ে বিরুদ্ধ আলোচনা করেছেন। আমাদের সাম্প্রতিক একদল সমালোচকদের সংগে তিনি একমত নন। খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে লেখা কারো কবিতা পড়তে মার্জিতরুচি ভদ্রলোক তিনি বিব্রত বোধ করেন, যে কথা শুধু একজন বলতে পারেন এবং আরেকজন শুনতে পারেন; সে কথা এলিঅটের মতে মুখোমুখি বলাই ভালো, বা চিঠিতে লেখাই সমীচীন। তাই মিসেস ব্রাউনিং-কে লেখা মিস্টর রবর্ট ব্রাউনিঙের কবিতা পড়ে তিনি আড়িপাতার লজ্জা পান, যেমন পেয়েছিলেন জোসেফ স্তালিন রুশকবি সিমোনভের অলগাকে লেখা কবিতা পড়ে,' এবং অবাক হয়েছিলেন দুকপির বেশি কেন ঐ বই ছাপা হয়েছে এই ভেবে!

কবিতার একটি স্বর যে দীর্ঘকাল ধ'রে সামাজিক ব্যাপার নিয়ে বিচলিত উচ্চকণ্ঠস্বর, এই কথাটা এলিঅট্ আবার মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। ব্যংগের কবিতা, বিতণ্ডার কবিতা, সংস্কারের কবিতা অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে চলে আসছে। সম্প্রতি বা রুশ-বিপ্লবের পরেই এর জন্ম এ কথাটা নেহাৎ কাব্যের ইতিহাসের অজ্ঞতা থেকে প্রসূত। এমন কি নিছক রাজনীতিরও যে সাহিত্য হয়, সে কথাটাও মনে রাখা ভালো। এলিঅট্ "রাজনীতির সাহিত্য" পুস্তিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শেষের দিকে তিনি বলেছেন যে হয়ত সাক্ষাৎ দৈনন্দিন রাজনীতিতে না জড়িত হয়ে ঠিক তার আগের মুহূর্তের মানসকে রূপদানেই রাজনৈতিক সাহিত্যের অধিক সার্থকতা। আর, এতদিন পরে এলিঅট্ কথা বলেছেন তাঁর এককালীন গুরু শার্ল মরা-র বিষয়ে, যিনি ফ্রান্সের মুক্তির সময়ে বিচারের ফলে মৃত্যুদণ্ডিত হন।

এই দুটি পুস্তিকাতেই এলিঅটের রচনাবৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, বলা যেতে পারে যে একালের শ্রেষ্ঠ কবি ও অগ্রগণ্য সমালোচকের গদ্য কণ্ঠস্বর প্রায় শুনতে পাওয়া গেল।

বিষ্ণু দে

বাঙলা সাহিত্য পরিচয়—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ। কলিকাতা। আড়াই টাকা।
ব্যঞ্জনা ও কাব্য—হরিহর মিশ্র। গ্রন্থজগৎ। কলিকাতা। দুই টাকা।

সংক্ষেপে লেখা বাংলা সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাস নেই,—কথাটি শোচনীয় সন্দেহ নেই। সাধারণ অনুরাগীর কাজে লাগতে পারে, এবিষয়ে এমন কোনো বইয়ের নাম করা দুরূহ। যে বইগুলি লেখা হয়েছে, তাদের লক্ষ্য হয় ছাত্রসমাজ নয়তো বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী। সন-তারিখের ভিড় এবং মামুলি কথার পুনরুক্তি পরিহার করে সরস অথচ তথ্যনিষ্ঠ, সুখ-পাঠ্য এবং নির্ভরযোগ্য একখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হোক—এ কামনা বাংলা সাহিত্যের তথ্যান্বেষী সাধারণ পাঠকেরই কামনা। অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যেই লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্যে তিনি পৌঁছতে পারেননি। বইয়ের নাম 'বাঙলা সাহিত্য পরিচয়',—কিন্তু ৯০ পৃষ্ঠার পুরো বইখানির মধ্যে প্রায় ২০ পৃষ্ঠা গেছে 'বাঙলা দেশ' এবং 'বাঙলা লিপি'-র আলোচনায়। তারপর মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, শিবায়ন, নাথসাহিত্য,—এই প্রসঙ্গগুলির ভূমিকাতেই বাকি ৭০ পৃষ্ঠা শেষ হয়েছে। ভূমিকাও মৌলিক নয়,—লেখক বলেছেন বটে, "বিষয়বস্তুর বিন্যাস-বৈচিত্র্যই নতুন, বইখানি বিচারের সময়ে এ-কথা মনে রাখা দরকার।"—কিন্তু বিন্যাসেও উল্লেখযোগ্য কোনো নতুনত্ব চোখে পড়লো না। বইখানির বিরুদ্ধে সাধারণ পাঠকের সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ এর নাম সম্পর্কে। রামায়ণ, শিবায়ন, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য—এই প্রসঙ্গ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে কি আর কিছুই নেই? ভারতচন্দ্রের জন্মকাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রায় আড়াইশ' বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে বিপুল, বিচিত্র বিস্তার ঘটেছে, সে বিষয়ে 'বাঙলা সাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থের লেখক নীরব। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি আধুনিকতর, ব্যস্ততর, বিচিত্রতর দেড়শ' বছরেও তেমন কিছুই কি ঘটেনি?

'রত্নসাগর' গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বরং দ্বিতীয় বইখানির মধ্যে। অধ্যাপক হরিহর মিশ্র মহাশয়ের 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' একখানি অভ্যর্থনাযোগ্য বই। শব্দ, অর্থ, অলঙ্কার একদিকে, আর, কাব্যের সৌন্দর্য অন্যদিকে,—এইভাবে বিষয়ের প্রতি কৌতূহল উদ্রেক করে, —মাত্র সাত পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁর প্রস্তাবটি বুঝিয়ে দিয়ে, বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অধ্যাপক মিশ্র যথাক্রমে শব্দের শক্তি, অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে অলংকারবাদ ও রীতিবাদের আলোচনা ছাপা হয়েছে।

বাংলায় এতৎপ্রসঙ্গের আলোচনামূলক বই যে একেবারে নেই, তা নয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্যবিচার' আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দের বাংলা আলোচনা বিশেষ নেই তবে মাঝে-মাঝে তিনিও বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের ছোট বইখানি (বিশ্বভারতী—বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ) সুন্দর হয়েছে। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্তের 'কাব্যালোক' অতিকায় গবেষণার বই। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইখানির মধ্যে এসব বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। নবেন্দু বসুর 'কবিতার প্রকৃতি' ঠিক এ ধরনের না হলেও এইসূত্রে স্মরণীয়। আরো দু'একখানি বাংলা বই আছে এসব বিষয়ে। অধ্যাপক মিশ্রের 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজনা।

সংস্কৃতের সাহিত্যবিবেকের মধ্যে সাহিত্যবিশ্লেষণের যে রীতি দেখা দিয়েছিল তার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ব্যঞ্জনাবাদও সেযুগে স্ফোটবাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে

গিয়েছিল। মিশ্র মহাশয় স্ফোটবাদের কথা তোলেননি। শব্দের অভিধাশক্তি থেকেই তিনি যাত্রা শুরু করেছেন। শব্দার্থতত্ত্বের ব্যক্তিবাদ, জাতিবাদ, জাতিব্যক্তিসমাহারবাদ, বৌদ্ধ অপোহবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতের পরিচয় পরিস্ফুট করে তিনি যথাক্রমে জাতিশব্দ, গুণশব্দ, ক্রিয়াশব্দ, এবং দ্রব্যশব্দ, এই চার শব্দশ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বাক্যার্থবোধের পক্ষে আবশ্যিক গুণাবলী—আসক্তি, যোগ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করে তাৎপর্যশক্তির পরিচয়সূত্রে অভিহিতান্বয়বাদ এবং অন্বিতাভিধানবাদ, এই দুই মতের প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন। লক্ষ্যার্থের পরিচিতির মধ্যে রূঢ়ি লক্ষণা এবং প্রয়োজন-লক্ষণার কথা দেখা গেল। গ্রন্থকার "প্রবন্ধবিস্তৃতি ভয়ে" তাঁর অভিপ্রেত অন্যান্য কথা বলেননি। কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গি এবং বিষয়ের অধিকার সম্বন্ধে পাঠকের প্রতীতি ইতিমধ্যে এতো নিবিড়, এতো শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে যে তাঁর কাছ থেকে মম্মট প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের এতদ্বিষয়ক ব্যাল্যাবৈচিত্র্যের আলোচনা-প্রাপ্তির ঔৎসুক্য এতে পুনরপি পরিবর্ধিত হয়। ব্যঞ্জনার দুই শ্রেণীবিভাগ করে নিয়ে 'শাব্দী' এবং 'আর্থী' ব্যঞ্জনার যথাযথ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি। দৃষ্টান্ত পরিবেষণে তিনি অবশ্য সংস্কৃতেরই পক্ষপাতী। বাংলা দৃষ্টান্ত পেলে আরো ভালো হতো। এইসূত্রে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে। শ্যামাপদবাবু খুবই কম লিখেছেন। কিন্তু যা লিখেছেন, তাতে সাধারণ বাঙালী পাঠকের প্রতি তাঁর সমবেদনার অন্ত নেই। তিরিশ থেকে ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার মধ্যে ব্যঞ্জনার কথা শেষ করে বাকি বাইশ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক 'অলঙ্কারবাদ ও রীতিবাদের স্বরূপ-বিচার' করেছেন। এই অধ্যায়টিতে অবশ্য কয়েকটি বাংলা দৃষ্টান্ত আছে। অলঙ্কার-ভারাক্রান্ত অকাব্যের দৃষ্টান্ত তোলা হয়েছে ভারতচন্দ্র থেকে। নিরলঙ্কৃত রচনার কাব্য-গুণের দৃষ্টান্ত আহরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে। ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রট প্রভৃতি অলঙ্কারবাদীরা আসলে বাচ্যার্থবাদী,—বামনের রীতিবাদ আসলে শব্দার্থগুণবাদ; এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনি বলেছেন, "অলঙ্কারবাদে যেমন অলঙ্কারের কোলাহলে অলঙ্কার্য চাপা পড়িয়াছে, রীতিবাদে তেমনি গুণের অন্তরালে গুণী অপ্রকাশিতই থাকিয়া গিয়াছে।" বলা বাহুল্য, এই নেতিবাচক সংকেতের পরে কাব্যরহস্যের জ্ঞানলাভের আগ্রহ নিবৃত্ত হতে পারে না। পরের কথা পরে বলবেন, এই ভরসা দিয়ে গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন। আশা করি, তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্ব ঘটবে না।

হরপ্রসাদ মিত্র

A Certain Smile. *By* Françoise Sagan. E. P. Dutton. New York. $2.95.

প্রতীপবিচারেও মনে হয় না যে ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর প্রথম বই *Bonjour Tristesse*-এ কোনো দর্শনের স্পর্শ ছিলো। হৃদয়তা ছিলো যথেষ্ট, কিন্তু সে-হার্দ্য কাহিনীতে ভারাতুরতা ছিলো ব'লে এখনো মনে হয় না। বরঞ্চ যা অবাক ক'রে দিয়েছিলো সেই দু'বছর আগে, তা বিশেষ-এক কলাকৈবল্য, বক্তব্যের নির্ভার স্পষ্টতা। এমন স্বচ্ছ, প্রায় তুচ্ছ ভাষা, মাত্র তিনটি, বড় জোর চারটি, চরিত্রের টানাপোড়েন; তবু কী সেই নিপুণতা যা মনকে কেড়ে রাখে, হাল্কা নির্ভরে পাখি-মিলিয়ে-যাওয়া দিগন্তকে নামিয়ে নিয়ে আসে?

শ্রীমতী সাগাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসও বিস্ময়বহ, কিন্তু নতুনতর অর্থে। কাহিনী এবারও প্রেমের বিচিত্র গতি, বর্ণনায় এখনো সেই ঋজুতা, গল্পের মালমশলা আগের মতোই তুচ্ছতার গা ঘেঁষে : চিরাচরিত সেই ত্রিকোণ। কিন্তু যা অবাক করে দেয় তা জঁ-পল সার্ত্রের ঈষদাভাস। অবশ্য সমকালীন ফরাশি সাহিত্যে সার্ত্রের প্রতিবিম্ব-অতিক্রান্ত রচনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাহ লেও, *A Certain Smile*-এর আগে, শ্রীমতী সাগাঁর রচনার সঙ্গে সাত্রীয় দর্শনের সাযুজ্য ভাবা প্রায় অসম্ভব ছিলো। *Bonjour Tristesse*-এ এক ধরনের নির্দয়তা ছিলো তা অনস্বীকার্য, কিন্তু সেটা হার্দ্যতারই অন্যতম প্রকরণ, সম্পূর্ণ আবেগজাত প্রক্রিয়া। যদি বিশ্লেষণের অরণ্যে ঢুকতেই হয়, তা হ'লে বরঞ্চ এ পর্যন্ত বলা চলে *Bonjour Tristesse* ইলেকট্রা-মানসিকতার নিরাড়ম্বর উদাহরণ, লরেন্সের *Sons And Lovers*-এ পল মরেলের ঈদিপাস-চেতনার সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল।

কিন্তু ইলেকট্রা-ঈদিপাস দুটোই তো বহুকালের বাসি প্রসঙ্গ। অন্যপক্ষে, *A Certain Smile* পাঠান্তে বিবৃতির যে রেশটা মনে লেগে থাকে, তা তীক্ষ্ণতায় স্পর্ধিত, শ্রীমতী সাগাঁর কৈশোরিকতা-মাখানো ভাষার গোধূলি-আলোর ভিতর দিয়ে ছিটকে-আসা বলেই দ্বিগুণতর তার তীক্ষ্ণতা।

এবারও সেই প্যারিস, সরবঁয়ে-পড়া মেয়ে, যদিও পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি কিনা তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। মেয়েটির নাম দমিনিক, প্রেমিকের নাম বায়ারত্রাঁদ। ছাত্রপ্রেমের অভ্যস্ত উপকরণ : কাফে, বই-পড়া, পার্টি, পছন্দের নাইটক্লাব। যৌবন হয়তো আগুন, কিন্তু গতানুগতিকতার শৃঙ্খলে সমস্ত উপভোগই বিস্বাদ হ'য়ে আসে, দমিনিককে ক্লান্ত ক'রে আনে। সে-আগুন জ্বলে যায়, অথচ সত্যিই যেন কিছু দহন করে না। বিশেষ ক'রে নিথর দমিনিকের মনে হয় বায়ারত্রাঁদ বড়ো বেশি ভাবপ্রবণ।

এমন সময় বায়ারত্রাঁদের মামা, লুক্, বয়সে শ্রীমতীর দ্বিগুণেরও বড়ো, যাকে দেখেই তার মনে হলো—অমন মাংসল, পেশীবহুল, মাদকতামাখানো চেহারা—'এ হচ্ছে সেই ধরনের লোক যারা আমার বয়সী মেয়েদের ধর্ষণ করতে ভালোবাসে'। হয়তো সেজন্যেই, এগিয়ে গিয়ে নিজেকে ধরা দিলো সে। তাছাড়া, বিশেষ ক'রে যা তাকে আকর্ষণ করলো, লুকের হৃদয় বায়ারত্রাঁদের মতো আদৌ দ্রবীভূত নয়, বাষ্পের পরিমাণ কম। এ-প্রেমে সুতরাং নিছক শরীরচেতনার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তার উপর, লুকের স্ত্রী ফ্রাঁসোয়া এ-ধরনের ব্যাপারে যথেষ্ট উদার।

এর পর অবশ্য ছক কেটে প্রেম। কড়া, ঝাঁঝালো স্বাদে দমিনিকের আসক্তি; নির্জলা হুইস্কী, বয়স্ক, বলিষ্ঠ, বিবাহিত, মধ্যবয়সী পুরুষের সঙ্গে শরীরসম্বন্ধ। সম্ভবত, পারস্পরিক চুম্বকতার সবচাইতে বড়ো কারণ উভপাক্ষিক সাত্রীয় প্রস্থানে : যেহেতু শরীর ছাড়া কিছুই দিতে হবে না পরস্পরকে, তাই কারোরই সত্তাস্বাধীনতা হারাবার ভয় নেই। এ-সম্বন্ধ দ্রুত, স্বচ্ছন্দ লীলায় সম্ভোগ শীর্ষে পৌঁছে চললো। চরমতা এলো যখন তারা দু'সপ্তাহ একসঙ্গে এক ঘরে রিভিয়েরায় কাটিয়ে এলো।

কিন্তু এখানেই বিবৃত্তির সহসা অবরোহণ। দমিনিক সহজেই লুকের মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলো : দু'সপ্তাহ একত্র যাপনের পর সমস্ত আবেগই নিঃশেষ হয়ে আসে, সব ক'টি বিভঙ্গ অভ্যস্ত ব'লে মনে হয়, রক্তে কোনো অনুক্ত উত্তাপ থাকে না, শরীরের কোনো অপঠিত কোণ। অতএব বসন্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ।

লুক্ যেহেতু মুক্তপুরুষ, এবং অনেকগুলি অভিজ্ঞতার ঋতু তার পিছনে, দমিনিকের

পক্ষে তাকে বেঁধে রাখবার প্রয়াস অসফল হ'তে বাধ্য। শুধু তা-ই নয়, তার নিজের দিক থেকেও সে-রকম চেষ্টা করা চারিত্রিক স্খলন। কারণ তা থেকেই গতানুগতির ক্লান্তি, মুক্তির সেখানে অবরোধ। অবশ্য যুবতী মেয়ে দমিনিকের এখনো বেদনার সেতু পেরিয়েই এই উপলব্ধিতে পেঁছুতে হয়। একচারিতার সংস্কার দীর্ণ করেই তবে বহুগামিতার মুক্তি; বুদ্ধি সে-সংস্কার অনেকদিন আগে অতিক্রম করে এলেও রক্তে তবু, সাময়িকভাবে হ'লেও, অন্যতর দোলা। বইয়ের যেখানে শেষ, দমিনিক সেখানে অভিজ্ঞতাতেও স্থিত হয়ে এসেছে: 'আমি, এক নারী, এক পুরুষকে ভালবেসেছিলাম; আর কিছু নেই' : এই উক্তিতে বোঝা যায় অবশেষে সাত্রীয় দর্শনের সারাৎসার স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

Bonjour Tristesse-এও একটি শান্ত বিষাদের সুর বরাবর প্রচ্ছন্ন ছিলো, কিন্তু সেটা শুধুই বর্ণনার ভঙ্গিতে। শ্রীমতী সাগাঁ এবার বিষাদকে আরো স্পষ্ট ক'রে বরণ করলেন; ব্যথাকে স্বীকার ক'রে নেওয়াতেই যেন আশা, নিষ্ঠাতেই যেন জীবনের পুঞ্জিত ক্লান্তি, ভালোবাসাকে সীমিত করতে পারাই মুক্তি। অবশ্য আরো সমতলে নেমে এসে বলা চলে, শ্রীমতী সাগাঁ *A Certain Smile*-এ *Bonjour Tristesse*-এর প্রতিতুলনা আঁকছেন। দুই গল্পেই অদ্ভুত এক অবসাদের স্বাদ, কিন্তু একটিতে নায়িকার আপাত-জয়ের বর্ণনা, অন্যটি নায়িকার পরাজয়কাহিনী, এবং, হয়তো, লেখিকা বলতে চাইছেন, জয় আর পরাজয় দুই-ই শেষ পর্যন্ত বিষাদের বিশাল নিবিড় ক্যান্‌ভাসে বিলীন হয়ে যায়। সেই সঙ্গে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে যে, শ্রীমতী সাগাঁ এ-বইতেও ইলেকট্রা-চেতনার পুনরুক্তি করছেন মধ্যবয়সী পুরুষের প্রতি দমিনিকের আসক্তির ভিতর দিয়ে।

কিন্তু শেষোক্ত দু'টো প্রসঙ্গই আমি বলবো আনুষঙ্গিক : প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে শ্রীমতী সাগাঁর দর্শনবিন্যাস। এমন একটি সরল কাহিনীর বুননে এই দর্শন বিবৃত হয়েছে ব'লেই আরো বেশি চমকে উঠতে হয়। তবে, দু'টো মাত্র বইয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই বলা চলে, শ্রীমতী সাগাঁর চমক-লাগানোর এই সবে শুরু।

অশোক মিত্র

অষ্টাদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

চতুরঙ্গ

কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৩

আমেরিকার চিঠি

হুমায়ুন কবির

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক সাম্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। নিগ্রোসম্প্রদায়ের প্রতি অবিচারের প্রসংগ বাদ দিলে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় সামাজিক সাম্যের এত স্পষ্ট ও ব্যাপক নিদর্শন মিলবে না। আমেরিকার ইতিহাস এ সাম্যবাদী মনোভাবের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। নানাদেশের নানাজাতির বিদ্রোহীরা এসে এখানে ভিড় করেছিল বলে সকল রকমের সামাজিক স্তরভেদের বিরুদ্ধে আক্রোশ আমেরিকাবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য তার রকম বেরকম প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে প্রতিক্রিয়ার পরিণতি হাস্যকর। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়েই আমেরিকাবাসী সজোরে এবং সগর্বে ঘোষণা করেছিল যে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য থাকবে না, রাজতন্ত্র বিলোপের সংগে সংগে সমস্ত শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু আমেরিকানের মনে অভিজাতশ্রেণীর প্রতি গোপন অনুরাগ নানাভাবে ধরা দেয়। এককালে ইয়োরোপের বিত্তহীন অভিজাতশ্রেণীর পুরুষেরা লুপ্ত ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারের জন্য আমেরিকা যাত্রা করত। সে যাত্রা ব্যবসায় বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। বর্তমান যুগে সামরিক অভিযানের অবকাশ'ত নেই বললেই চলে। আমেরিকাবাসী ধনী কন্যাকে বিবাহ করে ঐশ্বর্য সংগ্রহের সাধনায় ইয়োরোপীয় বিত্তহীন অভিজাতের এ অভিযান বহুক্ষেত্রে কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতির অবাধ সংমিশ্রণ ছাড়াও অন্যান্য মহাদেশের বহু জাতি দেশ ও সভ্যতার সমাবেশ ও সহযোগের পরিচয়ও আমেরিকায় মিলবে। তিনশ' বছর আগে সে ইতিহাসের সুরু, কিন্তু তার গতি ও পরিমাণ গত একশ' বছরের মধ্যে যে ভাবে বেড়ে চলেছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না। এত রকম পাঁচমিশেলী সত্ত্বেও যে একটি বিশেষ আমেরিকান দৃষ্টিভংগী ও আমেরিকান জাতি গড়ে উঠেছে, তার কারণ খুঁজতে গেলে যে সমস্ত শক্তি ও প্রভাবের পরিচয় মেলে, আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীকে তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। তাই আমেরিকার বিষয়ে কোন কথা বলতে চাইলেই আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থের খাতিরেও আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর বিশদ আলোচনা বাঞ্ছনীয়। আজকাল সবাই মেনে নেয় যে জনসাধারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। বস্তুতপক্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বর্তমানে আলোচনার কোন অবকাশ নেই। তাই এ কথা বললে হয়'ত আশ্চর্য শোনাবে যে ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আমেরিকার পূর্বে কোন দেশেই হয়নি। পুরাকালে কোন দেশেই সর্বসাধারণের শিক্ষার অধিকার বা প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়নি। অধিকারভেদের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা মুষ্টিমেয় লোকেই পেয়েছে। অধিকারভেদের ভিত্তি নিয়েও অনেক কথা বলা চলে। ব্যক্তিগত শক্তি বা গুণের বদলে বংশমর্যাদা দিয়েই সাধারণত অধিকার নির্ণয় হ'ত। ক্বচিৎ দু'এক ক্ষেত্রে হয়ত ব্যতিক্রম মিলবে, কিন্তু অধিকাংশের বেলায়ই কৌলিকবৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন ব্যক্তির অন্য কোন উপায় ছিল না। তারই ফলে ভারতবর্ষে জাতিভেদের পত্তন। গুণগত পার্থক্যের বদলে বংশগত পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষের মূল্যবিচারে ভারতীয় সমাজের অবনতিও তাই অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

কেবল ভারতবর্ষ বলে নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই পুরাকালে বিদ্যার্জন সর্ব-সাধারণের পক্ষে দুর্লভ ছিল। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি জ্ঞানভাণ্ডারকে যক্ষের ধনের মতন আঁকড়ে পড়ে থাকত—নিজেদের গোষ্ঠি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বাইরে যাতে সে জ্ঞান ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এক বিশেষ শ্রেণী জ্ঞানার্জনে আত্ম-নিয়োগ করবে, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের শ্রেণী-বিভাগ যে রকম স্পষ্ট এবং দৃঢ়, সর্বত্র তার পরিচয় না মিললেও এ শ্রেণীবিভাগের মূলতত্ত্ব প্রাচীনকালের প্রায় সকল দেশে ও সমাজেই মিলবে। সমাজের কার্যকলাপের তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ সে যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিজের নিজের বংশগত বা কৌলিক কর্তব্যপালন বিধাতার বিধান বলে মেনে নিয়েছে। মধ্যযুগেও মোটামুটিভাবে একই ধারা চলে এসেছে। এখানে-ওখানে খানিক অদল-বদল সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে জীবিকা নির্বাহ করেছে।

এই চিরাচরিত ধারাকে অস্বীকার করেই আমেরিকার বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। তাই সে বিপ্লবে রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে বংশগত মর্যাদা ও কৌলিন্যকে অস্বীকার করবার প্রয়াসও দেখা দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বুনিয়াদের যাঁরা পত্তন করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত ও ধনী, তাঁদের অভিজাত বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাঁরা এ কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের সমানাধিকারকে পরিপূর্ণ-ভাবে গ্রহণ না করলে আমেরিকার বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাঙলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা দেখি যে দিল্লীর প্রভুত্বকে অস্বীকার করার জন্য পাঠান সুলতানেরা মনে-প্রাণে বাঙালী বনে গিয়েছিলেন—অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবার জন্য আমেরিকাবাসী অভিজাত নিজের আভিজাত্যকে অগ্রাহ্য করে মনেপ্রাণে গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সকলের সমানাধিকার থাকবে এই স্বীকৃতির মধ্যেই আমেরিকার ভবিষ্যত শিক্ষাপ্রণালী ও আদর্শের সন্ধান মিলবে। প্রথম দিন থেকেই তাই আমেরিকার রাষ্ট্র-নেতারা মেনে নিয়েছিলেন যে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অন্যতম অবশ্য কর্তব্য।

আদর্শ স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই এ আদর্শকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু

স্বীকৃতির ফলে সর্বসাধারণের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রবলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। ওয়াশিংটন ঘোষণা করেছিলেন যে শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা না হলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলতে পারে না। জেফারসন তাঁর বিভিন্ন সমাজসেবার উদ্যোগের মধ্যে সার্বিক শিক্ষা-প্রচলনের প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিরাট দেশে জনসংখ্যার স্বল্পতার ফলেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে। অল্প লোকের দ্বারা অনেক কাজ করাবার চেষ্টায় নানা ধরনের যান্ত্রিক সাহায্যের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আমেরিকায় যন্ত্র-সভ্যতার যে উৎকর্ষ, পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না। যন্ত্রকে চালাতে হলে যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য, এবং সাধারণ শিক্ষার অভাবে যান্ত্রিক পারদর্শিতা বা কৌশল আসতে পারে না। আমেরিকার যন্ত্রসভ্যতার উৎকর্ষের প্রয়োজনেও তাই শিক্ষার প্রসার বেড়েছে। এবং প্রথম থেকেই সবাই মেনে নিয়েছে যে ব্যক্তি বা সমাজের প্রগতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আমেরিকায় তাই সর্বপ্রথম সার্বিক শিক্ষার প্রচলন হয়। গোড়ায় আমেরিকান নাগরিক চার পাঁচ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা পেত, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার ও পরিমাণ দুই-ই বেড়েছে। বর্তমানে প্রত্যেক বালকবালিকাকেই বাধ্যতামূলকভাবে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাকতে হয়। এবং আজ দাবী উঠেছে যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত করতে হবে। ষোল বৎসর পর্যন্ত স্কুলে থাকার অর্থ যে প্রত্যেক বালকবালিকা অন্তত দশ বৎসর শিক্ষালাভ করে, আঠারো বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারিত হলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বারো বৎসর হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষার এ রকম ব্যাপক ব্যবস্থা নেই। বিলাতে পনেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ রয়েছে, রুষ দেশে এখনো সে মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত, কিন্তু অল্পদিন হল সোভিয়েট রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত করেছে যে ১৯৬০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বাড়িয়ে সতেরো বৎসর পর্যন্ত করা হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকায়ও টনক নড়েছে, এবং কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত না হলেও অন্তত আঠারো বৎসর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলনের দাবী প্রবলতর হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি যে আমেরিকায় শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বাঁধাধরা শিক্ষা সুরু হয় ছয় বা সাত বৎসর বয়সে, কিন্তু তার আগেও শিশুদের জন্য নানা ধরনের মনোরঞ্জন ও মনোবিকাশের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্ডারগার্টেন'ত রয়েছেই, তা ছাড়াও বহু স্থানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন বৃত্তির পূর্ণ পরিণতির জন্য খেলাধূলা এবং একক বা সমবেত নানা ক্রিয়াপদ্ধতির আয়োজনের প্রভাব নেই। ভবিষ্যৎ নাগরিকের পূর্ণবিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করা সমাজের সর্বপ্রথম কর্তব্য, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ নেই। ছোট ছোট সহর গ্রামগুলিতেও প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। দালান কোঠা আসবাব-পত্র সব এত পরিপাটি যে বহুক্ষেত্রে আমাদের দেশের কলেজেও তার তুলনা মেলে না।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং সর্বব্যাপী করে আমেরিকা তুষ্ট হয়নি, তাকে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ এবং সার্থক করবার জন্যেও চেষ্টার অন্ত নেই। শিক্ষার উৎকর্ষ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে, তাই শিক্ষকের কৃতিত্ব, সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সঙ্গতির দিকেও আমেরিকা দৃষ্টি দিয়েছে। গত আট দশ বৎসরে শিক্ষকের অবস্থার অনেক উন্নতি

হয়েছে, কিন্তু তবু এ কথা মানতে হবে যে আমেরিকার সমাজে শিক্ষকের এখনো স্বকীয় মর্যাদা মেলেনি। কেবল আমেরিকা বলে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শিক্ষকের অর্থনৈতিক সংস্থান ভাবনার বিষয়। বহুক্ষেত্রে মোটা মেহনতের কাজের মজুরের যে আয়, প্রাথমিক শিক্ষককে তাই নিয়ে দিন যাপন করতে হয়। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় শিক্ষকের সংখ্যাল্পতার সমস্যা দেখা দিয়েছে, এবং তার সুযোগ নিয়ে সমাজের দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ শিক্ষকের আর্থিক অনটন দূর করবার চেষ্টা করছেন।

আমেরিকায় বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাও প্রায় সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বেই বলেছি যে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে স্কুলে যেতে হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ কিশোর কিশোরীই আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পাঠক্রম বজায় রাখে। তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। নানা দেশের যে সকল নরনারী আমেরিকায় অভিযাত্রী হয়ে এসেছিলেন, তাদের অধিকাংশই স্বদেশে শিক্ষার সুযোগ পাননি। প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত না হলেও তাঁরা সাহসে বুদ্ধিতে এবং বহুক্ষেত্রে চরিত্রেও বিশিষ্ট—তা না হলে স্বদেশের পরিচিত পরিবেশ পরিত্যাগ করে বিদেশ বিভূঁয়ে ভাগ্য পরীক্ষায় নামতেন না। আমেরিকায় এসে তাঁরা নিজের শক্তিতে নিজের ভাগ্য নির্মাণ করেছেন, তাই তাঁরা যে নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে সকল রকম শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেবেন, তাতে বিচিত্র কি? আমেরিকার সমাজসংগঠনে যে বৈশিষ্ট্য, তার ফলে শিক্ষার জন্য আগ্রহ আরো প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। আমেরিকার সামাজিক সাম্যের কথা আগেও বলেছি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সে সাম্য আরো সজীব হয়ে উঠেছে। সমাজের এক স্তর হতে অন্য স্তরে পেঁছবার উপায় হিসাবে শিক্ষা আমেরিকায় যে ভাবে কার্যকরী, পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। এককালে শিক্ষার অর্থ ছিল লেখা পড়া আঁক কষা। এক কথায় পুঁথি-সর্বস্ব বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষাকেই শিক্ষা মনে করা হত। যতদিন সমাজের এক নগণ্য অংশ শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিল, ততদিন এ ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা যখন প্রথম সর্বব্যাপী হয়ে দেখা দিল তখনও এ ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ছিল মোটে চার পাঁচ বৎসর, এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটিভাবে লেখাপড়া আঁক কষা ভিন্ন অন্য কিছু শেখা সম্ভব হত না। তা ছাড়া শৈশবে ও প্রথম কৈশোরে বালক-বালিকাদের স্পৃহা, রুচি বা শক্তির বিশেষ কোন তারতম্য বোঝা যায় না। দশ এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালকবালিকাই একই ধরনের শিক্ষা লাভ করলেও তাই কোন ক্ষতি নাই। এগারো বারো বছর বয়সের পরে কিন্তু ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হতে সুরু করে। বাধ্যতামূলক এবং ব্যাপক শিক্ষার মেয়াদ যখন চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়স ছাড়িয়ে সতেরো আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, তখন বিভিন্ন ধরনের রুচি ও স্পৃহা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার তারতম্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। পুরাকালে এ সমস্যা কোনদিন প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ যে মুষ্টিমেয় কিশোর কিশোরী প্রাথমিক শিক্ষার দরজা অতিক্রম করে মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষার স্তরে পৌঁছত, বুদ্ধিপ্রধান পুঁথিনির্ভর শিক্ষা তাদের রুচি ও স্পৃহার উপযোগী বলে তারা সহজেই সে শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম কিশোর কিশোরীরা বহুল সংখ্যায় মাধ্যমিক শিক্ষায় অগ্রণী হয়। বর্তমানে বোধহয় শতকরা আশীজন কিশোর কিশোরীই মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে, কিন্তু এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতিও বদলেছে। পুরাকালের পুঁথি-

সর্বস্ব শিক্ষার বদলে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা মানব-চরিত্রের সমস্ত রুচি ও শক্তিকে বিকশিত করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্রমের অবতারণা করেছে। ফলে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা যে রকম বিচিত্র ও বহুমুখী, পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কোনকালে অথবা বর্তমানে অন্য কোথাও তার নজীর মেলে না। শিক্ষার বৈচিত্র ও বহুমুখীনতা আমেরিকায় যে ভাবে বিকশিত হয়েছে, তার দৃষ্টান্তের ফলে আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচিত্র ও বহুমুখী করবার প্রয়াস স্পষ্ট।

ভারতবর্ষে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল সংস্কারের দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে। যাঁরা এ দাবী তুলেছেন, তাঁদের প্রধান বক্তব্য যে প্রত্যেক মানুষের রুচি বা শক্তি অনুযায়ী তাকে বিকশিত হবার সুযোগ দিলে তবেই সমাজ অধিক লাভবান হবে। কিশোর বয়সেই এ সমস্ত পার্থক্য প্রথম দেখা দেয়। তাই শৈশবে প্রাথমিক শিক্ষা একধর্মী হলেও মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে। আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বব্যাপী হবার ফলেই প্রথম এ দাবী উঠেছিল, এবং বর্তমানে প্রায় সমস্ত পৃথিবীই সে দাবী মেনে নিয়েছে।

শিক্ষাকে বহুমুখী করবার দাবী যে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার মানকে অবনত করেছে, সে কথাও মানতে হবে। নানান ধরনের রুচি ও স্পৃহার তুষ্টিসাধনের চেষ্টায় অনেক অনুপযোগী বিষয়েরও শিক্ষাক্ষেত্রে আমদানী হয়েছে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলা হয় যে আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলে রেকাবী বাসন ধোয়ার ক্লাশও খোলা হয়েছে, এবং তার জন্যও হয়তো ডিগ্রী দেওয়া হবে। হাসি ঠাট্টার কথা ছেড়ে দিলেও এ কথা মানতে হবে যে মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের দাবী মেটাবার বিভিন্ন উপাদান শিক্ষার বিষয় হিসাবে সমান উপযোগী নয়। পূর্বে এ বিষয়ে উন্নাসিকতা এবং সংকীর্ণতার বাড়াবাড়ি ছিল, এক মানসিক উৎকর্ষের উপকরণ ভিন্ন অন্য কোন কারণে কোন বিষয়কে শিক্ষণীয় মনে করা হয়নি। ফলে গণিত, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি একান্তভাবে বুদ্ধিনির্ভর বিষয়ের মধ্যেই পাঠক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে যে বিজ্ঞানের জয়জয়কার, তারও স্বীকৃতি এ সনাতনী শিক্ষা-দর্শনে মেলে না। বস্তুতপক্ষে বহুযুগ পর্যন্ত দর্শনের ছায়াছত্রতলে বিজ্ঞানের একটু সঙ্কুচিত স্থান মিলেছে, এবং এখনো অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মতন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক দর্শন হিসাবেই বিজ্ঞানের পরিচয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্থান আজ কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানের প্রতি খানিকটা অবজ্ঞার মনোভাবের পরিচয় আজও মেলে। কৃষিবিজ্ঞান বা পশু-পালনতত্ত্ব সত্যিকার পাঠ্যবিষয় হতে পারে কিনা, তা নিয়ে আজও মাঝে মাঝে তর্ক ওঠে। কিন্তু আমেরিকায় এ সমস্ত বিষয় অধ্যয়নের ফলে সে দেশের যে আর্থিক ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি, তার ফলে আজ আর কেউ সরাসরিভাবে এ সমস্ত বিষয়কে অগ্রাহ্য করতে পারে না। দু'টি কারণে আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার এ সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। যতদিন সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষী ছিল, ততদিন সে শিক্ষা দর্শন-ঘেঁষা বলে কেউ আপত্তি করেনি। আমেরিকায় সে শিক্ষা প্রথম সর্বব্যাপী হয়ে দেখা দেয়, এবং তার ফলে বিচিত্র রুচি ও শক্তির অধিকারী লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীর শক্তি সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের দাবী প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অন্যদেশে হয়'ত সে দাবী এত সহজে গৃহীত হত না, কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের ফলে নতুনকে গ্রহণ করতে আমেরিকাবাসী কখনো দ্বিধা করেনি। পূর্বেও বলেছি যে যারা এসে আমেরিকায় নতুন সমাজ পত্তন করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে এসেছিল। যারা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহ করেনি, তাদের মনেও প্রচলিত সমাজ বা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিশেষ কোন অনুরাগ ছিল না। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্য ও আদর্শের উত্তরাধিকারী বহু মানবের একত্র সমাবেশে কোন বিশেষ দেশের ঐতিহ্য বা আদর্শের বন্ধন স্বভাবতই শ্লথ হয়ে এসেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি, বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ এবং নানা ধরনের রুচি ও দাবী মেটাবার প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ তাই আমেরিকায় অতি সহজেই সাধিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্প্রসারণকে পৃথিবীর শিক্ষাতত্ত্বে আমেরিকার বিশেষ অবদান বলা চলে। বস্তুতপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এত পাঁচমিশেলী আর কোথাও দেখা যায় না। রান্নাবান্না, সেলাই, কাপড়তৈরী—এককথায় ঘরকরনার সমস্ত কাজ শেখবার ব্যবস্থা স্কুলেই হয়। ক্ষৌরকর্ম, কাঠের কাজ, কামার কুমোরের কাজও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষণীয় বিষয়। কৃষিকাজ বা গৃহপালিত পশুপাখীর দেখাশোনাও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে কোন কোন স্কুলে মোটর চালানো শেখানো হচ্ছে। এক কথায় ঘরে বা বাইরে করণীয় সকলরকম কাজেরই হাতে খড়ি শিক্ষায়তনে হয়। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্যুত নয়—প্রতিপদে জীবনের কাজের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ।

এ ব্যবস্থার ফলে নানারকমে আমেরিকার সমাজ লাভবান হয়েছে। শিক্ষায়তনে যদি সকল রকমের কাজ এক সাথে শেখানো হয়, তবে কোন বিশেষ বৃত্তির প্রতি বিরাগ বা অবজ্ঞার মনোভাব গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা স্বভাবতই কমে যায়। আমেরিকায় শ্রম ও শ্রমিকের যে ইজ্জত, মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমের ফলে তা' সমস্ত সমাজে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ফলেই যে পৃথিবীর নানাদেশের নানা ভাষাভাষী নানাজাতির বংশধরেরা একপুরুষে পুরোপুরি আমেরিকান বনে যায়, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখী বিকাশের ফলে বিভিন্ন দেশের যে সব ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসে, তারা নিজেদের শক্তি ও রুচি অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় খুঁজে পায়। ভাষাপ্রধান পাঠক্রমে বিদেশাগত ছাত্রছাত্রীর যে অসুবিধা, নানাধরনের কর্মপ্রধান পাঠক্রমে তা' হয় না। ভাষা ভাল করে না জানলেও কাঠের কাজ বা লোহার কাজ বা সেলাই রান্না বিদেশাগত ছাত্রছাত্রী সহজেই শিখতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের আবহাওয়ায় ক্লাসে এবং বাইরে ইংরিজি ভাষার ব্যবহার সব সময়েই তারা শিখতে থাকে, এবং ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হবার আগেই তারা মনেপ্রাণে আমেরিকান হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে দেখা গিয়েছে যে বিদেশাগত আমেরিকানদের প্রথম পুরুষ ইংরিজি ভাষা সম্বন্ধে খানিকটা দুর্বল এবং স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি খানিকটা অনুরাগী থাকলেও দ্বিতীয় পুরুষে তাদের ছেলেমেয়েরা অত্যুগ্রভাবে আমেরিকান হতে চায়, পিতৃপুরুষের দেশ ও ভাষা সম্বন্ধে অবজ্ঞা কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যধিকভাবে প্রকাশ পায়। তৃতীয় চতুর্থ পুরুষে সে উগ্রতা আবার কমে আসে, এবং তখন পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি নতুন অনুরাগ দেখা দেয়। এতে আশ্চর্য হবার কারণ নাই। যতদিন জাতীয়তা সম্বন্ধে নিজেদের বা অপরের মনে কোন সন্দেহ থাকে, তারা যে আমেরিকান সে কথা জোর করে জাহির করবার ততদিনই প্রয়োজন থাকে। সে সন্দেহ নিরসন হলে এবিষয়ে বাড়াবাড়িও থেমে যায়।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালী জাতিগঠনের অন্যতম প্রধান উপায় এ কথা মেনে নিয়েও কিন্তু আমেরিকার শিক্ষাবিজ্ঞানীরা তার সমালোচনায় পঞ্চমুখ। তাঁদের মতে

বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাধারার গলদের ফলেই আমেরিকার জীবনে বহু গ্লানি দেখা দিয়েছে। আমেরিকায় শিক্ষার মান কমে গিয়েছে এবং এখনো কমছে। একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যতখানি শেখে, জানে এবং বোঝে, বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতে ইয়োরোপের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক স্কুল শেষ করবার আগেই তা আয়ত্ত করে। বর্তমানে আমেরিকার সমাজজীবনে যে চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা, নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের বিকাশ, বহু শিক্ষাবিদের মতে অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাই তার জন্য প্রধানত দায়ী। যাঁরা এ ধরনের বিরুদ্ধ সমালোচক, কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যুক্তিদোষে দুষ্ট হলেও তাঁদের বক্তব্যের দু'টি প্রধান কথা অস্বীকার করা চলে না।

বিরুদ্ধ সমালোচকদের মতে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বড় গলদ এই যে শিক্ষা সম্প্রসারণের অজুহাতে শিক্ষাধারার ঐক্য ও সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। বিভিন্ন রুচি ও শক্তির অধিকারী বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করুক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের রুচির দোহাই দিয়ে যদি কেবলমাত্র তাদের মর্জি মাফিক বিভিন্ন বিষয় পড়তে দেওয়া হয়, তবে শিক্ষা নিরর্থক হয়ে পড়তে পারে। বর্তমানে আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের যে ফিরিস্তি থাকে, তাদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, বহুক্ষেত্রে কোন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা পর্যন্ত নেই। ছাত্রছাত্রীরা সেই বিচিত্র বিষয় সমাবেশের মধ্য থেকে খুশীমত কয়েকটি বিষয় বেছে নেয়, কিন্তু সে সমস্ত বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ বা সম্বন্ধ আছে কিনা তা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। অসংবদ্ধ কতগুলি বিষয় সম্বন্ধে তথ্য হয়'ত শেখে, কিন্তু তাতে পুরোপুরি মানসিক বিকাশ হয় না। সাহিত্য, গণিত বা ইতিহাস না পড়েও লোকে যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে সেখানে শিক্ষা প্রণালীতে গলদ রয়েছে এ কথা মানতেই হবে। মাধ্যমিক স্কুলে যদি সাতটি বিষয় পাঠ্য নির্ধারিত হয়, ছাত্র বা ছাত্রী হয়'ত ইংরিজি, মোটর চালানো, ব্যায়াম, ভূগোল, কাঠের কাজ, সেলাই এবং ক্ষৌরকর্ম এই সাতটি বিষয় নিয়ে ফিরিস্তি ভরে দিল, কিন্তু তার ফলে তার না হ'ল মানসিক বিকাশ, না হ'ল বিশেষ কোন বৃত্তি বা শিল্পে পারদর্শিতা লাভ। এক কালে মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীর বিষয় নির্বাচনের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা থাকত না। ফরাসী বিপ্লবের পরে নেপোলিয়ন যে পাঠক্রম সঞ্চালিত করেছিলেন, তাতে ভাষা, সাহিত্য গণিত ইতিহাস ভূগোল প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য ছিল। বর্তমানেও রুশ দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যে পাঠক্রম, তাতে ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে সমস্ত বিষয় পড়তে হয়, ব্যক্তিগত রুচি বা স্পৃহাকে বিন্দুমাত্র স্বীকার করা হয় না। এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে আমেরিকা একেবারে বিপরীত মুখে চলেছে। আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর অবাধ স্বাধীনতা ও রুষদেশের শিক্ষাপ্রণালীতে নির্বাচনের অধিকার পর্যন্ত অস্বীকার— এ দু'টি বিরোধী আদর্শের সমন্বয় করে একপক্ষে নির্বাচনের স্বাধীনতা ও অন্যপক্ষে পাঠক্রমের সংহতি স্থাপন করতে পারলেই মাধ্যমিক শিক্ষার সত্যিকার উৎকর্ষ সম্ভব হবে।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় গলদ শিক্ষার মানের অবনতি। সমাজের সকল ছেলেমেয়েরাই মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে, অথচ সকলের সে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় সাধারণভাবে এ মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে যে ছেলেমেয়েদের সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে, তারা যেন কখনো আশাভঙ্গের মনোকষ্ট না পায়। পূর্বেই বলেছি যে সারা আমেরিকায় উৎসাহ এবং সাফল্যের এমন একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছে যে পরাজয় বা বাধাবন্ধকের কথা তারা শুনতেই চায় না। এ-রকম মনোবৃত্তি কাজে উৎসাহ

এনে দেয়, কিন্তু মানুষের জীবনে জয়পরাজয় দুইকেই সমানভাবে গ্রহণ করতে না পারলে কখনো কখনো বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অন্যক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যকে এমনভাবে বড় করে দেখবার ফলে শিক্ষার মান নেমে গিয়েছে। কিশোর বয়সে কেউ যেন বিফলতার দুঃখ না পায় এ দাবী মেটাবার চেষ্টায় পরিশ্রম বা সাধনার মূল্য কমে গিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা জানে যে লেখাপড়া করুক আর না করুক, অধীত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিক আর না দিক, তাদের স্কুল জীবন সফল হবেই, কাজেই অল্পবয়স থেকেই তারা পড়ালেখাকে খানিকটা অবহেলা করতে শেখে। অবশ্য সকলের বেলায় এ কথা খাটে না। আমেরিকাতেও সত্যিকার জ্ঞানসাধকের অভাব নেই, কিন্তু তাদের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে অন্যদেশের সঙ্গে তুলনীয় হলেও শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে অনেক কম। আমেরিকার বহু শিক্ষাবিদ খেদের সঙ্গে বলেছেন এবং আজো বলেন যে সতেরো আঠারো বৎসর বয়সে আমেরিকান তরুণ তরুণী সাধারণত যে জ্ঞানের অধিকারী, বহুক্ষেত্রে ইয়োরোপের কিশোর কিশোরীরা পনেরো ষোল বৎসর বয়সেই তা অর্জন করে। এমন কি আমেরিকার প্রতিবেশী ক্যানাডায় সতেরো বৎসরের শিক্ষার্থীকে যতখানি শিখতে হয়, আমেরিকান শিক্ষার্থীর তুলনায় তা অনেক বেশী।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার এ দুর্বলতা কলেজী শিক্ষায় বহুপরিমাণে দূর হয়ে যায়। পূর্বেই বলেছি যে আমেরিকায় কাজের অভাব নেই। অভাব মানুষের। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার পরেও যারা বিদ্যা অর্জন করতে চায়, তারা নেহাৎ জ্ঞানান্বেষার জন্যই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। অর্থোপার্জনের দাবী মেটাবার জন্য কলেজী শিক্ষার প্রয়োজন নেই বলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রবাহুতের স্থান নেই বললেই চলে। মেধাবী ও একাগ্র ছাত্রই কলেজে ভর্তি হয়, কিন্তু তা' সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষার গলদ শোধরাতে দু'এক বৎসর কেটে যায়। কলেজের তৃতীয় বৎসরের পর থেকে এবং বিশেষ করে প্রথম ডিগ্রীলাভের পরে আমেরিকায় শিক্ষার যে মান, পৃথিবীর যে কোন দেশের শিক্ষাধারার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে।

মাধ্যমিক শিক্ষার গলদের বিষয় কিন্তু আজ আমেরিকার শিক্ষাবিদ খুবই সচেতন হয়ে পড়েছেন। আমেরিকার বিপুল ঐশ্বর্য এবং জনসাধারণের সহৃদয় ব্যবহার ও উদারতা সত্ত্বেও দেশে বিদেশে আমেরিকানদের নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়। ইয়োরোপের লোক সবরকমে আমেরিকার সাহায্য নিয়েও আমেরিকাবাসীকে খানিকটা অবজ্ঞা করে। এককালে তাতে বিশেষ কিছু আসে যায়নি। আমেরিকাবাসী স্বদেশ ও স্বজাতি নিয়ে মশগুল থাকত, বাহিরের পৃথিবীর ব্যাপার নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামাত না। দুই মহাযুদ্ধের ধাক্কায় সে অবস্থা একেবারে বদলে গেছে। বর্তমানে বহু ব্যাপারে আমেরিকাবাসীর হাতে পৃথিবীর নেতৃত্ব এসে পড়েছে, কিন্তু তবু ইয়োরোপের বাসিন্দা তাদের পুরোপুরি স্বীকার করতে চায় না। গত চল্লিশ বৎসরে আমেরিকা বিভিন্ন দেশকে নানাভাবে যে বিপুল সাহায্য করেছে, মানুষের ইতিহাসে তার তুলনা সহজে মিলবে না, কিন্তু যারা উপকার পেয়েছে, তারাও তা' স্বীকার করতে চায়নি। বস্তুতপক্ষে বহুক্ষেত্রে উপকারের প্রতিদানে আমেরিকার ভাগ্যে বিরাগই জুটেছে বেশী।

আমেরিকার অনেক শিক্ষাবিদেরা মনে করেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতা এ অবস্থার জন্য দায়ী। সুসংবদ্ধ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করলে সংহত ও আত্মস্থ মানুষ গড়ে উঠবে। বিভিন্ন বিষয় এলোপাথারী ভাবে পড়লে চরিত্রেও যে খানিকটা অনুশাসনহীনতা আসবে তাতেও বিচিত্র কি? মাধ্যমিক শিক্ষার শ্লথতার ফলে ব্যক্তি-চরিত্রে দৃঢ়তা আসে না, এবং

বয়স্ক আমেরিকানের মধ্যেও কৈশোরসুলভ চপলতা থেকে যায়। খালি চপলতা বলে নয়, কৈশোরের যে আত্মপ্রত্যয়, বয়স্ক লোকের মধ্যে তার অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখলে অনেক সময়ে বিসদৃশ লাগে। কঠিন সমস্যার জটিলতাকে অস্বীকার করাও তরুণসুলভ অনভিজ্ঞতার পরিচয়—বহুক্ষেত্রে জটিলতম রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার যে সহজ সমাধান আমেরিকাবাসী করতে চায়, তাতে অন্য দেশকর্মীর মনে যুগপৎ উপহাস ও ক্রোধের উদ্রেক হয়। এই সব কারণেই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আমেরিকাবাসীর প্রতি খানিকটা বিরাগ জমে উঠেছে, আমেরিকান চরিত্রের বিপুল উদ্যম, বিরাট কর্মক্ষমতা ও উদার সহৃদয়তার পুরোপুরি কদর হয়নি।

[ক্রমশঃ]

এখন ভাবনা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এখন একটু চোখে চোখে রাখো—
দিনগুলো ভারি দামালো;
দেখো,
যেন আমাদের অসাবধানে
এই দামালো দিনগুলো
গড়াতে গড়াতে
        গড়াতে গড়াতে
            আগুনের মধ্যে না পড়ে।

আমার ভালবাসাগুলোকে নিয়েই
আমার ভাবনা।
এখন সেই বয়েস, যখন
দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট—
কাছেরটাই ঝাপ্‌সা দেখায়।

এখন সেই বয়েস, যখন
আচম্‌কা মাটিতে
প'ড়ে যেতে যেতে মনে হয়
হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকলে ভাল হত।
পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই—
সিংহের কালো কেশর দুলিয়ে
গর্জমান সমুদ্র;

দেয়ালে গুলীর দাগ,
ভাঙা শ্লেট, ছেঁড়া জুতোয়
ছত্রাকার রাস্তা,
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত।
মুক্তির বহুবর্ণ বাসনার নিচে
যৌবনকে পণ ধরেছে জীবন।

ঠিক তেমনি দূরে,
কত দূরে ঠিক জানি না,
আজও দেখতে পাচ্ছি—
হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে।
গান গেয়ে
আমাকে বলছে দাঁড়াতে।

গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে
আমি তার বলিষ্ঠ হাত দুটো দেখতে পাচ্ছি
আমি শেষ বারের মত
মাটিতে প'ড়ে যাবার আগে
আমার ভালবাসাগুলোকে
নিরাপদে তার হাতে
পৌঁছে দিতে চাই।

মরা ফেনা

দিনেশ দাস

হঠাৎ নক্ষত্রলোক থেকে
পিছ্‌লিয়ে পড়েছি অথই
বিস্তীর্ণ বালির তটে,
ছোট এক বালির মতই।
সারাদিন মৃতবৎ
অবাক্‌ বিস্ময়ে শুনি সমুদ্রের গম্ভীর ধ্রুপদ,
আর চেয়ে চেয়ে দেখি
অজস্র সবুজ জল
উচ্ছল
অপার,
আর এক পৃথিবী যেন সবুজ পাতার।

কখন
এলো সে চোরা-ঢেউয়ের মতন,
সে এক নুলিয়া-মেয়ে
যেন নীল সমুদ্রের টুক্‌রো মনে হয় :
বুকেতে জমাট দুটি নীল মেঘ—
ফসলের সম্ভাবনা, সৃষ্টির আবেগ;
ভ্রূভঙ্গে তরঙ্গ-ভঙ্গ, চোখে মহাসমুদ্র বিস্ময়।

সে এক আশ্চর্য মেয়ে :
স্বচ্ছ-নীল দেহের ভিতর দিয়ে তার
দেখি দূর-সমুদ্রের অগাধ বিস্তার,
যেখানে সমুদ্র-দিন মাখামাখি হাওয়ায় ফেনায়
বিচিত্র আলোর রঙে আপনার মুখ দেখে
জলের বিরাট আয়নায় :
কখনো বা জলের ধনুকে
অসংখ্য ফেনার ফুলে ভেঙে পড়ে কল-কৌতুকে।

সে-মেয়ে কখন গেছে নেমে
বালি ভেঙে ভেঙে,
চকিতে
এখনো আমি পারি চিনে নিতে,

পর পর
বালির উপর
স্থির
দুটি
নিটোল পায়ের গোছ
গভীর নিবিড়।

সময়ের চরে
ঢেউ ওঠে নামে পড়ে।
উৎসুক
শিশুর মত একা একা কুড়োই ঝিনুক—
ছোট মৃত প্রাণ যত, ছোট ছোট সমুদ্রের শব।
আমি তো মৃতকে নিয়ে খেলা করি,
শব নিয়ে করি উৎসব।
সে এক আশ্চর্য নারী :
তবু সে আরেক মৃত—সাদা বালিয়াড়ি
মরা এক সাদা ফেনা
আমার প্রাচীন এই প্রাণের উপর—
সে-প্রাণ হয়তো এই ধু-ধু বালুচর॥

সত্যি মশাই

হরপ্রসাদ মিত্র

সত্যি মশাই, এক-এক সময় আমিও চাই—
আর-কিছু সুখ,—অন্যরকম প্রাপ্তি—মানে,
অন্তত এই সংসারে সব গণ্যদের—
ইচ্ছা-পালন ঘটায় যে-সব ফলন, তাই।
গাধার মতন শরীর পাতন গাধার থাক্
সোনায় মোড়া হোক্ সে গাধা
—তারপরে সে পালিয়ে যাক্!

সোনায়-সোনায় পোষ মেনে বেশ শক্তি হয়।
অশেষ কষ্ট ভোলার সুখে ভক্তি হয়।
তাছাড়া,—এই মন্দ পায়ের মন্থরতাও উহ্য রয়।
সত্যি মশাই, সোনার গাধা হওয়ার স্বপ্ন তুচ্ছ নয়।
কিন্তু দেখুন, তেমন কিছু হতে যে চাই সংগতি—
প্রভুকে নয়, প্রভুত্বকেই নিত্য মানার সম্মতি।
বুকের মধ্যে মনটা আছে, মনের মধ্যে আপ্‌রুচি—
যতোই তাকে খাটো করি বাড়্‌ছে ততোই ভির্‌কুটি।
না-খেয়ে সে পদ্য লেখে, না-পেয়ে সে ফুরিয়ে যায়
ঠিক বলেছেন—কালের চক্র নগণ্য ঘাস গুঁড়িয়ে যায়!

ঘাসের পরে ঘাসের কিন্তু মহামিছিল উদ্যত
এবং মহাকালের জাঁতায় কেই বা থাকে অক্ষত?
শক্ত-নরম, মন্দ-ভালো সকল বস্তু এক দরে
পিষে-পিষে হচ্ছে মাটি মহাকালের যন্তরে।
কোথায় গেলেন জনক-রাজা, কোথায় গেলেন বাল্মীকি?
আজকে যাঁরা প্রধান তাঁরাও সবাই তো নন বল্মীক-ই!

চীনের পাঁচিল ভাঙ্‌লো দেখুন,—সমুদ্ররাজ ইংরেজের
প্রতাপ গেছে, তম্বিটা আজ দৃশ্য সুয়েজ-সংযোগের।
বুদ্ধ গেছেন, যীশু গেছেন, সক্রেটিস ও গান্ধীজি!
ঘাসের তুচ্ছ প্রাণটা যাবে, সেটাই কি-আর ভিন্ রীতি?
সত্যি মশাই, ঠিক বলেছেন—যাবারই নাম জাগৃতি।
ভাব্‌তে-ভাব্‌তে এমনি করেই সত্যেতে হয় সম্প্রীতি!

যেতে-যেতেই ক্লান্তি আসে,—বাতের মালিশ, সঞ্জীবন
পেতে গেলেই পয়সা লাগে, তাই দিতে হয় অর্থে মন।
কপালে হল চালাবে কাল, রগের চুলে পাক ধরে।
প্রথম দিনের অনন্ত প্রেম প্রতি-দিনের ঘর করে।
প্রেমের এমন দুর্দশাতেই নিষেধ ছিল রবীন্দ্রের।
ঘরে-ঘরে ছাড়ছে নাড়ী মল্লিকা আর গোবিন্দের।

তাইতো মশাই, মাঝে-মাঝে আমিও চাই—
আর-কিছু সুখ, অন্যরকম প্রাপ্তি,—মানে,
আপ্‌রুচিটার চূড়ান্ত ঘুম,—ঘুমের সুখে—
তৃপ্তি ফুটুক্‌ সোনার গাধার চোখে-মুখে।

দেবো, সব দেবো

আবুল হোসেন

দেবো, সব দেবো, যা যা চাও—
কলমিলতা নুয়েপড়া মাচা
দাওয়ার শালিকসুদ্ধ খাঁচা
টিকের ছাইতে ভরা কলকে দুটো
গোয়ালে ছড়ানো ভাঙা ঘুটো
বাতায় শিকেয় তোলা ফুটো
পেতলের কলসিটা
মাদুর বালিশ তেলচিটা
এখনো যা আছে।

ধানতো আর নেই, পাটও শেষ
বছর বছর ডোবে দেশ
আম জাম কাঠালের
জমি গেছে ঢের,
ফল নেই গাছে।

নাও, যা যা পারো নিতে
চৌদ্দপুরুষের ভিটে
গোয়ালের গরু
ঘরের মা বোন জরু
ছেলের মেয়ের শব।
সাহেব, দিয়েছি, দেবো সব।
মরবে কি মানুষটা?
মনে ঢাকে ফানুষটা?

ঝাঝ্‌রা বুকের মধ্যে শুধু
জ্বলবে আগুন ধু ধু
থাকবে দু'চোখ ভরে ঘৃণা
সেতো আর নিতে পারবেনা!

সোভিয়েত কম্যুনিজম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

অম্লান দত্ত

খ্রুশ্চোভের বিবৃতিতে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের যে চেহারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে।১

গোড়ায় কয়েকটি তথ্য স্মরণ করা যাক।

নিজের নীতি অথবা খেয়ালের বশবর্তী হ'য়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা স্ট্যালিনের অভ্যাসের অংগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীকালে পরিপার্শ্বস্থ সকলের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা নাকি তাঁর মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়।২ শুধু সন্দেহের বশবর্তী হ'য়ে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন হাজার হাজার নিরপরাধ কর্মী। কাল্পনিক অভিযোগের বাস্তবতা প্রমাণে এবং মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ে সোভিয়েত পুলিশবাহিনী অনন্যসাধারণ কুশলতা অর্জন করে। অভিযুক্তের মুখ থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের সোভিয়েত প্রণালী যেমনই অব্যর্থ তেমনই ভয়াবহ। এই প্রণালীতেই স্ট্যালিনের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা 'সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচর' বলে প্রমাণিত হয়ে যান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কম্যুনিষ্টদলের কেন্দ্রীয় সমিতির ১৩৯ জন সভ্য ও সভ্য-প্রার্থীদের ভিতর ৯৮ জনকে গুলি ক'রে মারা হয়; এ'দের অধিকাংশই নিহত হন ১৯৩৭-৩৮ সালে। এ-অবস্থায় কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ভিতর থেকে স্ট্যালিনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়।

এসব কথা অবশ্য সম্পূর্ণ নূতন নয়, অন্তত তাঁদের কাছে যাঁরা সোভিয়েত স্বৈরাচারের প্রকৃতি মোহমুক্ত মন নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত কাহিনীই কম্যুনিষ্ট প্রচারে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট নেতা হ্যারি পলিটের একটি প্রাক-খ্রুশ্চোভ বিবৃতি ধরা যাক। ১৯৫৩ সালে ৭ই মার্চে "ডেইলি ওয়ার্কারের" পাতায় পলিট ভক্তি-গদগদ ভাষায় বলেছেন : 'স্ট্যালিন, ইতিহাসে যিনি একটি নূতন স্বর্ণময় অধ্যায় যোগ ক'রে গেলেন, যাঁর ভাস্বর কীর্তি অবিনশ্বর...যিনি স্বৈরাচারী কখনই ছিলেন না, অনুশাসন প্রয়োগে কখনও প্রবৃত্ত হননি, সর্বক্ষণ ব্যগ্র ছিলেন অপরের বক্তব্য অনুধাবন করতে, অপরের মতামতের অর্থ হৃদয়ংগম করতে...।৩ হ্যারি পলিট কি জ্ঞাতসারে অসত্য প্রচার করছিলেন? হয়তো। অথবা

১ খ্রুশ্চোভের যে গুপ্ত বিবৃতি মার্কিণ পররাষ্ট্রদপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়, ব্রিটিশ ও অন্যান্য কম্যুনিষ্টদল তাকে ভিত্তি করেই দলীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেন। "প্রাভদা" ও অন্যান্য সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত পরবর্তী বিবৃতির সংগেও এই আদি বিবৃতির সামঞ্জস্য আছে।

২ কম্যুনিষ্টশাসিত পোল্যাণ্ড থেকেও এই মর্মে অভিযোগ আনা হয়েছে।
"How monstrous and pathologically suspicious must have been the thoughts of a man who could suppose that numerous members of the Central Committee were enemies or imperialist agents." (Radio Warshaw, 29th March, 1956). "Many honest activists who opposed Stalin in various matters fell victim to repression. Methods of provocation were used; false accusation were forged; abuses took place during investigations in order to bring about the condemnation of the accused." (*Trybuna Ludu,* 28th March, 1956).

৩ "Stalin, who has written golden pages in world history, whose lustre

হয়তো সোভিয়েত ভক্তিতে তাঁর বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল। কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বস্তুবাদের সঙ্গে ভক্তিরসের, আদর্শধর্মিতার সঙ্গে নীতিশূন্যতার আশ্চর্য সংমিশ্রণ এ-যুগের অন্যতম বিস্ময়কর ব্যাপার।

খ্রুশ্চোভের বিবৃতিতে স্ট্যালিনী অত্যাচারের অন্যান্য যে-সব দিক প্রকাশিত হয়েছে তা-ও লক্ষ্য করবার যোগ্য। এখানে শুধু দু'একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই যথেষ্ট। বিবৃতিতে প্রকাশ :

"All the more monstrous are the acts whose initiator was Stalin and which are rude violations of the basic Leninist principles of the nationality policy. Thus, already at the end of 1943 a decision was taken and executed concerning the deportation of all the Karachai from the lands on which they lived. In the same period, at the end of December, 1943, the same lot befell the whole population of the Kalmyk Autonomous Republic. In March, 1944, all the Chechen and Ingush peoples were deported and the Chechen-Ingush Automomous Republic was liquidated . . . The Ukrainians avoided meeting this fate only because there were too many of them and there was no place to which to deport them."

অর্থাৎ জাতীয় অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের নীতি মুখে নিয়ে কম্যুনিস্টরা যখন মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যত্র প্রগতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ সোভিয়েত দেশে তখন একে একে বহু ছোট ছোট জাতি ও গোষ্ঠিকে সমগ্রভাবে তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করবার অমানুষিক জুলুম চলছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্ট্যালিনী জুলুম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সমান ভয়াবহ। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের এই অধিনেতাটি শুধু ভবিষ্যতকে নয়, অতীতকেও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন। বিপ্লবের আদিযুগের ইতিহাস নূতন ক'রে লেখা হলো স্ট্যালিনের নির্দেশে, তাতে সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়ে ঘোষিত হলো স্ট্যালিন-মাহাত্ম্য।১

২

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যা হিসাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বৈরিতা ও অবরোধনীতির উল্লেখ করা হয়। বিপ্লবের পর শিশুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ইতিহাস সুবিদিত। আর তিরিশের যুগের মাঝামাঝি নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধায়োজন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে সঙ্গত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একথাও অনস্বীকার্য। তবু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈরনীতির সাহায্যে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যা শুধু আধা সত্যের মর্যাদাই পেতে পারে। স্ট্যালিন

---

time can never efface . . . . Never the dictator, never to lay down the law, always eager and willing to listen, to understand another's point of view . . ."

১ "In speaking about the events of the October Revolution and about the Civil War, the impression was created that Stalin always played the main role, as if everywhere and always Stalin had suggested to Lenin what to do and how to do it."

কম্যুনিষ্টদলের কর্মাধ্যক্ষ হবার আগেই ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যবাদী উগ্রপন্থীরা শ্রমিক আন্দোলনের সম্মুখে মাথা নত ক'রে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের নীতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। বিশের দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত দেশে দুর্ভিক্ষের সময় বিভিন্ন দেশ থেকে কোটি কোটি টাকার সাহায্য নূতন বন্ধুত্বের সুরই ব্যক্ত করেছে। বিশের দশকের মাঝামাঝি লোকার্ন চুক্তি এবং অন্যান্য ঘটনার ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তির সম্ভাবনা দৃঢ়তর হয়েছে। এদিকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে; অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। সংক্ষেপে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিপদের সম্ভাবনা এ-যুগে বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে। অথচ এ-যুগেই স্ট্যালিনী একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি তৈরী হয়েছে। এ-যুগেই গুপ্ত পুলিশবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে; সোভিয়েত আইন ক্রমশ কঠোর হ'য়ে স্বৈরাচারের যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে; আর দলের ভিতর বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ সংকীর্ণ হ'য়ে এসেছে। তিরিশের দশক যখন শুরু হোলো হিটলার তখনও ক্ষমতায় আসেননি, বরং স্ট্যালিনের ১৯৩০ সালের বক্তৃতায় জার্মানীতে কম্যুনিষ্টবিজয়ের আশু সম্ভাবনাই ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রে ততদিনে স্ট্যালিনী জুলুমের ভিত্তি দৃঢ়-ভাবেই প্রস্তুত হ'য়ে গেছে। খ্রুশ্চেভের বিবৃতির একটি অংশ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় : "Stalin put the party and the N.K.V.D. up to the use of mass terror when the exploiting classes had been liquidated in our country and when there were no serious reasons for the use of extraordinary mass terror."

দেশের ভিতর যখন বিরুদ্ধ শ্রেণী নির্মূল, অথবা প্রায় নির্মূল, এবং হিংসাত্মক নীতি প্রয়োগের অন্যান্য কারণও যখন অনুপস্থিত তখনই স্ট্যালিন কম্যুনিষ্ট দল ও পুলিশ-বাহিনীকে দেশময় সন্ত্রাসনীতির সমর্থনে ব্যবহার করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি বার্ট্রাম ডি. উলফের একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। উলফ লিখেছেন :

In the early days of civil war, intervention and famine, when the state was most in danger, art was most free. The state did not begin to dictate in detail until the danger had passed, just as the Menshevik Party was not finally outlawed until the Civil War and the Polish War were safely over . . . . In the war years of 1939-45, when the state was once more in danger and its very survival was in question, there was a new era of comparative liberalism. Then censorship relaxed and poets like the gentle Akhmatova, silenced for more than twenty years, were given a chance to be published. But no sooner was the danger safely past than the Soviet dictators began a renewed war on their own people. The year 1946 saw Zhdanov delivering his declaration of war on Soviet artists, writers and musicians in Stalingrad. Thus the relation between danger to the State and total terror is just the opposite of what is generally imagined." (*Six Keys to the Soviet System*, pp. 99-100).

সোভিয়েত আমলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে বিশেষভাবে সেই যুগে নয় যখন রাষ্ট্র বিপন্ন, বরং সেই যুগে যখন রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত বিপন্মুক্ত।

৩

অর্থাৎ, রুশদেশে স্বৈরাচারী শাসনের অভ্যুত্থানের কারণ খুঁজতে হবে অনেকাংশে সোভিয়েত ব্যবস্থায় ও কম্যুনিস্ট নীতির মৌলিক গলদে।

সাম্যবাদীরা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের দুটি গলদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে-সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বিরাট সেখানে টাকার জোর সহজেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। তা ছাড়া পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন প্রত্যক্ষ ও প্রাত্যহিক যোগাযোগ নেই; শিল্পের ক্ষেত্রেও সাধারণ শ্রমিকের মতামত শিল্প-পরিচালনায় প্রতিফলিত হবার সন্তোষজনক উপায় নেই। এদিক থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থায় একটা নূতন সম্ভাবনা নিহিত ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের স্থানীয় সমিতির ভিতর দিয়ে সাধারণ কর্মীর মতামত শিল্পের ও রাষ্ট্রের পরিচালনায় নিরন্তর প্রভাব বিস্তার করবে, গণতন্ত্র গণস্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশা সোভিয়েত রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের যুগে বহু আদর্শবাদীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই আশা কেন ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো, শ্রমিক-কৃষকের সমিতি কেন সাম্য-স্বাধীনতার নূতন যুগের সূচনা না ক'রে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের যন্ত্রে পরিণত হলো, এ প্রশ্ন আজকের যুগের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর থেকে এ প্রশ্নের সবচেয়ে সুস্পষ্ট উত্তর দিয়ে গিয়েছিলেন রোজা লুক্সেমবুর্গ, যাঁকে লেনিন তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রে গিয়েছিলেন মতের পার্থক্য সত্ত্বেও। রুশবিপ্লবের অল্পকাল পরেই লুক্সেমবুর্গ তীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁর মত প্রকাশ করেন :

"With the repression of political life in the land as a whole, life in the Soviets must also become more and more crippled . . . . Without unrestricted freedom of press and assembly, without a free struggle of opinion, life dies out in every public institution in which only the bureaucracy remains as the active element."

শ্রমিক-কৃষকের সমিতি গণতন্ত্রের ভিত্তি হতে পারে সেই দেশেই যে দেশে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার অক্ষুণ্ণ, সরকারী নীতিকে সমালোচনা করার সুযোগ অবারিত। বিরোধী মতবাদ সংগঠনের অধিকার যেখানে অবলুপ্ত, সেখানে সরকারী শাসনযন্ত্রই সর্বকর্তৃত্বময়। আর সর্বপ্রকার গণসমিতিই সেখানে শাসনযন্ত্রের করায়ত্ত। শ্রমিক ও কৃষক-সংগঠন সে-ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বাহন না হ'য়ে রাষ্ট্রের নির্দেশে গণপীড়নের যন্ত্রে পরিণত হয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্টদল আজও একমেবাদ্বিতীয়ম্। বিরোধী দল গঠনের স্বাধীনতা সে-দেশে অনুপস্থিত। এ বিষয়ে খ্রুশ্চেভের মতবাদ লেনিন তথা স্ট্যালিনের-ই অনুগামী। সোভিয়েত সরকারী বিবৃতিতে বারবারই একদলীয় শাসনের সমর্থন করা হয়েছে।

এ-সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদলের যুক্তি মার্ক্সবাদের উপর নির্ভরশীল। বিরোধীদল বিরোধী শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিফলন। সাম্যবাদ যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উৎপাদনের যন্ত্র যে সমাজে

রাষ্ট্রের করায়ত্ত, সে দেশে শ্রেণীবিরোধের বাস্তব ভিত্তি অনুপস্থিত। কাজেই সাম্যবাদী দেশে বিরোধীদল নিষ্প্রয়োজন।

উৎপাদনযন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পেলেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব লোপ পায় না। যতদিন বণ্টনের প্রশ্ন আছে ততদিন স্বার্থের সংঘাতও সম্ভব। আর যেখানেই কাম্যবস্তু সীমায়িত, অর্থাৎ অশেষ নয়, সেখানেই বণ্টনের প্রশ্ন অনিবার্য। যে-সমাজে উৎপাদনযন্ত্র সমাজের সম্পত্তি ব'লে স্বীকৃত, সে-সমাজেও আয়ের বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠির ভিতর স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। ক্ষমতা নিয়ে সংঘাতও একই কারণে। ক্ষমতা এমন বস্তু যে, একের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে অন্যের ক্ষমতা তাতে সংকুচিত হবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ, মানুষের স্বার্থের সংঘাতের মূলে আছে কাম্যবস্তুর সীমাবদ্ধতা। অর্থ, ক্ষমতা ইত্যাদি যতদিন মানুষের প্রধান কাম্য সামগ্রী হ'য়ে থাকবে ততদিন সমাজে স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য। আর উৎপাদনযন্ত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেই ক্ষমতা অথবা অর্থের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা সুশমিত হবে, এমন মনে করবার কারণ নেই।

স্বার্থের বিরোধ নিরপেক্ষভাবেও মতবিরোধের অন্যতম কারণ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। বিভিন্ন মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই ক্রমশ সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠি অথবা দল অপর সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠি অথবা দলের মতামতকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রথম থেকেই উপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে এ সিদ্ধান্তের ফলে মিথ্যাকেই দীর্ঘায়ু করা হবে।

কাম্যবস্তুর সীমাবদ্ধতা ও জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার ফলে মানুষে মানুষে যে স্বার্থের সংঘাত, সে সংঘাত বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কিন্তু ধনতন্ত্রের বিলোপের সঙ্গে এই সংঘাতের বিলোপের কল্পনা ভ্রান্তি মাত্র। সমাজ যেখানে অচল, অনড় এবং সামাজিক ব্যবস্থার জটিলতা যেখানে কম সেখানে অবশ্য পারস্পরিক অধিকার সম্বন্ধে সর্বস্বীকৃত কোন প্রাচীন নীতির অবলম্বনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অনুচ্চার থাকতে পারে। কিন্তু সচল ও জটিল কোন সমাজব্যবস্থায় বিরোধ উচ্চারিত হবে এটাই স্বাভাবিক। সে-অবস্থায় বিরোধী মতবাদের অনুপস্থিতিই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। যে সমাজে বিরোধী মতবাদ সংগঠনের অধিকার অস্বীকৃত সে সমাজে শাসকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ অনিবার্য; এবং সেই কেন্দ্রীভূত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সমর্থনে নানা মিথ্যা মতবাদ সেখানে প্রশ্নাতীত সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রত্যাশিত। স্ট্যালিনের শাসনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং ইতিহাসের পুনর্লিখন সমাজের উক্ত অন্তর্নিহিত ঝোঁকের একটি চমকপ্রদ অভিব্যক্তি মাত্র।

৪

কম্যুনিষ্ট মতবাদীরা বলে থাকেন যে, সাম্যবাদী সমাজে বিরোধীদল সংগঠনের স্বাধীনতা নিষ্প্রয়োজন। বিরোধী মতাবলম্বীরা কম্যুনিষ্টদলের ভিতর থেকেই তাঁদের মতবাদ প্রকাশ করবেন।

কিন্তু কম্যুনিষ্টদলের ভিতর থেকে বিরুদ্ধবাদীরা মতপ্রকাশের অধিকার কতটুকু পেতে পারেন? কমনুনিষ্ট নীতির মৌলিক সমালোচনা সোভিয়েত দেশে নিষিদ্ধ। এ-বিষয়ে সরকারী বিবৃতিতে কোন অস্পষ্টতা নেই। ১৯৫৬ সালে ৪ঠা এপ্রিল 'প্রাভদা' পত্রিকায়

বলা হয়েছে :

"Communist Party rules give every Communist the right to discuss all questions of party freely. But . . . . the party cannot permit the freedom to discuss problems to be interpreted as the freedom to propagate views alien to the spirit of Marxism-Leninism because this contradicts the provisions of party rules and party principles."

অর্থাৎ কম্যুনিস্টদলের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত দলগত প্রশ্নই সভ্যদের স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী কোন মত প্রচার করবার অধিকার কারো আছে, কারণ দলের নীতি এতে খণ্ডিত হয়।

একদলীয় শাসনের সমর্থকদের একটি কথা বিবেচনা করতে বলি। তাঁরা কি মনে করেন যে তাঁদের মতবাদ অন্য কোন দলের ভিতর থেকে তাঁরা কার্যকরীভাবে প্রকাশ করতে পারতেন? পারতেন না বলেই কি তাঁরা স্বতন্ত্রদল গঠন করেননি? যে-কারণে মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োজন, সেই একই কারণে মত সংগঠনের অধিকারও অপরিহার্য। যে-সমাজে মত সংগঠনের স্বাধীনতা নেই সে-সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ নয়। বিরোধী মতাবলম্বীদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠিত সরকার শুধু এই একটি অংগীকারই দাবি করতে পারেন, যে, মত প্রচারে তাঁরা গণতান্ত্রিক পথই অবলম্বন করবেন, হিংসাত্মক উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে প্রয়াসী হবেন না, আর মতপ্রচারের যে অধিকার তাঁরা দাবি করেন প্রতিপক্ষেরও সেই অধিকারকে তাঁরা সম্মান ক'রে চলবেন। এই সর্ত যাঁরা খণ্ডন করবেন শুধু তাঁদেরই গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যেতে পারে।

যতদিন শাসকদল সংগঠিত, ততদিন বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক সংগঠনের অধিকার স্বাধীন সমাজব্যবস্থার অন্যতম মৌল সর্ত। একদলীয়ত্বের সমর্থনে সোভিয়েত শাসকবর্গ ব'লে থাকেন যে, রুশদেশে কম্যুনিষ্টবিরোধীদল বিদেশী পুঁজিপতিদের সাহায্য লাভ করবে। একই যুক্তি আমরা ফ্যাসিস্টদের মুখেও শুনেছি : কম্যুনিষ্টদলকে বে-আইনী করা দরকার, কারণ কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিদেশী সাহায্যে পুষ্ট। এ-ধরনের যুক্তি মারাত্মক আধা সত্য। শুধু বিদেশী সাহায্যকে পুঁজি করে কোন দলই জনসমর্থন লাভ করতে পারে না। বিদেশী সাহায্য যাতে কোন দলের হাতে বে-আইনীভাবে পেঁছিতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সংগত। সতর্কতা সত্ত্বেও যে-পরিমাণ সাহায্য বিপক্ষদলের হাতে পেঁছিতে পারে তা নিয়ে আজকের যুগে কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারকে, এমন কি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথেও, উল্‌টে দেওয়া যায় না। এ-কথা সোভিয়েত সরকারের অজানা নেই। বিদেশী ষড়যন্ত্রের নামে আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক বিরোধিতার অধিকার কেড়ে নেওয়া আসলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার চিরকালীন অভ্যাস।

সাম্যবাদী সমাজে পুঁজিপতিশ্রেণী অনুপস্থিত। সে-সমাজে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সমালোচনা ক'রে যদি কোন দল জনসমর্থন লাভ করেন তবে একথাই মনে করতে হবে যে এই সমর্থনের পিছনে টাকার জোর প্রধান নয়, যুক্তির জোরই হয়তো প্রধান, অন্তত জনগণের অভাব-অভিযোগের সংগে বিরোধী মতবাদের কোথাও কোন গভীর যোগসূত্র আছে। বিরোধীদলের দুর্বল যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করবার জন্য সোভিয়েতদেশে কম্যুনিষ্টদলের তো সুযোগের অভাব হবার কথা নয়। তাহলে বিরোধীদলকে সংগঠনের স্বাধীনতা দিতে

সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ অসম্মত কিসের ভয়ে?

এ-কথা বলা হয়েছে যে, সোভিয়েতদেশে বিরোধীদল গঠনের কোন দাবি নেই। স্ট্যালিনী অত্যাচারের যুগেও এ-কথাই আমরা বারবার শুনেছি। কিন্তু বিরোধীদল গঠনের দাবি যদি উঠে না থাকে সেদিন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী যদি ধ্বনিত না হ'য়ে থাকে, তবে এ-সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, ভয়ে মানুষ স্তব্ধ হয়েছিল। লেনিনী আমলে এই দাবি শোনা গিয়েছিল। সম্প্রতি সোভিয়েত দেশে এই দাবি আবারও শোনা গেছে; আর একই সঙ্গে শোনা গেছে এই দাবিকে স্তব্ধ ক'রে দিতে সরকারী হুংকার।

চীনদেশে অবশ্য কম্যুনিষ্ট ছাড়া আরও কয়েকটি দল আছে। কিন্তু অন্যান্য দলগুলি কমীনিষ্টদলেরই আজ্ঞাবাহী। রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার সোভিয়েতদেশের মত চীনদেশেও অনুপস্থিত। সোভিয়েত অথবা চীনদেশে যদি গণতন্ত্র ভবিষ্যতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে-গণতন্ত্রের রূপ পশ্চিমী গণতন্ত্রেরই অনুরূপ হ'তে হবে, এ-কথা আমরা বলছি না। গণতন্ত্রের অন্যতর রূপ সম্বন্ধে দু'য়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে প্রবন্ধের শেষ অধ্যায়ে। কিন্তু চীন অথবা সোভিয়েতদেশে আজ যে-ব্যবস্থা প্রচলিত তাতে সরকারী মতের প্রকাশ্য, মৌল সমালোচনা শান্তিপূর্ণ উপায়েও সম্ভব নয় ব'লেই একে গণতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

৫

বিশ্বব্যাপী কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে আজ এ-কথা পরিষ্কার যে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় বিপ্লবের পথে নূতন কোন দেশে ক্ষমতা হস্তগত করবার চেষ্টায় একদিকে বিপ্লবের অসাফল্য, অন্যদিকে বিশ্বশান্তির ব্যাঘাত এবং ফ্যাসিজমের উদ্ভবের সম্ভাবনাই প্রবল। শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা হস্তগত করতে হ'লে দেশের অধিকাংশের সমর্থন প্রয়োজন। অথচ সোভিয়েত শিবিরের বাইরে কম্যুনিষ্টদল কোন দেশেই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। অর্থাৎ, অন্যান্যদলের সঙ্গে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে 'যুক্ত-ফ্রণ্টের' পথেই শুধু কম্যুনিষ্টদলের পক্ষে আজ ক্ষমতালাভ করা সম্ভব। ক্ষমতা করায়ত্ত হ'লে 'যুক্তফ্রণ্টের' অন্যান্যদলের স্বাধীন অস্তিত্ব অবশ্য অচিরেই লোপ পাবে।

বিপ্লবের পথে ক্ষমতা হস্তগত করা যাবে না, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই কম্যুনিষ্টদল আজ এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কম্যুনিষ্টদল কি ভবিষ্যতে এ-সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে পারবেন যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসস্থাপন না ক'রে অন্যান্য গণতান্ত্রিক-দলের সহযোগিতা লাভ করা যাবে না? কম্যুনিষ্টদল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, এমন একটা ঘোষণা অবশ্য আজকাল বারবারই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্র সম্বন্ধে কম্যুনিষ্টদলের নূতন প্রস্তাব বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা নির্ভর করছে দু'টি প্রশ্নের দ্ব্যর্থবিহীন উত্তরের উপর।

প্রথম প্রশ্ন, সোভিয়েতদেশের একদলীয় শাসনের সুস্পষ্ট সমালোচনা উচ্চারণ করতে কি কম্যুনিষ্টদল রাজী আছেন? এ-দেশের কম্যুনিষ্টদল যতদিন সোভিয়েত একদলীয় শাসনের সমালোচনায় পরাঙ্মুখ ততদিন এ-সিদ্ধান্তই অনিবার্য যে, ক্ষমতা হস্তগত হ'লে এঁরাও এদেশে নির্বিরোধ শাসনের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবেন। এমন কোন কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন যে-কারণে সোভিয়েতদেশে বিরোধীদলের স্বাধীনতা বিপজ্জনক বিবেচিত

হ'য়েও কম্যুনিষ্টশাসিত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপজ্জনক বিবেচিত হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, লেনিনবাদ ত্যাগ করতে কি কম্যুনিষ্টরা রাজী আছেন?

সোভিয়েতদেশে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং লেনিন। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েতদেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের ভিতর ধনিকশ্রেণী নির্লোপ হয়েছে; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েতদেশ আজ আর দুর্বল, একক রাষ্ট্র নয়। ধনতান্ত্রিক অবরোধের কথা আজ অবাস্তব। কম্যুনিষ্ট কাগজেও একথা স্বীকার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ কম্যুনিষ্টদের মুখপত্র "মার্ক্সিষ্ট কোয়ারটার্লি" কাগজে বর্তমান বৎসরের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে উধৃতি দেওয়া যেতে পারে:

"The destruction of fascism . . . . cleared the way for the fundamental shift in the balance of world forces which took place during the first decade after the war. Governments under Communist leadership were established in Eastern Europe and China . . . . The capitalist encirclement of an isolated Soviet Union was ended."

প্রায় একই মর্মে বিবৃতি সোভিয়েত নেতাদের ভাষণ থেকেও উধৃত করা সম্ভব। অর্থাৎ, চীনদেশে ও পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন অনস্বীকার্য। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক এই বিরাট পরিবর্তনের পর লেনিনবাদ ও লেনিন-প্রতিষ্ঠিত একনায়কতন্ত্র কায়েম রাখবার স্বপক্ষে সুযুক্তি অবশিষ্ট নেই।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্স-লেনিনের মৌল শিক্ষাও আজ বহু পরিমাণে অচল। রাষ্ট্র শ্রেণী-সংগ্রামে হাতিয়ারমাত্র, অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র মজুরশ্রেণীর বিপক্ষে ধনিকশ্রেণীর হাতিয়ার, এ-কথা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রের উপর মজুর অথবা জনসাধারণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ধনিকশ্রেণী কখনই হতে দেবে না, বরং হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে, লেনিনবাদের এটাই অন্যতম মূল শিক্ষা। শ্রমিকশ্রেণী যতই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও দলবদ্ধ হোক-না কেন, রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক-শ্রেণীর করায়ত্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে ধনিকশ্রেণী, অথবা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসক-গোষ্ঠি, সেই সংকটের মুহূর্তে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে নগ্ন, হিংসাত্মক দমননীতি অবলম্বন করবে, এই তত্ত্বই লেনিনের উত্তরাধিকারসূত্রে কম্যুনিষ্টরা এতকাল প্রচার ও বিশ্বাস ক'রে এসেছেন, এবং বিরোধী মতবাদকে অবাস্তব ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত "সংস্কার-বাদ" আখ্যা দিয়েছেন। অথচ এই লেনিনীতত্ত্বের সংগে এ-যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বৈসাদৃশ্য বারবারই চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর কম্যুনিষ্টরা নিজেদের মতের সমর্থনে পর্যায়ক্রমে দু'টি পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়েছেন : কখনও বলেছেন যে, ভারতবর্ষ প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁরা প্রবঞ্চক, কারণ আপোষের পথে যে-আজাদী পাওয়া গেছে তা যথার্থ হ'তে পারে না; আবার কখনও বলেছেন যে, আমরা যা-পেয়েছি সেটা স্বাধীনতাই বটে, তবে আপোষের পথে এটা পাওয়া গেছে এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ভ্রান্ত অথবা মিথ্যাবাদী। অথচ স্বীকার করা প্রয়োজন যে, ক্ষমতার যথার্থ হস্তান্তরই হয়েছে, এবং অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়েই এটা হয়েছে। বৃটেন ও অন্যান্য কয়েকটি

পাশ্চাত্যদেশের বর্তমানকালীন, আভ্যন্তরীন ইতিহাস এ-দিক থেকে আরও শিক্ষাপ্রদ। এ-সবদেশে রাষ্ট্রের উপর ক্রমশই শ্রমিকশ্রেণীর সুস্পষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—অথচ গণতান্ত্রিক পথেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান যেমন সত্য, বৃটেন-সুইডেন-আমেরিকায় শ্রমিক সংগঠনের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় নীতির ও সমাজব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তনও তেমনই সত্য; অভিজ্ঞতা হিসাবে কোনটিরই মূল্য কম নয়। এ-কথা ঠিক যে, লাঞ্ছিত মানুষের মানবিক অধিকার অর্জন কখনই শাসকগোষ্ঠির কৃপার দ্বারা সম্ভব নয়; সেজন্য সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন সন্দেহাতীত—ভারতবর্ষেও, পাশ্চাত্যদেশেও। কিন্তু এই সাংগঠনিক শক্তি প্রবল হ'লে এবং রাষ্ট্রের চরিত্রগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিলেই শাসকশ্রেণী গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে নগ্ন দমননীতির পথ গ্রহণ করবে, এ-সিদ্ধান্ত সূত্র হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না—সম্ভাবনার অন্যতম প্রান্ত হিসাবেই শুধু স্বীকার করা চলে। এ-বিষয়ে লেনিনীমত গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে মূলে অস্বীকার ক'রে পরিণামে বিপন্ন করেছে এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্বৈরতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবিতার ভ্রমাত্মক কল্পনা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে স্বৈরাচারের শাস্ত্রীয় ভিত্তি রচনা করেছে।

লেনিনের দেশে ও তৎকালে তাঁর মত প্রযোজ্য ছিল কিনা, সেটা আজ প্রশ্ন নয়। লেনিনী মতবাদ আজকের যুগে প্রযোজ্য কিনা, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে কিনা এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিহিসাবে লেনিনবাদকে গ্রহণ করা চলে কিনা, সেটাই বিচার্য। লেনিনের মতবাদ তৎকালীন পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত; এবং পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানা মতবাদের মত লেনিনী মতবাদও আজ অগ্রাহ্য। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নূতন সম্ভাবনার আবির্ভাবের পরও যাঁরা স্বৈরতন্ত্রী জারীয়যুগের প্রভাবাক্রান্ত লেনিনী মতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অটল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের হয়নি এখনও, এ-কথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৬

মানুষের মুক্তির আদর্শ নিয়ে যে-আন্দোলনের প্রথম পাদক্ষেপ, স্বৈরাচারে সে-আন্দোলনের ক্রমপরিণতিলাভ আদর্শগতভাবে আন্দোলনের শোচনীয় পরাজয়েরই জ্ঞাপনা। তবু এ-আশা হয়তো অলীক কল্পনা নয়, যে, কোন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে এই সোভিয়েত-দেশে গণতন্ত্রের একটি নূতন রূপ বিবর্তিত হবে। কোন সমাজব্যবস্থাই অক্ষয় নয়; সোভিয়েত বর্তমান সমাজব্যবস্থাও চিরস্থায়ী হবে না। সে-দেশেও মানুষের ধ্যানধারণা অচিন্তিত পথে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের উদ্যত তর্জনীকে অমান্য ক'রে অগ্রসর হবে; কালের স্রোত তট পরিবর্তন ক'রে নূতন জনপদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবে।

সেই নূতন যুগের কোন অস্পষ্ট আভাসও কি আজ এ-তট থেকে পাওয়া যাবে? বহু সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের একটি সম্ভাবনাই শুধু এখানে নির্দেশ করব। মার্ক্সীয় চিন্তায় রাষ্ট্রবিহীন সমাজের একটি ইঙ্গিতময় কল্পনা আছে। মার্ক্সের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ যেদিন যুগচিহ্নিত ব'লে পরিত্যক্ত হবে, তাঁর আদর্শ হয়তো সেদিনও সোভিয়েত সমাজের বিবর্তনকে প্রভাবান্বিত করবে। নৈরাষ্ট্রবাদী কল্পনার বাস্তবে রূপায়ণ অনিশ্চিত হ'লেও তার পূর্ববর্তী ধাপ হিসাবে শাসকদলের বিলোপ এবং শাসনব্যবস্থায় সমাজের কর্তৃত্ব-

স্থাপনের দাবি একদিন সোভিয়েতদেশে গণদাবিতে পরিণত হতে পারে। কম্যুনিষ্টদলের ক্রমবিলোপের পথে দলোত্তর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হয়তো সোভিয়েত রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের পরবর্তী উচ্চতর ধাপ। দলীয় শাসনমুক্ত সেই সোভিয়েত সমাজে সাংস্কৃতিক সংগঠনের স্বাধীনতা অবাধ হবে; মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ রাষ্ট্ররক্ষিত গোঁড়ামির মর্যাদাচ্যুত হবে; এবং গণপরিষদে রোজা লুক্সেমবুর্গ-কল্পিত অবাধ মতবিরোধের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হবে। এটা অবশ্য সম্ভাব্য ভবিষ্যতের একটি আদর্শীকৃত চিত্র মাত্র। এই বাঞ্ছিত পরিণামের পথে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব আজকের সোভিয়েত একতান্ত্রিক শাসনের প্রতি সমর্থনজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে নয়, বরং ব্যক্তিগত বৈরিভাবমুক্ত শুভেচ্ছা-প্রণোদিত শান্তিপূর্ণ অথচ অনমনীয় বিরোধিতার ভিতর দিয়েই।

নটি

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

জুঁই চামেলীর গন্ধ-বিভোর উত্তাল বাতাসের তরঙ্গে মধুর আজকের রাত। হোলির পক্ষকালব্যাপী উৎসবের আজ শেষদিন। শুক্লপক্ষ থেকে কৃষ্ণপক্ষে এসেছে রজনী চাঁদ। রজনী এসেছে মধ্যযামে। নগরীর কলকোলাহল স্তিমিত, আলোতে ছায়াতে রহস্যময় নির্জন পথ।

কেল্লার পূর্বপ্রান্তে ময়দানে আসর বাঁধছে কয়জন। কাঠের ধুনী জ্বালিয়ে আরাম করে বসেছেন ঘোসসাহেব। সহরে মজুরা নিয়ে এসেছিল নটুয়াদল। তাদের বায়না করে নিয়ে এসেছেন রঘুনাথ সিং রিসালাদার। ফৌজী ছাউনীতে রাম-চরিতের গান হবে।

সিপাহীরা বসেছে ভীড় করে। সামিয়ানার নীচে বড় বড় মশাল মাটিতে গুঁজে রোশবাই হয়েছে জোর। ধুলো উড়িয়ে মস্ত সতরঞ্চি বিছিয়ে দিচ্ছে দু'জন সিপাহী।

আসল জটলাটা বসেছে ঘোসের আশেপাশে। সিদ্ধির সরবতের তত্ত্বাবধানে আছেন স্বয়ং ঘোসসাহেব। আজ সকালে রাজার সঙ্গে দেখা করে অনুমতি আনতে গিয়েছিলেন তিনি। বন্দোবস্ত করে ফরমায়েসী মালাই আর গোলাপজল আনবার দায়িত্বও তাঁরই ওপর ছিল। বাবাসাহেব সমঝদার লোক। ঘোসকে নাকি তিনিই বুদ্ধি দিয়েছেন এলাচের আরক খানিকটা মিশিয়ে দিতে।

ফলটা কিরকম দাঁড়ায় দেখবার জন্যে সকলের মুখের দিকে চাইলেন খাঁ-সাহেব। কিন্তু পেয়ালা মুখে তোলবার আগে সকলেই চুপ-চাপ। ঘোস বললেন,—ব্যাপার কি? আপনাদের কি চুমুক দেবার মেজাজ আসছে না? কিছু গলতি হয়ে গেছে?

তখন ঝুঁকে পড়ে রঘুনাথ সিং বললেন,—গোস্তাকি মাফ করবেন খাঁসাহেব, কেমন যেন ভরসা হচ্ছে না। আপনি পথ দেখান। সেই দশেরার ব্যাপারটা আর কি ভুলতে পারছে না এরা। বলেই হেসে ফেললেন তিনি। হেসে ফেললেন ঘোসও, আর প্রাণখোলা একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল আসর দিয়ে।

ঘোস দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ভাইসব,—একবার পাঁচবছর আগে দশেরার পর নিজেরা খানাপিনা করতে গিয়ে নতুন কায়দায় রান্না বাৎলেছিলাম আমি, তাতে নিমকের কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল।

—আর দুধের ব্যাপারটা? খেই ধরে দিলেন রঘুনাথ সিং। হাসির হররা ফেটে পড়ল।

ঘোস বললেন, দুধের ব্যাপারে কামাল করেছিল বাহ্‌রাম, একচোখো শয়তান, কিন্তু সেই বদনাম যদি এখনো নাছোড়বান্দ হয়ে আমার পেছু পেছু ঘুরতে থাকে, তো তাকে আমি আজ এই রাতে সিদ্ধির সরবতের ভেতর দিয়ে খতম করলাম। মরতে হয় তো—

ব'লে ফিরে দাঁড়িয়ে টেনে তুললেন বাহ্‌রামকে। বললেন—মরতে হয় তো এই মরুক।

চুমুক দিয়ে খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাহ্‌রাম—আরে বাস্‌বাস্‌ ওস্তাদজী কামাল করেছেন ভাই। একবার দেখ।

আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে ফিরতে লাগল সিদ্ধির পেয়ালা। খুদাবক্স সাগরসিং-কে

কানে কানে বল্‌ল, বাহ্‌রামের ব্যাপারটা কি?

সাগর সিং বল্‌ল—বাহ্‌রামের কানের কাছে বলো না, হঠাৎ চটে যাবে। সেবার এমনি ধারাই হঠাৎ বাজী ফেল্‌ল বাহ্‌রাম, ক্ষেতে গরু চরছে, তাকে ধরে দুধ দুয়ে আনবে। বৈশাখ মাসের গরম। বিল্‌চারী থেকে ফিরছি আমরা পঁচিশজন। যেমন গরম চারপাশ তেমনি গরম ওস্তাদের মেজাজ। বিকেল নাগাদ রান্নাবান্নার দিশে করা গেল, ভাগ্যগুণে একটা হরিণ মারলেন কুমার রঘুনাথ সিং, সকলে আরাম করে বসলাম। বাহ্‌রাম ত' যেমনি গোঁয়ার তেমনি একরোখা, অথচ মনটা ওর ভারী সাচ্চা। হঠাৎ ক্ষেপে গেল ওস্তাদের তক্‌লিফ হয়েছে, ও দুধ খাওয়াবে তাঁকে। আমাদের সঙ্গে বাজী ফেলে সে চল্‌ল বালতি নিয়ে। তারপর ফিরে এল শুধু শুধু।

খুদাবক্সের কানটা টেনে এনে সাগর বল্‌ল, ভাই, তার একটাও গাই ছিল না, সব বলদ। আহীরদের গাড়ীতে জুত্‌বার বয়াল সব।

হাসতে গিয়ে বিষম খেয়ে চেপে গেল খুদাবক্স, বাহ্‌রাম খাঁ তার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে আছে দেখে। ঘোস তার দিকে সিদ্ধির মেজাজে আরক্তিম সস্নেহ চোখে তাকালেন। বললেন, গান সুরু হবে। মেজাজ ঠিক আছে ত?

সম্মতি জানাল খুদাবক্স স্মিত হেসে। মনমেজাজ তার খুব ভাল আছে। সেই হোলির পর থেকে মনটা তার অন্যরকম হয়েছে। দুনিয়ার রঙই সুন্দর হয়ে গেছে তার চোখে। আসরভরা মানুষ, কথায়-বার্তায় ব্যস্ত। এতজনের মধ্যে ব'সে খুদাবক্সের মনে হ'ল, এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করতে শিখেছে তার মন। মনের কোন গহনে ছিল সেই আনন্দের মণিকক্ষ। কার সুপ্রসন্ন নয়নের আলোতে যেন তার দরজা এতটুকু খুলেছে। এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

পেটাঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজল। আসরে ঢুকল নায়ক। সাদা কুর্তা, ধুতি ও উত্তরীয়। গলায় রুপোর মালার সঙ্গে গাঁথা রুদ্রাক্ষ, কানে কুণ্ডল। ঢুকে করজোড়ে সকলকে অভিবাদন ক'রে সে সুউচ্চ কণ্ঠে প্রস্তাবনাগীত সুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ হ'ল জমায়েৎ।

সুললিত কণ্ঠ গায়কের। সেই পুরানো রামসীতার গানই সে গাইতে লাগল ভক্তি-ভরে। সূর্য-চন্দ্র, শিব, কৃষ্ণ, চতুর্দিক, দশকোণ এবং শ্রোতাদের উদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করল সে। তারপর ক্ষমা চাইল, পাপমুখে সে পৃথিবীতে নররূপী ভগবান রামচন্দ্রের নামগান করছে বলে। সুরু হ'ল তুলসীদাসী পদ। রাম বিবাহ ক'রে অযোধ্যায় প্রবেশ করছেন। কাঠের ঘোড়ার পিঠে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এলেন লক্ষণ। রাম আর সীতা ঢুকলেন মস্ত জরির ছাতার নীচে। ছাতা ধরে ঢুকল প্রহরী। তখন নায়ক উচ্চকণ্ঠে বললেন—

'জনকপুরী সে রামচন্দ্রজী সীতা লে কর আয়ে'
ধুমধাম কর্‌ শোর মচাওকে সরসে রামগুণ গায়ে'

সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল আনন্দিত পুরবাসীর নৃত্য। বাব্‌ড়ী চুল কপালে ঝুলিয়ে দ্রুত সারেঙ্গী বাজাতে লাগল সারেঙ্গীবাদক। আসর জুড়ে আহা আহা উঠল। ঘোড়াটাকে দুল্‌কি চালে নাচিয়ে লক্ষণও নাচে যোগ দিলেন। রাম সীতা অটল গাম্ভীর্যে চেয়ে থাকলেন। উৎসাহে নায়ক লাফিয়ে উঠতে লাগল।

সামান্য সরবৎ খেয়েছে খুদাবক্স। কিন্তু মগজ পর্যন্ত নেশা পেঁাছেছে ব'লে বোধ

হ'ল। ভীড়ের সুযোগ নিয়ে সে একটু একটু করে পিছু হঠতে লাগল। কিছুদূর এসে দঁাড়ির ঘেরটা পেরিয়ে বাইরে চলে এল। তার অনুপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করবে বলে মনে হ'ল না। ঘোস একমনে দেখছেন, তাকিয়া কোলে নিয়ে। সাগর সিং একমনে সিদ্ধির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। আসর পেছনে ফেলে চলে এল খুদাবক্স।

পাথর বাঁধানো পথে পথে বাড়ীগুলোর ছায়া পড়ে থেমে আছে। উৎসবক্লান্ত নগরী ঘুমিয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে। রাজ-উদ্যান থেকে এক ঝলক ফুলের গন্ধ ভেসে এল।

মায়াময়ী নিশিথিনী। অভিসারিকার মত তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার। কোন আকর্ষণে সে খুদাবক্সকে পথে পথে নিয়ে চল্‌ল। এ পথ, সে পথ, বাজারের চত্বর। ভিখারী ঘুমোচ্ছে মন্দিরের সামনে। চার-পাঁচটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, মালিকরা পাশেই শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পঞ্চকুঁয়ার পাশের নিমগাছটা অজস্র মুকুল ও মঞ্জরীতে সহসা সুন্দর হয়ে উঠেছে, তার পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার টুকরো ঝলমল করছে। সেখানে ক্ষণিক দাঁড়াল খুদাবক্স। অনেক দূরে কার ক্লান্তকণ্ঠে গানের কলি শোনা যাচ্ছে। এত রাতে-ও জেগে আছে কেউ? গানের কথা বোঝা যায় না, তবে সুরটা বাতাসের তরঙ্গে ভেঙে ভেঙে এই চন্দ্রালোকিত নগরীর বুকে টুকরো টুকরো হয়ে জোনাকির মত ছড়িয়ে পড়ছে। এমন রাতে তাহ'লে আরো কেউ জাগে? নিশ্চয় তাকেও খুদাবক্সের মত নিশিতে পেয়েছে।

লছমী দরোজার সামনে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রহরী। সেই রাস্তা ধরল খুদাবক্স। পথের দুই পাশে মুকুলভারে আনমিত কিশোর আমগাছ। মন্দির উদ্যান থেকে জুঁই-চামেলী চাঁপা ও বেলফুলের গন্ধ নিয়ে এসে সেই অপরূপ আলপনা আঁকা পথের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। হ্রদের তীরে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স।

আকাশের ছায়া বুকে ধরে স্থির হয়ে আছে জল। তীরে দু'টি তিনটি কিস্তি বাঁধা। উঠে বসে দড়ি খুলে দিয়ে বৈঠা তুলে নিল খুদাবক্স। রোজকার হিসেব চোখ থেকে হারিয়ে গেছে তার। এমনি রাত রোজ আসে না। আজ তাই বে-হিসেবী হয়ে গেছে খুদাবক্স।

জলে কালো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে বিরামমঞ্জিল। সুরক্ষিত এই উদ্যানবেষ্টিত জল-মহল। একটা মস্ত বটগাছের ঝুরি নেমেছে জলে। সেখানে কিস্তি বেঁধে বটগাছের রেখায় রেখায় তরঙ্গায়িত গুঁড়িতে পা রেখে উঠল খুদাবক্স।

একটু বাগান, কিছু সিঁড়ি, একটি চত্বর, আবার একটু বাগান। তারপরে তৃণাকীর্ণ জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে জলের দিকে। সেখানে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স, আর চকিতে বিদ্যুৎ-ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াল কে কালো পাথরের সিঁড়ির ওপাশ থেকে। সেই সন্ত্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে সহসা সমস্ত আকাশ-বাতাস দুনিয়া দুলে উঠে স্থির হয়ে গেল খুদাবক্সের চোখে। অবগুণ্ঠন টানতেও ভুলে গেল মোতি। ললিত পঞ্চমের সুরে বাঁধা সেই কম্প্র-মুহূর্ত। সময় যেন সময় রইল না। পল ও অনুপল, এই মাত্রাগুলি পাথর পদ্মের মত ফুটে উঠে সুরভিতে ভারাক্রান্ত করল সময়। তখন হৃতসম্বিৎ ফিরে পেল মোতি। ওড়নী টেনে দিল মাথায়। নিজেকে তিরস্কার করল খুদাবক্স। মাথা নীচু করল সম্মান জানিয়ে। বলল, দুইবার অজান্তে গোস্তাকি করেছি। বড় লজ্জায় আরজি পেশ করছি, মাপ করুন।

কথা কইতে গিয়েও খুঁজে পেল না মোতি। তারপর বলল,—কেন?

সেই সন্ধ্যায় বে-আন্দাজ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। জবান্ আমার বশে ছিল না।

অনেক লজ্জা জয় করে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল মোতি। বলল,—আমার স্মরণে নেই।

—আপনার মেহেরবানি।

স্বল্প হাসল মোতি। তার নীরবচিন্তা যাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গুঞ্জরণ করছিল সেই তার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু দুনিয়ার লজ্জা তাকে ঘিরে ধরেছে। কথা কইতে বাধছে। দুরু-দুরু করছে বুক। অজানিত এই চকিত সাক্ষাৎ যেমন মধুর, তেমনি বিপজ্জনক।

তার চিন্তাকে ধ'রে খুদাবক্স বল্‌ল,—কৌতূহল মাপ করবেন, কিন্তু আপনি একা এসেছেন?

—এই বাগান সুরক্ষিত। এখানে আমি কখনো কখনো এসে থাকি, প্রহরী তা জানে। তাই কোন ভয় নেই। কিন্তু আপনি?

আমি খুদাবক্স। গুলাম ঘোসের তোপখানার হাবিলদার। সহরে আমি নতুন এসেছি।

আলাপ পরিচয়ের বিনিময়ে সহজ হ'ল পরিবেশ। ঘাটের সোপানে বসল মোতি। দূরে বসল খুদাবক্স। অবাধ্য কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে দেখল তার স্বপ্নচারিণীকে। এই মুখ তাকে উন্মনা করেছে, এই চোখে তার হৃদয় পড়েছে বাঁধা, এই কণ্ঠের সংগীতে তার হৃদয়ের তারে তারে টান লেগেছে। তাই এখন, এমনি সময়, অপরাধ হলেও বারবার চেয়ে না দেখে তার উপায় নেই।

আজ সন্ধ্যায় কেন প্রসাধন করেছিল মোতি এমন ক'রে, কে বলবে। বড় যত্নে বেণী রচনা করেছিল রূপোর ফুল গেঁথে, সাদা রেশমের গাড়ারা পরেছিল। যত্ন ক'রে বেছে নিয়েছিল আকাশনীল রঙের জরির ফুল বসানো ওড়নী। চোখে সুর্মা টেনে দিয়ে সযত্নে সিঁথিতে পরেছিল মুক্তার কাশ্মীরি গহনা, পায়ে পরেছিল নাগরা।

প্রসাধন তার সার্থক হ'ল আজ। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে সময়ের হিসেব হারাল।

শৈশব থেকে গুরুর পায়ের কাছে বসে সুরসাধনার শিক্ষা নিয়েছে মোতি, মন প্রাণ দিয়ে আরাধনা করেছে সংগীতের। এই মুহূর্তকে সার্থক করে চকিতে তার মনে ঝঙ্কৃত হ'ল—

যব প্রীতম ঘরে আয়ে—

কত ধ্যানে, সাধনায়, আরাধনায় আর আলাপনে যেন পূর্ণতা পায়নি মোতি, যেন কোন আকুলতা মিটত না। আজ তারই চরিতার্থতা অনুভব করছে সে। কোমল চরণ জলে ডুবিয়ে বসল মোতি।

চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিম গগনে।

কিছুক্ষণ বাদে মোতি বলে, এবার কিন্তু ফিরতে হবে আমার।

—সহরে কি কখনো সাক্ষাৎ করা যায় না?

—না। সন্ত্রস্ত মোতি বলে, আপনি ত' জানেন না, কত নিষেধ, কত শাসনে কয়েদ আমি।

তখন একটু দুঃসাহসী হয় খুদাবক্স। বলে, কয়েদ ত' আমরা সকলেই। সকলেই ত' কয়েদ হ'তে চায়, যদি মালিকের হৃদয় কোমল হয়। আর ছুটিই কি সব সময় মেলে?

মখ্‌তবে ইশ্‌ক-কা দেখা য়ে নিরালা দস্তুর
ছুট্টি উনকে নহিঁ মিলা, ন লুৎফ-কা কসর হুয়া—

—তার মানে?

মোতির চোখে চোখ রেখে খুদাবক্স বলে যায়, প্রেমের মখ্‌তবের আশ্চর্য নিয়ম এই যে,

না ছুটি মেলে, না আনন্দের অভাব হয়।

খুদাবক্সের এই স্পর্ধাকে তিরস্কার করবে ভাবে মোতি, কিন্তু তার কৌতুক-ভরা চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে সকৌতুকে, খুদাবক্সও হাসে।

হঠাৎ কোলাহল আসে সহরের দিক থেকে। মনে হয় মশাল নিয়ে লোকজন এদিকেই আসছে। চকিত হয়ে ওঠে মোতি। শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, কি হবে?

স্বীয় আচরণের দুঃসাহসিকতা তখন খুদাবক্সকেও সচেতন করেছে। মোতির হাত টেনে ধরে সে কিস্তিতে তোলে। তারপর জোর জোর বৈঠা টানতে থাকে। বলিষ্ঠ হাতের চালনায় নৌকো চলে আসে বেশী জলে। বিপদের সম্ভাবনায় বুক কাঁপছে, তবু মোতি একটু হাসে। খুদাবক্স বলে, কোন ভয় নেই।

ঘাটে পেঁাছেই নেমে পড়ে মোতি। বাঁধানো শিরীষগাছের গোড়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তার বৃদ্ধ সঙ্গী, মুন্নু সারেঙ্গীয়া। তাকে ডেকে তোলে মোতি। তারপর চকিতে চলে যায়। কিছুদূর গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

খুদাবক্স চল্‌তে থাকে কেল্লার দিকে। আসর থাকতে থাকতে তাকে পেঁাছতেই হবে। আসর ছেড়ে সে যে উঠে এসেছিল তা কেউ বুঝেছে কিনা কে জানে। মোতি নিশ্চয় নিরাপদে বাড়ী পেঁাচেছে। আসরের আলো দূর থেকে দেখা যায়। গান-ও শোনা যায় বেশ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুদাবক্স।

পুণ্যরামচরিত গান সমাপন হয়েছে। দশমুণ্ডধারী লঙ্কাপতি রাবণকে হত্যা ক'রে রাম সীতাকে নিয়ে ফিরেছেন অযোধ্যাপুরী। নায়ক করজোড়ে গীতসমাপনে সমবেত জনতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন।

যে কিশোর বালক তিনজন রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সেজেছিল, তারা হাসিমুখে পিতলের একখানা তাম্বুলদান নিয়ে এল। দর্শকদের সামনে ধরল পেতে। ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে দর্শনী পড়তে লাগল। খাজাঞ্চি জ্বালানাথের ইঙ্গিতে একখানা নতুন থালায় ধুতি চাদর ও টাকা বয়ে আনল একজন। নজরানা তুলতে তুলতে খুদাবক্সের সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটি। হেসে বাড়িয়ে দিল হাত। আসরের সবাই সকৌতুকে খুদাবক্সের দিকে চাইল।

দীর্ঘছন্দ সুঠামদেহ, ধপ্‌ধপে সাদা যোধপুরী ও পেশোয়ারী কুর্তা পরণে, তার ওপর টুকটুকে লাল জামিয়ারের বাণ্ডি, মাথায় মুরেঠা, পায়ে নাগরা। দেখে তারিফ মনে এল সকলেরই। আপনার আনন্দে আপনি মস্ত্ এক মূর্ত যৌবন। সকলের দৃষ্টি নিজের ওপর অনুভব করে একটু লাজুক হাসল খুদাবক্স আর কুর্তার পকেট উজাড় করে, মুঠো ভরে যা উঠল ঢেলে দিল থালায়। একটা মোহর আর চারপাঁচটা টাকা। তার পুরোমাসের সম্বল। নটুয়াদলের মালিক, নায়ক মহানন্দে সম্মতি জানাল, রাম সীতা ও লক্ষ্মণ হেসে উঠল পরস্পরের দিকে চেয়ে। সিদ্ধির নেশা আর গানের মেজাজে মস্‌গুল আসর মাথা ঝুঁকিয়ে মুরেঠা নাচিয়ে তারিফ করে উঠল—হদ্দ্ কিয়া ভাই খুদাবক্স, কামাল কামাল! দিল্ এত খুলে গেল কেন রে—ব'লে বেয়াড়া আনন্দে চীৎকার করল কে যেন! রঘুনাথ সিং বলে উঠলেন, কি খাঁ সাহেব, আমি আপনি দুই শের থাকতে এই বাচ্চা এসে কামাল ক'রে যাবে? বলে দুইমোহর বের করলেন রুমাল খুলে।

ঘোস বেশ চেখ বুজে বসেছিলেন। রঘুনাথের কথার পর কি করতে হবে ভেবে নেবার আগেই হাসতে হাসতে রঘুনাথ তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোহর উঠিয়ে এনেছেন। রঘুনাথ টেক্কা দিচ্ছেন দেখে তিনি বলে উঠলেন, ঠিক আছে ভাই, আজ পুরো নটুয়াদলকে

কুমার রঘুনাথ সিংজী পরোয়ার পুরী মিঠাই খাইয়ে নতুন কাপড় বখ্‌শীষ করবেন। বাস্‌—যাও!

ব'লে হাত নেড়ে আসর ভেঙে দেবার হুকুম দিয়ে সহসা ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে উঠলেন। গোঁফে চাড়া দিয়ে বললেন, কি কুমারসাহেব, কামাল করল কে? তারপর পরোয়ার আর পাঠান শরীর কাঁপিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগলেন। দেখা গেল টক্কর নিতে গিয়ে একটু ঠকে গেছেন কুমারসাহেব, কিন্তু তাতেই তাঁর আনন্দ বেশী।

আসর ভাঙছে হৈ হৈ করে, সতরঞ্চি গুটিয়ে আনছে কয়জন, নেভা মশালগুলো তুলছে বরদাররা, এরই মধ্যে হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল সাগর সিং। কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে সিদ্ধির নেশায় বুঁদ হয়ে সে বসেছিল। এখন দাঁড়িয়ে পকেট উল্‌টে ফেলে সে কেঁদে উঠল বিশ্রীভাবে—আমি অনেক কিছু দিতে চাই, কিন্তু আমার একপয়সাও নেই। ও হো হো, তবে আমি দিল দিয়ে দেব, ভাই মালিক, তুমি কি আমার দিল নেবে না?

সকলেই হেসে উঠল, কিন্তু কার কথা কে শোনে। সাগর সিং বারবার বলতে লাগল—আমি খাস বঘেলখণ্ডের রাজপুত, আমার দিল কি কমদামী? আমার দিল নিয়ে নাও, চলে যেও না—

হাসতে হাসতে রঘুনাথ সিং বললেন, ওর গলা থেকে পা পর্যন্ত সিদ্ধিতে বোঝাই। ওর মাথায় জল ঢেলে দাও।

জল দেবার কথা শুনেই চেঁচামিচি করে আপত্তি জানাল সাগর সিং, কিন্তু কে তার কথা শোনে। চারজন ধরাধরি করে তাকে নিয়ে চলল ছাউনীতে।

খুদাবক্সও হাসছিল। ঘোস শক্ত ক'রে তার কাঁধের কাছে চেপে ধরলেন। বললেন, এবার বাড়ী।

ভোর হয়ে এসেছে। পুব আকাশের রঙ ফিকে, আর চাঁদ ক্রমেই নিভে আসছে। ভোরের তারা দপ্‌দপ্‌ করছে। ঠাণ্ডা বাতাস ক্লান্তি মুছে নিতে লাগল সস্নেহে খুদাবক্সের কপাল থেকে। কেল্লার নহবৎখানায় শানাই বেজে উঠল প্রভাতী সুরে। শানাই-এর পুকার নিদ্রিত নগরবাসীর তন্দ্রামগ্ন চেতনার দরজায় সুরের মূর্ছনায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগল।

শুদ্ধ সুরের আশীর্বাদ পথচারী দুজনকে স্পর্শ করল। রাজপথে সামান্য প্রাণের সাড়া দেখা যায়। এখনই উঠবে ভাণ্ডী পুরুষ ও রমণী। জল দিয়ে ধুয়ে দেবে রাজপথ। জলসিঞ্চনে ভিজিয়ে দেবে দুইপাশের ধুলো।

ভৈরব রাগের উত্তরেই যেন পূর্বপ্রান্তে মহালক্ষ্মীমন্দিরের নহবৎখানা থেকে শানাই বেজে উঠল। রাজপ্রাসাদের অন্ধকার দরজা খুলে গেল। বিনায়ক রাও শাস্ত্রী মৃদুমৃদু ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে চলেছেন, পেছনে প্রদীপ ও অন্যান্য পুজোপচার নিয়ে চলেছে ব্রাহ্মণ সেবক কয়জন। সামনে একটি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ বালক পিতলের ঝারি থেকে জলসিঞ্চন করতে করতে চলেছে। রাজপরিবারের পুজো যাচ্ছে মহালক্ষ্মীমন্দিরে, তাই পথ শুদ্ধ করছে সে।

আসন্ন প্রভাতের এই শুদ্ধশুচি প্রস্তাবনা বড় ভাল লাগল খুদাবক্সের। মনে পড়ল তার গ্রামেও ভোরবেলা কেমন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। মদনমোহনের পুজারী পরমেশ্বর মিশ্র কেমন সু-স্বরে মন্ত্রপাঠ করে। মনটা তার এমনিতেই সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এই সমস্ত পরিবেশ ও সুখস্মৃতি তাকে যেন আরো ভরে দিল।

—সাঁতার জানতে?

ঘোসের এই অদ্ভুত প্রশ্নে তার চমক ভাঙ্‌ল। অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইল। ঘোসের মুখ কিন্তু একেবারেই ব্যঞ্জনাবিহীন। তিনি তার দিকে চাইলেন না। আবার বললেন—

—সাঁতার শিখেছ?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল খুদাবক্স। চট্ ক'রে সে সতর্ক হয়ে গিয়েছে। কেন এই প্রশ্ন, তা যেন ঠিক ধরতে ছুঁতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের পেশার সাগ্‌রেদী করতে করতে সতর্ক হ'তে শিখেছে সে। মনে হ'ল যেন অতর্কিতে আক্রমণ একটা হ'লেও হ'তে পারে। একটু অপেক্ষা করল সে। তখন ঘোস বললেন,—নৌকো চড়ছিলে কিনা, তাই জানতে চাইলাম, মুস্কিল হ'লে কি করতে!

ধরা পড়ে গিয়েছে সে। অবাধ্য হৃৎপিণ্ডকে শাসন করে খুদাবক্স জবাব দিল,—কোন-মতে সামলে নিতাম।

—বেশ বেশ। ব'লে চলতে লাগলেন ঘোস। একেবারেই ভাবলেশহীন মুখ ঘোসের। তবু খুদাবক্সের মনে হ'ল চোখের কোণে যেন কৌতুকের একটি স্মিত আভাস চিক্‌মিক করছে।

আট

মোতির শয়নকক্ষের সামনে একটি ঝুলা বারান্দা। প্রভাতে তার একান্তে দাসী একটি বেদী ধুয়ে দিয়ে গেছে। এখন সকাল। সেই বেদীতে একটি নরম সবুজ রেশমের সাজপোশ্ ঢাকা তানপুরা অপেক্ষামান। একপাশে রুপোর রেকাবীতে বেলফুলের গোড়ে মালা। ওপাশে জাফরিকাজের ধূপদানী থেকে চন্দনধূপের গন্ধ উঠছে।

একপাশে বসেছেন বৃদ্ধ চন্দ্রভাণ। রাজপুত রাজবংশীয় এই সঙ্গীতাচার্য তরুণ-জীবনে মুসলমান ওস্তাদের কাছে সোনার রাখী বেঁধে সাগ্‌রেদী গ্রহণ করেছিলেন। স্বীয়-সাধনায় অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর নামের সঙ্গে পান্নার রাজ-কুমারীর নাম জড়িয়ে অনেক গল্প একদা দরবারে দরবারে ফিরত। খ্যাতি ও যৌবনের চরম শিখরে দাঁড়িয়ে সহসা তাঁর জীবনের মোড় কেন ঘুরে গেল, কেন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে নগরে নগরে ভ্রাম্যমানের জীবন গ্রহণ করলেন, তা নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। অনেকদিন থেকে এখানে বসবাস করছেন তিনি, সঙ্গীতশিক্ষা দিচ্ছেন মোতিকে।

সৌম্য সুন্দর গৌরদেহ চন্দ্রভাণ, সাদা আচকান, যোধপুরী, মুরেঠা ও নাগরায় সুঠাম দেহখানির বাঁধন বার্ধক্যেও শিথিল হয়নি। ঋজু হয়ে ব'সে তিনি কথা বলছেন আর একটু দূরে করজোড়ে ব'সে সশ্রদ্ধ হয়ে শুনছে মোতি নত হয়ে। প্রভাতে স্নানান্তে পীত বস্ত্র পরিধান ক'রে, শুদ্ধশুচি মনে গুরুর কাছে এসেছে মোতি। চন্দ্রভাণের সংযত কণ্ঠের কথা-গুলির একটি-ও যেন হারিয়ে না যায়, তাই একাগ্র চিত্তে মোতি শুনছে।

চন্দ্রভাণ সস্নেহ কণ্ঠে বলছিলেন, —সব সাধনার মতই সঙ্গীত সাধনা বড় দুরূহ ব্যাপার। ঈশ্বর আরাধনা ক'রে ভক্তের জীবন কেটে যায়, সঙ্গীত-ও চিরজীবনের জিনিষ। অনেক সাধকজনের খবর আমি জানি বেটি, তাঁরা সিদ্ধসাধক, তবু সুরের কারণে জীবনে কোনো মহফিলে যোগ দেননি। পরিণামে দুঃখে কষ্টে দিন কেটে গেছে তাঁদের, তবু বিদ্যাকে

পূজি করে তাঁরা না কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছেন, না কোন আরাম পেয়েছেন। তোমাকে কি আমি কখনো ছোটে খাঁর কথা বলেছি?

—না তো!

ছোটে খাঁকে আমি দেখেছিলাম কাশীতে। সে চল্লিশ বছরের কথা হবে। তাঁর নাম আমার গুরুজীর কাছে শুনেছিলাম। গুরুজী বলেছিলেন, ভাগ্যের বরপুত্র ছোটে খাঁ সাহেব, তিনি ছিলেন সুরের একান্ত রগীব্ লোক। মালকোশে সিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। গান গাইবার সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকতেন মুর্শিকের সৈয়দ, সঙ্গীতের আত্মা। কিন্তু শেষ অবধি কি হ'ল? মাথা তাঁর গোলমাল হয়ে গেল। গোয়ালিয়রে তাঁরই মহফিলের শেষে সব ফেলে রেখে কোথায় চলে গেলেন।...যাক্, আমি তখন নতুন জোয়ান, গুরুজীর সন্ধানে নানাভাবে ফিকির করতে ব্যস্ত। শেষরাতে খেয়াল হয়েছে গঙ্গাজী-কে দর্শন করব। চলে গেছি শিবালা ঘাটে। সেখানে সহসা শুনলাম মালকোশ রাগের একটি পদ, সুরের মুহ্রা কায়েম করে, একটি সপাট তানের অন্তে এমন করে চলে গেল পূর্ণস্থায়ী পদগুলোতে, যেন মনে হ'ল সেই শেষরাতের আকাশ, বাতাস আর গঙ্গার জল, সবই সুরের ঝাপটায় তোলপাড় হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছি। সময়ের খেয়াল নেই, হিসেব নেই, সুর যে এমন ধারা জীবন্ত হ'তে পারে, তা' আমি তখন পর্যন্ত জানতাম না। মনে পড়ে গান শেষ হ'ল যখন, তখন রাতের রঙ ফিকে। দেখলাম সমাধিস্থ ভাবে বসে আছেন চোখ বুজে স্বর-সাধক।

শিবালা ঘাটের এক পূজক ঠাকুর নেমে আসছিল। সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। সস্নেহে হাত ধ'রে তুলল তাঁকে, তারপর ধীরে ধীরে নিয়ে পার করে দিল চবুতরা, খিলান আর সিঁড়ির বিপজ্জনক অংশগুলো।

পূজকজীকে আমি জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেছিলেন, উনি হচ্ছেন ছোটে খাঁ সাহেব। বড় খামখেয়ালী আর বে-ঠিকানা মানুষ। চোখ তাঁর ক্ষীণ হয়ে গেছে। কখনো এখানে আসেন, কখনো চলে যান, বেশী কিছু জানি না, তবে যখন আসেন, তখন একটু মদত খিদমৎ করবার চেষ্টা করি, ওঁর পিছু পিছু যাবেন না কখনো, উনি একেবারেই মানুষের সঙ্গ পছন্দ করেন না।

মোতি অভিভূত হ'য়ে শোনে। চোখের ঘনকৃষ্ণ আঁখি-পল্লব বেদনাতুর হয়ে ভিজে ওঠে। চন্দ্রভাণ বলতে থাকেন,—আমি আজ বুঝি, গানের সাচ্চা আশ্‌ক তিনি বুঝেছিলেন, তাই নিজের বলতে যা কিছু সব মিলিয়ে দিয়ে অমনি ধারা জীবন বেছে নিয়েছিলেন। সেই ভাবে সঙ্গীতকেই চরম জেনে জীবনটাকে ভাসিয়ে দিতে বলি না আমি, তবু জেন সাধনা দরকার হয়। এমন সাধনা চাই যে জীবনভর ঐ একই জিনিষের মধ্যে রোশ্‌নি দেখবে, আর কোথাও খুঁজে ফিরবে না।

করজোড়ে মোতি বলে,—আপনার মত শরীফ মুরশিদ পেয়েছি, আমার ত' পরম সৌভাগ্য। আমার অত সুকৃতি নেই, তবু চেষ্টা করি।

চন্দ্রভাণ বোঝেন মোতির মর্মব্যথা কোথায়। বলেন, তওয়ায়েফ্ তুমি, তাতে কোন অপমান নেই, তোমাকে ত' বলেছি, তওয়ায়েফ্‌দের মধ্যে থেকেই কতজন সুরের সাচ্চা মাসুক জন্ম নিয়েছেন। কমল যেখানেই ফুটে উঠুক, সে কমলই থাকবে, আর তার সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ হবে। শুধু খেয়াল রাখবে কখনো গানকে ছোট ব'লে মানবে না। যত রাগরাগিণীর পট তুমি দেখবে, জানবে তাঁরা সাধকের ধেয়ানে ধরা দিয়েছিলেন, তাই তাঁদের রূপবর্ণনা সম্ভব হয়েছে। সাধনা সবচেয়ে বড় কথা বেটি—

চন্দ্রভাণ উঠে দাঁড়ান। স্পর্শ বাঁচিয়ে মেঝের ওপর নত মস্তকে প্রণতি জানায় মোতি। সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে আশীর্বাদ করেন তাকে চন্দ্রভাণ। মোতি যে তওয়ায়েফ্ মাত্র, সে কথা তিনি কখনো মনে করেন না। কোন গোপন বেদনার পূজারী চন্দ্রভাণ। সব মানুষকেই গ্রহণ করবার ক্ষমতা পেয়েছেন একটি গভীর বেদনাবোধ থেকে।

নেমে গিয়ে চন্দ্রভাণ অপেক্ষমান শিবিকায় আরোহণ করেন। পথের দিকে চেয়ে আনমনা হয়ে যায় মোতি। ভাবে, চন্দ্রভাণের কথা। মনে হয় কোন্ বিচ্যুতি ঘটল নাকি। তারপর মনে হয় তার নিজের জীবনে দুটো প্রেমই সত্যি। সংগীত সে ভালবাসে নিশ্চয়ই, কিন্তু খুদাবক্সকেও কম ভালোবাসে না। দুই-ই সমান, মনে মনে বলে সে।

নীচ থেকে জুহীর কলকণ্ঠ শোনা যায়,—বেগমসাহেবার শিঙার কতদূর? এদিকে এত্তেলা নিয়ে তাঞ্জাম এসে গেছে। খেয়াল আছে কি না আছে যে, আজ হচ্ছে সেই দিন।

কথা বলে আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠে জুহী। মোতি আয়নাতে মুখ দেখে, কানে গহনা পরে আর মুখ টিপে হাসে। বলে,—বাস্ বাস্, চুপ কর্। আমার সব খেয়াল আছে।

—এ কিন্তু মাঝরাতে চুপিচুপি—সে সব খেয়াল নয়, এ হ'চ্ছে ভোরবেলা, কাজের খেয়াল।

—হাতীর দাঁতের চিরুণী দিয়ে শাসন করে জুহীকে মোতি। বলে,—সব খেয়াল আছে।

চঞ্চল চরণে জুহী ঘুরে বেড়ায়। একখানা ছবি সোজা ক'রে বসায়। আয়নার ওপর থেকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় চন্দনের গুঁড়ো। সুর্মা পরে টেনে টেনে। ভুরু কুঁচকে নিজের মুখখানা দেখে। মোতি বলে,—ওতেই চলবে জুহী, এখন চল্।

জুহী বলে,—না, মন খারাপ ক'রে লাভ নেই।

—মন খারাপ হ'ল কেন?

—মন ত' ভালোই থাকে, শুধু তোমার সামনে এলেই—

মোতি মৃদু তাড়না করে। বলে,—চল্ চল্ তবু যদি না সুন্দরদাসের ছেলের কথা জানতাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জুহী হাসিতে হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে,—ছেলেটার একেবারে বুদ্ধি নেই। কালও খত্ পাঠিয়েছে, জানো?

নেমে এসে মোতি তাঞ্জামে ওঠে। তাঞ্জাম চলে নাট্যশালার দিকে। পথে চলতে চলতে বাহকরা হাঁকে—তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে মোতি। ছাগলছানা কোলে নিয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে হেসে হেসে দৌড়োয় তার ভাই-এর হাত ছাড়িয়ে এঁকে বেঁকে শাক-ওয়ালীদের ঝুড়ির ভেতর দিয়ে। প্রসন্ন কৌতুকে স্মিতাননে হাসে মোতি। প্রত্যহের পরিচয় এই পথের সংগে, তবু কেন যে মধুর মনে হয়, কেন যে ভালো লাগে! এই কেনগুলোর উত্তর খোঁজে না মোতি, শুধু এককলি গান গুঞ্জরণ করে—মুরলী ধুন শুনা শাঁবলিয়া।

নাট্যশালাতে সারেংগীয়া, মৃদংগকার ও অন্যান্য সংগতীয়ারা অপেক্ষা করছেন। মাঝখানে শ্যামকান্তি ঈষৎ স্থূলকায় বাবাসাহেব গংগাধর রাও, শিল্পী সুখলাল কাছুবাহাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সুখলাল নিবিষ্ট হয়ে শুনছেন, আর রাজার চাহিদাগুলো মনে মনে টুকে রাখছেন স্মৃতির পাতায়, ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে। নাট্যশালার অধিকারী বিশাল সুখ করণ বসে আছেন পদ্মাসনে। ঋজু হয়ে বসে থাকলে মেরুদণ্ড দিয়ে নাকি শক্তি সঞ্চারিত হয় মাথায়, এই তাঁর বক্তব্য।

ঘরের মাঝখান দিয়ে দরজা পর্যন্ত চলে গেছে কার্পেট। তার বাইরে নাগরা খুলে রেখে নতমস্তকে কুর্ণিশ করতে করতে ঢোকে মোতি। রাজার সামনে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায়। তারপর সকলের সামনে মাথা নীচু করে কুর্ণিশের ভঙ্গীতে পেছু হটে গিয়ে স্ব-স্থানে বসে। তার অনুরূপ আচরণের পর জুহী-ও বসে তার পাশে। ক্ষণকাল সকলে অপেক্ষা ক'রে, তারপর রাজার চোখের ইসারা বুঝে নিয়ে বিশাল সুখকরণ সুরু করেন মহড়া। মৃদঙ্গী ঘাড় ঝুঁকিয়ে বাব্‌রী চুল নাচিয়ে বোল বাজিয়ে ওঠে, খোলে ঘা পড়ে। নিমেষে ঘুঙুর বাঁধে মোতি। সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে বিশাল সুখকরণ আসরে এসে দাঁড়ান। গণেশ, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীর বন্দনাগানের পর রাজার প্রশস্তি গীত করেন তারপর দ্রুত সংস্কৃত শ্লোকে, অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনা গেয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান। তখন আলবালে জল সেচন করতে করতে নৃত্যপরা মোতি প্রবেশ করে। স্বল্প নৃত্যছন্দ, শুধু জলসেচনের ভঙ্গিমা। জুহী ও হীরা, তার অন্য সখীরা-ও আসে।

চিবুকে হাত রেখে জরির তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে দেখেন গঙ্গাধর রাও। প্রশস্ত ললাটে প্রভাতী পূজার আশীর্বাদ-তিলক। কোনো দুশ্চিন্তা যেন কপালের রেখাবলীতে বন্দী হয়ে আছে ব'লে বোধ হয়। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন ক'রে তিনি দেখেন।

সোনী দুষ্যন্ত বেশে প্রবেশ করে আসরে। দেখে গঙ্গাধর রাও সামনের ঘণ্টাতে আঘাত করেন। অভিনয় থেমে যায় চকিতে। কার কি ত্রুটি হয়ে গেছে ভেবে সকলেই দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করে। রাজা বলেন,—"মোতি, তোমার চাহনী আর নাচ এরকম তরল হয়েছে কেন? এ কি তওয়ায়েফের আসর? হুঁশ নেই তোমার?"

ভীত মোতি নতমস্তকে শোনে ভর্ৎসনা। তারপর আবার সুরু করে প্রথম থেকে।

ঘড়িতে দশটা বাজতেই উঠে পড়েন রাজা। পাশে করজোড়ে দাঁড়ায় মোতি। রাজা সস্নেহকণ্ঠে বলেন,—বড় পরেশান্ হয়ে গিয়েছ মোতি?

—নেহি জী সরকার।

রাজা বলেন,—আমি ত' চলে যাচ্ছি তিন মাসের মতো। তার আগে একদিন পুরো জলসা দেব।

দরজার দিকে চলতে চলতে বলেন,—রানীমহালে একদিন নাচ দেখাতে হবে। তারপর সকৌতুকে বলেন,—খুব ভাল ক'রে। বাঈসাহেবকে খুশী করতে পারো তো—

নতমুখে মৃদু মৃদু হাসে মোতি। রাজা উঠে বসেন মেণায়। বাহক-রা তুলে নেয় শিবিকা।

প্রাসাদ অভিমুখে চলতে চলতে রাজা কত কথাই যে ভাবেন। কোলে একটি আর অপর একটি ছেলের হাত ধরে মা চলেছে ছেঁড়া কাপড়ের ঘাঘরা দুলিয়ে বিষ্ণুমন্দিরের অন্নসত্র অভিমুখে। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র। দূরে দবণ্ডী বাজাচ্ছে নকীব—ঘোষণা করছে আজ অপরাহ্নে চৌকে শ্রীমন্ত সরকারের হুকুমে বস্ত্র বিতরণ হবে। সবাই যেন হাজির হয়ে যায়—! অন্নদান, বস্ত্রদান, মন্দিরে মন্দিরে পূজা, লগ্নে লগ্নে হোম যজ্ঞ, সবাই একটি ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে। একটি পুত্র হোক মহারাজের। সিংহাসনের উত্তরাধিকার হোক সুনিশ্চিত। কিশোরী পত্নীর পুত্রেষ্টি-ব্রতের উপবাসে ক্লিষ্ট মুখের একখানা ছবি সেই নিঃসঙ্গ রাজহৃদয়কে ব্যথা দেয়। গত রাত্রে সান্ধ্যপূজার পর যখন বস্ত্র পরিবর্তন করতে চলেছিলেন তিনি, সহসা চোখে পড়েছিল, অলিন্দে মাথা হেলান দিয়ে বসে আছেন রানী। উপবাসে ঈষৎ শীর্ণ বোধ হ'ল চেহারা। সমবেদনা আর স্নেহের ভাব এল রাজার মনে।

দূরে বহু দূরে ক্যাণ্টনমেণ্টের দিক থেকে ব্রিটিশ বিউগ্‌লে ঊর্দি বাজছে শোনা গেল। ভ্রূকুঞ্চন করলেন রাজা। বাহকদের বললেন,—জোরে চালাও।

রানীমহালের অংগনে লাল শালু বিছিয়ে দিয়েছে আসরে। ঝুলবারান্দায় বসেছেন পুরনারীরা। তাদেরই মধ্যে বসেছেন রাণী। আসরে মোতি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকায়। অভিবাদন ক'রে বলে,—ফরমাইয়ে সরকার।

রানী তার চেয়ে কিছু ছোটই হবেন। মোতির ঈষৎ উন্নীত মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি অংগুলি হেলনে কাশীকে ডাকেন। কাশী ডেকে বলে, এক নাচ প্রথমে, তার পরে ব্রজধামের গান শুনবেন বাঈসাহেবা।

নীচু হয়ে তস্‌লিম জানায় মোতি। তারপর একবার শান্ত দৃষ্টিতে দেখে তার পরিবেশ। রাজপ্রাসাদের ভেতরের প্রশস্ত অংগন জলে ধোওয়া সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। দ্বিতল প্রাসাদ এই অংগনের চারিপাশ ঘিরে। অপরাহ্ণ। তবু সূর্যের আলো এসে পড়েনি এই কালো পাথরের অংগনে, চারপাশের ঘরগুলোতে আড়াল করেছে। প্রাসাদের গায়ে গায়ে জোড়ায় জোড়ায়, মাছ, হাঁস, ময়ূর ও হরিণের মূর্তি উৎকীর্ণ। ও পাশে ঝুলবারান্দায় পাখীর কলরব। চিড়িয়ামহলে পিঞ্জরা টাঙানো সারি সারি, তাতে শুক, শারী, হীরামন ও কাকাতুয়া। খোপে পায়রা উড়ে এসে বসছে শত শত। বাঁদিকে বোধ হয় আশ্রিত পুরনারীদের বাস। মারাঠা রমণীরা কাছা দিয়ে পরেছেন রঙীন কাপড়। সারি সারি বসে আছেন জোড়াসন হ'য়ে। শিশু, বালক বালিকারও অভাব নেই। বাঈসাহেবাকে এত কাছাকাছি দেখেনি কখনো মোতি। দোতলার ঝুলবারান্দায় তিনি বসেছেন মাঝখানে, একটি হাতলবিহীন চৌকিতে। দুইপাশে বসেছেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা। রানীকে মৃদু-মৃদু বাতাস দিচ্ছে কাশী। সকলেই অপেক্ষমান। এদের চোখে কোনো এক বার্তা পড়ে মোতি। এদের কাছে সে শুধু নটি, বাঈসাহেবার বেতনভোগী নর্তকী মাত্র। সহসা রানীর চোখে চোখ পড়ে। যেন তার বিভ্রান্তি বুঝে রানী ভরসা দিয়ে একটু হাসেন। বলেন,—কোন অসুবিধে হচ্ছে?

মোতিও হাসে। বলে, না। তারপর সংগতীয়াদের নির্দেশ দেয়।

রঙিগলা তানের হাল্‌কা গানের সংগে লঘু পদক্ষেপে নামে মোতি। পুরো হাতা গলাবন্ধ জামা সবুজ রেশমের, পীলা ঘাঘরা, পীলা ওড়্‌নী। নাচের তালের সংগে সংগে বাজনা কখনো দ্রুত হয় কখনো আস্তে। মানিনী হয়ে মান ক'রে বসে মোতি, আবার হেসে হেসে প্রসন্ন হয়। পায়ের কাছে লাল শালু কুঁচকে পদ্মফুলের মত হয়ে যায়। তারিফ্ করে মেয়েরা, সবিস্ময়ে দেখে। মোতি তালে তালে পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল-শালুতে অনেকগুলি পদ্মরচনা করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

নাচ থামতেই সকলেই প্রশংসা ক'রে ওঠে। তাড়াতাড়ি চাদর টেনে সমান ক'রে দেয় স্নুহী। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এবার মশালদানে বাড়ি নিয়ে আসে দাসীরা। মহলকারনীরা বাতি জ্বালায় ঘরে ঘরে, ঝাড় লণ্ঠনে, অলিন্দে। এই আবছায়া পরিবেশে, প্রাচীন প্রাসাদের ছায়াচ্ছন্ন অংগনে, মোতি একটু স্বস্তি পায়। মধুর কণ্ঠে চন্দ্রভাণজীর কাছে শেখা গান ধরে—কুঞ্জবন ছোড়ি রে শ্যাম, কঁহা গাউঁ গুণনাম—

ললিত কণ্ঠে কোনো প্রেমিকার হৃদয়বেদনা বেজে ওঠে। সমস্ত হৃদয় দিয়ে, মীরার গানে মোতি নতুন আকুতি আরোপ করে। নতুন আরতির আলোয় উদ্ভাসিত করে গানের অন্তর্লীন সৌন্দর্য। ভজন গাইতে বসে কেমন যে আবেগ আসে মোতির মনে, তার পরেই

সে চলে যায় বালক কৃষ্ণের প্রতি যশোদার স্নেহোক্তিতে—নন্দলালা মোরে প্যারা আও গিরিধারী বনমালা পহ্নাউঁ ইত্যাদি—। ধীরে অতি সন্তর্পণে সন্ধ্যা নামে গগন ছেড়ে অঙ্গনে। শ্রোতাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। গানের সুরে সুরে যেন, ব্রজধামের ধূলিধূসর সন্ধ্যা, গৃহগামী গাভীদলের গলার ঘণ্টার টুং টাং শব্দ, দুরন্ত বালককে কোলে নিয়ে যশোদার মান-অভিমান, এই সব ছবিগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। গান থামতেও তাই আবেশ কাটে না।

বড় সুন্দর লাগল, পিয়াস পুরিয়ে দিলে তুমি—রানীর সপ্রশংস উক্তি শুনে মোতি মাথা নীচু করে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ও আনন্দে। শুধু ভালো লেগেছে শুনেই মোতি চলে যাবে, রানী তাঁর পার্শ্বচারিণীকে কাছে ডাকেন।

তারা তাড়াতাড়ি ক'রে ছুটে আসে। দাঁড়িয়ে পড়ে মোতি। দাসী বলে, বাঈসাহেবার আশীর্বাদ। লাল রেশমের রুমাল মেলে ধরে। এক জোড়া মুক্তোর বালা। কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায় মোতি। তারপর তুলে নিয়ে রানীর উদ্দেশ্যে পুনর্বার তস্লিম পেশ করে। মোহরের থলিটা দেয় ভৃত্যের হাতে। একটা মোহর বের ক'রে দেয় দাসীর হাতে।

রাতে যখন গঙ্গাধর বিশ্রাম করতে এলেন, রানী অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। বললেন, মোতির গান আমার খুব ভালো লাগল। কি সুন্দর ভক্তির সুরে গাইল। বড় গুণী মেয়ে, বড় কলাবিদ্।

ভালো লেগেছে তোমার?

—হ্যাঁ।

তারপর একটু ইতস্তত ক'রে, হেসে বল্লেন, আমার মোতির কঙ্কণ আমি ওকে দিয়েছি। ভালো করিনি? একটু যেন অপরাধের সুর আল্তো হ'য়ে ছুঁয়ে আছে প্রশ্নটায়।

রাজা বললেন, বেশ করেছ। মোতিকে মোতির বালা দিয়েছ, ঠিক করেছ। কি বিঠুরওয়ালী, খুব কাব্যবোধ হয়েছে ত? বড় খুশী হ'লাম। হাসছ?

—আমি বিঠুর ছাড়লাম, তবু নাম আমাকে ছাড়ল না।

—না আগের চেয়ে অনেক মানুষ হয়েছ। মানতেই হবে—

এবার দুজনেই হেসে ফেললেন। অনেক দুশ্চিন্তার মাঝখানে একটু হাসিতে যেন মনের ভারও খানিকটা নেমে গেল।

লছ্মীমন্দির ছাড়িয়ে পূবদিকে চলতে চলতে টিলার গায়ে একটি মিনার ও ঘর। লোকালয়ের সীমানা ছাড়িয়ে এখানে পলাশ, কেঁদ, তেঁতুল ও শিরীষ গাছের বন। শেষ-বসন্তের অন্তিম বাসনা মূর্ত্ত ক'রে ফুটে উঠেছে পলাশ। বনজুঁই-এর গাছেও গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেছে। তার স্নিগ্ধ গন্ধে মদির হয়েছে পরিবেশ। শুক্লপক্ষ সমাপনে চাঁদের দিন ফুরিয়েছে। দিনমানেও এখানে কেউ আসে না।

প্রতি রজনীতে ছায়া ও সুরভিসমাকুল এই বিসর্পিল বনপথ ধরে অভিসারিকা রাধিকার মত গোপনে আসে মোতি। কত শাসন, কত বাধা, রাজার নজরে পড়বার আশঙ্কা, সব অগ্রাহ্য ক'রে আসতে হয়। খুদাবক্সের সঙ্গে কিস্তি বেয়ে চলে এসে, জলের ওপরে আনমিত একটি জামগাছের ডালের আড়ালে কিস্তি বাঁধে তারা। তারপর চলে আসে তাদের এই ছোট্ট ঘরখানায়। পাথরের ঘর। একপাশে একটা মোটা মোমবাতি জ্বলে। তাতে একটা সুন্দর আভা হয়।

সেই স্বল্প আলোতে বাঈসাহেবের ইনাম, বালাজোড়া হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়

মোতি। খুদাবক্স ছলনা করে। বলে, দেখতে পাচ্ছি না ত? মোতি বলে, কেন, আলোতে ভাল ক'রে দেখ। খুদাবক্স বলে,—না, তোমাকে দেখে দেখেই সব আলো আমার ফুরিয়ে গেছে। এখন আর অন্য আলো কোথায় মিলবে বল?

মধুর হাসে মোতি। কোমল হাত তার মুখের ওপর রাখে। মোতির পোষাক দেখে হাসে খুদাবক্স, বলে, কিষাণের সঙ্গে মিশে কিষাণী হয়ে গেছ মোতি। কালো মোটা কাপড়ের ঘাগরা আর ওড়নীতে মোতিকে সত্যিই গাঁয়ের মেয়ের মত দেখায়। খুদাবক্স বলে, এক গান গাও মোতি?

—বল কোন গান।

—যে গান গাইতে চায় তোমার মন।

ভীরু সরমে মধুর কণ্ঠে সেই পুরানো গান গায় মোতি। গজলের কথায় আর সুরে ললিত রাগ তার আবেদন জানায়। মিনতি ক'রে বলে, হে বুলবুল, তুমি অশ্রুবর্ষণ কোরো না, এখানে অশ্রুবর্ষণে মানা আছে—

মৎ রোঁ ইঁহা বুল্‌বুল্‌—
আঁসু বহানা হ্যায় মনা॥

ফুলের মত ওষ্ঠাধর মৃদু গুঞ্জন করে কথাগুলি। অনভ্যস্ত কোন্ বেদনার অনুভূতি জাগে খুদাবক্সের মনে। নীলাভ তীক্ষ্ণচোখে নামে কোমল মমতা। অনুভূতির কোন্ জটিল অরণ্যে পথ হারায় খুদাবক্সের তরুণ মন। গানের সুর সেই অরণ্যের দিশারী। সুরে সুরে যেন ফুল ফুটে ওঠে, জোনাকি জ্বলে, মাধুরী ও প্রেম সুরভিত করে সেই ছায়াপথ। শেষ স্তবকের সময়ে পুনর্বার ফিরে আসে কোনো দুখিয়ারী মনের সকরুণ মিনতি—

মেরে প্রীতম্ নিদ্ হুয়ে হ্যায়
সোর মচানা হ্যায় মনা॥

মিলনের প্রথম বাসর। মন জানাজানি হয়েছে সবে। যন্ত্রগুলি বাঁধা হয়েছে, ঝাড়ে বাতি জ্বল্‌ছে, অপেক্ষমান এক আসর। সেখানে সঙ্গীত এখনো সুরু হতে বাকি, সবে যেন সায়াহ্ন। এখনি কেন এই বিরহের গান গাইলো মোতি? এই সময়কে করল ব্যাথাতুর? খুদাবক্স ভেবে পায় না। মোতিকে দেখে দেখে অবাক মানে বারবার। বিস্ময় তার আর ফুরোয় না। কি অপরূপ সুন্দরী মোতি, কি রহস্য থেমে আছে তার অধরে নয়নে অলকে। অথচ বড় গভীর আর শান্ত।

মোতি হাসে একটু। নীরবতার মুহূর্তগুলি আবেগ ও বাসনায় থরথর ক'রে কেঁপে উঠতে চায়, তাতে ভয় পায় মোতি। খুদাবক্সের হাতে হাত রেখে বলে, কিছু বল খুদাবক্স।

—কি বলব মোতি।

—তোমার কথা বল।

—আমার কথা ত' বলেছি মোতি, সবই ত' তুমি জান। আমার জীবনটাই বা কতটুকু বল, আর কি জানাবার আছে। তবে বলবার অনেক ইচ্ছে ছিল মোতি। তোমার আগে কে শুনতে চেয়েছে বল।

উন্মীলিত কমলদলের মত শিশিরের ফোঁটাগুলি গ্রহণ করে মোতি। বলে, আমার কথাও ত' তুমি সব জান খুদাবক্স। সেই কোন ছোটবেলা মা মরে গেল, মানুষ করল

মগ্ন সারেঙ্গীয়া। দিল্লীতে বিশেশ্বর মিশ্র খেয়ালীয়ার বাড়ীতে ছিলাম তাঁর স্ত্রীর আশ্রয়ে। আট বছর বয়সে সেখান থেকে আমাকে এনেছেন চন্দ্রভাণজী। বড় বিধিনিষেধ আর কড়া পাহারায় থেকেছি খুদাবক্স। শাসন আর নজর মানতে শিখেছি।...রাজার নাটে আমরা নাচ্‌নেওয়ালী, কি জীবন বল, কি বা জানতাম।

—কবে জানলে মোতি, কিছু কি জেনেছ?

—হ্যাঁ খুদাবক্স, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে পরে জেনেছি যে আমার জীবনেরও মূল্য আছে।

—নিশ্চয় আছে মোতি। আমার কাছে আছে।

—বড় বে-বফা দুনিয়া খুদাবক্স। মনে ভাবি, ভুল করলাম না ঠিক করলাম, তোমাকে কোন দুঃখের মধ্যে আনলাম কি না কে জানে! আমার কথা বলে কয়ে বিশেশ্বরজী চন্দ্রভাণজীকে অনেক অনুরোধ করলেন। চন্দ্রভাণজী আমাকে ঝাঁসী আনলেন। বাবা-সাহেবের বড় ভাই রঘুনাথ রাও তখন গদীতে ছিলেন। বাবাসাহেবের নাট্যশালার সখ জানো ত? সেই থেকে আমি নাচ গান শিখেছি, খানিকটা পর্দানশীন্ হয়ে বড় হয়েছি। বাইরের দুনিয়ার কাকেই বা চিনি বল? বিধিনিষেধ, কত বাধা, সে তুমি বুঝবে না খুদাবক্স তারপরে জানোই-ত' আমার মা ছিল নাচওয়ালী, এ আমার জন্মগত পেশা, এক সময় মনে হয়, তোমার জীবনের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে তোমাকেই হয়তো কষ্ট দেব—কি করলাম, ভালো কি মন্দ—তা জানেন উপরওয়ালা।

—আমি জানি। ব'লে খুদাবক্স তাকে কাছে টেনে নেয়। মাথাটা হেলিয়ে দেয় কাঁধে। মোতি পরমনির্ভরে মাথা হেলান দেয়। সুরভিত চুলের গন্ধ আসে। চূর্ণ কুন্তলগুলি সযত্নে কপাল থেকে সরিয়ে দেয় খুদাবক্স। অনেক দূরে কোনো রাতচরা পাখী ডেকে ওঠে। জোনাকি মুঠো মুঠো আলো ছড়িয়ে দেয় গাছের তলায়।

পাশাপাশি দু'খানা বুক উত্তাল হয়ে ওঠে। পরস্পরের হৃৎস্পন্দন শোনে দু'জনে। মোতির হাতখানা তুলে ধরে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে খুদাবক্স। এত কোমল, এত পেলব। নিজের হাতের ওপর রেখে দেখে। মোতি বলে,—কি দেখ্‌ছ?

—মানায় না।

—কি?

—দেখ কি বে-মানান্।

মোতি বলে, খুব মানায়। কিচ্ছু জান না তুমি।

দু'জনের ভালবাসা এক সঙ্গে স্পন্দিত হয়। তারাগুলোও যেন তাদের মনের আনন্দ ধরে নিয়ে থরথর কাঁপে। মোতির মুখ তুলে নিয়ে এমন ক'রে দেখে খুদাবক্স যে মোতি লজ্জা পায়। বলে, কি দেখছ? কি এমন জিনিষ?

—বড় আশ্চর্য জিনিষ মোতি, তুমি যদি আরশী নিয়ে দেখো তবু এর নিশানা পাবে না। আমার চোখে দেখতে হবে।

—আমি দেখতে চাই না। তুমিই দেখ।

একটু হাসল খুদাবক্স। তারপর তার চোখের দৃষ্টি গভীর হয়ে নেমে এল। সেই চোখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে জগৎসংসার ভুলে গেল মোতি। গভীরতর কোন দুর্বার আকর্ষণ খুদাবক্সের চোখে। মোতির চিবুকটা তুলে ধরল সে। ঈষৎ আনমিত করল তার নিজের মুখ।

কয়েকটি মুহূর্তের হিসেব হারিয়ে গেল। তারপর খুদাবক্স গভীর গলায় আবৃত্তি করল—অগর ফিরদৌসে বার, রু-মে-জমিন্ অস্ত্—

মনে মনে মোতি বলল—হামীন্ অস্ত্! সে ত' আমারও কথা।

রজনী অতিক্রান্তা হয়ে অবতীর্ণ হলেন তৃতীয় যামে। মোতি বলল, চল রাত আর অল্প বাকি।

—চল।

জলের ধারে কিস্তির কাছে এসে খুদাবক্স বলল, মোতি, খএর যদি হ'য়ে থাকে ত' মাপ কোর—। অন্যায় করিনি ত?

গভীর সপ্রেম চাহনিতে তাকে আশ্বস্ত করল মোতি। বলল—আমার কাছে তোমার কিছু অপরাধ নেই।

কিস্তি ছেড়ে দিল খুদাবক্স।

কামানগুলো যে জ্যান্ত কিছু নয় তা ঘোসের কথা থেকে বুঝতে পারা কঠিন। ভবানীশংকর ঘনগর্জ, কড়ক-বিজ্‌লী, নলদার—কামান নয়, যেন পঞ্চপুত্রের কথা বলছেন ঘোস, এমনই মনে হয় খুদাবক্সের।

—কি চেহারা, কি তেজ, কি লড়াই করবার হিম্মৎ, পেশোয়া-র আমলে কি রকম খেলা দেখিয়েছে কি বলি! কি সব দিন চলে গেল বল ত? বিশাল স্থবিরদেহ কামানটার দিকে চেয়ে ঘোস এমনভাবে আফ্‌শোষ করেন যে অবাক হয় খুদাবক্স। ঘোস ঘনগর্জকে একটু হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, চুপ ক'রে ঘুমো ব্যাটা, হিম্মৎ বঢ়াতে রহো।

—দরকার হবে না কি?

—না না, কি বলছ তুমি। সে-সব দিন একেবারে খতম। এখন শুনি লড়াই হয় কাগজে কলমে। অংরেজ সরকারের সংগে খরীতা, চলে দরবারে দরবারে। দিন-কালের গন্ধটাই বদ্‌লে যাচ্ছে না কি বল! ছিল বটে সে সব দিন।

কেল্লার দক্ষিণবুরুজে দাঁড়িয়ে ও-পাশে ইংরেজ ছাউনী চোখে পড়ে। ঝক্‌ঝক্ করছে বেয়নেট। মার্চ ক'রে ফৌজ ফিরছে ছাউনীতে। গোঁফে মোচড় দিয়ে অনুকম্পার সুরে ঘোস বললেন, লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট রাইট ট্রেনশান! চালাতে থাক্। ওদের আদবকায়দা কিন্তু ভারী চমৎকার! তবে পরেড্ আর পরেড্! আমার পছন্দ হয় না। সকাল, বিকেল, রাত যেন ঘড়ির মতো চলছে।

বুরুজের কিনারে পাথরের প্রাকারে বসেন ঘোস। খুদাবক্সকেও বসতে ইংগিত করেন। বলেন, অংরেজদের বন্দুক, কামান ভারী চমৎকার। আমার কবে থেকে শৌখ্ ছিল দুটো অংরেজী কামান কিনব। ওজনে হাল্কা, ব্যবহারে সুবিধে অথচ ভারী পাল্লাদার। গোয়ালিয়রে আছে কয়েকটা, সেখানেই দেখেছি।

টহল দিয়ে ঘুরিয়ে আনছে দুটো হাতীকে রাস্তা দিয়ে। বাঁকে ক'রে জিলিপী আসছে দেখা গেল। বড় হাতীটার রোজকার বরাদ্দ। অনেকটা উঁচু থেকে সহরটা দেখতেও চমৎকার লাগে। দূরে পাহাড়গুলো দেখা যায়। একেবারে নিরুদ্বিগ্ন ভালো-লাগার আনন্দটা খুব উপভোগ্য মনে হয় খুদাবক্সের। এক মুঠো বাদাম আখ্‌রোট তুলে দেন তার হাতে ঘোস। নিজেও ভাঙেন দু'টো একটা। তারপর বলেন, বেটা, কথা আছে। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

উত্তর নিষ্প্রয়োজন। ঘোস বলেন, তোমার মনে পড়ে সাতবছর আগেকার কথা? যখন তোমার আমার প্রথম মুলাকাৎ হয়েছিল? আমার নিজের বলতে কেউ নেই। তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার মধ্যে সাঁচ্চা ইস্পাত আছে বলে আমি মনে করি। আর এ-ও আমি আমার জিন্দ্‌গী ভরে দেখলাম, একটু ভালবাসা, একটু দেখ্‌-ভালাইএর অভাবে, সেই ইস্পাতে তৈরী হয় কসাই-এর ছুরি। কিছু আমার বল্‌বার নেই, কেন না, তুমি আমার সব চাহিদা ভরে দিয়েছ। ঘোড়া চালাতে, তরোয়াল খেলতে, বন্দুক লড়তে, কামানের তদারক করতে খুব তৈরী হয়ে গিয়েছ তুমি। এখন কয়দিন থেকে কিছু কিছু কথা শুনতে পাচ্ছি। কি, বাবাসাহেবের তওয়ায়েফ্‌ মোতির সঙ্গে তোমার কিছু বুঝ্‌ হয়েছে?

ঘোসের দিকে চেয়ে খুদাবক্স বলে,—আপনি যে নিশানা করেছেন ওস্তাদ্‌, ও একেবারে ঠিক। কিন্তু এতে কোন ইজ্জত ছোট হবার কথা নেই—কারণ আমি তাকে ভালবাসি। এতে কি আমার কোন গুণাহ্‌ হয়েছে? কোন অপরাধ করেছি কি?

ঘোস ব্যথিত নয়নে ঘাড় নাড়েন। বলেন, সচ্চা আস্‌ক্‌, খাঁটি সোনা। তা কারোর ইজ্জৎ ছোট করে না—বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তুমি ত' সব জান না বেটা। জান না কি, মোতি নিজের মালিক নয়। হাঁ বাঁদী নয় বটে, কিন্তু বাবাসাহেব ওকে ছোট থেকে বড় করেছেন, সব শিখিয়েছেন, দরবারে দরবারে যে মামুলী তওয়ায়েফ্‌ থাকে, তাদের চেয়ে মোতিকে অনেক ভালোভাবে রেখেছেন। মোতিকে তুমি কি করবে, সাদী ত' করতে পারবে না!

—কেন নয়? আমি সাদী নিশ্চয় করব। আপনি একথা কখনো ভাববেন না—

—আরে হামারা বাত্‌ ছোড়ো—ব'লে ধমক দেন ঘোস। বলেন—সাদী করবে! তোমার মা কি বলবেন?

—মা মেনে নেবেন। তর্কের খাতিরে কথাটা বলে খুদাবক্স। ব'লেই মনে হয় অসম্ভব কি। উত্তেজনায় আরক্ত মুখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সে।

হতাশার ভঙ্গীতে হাত উল্‌টোন ঘোস। বলেন,—বেশ! মা-ও নয় মেনেই নিলেন। কিন্তু হাওয়ার উপর ইমারত বানিও না বেটা, মোতিকে সাদী করতে দেবেন না বাবাসাহেব। বুঝছ না তুমি? আইন নেই, নিয়ম নেই, রাজা যা বলেন তাই হয়। মোতির ওপর তাঁর নিজের কোন মত্‌লব নেই সত্যি, তবু তুমি তাঁর হাবিলদার, আর দরবারের নটি মোতি—স্বাধীন ইচ্ছেয় নিজেদের মধ্যে মিলমিশ তিনি বরদাস্ত করবেন না।

—আমি পরোয়া করি না। এই দর্পিত উক্তির সময় এমন দেখায় খুদাবক্সকে, যে ঘোস খুব বোঝেন, এই তেজ, এই বে-পরোয়া জিদ্‌, নিজের ভবিষ্যৎ বাতাসের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে হৃদয়ের দাবী মেনে নিয়ে দেওয়ানা হবার সাহস, একমাত্র যৌবনের পক্ষেই সম্ভব। খুদাবক্সের সতেজ সুন্দর চেহারা, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, দেখে দেখে তাঁর নিজেকে বড়ই বুড়ো মনে হয়। কিছু ঈর্ষাও হয়। তারপরই স্নেহ ও বাৎসল্যের সুরে বলেন, খুব হয়েছে। বোস। মস্ত মর্দান্‌ হয়েছ বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বোঝ, বে-পরোয়া কিছু কোর না। অনেক ক'রে নিজের জীবন একটুখানি গড়েছ, এক ঠোক্করে ভেঙে দিও না বেটা। যদি এমনিভাবে চলে তো সম্মান, অর্থ আর নিরাপত্তা, সবই মিলবে তোমার। দেখ, জীবনে কত কিছু বুঝবার আছে, শিখবার আছে—দিন তোমার সামনে। আমি আসল দিনগুলোই পিছে ফেলে এসেছি—যখন ঠোক্কর খেয়ে ফিরেছি পথে পথে।

ঘোসের কণ্ঠের আন্তরিক বেদনা স্পর্শ করে খুদাবক্সকে। বলে,—ওস্তাদ!

ঘোস উঠে দাঁড়াল। বলেন, চল, যাওয়া যাক্, বেলা হয়ে যাচ্ছে! একটা খেয়াল রেখ—তোমাকে আমি ডানহাত করে নিয়েছি, রাজা-ও একটু স্নেহ করেন, শত্রু তোমার অনেক। তুমি কি কর না কর, খবর ঠিক রাখে সবাই, রাজার কানে-ও দুটো একটা কথা গিয়েছে। তাই এতগুলো কথা কইলাম।...জানো কি? যে তোমাকেও যেতে হচ্ছে?

—কোথায়? চকিত হয় খুদাবক্স।

—রাজার সঙ্গে সফরে। একটি ছেলে হ'ল না বলে রাজার বড় দুশ্চিন্তা হয়েছে। ভয় হয়ে গেছে গদীর জন্যে। রাজাদের নসীব জানো ত, একটা ছেলের জন্যে গদী ছুটে যেতে পারে। যাই হোক, রাজা যাবেন তীর্থে—তিন মাসের জন্যে। আমি ত' যাবই। ইচ্ছে ক'রেই তোমার নাম বলেছি। যাতে তোমার ওপর সন্দেহটা তাঁর কমে যায়। আমাকে দুটো একটা কথা বলেছেন, মনে হচ্ছে কিছু সন্দেহ করেন উনি। জানি না। একটু ক্রোধী মানুষ ত। সিঁড়ি ধ'রে নামতে নামতে বলেন, কিস্তি রোজ চালায় কে? তুমি, না ও?—ব'লেই বলেন, ঝগড়া করতে পাবে না। হেসে ফেলেন একটু। খুদাবক্স আশ্বস্ত হয়। নেমে এসে ঘোসকে সেলাম জানিয়ে প্রায় লাফিয়ে নেমে গিয়ে ঘোড়ায় ওঠে। মুরেঠা নাচিয়ে আবার সেলাম জানায়। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

তাকিয়ে থাকেন ঘোস। বুড়ো ঈশ্বরদাস হিসাব মিটিয়ে খাতা বগলে নিয়ে ছাতা খুলতে খুলতে বলে, আমার আপনার মতন বুড়ো চোখে ছোকরাকে দেখলে বড় খুশী আসে, না খাঁ সাহেব? কি দেমাক, আর কি ঠাট!

ঘোস সম্মতি জানান। কিন্তু মানতে পারেন না। এতদিন আরাম আর খুশীই হচ্ছিল, ইদানীং একটু দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। রাজার কথাবার্তা মনে পড়ে। খুদাবক্সের জন্যে দুশ্চিন্তা হয়। রাগ হয় মোতির ওপর। ঘোড়ায় চড়তে চড়তে, ঘোড়াকেই বলেন, যেখানেই মুস্কিল, সেখানেই কিছু ঘাঘ্‌রী ওড়নীর কারবার আছে। না কি রে বাহাদুর, বল্?

কানখাড়া ক'রে একটু শোনে ঘোড়া। তারপর চালকের নির্দেশে চলতে থাকে দুল্‌কি চালে। ঘোস আখ্‌রোট খেতে খেতে পথ চলেন। ব্রিটিশ অফিসার খোদ এলিস সাহেব যে প্রাসাদের দিকে চলতে চলতে তাঁকে স্বীকারের নজিরে একটু মাথা নোয়ালেন—তা খেয়ালই হ'ল না তাঁর। একটু বিস্মিত হলেন এলিস। তারপর হতাশভঙ্গীতে তিনিও মাথা নাড়লেন। বড় মুস্কিল এদের আদব-কায়দা বোঝা।

নয়

শয়নকক্ষে সারি সারি রাজার পিতৃপুরুষের পুরানো ঢঙের তৈলচিত্র। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রাজার বক্তব্যটা যেন আরো জরুরী হয়ে ওঠে। সুদৃশ্য শ্বেতপাথরের শঙ্খ চাপা দেওয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা টেবিলে পড়ে আছে। রানী মাথা নীচু ক'রে স্বামীর কথাই শুধু শোনেন। রাজা বলেন,—একটি পুত্র আমাদের প্রয়োজন। কি দুশ্চিন্তা আমাকে অহর্নিশ অনুসরণ করছে, তোমাকে কি বলব। তীর্থে যাব স্থির করেছি, তার আগে তোমার ও আমার কোষ্ঠিপত্র পুনর্বার বিচার করিয়ে এনেছি কাশী থেকে। তোমার কোষ্ঠির বিচারে এক কথা বলে—তুমি নেবালকর বংশের যশের কারণ হবে। আমি ত' বিচারে ভুল করিনি। যে যা চায় আমি দু'হাত ভরে দিই, আর ভাবি নিশ্চয় প্রসন্ন হবেন

শঙ্কর। নইলে—। নইলে কি হবে ভাবতে গিয়ে দু'জনেরই চোখ পড়ে খোলা মানচিত্রখানার ওপর।

বাইরে পর্দা দুলে ওঠে। দাসী জানায় এলিসের আগমন বার্তা। রাজা বেরিয়ে যান। রানী জানালা দিয়ে তাকান বাইরে। অঙ্গনে তাঁরই বয়সী তাঁর দাসীরা হাসাহাসি ক'রে জল নিয়ে চলেছে পিতলের ঘড়া মাথায়। কেমন নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবন। কত হাসবার অবসর। বারান্দা-ঘেরা ঘর। আলো বেশী আসে না। নরম গালিচায় পায়চারি ক'রে দেয়ালের দিকে ফিরে আসেন রানী। বিলম্বিত ছবিগুলোর বড় বড় চোখে স্থির দৃষ্টি। সকলের মধ্যে স্বামীর কথারই পুনরাবৃত্তি যেন ঝঙ্কৃত হয়--পুত্র চাই, বংশধর চাই, উত্তরাধিকারী চাই!

মনে মনে মহাদেবকে প্রণাম করেন রানী। এত ব্রত, পূজা, উপবাস, তার সুফল নিশ্চয় মিলবে। প্রসন্ন হবেন মহাদেব। নইলে তাঁর জীবনটার মানেই তো হারিয়ে যাবে।

আসন্ন যাত্রার প্রাক্কালে মহাসমারোহে জলসা বসেছে। নাট্যশালা দীপমালা সজ্জিত। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে লাল গালিচা। দুই পাশে অবিচল মুখে দাঁড়িয়ে আছে ভালাদার, রুপোর ভালা হাতে। তাঞ্জামে একে একে এসে নামছেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। রাজপুরুষ, ইংরেজ অফিসার, বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত অরছা ও দতিয়ার রাজা। প্রত্যেকের সম্মান রক্ষা ক'রে ভেতরে নিয়ে আসছেন রাজার কর্মচারীবৃন্দ। গালিচা-ঢাকা ঘরে কুর্শী পড়েছে সারি সারি। হাজারখানা মোমবাতির ঝাড় দুলছে মাথার ওপর। পান, এলাচি ও আতর ফিরছে হাতে হাতে। দরজায় দরজায় পত্রপুষ্পের মালা।

রাজার অশ্বারোহী ও গোলন্দাজদলের বাছাই-করা লোকরা দরজায় দরজায় সুসজ্জিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেরিয়ে যাবার দরজার মুখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুদাবক্স। মনটা তার ভাল নেই।

সে জানে দর্শকরা মোহর নিয়ে ব'সে আছেন। নাচ শেষ হ'তে মোহর ছুঁড়ে দেবেন তাঁরা। মোতির পেশার সে-ও একটা অঙ্গ। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ-সই নয়। তা ছাড়া তার বা মোতির, এই জমায়েতের কাছে বেতনভোগী নাচওয়ালী বা হাবিলদার ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই, সেই রূঢ় সত্যটা এই কায়দাদুরস্ত মজ্‌লিসে ব'সে যেমন মালুম হচ্ছে এমন আর কিছুতে হয় না। গঙ্গাধর রাও কলারসিক মানুষ। কিন্তু এই জলসা একান্ত ভাবেই তওয়ায়েফ্‌ কায়দায় হবে।

একটু গরম লাগছিল খুদাবক্সের। সন্ধ্যার দিকে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সিদ্ধিমালাই খেয়েছে। খেলে নেশা হবে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই সাগর জিভ কেটে লম্বা লম্বা ফিরস্তি দিয়েছিল উর্দুতে। তবু বে-চায়ন্‌ বোধ হচ্ছে একটু, অস্বীকার করা যায় না। ঘোস বাধ্য হয়ে বসেছেন চতুর্থ সারিতে, কিন্তু খুদাবক্সের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাতে ভুলছেন না। বাহ্‌রাম খাঁ ঢুকে ঘোসের কানে কি বলে খুদাবক্সের পাশে এসে দাঁড়াল। বোধ হ'ল ঘোস নিশ্চিন্ত হলেন।

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। সহসা একসঙ্গে সারেঙ্গী ও তবলা বেজে উঠল, আর জাফরান ঘাঘরায় তুফান তুলে প্রবেশ করল মোতি। দর্শকরা যেন একবার নিশ্বাস ভেতরে টানলেন। রঙ, রেশম, জরি, গহনা আর বেণীতে ঘূর্ণী হাওয়ার মত কয়েকটা পাক মেরে আসরের চার-

পাশে ঘুরে নতি জানিয়ে জরির একটা বৃত্ত রচনা করে ঘাঘ্‌রা ছড়িয়ে দিয়ে মাঝখানে বসল মোতি। মাথায় মুক্তার সিঁথিমোর, দীর্ঘ বেণীর প্রান্তে সোনার ঝিঁজর, চোলির নীচে গৌর দেহের একটু অনাবৃত অংশ। বুক থেকে গলা অবধি গহনায় ঢাকা, আঙুলে, মনিবন্ধে, সর্বত্র মোতি চুনী ও পান্নার ঝিলিক, ঘাঘরার ঘের শেষ হয়েছে গোড়ালির ওপরে, গোড়ালি অবধি চেপা ঘনসবুজ পেশোয়াজ, হাল্কা জরির ওড়না আজ আর আবরণ নয়, আভরণ। সেই সরল, শান্ত, লজ্জাবনতমুখী, একান্ত ভাবে খুদাবক্সের ওপর নির্ভরশীলা প্রেমিকাকে কোথাও খুঁজে পেল না খুদাবক্স। এই লীলাচপলার গতিতে বিভ্রম, চাহনি ম্যালস ও উদ্‌ভ্রান্ত, এ যেন মোতি নয়, যেন কাঁচের পানপাত্রে টলমল করছে তরল সুরা।

সুর্মাটানা চোখে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিল মোতি। সকলেই যেন তাকে তারিফ করছে চোখে চোখে। মৃদু শিহরণে মুখ নামাল মোতি, তারপর ধরল ঠুম্‌রী—'কাঁহা শুনি ব্রজক বাঁশুরী—'।

এমন মিঠে ঝঙ্কার উঠল যে মনে হ'ল গলায় নয়, কোনো স্পর্শকাতর তারের বাজনায় ঝঙ্কার লেগেছে। মুখে মুখে তারিফ উঠল ঘর গম্‌গম্‌ করে।

গানের সঙ্গে সঙ্গে ভাঁও বাতায় মোতি। মুখে ভাববিলাস না খেললে ভূমিকা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। কখনো চোখের পাতা মৃদুকম্পনে শরম টানে, কখনো ভ্রূ ধনুকের মতো টেনে হয় বিজয়িনী, আবার ওড়না একটু ঢেকে, একটু খুলে নায়িকাসুলভ লীলা দেখিয়ে মোতি গান শেষ করে।

রাজার অনুসরণে মোহর পড়ে লাল সালুর ওপর।

কুড়িয়ে এবার নিতেই হবে। এমন পরীক্ষায় কখনো পড়েনি মোতি। আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে অবমানিতা মোতি আশ্বাস খুঁজে ফেরে চোখে চোখে। এক পলকে অনুভব করে রাজার তীক্ষ্ম দৃষ্টি, তার দিকে শিকারীর মতো চেয়ে কি যেন খুঁজছে। নীচু হ'য়ে তুলে নেয় মোতি আর দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়। বিভ্রান্তিতে ওড়না একটু নি-লাজ করে মোতিকে, হাতে মোহরগুলো কেমন যেন বেঁধে, ওদিকে সারেঙ্গীয়া তার নাচের সুর বাজিয়ে তুলেছে, এবার ধামারের লহরায় নাচ্‌বে মোতি। হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘরের শেষপ্রান্তে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে খুদাবক্স। চোখ নামিয়ে নিল মোতি। সাবধান হয়ে থাকবার প্রয়োজন তাকে ভালো করেই সকালে বুঝিয়েছেন চন্দ্রভাণজী। এতটুকু সন্দেহ যাতে কারো মনে না আসে, তাই দ্রুত প্রণতি সেরে একেবারেই নাচতে সুরু করল মোতি। পায়ের তালে তালে, ঘাঘ্‌রা পেশোয়াজের দোলে, রঙিলা তানের ছোট ছোট ফুলঝুরিতে মনমাতানো পরিবেশ রচনা হ'য়ে গেল। অরছার বিজয়বাহাদুর বে-তালা তারিফ দিতে সুরু করলেন। ভ্রূভঙ্গে অসন্তোষ দমন করলেন গঙ্গাধর রাও। হাজার হলেও অতিথি। শুধু নাচগানের নাটক নয়, ভেতর ভেতর আর একটা নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি অনিবার্যভাবে স্থানকালের পরোয়া না ক'রে ঘনিয়ে আসছে, তা তিনি তখনো বোঝেননি। সিদ্ধির নেশা তখন মগজে উঠেছে খুদাবক্সের। আসরে যে নাচ্‌ছে তার পায়ের তাল, বোল, মনের তুফান সবটা শুধু সে-ই বুঝছে। বুঝছে বলেই কেমন যেন অসহ্য লাগছে।

নাচ শেষ হতেই আবার মোহর পড়ল আসরে। নাচের নেশায় মোতিও একটু মাতাল। রাজার ঠিক সোজা নজরের সামনে দাঁড়িয়ে কোন বে-চাল সে করতে পারে না। বিশেষত গুপ্তচরের মুখে খবর শুনে যখন রাজা চ'টে আছেন। আভূমি প্রণত হয়ে তস্‌লিম জানিয়ে

মোতি উঠে দাঁড়াল। পরিশ্রমে আরক্ত মুখ, চূর্ণ কুন্তল, কপালে ঘাম, তার দিকে চেয়ে কি মন্তব্য ক'রে উঠে দাঁড়ালেন ইংরেজ অফিসার, ছুঁড়ে দিলেন একটা মুখবাঁধা লাল থলি। হঠাৎ সমস্ত কথাবার্তার ভেতর দিয়ে তার কানে এসে বাজল—মোতি ছুঁ না মৎ! মোতি ছুঁয়োনা।

অবিশ্বাস্য এই ঔদ্ধত্য। একটি নিশ্চল মুহূর্ত, তারপরেই আবার শোনা গেল—কেন নিলে মোতি?

খুব নীচু গলা। তবু চারিপাশ নীরব বলেই শোনা গেল। দুইচোখ ভরে অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে গেল মোতির। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কার ভরসা চাইল। তারপরই রাজাসাহেবের ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু চীৎকার শোনা গেল—বন্ধ করো!

কোলাহল উঠল নানা গলায়। তারই মধ্যে ছুটে এলেন ঘোস। প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে বাহ্‌রাম খাঁর সঙ্গে খুদাবক্সকে দরজা দিয়ে ঠেলে বের করে দিলেন। বল্‌লেন—স্বরূপদাস মেওয়াওয়ালা, মানিকচৌক! তারপরই চলে এলেন ভেতরে।

হতবুদ্ধি খুদাবক্সকে টেনে নিয়ে বাহ্‌রাম ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। গলির কিনারে একটা পানের দোকান। তার পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে বের করে আনলো একটা ফলের দোকানের সামনে। মুখে বসন্তের দাগ, কালোরঙ একজন আধাবুড়ো লোক বাহ্‌রামকে দেখেই নেমে এল। পাশের দরজা খুলে তাদের ঢুকিয়ে নিল। খুব দ্রুত কি যেন বল্‌ল তাকে বাহ্‌রাম খাঁ। লোকটা তাড়াতাড়ি মেঝেতে ময়লা মাদুরের ওপর সতরঞ্চের পাশা বিছিয়ে দিল। পাশে রাখ্‌ল দুটো গেলাস, একভাঁড় সিদ্ধি। বাহ্‌রাম খুদাবক্সকে বল্‌ল—শোন ভাই, খাঁ সাহেবের হুকুম, আর তোমার জান বাঁচানোর জন্যেও বটে, এখনি হয়ত', খুদা না করেন, তোমার খোঁজে ফৌজ আসবে। তুমি আজ যা করেছ, তাতে গর্দান্ চলে যেতো যদি কোন কোন দরবারের মত এখানেও পোষা গুন্ডার চল্ থাকতো। অরছা দতিয়ার রাজা, আর অংরেজ অফিসারদের সামনে তুমি বে-ইজ্জতী করেছ রাজাকে। খেয়াল হয়, রাজা ধরতে পারেননি, কিন্তু তোমার ওপর সন্দেহ তো তাঁর চট্ করেই আসবে। এ-ও খেয়াল হয় খবর নিতে এখনি লোক আসবে—

নেশার ঘোর আর চমক তখন অনেকটা কেটেছে। খুদাবক্সকে বাহ্‌রাম আবার বলল, —কোন কথার জবাব দেবে না তুমি, দেখাবে যে নেশায় একেবারে চুর হয়ে আছ। ভাই স্বরূপদাস—আজ সন্ধ্যে থেকে, এই খাঁ সাহেব, তুমি আর আমি এখানে দাবা খেলছিলাম—কোথাও যাইনি।

মোমবাতি-বসানো লণ্ঠনটা টুলে বসিয়ে কাছে টেনে আনল স্বরূপদাস। খুদাবক্সের পাগড়িটা খুলে পাশে ফেলে দিল। গলার বোতামগুলো খুলে দিল, নাগরা টেনে রাখল পাশে, তারপর হাতে ধরিয়ে দিল সিদ্ধির গেলাস।

বাইরে পাথরের রাস্তায় খটাস্ খটাস্ করে চার পাঁচ জোড়া নাল বসানো জুতোর শব্দ হলো। পরুষকণ্ঠে কে দরজা খুলতে বলল।

দাবায় দান ফেলে জড়ানো গলায় বিশ্রী গালি দিয়ে উঠল বাহ্‌রাম। খুদাবক্স তার জামা চেপে ধরল। জড়িতকণ্ঠে বলল,—এই গালি দে না মৎ। কেয়া তুম বড়ে রাহীস্ আদ্‌মী হো?

দড়াম্ ক'রে দরজাটা খুলে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন রিসালদার রঘুনাথ সিং। জিজ্ঞাসা করলেন,—কতক্ষণ হল এসেছে খাঁ সাহেবরা?

—সন্ধ্যে থেকে বড় গোল লাগিয়েছে কুঁয়ার সাহেব, দু'ঘণ্টার ওপর হল্লা করছে,—বলছি হুজুর আমার একটা ছাড়া ঘর নেই।

হাতের একটা ঝাপ্‌টা-মারা ভঙ্গীতে তাকে নাকচ ক'রে দিয়ে রঘুনাথ বললেন, —বাহ্‌রাম, খুদাবক্স এখানে ছিল? ইস্‌মে কোঈ ফন্দাবাজী ঔর ফিকর নেই হ্যায়!

—কিছু না হুজুর—ছুটি মিলেছিল তাই একটু ফূর্তি করতে বসেছি। বিশ্বাস না করুন ত'—

রঘুনাথ সিং বললেন,—আমি বিশ্বাস করব কিনা সেটা বড় কথা নয়—আজ যা হয়ে গেছে, তেমন কখনো হয়েছে কিনা জানি না। খুদাবক্সের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। একটা তীব্র অস্বস্তির অনুভূতি—অনেককাল পরেও মনে পড়ত খুদাবক্সের—যেন তার মনের তলা পর্যন্ত খুলে খুলে দেখছেন কুমারসাহেব।

তাঁরা চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে খুদাবক্স, স্বরূপদাস ও বাহ্‌রাম! নিজের আচরণের গুরুদায়িত্বটা বোঝে কিনা খুদাবক্স কে বলবে। তুফান একটা উঠিয়েছে সে। ঝাপ্‌টাটা মোতির ওপর দিয়ে কতখানি যাবে সে-ই হয় তার ভাবনা। তারপর স্বরূপদাসের হাতটা চেপে ধরল। বলল,—বাঁচিয়ে দিয়েছ ভাই।

ঈষৎ গম্ভীর সুরে বাহ্‌রাম বল্‌ল,—আজকের রাত কেটে যাক্‌, তারপর তুমি ধন্যবাদ জানিও। এখনো সময় হয়নি।

পরে যখনই খুদাবক্স সেই রাতের কথা স্মরণ করেছে, তার মনে পড়েছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, ফৌজের হল্লা, মশালের আলো দপ্‌দপ্‌ ক'রে নাচিয়ে চারজন সিপাহীর ক্রমাগত টহল। সেই রাতে, অসহায় ক্রীড়নকের মতো তার নিজস্ব অনুভূতি আর আবেগ শুধু চরকিবাজী খেয়েছিল। কেননা ঘটনা তাকে আর মোতিকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তার প্রমত্ত উক্তিতে ইজ্জতে ঘা লেগেছিল সামন্ততন্ত্রের। ক্ষেপে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সিংহের প্রতিভূ। মনে পড়েছে সেই রাতে বাহ্‌রাম ও স্বরূপদাসের মুখে লণ্ঠনের লাল আলোয় চরম বিশ্বস্ততার দৃঢ় মনোভাব ফুটে উঠেছে। আরো মনে পড়েছে, রাত যখন দু'টো বাজল, তখন ক্লান্ত চরণে রাজপ্রাসাদ থেকে সেই ঘরে এলেন ঘোস। তাঁকে দেখে মনে হল, অনেক সংগ্রামের ক্লান্তি তিনি বয়ে এনেছেন। তাকে ডাকলেন ঘোস, বললেন, তোমার জন্যে আমি রাজার সঙ্গে তর্ক করলাম খুদাবক্স, কথা আদায় করলাম যে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। আমার ইজ্জতের কথা আর ভাবলাম না, কেন না, তোমার ভবিষ্যত ব্যবহারের ওপরে আমার ইজ্জতের ভার রইল। কিন্তু এ কি করলে তুমি, আমার একটা মানা-ও শুনলে না?

মনে পড়েছে খুদাবক্সের, মাথার মুরেঠা খুলে নিয়ে খোলা মাথায় ঘোস বসেছিলেন চরম ক্লান্তির ভঙ্গীতে। নিজেকে সেদিন ক্ষমা করতে পারেনি সে।

সেই রাতে যখন খুদাবক্স ঘুমিয়ে পড়ল, ঘোসের চোখে ঘুম এল না। মনে হ'ল রাজাকে তিনি বলেছেন, আজ তুমি মস্ত রাজা হয়েছ, কিন্তু ভুলে যেও না একদিন আমি তোমার সঙ্গী হয়ে বড় ভাই হয়ে, তোমাকে দেখ্‌-ভালাই করেছি। আমি স্বীকার করছি, খুদাবক্সকে আমি স্নেহ করি। তাই বলছি, সে বালক, তাকে তুমি ক্ষমা করো। আমার ইচ্ছে আমি জানালাম মাত্র। যা তোমার বিচার তাই করো তুমি—

রাজা মেনেছেন তাঁর অনুরোধ।

কিন্তু কি ক'রে তিনি খুদাবক্সের হয়ে কথা দিয়ে এলেন? সে কি তার কথা মানবে? জোয়ানীর ধর্মই নয় কি বিশ্বাসঘাতকতা করা? তাঁর কথা ত' সে মানবে না।

আঘাত লেগেছে তাঁর-ও। তিনি-ও হৃদয়ঙ্গম করেছেন, এই পাঠানযুবককে তিনি কতখানি ভালবেসেছেন। বুঝে মনে হচ্ছে এই ভালবাসা তাঁকে নীতিচ্যুত করবে। আরো মনে হচ্ছে সেই নাচওয়ালীর কথা। তার প্রেম শুধু সর্বনাশ আনবে, তবু খুদাবক্স তাকে পরিহার করবে না, সেই সামান্য রমণীর নয়নের ইঙ্গিত মাত্রে তাঁর সমস্ত শুভেচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি পদদলিত করে চলে যাবে।

নাচওয়ালী মোতি। ভালবাসার ফাঁদ পরিয়ে সে বন্দী করতে পারে প্রেমিককে, তার প্রেম শুধু দুঃখ আনবে জেনেও সে মুঠো আলগা করতে হয় তো জানে না। জানে না যে ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়। জানে না যে সেই হল প্রকৃত প্রেম।

জানে না যখন, তিনিই জানাবেন। প্রয়োজন হলে যেমন গুলী ক'রে মেরে ফেলা হয় আহত ঘোড়াকে, নির্মম অস্ত্রোপচার চলে সৈনিকের ক্ষত-বিক্ষত দেহে, তেমনই প্রয়োজন অনুভব করছেন ঘোস। একটা ঘা তাকে দিতে হবে। যোদ্ধার মতো সুকৌশলে, অথচ আঘাত হবে মর্মান্তিক। নইলে খুদাবক্সকে বাঁচানো যাবে না। তার বাপদাদার মতো সেও কিসমতের হাতের পুতুলার মতো, খড়কুটো হয়ে নাকচ হয়ে যাবে। জীবনটার দিশা থাকবে না।

প্রৌঢ় যোদ্ধা ঘোস, রণনীতিতে সুনিপুণ তিনি। কিন্তু এক বাঁধন কাটবার জন্যে যে কৌশল করছেন, তার উৎসস্থলে কোন্ অনুভূতি কাজ করছে তা কি তিনি বুঝেছিলেন? বুঝেছিলেন কি, একজনের হাত থেকে নিয়ে আসতে চায় খুদাবক্সকে তাঁর যে সত্তা, সেও সমান লোভী, অধিকারলোলুপ এবং অন্ধ? নিজের অনুভূতির স্বরূপ অবচেতনে রইল, এই বোধ হয় ভাল। সেই ঘোসকে দেখবার দূরদৃষ্টি তাঁর সে রাতে ছিল না, থাকলে তিনি শিউরে উঠতেন।

অন্ধ প্রেম যদি মৃত্যুবাহী হয়, অন্ধ বাৎসল্যও সমান মর্মান্তিক।

দশ

অগ্নি, নৈঋত ও ঈশান কোণে মেঘ সঞ্চারিত হয়েছে বলে বোধ হয়েছিল মোতির। কিন্তু সেই মেঘে যে প্রলয় উঠবে সে ধারণা তার ছিল না। তার ধারণা ছিল না যে দুনিয়ার চোখে তার কোন দাম নেই। রাজার রূঢ় পরুষ ভাষণে অনেক সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে মোতির মনে। জেনেছে রাজ্যের পরিধি যাই হোক, সামন্ততন্ত্রের প্রাপ্য সম্মানের উচ্চমান গগনচুম্বী। বিদেশী অফিসারের সামনে অপমানিত হয়েছেন রাজা। তওয়ায়েফের এতখানি স্পর্ধা সহ্য করা সম্ভব নয়। অপরাধীর নাম রাজা জানেন, এবার তাদের ক্ষমা করা হল, কিন্তু ভবিষ্যতে বুঝে চলতে হবে।

ভবিষ্যৎটাই যে হারিয়ে গেল মোতির চোখে। রাতভোর ভেবেছে, সকাল হয়েছে কতক্ষণ, খাটে বসে ভাবছে আর ভাবছে মোতি, ভাবনার কালীদহে কূল পাচ্ছে না তার মন রশি ফেলে ফেলে। এও বুঝছে সে, রাজার নিষেধ মানবার চেয়ে মৃত্যু বরণীয়। কেন না খুদাবক্স ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

মন্নু সারেঙ্গীয়া, বার্ধক্যের রেখাবলীয়িত জরাজীর্ণ হাত মাথায় বুলিয়ে তাকে যথা-

সম্ভব সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে তার মায়ের কথা। বলেছে, মন্থনে গরল উঠবে জেনে-শুনেও গভীর প্রেমভরে প্রেমাস্পদের মুখ চেয়ে ভবিষ্যতের আঁধার দরিয়ায় ঝাঁপ দেবার যে চারিত্রিক আদল, তা নাকি এসেছে রোশানের কাছ থেকে।

সে কথা যাচাই করবার মন মোতির নেই। অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, আছে শুধু বর্তমান, তাও একজনের মুখে। দুনিয়াতে তারও আর কেউ নেই, বিত্ত নেই, পিতা নেই, বন্ধু নেই, শুধু নিজের জোরে এই দুনিয়াতে মাথা তুলে চলবার ফিরবার মতো একখানা আকাশে নিজের মালিকানা কায়েম করবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

সেইখানেই চরম আশ্রয় মোতির। নর্তকী হয়ে নয়, বহুজনের ঈর্ষা ও কামনার লক্ষ্য হয়ে নয়, একজনের একান্ত হয়ে, তার সঙ্গে জীবন বেঁধে, তার পাশে থেকে, তবে তার সার্থকতা মিলবে।

ভেবে ভেবে মনে আগুন জ্বলে যাচ্ছে, আর তাতে পুড়ে পুড়ে মোতির রূপ আরো উজ্জ্বল হয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতির ছায়া দেখে কিরকম লাগল মোতির। আরেকজনের জীবনে সর্বনাশ এনেছে, এতখানি বিপদ মাথার ওপর টেনে নামিয়েছে, তবু রূপ ম্লান হয়নি। চুনী, পান্না, হীরে, মোতি, সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে নিষ্ঠুর দ্যুতিতে। কাল ফেরৎ পাঠাতেও ভুল হয়ে গেছে নাট্যশালার তোষাখানার মালিক মালহরির কাছে।

সহসা চমক ভাঙল। দাসী খবর দিল ঘোস এসেছেন। নীচে তিনি অপেক্ষা করছেন।

ঘোস! খুদাবক্সের কোন খবর এনেছেন তবে! ত্বরিতগতিতে নেমে এল মোতি। পর্দা সরিয়ে ঢুকল ঘরে। ঘোস তাকালেন তার দিকে। তাঁর চোখে অবিশ্বাস, অনুকম্পা আর কঠিন কর্তব্যের সংকল্প। চঞ্চল চরণ থেমে গেল। ভয়ে ভয়ে একপাশে বসল মোতি, ঘোসকে কুরশী দেখাল।

কর্তব্য নিয়ে এসেছিলেন ঘোস, তাই বিলম্ব না ক'রে বলে গেলেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গেল মোতি।

ঘোসের কথাগুলো অমোঘ হয়ে ঘা দিয়ে পড়তে লাগল তার চেতনার ওপর। ছেড়ে দিতে হবে। তার মা আছে ঘরে, সে গরীব ঘরের ছেলে, তার ভবিষ্যৎ আছে, এই তার জীবনের সুরু, যদি ছেড়ে না দাও তুমি, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে, সর্বনাশ হবে, বন্যার মুখে ঘরের মতো, ভিত্তিটাও উপড়ে ভাসিয়ে নেবে দুর্দৈব। আহত আত্মসম্মানে উঠে দাঁড়াল মোতি। কথা তারও আছে। —আপনার মুখে আমি তার কথা শুনব না খাঁ সাহেব, সে আমাকে সব বলেছে।

—কি তোমাকে বলেছে সে? বলেছে কি, যে দশদিন জখম হয়ে পড়েছিল, তাকে মলমতাগিদ করে বাঁচিয়েছি আমি? তুমি তাকে দেখেছ নওজোয়ান, জীবনে একটা দাঁড়া এসে গেছে। তুমি বলছ মোতি—শিশুর মতো সেবা করে বাঁচিয়েছি ওকে, যখন রাতের পর রাত মৌত্ এসে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতো! কাজ দিয়েছি, ইজ্জৎ দিয়েছি, কাজ শিখিয়েছি, আজ তার বাপ নেই, ভাই নেই, ভালোমন্দের কথা আমি ভাবব না? বে-করার হয়ে যাব ইন্সাফের কাছে?

—সে আমাকে ভালোবাসে।

—তুমিও ত' তাকে ভালবাস?

জরুর, ব'লে রানীর মতো দর্পে ঘাড় ঈষৎ বাঁকাল মোতি,—তাই তার ভালোমন্দ, সব দেখব আমি। আমি তার জন্যে সব করব।

—তুমি কি করবে মোতি? কি করতে পারো? কতটুকু তোমার ক্ষমতা?

—ভালবাসতে পারি।

—এ ভালোবাসা দিয়ে তুমি কি করবে? এখান থেকে ওখানে ফিরবে কিছুদিন, তিসরাদিন ও-ই তোমাকে ধিক্কার দেবে। বলবে আমি পুরুষ। শুধু এখানে ওখানে বে-ইজ্জতী জীবন নিয়ে টক্কর খেয়ে ফিরলে আমার চলবে না। শুধু মুহব্বতে কি হবে মোতি, পুরুষ চায় সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা।

ব'সে পড়ল মোতি বিবশা হয়ে। ঘোস অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, তার মা কষ্ট ক'রে দিন চালাচ্ছে, ছেলে একদিন উপযুক্ত হবে তার জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট ধুয়েমুছে দেবে। আজ তুমি ভাবছ একরকম। তিনদিন পরে সে-ই তোমাকে দোষ দেবে। তুমি ত' মেয়ে মোতি, সেদিন কেমন ক'রে সইবে? তাই বলছি সব ভেবে দেখ, তুমি তাকে ছেড়ে দাও।

গত রজনীর দুঃসহ গ্লানির যন্ত্রণা এতক্ষণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু হয়ে ঝরতে লাগল। মোতি বলল,—আপনার এক্তিয়ার আছে তার জীবনের ওপর, আপনি তাকে নিয়ে যান। আমি কে? কতটুকু আমার ক্ষমতা? আমি ত' তাকে ধরে রাখিনি।

বড় অন্যায় করছেন জেনেও বিচলিত হলেন না ঘোস। বললেন,—তোমার জয় পুরা হয়ে গেছে মোতি। আমার একটা কথাও সে মানবে না। তোমাকেই বলতে হবে।

—আমাকেই বলতে হবে? রুদ্ধ অশ্রুর বাঁধ ভেঙে বন্যা নামল। মোতি ফুলে ফুলে উঠল কান্নার আবেগে। বলল,—তওয়ায়েফ্, নাচি, গান গাই, যা খুশী আসে তা-ই বল, তোমরা বিচার কর, আমরা শুনি। কিন্তু আমি ত' মানুষ, আমি তাকে ভালবাসি, তাকে আমি মুখ ফুটে বলব, চলে যাও আমাকে ছেড়ে? এ তুমি কি বলছ খাঁ সাহেব। এ কি কখন হয়েছে? কোন নজীর আছে?

- ভালবাসলেই ছাড়তে হয় বেটি। তোমার প্রেম যদি সত্যি হয়, তবে তার ভালাই-এর জন্যে সদ্‌কা করো তোমার আশ্‌ক। বিলিয়ে দাও তামাম দুনিয়ার দরবারে। সবাই দেখুক আর মানুক, যে হাঁ মোতির প্রেম সাচ্চা ছিল বটে।

—না, না, না! ঈষৎ রক্তাভ শুভ্র আঙুলগুলির ফাঁক দিয়ে অমূল্য মুক্তাবিন্দুর মতো অশ্রু উৎসারিত হয়। মাথা নাড়ে মোতি। কিছুতেই পারবে না সে!

—আজই তার কাজে মন নেই, হুঁস হারিয়ে কত কি করছে, বল তুমি, যাকে ভালবাস, তার ত' ভালই দেখতে চাইবে। না কি দেখতে দেখতে চাইবে দিন থেকে দিন তার খারাপ হচ্ছে, সে নেমে যাচ্ছে। প্রেম ত' শিকলি নয় যে কয়েদ করবে, বেঁধে রাখবে, নীচে টেনে রাখবে—, ছেড়ে দাও, উঠতে দাও, মানুষের মতো হয়ে দাঁড়াতে দাও।

—ওকে চোট্ দেবো কি ক'রে?

—কলিজার চোট মরদকে ঘায়েল করে না, মরদ ভেঙে যায় যদি ইজ্জৎ চোট্ খায়।

মোতি চোখ মুছে ঘোসের দিকে তাকাল। একটু নিরীখ ক'রে বলল,—খাঁ সাহেব, আপনারও কোন মতলব আছে না কি আমি জানি না। জানি না কি নদীর গহীরে আরো কোন চোরা নদী বইছে নাকি অন্য ঠিকানায়। আপনি আমাকে জানেন না খাঁ সাহেব। আমি যদি ভালো বুঝি, ত' ঠিক, আমার ধর্মমতো আমি কাজ করব, চাই তো কলিজা টুকরো হয়ে যাক! কিন্তু জানবেন, তখন যদি দেখি, আপনি আমার সঙ্গে দুইমুখে কথা বলেছেন,

অন্য কোন মতলব আপনার ছিল, তা'হলে কিন্তু ক্ষমা করব না। আপনাকে আমি ছাড়ব না। জবাব আদায় করব। এ কথাও খেয়াল রাখবেন। আপনি এখন চলে যান।

একটু আত্মস্থ হয়ে অভিবাদন জানিয়ে ঘোস বেরিয়ে গেলেন। এসেছিলেন এক-ভাবে, যাবার সময়ে সম্ভ্রম বয়ে নিয়ে গেলেন।

উপরের ঘরে এসে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদ্‌ল মোতি। কাঁদল এই জন্যে, যে ঘোসের কথায় কিছু সত্য ছিল। কাঁদল এই জন্য, যে খুদাবক্সের জন্য নিজে সমস্ত দাবী ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত। তবু কাঁদল, কারণ এই ত্যাগ করতে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে! মাত্র ঊনিশ বছর বয়স তার। এই পরিপূর্ণ যৌবনে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ-সাধ অনাস্বাদিত রেখেই তাকে মরতে হবে তাই ভেবে। খুদাবক্স বেঁচে থাকতে সে মরতে পারবে না। কিন্তু এ-ও ত' মরণেরই দোসর।

দুনিয়ার নাটে কখনো কখনো আশ্চর্য খেলা ঘটে। বহুজনের স্বপ্নপ্রেয়সী যে অপরূপা, ভাগ্যের বিধানে তারই স্বপ্ন ভেঙে যেতে বসেছে এ-ও এক আশ্চর্য খেলা। চিক্, কণ্ঠি, মৌলী, কর্ণিকা ও কঙ্কণ খুলে ফেলল মোতি। নিরাভরণ বক্ষ মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে কাঁদল সে। প্রাচীর থেকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন রামকেলি, মল্লার, তোড়ি, কৌশিক ও মালকোশ।

চিত্রকারের ধ্যানে ও সাধকের স্তবে রাগরাগিণীরা কখনো অশ্রুবর্ষণ করেন সত্য, কিন্তু সে সবই মর্তবাসীর চিত্তে আনন্দবিধায় নিমিত্ত। দেহী মানুষের পার্থিব কারণে ক্রন্দন তাঁদের বোধাতীত। দুঃখের কারণে দুঃখ একান্তভাবেই পার্থিব অনুভূতি। তার স্বাদ রাগরাগিণীগণ জানেন না।

গভীর রজনী। শহর ছাড়িয়ে পশ্চিমদিকের প্রান্তরে এক নির্জন উদ্যান। মোতির নিজের এই বাগান। একদা সখ ক'রে আমগাছের সঙ্গে জুঁইয়ের লতার বিয়ে দিয়েছিল মোতি, বাজনা বাজিয়ে বাজি পুড়িয়ে, ধুমধাম ক'রে। ছলনা ক'রে জুঁইয়ের লতা, পাশের একটি বকুল গাছকে আশ্রয় ক'রে জড়িয়ে উঠল ফুল ফোটবার সময়ে। তার আচরণকে সকৌতুকে তিরস্কার ক'রে মোতি আমগাছের তলায় বেদী বাঁধিয়ে দিয়েছিল। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমের মঞ্জরীর মৌশুমে, এখানে বসে জুহী, শোহ্‌নী ও হীরাকে নিয়ে কত আনন্দ করেছে, ঝুলনা টাঙিয়ে দোলা খেয়েছে, কখনো বনভোজন করেছে অগ্রহায়ণ মাসে। লোধী ছেলেমেয়েরা কাঠ কুড়িয়ে, পাতা কুড়িয়ে দিয়েছে, তাদের কাছ থেকে শাকসব্‌জী কিনেছে, দুধ কিনেছে, দাম দেবার সময় হিসেব মানেনি।

অনেক সুখস্মৃতিজড়িত এই বাগানেই আজ দেখা করবে খুদাবক্স। বিকেলে খুদাবক্সকে খত পাঠিয়েছে সে-ই, জুহীকে দিয়ে সুকৌশলে। তারই নির্দেশে আসছে খুদাবক্স।

অনেক দিন আগে, যখন খুদাবক্সকে জানত না মোতি, তখন এই বাগানেই সখীদের অনুরোধে সে গান গেয়েছিল—'বীতে দুখকে দিন আওয়ে বসাওয়ান্‌ত'—পদটির বক্তব্য ছিল, দুখের দিন বিগত হয়েছে হে সখী, প্রিয়তম আসছেন, তাই বসন্ত উদিত হচ্ছে কাননে। সেদিন বোধ হয় অনাগত ভবিষ্যতের ডালির আনন্দসম্ভার কল্পনা ক'রেই সেই গান এসেছিল তার মনে। আজ এই আখেরী মিলনের দিনে, সেই গানের কথা স্মরণ হচ্ছে আর মনে

হচ্ছে বসন্তকে বিদায় দিতেই সে এসেছে। মাঝখানের দিনগুলোর কি প্রয়োজন ছিল? ন জানে, ন পহ্চানে, ন দিল্ লগাতা, ন প্যার হোতা—পরিচয় না হ'লে ত' চিত্ত বিবশা হ'ত না, ভালবাসত না সে।

শুকনো পাতায় দ্রুত অধীর পদক্ষেপ শোনা গেল। এগিয়ে এল খুদাবক্স—সেই পরিচিত প্রিয়কণ্ঠে শোনা গেল—মোতি!

যদি কোথাও থাকো দীনদুনিয়ার দরদী মালিক, তবে এই সময় পাশে থেকো, আমাকে সাহস দাও, মনে মনে প্রার্থনা করল মোতি।

—মোতি! একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স।

তার ব্যগ্র বাহু থেকে সজল চোখে একটু হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মোতি। বলল,—বোস, কথা আছে।

—বসব, আগে তোমাকে ভালো ক'রে দেখি। ওঃ, কি দিনটাই গেছে মোতি, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না? তোমাকে কি বলেছেন কিছু?

—তোমার কষ্ট হয়নি?

হাত নেড়ে খুদাবক্স তার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিল। বলল,—কষ্ট আবার কি, আর, এখানে ত আমি থাকব না—চলে যাচ্ছি—

—চলে যাচ্ছ?

—তুমিও যাচ্ছ, আমি একা যাচ্ছি না কি? আমরা পালাচ্ছি অনেক দূরে। আগে যাব আমার মা-র কাছে।

সম্মোহিত হয়ে চেয়ে থাকে মোতি। বলে,—তারপর?

—তারপর কি করব, তা ভাবব কেন? যা হয় করব। কেন ভরসা হচ্ছে না? পাঞ্জাখানা দেখ, হাতখানা দেখ—আরে দরকার হ'লে সব কিছু করব—

নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে নিজেই মনের খুশীতে হাসে খুদাবক্স। অসীম আত্মবিশ্বাস তার। হাতে জোর আছে, দুনিয়া পড়ে আছে, যা হয় একটা কিছু করবে সে। পরওয়া ক'রে কি হবে?—কাল কৌন্ দেখা হ্যায়? কালকের চেহারা ভাবছ কেন মোতি? আজকের কথা ভাবো—এই মুহূর্তের কথা ভাবো—এইটেই সত্যি।

বিশুদ্ধ প্রেমের সংকল্প জ্বলজ্বল্ করে খুদাবক্সের মুখে। সেই মুখের দিকে চেয়ে মোতির ভয় হয় বুঝি বা সব সংকল্প তার ভেসে যাবে। সময় আর নেই। তাই সে বলে,—তুমি ভুল করছ খুদাবক্স। আমি তো তোমার সঙ্গে যাব না।

—কি বললে?

—আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

—তবে কি করবে? পরে আসবে কার সঙ্গে, কেমন করেই বা আসবে।

মাথা নাড়ে মোতি। খুদাবক্স ব'সে তার হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে, মোতি হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে,—ভুল বুঝ না খুদাবক্স, না আজ, না কোনদিন, তোমার সঙ্গে আমি যাব না।

চরম বিস্ময়ে চেয়ে থাকে খুদাবক্স। মোতি বলে,—সেই কথা বলতেই তোমাকে খত্ পাঠিয়েছিলাম আমি।

সবিস্ময়ে শোনে খুদাবক্স।

—যা হয়ে গেছে, তার কথা ছেড়ে দাও খুদাবক্স। ও ত' তীরের মতো ছুটে গেছে,

এখন ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

—কি বলছ মোতি?

—বলছি গত ছ' মাসের কথা ভুলে যাও। ভুলে যাও যে আমাকে চিনতে তুমি, জানতে। কেন না, ভুল করেছি আমি, সেই ভুল আর টানব না। আমার সংগে তোমার—

আর কোন সম্বন্ধ নেই এই কথাটা বলতেও যেমন পারে না মোতি, শুনবারও ধৈর্য্য থাকে না খুদাবক্সের। রক্ত ক্ষেপতে থাকে তার। চরম বেইমানী উক্তির উত্তরে সে গম্ভীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—জবান্ সামলে কথা বলো মোতি। এ নাট নয়, আমিও নাটের কদরবান্ আমীর নই।

—কিন্তু আমি ত' সেই নাটেরই তওয়ায়েফ্! আমিও আমাকে ভুলতে পারি না। তোমার সংগে আর দেখাশুনা হবার কোন মানে হয় না—আমার কথা তুমি ভুলে যাও।

—ভুলে যাব! তবে এই দিনের পর দিন কথা, গান, হাসি, এত রকমের জবানবন্দী সব মিথ্যে? তুমি মিথ্যা? তুমি বেইমান?

অমৃতে গরল মিশিয়ে দিয়ে তার জ্বালা আর ফেনা মোতিকে জ্বালিয়ে দেয়—নিজের সর্বনাশ ঘটাবার সংকল্প হয় দৃঢ়তর। মোতি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—আমি বেইমান নই—আমি নাচ্‌নেওয়ালী। এ রকম কারবার হাল্‌ফিল্ করি আমি—আমার ইমান্ সেটাই। তোমার সংগে আমি কোথায় যাব? সেই কুঁড়ে ঘরে? গরীবখানায়? সেখানে আমার কোন্ সুখ? কিসের আশা? চারজন দাসী আমার মদৎ করে, আর আমি যাব তোমার ভাঙা ঘরে ব'সে রুটি বানাতে?

—খবরদার! আমার ঘরের কথা তোমার মুখে এনো না! খুদাবক্স ঠেলে সরিয়ে দেয় তাকে।—মিথ্যা কথা বলেছ, বেইমানী করেছ, আমার সমস্ত দুনিয়াকে জ্বালিয়ে দিয়েছ, এই পর্যন্ত, আর এগিও না!

—এই কথা থাকল তবে! আমি চলে যাই?

—আমি চলে যাচ্ছি, ব'লে খুদাবক্স এগিয়ে এল কাছে। অন্তর্দাহনের জ্বালা গলায় নিয়ে বলল—নাচনেওয়ালী! তওয়ায়েফ্! যাদুগরনী! আমার ভুল হয়েছিল। সোনার শিক্‌লীতে বাঁধা থাক বুলবুল, গোলামী করতে থাকো। এর বদ্‌লা আমি এখনই নিতাম, কিন্তু তোমাকে ত' আমি ছোঁব না।

—খুদাবক্স—

যন্ত্রণার ঝড় উঠেছে আর তারই মুখে ছিট্‌কে পড়ছে কথাগুলো : কেন তবে আগে বললে না মোতি, কেন জানতে দিলে না যে আমি চাঁদ ধরতে গিয়েছিলাম? তোমাকে ত' আমি কোন কথা লুকোইনি। চাষী কিষাণের ছেলে, তামাম দুনিয়ায় কেউ নেই, একটু ভালবাসার ভিখারী ছিলাম সব কথাই ত' বলেছিলাম—তবে কেন এমনি করে আঘাত দিলে?

—আমি চলে যাব—

—তুমি যাও না যাও, আমার চোখ থেকে তুমি হারিয়ে গেছ। এখন আমি কি করব। উপড়ে ত' ফেলে দিতে পারব না, নয় ফেলে দিতাম—

—খুদাবক্স! মোতির অনুনয়-জড়ানো হাত ঠেলে দিল খুদাবক্স। বলল,—ভুল করেছি। মাপ করো।

চলে যেতে যেতে ফিরে এসে আবার বলল—যাব যখন ঠিক করেছি তখন যাবই, একই

সূর্যের তলায় এক জায়গায় তোমার সঙ্গে থাকব না...তাতে তোমার কি ক্ষতি আছে, অন্য কোন সমঝদার জুটে যাবে—আমার মত গাঁওয়ার নয়, গরীব নয়—সেই তোমার ভালো... বাস্ কি বল নাচওয়ালী!

—অনেক বলেছ খুদাবক্স আর বোল না—

—ও, সময় বুঝে গলায় হামদরদীর সুরও আসে! দেরী হয়ে গেছে মোতি, আর নিজেকে ভুলে যাব না—চলে যাব আর তামাম দুনিয়াকে শুনিয়ে যাব—মোতি বেইমান! মোতি মিথ্যাবাদী! জবান্ ইজ্জত আর দিল্ তিনটেই তার জ্বলে খাক্ হয়ে গেছে!

বনপথে চলে যেতে যেতে শেষ কথা বলে গেল খুদাবক্স—হারামী করেছ তুমি! নটি!... অপেক্ষমান ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে। চাবুক কসিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঘোড়া।

সান্ত্বনা এই, যে মোতি সেই দৃশ্য দেখল না। তার আগেই তার চেতনা হারিয়ে গেল।

দুই পাশ আঁধার, আঁধার আরো আসুক, আর ঢেকে দিক খুদাবক্সকে, তাতে বোধ হয় সান্ত্বনা আছে।

নিজের ঘরে না ফিরে, অপেক্ষমান বাহ্‌রামের হাতে খত্ পাঠিয়ে দিয়েছিল খুদাবক্স ঘোসের কাছে। বাহ্‌রাম তার কোন মানা শোনেনি। টাকা আর আস্‌রফি-ভরা একটা থলি তুলে দিয়েছিল তার হাতে। বলেছিল, তোমার প্রাপ্য টাকা থেকে আমি মিটিয়ে নেব।

বিদায়বেলায় এই চরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর হাত চেপে ধরে খুদাবক্স কোন কথা বলতে পারেনি। বলেছিল, মনে রেখ। বাহ্‌রাম অনুনয় করে বলেছিল,—একবার ঘরে চল, ওস্তাদের সঙ্গে দেখা কর। খুদাবক্স মানতে পারেনি। তার দিল ছুটে গেছে এই জায়গা থেকে, এখানে তার ঘর নয়।—ভেব, কোন মুসাফির এসেছিল কিছু হামদরদী প্রাণের সন্ধানে। দুদিন বাদে সে-ই চলে যাচ্ছে। তাতে কারো কোন দুঃখ নেই। একটা চোখ অন্ধ, তবু এক চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিতেই অনেক দূর দেখেছিল বাহ্‌রাম। সান্ত্বনার কথা বলে বন্ধুকে অপমান করেনি। মাঝরাতে ফটক খুলিয়ে দিয়েছিল ঘুষ দিয়ে। খুদাবক্স বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। নির্জন রাস্তায় একা ফিরতে ফিরতে এমন আজব মনে হয়েছিল দুনিয়াদারীটা, কোথাও কোন মিল খুঁজে পায়নি বাহ্‌রাম।

রাশি রাশি আঁধার কেটে উড়ে চলেছিল খুদাবক্স। শহর ফেলে, সীমানা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল জঙ্গলের সীমান্তে বেতোয়ার ধারে। তৃষ্ণার্ত ঘোড়াকে জল খাইয়ে নিয়েছিল, আবার চলেছিল পশ্চিমের পথ ধ'রে।

বন্ধ্যা প্রকৃতি, কঠিন পথ। ঘোড়ার খুরে খুরে বিজ্‌লীর টুকরো খেলছে, নিশাচর শ্বাপদ সভয়ে পথ ছেড়ে দিল। দূরে দূরে গ্রামে, যে যার ঘরে সুষুপ্ত সুখনিদ্রায়। সকলের জন্যেই ঘর আছে শান্তি আছে, ঠিকানা আছে। শুধু তারই কোন দিশা নেই। অন্তরে বহ্নিশিখায় জ্বলে জ্বলে ভাস্বর হয়ে উঠল নিখাদ প্রেম, মনে হল সমস্ত নৈশ-প্রকৃতি তাকে অনুনয় ক'রে বলছে যেয়ো না, যেয়ো না। সমস্ত প্রান্তরের বুক থেকে হা হা ক'রে উঠল তারই অন্তরের হাহাকার।

খত্‌খানা নিয়ে পাথর হয়ে বসে রইলেন ঘোস—'ওস্তাদ্, চলে যাবার আগে আপনার সঙ্গে আখ্‌রী মুলাকাত হ'ল না, এই গলতি মাপ করবেন, কেন না আপনি মহানুভব।

এই বুঝে নেবেন, যে দেখা করা সম্ভব ছিল না। আঁধারে আঁধারে চলে যাচ্ছি, কারণ সকালের আলোতে এই মুখ দেখাতে পারব না। আপনাকে অনেক মুস্কিলে ফেলেছি, তার থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। আফ্‌তাব হয়ে আসমানে শোভা পাবার ভাগ্য আমার হ'ল না যদিও আপনার মত মুরশিদ মিলেছিল, আমি খুশনসীব নই। মুঝে এ্যায়সে ইয়াদ রাখিয়ে জৈসে হম্‌ হ্যায়ঁ য়ো বদ্‌বখ্‌ত তারেঁ কা টুক্‌ড়া জিস্‌কো আস্‌মান ভি কয়েদ্‌ রাখ্‌ সেক্‌তা নহী'—এই শ্যের একদিন আপনিই শুনিয়েছিলেন, আজ তাতেই মনের কথা জানিয়ে গেলাম। আপনি হয়ত' দুঃখিত হবেন, কিন্তু নসীব যাকে ঘর লিখে দেয়নি, তাকে আপনি বাঁধ্‌বেন কি দিয়ে? পথই আমার ভাল।

খুদা আপনার ভালো করবেন। বাহ্‌রামকে আমার টাকাগুলো দিয়ে দেবেন, যাবার সময়ে সে আমাকে অনেক সাহায্য করল। এই রকম সাঁচ্চা দোস্তি কমই মেলে, আমি নিশ্চয়ই যোগ্য ছিলাম না। তবু কৃতজ্ঞ থাকলাম।

আমার জিনিষ বলতে কিছু নেই। চান ত' কোন কাঙালীকে খয়রাত্‌ ক'রে দেবেন—। আমার ঘোড়া তুফানী বড় আদরে পালন করেছিলাম, ওকে আপনিই রাখবেন। আপনার বাহাদুরকে নিয়ে আমি যাচ্ছি, পথ থেকেই পাঠিয়ে দেব লোকের সঙ্গে—চিন্তা করবেন না। —খুদাবক্স।

বাহ্‌রাম আর ঘোস দু'জনই চুপ ক'রে রইলেন। ঘোস চিঠিখানা নিয়ে পকেটে রাখলেন। তাঁকে আর একজায়গায় পৌঁছতে হবে এই খত্‌। পরাজিত হয়েছেন নিশ্চয়, কিন্তু লাঞ্ছনা পুরো হয়নি। আর একজনের কাছে হার স্বীকার না করলে হবে না।

যোদ্ধা যদি আসল হয়, তো হার স্বীকার করবার সাহস থাকা চাই। এই সময় ঘোসের বড় সাহসের প্রয়োজন হল।

নতুন হাবিলদার খুদাবক্স খাঁ অজ্ঞাত কোন কারণে কাল রাতে শহর ছেড়ে চলে গেছেন, এই খবর বাতাসের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে শহরে। মোতির ঘরেও সে খবর পৌঁছে গিয়েছিল।

ঘোসের আগমন প্রতীক্ষাতেই অপেক্ষা করছিল মোতি। নিশাজাগরণ ও রোদনে চোখ মুখ লাল, চুল বিস্রস্ত, বসন ধূলিধূসরিত, পড়ে গিয়ে চোট লেগেছিল, কপালে একটু কাটা দাগ। দরজার দুই পাশে হাত রেখে মোতি দাঁড়িয়েছিল। মনের আগুনে চোখ তার জ্বলছিল। সেই চোখের দিকে তাকাতে পারলেন না ঘোস। চোখ নামিয়ে নিলেন। তখন মোতি বলল, খুদাবক্স কোথায়—

নীরবে খত্‌ তুলে দিলেন তার হাতে ঘোস। তর্জনী নির্দেশে ঘোসকে দেখিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল মোতি। কান্নার চেয়েও ভয়ঙ্কর ও করুণ সেই হাসি। এক মুহূর্তেই চোখে নামলো জল। তীব্র কণ্ঠে সে বলল,—আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিলে, ধরে রাখবে বলে, ধরে রাখতে পারলে? নিজেও রাখতে পারলে না আমাকেও দিলে না এ তুমি কি করলে?

পর্দায় পর্দায় উঠতে লাগল তার কণ্ঠ,—আমি তার জন্যে সব ছাড়তাম, ঘর বাঁধতাম, তাকে বাঁধতাম, সে আমাকে নিতে চাইল, তোমার কথা মেনে আমি গেলাম না। সে বলল আমি নটি, তুমি বললে আমি নটি, আমার মন দেখলে না, প্রাণ দেখলে না, সব পরিচয় ভেসে গেল, আমি হলাম নটি—আর তোমরা হ'লে খাঁটি মানুষ! তাই যদি হয়, তবে কেন সে চলে গেল। নিজের জিদ আর নিজের অন্ধ মনকে ভেট দিলে ওস্তাদ্‌, দু'জনের জান্‌ নষ্ট ক'রে দিলে? তাকে তাড়িয়ে দিলে?

বেরিয়ে গেলেন ঘোস। নিজের কাছ থেকেই নিজে তিনি পালাতে চাইলেন। শোকাতুর তীব্র কণ্ঠ ভেঙে পড়তে লাগল তাঁর কানে—আমি নটি! আমি ভালবাসতে জানি না! আমি বেইমান!

এগারো

শ্রান্ত দেহ, ক্ষতবিক্ষত পা, পথ চলতে লাগল খুদাবক্স। দিনের পর দিন সে পথ চলে। শরতের প্রসন্ন রজনী। কখনো রাতেও পথ চলে। গ্রামে গ্রামে বিশ্রাম করে। কখনো আহার মেলে, কখনো মেলে না। পথচারী বা গ্রামবাসীর চোখে সহানুভূতি তার কাছে অসহ্য বোধ হয়। কোন কোমল হৃদয় রমণী কুয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে তাকে জল ঢেলে দেয় হাতে। আঁজলা ভ'রে জল খায় খুদাবক্স। প্রতিদানে ধন্যবাদের কথা কইতেও ভুল হয়ে যায়। কখনো বিশ্রাম করে গাছের ছায়ায়। জল আহরণ নিরত তরুণীর দল এই সুপুরুষ পাঠানকে দেখে চোখে চোখে ইসারা করে, সে ইঙ্গিত জ্বলে যায়, তার মাধুরী মিছে হয়ে যায় খুদাবক্সের অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে। চরণ কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মন কিন্তু থামতে চায় না। কোন সর্বনাশা বন্যার পথ মুক্ত করেছে মোতি, তার স্রোত তাকে তাগিদ দিচ্ছে নিরন্তর, ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

বৃদ্ধা পৃথিবী সুনিপুণা কিষাণীর মতো তার কাজ ক'রে চলে। নদীতে জল ভরে দেয়, ক্ষেতে ক্ষেতে আশ্বাসের রঙ লাগিয়ে দেয় গমের শীষে, পাখীগুলোকে লাগিয়ে দেয় ঘর বাঁধবার কাজে, অভিজ্ঞ চোখে সন্ধান ক'রে ঠিক করে জল বাতাস আর রোদ কোথায় কতটা দরকার। এই শরতে ফসল তোলবার সময়, তাই প্রয়োজন হয় তার দিবারাত্রি প্রহরার।

দূরে পাকা ফসলের তরঙ্গে মাথা তুলে ঘোড়ার পিঠে খবরদারী করে কিষাণ, মেয়েরা আল ধরে মাথায় খাবার নিয়ে পেঁৗছতে চলে। এই দৃশ্যের সঙ্গে সে আশৈশব পরিচিত। দেখে দেখে তার মনে ঘরের জন্য তৃষ্ণা জাগে। অন্ধ একটা অনুভূতি, দুর্নিবার সেই আকর্ষণ। তার নদী, তার ক্ষেত, তার মাটি তাকে ডাক দিচ্ছে। তবে যে তাগিদ তাকে দিবারাত্র ক্ষেপিয়ে নিয়ে চলেছিল, সেটা তার মায়ের ডাক? দেশ, ঘর, গ্রাম, সেই কুয়োর জল টানবার চাকির ক্যাঁ কোঁ শব্দে করুণ দুপুর, কানা কুকুরটার কান্নায় ঘুম ভাঙা শরতের রাত, গমের গন্ধে মন্থর হেমন্ত বিকেল, এই সমস্ত পরিচিত স্মৃতিগুলো রূপ নেয় তার মা'র মধ্যে। এই হাজারখানা চেনা ছবির চিঠি রোজ স্বপ্নে পাঠাচ্ছে তাকে মা। মা ত' লিখতে জানে না। অজান্তে কখন চোখে জল নেমেছে খুদাবক্স খেয়াল করতে পারেনি।

সামনেই কুয়োতলা। আঁজলা পেতে ধরে খুদাবক্স আর জল দেয় একটি বালিকা। কালো রঙ, নাকে গহনা, সরল চাহনি। সন্ধ্যা নামে। দূর থেকে কার কণ্ঠে ডাক আসে—মোতি! মোতি-রে!

—আঈ আম্মা!

সাড়া দেয় মেয়েটি। খুদাবক্স কুয়োর গায়ে একটু হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। গভীর মমতায় বলে, তোমার নাম? —হাঁ জী, ব'লে হাসে মেয়েটি। মনে তরঙ্গ খেলিয়ে অনুভূতি উঠে আসে। রুদ্ধ কণ্ঠে খুদাবক্স গুঞ্জরণ করে—মোতি, মোতি, মোতিয়া।

চলতে সুরু করে মেয়েটি। সে রাতের মতো পথের ধারেই রয়ে যায় খুদাবক্স।

হাজারখানা তারার দীপালি জ্বালিয়ে বসে আছে আকাশ। একখানা চওড়া পাথরে

হেলান দিয়ে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে খুদাবক্স এক আকাশ তারার একটাও দেখতে পায় না। মনে হয়, সবগুলো তার মোতির হাতে জ্বালা। এতগুলো বাতি জ্বালিয়ে মোতি তাকে ডাকছে।

পিপাসিত বুকের ভেতর থেকে মোতির জন্যে তৃষ্ণা জাগে। দুরারোধ্য সেই প্রেম। বীজ যেন অংকুর হতে চাইছে, মাটির বুক থেকে তাই সে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। মোতি যে তাকে ঘরছাড়া করেছে, মোতি যে তাকে ঘা দিয়েছে, সে কথা ভুলে যায় খুদাবক্স। এই তারাভরা নিশিথিনীর অঞ্চলতলে নিদ্রামগ্ন পৃথিবী জুড়ে মোতির কোমল ভালবাসা ছড়িয়ে আছে। এমন ক'রে ছড়িয়ে গেল কি ক'রে মোতি?

শীতল, বোবা পাথরে মাথা গুঁজে খুদাবক্স একটি নামই গুঞ্জরণ করে, কত গান, কত শ্যের শুনেছে আর শিখেছে সে—একটাও তার মনে আসে না। শুধু বুক থেকে হাহাকার ওঠে, একখানা সমুদ্রের মতো লক্ষ লক্ষ বাহু তুলে তার প্রেম মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই নাম—মোতি, মোতি, মোতি।

কোন বিপদের অনুভূতিতে মাথা তোলে খুদাবক্স। কোমরের তরোয়ালে হাত দেয়। অনতিদূরে তার দিকে অসীম বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে চিতাবাঘ। তারার আলোয় তার বিচিত্রিত দেহ চোখে পড়ে, সবুজ জ্বলজ্বলে চোখে শুধু বিস্ময়।

ভয় হয় না খুদাবক্সের। শুধু মনে হয়, ও লাফ দেবার আগেই যেন সে সরে যেতে পারে। চিতাবাঘটা কিন্তু আক্রমণ করবার কোন নজীরই দেখায় না। কিছুক্ষণ কৌতূহলের সংগে তাকে নিরীক্ষণ করে, এক লাফে রাস্তা পেরিয়ে নালার ধারে বসে। চক্‌চক্‌ ক'রে পরম তৃপ্তিতে জল খায়। তারপর অবহেলে, সহজে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মিলিয়ে যায় বনের মধ্যে।

আত্মরক্ষার জন্যে যে অস্ত্র ধরতে হল না, তাতে বেশ কৃতজ্ঞ বোধ করে খুদাবক্স।

পথের হিসেব পথিক মনে রাখে না, পথ যদি লিখে রাখে ত' সে আলাদা কথা। পথে চলতে চলতে কোন কিষাণ বালকের গানের ছন্দে নিজের মনের কথা খুঁজে পায় সে। গানটা যেন তারই মনকে জবাব দিচ্ছে—

'প্যার প্যার কেয়া করতা রে তেরা প্যার না জানে কোঈ
তেরে দিলকে লাগি কোঈ কেয়া মাঙে—
ঘায়েল কী দুখ ঘায়েল জানে ঔর জানে কোঈ।'

খুব ঠিক কথা। কদরবান মানুষের কথা। কোন ঘায়েল মনের কথা। তবে হে গীতকার, ঘা তুমিও খেয়েছ, তোমাকেও কেউ সহসা সব দাম কেড়ে নিয়ে একেবারে মূল্যহীন ক'রে ছেড়ে দিয়েছে বাজারে। তোমার গানে সেই কথা লেখা আছে।

বিশদিন পথ চলে চলে সন্ধ্যে নাগাদ কৈন নদীর তীরে এসে পেঁছয় খুদাবক্স। বাঁকে ক'রে ছেলে বসিয়ে অন্যদিকে জামাকাপড়ের পোঁটলা রেখে চলেছে মেয়ে ও পুরুষ। উটের পিঠে পার হচ্ছে যাত্রী। রাজস্থানের ভবঘুরে লোহার ও লাম্বাডিরা মস্ত ধুনী জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করছে। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে, বয়স্ক ছেলে বুড়ী মা-কে পিঠে ক'রে নদী থেকে হাত মুখ ধুইয়ে বয়ে আনছে, এইসব ঘরোয়া ছবি দেখে চোখ দু'টো জুড়িয়ে যায় খুদাবক্সের। মানুষের সংগ প্রার্থনায় কতদিন যে চোখ তার পিয়াসী হয়ে ছিল! প্রশ্ন করে জানতে পারল, কালকে সাম্বৎসরিক মেলা। বান্দার নবাব-সাহেব অনেক পয়সা খরচ করে মেলার বন্দোবস্ত কায়েম করেছেন।

লাম্বাডি পরিবারের সঙ্গে বসে আরাম করবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে খুদাবক্স। ওপারে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে।

মেলার জন্যে তাঁবু পড়েছে কম করেও হাজার দুয়েক। পিতল তামার বাসন, রাজস্থানের ছাপা কাপড়, কম্বল, ইস্পাতের ছোরা-ছুরি থেকে সুরু ক'রে ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গরু, পাল্কী, গরুর গাড়ীর চাকা, ঘোড়ার ডাকগাড়ী সবই কেনা-বেচা চলবে। তাছাড়া গান, রামলীলা, যাদুখেলা, ভানুমতী, সাপখেলা, ভালুকনাচ সব থাকবে। কোন কোন তাঁবুতে বিলাসিনীদের নূপুর নিক্কণ অবধি বাজছে। কোন বরনারীকে নিয়ে সঙ্গী পুরুষ কাঁধে বুলবুলি পাখী বসিয়ে দোকানে ঘুরছে। নবাবের লোকরা দবন্ডী বাজিয়ে বলে বেড়াচ্ছে—ছেলেমেয়ে চুরি হ'তে পারে, চুরি ডাকাতি খুন হ'তে পারে, যে যার সে তার মতো সাবধান থাকবে। এরই মধ্যে কোথাও সাধু ধুনীর সামনে বসে জ্ঞান ও ওষুধ বিতরণ করছেন মহিমামুগ্ধ ভক্তজনকে। ভস্মের টিপ ধারণ ক'রে পুত্রহীনা পুত্র পাবে, শত্রু নিপাত হবে, আধিব্যাধি দূরে যাবে এই ত্রিবিধ প্রধান গুণ। গুণ কিন্তু নিরাসত্ব নয়, এইসব প্রধান গুণের সঙ্গে আরো অনেক গুণ আছে, যথা অর্থলাভ, ভূমিলাভ, বিপদআপদ দূরীভূত হওয়া, ইত্যাদি। কোথাও কোন বিগতযৌবন চপলা রমণী হেসে হেসে নানারকম ওষুধ বিষুধের ব্যবস্থা দিচ্ছে। প্রেমের ক্ষেত্রে এরা সিদ্ধ যাদুকর। এদের দেওয়া শিকড় ধারণ করলে পরে বাঞ্ছিত রমণী বা পুরুষ নিমেষেই করতলায়ত্ত হবে। সপত্নী মরে যাবে।

বহুক্ষেত্রেই আগুন জ্বালিয়ে যাত্রীরা রান্নাবান্না করছে। বাঁশবাজির বাঁশ পুঁতেছে খেলা দেখাবার আসল লোক, ছেলে দু'টো। ঐ বাঁশে তাদের উঠতে হবে, এই ভেবে তাদের চোখে প্রাণের আশঙ্কা ফুটেছে। কোথাও শাশুড়ী তিরস্কার করছে বৌ-কে, যে সে কেন নিলাজ হয়ে বাপের গাঁয়ের মানুষ দেখে ছুটে গিয়ে কথা কইল? বাপের বাড়ী বলতে কি অতই টান?

ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে খুদাবক্স চলল। উদ্দেশ্যহীনভাবে যেতে ভালোই লাগছে তার। অনেক দিন পর চোখ আরাম পাচ্ছে, মনও হালকা লাগছে। যেতে যেতে কানে এল পুরানোদিনের খবর বয়ে একটা পরিচিত স্বর—আরে ভাই, সেই-দিনের শোভা-খানা ভাব দেখি? আ-হা-হা-নবাব বসেছে, ঘিরে বসেছে নবাবের লোক, এদিকে আমাদের রাজার ত' চোখ অন্ধ, ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে—তীর-ধনুক হাতে। ভাই কেয়া নিশানা দিয়া ভাই?—চব্বিশ বাঁশ চল্লিশ গজ, আঙ্গুল আট প্রমাণ,...মারো মারো মোটা তাওয়া, মাৎ চুকো রে চৌহান! রাজা মেরে দিল তীর—কিন্তু নিশানাতে নয়, নবাবের বুকে—কলিজা ছিঁড়ে মরে গেল নবাব...ভাই, ও রাজা ছিল চৌহান। চৌহান দেখবে ত' সেই গল্প মনে রাখবে। চৌহান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর ভুল থাকে না। বিস্মৃতির জাল ছিঁড়ে ফেলে তীর সন্ধান ক'রে আনে পরিচয়টি। মহা আনন্দে খুদাবক্স এগিয়ে যায়—পরন্তপ, পরন্তপ জী!

—কে ডাকে রে? ব'লে সাড়া দিয়ে, জোড়া গোঁফ, আকর্ণবিস্তৃত লাল চোখওয়ালা শ্যামবর্ণ একটি লোক বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই—খাঁ সাহেব! ব'লে অভ্যর্থনা করে খুদাবক্সকে। জড়িয়ে ধরে, আদর করে, পিঠ চাপড়ায় আর বলে,—শেরে শেরে মুলাকাৎ হয়ে গেল ভাই, তোমরা সব ফূর্তি কর!

তার শ্রোতৃমণ্ডলী একান্তভাবেই নিরীহ গ্রামবাসী সব। সহসা ফূর্তি করবার যুক্তি তারা খুঁজে পায় না।

পরন্তপ তাকে টেনে নিয়ে যায়, তাঁবুতে নিয়ে একবার খাটিয়ার ওপর ফেলে দেয়। তারপর দাঁড় করিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখে। বলে গরম পানি দিয়ে বাদশাহী গোসল, গরম দুধ, আর আরাম—আরে জওহর!

মুখ ঢোকায় একজন ছোকরা। পরন্তপ বলে,—শেঠজীকে বলবে তাঁকে ছুটি দিয়ে দিলাম।

শেঠজীর-ই তাঁবু, অথচ ছুটি দিচ্ছে তাঁকেই পরন্তপ, এই উল্টো যুক্তি বুঝতে পারে না জওহর, চেয়ে থাকে। পরন্তপ বলে, আরে, তোমার মত ভাতিজা থাকতে শেঠজীর তাঁবুর অভাব? যাও যাও, দেখে-শুনে জোগাড় করো আর একটা!

খুদাবক্সকে বলে, তাজ্জব হবার কি আছে? শেঠজী একটা খুন করেছেন, আমি তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছি হৈ-হাঙ্গামার হাত থেকে, তারপর টিকমগড় ফিরবার পথে এক সঙ্গে মেলা দেখছি—খুব সোজা কথা। এরকম ত হামেশাই হচ্ছে।

পরন্তপের কথা কইবার ভঙ্গীতে মনে হয়, এর চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক আর কি হতে পারে? সত্য বটে সাত বছর আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল খুদাবক্সের, কিন্তু এই রকম মেলা হলেই যে শেরে শেরে মুলাকাৎ হবে, তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কি আছে? আর শেঠজীর ঘোড়া বে-কায়দায় নবাবসাহেবের বুড়ো ডাকবরদারকে মেরে ফেলবে এ-ও যদি ঘটতে পারে, ত' সেই শেঠকে দশটা হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যে পরন্তপ, সে কি তাঁর তাঁবুটাও এক রাতের মতো ব্যবহার করতে পারবে না?

—ওসব কথা ছাড়। এখন বল দেখি ভাই তারপরে কি কি হল। ক্রমে সব শুনব, এখন একটু আরাম কর।

জওহর ঢোকে এক চ্যাঙারী খাবার নিয়ে। জল আসে, কুর্শী আসে।

রাত বারোটা বাজে। মেলার অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু জেগে থাকে নিশা-বিলাসিনীরা আর তাদের হিমায়েৎদার মানুষরা। ওদিকে কোন কোন নতুন দোকানী দেরীতে এসে পেঁাচেছে, তাঁবু খাটায় তার কুলীরা, একটু কথাবার্তা কানে আসে।

তাঁবুর সামনে ধুনী জেবলে, তার সামনে কম্বল বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে খুদাবক্স ও পরন্তপ কথা বলে। সব শুনে পরন্তপ বলে,—সব বুঝলাম, কিন্তু তুমি হঠাৎ ক'রে ঘোসের কাজ ছাড়লে কেন?

খুদাবক্স জবাব দেয় না। বলে,—এখন তাই ঘরে চলেছি।

পরন্তপ বলে,—অর্জুনের সঙ্গে যে তুমি থাকতে পারবে না, তা আমি জানতাম। ওরা তিন পুরুষ ধ'রে লুঠেরা। চৌথা পুরুষে সে নতুন ক'রে বদলে যাবে, তা ত' আর হয় না!—যাই হোক এখন দেশে চলেছ?

খুদাবক্স সম্মতি জানায়। পরন্তপ বলে,—তোমার মনটা এখন নিশানা থেকে ছুটে এখানে ওখানে ঘুরছে ব'লে মনে হয় খাঁ সাহেব, এই জন্যে বলছি এখন নয়, কিন্তু কাজ যদি করতে চাও, শীগ্গিরের মধ্যে, তাহলে আমার কাছে চলে এসো। এলাহাবাদের আগে, আমার এক বন্ধুর মারফত একটা রিসালা-হল্ট পেয়েছি। ঘোড়ার একটা আস্তাবল। দশটা ঘোড়া নিয়ে কারবার সুরু করছি, পরে ভালো হবে। তুমি ঘোড়াকে শিখাতে পারবে ত?

খুদাবক্স না হেসে পারে না। বলে,—কি পারব, আর কি পারব না তা কি আমিই জানি?

পরন্তপ বলে,—এই তো বাস্—ঠিক হয়ে গেল। ঘোড়া আমার, শিক্ষা দেবে তুমি।

—কি দেবে?

—ট্রেনিং দেবে, অংরেজী কথা ফৌজের কথা এ-সব। বল ভাই কি জানে পরন্তপ চৌহান আর কি জানে না। ফৌজে ছিলাম দু-মাস, কিন্তু যা শিখেছি, তা শিখতে অন্য লোকের কমসে কম্ ছয় মাস লাগত। ট্রেনিং হচ্ছে শিখাই-পড়াই। ঘোড়াকেও মখ্‌তবে বসে পাঠ শিখতে হয় জানো ত? আমি আর তুমি, দু-জনে মিলে কারবার লাগাব। ঘোড়া বিক্রী করব, চড়াদামে, ফৌজের সাহেবদের কাছে, এখানে ওখানে। কোন গোলমাল নেই।

—ফৌজের কাছে কেন? ফৌজ ত' তোমার না-পসন্দ।

পরন্তপ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল,—এই কথা তোমাকে আমি বলেছিলাম কবে? অংরেজী তেতাল্লিশ সালে ত? এখন চলছে অংরেজী তিপ্পান্ন সাল। ও জবান্ বুড়ো হয়ে গেছে, ওকে ফেলে দাও ভাই। এখনকার নতুন কথা হচ্ছে ফৌজের কাছেই থাকতে হবে, আর খুব ঘোড়া বেচতে হবে, আসতে হবে, যেতে হবে।—বলে আগুনের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবে পরন্তপ। বলে,—আমি ওখানেই থাকবো, তুমি যদি কাজ খোঁজ, ত' ওখানেই চলে আসবে। কারবারের জন্যে আগেই আমি আগাড়ি-পিছাড়ী দড়ি, যা ঘোড়া বাঁধতে লাগবে, তার ফরমায়েস দিয়েছি।

খুদাবক্স বলে,—ঘোড়া দেখেছ?

—না-না-তবে যে আমাকে খবর দিয়েছে, সে মিথ্যা কথা বলবে না।

—আগেই ঘোড়া বাঁধবার দড়ি কিনেছ যে? এমন অসম্ভব হাস্যকর লাগে ব্যাপারটা, যে খুদাবক্স না হেসে পারে না। পরন্তপও খুব হাসে। বলে,—দড়ি ঠিক আছে, আমি ঠিক আছি, একবার ধরব কি সুরু হয়ে যাবে কারবার।

—যার ঘোড়া সে কি দড়ি রাখেনি? এতদিন কি করেছে তাহলে?

—আরে ভাই যা হয়ে গেছে, তার কথা ছোড়। এখন ভাব সামনের কথা যা হবে, যা আসছে।

হাতের ওপর মাথা রেখে, অন্ধকারে চোখ চেয়ে থাকে খুদাবক্স। হয়ত পরন্তপের কথাই ঠিক। হয়ত গত জীবনকে ভুলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তা বলেই কি তা' সম্ভব? ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে খুদাবক্স।

গ্রামে পেঁাছয় তারও দিন দশেক বাদে। যমুনা পেরিয়ে পাড় ভেঙে উঠে, ক্ষেতের পথ ধ'রে চলতে চলতে দেখে দুই পাশে পাকা গমের ভারে গাছগুলো মাথা নীচু ক'রে আছে। তিতির, বটের, টিয়া, নানান রকম পাখী গমের দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

তাদের বাড়ীর দিক থেকেই তার গাঁ সুবাদের চাচা হাফিজ বেরিয়ে আসছে বোধ হল। খুদাবক্স প্রায় ছুটে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সম্ভাষণ ও আশীর্বাদের পর হাফিজ বলল,—এতদিন কোথায় ছিলে বেটা? কেন কোন চিঠিপত্র লেখনি? টাকা পাঠিয়েছ ঠিক ঠিক এসেছে সুজনের ছেলের হাতে। আমার খত্ তুমি পাওনি?

—কেন, কি হয়েছে?

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে হাফিজ। বলে,—নিজেই দেখগে বেটা, তোমার চাচী ওখানে রয়েছে, কোন ভাবনা নেই...ভাবীর বড় অসুখ, খুদাবক্স, আজ বাইশদিন হয়ে গেল বুখার ছাড়ছে না।

পরী শুয়েছিল আনোয়ারের খাটিয়াতে। পায়ের থেকে গলা অবধি পুরানো লাল রেজাই দিয়ে ঢাকা। জ্বরে মুখখানা লাল হয়ে আছে। হাফিজের বৌ, মুখ নীচু ক'রে আস্তে ডাকল—দেখ কে এসেছে, দেখ?

খুদাবক্স আস্তে ডাকল—মা—

চোখ খুল্‌ল পরী। অবিশ্বাস চোখে নিয়ে তাকিয়ে চিন্‌ল ছেলেকে। শীর্ণ মুখে হাসি খেলে গেল। চোখে তার পরেই জলে ভরে এল। বলল,—তোর সংগে আমি ত' কথা বলব না!

পরে সব শুনল খুদাবক্স তার পড়শীদের কাছে। একে একে সবাই এল। বিষুণ সিং, সুজন, বুড়ো লালা, হাফিজ, এমনকি পরমেশ্বর মিশ্রও দাঁড়িয়ে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করল। অনেক দিন বাদে চার পাঁচ খানা চারপাই পড়ল উঠোনে। সবাই তামাক খেতে খেতে মৌজ ক'রে কথাবার্তা কইতে লাগল। বয়স্কদের প্রাপ্য সম্মান দেখিয়ে খুদাবক্স দাঁড়িয়ে রইল। প্রত্যেককে জানাল অভিবাদন। দেখেশুনে তারিফ ফিরতে লাগল চোখে চোখে। হাঁ, বেশ ছেলে হয়েছে। আজকালকার ছোকরাদের মত বে-আদব নয়। আর চেহারা—তা হবে না কেন? বাপ্‌কা বেটা ত?

প্রত্যেকের কাছেই পরম কৃতজ্ঞ বোধ করল খুদাবক্স। তার অনুপস্থিতিতে এরা তার মা-কে দেখাশোনা করেছে—চাষ দিয়েছে, ক্ষেতী দেখেছে, ফসল দিয়েছে। আগে ভাবেনি সে, এখন দেখল, এরাও তাকে ভালবাসে। তাকে আলাদা কোন মানুষ হিসেবে দেখে না। তাদের বন্ধু আনোয়ারের ছেলে, এই গাঁয়ের মানুষ। তাকে দেখাশুনা করা, ভালবাসা, এ'ত কর্তব্য কাজ মাত্র। প্রতিদানে তারা চায় এই গ্রামেই থাকো, বিয়ে করো, বসবাস করো। তোমার সন্তান যেন এই গ্রামেরই একজন হয়ে বড় হয়ে ওঠে। পরস্পর কাছে থাকবার, বেঁধে রাখবার জন্যে এই স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন। বুড়ো লালার রেখাঙ্কিত মুখ, হাফিজের গোলগাল ফর্সা মুখ, বসন্তের দাগ চিহ্নিত বিষুণ সিংয়ের মুখ, সবগুলো মুখ যেন এক কথাই বলে, একই অনুনয় জানায়। এই জীবনের আদলখানা বদলে দেবার বিদ্রোহী হাওয়া কোন আশমানে ফুঁসে উঠেছে। এইসব কিষাণ ও জোতদার মানুষ যেন তার গন্ধ পাচ্ছে, তার একটা আশংকাও চোখে চোখে লেখা আছে।

পরীর কথা বলে মাথা নাড়ল সকলেই। সকলেই তাকে ভালোবেসেছে, নিজে থেকেই করেছে তার জন্যে। কিন্তু পরী সেই দান এমনি এমনি নেয়নি। লালা বলল,—খলিফার রুটি মেরে দিয়েছে তোমার মা।

পরী নাকি জামা, পা'জামা, মেয়েদের জামা, পুরুষদের মেরজাই, এইসব জিনিষ সেলাই ক'রে দিয়েছে, গম পিষে দিয়েছে ঘরে ঘরে। লালা আরও বলল,—তুমি যা টাকা দিয়েছ তার একটি পয়সাও খরচ করেনি। শুধু সংসার সাজিয়েছে, গুছিয়েছে, শীত মানেনি, বর্ষা মানেনি, পরিশ্রম করেছে, বলেছে,—এখন আমার ছেলে দাঁড়িয়ে গেছে, সংসার হবে, সে বিয়ে করবে—আমি তখন আরাম করব। সেদিনও, রাত হয়ে গেছে, দেখছি হাফিজের বোনকে মালিশ তাগিদ ক'রে কত রাতে একলা ঘরে ফিরছে। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। আমি বললাম—বেটি, খুদাবক্সের বাবাকে আমি ছোটটি দেখেছি, আমার কাছে তুমি শরমাও কেন? একটু হেসে তখন চলে গেল। এই কাজ ক'রে ক'রেই অসুখটা বেড়ে গেল আর কি!

খুদাবক্স শোনে মন দিয়ে। বুকের হাড়ে জখম্‌ আছে, বুখার হয়, তার সংগে সেখানে

হয় ব্যথা, আর খুনও মাঝে মাঝে উঠে আসে গলায়। গাঁয়ের হেকিমের অনুরোধে, এলাহাবাদ ফেরবার পথে এক বড় হেকিমকে এনেছিল বিষ্ণু সিং—কোন আশাই দিতে পারলেন না। বললেন বড় পাজি ব্যামো—ভেতরটা খেয়ে গিয়েছে, ঝাঁজরা ক'রে দিয়েছে। এখন সেবা যত্ন খাওয়া-দাওয়ার ফলে যতটা ভাল হয়। কাছাকাছি কোন্ বটগাছের নীচে এক সিদ্ধ দরবেশ এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে তাবিজ্ এনেও দেওয়া হয়েছে। কিছু ফল পাওয়া যায়নি।

মায়ের সেবা করে খুদাবক্স প্রাণমন ঢেলে। মা যদি চলে যায়, তবে তার যে কিছুই থাকবে না। একটা বিরাট নিঃসঙ্গ শূন্যতা যেন তাকে গ্রাস করতে চাইছে, তার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে।

খুদাবক্স কাজ ছেড়ে আসার কথা বলে না, বলে ছুটিতে এসেছে। পরী দেখে দেখে বলে,- এবার তোকে বিয়ে দেব। কত টাকা জমিয়েছি জানিস্? তোর বৌ-কে গয়না দেব।

মায়ের একটা স্বপ্নও ভাঙে না খুদাবক্স, হেসে হেসে বলে,—তার জন্যেও ত' তোমার ভালো হয়ে উঠতে হবে মা।

সন্ধ্যে হতে বাপের কবরে চেরাগ্ জ্বেলে দেয় খুদাবক্স। পরীর পাশে বসে কথা বলে। পরী বলে,-তোর মনের মতন বৌ আমি পাব কোথায়? অন্য গাঁয়ে খবর করতে হবে। কিরকম বৌ চাস্ বল্ দেখি?

—তোমার মতন।

-শুধু ঠাট্টা, বলে হাসে পরী। খুদাবক্স মমতাভরা গলায় বলে,—তোমার চেয়ে সুন্দর বৌ দিয়ে কি হবে?

পরী বলে,—কি যে বলিস্!...একটু চোখবুজে থেকে আবার বলে,—তোর বাবার জামা, কামিজগুলো পরিস্, পেটিতে তোলা আছে। আমার বৌ'কালের পায়ের গহনা আছে, সোনার ফুল আছে একটা, সব তুলে রেখেছি। টাকাগুলো পাবি পিতলের ঘটিতে, পোঁতা আছে পেটির নীচে মেঝেতে। একখানা ইঁটের তলায়।

সোনার ফুলটা বের ক'রে এনে মাকে দেয় খুদাবক্স, দেখে দেখে পরীর চোখে কোমল মমতা ফোটে, বলে,—তোর বাবার প্রথম উপহার। পাছে সামনে থাকলে অভাবের দিনে বেচে দিতে হয়, তাই আড়ালে রেখেছি। তোর বৌ এনে নিজে হাতে পরিয়ে দেব। কি বলিস্?—

খুদাবক্স জবাব দেয় না। একখানা মুখে এই ফুল পরিয়ে দেখে তার মন। তার পরেই সেই ছবিখানা বন্ধ করে সে! নিশ্বাস পড়ে একটা। এমন ছেলে, পরী ভাবে, কোন যাদুগরণী ত' বশ করেনি? তার পরেই ভাবে না, না, তাহ'লে আমি জানতাম।

ফসল কাটবার সময় হলে এবার সবাই ডাক দেয় খুদাবক্সকে। বছর বছর তারাই কেটেছে, এবার যখন ঘরে আছে, তখন সেও আসুক।

চাচীকে মা'র কাছে বসিয়ে ক্ষেতে যায় খুদাবক্স। হাতে পাশ্নি নিয়ে ক্ষেতে নামলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। সকৌতুকে তার পড়শীরা দেখতে থাকে, খুদাবক্স কেমন ক'রে ফসল কাটে। প্রথমটা কষ্ট হয়, তারপর নিপুণ হাতে গম কেটে ভারা বাঁধে খুদাবক্স। হাফিজের গরুর গাড়ীতে তুলে দেয়। ঘর থেকে মেয়েরা দুপুর বেলা নাস্তা আনে। সকলেই আহ্বান করে খুদাবক্সকে। একটু হাসি গল্পও চলে। তারপর আবার সুরু হয় কাজ।

তার রক্তে রক্তে বুঝি এই পরিবেশে সাড়া জাগে। পাকা ফসলের গন্ধ বুক ভরে নেয় খুদাবক্স। এমনি সময় দেখে বুড়ো লালা ঘোড়া চড়ে দেখতে দেখতে আসছে। নেমে পড়ে পাশনি তুলে নেয় লালাও। রেখাঙ্কিত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক গোছা গম হাতে ধরে। খুদাবক্সকে বলে,—এমনি ধারা রঙের বৌ আন্‌বে বেটা, ভুলে যেও না।

পিঠ নীচু করে কাটতে কাটতে হাসে আর সকলে। লালা বলে,—বৌ আনবে এই রকম সুন্দর, চাঁদি দিয়ে আঁজলা ভরে দিয়ে মুখ দেখব তোমার বৌয়ের।

সকলেই আনন্দ অনুভব করে। গুনগুন করে গুঞ্জন করে। ওদিকে গানের সুর তোলে হাফিজ নিজে—একেবারে দেহাতী গান। সুরটা একঘেঁয়ে, কথায় বৈচিত্র্য নেই। তবু ফসল কাটার ঝোঁকে ঝোঁকে গানের মুখে তাল পড়ে, আর মুখে মুখে গানটা ছড়িয়ে পড়ে এদিক থেকে ওদিকে—সহেলী আঙিয়া রঙাবত আওরে—এস সখী আমরা আঙিয়া রঙে রঙাই—আনন্দের দিন এল।

বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র সোনালী গমের ভারে নীচু হয়ে আছে। সরু সড়কে বয়াল-গাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এই ফসলের সমুদ্রে মাথা নীচু ক'রে ফসল কেটে চলেছে মেয়ে পুরুষ। একটা ঘোড়া নিস্পৃহভাবে চরে বেড়াচ্ছে, মুখে তার জালবাঁধা। সমস্ত চিত্রপটখানা সুখ, শান্তি এবং আশার রঙে মনোহারী। গানের গুঞ্জন ভেসে আসছে তারই মধ্যে। নীল আকাশ প্রসন্ন মিঠে রোদের আশীর্বাদ ঢেলে দিচ্ছে, বিচিত্র পেখম ঝুলিয়ে ময়ূর অপেক্ষা করছে কেঁদ গাছের ডালে। এই দৃশ্য, খুদাবক্স সতৃষ্ণ নয়নে দেখে মনের পটে লিখে নিল। দীর্ঘদিন বাদে, যখন এই শান্ত সুন্দর দিনগুলো চিরতরে হারিয়ে গেছে, তখন মাঝে মাঝে খুদাবক্স এই ছবিখানা মনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখত, আবার রেখে দিত স্মৃতির ভাণ্ডারে, যেন এই ছবি এক মূল্যবান রত্ন, রেখে দেবে আর মাঝে মাঝে দেখবে, ব্যবহারে কখনো মলিন করবে না তাকে।

দিনে দিনে দিন চলে যায়। এত চেষ্টাতেও এতটুকু উন্নতি হয় না পরীর। অঝোরে কাঁদে পরী, ছেলের অজান্তে। এখনই বাঁচবার আকাঙ্খা তার, এখনই সে সংসার বাঁধবে। আর এখনই নিষ্ঠুর বিধানে তাকে চলে যেতে হবে। ছেলের কথা ভাবে সে। নিরাশ্রয়, অসহায়, নিঃসঙ্গ। কেউ নেই। যত কাঁদে, তত বুকের ভেতরে ব্যথায় যেন হাড়পাঁজরা ভাঙতে থাকে। নিশ্বাস নিতে বাতাস পায় না।

ছেলে ভাবে মা-র কথা। বাবার কথা মনে হয়, মনে হয়, মা চলে গেলে কেমন ক'রে থাকব। মনে হয়, এই জীবনের কি কোন প্রয়োজন ছিল না? অথবা কোন প্রয়োজন আছে বলেই একটার পর একটা বাঁধন ছিঁড়ে তাকে মুক্তি দিচ্ছে খোদা? এই মুক্তি সে চায়নি, এই পরিণতি তার কামনা ছিল না—কিন্তু সে আরজি ত' খোদা মানল না। দুনিয়াতে যে কটা দিন মাপা ছিল পরীর, শেষ হয় বড় শান্তির মধ্যে, শেষ সময় বাঁচবার আর সংসার বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা তাকে পেয়ে বসেছিল।

তবু চলে যেতে হল। তখন রাত্রি উত্তীর্ণ হবে প্রভাতের তীরে। পূব আকাশে আলোর রেখাগুলো ফুটছে। হেকিম উঠে এলেন শয্যার পাশ থেকে। মেয়েরা কেঁদে উঠল কেউ কেউ। খুদাবক্সের অনুভূতিতে সেই মুহূর্তটা কেমন জানি এলোমেলো হয়ে গেল। মায়ের প্রশান্ত মুখ মনে পড়ে, আঙিনাভরা অনেক লোক, তাও মনে পড়ে, আর যে কি হল, ঠিক মনে পড়ে না। দাঁড়িয়েই কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। সেই বিস্মৃতির ঘূর্ণীপাকে ফাতেহার গুঞ্জন কিন্তু প্রবীণ যন্ত্রীর হাতে সমের মতো তালে তালে পড়ছে—

হে আল্লা, দীনের প্রভু তুমি, এই মৃত্যুপথযাত্রিণীকে দয়া করো, যা সে জীবনে পায়নি তাই তুমি তাকে পূর্ণ করে দিও, যেন কোন অসংগতি না থাকে, বড় দুর্গম যাত্রা তার সামনে, হে আল্লা, তুমি তাকে সাহায্য কোর।

সব এলোমেলো হয়ে যায়।

পরী আর আনোয়ারের কবরের পাশে চাঁপা ও কামিনীর দুটো চারা লাগালো খুদাবক্স। বিলিব্যবস্থা করল ঘরদোরের। গাঁয়ের লোক কত করে বোঝাল তাকে, এক মা চলে গেছে তাতে কি অনাথ হয়েছে সে? এইখানে থাকুক খুদাবক্স, পিতামহের ভিটেখানাকে মর্যাদা করুক। ঘাড় নাড়ল খুদাবক্স। এই ঘর, এই মাটি থেকে তার মন ছুটে গেছে। ছেড়ে ত' সে যাচ্ছে না, হেফাজত দিয়ে যাচ্ছে মাত্র। হাফিজ তার চাচা, হাফিজের বৌ তার দুধ-মা। তাদের হাতেই ঘর দিয়ে গেল খুদাবক্স। তারা বাস করুক, ব্যবহার করুক, ভোগ করুক ক্ষেতের ফসল, সন্ধ্যায় চেরাগ জেবলে দিক উঠোনে, তাতেই খুদাবক্স শান্তি পাবে। যদি কোনদিন ফিরে আসে? তবে থাকবে এখানেই। তখন যা হয় ব্যবস্থা হবে। শুধু এখন যেতে চায় সে। এই শূন্যঘর তাকে তাড়না করছে। এই উঠোন তার পিতা ও মাতার স্মৃতি বিজড়িত। এই মাটিতে, ঐ আমগাছের তলায় তার কত সুখের দিন কেটেছে, যখন শিশু ছিল, মায়ের কোলে শুয়ে গান শুনত, বাপের কাঁধে চড়ে বেড়াতে যেত, দুপুরে ছোট্ট লাঠি হাতে গমের ওপর থেকে পায়রা তাড়াত, তার সেই শৈশব ও কৈশোর, সুখ ও শান্তির দিন, সবই এখানে বাঁধা পড়েছে। ঐ আমগাছটা জানে সেই মর্মান্তিক সকালের কথা, যখন সাহেবের গুলীতে আনোয়ারের কলিজা টুটে রক্ত বেরিয়েছিল, ঐ আমগাছটার তলার মাটিতেই মাটি নিয়েছে সেই বীর কিষাণ। খুদাবক্সের মক্কা মদিনা সবই ঐ আমগাছের তলায়। সেখানেই সব তীর্থের পুণ্য সমাহিত আছে। এই ঘর সে ছেড়ে যেতে পারে কি? সাময়িকভাবে চলেছে এইমাত্র।

খুদাবক্সের যুক্তি বুঝে কেউ তাকে বাধা দিল না। রাতে দেখা করতে এল বুড়ো লালা। বলল,—কি বেটা, কি কথা শুনছি? তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

—কিছুদিনের জন্যে চাচাজী।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল লালা। বলল,—মিথ্যে কথা বোল না বেটা, তুমি আর ফিরবে না। ভগবানের কি আন্দাজ তা ত' জানি না, নইলে এমনই বা ঘটবে কেন? আন্দাজ করি, তোমাকে দিয়ে তাঁর অন্য কোন কাজ আছে।

খুদাবক্সের চোখে অবিশ্বাস লক্ষ্য করে সে বলল—অবিশ্বাস কোর না বেটা—দুনিয়াতে সকলেরই কিছু না কিছু কাজ আছে, ছোট পতঙ্গও ভগবানের কাজ ক'রে চলেছে। তোমাকে তিনি অন্য কাজের জন্যে তৈরী করেছেন হয়ত।

বৃদ্ধের গভীর বিশ্বাস দেখে নীরব হয় খুদাবক্স। লালা বলে চলে,—একই লোহা থেকে, হাল, ঢাল, তরোয়াল, সবই হয়। তবে এক এক মানুষ এক এক কাজে লাগবে না কেন?

তারপর বলে,—একটা কথা খেয়াল রাখবে বেটা, যখন মন করবে, ফিরে আসবে। এই তোমার ঘর, এখানে তোমার মাটি আছে। টাকা লাগবে কিছু? সংকোচ করো না—

খুদাবক্স অভিভূত হয়ে ঘাড় নাড়ে। না তার মায়ের জমানো তিন বিশ টাকা আছে। তার পক্ষে অনেক। পঁচিশ টাকা সে রেখে যাচ্ছে। হাফিজ তার মা'র নামে দাওয়াৎ দেবে। তার বড় সখ ছিল শহর বাজারের মত মা আর বাবার কবর বাঁধিয়ে দেবে।

ভগবান জরুর দিন দেগা, লালা বলে। তারপর খুদাবক্সকে সস্নেহ আলিঙ্গন ক'রে বিদায় নেয়।

ভোররাতে নিজের জিনিষপত্রের ঝোলা কাঁধে ফেলে খুদাবক্স। প্রত্যূষের তারার চাহনী যেন তার মায়ের মতো মধুর, উজ্জ্বল। উঠোনের একটু মাটি নিয়ে কাপড়ে বেঁধে পকেটে রাখে। আমগাছের তলায় বাতিটা নিজের হাতেই জ্বালে। তারপর বিদায় নেয়। শূন্য ঘর, শূন্য আঙিনা, বিদায় জানায় সকলকে। বিদায় জানায় শৈশব ও কৈশোরকে। বিদায় জানায় মা ও বাবাকে। বোবা ভাষায় জানায় যে তার আর উপায় ছিল না, জানায় সে তাদের ভোলেনি, জানায় তার কলিজা ছিঁড়ে এখানেই রেখে যাচ্ছে, তবু যেতে হচ্ছে, এইসব কথা জানিয়ে সে তাদের দোয়াভিক্ষা করে। সে একলা, সে নিঃসম্বল, তবু তাকে চলতে হবে। চলতে হবে, যতদিন না তাদের মতো তারও সময় আসে। এখন সে সময় নয়। এই জীবন তাকে শুধু আঘাত দিচ্ছে, অমৃত পাবার আশা ক'রে তাই সে দোয়া ভিক্ষা করে।

প্রভাতের বাতাস তার তপ্ত ললাট চুম্বন ক'রে আশীর্বাদ জানায়, দুটো একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়ে। ঘরটা বন্ধ ক'রে চলতে সুরু করে খুদাবক্স।

এলাহাবাদের পথে চলতে চলতে কোম্পানীর ডাকসওয়ারকে দেখে খুদাবক্স। একই সরাইখানায় তারা বিশ্রাম করে। খুদাবক্সের প্রশ্নের জবাবে সে জানায় হ্যাঁ ঝাঁসীতেও তাকে যেতে আসতে হয়েছে সম্প্রতি। 'ঝাঁসী' নামটা শুনেই কেমন যে লাগে খুদাবক্সের। তার হাজারটা সাগ্রহ প্রশ্নের জবাব ডাকসওয়ার দিতে পারে না। একটা শহর মাত্র, এমন কি দেখাবার আছে, এত কি জানবার আছে? তা ছাড়া এখন ত' একটাই খবর, ঝাঁসীর রাজ্য থাকে কি যায়! রাজাসাহেব সম্প্রতি মারা গেছেন।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় খুদাবক্স। কি হয়েছিল?

—কি জানি! ভাই, মৌত যখন পরওয়ানা জারী করে, তখন কিছু কিছু বাহির নিশানা দেখায়—আসলে কি হয়েছিল জানো? মৌত ধরেছিল, আর কিছু নয়।

রাজার জন্য সহানুভূতি হয় খুদাবক্সের। মন ভরে ওঠে। সময় মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

বারো

বীণার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদে মোতি। বলে,—সব সাধনা মিছে হয়ে গেল গুরুজী, আমি গান করতে পারি না, সাধনা করতে পারি না। গান করতে যখনই মন ঠিক করি, ধ্যান ঠিক করি; সেই ধ্যান আমার ভেঙেচুরে কোন্ ধ্যান হয়ে যায়, এ কি হল?

এত বিদ্যা চন্দ্রভাণের, এত মানবচরিত্র দেখেছেন তিনি, তবু এই হতভাগ্য নর্তকীর অনুশোচনার সামনে সব কথা তাঁর মিথ্যা হয়ে যায়। নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, মানুষের বেদনাই সবচেয়ে মহান সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের 'অরমাঁ' কণ্ঠে বেজে সার্থক হবে যে সঙ্গীতে, সেই সিদ্ধি তাঁর ত' নেই। যাঁরা সঙ্গীতের তীর্থে বাউরা যাত্রিক, তাঁদের কথা স্মরণ ক'রে এতদিনে মনে হয়, মানুষের হৃদয় শ্রেষ্ঠতম বীণা, আর মানুষের বেদনাই শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত।

সে কথা বোঝেন বলেই প্রিয় শিষ্যাকে সান্ত্বনা দিতে ভাষা খুঁজে পান না চন্দ্রভাণ। শুধু হাত বুলিয়ে দেন মাথায়। প্রত্যহ আসেন, আর বসে বসে চলে যান।

মোতির মধ্যে যেন কোন বিস্মৃত বেদনার স্মৃতি খুঁজে পান চন্দ্রভাণ। মোতির বিভ্রান্ত মুখ, দিশাহারা চাহনি দেখে চল্লিশ বছরের যবনিকা ভেদ ক'রে নিজের যৌবনের মদমত্ত দিনগুলির কথা স্মরণ করেন তিনি। মনে পড়ে পান্নার রাজবাড়ীতে দশহরার চন্দ্রালোকিত রজনীতে জল-মহলের একটি স্মৃতি। মনে পড়ে তিনি দ্রুত নেমে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে নৌকোর দিকে, আর কার মিনতি তাঁর পায়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে—যেও না! যেও না! শুনে যাও। মনে পড়ে ঘৃণাভরে তিনি বলেছিলেন,—আমার ভালবাসা পণ্য নয়—মিষ্টি হাসির দামে তাকে কেনা যায় না। আরো মনে পড়ে তাঁর রূঢ় কথার আঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেল একখানি অপরূপ মুখ। আজও মনে পড়ে তার কপালে ছিল মুক্তার চন্দ্রটিকা। নিজেকে তিরস্কার করেন চন্দ্রভাণ। মনে হয় আজ মোতির মধ্যে সেই অবহেলিতাকেই দেখছেন তিনি।

গানে যদি শ্রীরাধিকার কথা থাকে ত', সে গান বিস্মৃত হয়ে নিজের কথায় চলে যায় মোতি। কুকুভা ও খম্‌বাবতী, গুর্জরী ও ভূপালী, কণ্ঠে তাদের আহ্বান করতে বাধে তার। প্রিয়সঙ্গসুখনিমগ্না, মালতীপুষ্পশোভিতা হে কমলাননা রাগিণী, তুমি কি আমার দুঃখ বুঝবে, এই কথা মনে হয় তার।

বিরহিণী রাগিণীমালা পটমঞ্জরী, আসাবরী ও ললিতার ছবি দেখে মোতি। দিগন্ত রেখা থেকে পুঞ্জে পুঞ্জে যখন মেঘ উঠে আসে, তার মনে হয় এমনি দুর্যোগের মধ্যে তার দয়িত চলেছে একা, মনে হয় সেই পথ যদি সে হতে পারত, যদি তার প্রিয়তম পদক্ষেপে দলিত করেও যেত, তবু কিছু সান্ত্বনা মিলত তার। মনে হয় সুখ, অর্থ ও নিরাপত্তার সব সম্ভাবনা পদদলিত ক'রে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে গেছে। তখন মোতি নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। তার পরিবেশ, তার অর্থ, ঐশ্বর্য, কাঁটার মতো বেঁধে।

সান্ত্বনা দিতে ভয় পায় জুহী, মোতির কাছে কাছে সকরুণ চোখে চেয়ে ফেরে। পাখীর শখ ছিল মোতির, পিঁজরায় তারাও ঝিমিয়ে বসে থাকে, যত্ন পায় না। ঘরে ঘরে গালিচার ওপর ধুলো, ঝাড়লণ্ঠনে মাকড়সা জাল বোনে। দাসীদের কাজে শৈথিল্য দেখা দেয়।

কখন শয়নকক্ষে তার নাচবার পোষাকগুলো সাজিয়ে দেখে মোতি। বিরহে, মিলনে, হোলিতে, অভিসারে, রাধিকার এক এক রকম পোষাক। মনে হয় কোনোদিনও এগুলো কাজে লাগবে না তার। দিন উদ্‌ভ্রান্ত, কিন্তু রাত্রি আর কাটে না। ধীরে নগরী ঘুমিয়ে পড়ে, তবু তার চোখে ঘুম নেই। কোন কোন নিদ্রাহীন রাতে তানপুরাতে মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে গান গায়, 'নিদ নহী আবত সৈয়াঁ—' গাইতে গাইতে গান আর গান থাকে না, সুর হয়ে যায় অশ্রু, তখন তানপুরা নামিয়ে রাখে মোতি, বলে,—কান্না এনে দিস্‌ কথায় কথায়, তুই কি আমার সৌতীন?

কখনো নির্জন ঘরে প্রসাধন করে মোতি, সযত্নে বেণী রচনা করে, কপালে টিপ পরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখ দেখে আয়না ধরে। বিছানায় বসে পায়ের ওপর দিয়ে ঘাঘ্‌রার প্রান্ত বিছিয়ে দেয়, ভাবে সেই দিনগুলোর কথা,—এমনি করে সেজেছিলাম, দেখে সে একদিন বলেছিল—রোজ রোজ এত প্রসাধনের কি প্রয়োজন? কোন্‌ হরিণকে ঘায়েল করতে চাও? আমার হৃদয় দেখ জর্জরিত, আরো আঘাত কি সহ্য হবে? মনে পড়ে গান গেয়ে কত রাত কেটে গেছে। তারপরেই মনে পড়ে সেই শেষ দিনের কথা। তার কথার চাবুকে

পাংশু হয়ে গেছে খুদাবক্সের মুখ, বিস্মিত ও আহত দৃষ্টি। মনে পড়ে আর মন জ্বলে যায় তার। দুঃখে পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে কাঁদে মোতি।

কখন মনে হয় সেই কি কম নিষ্ঠুর! আঘাত দিল মোতি আর সেটাই সত্যি মেনে চলে গেল? সেই আঘাত যে ফিরে মোতিকেই হানল, তা' ত' দেখল না খুদাবক্স? খুদাবক্সকে কঠিন হৃদয় ও নিষ্ঠুর মনে করলে তার খানিকটা শান্তি হয়। ভাবে জীবনটাই আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল জেনেও এই ব্যর্থতা থেকে আমি মুক্তি পেলাম না। এ এক আশ্চর্য প্রেম, যাতে তার কোন অধিকারই স্বীকৃত হল না।

'ন গুল আপনা, ন খর আপনা
ন জালিমবাগবানে অপনা—
বনাইয়া হ্যায় কিস্ গুল্শন মে'
ম্যয়' ঘ্যর আপনা?'

ফুল আমার নয়, কাঁটা আমার নয়, নিষ্ঠুর বাগানের মালী, সেও আমার নয়। তবে কোন গুলবাগিচায় আমি আমার ঘর বাঁধলাম।

প্রেম আমাকে শুধু বন্দী ক'রেই রেখে গেল, অথচ প্রতিবাদ করেও উপায় নেই—

ইয়ে কাফসোঁ কো কয়েদীয়োঁ কা
আঁসু বহানা হ্যায় মনা—

এই কারাগারের বন্দীদের অশ্রুমোচন করতে নেই।

একদিন স্নানান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে কার সুস্বরে গান শুনে তাঞ্জাম থামাল মোতি। চৌকে দাঁড়িয়ে একটি অন্ধ রমণী গাইছে—

তেরে কারণ ম্যয় প্রীতম যোগান বনি যাঁউ
　　যোগান্ বন্ যাঁউ॥
অংগ ভূষণ ছোড়ি প্রীতম্
　　গৈর বসন পহ্নাউ'—
একনাম গাবত প্রীতম তীরথ তীরথ ভরমাউ'
　　যোগান্ বন্ যাঁউ॥

প্রেমিকের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের এই নিবেদন শুনে মোতির হৃদয়ে বর্ষণান্তে পুষ্পিত কামিনী গাছের মতো দোলা লাগল—কিছু অশ্রু কিছু চ্যুতবৃন্ত ফুল ঝরে পড়ল নিমেষে। শিবিকা থেকে নেমে দাঁড়াল মোতি, ভিখারিণীর হাতে গলা থেকে সোনা ও মুক্তার বহুমূল্য হার খুলে দিল। রাজপথে প্রকাশ্যভাবে তখনো মোতিকে দেখতে অভ্যস্ত নয় মানুষ। তারা সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। ভিখারিণী একটু হেসে বলল,—মাল্‌কিন, তুমি মেহেরবান, কিন্তু আমি সামান্য·ভিখারিণী, এই অলঙ্কার আমার হাতে দেখলে লোকে কেড়ে নেবে, কয়েদ করবে—তা ছাড়া এ তো আমার কাজে লাগবে না। এ তুমি ফিরিয়ে নাও।

—তোমার ঘরে কেউ নেই?

—আমার পিতাজী আছেন।

তখন পিছন থেকে জলদগম্ভীর সুরে কে বললেন,—তুমি নির্ভয়ে ঘরে চলে যাও বেটি। কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না। সাগর একে ঘরে পেঁছে দাও।

জনতা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। মোতি ও ঘোস পরস্পরের দিকে তাকালেন। ত্রস্তে শিবিকায় উঠে মোতি পর্দা টেনে দিল।

ফিরে চন্দ্রভাণকে ডেকে পাঠাল মোতি। বলল,—গুরুজী আপনি আমাকে ভজন শিক্ষা দিন। আমি ভজন শিখব।

চন্দ্রভাণ বোঝেন। বলেন,—ভজন তুমি গাইতে পারবে মোতি। সব গান সকলে গাইতে পারে না। ভজনের অরমা চরিত্রে সঞ্জাত হবার পূর্বে প্রয়োজন হয় কিছু চিত্ত-শুদ্ধির—তা' হয় কখনো দহনে, কখনো অশ্রুতে। মীরার কথা খেয়াল করো।

উত্তর না দিয়ে একটু হাসে মোতি। সে ভাবে, তবে আমার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে? আমি যোগ্য হয়েছি?

চন্দ্রভাণ ভাবেন, জীবনের পশ্চিমে চলে এলাম, তবু শিক্ষা শেষ হল না। আখ্‌রী পাঠ নিতে বাকি ছিল মোতির কাছে। সে শিক্ষা তাঁকে দিল এই নর্তকী, মানুষকে আরো ভালবাসতে শেখাল এই মেয়ে। তাঁর অহঙ্কারেরও মোচন হল। বলেন,—তম্বুরা বাঁধ বেটি, বল কোন ভজনে পাঠ সুরু করব।

মুখ নীচু ক'রে মোতি বলে,—সেই 'যোগান্ বন্ জাউঁ'—শেখান গুরুজী।

চন্দ্রভাণও গান সুরু করেন বিনা প্রতিবাদে।

যোগান্ বন্ জাউঁ, যোগিনী হয়ে যাব তোমার জন্যে—এই কথার মধ্যে শান্তি পায় মোতি। তার হৃদয়ের ধূপ জ্বলে জ্বলে এই সুরের আরতিকে মধুর ও পবিত্র করে।

ঘোস ও বাহ্‌রাম পাশাপাশি চলেন নীরবে। দু'জনেই এক কথা ভাবেন। সহসা বাহ্‌রাম বলে,—মাপ করবেন ওস্তাদ, ও কাজ আপনি ঠিক করেননি।

—সে কথা আমিও জানি বাহ্‌রাম।

—মোতি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল।

—মানুষ দুঃখ বহন করতে পারে বাহ্‌রাম, পাহাড় হলে দীর্ণ হয়ে যেত।

দু'জনেই দু'জনের মন বোঝেন। তাই বেশী কথা হয় না। আবার বাহ্‌রাম বলে,—আপনি যে টাকা আর খত্ পাঠালেন, তার কি হল?

—কিশোর এখনো আপস্ আসেনি, তবে খবর পাঠিয়েছে এলাহাবাদ থেকে। ওর মা মারা গেছেন, সে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না।

তারপর বলেন,—বড় অন্যায় আমি করেছি বাহ্‌রাম, বড় অহঙ্কার বেড়ে গিয়েছিল। একটা জান দেবার ক্ষমতা নেই, দু'জন মানুষকে ঘা দিলাম!

—আপনিও ঘা খেলেন।

—দু'জনের কথাই ভাবি বাহ্‌রাম, তিস্‌রা জনের কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু এই পাপ আমি মোচন করে যাব।

—তাও জানি ওস্তাদ, আপনি চেষ্টা করবেন।

বাহ্‌রামের এই বিশ্বাসে কিছুটা বল পান ঘোস। একটু সান্ত্বনা মেলে।

তেরো

সরাইখানায় বসে কোম্পানীর ডাকসওয়ারের হাতে একখানা খত্ পাঠায় খুদাবক্স। ঘোসের কাছে খত্। লেখে : ওস্তাদ, আমার শেষ বন্ধন কেটে গেছে। মা আমাকে ছুটি

দিয়ে গেছেন। অনেকদিন হল আপনাকে ছেড়ে এসেছি। আপনার কুশল জানতে ইচ্ছে করে। একটা ছোট সরাইখানায় বসে আছি। কোম্পানীর ডাকসওয়ারের মুখে জানলাম রাজাসাহেব আর নেই। জেনে দুঃখিত হয়েছি। আমার বন্ধু পরন্তপ চৌহানের সংগে এলাহাবাদের কাছে একটা রিসালা-হল্টে কারবার করবার কথা হয়েছে। আপনি আমার ভালোমন্দের কথা ভাবেন বলে জানি, তাই এত কথা লিখলাম। এ কাজে হয়ত ভালোই হবে। নতুন কোন নোকরী আর করবার ইচ্ছে নেই। আপনার কুশল কামনা করি। আপনার মত হিমায়েৎদার, বাহ্‌রামের মতো বন্ধু মিলেছে বলেই এই কারোয়াঁতে মিশে পড়েও আফশোষের কিছু নেই। খুদা হাফিজ।—খুদাবক্স।

থলি বের করে ডাকবরদারকে মাশুল গুণে দিল খুদাবক্স। লোকটা খুদাবক্সকে বলল,—তুমি নতুন পথে বেরিয়েছ। তাই সব নিয়ম জান না। এমনি করে টাকা বের করো না। বে-ঘোরে বদমায়েসের হাতে জান চলে যাবে।

পরদিন পথ চলতে চলতে দুপুর নাগাদ একজন বুড়ো সংগী জুটে গেল। পথের পাশে বসে সে সযত্নে খুদাবক্সকে মিঠাই বের ক'রে দিল, এক রকম শরবতও বানাল। খেতে দিয়ে বলল—আমার টাকাকড়ি আর মালপত্র একটু দেখো। আমি স্নান ক'রে আসি।

কম্বলের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে খুদাবক্স ভাবল : এত ভাল লোক রয়েছে দুনিয়াতে, তবু সবাই শুধু সাবধান হতে বলে। তারপর তার ভারী ঘুম পেতে লাগল। চোখ বুঁজল খুদাবক্স।

সহযাত্রীকে আফিম বা ধুতুরা খাইয়ে জিনিষপত্র নিয়ে উধাও হবার নজীর তখন বিরল নয়। ভাগ্যক্রমে খুদাবক্সের অচৈতন্য দেহ কোম্পানীর রেজিমেণ্টের চোখে পড়েছিল—সড়ক ধরে কুচ চলেছিল নারায়ণপুরের দিকে। রিসালার সহিসদের চোখে পড়তে তারা খবর দেয়।

জ্ঞান হতে খুদাবক্স সব কথা বুঝল। বুঝল যে সে কোন ফৌজের হল্টের তাঁবুতে রয়েছে। উর্দিবাজনা অভ্যাস করাচ্ছেন উর্দিমেজর। ছয় জন বাজাচ্ছে, তাঁর সামনে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাঁবুর দরজা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো একজন শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক। সাদা আচকান ও পায়জামা পরনে। সুগঠিত, ঈষৎ স্থূল দেহ। তাকে বললেন,—হুঁশ এসেছে আপনার। কতক্ষণ জেগেছেন?

—এই ত! আমি কোথায়?

—নারায়ণপুর হল্ট-এ। কি হয়েছিল মনে করতে পারেন?

খুদাবক্স ভদ্রলোকের বারণ সত্ত্বেও উঠে বসে। বলে,—নারায়ণপুর হল্ট? এলাহাবাদ থেকে কতদূর?

—পঁয়ত্রিশ মাইল পূবে। কেন, এলাহাবাদে আপনার কাজ ছিল?

একটু অবাক হয়ে থাকে খুদাবক্স। বলে,—এখন চলে যাব। কিন্তু কি হয়েছিল আমার?

ভদ্রলোক তাকে একটু ওষুধ খেতে দেন। তারপর টুলে বসে বলে যান। আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথা বলবার অভ্যাস তাঁর। খুদাবক্স শোনে, তার সংগী তাকে ধুতুরা খাইয়ে টাকা-কড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিল। রামপুর ফোর্থ নেটিভ ইনফ্যান্ট্রীর রাইট উইং ও রিসালার দুটো ট্রুপ কুচ ক'রে চলেছিল। সহিসদের চোখে পড়েছিল, তারাই তুলে এনেছে খুদাবক্সকে। তিনি বাঙালী ডাক্তার, তাঁর নাম শিবচন্দ্র গাংগুলী।

—আপনিই আমার জান বাঁচিয়েছেন?

—আপনি স্বীয় ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছেন। আমি সাহায্য করেছি মাত্র।

—কুচ-এর সঙ্গে আমি'ত থাকতে পারব না—নিয়ম নেই শুনেছি।

—হ্যাঁ, স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড সাহেব আপত্তি করেছিলেন। আমি বলে কয়ে রাজী করিয়েছি।

—এখান থেকে আপনারা কতদূর যাবেন?

—চারদিন পরে এলাহাবাদে ফিরতে হবে মনে হচ্ছে। বোধ হয় কাশী যাবার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেল।

—কেন?

—আমরা আদেশ পালন করি মাত্র। কোন প্রশ্ন করবার এক্তিয়ার নেই। তবে মনে হয় কোন জরুরী খবর এসে গেছে।

—আমাকে আজকে ছেড়ে দিন তবে?

এতক্ষণে একটু হাসেন ডাক্তারবাবু। বলেন,—আপনি কারো কয়েদত' নন্‌। তবে আপনার যাবার মতো তাগদ্‌ শরীরে নেই। কুচের সঙ্গে কোন কাজ করবেন?

খুদাবক্স কি যেন একটা ধরতে পারে। বলে,—জনাব, আপনি জান বাঁচিয়েছেন, ও-ই বড় কথা। ফির 'আপনি' বলে কথা বলবেন না। আমি কখনো শুনিনি, না আমার অভ্যেস আছে। বলুন কি কাজ করব?

হাসপাতাল সাফাখানার জন্যে আমি একজন লোক চাই, ওষুধপত্রের তদারক করতে, হল্‌টে সাফাখানার বন্দোবস্ত করতে। পথে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, পরে ছুটি দিয়েছি, সে এলাবাহাদে আমাদের সঙ্গে মিলবে । তুমি থাকতে চাও'ত আমি সাহেবকে বলব। বুঝতেই পারছ, তোমাকে রেজিমেণ্ট কোন মাইনে দেবে না। এখান থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত যাবে। খরচ যা, আমি দেব।

রাজী হয়ে যায় খুদাবক্স। সাহেব, রেজিমেণ্ট, এইসব কথা সে কতবার শুনেছে। ঝাঁসীতে থাকতে এলিস সাহেবের সঙ্গে ঘোসের সেলাম বিনিময়ের সম্পর্ক ছিল। দুজনেই সামান্য মাথা হেলিয়ে পরিচয় স্বীকার করতেন। ঝাঁসীর সাহেবদের সে কখনো আগ্রহ করে কাছে গিয়ে দেখেনি। সব সাহেব ডেভিড্‌সন নয়। তবু তার একটা বিদ্বেষের ভাব রক্তে ছিল। কিন্তু সে রাজী হয়ে গেল। মনে হল এ-ও একটা সুযোগ।

স্নান শেষ করে পরিষ্কার চিপা ও কুর্তা পরে যখন মুরেঠা বাঁধল খুদাবক্স, সকলেই একবার তাকে তাকিয়ে দেখল। পরে ডাক্তারবাবু সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সাহেবের তাঁবুতে। বললেন—আজ রবিবার। কাজ কম। স্ট্র্যাটফোর্ড সাহেবকে সেলাম পেশ করতে হবে—খেয়াল রেখ।

স্যামুয়েল হেনরী স্ট্র্যাটফোর্ড সাহেবের ছাব্বিশ বছর কাটল ইণ্ডিয়াতে। তবু গরমে অভ্যস্ত হতে পারলেন না। তাঁবুর ভেতর টেবিলে বসে কি লিখছিলেন। ডাক্তারবাবু ভেতরে ঢুকতে বললেন,—অনেকদিন বাঁচবে তুমি, তোমার কথাই ভাবছিলাম। সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের হাতের ব্যথাটা তুমি দেখবে।

—দেখব স্যার।

—চিতাবাঘের আঁচড়—একটু গোলমাল হতে পারে কি?

মনে হয় না। বাচ্চা বাঘত'?

—বড় ill-fated কুচ এবারকার। তোমাকে ত' বলেছি গাঙ্গুলী, ঐ লোকটাকে তুমি

ছাড়ো। ও সংগে থাকলেই গোলমাল সুরু হয়।

—সেত' অসুখ হয়ে ছুটিতে চলে গিয়েছে স্যার।

সাহেব পাইপ নামিয়ে বলেন,—কিছু বলবে আর?

—হাঁ—বলে খুদাবক্সের কথাটা পেশ করেন তিনি। খুদাবক্স তাঁর নির্দেশে ঘরে ঢুকে সেলাম ক'রে দাঁড়ায়। একটু অবাক হয়ে দেখেন সাহেব। বলেন,—যাও। ঠিক আছে। গাংগুলীকে বলেন,—এ রকম striking চেহারা, good carriage. He is not used to serve বলে বোধ হয় গাংগুলী। কোন গোলমাল করবে না ত?

—সামান্য ক'টা দিনের জন্যে।

—ঠিক আছে। Serve করেনি কথা কেন বললাম জানো? আমি ছাব্বিশ বছর ধরে তোমার দেশের লোকদের দেখছি। কোনো নেটিভ সাহেবের সামনে ওভাবে দাঁড়ায় না। How free he looks. You know me quite well. তাই ভুল বুঝবে না এরা বেশীদিন serve করতে পারে না। Better under Native States, ফৌজী জীবনে চলতে পারে না।

গাংগুলী চলে আসেন। অন্য সাহেবদের কথা আলাদা। স্ট্র্যাটফোর্ডকে তিনি ভালভাবেই জানেন। ভারতীয়দের সংগে ভালো ব্যবহারের জন্য, সরলতা ও সংবেদনশীল স্বভাবের জন্য তিনি ভারতীয়দের মধ্যে যতটা প্রিয়, ততটা স্ব-জাতীয়ের মধ্যে নন্। মীরাট, এলাহাবাদ ও বেনারসে ক্যান্টনমেণ্ট ক্লাবে তাঁকে দোস্ত সাহেব নামে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়, তাও তিনি শুনেছেন। স্ট্র্যাটফোর্ডের রেজিমেণ্ট তাঁকে ভালবেসে রিসালার দোস্ত বলে। সেই নামই কি অন্য ভাষণ পেয়েছে সাহেবমহলে? স্ট্র্যাটফোর্ডের কথাটা হয়ত' সত্যি। অনেক দেখেছেন তিনি, বেশী দেখেছেন ভারতীয়দের। হিন্দী, হিন্দুস্তানী এবং তাঁর প্রথম কর্মস্থল রাজস্থানের কিছু স্থানীয় ভাষাও তিনি জানেন। রিটায়ার করার পরে রেওয়া ও পান্নার জীবজন্তু ও পাখীর ওপর একখানা প্রামাণ্য বই লেখবার জন্যে তথ্য সংগ্রহ করছেন। সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে আগে গলা ঝেড়ে উপস্থিতি জানালেন। ব্রাইটের মেজাজ স্ট্র্যাটফোর্ডের থেকে একেবারে আলাদা। জড়িত কণ্ঠে একটা গালাগালি দিয়েই তাঁকে ঢুকতে বলল বলে বোধ হল।

ফৌজের জীবন বড় আগ্রহের সংগে দেখে খুদাবক্স। একেবারেই নতুন রকম লাগে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমার খানা তুমিই বানাবেত'?

—আপনাদের যা আদত্।

কি বুঝেছিলেন ডাক্তারবাবু কে জানে, তাঁর সাফাখানার মুসলমান বেয়ারা খুদাবক্সকে খানা পেঁছে দিয়ে গেল তাঁবুতে।

ভোরবেলা উর্দি বাজে, তখন উঠে পড়ে ফৌজ। বাঁশীর পরেই ড্রাম বাজে। সংগে সংগে পোষাক পরে, বন্দুক নিয়ে সিপাহীরা প্যারেড্ করে।

বানিয়ার তাঁবুতে এগারোটার সময় সিধা নিতে যায় সিপাহীরা। বানিয়া সিপাহী ও রিসালার সওয়ারদের মেপে মেপে সিধা দেয়। অড়হরের ডাল আর আটা, লবণ আর সামান্য ঘি। এই একই খাদ্য দিনের পর দিন দুই বেলা। কেন রোজ একই খাবার খাও? জিজ্ঞাসা করেছিল খুদাবক্স একদিন। পরমেশ্বর আহীর তার দিকে চোখ মট্‌কাল। অর্থাৎ প্রশ্ন কোর না। পরে বলল,—বৃহস্পতিবার প্যারেড নেই, সাহেবরা শীকার খেলতে যাবেন, নারায়ণপুরের [illegible] নেমন্তন্ন করেছেন। সেদিন গল্পসল্প করব।

কেউ যেন কাউকে বিশ্বাস করে না। জাত, জাত, জাতের কথা খুব শোনে খুদাবক্স। ভাবে, জাতের মধ্যে দুটোত' জাত দেখলাম। কিছু মানুষ ভালো, আর কিছু মন্দ। হাঁ, হিন্দু মুসলমানও জানি। কিন্তু এখানে এসে অনেক ভাগ বিভাগের নজীর পেল খুদাবক্স। পুরাবিয়া হিন্দুস্থানীরা এসেছে প্রধানত এলাহাবাদ, অযোধ্যা থেকে। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, আহীর বা গোয়ালা ও গড়েরিয়া আছে। ফৌজে এরা ভালো ভালো পদে আছে। আবার তারাই সুবেদার, জমাদার ও হাবিলদার হতে পারে যারা একটু ভাল ঘর থেকে এসেছে। এরা মাছ মাংস খায় না। এক বেলা আহার করে। জাতের গর্ব একটু রাখে।

শিখরা ভাল সিপাহী হয়। তারা নিজেদের মধ্যে থাকে, মাংস খেতে আপত্তি নেই। কিন্তু নিজেরা জবাই করলে তবেই, অন্যথায় মাংস তাদের কাছে অস্পৃশ্য।

গুর্খারা এক আশ্চর্য জাত। বেঁটে, পেশল চৌকো শরীর, ছোট ছোট চোখ। এরা এসেছে নেপাল থেকে। ইংরেজ অফিসাররা গুর্খা আর শিখদের ভারী খাতির করেন। বড় পরিশ্রমী আর স্বল্পে তুষ্ট থাকে গুর্খারা। মাছ, মাংস, বুনো শুয়োর, যা যখন সংগ্রহ করতে পারে খায়।

পাঠান, আফগান ও মকরানী মুসলমান ভালো সওয়ার হয়। তারা দুবেলা আহার করে।

জাত নিয়ে বড় কথা হয়। এ ওর সঙ্গে খাওয়া-পরা ওঠা-বসা করে না। গুর্খাদের নিয়ে শিখরা হাসে। শিখদের দেখে গড়েরিয়ারা ঠাট্টা করে।

সাহেবদের তাঁবুতে, বাবুর্চিখানার সামনে, মেস-তাঁবুতে, সাফাখানার সামনে, উর্দি তাঁবুতে, সর্বত্র পাহারা দেয় সিপাহীরা। ডিউটি পড়ে তাদের। ছোকরা একজন সিপাহী, সাফাখানার সামনে দুই ঘণ্টার কাছাকাছি পায়চারি করছে পা গুণে গুণে দেখে একদিন খুদাবক্স বলেছিল,—বোস না তুমি! থকে গেছ ত?

—এরকম বলবেন না খাঁ সাহেব। জমাদার সাহেব জানলে আমারই কোর্ট্‌মার্শাল হয়ে যাবে।

গাঙ্গুলী বলেছিলেন,—দুঘণ্টার ভেতরে একবার থামলে কি বললে কোর্টমার্শাল হয়ে যাবে তা-ও যেমন সত্যি, না বসলেও কোর্টমার্শাল হতে পারে। কেউ যদি রিপোর্ট করে যে তুমি ওকে বসতে বলেছ, বেত খেতে ও-ই খাবে। কেন না জমাদার বলবে নিশ্চয় ও তোমার কাছে কোন রকমে ওর যে পরিশ্রম হচ্ছে, সেই অভিযোগ করেছে, নয় তো তুমি বলবে কেন?

—সে ত অন্যায় হবে।

—এই রকম করে সিপাহীদের ছলছুতো দেখাতে পারলে জমাদারের উন্নতি হবার ভরসা থাকে।

বেতমারবার বহরও একদিন দেখল খুদাবক্স। দুজন রিসালার সহিস নাকি বাবুর্চি-খানা থেকে আলু চুরি করেছিল। শাস্তি ঠিক হল পাঁচ ঘা ক'রে বেত। শুনে মনে হল সামান্য। কার্যকালে দেখা গেল এমন কাতরভাবে কাঁদছে সহিসরা যেন তাদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুজন সিপাহী তাদের ধরে নিয়ে এল। চামড়ার জোড়া বেত অপেক্ষা করছিল। তুলে নিল তার একখানা রিসালার সুলতান। মিনিট দশেক সময় মাত্র। কিন্তু খুদাবক্সের মনে হল মনুষ্যত্বের কোন দোহাই আর রইল না। মানুষকে একেবারে নগ্নভাবে

অসহায় ক'রে ফেলে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হল কে জানে!

বেতমারা হচ্ছিল সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের তত্ত্বাবধানে। স্ট্র্যাটফোর্ড ঠাকুর সাহেবের নিমন্ত্রণ রাখতে গেছেন। বেতমারা হয়ে যাবার পর গাঙ্গুলী সহিস দুজনকে সাফাখানার তাঁবুতে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। ব্রাইটের প্রশ্নের জবাবে বললেন—এখন ত' ওদের ওষুধ লাগিয়ে দেওয়াই দরকার। পরে সাফাখানার তাঁবুর বাইরে একটা তৈলাক্ত মোলায়েম গলা শোনা গেল—ডাক্তারসাহেব আছেন?

ছোট ছোট চোখ, কালো রঙ দাস্য সুখে পরিতৃপ্ত চেহারা লোকটাকে দেখেই কি রকম যেন লাগল খুদাবক্সের। গাঙ্গুলী তার হাতের শিশিটাতে খানিকটা মলম ভরে দিতে দিতে বললেন—সুখচাঁদ আর বংশীকে ধরিয়ে দিয়েছে কে, তুমিই ত? তুমি রূপচাঁদ না?

—হাঁ হুজুর আমিই। মেহেরবান আপনি নাম মনে রেখেছেন। চুরি করছিল হুজুর।

—আলুর সের দু-পয়সা রূপচাঁদ, আর সুখচাঁদের বয়স পঞ্চাশের কাছে। শরম আসে না তোমার?

তেমনি হেসেই লোকটা বলল,—ভুল হয়ে গেছে হুজুর। কোম্পানীর ওপর চুরি দেখে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল হুজুর।

যখন ফৌজে সিপাহী হয়ে ঢুকেছিলাম, ভেবেছিলাম সুবেদার হয়ে বেরুব। সাত বছর হয়ে গেল। এখন বুঝি সুবেদার আমি আর হব না। মাসে সাত টাকা মাইনেতে ঢুকেছি। খাইদাই, কাপড়-লত্তা বাবদ বেনিয়া মুদীর খাতা চুকিয়ে হাতে পেয়েছি বড়-জোর এক টাকা, কি দেড় টাকা। এমন অনেক মাস গেছে যখন এক আনাও মেলেনি। বেনিয়ার ধার শুধে সাত টাকার একটা পয়সাও বাঁচেনি। কোম্পানীর হয়ে খাটলাম, লড়লাম, চাবুক খেলাম, আর সারা জীবনটা ডাল রুটি খেয়েই কেটে গেল। ঐ দিন তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে, কেন ডাল রুটি খায় ফৌজ। জানবে, যে সব্জী বাড়ীতে আমরা হরদম চাষ করি, এখানে তা মেলে না। তরকারী সেই খাবে, যার পয়সা আছে। ঘরে টাকা পাঠাতে পারব এই ভরসায় ফৌজে এসেছিলাম, কিন্তু হাতে করে টাকার চেহারা না নিজে দেখলাম, না ঘরে কেউ জানল, সাতটা টাকা কি রকম দেখতে!

ঝর্ণার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসে তিন চারজন সিপাহীর সংগে কথা বলে খুদাবক্স। একটা চরম হতাশার ছবি কথায় এঁকে চুপ করে গিরধারীলাল। পরমেশ্বর আহীর বলে,—এসেছিলাম আঠারো বছর বয়সে। অযোধ্যাতে গণ্ডক নদীর ধারে আমার গ্রাম। আমের জন্যে আমাদের জেলার খুব নাম। যদি মাসে পাঁচ টাকা কামাতে পারো ত' রাজার মতো থাকবে আমাদের গাঁয়ে। আমার বাপের দুই বিয়ে। মা-কে বাবা বড় কষ্ট দিয়েছিল। তাই ভাবতাম মা-কে আমি সুখে রাখব। জ্যেঠাইন-মা আমাকে আর মা-কে শুতে ঘর দিত না। ঝোপড়ীতে শীতের মধ্যে দুজনে তুঁষের বোরা চাপা দিয়ে ঘুমোতাম আর ভাবতাম, একটু জমি, একখানা ঘর, দুটো বকরী, একটা ছোট বৌ—পঞ্চাশ টাকা যদি জীবনে কামাতে পারি ত' এইসব হবে। কিন্তু কিছুই হলো না। আট বছর ধরে কাজ করছি, পায়ে হেঁটেছি কম ক'রে ক-হাজার মাইল হবে। জলে ভিজেছি, রোদে পুড়েছি, অনেক তক্‌লিফ করলাম। কিন্তু ঐ পঞ্চাশ টাকা আজও ছুঁতে পারলাম না।

--রিসালার সওয়ার কত পায়?

—সিপাহীর অনেক বেশী। খাতায় লিখা পায় সাতাশ টাকা, হাতে পায় নয় টাকা। সহিস, ঘোড়া, এদের খরচ থেকে সুরু করে, তাঁবু, কাপড়, ধোবি, নাপিত, সব টাকাই কেটে যায়। রিসালাতে ঢুকতে অনেক টাকার ধাক্কা। দুইশো আশী টাকা ঘোড়ার জন্যে দিতে হয়, আর দেড় মাসের মাইনের টাকা দিতে হয় আমানত ফান্ডে। তিনশো থেকে চারশো টাকা ঘর থেকে না আনলে সওয়ার বানায় না কোম্পানী।

সকলেই বলে,--বড় পরেশানীর কাজ। না করেছ, ভালো আছ। যদি ঘরে জমি থাকত, টাকা থাকত, ঠিক ঠিক মতো পেঁাছাতে পারতাম সে সব ভেট, তাহলে হয়ত উন্নতি হত আমাদেরও।

এই দিনের গল্পকথা এটাই। এই ফৌজী জীবন এক দিল্লীর লাড্ডু, যে খেয়েছে, আর যে খায়নি, সবাই পস্তিয়েছে। এ-ও বোঝে খুদাবক্স, যা সে শুনল, সবই বাইরের কথা। ভেতরে আরো অনেক গলতি আছে, অনেক কথা জমা আছে। সহজ স্ফূর্তির অভাব। স্বচ্ছন্দ জীবনের অভাব। অনেক আশা আকাঙ্খা সমাধি পেয়ে যাবে এ কথাও যেন জানা হয়ে গেছে, এমনি ধারা ক্লান্তি এইসব মানুষের চোখে লেখা আছে।

পাশাপাশি আরেকটা জীবনস্রোত প্রবহমান।

কুচে এসেছেন সাহেবরা, এক একজনের জন্যে পাঁচটা ক'রে তাঁবু পড়েছে। বসবার কামরা, খানা-কামরা, শোবার কামরা, গোসলখানা। আসবাব এসেছে খাট, টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, তিনটে বড় ঘোড়া, সাত আটজন সহিস তাদের দেখাশোনা করছে। পাঁচ ছয়টা টাট্টু ঘোড়াও রয়েছে। সাহেবদের আসবাব উটে বয়ে এনেছে। বেয়ারা, বাবুর্চি, মশালচী, খানসামা সর্বদা সাহেবদের সুখবিধানে ব্যস্ত। বিলিতী মদও দুষ্প্রাপ্য নয় হল্টে। গ্রাম থেকে ঠাকুর সাহেবের লোকরা বয়ে আনে হরিণের মাংস, খাসী, বড় বড় মাছ, ফল, ঘি, দুধ। প্রত্যহ খাবার সময়ে বাজনা বাজে মিঠেসুরে। বিকেলে কোনদিন এমনিই ঘোড়া চড়েন সাহেবরা, কোনদিন শিকার খেলতে যান জঙ্গলে। তখন সিপাহীরা গ্রামবাসীদের জুটিয়ে আনে। টিন বাজিয়ে জঙ্গল তাড়িয়ে বরাহ ও হরিণ বের করে, কখনো বেরিয়ে আসে চিতাবাঘ। শিকার খেলতে গিয়ে দুটো একটা বে-কায়দার ঘটনা বে-নজীর নয়। তখন টাকা দিতে হয় কিছু। মিটে যায় হাঙ্গামা।

ফিরতি পথে সাহেবদের জোশ্ বেড়ে যায়। গ্রামে পড়েছিলেন, ক্লাব আর সভ্যজগতের মধ্যে ফিরতে না পারলে স্বস্তি নেই। জোরে জোরে আরো জোরে চলতে পারে না কেন এরা? তেজী ঘোড়ার পিঠে বসে, বড়ই অধৈর্য লাগে, মনে হয় কুচের কদম বড় মন্দা। মনে হয়, দেশের জন্যে কি স্বার্থত্যাগটাই না করছি। কোন দূর দেশে, এই যে পথে জঙ্গলে, গ্রামে, কত অবস্থার মধ্যে চলছি, একি কম কৃতিত্বের কথা। এরপর ক্লাবের একটা সন্ধ্যা, তার দাম-ই অনেক। একজন আর একজনকে মন্তব্য করে,— বাজি ফেলে বলতে পারি, নেটিভগুলো তাদের রেজিমেণ্ট বাজারের মেয়েমানুষগুলোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

—You mean those licensed ones? —ব'লে দুজনেই হাসে।

সিপাহীরা তিনজন মিলে একটা ক'রে তাঁবু বয়। শবদেহ বহন করবার মতো ভঙ্গীতে। ধীরে ধীরে চলে। খালি পা, খাকি পট্টি জড়ানো, টেনে টেনে চলে। যতদূর দেখা যায় সিপাহী আর রিসালা, লাইন-ডুরি গার্ড, রসদ গার্ড, ভিস্তি, মেথর, দফাদার, জমাদার, নায়েক, সকলের একটা বিরাট মিছিল। চলবার যান্ত্রিক ছন্দের মধ্যে ফৌজী জীবনের

অনেক ইতিহাস লেখা আছে।

পথ, পথ, আর পথ! বড় বড় চওড়া সড়ক বাঁধিয়ে আম্বালা, মীরাট, কানপুর, কর্ণাল, আগ্রা, ফৈজাবাদ, এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা, এদিকে সাগর, নীমাচ্, জব্বলপুর, কোথাও আর তফাৎ রাখেনি কোম্পানী। সব দূর এক হয়ে গেছে। যত পথ, তত অনির্দিষ্ট যাত্রা। সব সময় চলো তাল রেখে, সোজা হয়ে, সাহেবদের সম্মান বাঁচিয়ে।

সিপাহী থেকে সুবেদার, সওয়ার থেকে পহেলা রিসালদার, এই স্বপ্ন সামনে থাক। তাকে নিশানা ক'রে চল। চলতে চলতে একদিন চলা ফুরিয়ে যাবে। তুমি হয়তো ঠিকানা মতো কবর অথবা চিতায় পেঁছে যাবে, তাতে এই মিছিল থামবে না। ভালো সাহেব, মন্দ সাহেব, দয়ালু, রাগী, হিংস্র অথবা যে কোন মেজাজেরই হোক না কেন, কোন না কোন সাহেব তোমাদের ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবে। অর্ডার ঠিক পেয়ে যাবে।

তার পরে যদি জিজ্ঞাসা জাগে মনে? যদি মন ও হৃদয় বুভুক্ষু হয়? সে জন্যও ব্যবস্থা আছে। ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স পাওয়া কিছু বিলাসিনী রাখে সরকার। চালাঘরে কুপীর আলোয় তার কাছে বসে মাইনের টাকা তুলে দিয়ে কিছু নিরালা মুহূর্ত কিনতে পারো তুমি। সকালে বাজারে তাকে দেখলে হয়তো তোমারই ঘৃণা হবে, দুঃখ হবে। তাতে কারো এসে যাবে না।

এই জীবন কাটাতে কাটাতে রক্তে ও মজ্জায় এই বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসবে, যে সাহেবরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমরা তাদের নীচে। তখন সহজ হবে সেলাম করা, আনুগত্যের হাসি আপনিই ফুটবে। আর প্রশ্ন করবে না। সেই দিন এখনও অনেক দূরে। তাই সাহেবদের চেষ্টার অন্ত নেই।

এলাহাবাদ কাছে আসতে গাঙ্গুলীবাবু জানতে চাইলেন—খুদাবক্স কাজ করতে রাজী আছে কি না। কোন কাজ কি সে চায়?

খুদাবক্স মাথা নাড়ল। ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু সে কাজ করবে না। একটা কথা জানতে তার ইচ্ছে করে, দেশঘর ছেড়ে এতদূরে কাজ করেন ডাক্তারবাবু, তাঁর ভালো লাগে?

ডাক্তারবাবু বলেন,—আমার কাজটা ত' ভাল। আর সবাই যদি সব সুবিধার কথা ভাববে খুদাবক্স তবে রুগীর রোগ সারাবে কে? রোগ ত' সারাতে হবে, ব্যথা ত' আরাম করতে হবে?

অকাট্য যুক্তি। সশ্রদ্ধ হয়েই স্বীকার করে খুদাবক্স। তা যদিও মানা গেল, তবু এ কাজে কি তাঁর মন তুষ্ট হয়?

তখন ডাক্তারবাবু যে কথা বলেন, বড় মূল্যবান মনে হয় সে কথাগুলো খুদাবক্সের কাছে। তিনি বলেন,—তুমি তরুণ, আমি প্রৌঢ়। তুমি আমাকে ভুল বুঝ না, আমি আমার বুঝ্ দিয়ে যা মনে করি তাই বলছি। আমি কার নোকরী করছি তা বেশী ভাবি না খুদাবক্স। আমি কি কাজ করছি, তাই ভাবি। আমার ভাবনা আমি ভাবব কেন? সে কথা নিশ্চয় ভগবান ভাববেন। আমার শুধু মনে হয়, এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অবিচার, এত যন্ত্রণা, যদি এতটুকু আরাম করতে পারি, যদি এতটুকু ভালো করতে পারি। চেষ্টা করতে ত' দোষ নেই।

বড় দামী কথা। স্পর্শ করে খুদাবক্সকে। সে বলে,—ডাক্তারবাবু, আপনার মতো

যদি আমিও পারতাম! আমি যে তা পারি না।

ডাক্তারবাবু বলেন,—তোমার সঙ্গে আলাপই হল না, স্বল্প পরিচয়, তুমিও চলে যাচ্ছ। কোথা থেকে এলে, কি তোমার পরিচয় কিছুই জানি না। ভাগ্যে থাকে আবার দেখা হবে। তারপর হেসে বলেন,—আমার রিটায়ার করবার আর চার বছর আছে। তারপর কলকাতা যদি না ফিরি'ত এখানেই কোথাও রয়ে যাব। তখন দেখা হতে পারে।

কলকাতার নামই শুনেছে খুদাবক্স।—খুব বড় সহর, তাই না?

—খুব বড় সহর। সাহেবদের আসল ঘাঁটি সেখানে। অনেক ঘরবাড়ী, অনেক মানুষ।

খুদাবক্স ডাক্তার গাঙ্গুলীকে অভিবাদন জানায়। ডাক্তারবাবু দেব দেব করেও কিছু টাকা হাতে তুলে দিতে পারেন না তাকে। কেমন যেন মনে হয়, তাকে অপমান করা হবে।

ফিরবার সময় পরমেশ্বর আহীর একটু আন্‌মনা হয়ে যায়। বলে, আমার কথা মনে রেখ।

ফিরতে ফিরতে খুদাবক্স ভাবে কোন্ কথা? কোন্ কাহিনী? এক একটা মানুষের জীবন একটা কাহিনী। একখানা ঘর, একটু ক্ষেত, একজন মল-বাজানো ছেলেমানুষ বৌ—এই স্বপ্ন ভেঙে ভেঙেই গেল পরমেশ্বরের চোখে, শুধু পঞ্চাশ টাকার জন্যে। আট বছর ধরে খাতায় কলমে ছয়শো' সত্তর টাকা রোজগার করল পরমেশ্বর, হাতে তুলে পেল একশো টাকা। এ গল্প ত' কম আশ্চর্য নয়। আরো বিস্ময়ের এই যে এ কথাও সত্যি।

আবার এই ফৌজী জীবনেই ডাক্তারবাবুর মতো লোকের দেখা মেলে, এও কম অবাক কথা নয়। অসঙ্গতি, অন্যায় ও অবিচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নীরবে অবিচলভাবে মনুষ্যত্বের কাছে কর্তব্য ক'রে যাবার মধ্যে যে হিম্মৎ আছে, তা খুদাবক্সকে কম স্পর্শ করেনি। ডাক্তারবাবু তার শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

তারপরে খুদাবক্স পৌঁছয় পরন্তপের কাছে। শুধু দড়িই নয়, ঘোড়াও জোগাড় করেছে ইতিমধ্যে পরন্তপ। কিছু টাকা জলখাই দিয়ে হুকুমনামাও বের করেছে ফৌজী দফ্‌তর থেকে। ফৌজকে ঘোড়া বেচবার এক্তিয়ার তার মিলেছে। তার ও খুদাবক্সের জন্যে একখানা নীচু দোতলা বাড়ী, পাশে ঘোড়ার আস্তাবল। ছয়জন সহিস, চারজন চাকর। অবশ্য আস্তাবলটা পুরানো, বাড়ীর নীচটা শুধু শালকাঠের খুঁটি, মই দিয়ে দোতলায় উঠতে হয়, বৃষ্টি হলে নীচ দিয়ে ধুয়ে চলে যায় জল, তাতেই বা কি! চাকর আর সহিস নাকি পরন্তপ পেয়েছে তার কোনো খুড়শ্বশুরের কাছ থেকে। মারা গেছেন তিনি, এদের লালন-পালনের ভার দিয়ে গেছেন পরন্তপকে। জামাইবাড়ীতে কাজ করে জামাইকে লজ্জায় ফেলে না তারা, অধিকাংশ সময়ই ধুতুরো পাতার বিড়ি খেয়ে ঘুমোয়, কিন্তু তাতে কি! তাদের থাকবার ঘরটাই খুব গর্ব ক'রে দেখায় পরন্তপ। মেঝেতে তক্তা দিয়ে ফুটো ঢাকা আছে। পূর্ববর্তী মালিককে নাকি ডাকাতরা, ঐ ফুটো দিয়ে বর্শা খোঁচাত।

—কিন্তু কি জায়গা ভাই, তারিফ্ ত' করো! বলে জানলা খুলে দেয় পরন্তপ। চোখ জুড়িয়ে যায় খুদাবক্সের। শেরশাহী সড়ক চলে গেছে প্রায় সামনে দিয়ে। পেছনে যমুনা নদী, পূবে এলাহাবাদ, উত্তর-পশ্চিমে কানপুর। তাদের ঘরের ঠিক পেছনেই একটি স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনী বয়ে গেছে। তার পাশে পাশে বড় বড় কালো পাথর। সেখান থেকে জল ভরে গোয়ালিন্ মেয়েরা। রাখাল স্নান করায় মহিষকে। এইসব অখ্যাত নদী-গুলো যেন গাঁয়ের মেয়েদের মতো। কল্যাণী অঞ্জলিতে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে চলেছে এরা অবিরাম। আসন্ন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুয়াশাচ্ছন্ন করুণ দিগন্ত। এমনি দিনে ঘর, প্রিয়জনের

সঙ্গ, কাঠের আগুনের সামনে বসে গল্পগুজব এই ভালো লাগে। যার ঘর নেই তার পক্ষে এই চিন্তা বিলাস বই কি!

রাতে বসে বসে পরন্তপকে কিছু কথা বলে খুদাবক্স। শুধু মোতির প্রসঙ্গ সযত্নে পরিহার করে। বলে,—কাজ দিতে পারো? অনেক কাজ, যাতে সব ভুলতে পারি, কখনো নিজের কথা মনে না পড়ে?

পরন্তপ বলে,—কাজের দিন সবে সুরু হল খুদাবক্স। এখন তুমি অনেক কাজ পাবে।

রিসালায় ভর্তি হতে যখন সওয়ার আসবে তখন সাহেব জিজ্ঞাসা করবে—রুপেয়া মজুদ্ হ্যায়? দুইশো' টাকা সওয়ারকে ঘর থেকে আনতে হয়। সে বলে—হাঁ হুজুর, হ্যায়। তার টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনে দেওয়া হয় সওয়ারকে। সেই ঘোড়া সরবরাহ করবার অনুমতি মিলেছে পরন্তপের। আপাতত দশটা ঘোড়া আছে। আগ্রা থেকে দিন দশেকের মধ্যেই আরো ঘোড়া এসে পড়বে। তারপর চাহিদামত খবর আসবে ফতেপুর, বিন্দ্‌কি, কাল্পী ও হামীরপুর থেকে। ঘোড়া নিয়ে পেঁছবে কখনো খুদাবক্স, কখনো পরন্তপ। অনেক দূর ভেবেই সড়কের ওপরে জায়গা বেছে নিয়েছে পরন্তপ। এই পথ যোগ করেছে উত্তর হিন্দুস্তানের বড় বড় সহরগুলো। এই পথ দিয়ে ডাক চলাচল করবে, কুচ যাবে, যাত্রী যাবে, সব খবরাখবর পাবে তারা।

—এ কাজে অনেক টাকা দরকার, তাই নয়?

পরন্তপ গভীর চোখে তাকাল। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট একটা পেটি এনে নামাল। বলল,—খুলে দেখ। খুদাবক্স নড়ল না। পরন্তপ নিজেই খুলে ফেলল পেটি। তুলে ধরল একমুঠো সোনা ও রুপোর টাকা। বলল,—এখানে তিন হাজার আছে। যখন দরকার হবে টিকমগড় থেকে টাকা আসবে আরো। তোমাকে সব কথা বলিনি খুদাবক্স। টিকমগড়ে আমার একটা গদী আছে। পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা যে কোন সময়ে আমি যোগাড় করতে পারি। কিন্তু রাহী মানুষের কাছে বেশী টাকা থাকা ত' কাজের কথা নয়?

খুদাবক্স বলল,—আমাকে এত কথা বলছ পরন্তপ, তুমি আমাকে কতটুকু জানো?

—সে দায়িত্ব আমার।

—বেশ, মানলাম। কিন্তু পরন্তপ, আসল কথাটা এবার বল। শুধু শুধু ঘোড়ার কারবার করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছ কেন? এর মধ্যে কি ফন্দী আছে? সেটা ভাল, কি মন্দ?

—চৌহান কাউকে কৈফিয়ৎ দেয় না। বলে অনেকদিন পর হা-হা ক'রে হাসল পরন্তপ। বলল,—হবে সব কথা হবে।

—এখনই হোক না কেন?

—দাঁড়াও। বলে একটু আগুন জ্বালাল পরন্তপ। মাঝখানে রাখল তার তরোয়াল। বলল,—খুদাবক্স, তোমার আর আমার দুই ধর্ম, এরকম শুনি, কিন্তু আমি মানি না। তা'হলে তোমার আর আমার এই দোস্তি সম্ভব হত না। তুমিও যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা, তোমার আর আমার কাছে এই তরবারি পরম পবিত্র। তাই একে সাক্ষী ক'রে বল, যা শুনবে তা দ্বিতীয় লোকের কাছে বলবে না।

খুদাবক্স ছুঁল না। তীক্ষ্ণ চোখে নিরীখ্ ক'রে বলল,—পরন্তপ, আমি মেয়েমানুষ নই, যে নিশানা ছুঁয়ে শপথ করব। আমি নিজের জবানকে দমন করতে জানি।

অধর দংশন করল পরন্তপ। বলল,—খুদাবক্স, তুমি অনেক আদত জয় করেছ, আমি বুড়ো হয়েছি। কিন্তু তুমি সহজে অস্বীকার করবার জোর রাখ, এই দেখেই তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি। তবে শোন। আমি আগে ফৌজে ছিলাম, তুমি জান বোধ হয়?

—শুনেছিলাম তোমারই কাছে।

—ফৌজের কিছু তুমি দেখেছ, তা-ও বাইরে থেকে। ও দেখা কিছুই নয়। দেখে থাকবে ইংরেজ আর হিন্দুস্থানের সিপাহীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এ-ও জেন, ইংরেজ এই দেশে এসেছে প্রায় একশো' বছর হতে চলল। তাদের সব আইনকানুন সবাই মনে মনে মেনে নিতে পারেনি। গত তিরিশ বছরের মধ্যে বারবার সিপাহীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আখেরে কিছুই মেলেনি। ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে তাদের লড়াই।...গত চার পাঁচ বছরে ইংরেজ কোম্পানী এমন অনেক কাজ করেছে, যাতে খাঁটি হিন্দুস্থানী মনে মনে ভয় পাচ্ছে। এরা জাত মানছে না, ধর্ম রাখছে না, দেশী সরকার-গুলোকে নিয়ে নিচ্ছে একে একে। রণজিৎ সিংহের মতো রাজা, যে নাকি কাশীর বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা মন্দিরের চূড়ো বাঁধতে বাইশ মণ সোনা ঢেলেছিল, যার নামে লাটসাহেব তিনবার কেঁপে যেত, তার পাঞ্জাবও হয়ে গেল কোম্পানীর তালুক। ছোটখাটো রাজ্যগুলো ত' বাঘের মুখে হরিণের মতো একে একে চলে যাচ্ছে। একেবারে কায়েম হয়ে বসছে কোম্পানী, আর সব জায়গায় হিন্দুস্থানের মানুষকে একেবারে বিগর দাম, মূল্যহীন ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে। কোন কিছুর দাম দিচ্ছে না, না ইজ্জতের, না জানের। কিন্তু একবারে ফুটো টাকা হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই দাম আদায় করবার কথা উঠেছে। অনেক জায়গায় অনেক লোক অনেক কথা ভাবছে। ভাবছে সুবিধে হলেই এই কোম্পানীকে মেরে তাড়াতে হবে। ফৌজের মধ্যে অনেকেই গরম হয়ে আছে। এ কথাও শোনা গেছে যে ফৌজকে যদি না টানা যায় ত' কিছু হবে না। কেননা, ফৌজের হাতে আছে কামান, বন্দুক, তোফখানা। আমার চেনা জানা কিছু মানুষ, আর আমি, মাঝে মাঝে কথা বলে দেখেছি। ঠিক হয়েছে চেষ্টা করতে থাকব। ফৌজের সঙ্গে মিলব, মিশব, আসব, যাব, খবর করব।

—তারপর?

—তারপর দেখা যাবে কি হয়। তাই এই মৌকা নিয়ে নিয়েছি। এখন শুধু দেখে যাবার সময়। আসল কাজের সময় পরে আসবে। কারণ কেউ তৈরী নেই, দেখছ না? আমার মুখে শুনলে বলে তাই, আমার মতন জেনো কম ক'রে কয়েক হাজার মানুষ আছে।

পেছনের নদীটার নাম চূণারকি। তাই নিজেদের ডেরার নামকরণ করে পরন্তপ—চূণারকি-রিসালা হল্‌ট। ধীরে ধীরে চূণারকি-রিসালা হল্‌ট একটি পরিচিত ঘাঁটি হয়ে ওঠে। মুৎসুদ্দীর চিট্‌ঠা নিয়ে লোক আসে, চৌথা রেজিমেণ্টে দশটা ঘোড়া চাই, বিন্দকীর পহেলা রিসালদার নিজের জন্যে দুটো ঘোড়া চান। ঘোড়া নিয়ে সহিস নিয়ে খুদাবক্স বা পরন্তপ চলে ছাউনীতে। পুরানো ফৌজী বাপ ছেলেকে নিয়ে নাম লেখাতে আসে রিসালাতে। গাছের তলায় রান্নাবান্না ক'রে খায় তারা, কিষাণ ঘরের ছেলে সরল চোখে দেখে ছাউনীর কাণ্ডকারখানা। ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হলে ঘোড়া কেনে, দেড়শো থেকে দুইশো টাকা দিয়ে, আশী টাকা জমা দেয় চাঁদা ফাণ্ডে, জিনপোষ, লাগাম, এইসব বাবদ। দুই নম্বর রিসালদার সাহেব দাঁড়িয়ে থেকে এই সব কেনাবেচা করান। বাপ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে থলি থেকে গুণে গুণে টাকা দেয়। এই টাকা শেষ জীবনে ফেরত পাবার কথা জেনেও সে স্বচ্ছন্দ

বোধ করে না। টাকা দেবার পর বাইরে এসে যখন খাই দাই-এর প্রসঙ্গ ওঠে, তখন প্রাণে ধরে এক পয়সার সব্জী কিনতেও চায় না সে। ছেলেকে ধমক দিয়ে বলে—আজকের মতো আচার দিয়ে রুটি খা! তারপর ছেলেকে ভজিয়ে রেসাইদারকে আর একে তাকে কিছু কিছু দর্শনী দিয়ে খুশী রাখে।

টাকা নিয়ে খুদাবক্স সহিসদের খাবার ছুটি দেয়। পরন্তপের শেখানো কায়দায় বাজার থেকে খাসী, মাছ, দুধ, ঘি, সব্জী কিনে ডালা সাজিয়ে রিসালদার মেজর সাহেবকে ভেট লাগায়। তাঁর সন্তুষ্টিতে কিছু প্রশ্রয় মেলে। তারই জোরে অল্প-স্বল্প গল্প করে ফৌজের সঙ্গে। কাছাকাছি গাঁ যাদের, তাদের চিঠিও কখন পৌঁছে দেয়।

শেরশাহী সড়ক বিশ্রাম জানে না। বাদশাহ শের শাহ, যাঁর মতো শাসক দিল্লীর সিংহাসনে বসেনি, তাঁর অক্ষয় কীর্তি এই বিশাল সড়ক। গোটা উত্তর হিন্দুস্থানে আর তফাৎ রইল না, সব দেশে দেশে যোগাযোগের সেতু বাঁধল এই পথ। পাশাপাশি গাঁয়ের ঠাকুর সাহেব বা তালুকদার যখন কীর্তি অর্জন করতে চায়, এই পথের ধারে তারা গাছ বোনে, সরাইখানা বসায়, ইঁদারা খুঁড়ে দেয়, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে জলসত্র খোলে। তাপিতকে ছায়া দাও, তৃষ্ণার্তকে জল দাও, পরিশ্রান্তকে দাও রাতের মতো আশ্রয়। ধর্ম হবে, পুণ্য হবে, মুক্তি পাবে।

এদিকে কোন অতন্দ্র-জাগর মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে এই পথ, চলাচল সেখানে থামে না। কোম্পানী বাহাদুরের ডাক আসে, ঘোড়ার পিঠে, গাড়ী ক'রে, রাণারের কাঁধে। কোন রেজিমেণ্ট কুচকাওয়াজ ক'রে চলে। রিসালা রেজিমেণ্টের শত শত ঘোড়া, ইংরেজ অফিসারের ঘোড়া, ভারতীয় অফিসারের ঘোড়া, মালবাহী টাট্টু ও অশ্বেতরের পিঠে তাঁবু, রসদ, পোষাক, উটের পিঠে রসদ, অনেক মানুষ ও জন্তুর পায়ের শব্দে একটা জীবন্ত ঝড় চলেছে বলে বোধ্ হয়। কখনো ইংরেজ অফিসার পরিবারবর্গসহ স্থানান্তরে চলেন। সাহেবদের সঙ্গে কোন কোন উৎসাহী মেমসাহেবও ঘোড়ার পিঠে চলেন। কখনো তাঁরা চলেন পাল্কীতে। মেম সাহেবের আয়া, দাসী, ছেলেমেয়েদের আয়া, দাই, সাহেবের খানসামা, আবদার, খিদমৎগার, বাবুর্চি, মেটবাবুর্চি, মশালচী, ধোবি, ইস্ত্রীওয়ালা দর্জি, জোরিয়া, সর্দারবেয়ারা, মেটবেয়ারা, পাংখাবেয়ারা, মুর্গীওয়ালা, মালী, কুলী, কোচ্ম্যান, সহিস, ঘেসেড়া, ভিস্তি, বঢ়াই মিস্ত্রী, চৌকিদার, দারোয়ান, চাপরাশী, সবাই পেছনে পেছনে চলে সারি সারি গরুর গাড়ীতে। টাট্টু বা উটের পিঠে চলে আসবার ও রসদ। কখনো তীর্থযাত্রায় চলেন কোন রানীসাহেবা। সারিসারি ঘোড়া আগে আগে চলে, পাল্কীতে চলেন রাজপরিবারের বধূ ও কন্যারা। পুরুষরা কখনো পাল্কীতে, কখনো ঘোড়াতে চলেন। দাস, দাসী, আশ্রিত, পরিজন, গরুর-গাড়ী, পাল্কী, ডুলি, সে যেন একখানা নগর চলেছে শোভাযাত্রা ক'রে। কখনো আসে গ্রামের বিয়ের যাত্রীরা। লাল জামা, কাপড়, পাগড়ীতে সাজানো বালক-বরকে সামনে নিয়ে বাবা ঘোড়া বা উটের পিঠে বসে মিছরী ও মোরব্বা বিতরণ করতে করতে চলে, বাজনা বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা যায়, পাল্কীতে বসে নথ ও হলুদরঙের কাপড়-পরা বালিকা-বধূ কাঁদতে থাকে। তাকে সান্ত্বনা দেয় বৃদ্ধা দাসী।

আবার কখনো মহাযাত্রার পথিকদেরও দেখা যায়। নদীতীরে দাহ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে চায় না বলে দূর দূর গ্রাম থেকে ডোলা সাজিয়ে, লাল রেশমী কাপড়ে ঢেকে প্রিয়জনকে বয়ে আনে মানুষ। রাম নাম উচ্চারণ ক'রে ক'রে প্রতি পদক্ষেপে শুধু শ্মশানই নয়, স্বর্গকেও যেন কাছে টেনে আনে।

রাহী চলে, কিষাণ চলে, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ চলে, জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সবাই চলে এই পথ দিয়ে।

বহু মানুষের পদচারণায় পথ হয়েছে তীর্থ। সেই তীর্থের এক পাশের চুণারীক হলুট আস্তে আস্তে সকলেরই পরিচিত হয়ে ওঠে। কেউ বিশ্রাম করে, কেউ কিছু খাদ্য চায়, কেউ অর্থ চায়, কেউ আসে নিছক গল্প করতে ও সময় কাটাবার জন্যে।

যখন কাজকর্ম থাকে না, তখন পরন্তপ আর খুদাবক্স মাঝে মাঝে চুণারীকিতে মাছ ধরতে যায়। একটু এগিয়ে গেলে শিকারও মেলে। কিন্তু শিকারে খুদাবক্সের উৎসাহ আসে না। মাঝে মাঝে পরন্তপ বলে,—কি খুদাবক্স, দিনগুলো ঝুলে যাচ্ছে নয় কি? একটু জোস্ লাগিয়ে দেব?

হৈ চৈ বাধাবার ক্ষমতা তার অপরিসীম। রাস্তা থেকে একদল ভানুমতীর খেল্ যোগাড় করে, সহিসরা কাছাকাছি চুণারীক গাঁয়ে খবর দেয়। তামাশা লাগাবে হলুটের সামনে, খবর পেয়ে ভীড় জমে যায় চট্পট্। ভানুমতীর খেল্, বাঁশবাজী, ভাল্লুক নাচ, বা মুরগীর লড়াই, সবতাতেই মাঝখানে বসে বিচারক হয় পরন্তপ আর খুদাবক্স। টাকা ইনাম দেয়, কখনো কাপড়ও দেয়, তারপর উদার ভাবে মিষ্টি বিতরণ করে।

এইসব বিষয়ে সবচেয়ে আগে ছুটে আসে লখিয়া। চুণারীকির গয়লাদের মেয়ে সে। বিয়ে হয়েছে, স্বামী নেয়নি, এমনি কোন গোলমাল আছে। রঙ কালো, স্বাস্থ্য সুন্দর, বয়স বড়জোর পনেরো হবে। গাঁয়ের অনেক ছেলেই লখিয়ার মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত। সেই মনোযোগ পেয়ে লখিয়া খুব আত্মসচেতন হয়েছে। পরন্তপ বলে,—তুমি ওকে ঘায়েল করেছ খুদাবক্স। খুদাবক্স হেসে উড়িয়ে দেয় পরন্তপের কথা।

ভোরবেলা গাছের ফল, সব্জী ডালায় ক'রে হলুটে বেচতে আনত লখিয়া। একবার মাছ ধরতে গিয়েছিল খুদাবক্স একা, তখন তাকে খুব সাহায্য করেছিল লখিয়া। কলকণ্ঠে গল্প করেছিল, মাছ বয়ে নিয়ে ফিরেছিল চার ঘণ্টা ধরে। পরদিন স্নান করতে গিয়ে খুদাবক্স দেখে, তখনো বসে আছে লখিয়া। বলল,—আজ মাছ ধরবেন না হুজুর? খুদাবক্স না বলাতে মনে হয়েছিল যেন আশাহত হল লখিয়া। কিন্তু তারপরই তার ঘন ঘন আনাগোনা বেড়ে গেল হলুটে। কখনো মধু নিয়ে আসে, কখনো আনে পাকা কলা। কখনো এমনিই গল্প করতে আসে। ময়লা হলদে ঘাঘরীটা বিছিয়ে বসে। বলে,—কি করছ, এখানে একলা কেন থাক, তোমার ঘর আছে কি নেই, কখনো বলে, একটা কিস্সা শোনাও।

ক্রমে সন্দেহ হল খুদাবক্সের। আরো তাকে সচেতন করল লখিয়ার ভাই দুখ্রী। তিন ছেলে মরে গিয়ে সে হয়েছে, তাই তার নাম দুখ্রী। খুদাবক্সের খুব ভক্ত এই পনেরো ষোল বছরের কিশোরটি। সে বলল,—খাঁ সাহেব, লখিয়ার সঙ্গে আপনি কথা বলেন, তাতে কি মনে মনে মেনেছে লখিয়া কে জানে, তাকে নিতে আসবে শ্বশুরঘর থেকে শুনেই কান্নাকাটি করছে। আমার আর এক বহিন্কে বলেছে ও গাঁয়ে গেলে আপনাকে দেখতে পাবে না, তাই সে যাবে না।

শুনে স্তম্ভিত হয় খুদাবক্স। পরন্তপ ত' তাকে বকে বকে কিছু রাখল না। বলল, —তুমি একটা পয়লা নম্বরের বুদ্ধু। আমার বুড়ো ঘোড়াটারও তোমার চেয়ে বুদ্ধি আছে।

খুদাবক্স বলল,—একেবারে বাচ্চা মেয়ে পরন্তপ, কি বলছ তুমি!

পরন্তপ বলল,—খুদাবক্স, তুমি নিশ্চয় কোন আঠারো বছরের ফাঁদে পড়েছ, তাই ওকে বলছ বাচ্চা মেয়ে! গাঁয়ের মেয়ে, পনেরো বছর বয়েস, সে হল বাচ্চা? কোন্ সহরের মানুষ

হে তুমি?

সত্যি কথা। খুদাবক্স মানল তার যুক্তি। পরদিন কোন কাজে গাঁ থেকে ফিরতে ফিরতে দেখে পথের বাঁকে লখিয়া দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার। তারপর কয়দিন একেবারে এড়িয়ে চলল লখিয়াকে। একবার বিন্দ্‌কীতে থেকে গেল দিন দশেক। এসে জানল লখিয়া চলে গেছে। পরন্তপ বলল,—খুব কেঁদে-কেটে তবে গেছে লখিয়া। শুনে দুঃখই হল খুদাবক্সের। সেই নিতান্ত সরলা গ্রাম্য মেয়েটি তাকে নিশ্চয় মনে রাখবে না উত্তরকালে, তবু খুদাবক্স—অজানিতে হলেও তার মনোকষ্টের কারণ হয়েছে, সেজন্য নিজেকেই সে অপরাধী মনে করল।

একবার টিকমগড় থেকে বেশ কিছু টাকা আনল পরন্তপ। গাঁয়ের মাতব্বরদের সংগে পরামর্শ ক'রে জোয়ানদের খেলা লাগিয়ে দিল। সাতদিন ধরে আজ ভেড়ার লড়াই, কাল মুরগীর লড়াই, ঘোড়দৌড়, বর্শা, তীর আর ভাল্লার জোর, পাল্লাছুট, এইসব নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। পরে প্রবীণ বিচারকের মতো জোয়ানদের, তরোয়াল, পাগড়ী, বর্শা এইসব ইনাম দিল পরন্তপ।

এতে ইজ্জত বেড়ে গেল রিসালা হল্‌টের। গাঁয়ের ছেলেদের সহযোগিতা মিলল। মাতব্বররাও খুদাবক্স আর পরন্তপকে নিজের লোক বলে মেনে নিল। সাপে কামড়ালে কি করতে হবে, কার মেয়েটা ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে, কৃপাদয়ালের গোঁড়ালেবুর গাছটা ইন্দ্র মিশির প্রয়োজনে কেটে ফেলতে পারে কিনা, কলিযুগ পূর্ণ হলে রামচন্দ্র আবার আসবেন কিনা, কালিয়া কাহারের মোষটা বিক্রী হবে কি রাখা উচিত, এইসব প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনাতে প্রায়ই পরন্তপ মধ্যস্থ হয়। ছোট ছেলেমেয়েরাও নানারকম আরজি নিয়ে আসে। খুদাবক্সের মধ্যস্থতায় দশদিনের বিবাদ মিটিয়ে সুলতান ও রাজু খরগোসের সংগে কাকাতুয়া বিনিময় করে বন্ধুত্ব করে। ছয় বছরের সোনা ও সাত বছরের পঞ্চীর পুতুলের বিয়েতে পরন্তপ পুঁতির মালা এবং মিঠাইএর বন্দোবস্ত করে। প্রয়োজনে খুদাবক্সকে পাখী ধরবার ফাঁদ, ঘুড়ির লাটাই এবং তীরধনুক বানিয়ে দিতে হয়। ঘোড়াও চড়াতে হয়। একদিন দুপুরে খুদাবক্স দেখে—তিন বছরের লছ্‌মনকে পিঠে বসিয়ে পরন্তপ ঘোড়া হয়ে ঘুরছে। খুদাবক্সকে দেখে উঠে দাঁড়াল পরন্তপ। বলল,—তিনদিন থেকে ঝামেলা লাগিয়েছে। তারপর দু'জনেই হেসে ফেলল।

বাইরের কোন ঘটনা ছাড়া এমনিতে রিসালা হল্‌টের জীবন চলে নিজস্ব একটা ছন্দে। ঘোড়াগুলো শেষরাত্রিতে ছুট করিয়ে আনে সহিসরা, নতুন বেয়াড়া ঘোড়া হলে খুদাবক্স নিজে তাকে তালিম দেয়। ফৌজের ঘোড়া, তাদের দলাইমালাই করা, তাজা ঘাস আর দানা খাওয়ান, এ সমস্ত তত্বাবধান করে খুদাবক্স। রোদ উঠতে না উঠতে তার সহিস রহিমবক্স দুধ গরম করে আনে। চূণারকি নদী পেরিয়ে যারা সড়ক ধরে ফেরি নিয়ে যাবে, তাদের ধরে ধরে সওদা করে পরন্তপ। সহিসদের জন্যে, তার ও খুদাবক্সের জন্যে। ইতিমধ্যেই নীচে চারপাই পড়তে থাকে, আর তাদের এখানে অতিথিরা আসতে সুরু করে। সরকারী ডাক পিয়ন, তীর্থযাত্রীদের কেউ কেউ, কখনো কোন সাধু সন্ন্যাসী, দূর থেকে রিসালা হল্‌টের দোতলা কুঠিটা দেখে সোজা চলে আসে। শালগাছের খুঁটির ওপর ঘর দু'খানাকে ইতিমধ্যে রং করেছে পরন্তপ। মেরামত করিয়েছে কারিগর ডেকে। অতিথিদের কাউকে পানীয় জল দেয়, কেউ চায় ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশ, কেউ আসে নিছক প্রার্থী হয়ে। একবার বৃষ্টি হতে সন্ধ্যেবেলা এল এক বাজিওয়ালার দল। একটা ভাল্লুক, একজোড়া

রামছাগল, একজন বুড়ো লোক, আর একটি তরুণী। দুইদিন থাকল তারা। বৃদ্ধটির শরীর রোগে জীর্ণ, মেজাজ তিক্ত। মেয়েটি তাকে যে কত রকমে সেবাযত্ন করল। পাছে খুদাবক্সদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, সেজন্য সে হাত জোড় করেই থাকত। যাবার সময়ে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল। বলে গেল, এ আমার স্বামী। একসময়ে খুব শক্তি ছিল, ভালো খেলা জানত, এখন একটু কমজোরী হয়ে পড়েছে।

তাদের দেশ না কি কোথায় কোন দূরে, হায়দ্রাবাদ জিলাতে। দেশঘর ছেড়ে অনেক দূরে অন্য মানুষের মধ্যে, অন্য জায়গায়, একটি তরুণী তার বৃদ্ধ স্বামী, একটা ভাল্লুক ও একজোড়া ছাগল নিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, এই ছবিটার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা খুদাবক্সকে স্পর্শ করেছিল।

প্রতি সন্ধ্যায় বাতি জেবলে চশমা নিয়ে বসে পরন্তপের চাকর প্রভুদয়াল সুস্বরে তুলসীদাস পাঠ করে—যবসে রামচন্দ্র রাজসুখ ছোড় গেই—

সেই সময়টা পরন্তপ ও খুদাবক্স খুব শ্রদ্ধা ভরে শোনে। প্রভুদয়াল ভক্ত মানুষ। বলে,—শুনছেন যখন, চৌহানজী, হাতে তামা ও তুলসী নিয়ে বসুন। কিছু খেয়াল ত' রাখুন। তার কথা শোনে পরন্তপ।

দিন চলে যায়। হৈমন্তিক শস্যসম্পদ কবে শীতের রিক্ত বৈরাগ্যে পরিণত হয় তার হিসাব রাখে না খুদাবক্স। শীতের পরে পুনর্বার বসন্তের সূচনায় ধীরে ধীরে মধ্যাহ্নের বাতাসে উদাস সুর লাগে, গাছগুলো সাজে নবকিশলয়ের ভূষণে। এই প্রত্যেকটি দিন তার কাছে মোতির স্মৃতি দিয়ে ভরা। এমনি একদিনে মোতিকে দেখেছিল খুদাবক্স, সে কবেকার কথা হবে? অনেকদিন। এখন যখনই তার সময় মেলে, সেই কথা, সেই গান মনে মনে নাড়াচাড়া করে। একটি নামই ব্যথা ও আনন্দে গুঞ্জরণ করে তার মনে।

এমনি এক সময়ে, একদিন সন্ধ্যা যখন তার কুয়াশার উত্তরীয় পরিহার ক'রে, বসন্তের মধুর আবেশ গায়ে জড়িয়েছে, তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বটগাছের তলায় শিবলিঙ্গের সামনে ঘিয়ের প্রদীপটির এক ফোঁটা আলো দেখতে দেখতে খুদাবক্সের মনে হয়, একজন পথিক যেন ঘোড়ার পিঠে তারই ডেরার দিকে আসছে। কে হতে পারে? চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা তার মনে হয়, এই লোকটি তার একান্ত পরিচিত। বারান্দার নীচে এসে সে যখন দাঁড়ায় তখন তার সহিস প্রশ্ন করে—কি আরজি? খুদাবক্স শোনে—খুদাবক্স খাঁ সাহেবকে খবর দাও কি ঝাঁসীর বাহ্‌রাম খাঁ তাঁকে মিলতে চান। নেমে আসে খুদাবক্স। বাহ্‌রামও ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে। দু'জনে সোল্লাসে দু'জনকে আলিঙ্গন করে। সহিস ঘোড়া নিয়ে যায় ওপাশে।

দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে কথা হয়। তন্দুরী রুটি আর কাবাব দিয়ে অভ্যর্থনা করে বন্ধুকে খুদাবক্স। বলে,—কাল আমার ঝর্ণা থেকে মাছ ধরে খাওয়াব।

আলো মাঝখানে রেখে দু'জনে বসে। বাহ্‌রাম বলে,—তোমাকে ধরবার জন্যে কত খোঁজ করেছি। শেষে টিকমগড়ে পরন্তপের সঙ্গে দেখা হল। নিশানা ক'রে আসছি। অনেক কথা আছে দোস্ত। পহেলা কথা শোন। ঝাঁসী চলে গেছে অংরেজের হাতে। কত কি যে হয়ে গেল খুদাবক্স তুমি কিছুই জান না। তারপর বাহ্‌রাম বলে,—তুমি বড় ভুল করেছ খুদাবক্স। সবচেয়ে বড় ভুল করেছ, চলে এসে।

এ প্রসঙ্গ খুদাবক্স তুলতে নারাজ। কিন্তু তার বারণ শোনে না বাহ্‌রাম। বলে,—এ কথা বলে যদি তুমি চিরদিনের মতো সম্পর্ক কাটিয়ে দাও, তাতেও আমি আপত্তি করব না।

কিন্তু শুনতে তোমাকে হবেই। আরো বুঝবে তুমি ওস্তাদের খত্ পড়লে।

ঘোসের চিঠি! কম্পিত হাতে সেই চিঠি খোলে খুদাবক্স। শিষ্টাচার ক'রে তাকে সহস্র আশীর্বাদ জানিয়ে ঘোস লিখেছেন, খুদাবক্সের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। নিজেই আসতেন তিনি, কিন্তু বড় দুর্দিন আজ। বাঙ্গি সাহেবের অবস্থা শোচনীয়। নগরীর ওপরে দুঃখের ছায়া। কেল্লার ওপরে উড়ছে কোম্পানীর পতাকা। তাঁরই প্রাণাধিক প্রিয় কামান-গুলি ইংরেজের সম্মানে গর্জন করেছে—তা-ও তাঁকে শুনতে হয়েছে, আরো শুনছেন ইংরেজের মহারানীর জন্মদিনে কেল্লাতে বাতি দিয়ে সাজাতে হবে। এই দুর্দিনের পটভূমিকায় তিনি নিজে আসতে পারলেন না। কিন্তু খুদাবক্স কি একবার আসবে না? অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, আল্লার বিধানের উপর টেক্কা দিতে গিয়ে তিনি তার ও আর একজনের জীবন নষ্ট করেছেন। আজ মনে করছেন, ভুল সংশোধন করবার সময় বয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁর মিনতি—

চিঠিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল খুদাবক্স। তারপর সযত্নে সেটাকে ভাঁজ ক'রে বুকের পকেটে রাখল। বাহ্‌রাম বলল,—সেদিন ওস্তাদের অনুরোধে তোমার ভালোর জন্যে, তোমাকে ঘা দিয়েছিল মোতি। তুমি যদি তাকে দেখতে খুদাবক্স, কতদিন গেল পাগলের মতন। শুনেছি খায়নি, কারো কথা মানেনি, কতদিন তানপুরা কি ঘুঙুর ছোয়নি, শুধু কেঁদেছে। তারপরে সে মানুষও একেবারে বদলে গেছে। এমন বদলে গিয়েছে যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। ভজনের পাঠ নেয় চন্দ্রভাণজীর কাছে। বাঙ্গি সাহেবকে গান শোনায় কখনো কখনো। ওস্তাদের ওপরে আগে বড়ই রাগ করেছিল, কিন্তু এখন তাও মেনে নিয়েছে। ওস্তাদের সঙ্গে তার দেখা হয়। শুধু তোমার কথা, তোমার ধ্যান নিয়ে বেঁচে আছে। তুমি একবার চল।

খুদাবক্স ঘাড় নাড়ে। তা হয় না। বলে, পরন্তপ আমার ওপর হল্‌ট ছেড়ে দিয়ে টিকমগড় গেছে। দুই মাসের আগে সে ফিরবে না, আমি যেতে পারব না এখন। আর কি জান, মনে হয় কত দিন কেটে গেছে, অন্যরকম হয়ে গেল হালচাল, এখন একেবারে ভাঙা জলসায় গিয়ে যদি দাঁড়াই, তবেই কি আবার বাতি জ্বলে উঠবে আর গাওনা সুরু হয়ে যাবে? যদি প্রাণমনেও চাই, তা'হলেই কি আগেকার মত সব হবে?

বাহ্‌রাম বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে জানায় না, তা হতে পারে না।

খুদাবক্স বলে,—ওস্তাদকে আমি খত লিখে দেব, আর তুমি এই খবরও পেঁছে দেবে, যে আমিও কম অপরাধ করিনি, কষ্ট দিয়েছি, কষ্ট পেয়েছি, এখনো আমি তৈরি নই বাহ্‌রাম। সময় হলেই যাব, যখন ছুটি মিলবে, যখন সময় হবে।

বাহ্‌রাম বলে,—আর কখনো সময় হবে খুদাবক্স? যে দিন চলে গেল তাকে আর কখনো দেখতে পাব?

অতীত মাত্রেই মধুর। যে দিনটা চলে গেছে, সেটাই যেন ভাল। বাইশ টাকার সওয়ার বাহ্‌রাম, ছোট একটা রাজ্যের ছায়াতলে বাস করেছে। তবু সেও অতীত জামানার কথা স্মরণ করে কাঁদে, যে রাজার সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক ছিল না, সেই রাজার মৃত্যুতেই অসহায় বোধ করে। খুদাবক্স একটু করুণ হাসে। বলে,—না বাহ্‌রাম, তা কখনোই হয় না। তারপর বলে,—ওস্তাদকে খত্ আমিই লিখে দেব। সেই খত্ দিও, আরো বলো যে, সময় হয়েছে জানলেই আমি আসব। তুমি এখন থাকবে ত?

বাহ্‌রাম বলে,—কাল ত' আমাকে যেতেই হবে খুদাবক্স। আমাদের ত' চাকরী ছেড়ে গেল। বাট্টা, ভাতা, সব নাকি দুই মাসের ক'রে হাতে হাতে মিলবে। ঝাঁসীতে এখন

ফৌজ আসবে বাইরে থেকে, জানো ত'? হল্‌টে ত' আছ, ফৌজী ছাউনীর কিছু খবর রাখ?

—কি খবর?

—কি রকম দেখছ? ওখানে ত' আমরা হরদম শুনতে পাই, এদিকে ওদিকে ফৌজ নাকি কোম্পানীর ওপর খুসী থাকছে না।

—কে জানে ভাই। খবর কত উড়ে আসে, দেখবে সব সত্যি নয়।

—না, সত্যি হতেও পারে। কেন কি, আমার মৌ, সাগর, আগ্রা, অনেক জায়গার খবর পাই। শুনি নানারকম গোলমাল চলে ছাউনীতে। কিছু যদি সত্যি না থাকবে ত' এত কথাই বা উঠবে কেন?

খুদাবক্স জবাব দেয় না। বলে,—তুমি আরাম কর বাহ্‌রাম। আমি ওস্তাদকে খত্‌ লিখি।

কম্বল টেনে আরাম ক'রে শুয়ে মুখের কাছের জানলাটা খুলে দেয় বাহ্‌রাম। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসে। বাহ্‌রাম বলে,—এইরকম একটা ডেরা পেলেই বিয়ে করি আমি। বৌ ওখানে বসে রান্না করে আমি তার সঙ্গে গল্প করি। বাড়ীর সামনে ঝারা বাঁধি, একটা যুঁইফুলের গাছ উঠিয়ে দিই।

—পরমেশ্বর আহীরও এইরকম কথাই বলতো।

—আরে ভাই বলবে, দিল্‌দার মানুষ হলেই এই কথা বলবে। আর কথা কি আছে বল?

—তাও ঠিক।

বাহ্‌রাম ঘুমিয়ে পড়লে পরে খুদাবক্স কলম কাগজ ধরে। প্রথমে ঘোসের কাছে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারো ওপর আর কোন অভিযোগ তার নেই। তার জীবনে যা যা ঘটল, সব কিছুর জন্যে কেউ দায়ী নন। এই কথা রাগ ক'রে সে বলছে না, এ তার অন্তরের কথা। সে কথা ঘোস নিশ্চয় বুঝবেন। তাঁর চিঠিতে খুদাবক্সের অন্তরের পোষিদায় যে কথা দুঃখে ঘুমিয়েছিল তাই জেগে উঠল, আর আজ খুদাবক্স বুঝছে যে সে জখম আরাম হয়নি। খুদাবক্স এখন যেতে পারবে না কেন, তার আপাত কারণগুলো বাহ্‌রামই বলবে। আরো কথা আছে যে, আবার যদি সে ফেরে ত' রাজার মতো যাবে, যাতে আবার ফিরে আসতে না হয়। সেই একজনকে যেন ঘোস বলেন, খুদাবক্স তার কথা ধ্যানে ধরে এখানে ওখানে ভেসে একটু মাটি পেয়েছে, একটু দম নিচ্ছে, এখনই সে যেতে চায় না। যেতে চায় না এই জন্যে যে, তার এখনো সময় হয়নি। দুর্লভ সৌভাগ্য লাভের সুকৃতি তার ছিল না, তাই হয়ত ভালো বুঝেই ভাগ্য তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল সেই সময়ে। এখন সে বোঝে, সেই একজন যেমন করে নিজেকে ভেঙে ভেঙে গড়ছে, তেমনি খুদাবক্সও ব্যস্ত আছে। একই আশাকে সে সযত্নে লালন করছে মনের গোপনে, নতুন ক'রে নতুন আসরে তাকে বরণ করবে। সেইজন নিশ্চয় তার ভাষা বুঝবে, কেননা সে ত' জানে খুদাবক্স কিষাণ। একটি অংকুর বুনে, সেই গাছের ফল পাবার আশায় যারা সারাজীবন পরিশ্রম করে, তাদেরই সে একজন। সেই দুর্লভ জনের সাধনই সে করছে। এইসব কথা ঘোস তাকে বললে সে বুঝবে নিশ্চয়। সে বুঝেছে জানলে, খুদাবক্সও শান্তি পাবে। আজ বোঝে খুদাবক্স, খোদা যা করলেন তা মঙ্গলের জন্য। ঘোসকে তিনি শান্তিতে রাখবেন, তাকে দেবেন ধৈর্য।

চিঠিটা শেষ ক'রে খুদাবক্স সযত্নে ভাঁজ করে। কাপড়ের খাপের ভেতর বন্ধ ক'রে মুখে গালা দিয়ে মোহর করে।

বাহ্‌রাম ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্ত হয়ে। পাশের ঘরে গিয়ে খুদাবক্সও শুয়ে পড়ে। মাথার কাছের খোলা জানলা দিয়ে বাতাস কতদূর থেকে বয়ে আনে ঢেউয়ের পর ঢেউ। এই বাতাসে স্বপ্নচারিণী হয়ে আসে মোতির প্রেম। কোন গান যেন গাইত মোতি—'কৈসে বীতাউঁ দিন রাতিয়া—' বলত, হে প্রিয় তুমি যদি চিঠি না পাঠালে, তবে কেমন করে আমি দিন ও রাত কাটাব। তাইত' সেও ভেবেছিল, কিন্তু দেখ, কেমন ক'রে কতদিন কেটে গেল।...নসীব বড় খেলাই খেলল খুদাবক্সের সঙ্গে। ছয় মাস আগেকার মন হলে, খুদাবক্স এখনি চলে যেত। কিন্তু বারবার ভালবাসতে গিয়ে হারাল, আর সব দিক থেকে বাঁধন খসেই পড়ল, তাই তার আবার ফিরে বাঁধন জড়াতে ভয় হয়। মনে হয় সময় হয়নি। মনে হয়, একবার ত' দেখলাম লোভীর মতো দুই হাতে ধরে, বুকের কাছে রেখে অন্ধ হয়ে। তাতেও ত' চলে আসতে হল। রক্তাক্ত হৃদয় ভেঙে-চুরে গেল। এবার তাই বিশ্রাম নিচ্ছে খুদাবক্স। আবার যাবে, কিন্তু এবার আর বৃথা সময় বইয়ে দেবে না। একটু দেরী হচ্ছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই। কোথা থেকে যেন বিশ্বাস এসেছে, এতে কোন ক্ষতি হবে না। বিশ্বাস যে এসেছে, তাই কি সে আগে বুঝেছিল?

ক্ষমা করবার কথা ভেব না মোতি। তুমি ত' জানো তোমার ওপর আমার কোন অভিমান থাকতে পারে না। এ কথা আজ, এখন যেমন বুঝছি, আগে তা' বুঝিনি। অভিমান হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু সে দিনও পেছনে রেখে এসেছি। আমার মনে তুমি আর তুমি নেই মোতি, আমার সঙ্গে এক হয়ে গেছ। তোমার প্রেম আঘাত করেছিল, আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে ঠেলে পথের পথিক করেছিলে। মোতি, সেই থেকে আমার অনুভূতিতে দুনিয়াটা বড় হয়ে গেছে। এখন মনে হয়, অনেক বড় আমার ঘর, আমার আপন মানুষও অনেকজন। আমি ছিলাম কিষাণ আর তুমি ছিলে নটী, দুই দুনিয়া ছিল আমার আর তোমার। ভাবতাম প্রেম দিয়ে সেতু বাঁধব। সেই সেতুতে দাঁড়িয়ে ভালবাসব। আজ আমাকে তুমি প্রেমিক করেছ, অনেক বেশী ভালবাসতে শিখিয়েছ দুনিয়াকে। এক বিশাল ঘরে আমি বাস করি, এক মস্ত আঙিনায় তোমার পথ চেয়ে থাকি। তুমি সেখানে যেমন ক'রে চাও, তেমনি ক'রে এসো, বরণ ক'রে নিতে বাধ্‌বে না।

এই আকাশ তোমার আমার চন্দ্রাতপ, এই বাতাসে তোমার সৌরভ পাচ্ছি, তুমি বিশ্বাস করো, তোমার পায়ের ঘুঙুরের শব্দ আমি সব সময় শুনি। শুনি তুমি আমার ঘরে আসছ সেই মঞ্জীর বাজিয়ে।

তুমি শুনিয়েছিলে, বিনা প্রেম্‌সে ন মিলে নন্দ্‌লালা—বিনা প্রেমে ত' কিছুই মেলে না। আমার হৃদয়ে তুমি সেই প্রেম দিয়েছ।

এই প্রতীক্ষা কষ্টকর। কষ্ট হোক, অপেক্ষা করো, তুমি চাও, তোমার চাওয়া আর আমার চাওয়া যেদিন অমোঘ হয়ে উঠবে সেদিন আর দূরে থাকতে পারবে না। আপনা থেকেই সব এক হয়ে যাবে, আর আমরা মিলবই। সেদিন জেনো কোন বিচ্ছেদই আর থাকতে পারবে না।

[আগামীবারে সমাপ্য]

সাহিত্যিক স্মৃতি ও বর্তমান সমস্যা

আঁদ্রে জিদ

[এই রচনাটি আঁদ্রে জিদ ১৯৪৬ সালে সাহিত্যসভার ভাষণ হিসেবে লেখেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে ফরাসী সাহিত্যধারা সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি ও অভিমত এই ভাষণে তিনি ব্যক্ত করেন। তাঁর বয়স তখন ৭৭ বছর। তিনি মারা যান ১৯৫১ সালে।—অনুবাদক]

সাহিত্যিক স্মৃতি, বর্তমান সমস্যা—বিষয় দুটো প্রথমে মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখলাম তারা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, ওতপ্রোত। কারণ সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে—প্রায়ই যা মর্মান্তিক—অতীত আলোকিত হয়। তাই বর্তমানের শিক্ষার সন্ধানে আমি প্রথমে কিছু স্মৃতিকথা ব'লে নেব।

বছর আঠার বয়স থেকেই একজন যুবক লিখতে চায়। ক্লাসে সে শুনেছে এবং তার বিশ্বাসও জন্মেছে যে, ভালো ক'রে লেখার মানে হল প্রথমে ভালো ক'রে অনুভব করা এবং ভালো ক'রে চিন্তা করা। লাব্রুইয়ের-এর *Caractères*-এ সে পড়েছে : "বই লেখা একটা কাজ" অথবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে : এমন একটা জিনিষ যা শিক্ষা করা যায় এবং শিক্ষা করতে হয়।

চিত্রশিল্পীরা কোনো খ্যাতিমান গুরুর শিল্পালয়ে যান শিক্ষানবিশি করতে। কিন্তু নবীন সাহিত্যশিল্পী কোথায় যাবে?

পিয়ের লুই আর আমি ছিলাম সহপাঠী। আমরা সানন্দে আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের দু'জনের রুচি হুবহু এক না হলেও অন্তত কাব্যের প্রতি অনুরাগ সমান। লুই আমার চেয়ে উদ্যোগী বেশী, বেপরোয়াও। স্বেচ্ছায়ই আমি তাকে আমায় টেনে নিয়ে যেতে দিতাম।

সে আমায় টেনে নিয়ে গেল মালার্মের বাড়ীতে।

মালার্মে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় র্যু দ্য রম-এ তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটে বৈঠক করতেন। এ বৈঠকের কথা অনেকেই অনেকবার বলেছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আবার বলতে আমার দ্বিধা হওয়ার কথা। বলছি একটা কারণে। আমার উদ্দেশ্য তাঁর মূর্তির কয়েকটা লক্ষণ তুলে ধরা, তাঁর শিক্ষার এমন কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা যা আজ দূর থেকে আমার মনে হয় খুব উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে এই কারণে যে, তখন যা কিছু দেখা যেত এবং এখন যা কিছু দেখা যায় শোনা যায় বা করা হয় তা থেকে তা পৃথক।

মালার্মের গৃহের অভ্যন্তর এবং তাঁর নিজের চালচলন যৎপরোনাস্তি অনাড়ম্বর। কঁদরসে স্কুলে ইংরিজি পড়িয়ে তিনি যে মাইনে পেতেন তা দিয়ে বিলাসিতা চলত না; কিন্তু তাঁর সব কিছুতেই অপূর্ব রুচির পরিচয় ছিল। যে ছোট্ট খাবার ঘরটিতে তিনি আমাদের বসাতেন সেখানে আটজন, বড় জোর দশজন আঁটত। আগন্তুকরা টেবিলের চারপাশে বসতেন, টেবিলের উপর আহার্যের জায়গায় থাকত বড় একটি তামাকের পাত্র। কবি নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন মেটে রঙের একটা স্টোভে পিঠ ঠেস দিয়ে। মাদাম মালার্মে ঘর

থেকে চলে যেতেন। তাঁর মেয়ে জর্নাভিয়েভ ঠিক দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যমধুর ভঙ্গীতে নিয়ে আসতেন পানীয়, কোনো কোনো সময় লোক কম থাকলে অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন; কিন্তু কখনো আলাপে যোগ দিতেন না। বলা যায়, একমাত্র মালার্মেই কথা বলতেন। পরে তিনি *Divagations* নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তাতে তাঁর এইসব আলাপের কিছু সঠিক প্রতিফলন পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর, সেই হাসি! ঠোঁটের হাসি নয়, দৃষ্টির। সাধারণত একটা সন্তর্পণ ভঙ্গীর সঙ্গে থাকত নম্র এক হাসি, অবগুণ্ঠিত, যেন ভীরু : তর্জনীটা উঠে আছে প্রশ্নের বা প্রতীক্ষার ভঙ্গীতে। আহা, সেই ছোট্ট ঘরে মনে হত আমরা যেন কতদূরে রয়েছি রু্য দ্য রম থেকে, কর্মব্যস্ত শহরের শূন্যগর্ভ কোলাহল থেকে, রাজনীতিক হট্টগোল, সবরকম স্বার্থান্বেষা আর চক্রান্ত থেকে। মালার্মের সঙ্গে সকলে প্রবেশ করত এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে, যেখানে অর্থ সম্মান করতালি মূল্যহীন হয়ে পড়ত। অথচ তাঁর গৌরবের বিকীরণ ছিল অতি অনাড়ম্বর, অতি সঙ্গোপন। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি আজ জানেন (কিন্তু সে সময়ে আমরা মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বীকার করতাম) যে, মালার্মে আমাদের ক্লাসিক পদ্যকে এমন এক ধ্বনিময় পূর্ণতার, এমন এক রূপগত অন্তর্লীন সৌন্দর্যের, এমন এক মন্ত্রস্বর-ক্ষমতার স্তরে নিয়ে গিয়েছেন যেখানে তা আগে কখনো পৌঁছয়নি এবং আমার বিশ্বাস কখনো পৌঁছবেও না; কারণ আর্টে যা পূর্ণ তাতে আর ফিরে যাওয়া চলে না। যেতে হয় তার বাইরে, খুঁজতে হয় অন্যত্র। সেটাই আসল।

কিন্তু মালার্মের মধ্যে এ ছাড়াও আরো কিছু ছিল। তাঁর মধ্যে থেকে বিকীর্ণ হত একটা তাপস ভাব। এই পৃথিবীর বাইরের এক রাজ্যে তিনি যেন তন্ত্রধারক। তাঁর কথাগুলো ছিল আমাদের মনকে উদ্দেশ ক'রে, আর তাঁর দৃষ্টান্ত স্পর্শ করত আমাদের আত্মাকে—অবশ্য অতি সহজভাবে, কারণ গুরুগিরির কোনো ভাব তাঁর ছিল না। তাঁর কথা দিয়ে এবং তার চেয়েও বেশী তাঁর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি আমাদের শেখাতেন নিষ্ঠা। সত্যিই এক তপস্বীর মতো তিনি আমার কাছে প্রতিভাত। সেই ভাবেই আমি তাঁকে দেখি। এই সংক্ষিপ্ত প্রশস্তিতে আমি কয়েকটা বিশেষ গুণের উপর জোর দিতে চাই যা আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যকে ছাড়িয়ে, কিন্তু যার উপর আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি নির্ভরশীল। এই নিষ্ঠার উপাদান কি ছিল? কতকগুলি নির্বিশেষ, স্পর্শবোধাতীত এবং ঘটনা বা অবস্থা দ্বারা অপরিবর্তনীয় সত্যে বিশ্বাস ও ভরসা। এক অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রতি অনুরক্তি, যে-সত্যের সামনে আর সব কিছু সরে যেত, মুছে যেত, মূল্যহীন হয়ে যেত।

প্রত্যক্ষের প্রতি এই বিরাগ যে কোন্ পরিণামে নিয়ে যেতে পারে তা আমি খুব ভালো ক'রেই জানি। জীবনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবার আমন্ত্রণ ছিল তার। কবি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলছিলেন; সাহিত্যকে তিনি বস্তুবিচ্ছিন্ন অনড় এক জগতে ঠেলে দেবার বিপদ ঘনিয়ে তুলছিলেন। বাহ্যজগতের প্রতি এই অবজ্ঞা—একটা কাহিনী দিয়ে একে পরিষ্কার করি।

সিম্বলিজ্‌ম্ আন্দোলনে তখনো কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি, তখনো পর্যন্ত শুধু কবিতাই লেখা হচ্ছে। সেই উপন্যাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ন্যাচরালিস্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আমি লিখলাম *Voyage d'Urien;* তার তৃতীয় ও শেষ অংশ বেরুল পৃথকভাবে, নাম *Voyage au Spitzberg*। মালার্মেকে দিলাম এই বই, তিনি নিলেন

সামান্য ভ্রূকুঞ্চন সহকারে, নাম দেখে ভাবলেন সত্যিকার কোনো ভ্রমণকাহিনী বুঝিবা। কয়েকদিন পরে আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হলে বললেন, "ওঃ, আপনি আমাকে বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি গিয়েছেন সেখানে!" আর সেই সঙ্গে তাঁর সেই অপরূপ হাসি।

এর অল্পকাল পরেই আমার মনে হল সাহিত্য এবং বাহ্যজগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গত সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আমার *Nourritures Terrestres*-এর ভূমিকায় যা লিখলাম : প্রয়োজন "আবার নতুন ক'রে মাটির উপর খালি পা রাখা।" অবশ্যই এতে ক'রে আমি মালার্মের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। অনায়াসসাধ্যতা সম্বন্ধে, আত্মপ্রসাদ সম্বন্ধে, জীবন ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই যা কিছু আত্মতুষ্ট করে, মনোরঞ্জন করে তার সম্বন্ধে এক পবিত্র বিতৃষ্ণা আমি ধরে রাখলাম মালার্মের শিক্ষা থেকে; ধরে রাখলাম নিজের সম্পর্কে এবং মানুষের সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ আন্তরিকতার এক আপোষহীন অনুরাগ ও প্রয়োজনবোধ; এই অটল বিশ্বাস যে, যাই ঘটুক না কেন, মানুষের মূল্য মানুষের সম্মান ও মর্যাদা যা থেকে সৃষ্ট হয় তার কাছে আর সব কিছু পরাভূত হয়, পরাভূত হতে বাধ্য, তার কাছে আর সব কিছু গৌণ ক'রে রাখা উচিত, দরকার হলে বিসর্জন দেওয়া উচিত।

একটা জিনিষ লক্ষণীয়, যা কেউ যথেষ্টরকম লক্ষ করেছেন বলে আমি জানি না। এই আপোষহীনতা, এই সর্বাঙ্গীণ সত্যানুরাগের পরোক্ষ পরিণাম। ন্যায়বিচারের প্রয়োজন-বোধের সঙ্গে তা ওতপ্রোত। বিখ্যাত দ্রেফ্যুস ঘটনার সময় আপোষহীন ন্যায়বিচারবোধ তার সব চেয়ে উৎসাহী সমর্থকদের পেয়েছিল মালার্মের নিকট ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে থেকেই। সুতরাং আমার এ কথা ভুল নয় যে র‍্যু দ্য রম-এর শিক্ষা শুধু মনকে শেখাত না, আমাদের আত্মাকেও তৈরী করত। সে-শিক্ষা স্মরণ ক'রেই আমি এখন কিছু বলতে চাই সুবিধাবাদ সম্বন্ধে, যার প্রকাশ দেখি "সংগ্রামী সাহিত্যে"র (littérature engagée) আকারে। এখন তার খুব চল।

মালার্মের আমলে "সংগ্রামী সাহিত্যে"র একজন অতি বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন : মরিস বারেস।

তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ছিল, কারণ তিনি আমার প্রথম বই *Les Cahiers d'André Walter*-কে অভিনন্দিত করেছিলেন। বইটা তখনো বারেস-এর প্রকাশক পের‍্যাঁর দপ্তরে গাদা হয়ে পড়ে ছিল। বারেস একটু খুলে চোখ বুলোলেন, যেটুকু পড়লেন তাতেই তাঁর ইচ্ছে হল আমার সঙ্গে পরিচয় করবার। আমাকে খবর পাঠালেন। আমার বয়স তখন মাত্র কুড়ি পেরিয়েছে। বারেস আমার চেয়ে আট বছরের বড়। যুবকদলে তখন তাঁর ভীষণ প্রতিপত্তি, যদিও তখনো পর্যন্ত অল্প গ্রন্থই তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁরই অভিহিত "আমির আরাধনা" নিয়ে যে-উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন শুধু সেগুলিই বেরিয়েছে তখন। তা ছাড়া একা একাই একটা পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি : *Les Taches d'Encre*। তার লেখকও ছিলেন তিনি একা। মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। তাতে বোদলের সম্বন্ধে একটা লেখা পড়েছিলাম। লেখাটা এযাবৎ খুব অল্প লোকেরই নজরে এসেছে। আমার মতে খুব অসাধারণ রচনা, সত্যিই শক্তিশালী। শক্তিমত্তার ব্যঞ্জনা বারেস-এর ছিল সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে, তাঁর অঙ্গভঙ্গীতে, তাঁর গতিভঙ্গীতে, তাঁর উদ্ধত, শ্লেষপূর্ণ ও অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠস্বরে। তাঁর ভাবভঙ্গী অপরকে সঙ্কুচিত ক'রে দিত,

যেমন শাতোব্রিয়াঁর ভাবভঙ্গী করত বলে আমার ধারণা। শাতোব্রিয়াঁর সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল। কিন্তু বারেস ছিলেন আরো দীর্ঘকায়, আরো সুদর্শন, এবং তাঁর সমস্ত সত্তা থেকে একটু অবজ্ঞাসূচক বা উন্নাসিক এক ধরনের কর্তৃত্ব বিকীর্ণ হত, যার কাছে লোকে কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে ভালোবাসত। তিনি মুগ্ধ করতেন, কিন্তু লোকে তাঁর কাছে যেত কাঁপতে কাঁপতে। নিজের চেহারার দিকে তাঁর খুব নজর ছিল এবং সব সময় চমৎকার সাজ-পোষাক করতেন তিনি। সজ্জায় খুব মার্জিত একটা সৌষ্ঠব ছিল এবং সেই সঙ্গে একটা সযত্ন অবহেলা।...তাঁকে দেখলে মনে হত স্পেনীয়। তোলেদোকে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে এল গ্রেকোর আঁকা মূর্তির সাদৃশ্য ছিল।

তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তিনি যখন চিঠি দিলেন, আমার বুক দুরু দুরু ক'রে উঠল। যখন গিয়ে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিলাম তখন তো আরো। প্যারিসের অন্যতম অভিজাত পাড়ায় তিনি থাকতেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন আমার যে-আলাপ হয়েছিল তা আমার পরিষ্কার মনে নেই। আমি তেমন সহজ বোধ করছিলাম না। এবং বারেসও তাঁর থেকে ভিন্ন ব্যক্তিত্বকে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করতেন না। আমার পরিষ্কার মনে আছে এইটুকু : বাইরের ঘরে বসে যখন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম তখন মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম সেই ঘরে থাকে থাকে সাজানো চমৎকার বাঁধানো সব বই। অথচ জনশ্রুতি ছিল এবং বারেসও জাঁক ক'রে বলতেন যে তিনি পড়েন কমই। আমার সামনে সাজানো ছিল বায়রনের এক গ্রন্থাবলী। কি যে খেয়াল হল, তার একটা খণ্ড টানলাম, অমনি সমস্ত গ্রন্থাবলী লুটিয়ে পড়ল। ওগুলো সত্যিকার বই ছিল না, ড্রয়ার ঢাকবার একটা আচ্ছাদন মাত্র। ড্রয়ারটার মধ্যে ছিল (তাড়াতাড়ি আবার বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম) বুরুশ আর সুগন্ধির শিশি।

তখনকার দিনের যুবকদের চোখে বারেস-এর মর্যাদা ছিল অসাধারণ। কারো কারো মনে প্রশংসা ছিল ভক্তি ও আরাধনারই নামান্তর। আমার বন্ধু মরিস কীয়ো (যাকে পরে আমি *Nourritures Terrestres* উৎসর্গ করি) একটা ছোট্ট ঘরে থাকত, গরীব ছাত্রের ঘর। তার মধ্যে সে একটা পুজোবেদীর মতো তৈরী করেছিল, সেখানে আইকনের বদলে ছিল বারেস-এর এক মস্ত বড় প্রতিকৃতি, প্রদীপ জ্বালিয়ে তার অর্চনা হত।

আমার মনে আছে এই মরিস কীয়োরই প্রস্তাবক্রমে (তখন কী তরুণই ছিলাম আমরা!) ভাগাভাগি ক'রে খরচা দিয়ে আমরা স্যাঁ সেভর্যাঁ গির্জায় উপাসনা করালাম বারেস-এর আত্মার শান্তির জন্যে—অবশ্য বারেস মারা যাননি, বিয়ে করেছিলেন।

বারেস পড়তেন কমই। পিয়ের লোতির চেয়ে সামান্য একটু বেশী। তবুও যে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল লোক ছিলেন তার কারণ সেক্রেটারীরা এবং বন্ধুরা তাঁর হয়ে পড়তেন এবং তাঁকে যুক্তি ও উপযুক্ত উদ্ধৃতি জোগাতেন।

তাঁর নিজের মতের পথে যা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ় করতে পারে, এই বিরাট অহংজ্ঞানী শুধু তাই খুঁজতেন বইয়ের মধ্যে, প্রকৃতির রূপের মধ্যে, জীবনের দৃশ্যের মধ্যে। অন্যের সম্বন্ধে একান্তভাবে কৌতূহলহীন ছিলেন তিনি। তাঁর সমসাময়িক যাঁরা পরে নামযশে তাঁর সমকক্ষ হন তাঁদের কারো মূল্য তিনি আবিষ্কার করেননি, এমনকি স্বীকারও করেননি। জ্যুল রনার, প্রুস্ত, ক্লোদেল, ভালেরি, জিরোদু—কারো প্রতি তিনি সামান্য মনোযোগও দেননি।

বারেস-এর সঙ্গে আমার সংযোগ বেশী দিন বজায় রইল না। ১৮৯৭ সালে তাঁর *Déracinés* প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই আমি বুঝতে ও অনুভব করতে আরম্ভ

করলাম, যে-সব মতবাদ তিনি প্রচার করছেন ও অনুসরণ করছেন তা সুস্থ মানবিকতার পক্ষে কত অশুভ, এমনকি ফরাসীদের পক্ষেও কত ক্ষতিকর। কিভাবে সেটা স্পষ্ট ক'রে বলবার চেষ্টা করছি।

এই সব মতবাদ, যা নাকি ফরাসী এবং অতি বিশেষভাবেই ফরাসী, এই সব স্থানীয় অর্থাৎ লরেন প্রদেশীয় সত্য, তাদের বারেস খাড়া করলেন কাণ্ট-এর মতবাদের বিরুদ্ধে। তিনি বললেন : "অসুস্থ কাণ্টবাদ"। অসুস্থ কেন? যেহেতু কাণ্ট তাঁর নীতির ভিত্তি স্থাপন করেন সাধারণ সত্যের উপর, যেহেতু তিনি বলেন : "সর্বদা এমনভাবে ক্রিয়া কর যাতে তুমি প্রত্যাশা করতে পার তোমার ক্রিয়ার মূলনীতি বিশ্বজনীন নীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।" এখন, বারেস-এর মতে নীতির ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন বা নির্বিশেষ বলে কিছু থাকতে পারে না, থাকতে পারে শুধু সময়োপযোগী বিশেষ বিশেষ সত্য, যা স্থান ও ঘটনার দ্বারা রূপায়িত। সত্য আর শিব হল আপেক্ষিক বস্তু, এবং আমাদের প্রত্যেকের উচিত সেটা হৃদয়ঙ্গম করা, 'মৃত্তিকা ও মৃতদের' শিক্ষা ও নির্দেশ শ্রবণ করা।

এ হল নতুন আকারে সেই পুরনো জাঁসেনিজ্‌ম্‌-বিরোধী কলহের পনরারম্ভ। এ হল মোরাস এবং 'আকাসিয়' ফ্রাঁসেজ'-এর মতবাদ : "রাজনীতি আগে"। এ হল বীজাকারে দ্রেফ্যুস ঘটনার সময়কার কর্ণেল আঁরির "দেশপ্রেমিক ধাপ্পাবাজি"র সাফাই; অর্থাৎ সত্যের জন্যে মাথা না ঘামিয়ে সময়োপযোগী ও ফলপ্রদ ভেবে ভুয়া দলিল তৈরী করা, যার মূলে সেই বিখ্যাত সূত্র : "উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় তাহলে উপায় খারাপ হলেও চলে"। এ মতবাদ অতিশয় চমৎকার এবং অতিশয় ফলপ্রদ মনে হতে পারে ততদিনই যতদিন তা একাই কাজে লাগানো যায়। কিন্তু যখন শত্রু তা আয়ত্ত করে তখন উল্টো সুর আরম্ভ হয়। *Les Amitiés Françaises* গ্রন্থে পুত্র ফিলিপ বারেসকে বাস্তববুদ্ধি নিয়ে বেশ মজা ক'রে শেখানো চলে যে, জার্মানদের আত্মা নেই, অতএব তাদের সম্পর্কে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। কিন্তু জার্মানরা যখন অল্প দিনের মধ্যে ঐ একই যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে আমাদের বিরুদ্ধে, তখন তাদের ঠেকায় কে? দেখা গেল প্রতিবেশী শত্রু-জাতির দ্বারা গৃহীত হয়ে বারেস-এর চমৎকার মতবাদের চোট ফিরে এল আমাদের উপর, ভয়ংকর আগুন উল্টোদিকে ছড়িয়ে আমাদের পোড়াল। হিটলারের মধ্যে আমি চিনলাম বারেস-এর শিক্ষা।...

Déracinés-র প্রকাশকাল থেকেই আমি বারেস-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াই, অন্তত তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে। তখন থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আমি কখনো ক্ষান্ত হইনি। এমন অবিশ্রাম সে-বিদ্রোহ যে, মাসিস তাঁর *Jugements* বইতে রায় দিলেন যে, বারেস-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামই হল আমার লেখার একমাত্র মূলকারণ এবং বারেস না থাকলে আমার অস্তিত্ব নেই (অবশ্যই সাহিত্যিক অস্তিত্ব)। মাসিস-এর বক্তব্য সত্ত্বেও বারেস-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উচিত কারণ যে আমার ছিল, দুর্ভাগ্যবশত তা পরবর্তী ঘটনাবলী ভালো-ভাবেই প্রমাণ করেছে। কারো কারো কী অন্ধতাই না ছিল! আজ হোক কাল হোক এর পরিণতি যে কি তা বুঝতে কী বিলম্বই না হল তাদের! তাই L'Action Française টিকে রইল। মনে হয়, আজকের তরুণ ফরাসীরা বারেসকে আর বিশেষ পড়ে না (তারা ভুল করে), অন্তত তারা তাঁকে আর বিশেষ অনুসরণ করে না (তারা ঠিক করে)। একটা অদ্ভুত জিনিষ, তাৎপর্যপূর্ণও বটে : আজ বিপক্ষ শিবিরেই, কমিউনিস্টদের মধ্যেই আপেক্ষিক মতবাদের মারাত্মক ক্রিয়া টের পাওয়া যাচ্ছে। 'উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় তাহলে উপায় খারাপ হলেও চলে'—এই নীতির। বিচারবুদ্ধিকে বিগড়ে দেবার, কখনো কখনো

চিরকালের মতো, আশ্চর্য ক্ষমতা এই নীতির। রাজনীতিক জীবনের মতো ব্যক্তিগত জীবনেও তা চরম ক্ষতিকর ভ্রান্তির কারণ। আমি মনে করি, সত্যকে (তাকে যদি ঈশ্বর বলতে চান তো বলুন) কখনো ফাঁকি দিয়ে চলা যায় না, চলতে গেলে শাস্তি পেতে হয়ই।

মোরাস-এর মতো বারেসও ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না। 'মৃত্তিকা ও মৃতদের' কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধর্ম তাঁর সুবিধাবাদেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তা তাঁর হৃদয় ভাবালুতায় স্পর্শ করত, কিন্তু নির্বিশেষভাবে তাঁকে কিছু দেয়নি। *Les Amitiés Françaises* গ্রন্থে তিনি তাঁর পুত্রকে শিক্ষাদানের সূত্রগুলি বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে সর্বপ্রধান হল শিশু ফিলিপ-এর মনে "আমাদের মৃত্তিকা ও মৃতদের" প্রতি আনুরক্তি সঞ্চার করা। সেটাই তাঁর কাছে একেবারে গোড়ার কথা। "আমাদের পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের উপলব্ধি" তিনি তাঁর পুত্রকে দান করতে চান, "তার সহজাত প্রবণতার পরিবর্তে এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা" ঠিক ক'রে দিতে চান।......

কিন্তু বারেস-এর রচনার যে-সব পৃষ্ঠায় এই "সহজাত প্রবণতা" অবাধে প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলিরই বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। যখনই এই লরেনবাসী তাঁর অভিপ্রায়ের কথা না ভেবে নিজেকে ছেড়ে দেন, যা তিনি হতে চান তা হতে ভুলে যান, স্বাভাবিক হতে সম্মত হন, অর্থাৎ নিছক লরেনবাসী না থেকে মানুষ হন, তখনই তাঁর রচনা আমাদের নাড়ায়, এখনও নাড়ায়।

কারণ আমাদের ফরাসী সংস্কৃতির মহত্ত্ব, মূল্য, ইষ্ট হল এই যে, তা স্থানীয় কৌতূহলের বস্তু নয়। যে-সব চিন্তাপদ্ধতি, যে-সব সত্য সে আমাদের শিক্ষা দেয় তারা বিশেষভাবে লরেনীয় নয়, সুতরাং প্রতিবেশী জাতি তাদের গ্রহণ করলে আমাদের উপর উল্টে চোট লাগবার কোনো বিপদ নেই। তারা সর্বজনীন, মানবিক, বিভিন্ন জাতির হৃদয় স্পর্শ করবার উপযোগী। যেহেতু তাদের মারফৎ প্রত্যেক মানুষ নিজেকে জানবার শিক্ষা নিতে পারে, নিজেকে চিনতে ও অন্যের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করতে পারে, সেই হেতু তাদের ক্রিয়াবিভাগও বিরোধের দিকে নয়, মৈত্রীর দিকে।

এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই, যার গুরুত্ব আমার মতে সর্বাধিক। ফরাসী সাহিত্যের গতি শুধু একমুখী নয়। ফরাসী চিন্তা তার বিকাশের ও তার ইতিহাসের সর্ব যুগে আমাদের সামনে ধরেছে এক কথোপকথন, এক প্রাণস্পর্শী অবিশ্রান্ত কথোপকথন, যা আমাদের হৃদয় ও মন উভয়কেই মাতিয়ে রাখবার মতো। এ কথোপকথন শুনলেই তাতে যোগ দিতে হয়। যে-তরুণ মন আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে উৎসুক এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে ইচ্ছুক, আমার বিশ্বাস সে-মন বিকৃত হয়ে যাবে যদি এই কথোপকথনে মাত্র একটি কণ্ঠই সে শুনতে পায় বা তাকে শুনতে দেওয়া হয়। এ কথোপকথন মোটেই রাজনীতিক দক্ষিণ ও বামের মধ্যে নয়; তার চেয়ে অনেক বেশী গভীর ও মৌলিক। এ হল লৌকিক ঐতিহ্য, স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের বশ্যতা এবং স্বাধীন চিন্তা, তর্ক করবার, পরীক্ষা করবার মনোভাব, যা ধীরে ধীরে মানুষের মুক্তিকে এগিয়ে আনে—এ দুয়ের মধ্যে কথোপকথন। আমরা এর সূত্রপাত দেখতে পাই আবেলার এবং খ্রীষ্ট ধর্মসংঘের মধ্যে সংগ্রামে। বলা বাহুল্য, খ্রীষ্ট ধর্মসংঘ সর্বদাই জয়ী হয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকবার তার প্রথম ব্যূহের মধ্যে অনেকখানি হটে গিয়ে এবং তার অবস্থানকে নতুন ক'রে সাজিয়ে তবেই জয়ী হয়েছে। ঐ কথোপকথন আবার সুরু হয়েছে মঁতেঞ-র বিরুদ্ধে পাস্‌কাল-এর দ্বন্দ্বে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কোনো বাক্যবিনিময় হয়নি, কারণ পাস্‌কাল যখন কথা বলতে আরম্ভ করেছেন তখন

মঁতেঞ-র মৃত্যু হয়েছে। তবু মঁতেঞ-কে উদ্দেশ ক'রেই পাস্‌কাল-এর কথা। শুধু মঁসিয়ো দ্য সাসি'র সঙ্গে সেই বিখ্যাত আলাপেই নয়। মঁতেঞ-র *Essais*-র বিরুদ্ধেই এবং তাকে ভিত্তি ক'রেই পাস্‌কাল-এর *Pensées*। মঁতেঞ সম্বন্ধে তিনি বলেন: "নিজেকে চিত্রিত করার মূর্খ পরিকল্পনা তাঁর হয়েছিল"। একথা কিন্তু তখন পাস্‌কাল অনুমান করতে পারেননি যে, *Pensées*-র যে-সব অংশে তিনি, পাস্‌কাল, তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর সংশয়সুদ্ধ নিজেকে চিত্রিত করেছেন সেই সব অংশ তাঁর গোঁড়া ধর্মমতের বিবরণের চেয়ে আমাদের আজ অনেক বেশী স্পর্শ করে। ঠিক ঐরকম, বস্যুয়ে-র মধ্যে যা আমরা আজ প্রশংসা করি তা তাঁর সেকেলে ধর্মতত্ত্ব নয়, তা হল তাঁর অপূর্ব ভাষার নিখুঁত শিল্প, যার গুণে তিনি আমাদের সাহিত্যের এক অসামান্য লেখকরূপে গণ্য। এ শিল্প না থাকলে আজ তাঁকে কেউ আর বিশেষ পড়ত না। যে-ফর্ম্‌কে তিনি ধর্মের দিক থেকে অবান্তর মনে করতেন সেই ফর্মের জন্যেই তিনি বেঁচে আছেন।

যুগের পর যুগ বার বার আরব্ধ কথোপকথন, ক্ষান্তি নেই তার। স্বাধীন চিন্তার তরফে তা অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্ন। বিচক্ষণতার ফলেই। আমাদের ধর্মশাস্ত্র-কথিত সেই "সাপের বিচক্ষণতা", কারণ মনকে লুব্ধ করে, মুক্তি দেয় যে-শয়তান সে ইচ্ছে ক'রেই অস্ফুট স্বরে কথা বলে। সে আভাষ দেয়, আর ধর্মবিশ্বাসী জোর গলায় ঘোষণা করে। তাই দেকার্ত-এর মন্ত্র হল: "আমি মুখোস পরে এগোই।"

কখনো কখনো দুই কণ্ঠের মধ্যে একটি জয়ী হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জয়ী হল স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠ; সে তখন আর মোটেই মুখোস-পরা নয়। সে এতদূর জয়ী হল যে গীতিময়তা স্বভাবতই শুকিয়ে গেল। কিন্তু ঐ কথোপকথনের সমতা ফ্রান্সে কখনো বেশী দিনের জন্যে নষ্ট হয়নি। শাতোব্রিয়াঁ ও লামার্‌তিন-এর সঙ্গে ধর্মানুভূতি, যা গীতিময়তার উৎস, আবার অপূর্বভাবে উৎসারিত হল। রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌-এর বিরাট তরঙ্গ উঠল। মিশ্‌লে ও য়ুগো সমস্ত ধর্মসঙ্ঘের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু দাঁড়ালেন এক গভীর ধর্মানুভূতির প্রেরণা নিয়ে।

এক ধার থেকে আর এক ধারে দুলে দুলে ফরাসী সংস্কৃতির তরণী এগিয়ে চলেছে তার দুঃসাহস যাত্রায়। সে চলেছে, ডুববে না। তার ডোবার সম্ভাবনা দেখা দেবে, ডুববেও সে, সেইদিন যেদিন ঐ কথোপকথনের এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর নিশ্চিতভাবে জয়ী হবে, তাকে স্তব্ধ ক'রে দেবে। নৌকো সেদিন একদিকে একেবারে হেলে পড়বে।

আমাদের কালে আমরা ক্যাথলিক লেখকদের এক বিরাট স্ফুরণ দেখছি। উইস্‌মাঁস ও লেয়ঁ ব্লোয়ার পরে জাম্‌, পেগি, ক্লোদেল, মরিয়াক, গাব্রিয়েল মার্‌সেল, বের্‌নানস, মারিত্যাঁ। আবার অন্যদিকে প্রুস্ত ও স্যুয়ারেস-এর উল্লেখ না ক'রেও বলা যায়, একা বিরাট ও অটল ভালেরি তাঁদের সকলের ভারসাম্য ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। সমালোচক-মন কোনো কালে এত বিভিন্ন বিষয়ে এমন অনবদ্যভাবে ব্যাপৃত হয়নি, এমন আশ্চর্যভাবে সৃজনশীল হয়নি। অস্কার ওয়াইল্ড-এর বাক্য মনে পড়ে: "কল্পনা অনুকরণ করে, সমালোচক মন সৃষ্টি করে।" এ বাক্য বোদলের-এরও হতে পারত এবং প্রত্যেক লেখক এর অনুধ্যান করলে লাভবান হবেন। (বলা বাহুল্য, অন্যকে সমালোচনা করা নয়, নিজেকে সমালোচনা করার কথা এটা)। কারণ, কল্পনা যে বহু বিচিত্র ছায়ামূর্তি বিশৃঙ্খলভাবে আমাদের সামনে ধরে, তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক চিত্রের গোড়ার কথা হল নির্বাচন। আর ফ্রান্স বলতে একটা চিত্রণধারার কথা আমার মনে আসে, যার আমি সবচেয়ে অনুরক্ত।

যখন আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বন্ধু মিলে *Nouvelle Revue Française* স্থাপন করেছিলাম, যে-পত্রিকা পরে এক অপ্রত্যাশিত গুরুত্ব অর্জন করে, তখন লোকে ভেবেছিল একটা ছোট দল তৈরী হল এবং, যা প্রায়ই দাঁড়ায়, একটা 'পারস্পরিক প্রশংসা সমিতি'। কিন্তু আমাদের ছিল ঠিক তার উল্টো, বলতে পারা যায় 'সমালোচনা সমিতি', পারস্পরিক সমালোচনার। তরুণ বয়সে যখন সাহিত্যিক হওয়া যায় তখন আত্মপ্রসাদের প্রতি সাধারণত খুব ঝোঁক থাকে। এই আত্মপ্রসাদকে আমরা ভয় করতাম, এতদূর ভয় করতাম যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা পত্রিকায় পরস্পরের সম্বন্ধে কিছু বলব না। কিন্তু কোন পাঠক আমাদের এই বিবেচনা লক্ষ করেননি; কারণ নীরবতা লোকে লক্ষ করে খুব কমই, যদিচ প্রায়শ নীরবতারই তাৎপর্য ও গুরুত্ব সমধিক।

Nouvelle Revue Française-এর আর একটা বিশেষত্ব ছিল, যা লোকে অবশ্যই লক্ষ করেছে, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করেছে কমই। তা এই যে আমাদের পত্রিকা যে-সব লেখা ছাপাত, একমাত্র গুণ বিচার ক'রেই ছাপাত, আদৌ তাদের প্রবণতা বিচার ক'রে নয়। যা চমৎকার তাই সে গ্রহণ করত, তার রং কি তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না তার। এর ফলে শুধু যা উৎকৃষ্ট তাই দিতে পারা যেত। এইভাবে *Nouvelle Revue Française*-এর মলাটের মধ্যে চলেছিল সেই বিরাট কথোপকথন যার সম্বন্ধে এইমাত্র বলেছি। আমাদের নিরন্তর ভাবনা ছিল চিন্তার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

ব্যাপারটা বাইরে থেকে খুব সামান্য মনে হয়, কিন্তু আসলে খুব বিরাট। আমার বিশ্বাস, একমাত্র আমাদের পত্রিকারই কোন দিকে উদ্দেশ্যপ্রবণতা ছিল না। এর ফলেই ক্লোদেল মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হতেন। তিনি প্রবলভাবে প্রতিবাদ করতেন, এমনকি তাঁর রচনা একেবারে প্রথমে দিলেও, যদি দেখতেন প্রুস্ত, স্যুয়ারেস, ভালেরি বা লেওতো এঁদের কারো রচনা, যা তাঁর বৈর মনে হত, তাঁর রচনার পাশে ছাপা হয়েছে। দল ও মত নির্বিশেষে গুণগ্রহণের এই নীতিই ছিল *Nouvelle Revue Française*-এর অসাধারণ সাফল্য ও অগ্রগতির মূলে, শুধু ফ্রান্সেই নয়, বিদেশেও। সত্যিকার মূল্য আছে এমন কোনো লেখক আমার জানা নেই যাঁকে আমরা প্রকাশ করিনি বা আশ্রয় দিইনি। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব লেখক তখন অজ্ঞাতই ছিলেন। অবশ্য আমি প্রাকযুদ্ধ *Nouvelle Revue Française*-এর কথা বলছি। নতুন পরিচালকমণ্ডলীর মনোভাবের দরুন তার প্রাচীন সহযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরা যখন বিদায় নিতে বাধ্য হলেন তার আগের কথা বলছি।

বিভিন্নমুখী রচনার সন্নিবেশে *Nouvelle Revue Française* ছিল চিন্তার একটা গোষ্ঠী। সমালোচনাই ছিল তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। সাহিত্যের অঙ্গন থেকে যত ভূয়া মূল্যের আবর্জনা দূর করবার এবং সুস্থ ও মহৎ ঐতিহ্যের চর্চা, চিন্তার শৈলী ও বিশুদ্ধ রূপায়নের অনুশীলন পুনঃপ্রবর্তন করবার কাজে তার দান বিরাট।...নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে *Vieux Colombier* ছিল তার মানস-সন্তান।

তারপর এল যুদ্ধ। বিরাট, অন্ধকারময়। যা কিছুর প্রতি আমাদের হৃদয়ের অনুরাগ, তাকে এ যুদ্ধ বিপন্ন করল। বিপন্ন করল মানুষের মর্যাদা এবং আমাদের জীবনধারণের আদর্শ। আবার নতুন বনিয়াদের উপর আরম্ভ করতে হবে, আবার সব আরম্ভ করতে হবে। আমি বলছি : নতুন বনিয়াদের উপর। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিছক অতীতে প্রত্যাবর্তন এবং অতীতের প্রতি অনুরক্তিতে আমরা উদ্ধার পাব না। সব কিছুর সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন জাগাতে হবে।......

গতকাল প্রয়োজন ছিল যোদ্ধার, আজ প্রয়োজন স্থপতির। পাওয়া যাবে স্থপতি। তাদের যে আজ প্রয়োজন হয়েছে তাইতেই তারা জন্মাবে। আহ্বানে সাড়া দেবে তারা। আমার খুব আশা আছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, আমাদের যুবসম্প্রদায় এই নিদারুণ ধাক্কার ফলে স্থিতিহীন। এক সর্বনাশ-চিহ্নিত আকাশের নীচে আজকের যুবকেরা, অন্তত এক্‌জিস্টানশিয়ালিস্ট গোষ্ঠী নামক তাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেন বারেস-এর শোচনীয় উক্তিকে আপন ক'রে নিয়েছে। বারেস-এর যে বইয়ের কথা বলছিলাম তাতেই আছে : "যে কোনো দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন, বিশ্বজগৎ এবং আমাদের অস্তিত্ব এক অর্থহীন হট্টগোল।" বারেস-এর পরে, কিন্তু কাম্যু, সার্ত্র্ ইত্যাদি আজকের একজিস্টানশিয়ালিস্টদের আগে মারত্যাঁ দ্যু গার (অন্তত তাঁর একজন নায়ক) এবং জাঁ রস্তাঁ আমাদের শুনিয়েছেন : "আমরা এক উদ্ভট জগতে বাস করছি যেখানে কোনো কিছুর সঙ্গেই কোনো কিছুর অন্তমিল নেই।" আমি যুবকদের বলতে চাই, বিশ্বাসের অভাব মানুষকে উন্মার্গগামী করে। এই জগৎ যাতে কিছুর সঙ্গে মেলে তা তোমাদের উপর নির্ভর করছে। নির্ভর করছে মানুষের উপর। মানুষের থেকেই আরম্ভ করতে হবে। এই উদ্ভট জগৎ আর উদ্ভট থাকবে না। তোমাদের উপর তা নির্ভর করছে। জগৎ তাই হবে যা তোমরা তাকে করবে। তোমরা যতই আমাকে বলবে এবং বোঝাবার চেষ্টা করবে যে, এই জগতে এবং আমাদের এই আকাশে নির্বিশেষ ব'লে কিছু নেই, সত্য ন্যায় আর সৌন্দর্য মানুষের সৃষ্টি, ততই বেশী ক'রে আমি এই বুঝব যে, মানুষকেই তাহলে ওগুলো বজায় রাখতে হবে এবং তার সম্মানের প্রশ্ন এতে জড়িত।

এমন একটা দেশ নেই, তা সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যতদূরেই অবস্থিত হোক, যার উপরে নতুন সব সমস্যার ছায়া পড়েনি, এমন কোনো জাতি নেই যে সকলের সঙ্গে একই ভাবনায় কিছু না ভাবিত, চিন্তাশীল এমন কোনো যুবসম্প্রদায় নেই যে উদ্বিগ্ন ও গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করছে না। অন্য কোনো প্রমাণ দেখাতে চাই না, মিশর থেকে চ'লে আসার আগে আমি যে-পত্র পেয়েছি সেটিই যথেষ্ট। পত্রলেখক বাগদাদের এক ছাত্র। সে লিখেছে :

"একজন অপরিচিত লোক আপনাকে পত্র লিখছে ব'লে ক্ষমা করবেন। আমি মনে করি, লেখক যা লেখেন তার জন্যে দায়ী থাকেন। আপনি আপনার রচনাবলীর ভিতর দিয়ে আমাদের অভ্যস্ত করেছেন এক শাশ্বত ও সঞ্জীবনী উৎকণ্ঠায়। যে-পুরুষ (generation) পূর্ব থেকে উৎসর্গীকৃত, তার পক্ষে আপনার শেখানো এই উৎকণ্ঠাই একমাত্র আশা।"

এ কথা শুনলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। ফ্রান্সে ও অন্যত্র এ কথা আমি অনেকবার শুনেছি : অনেক যুবক মনে করে তারা এক "উৎসর্গীকৃত পুরুষে"র লোক। আমি যে সর্বান্তঃকরণে এই ধারণার প্রতিবাদ করি, তা বলাই বাহুল্য।

ঐ যুবক চিঠিতে লিখেছে : "আমি আরও বেশী বলব : এই উৎকণ্ঠাই আমাদের একমাত্র মহত্ত্ব। মোট কথা, আপনার শিক্ষার সার হল এই যে, আগে থেকেই আমাদের কিছু মেনে নেওয়া বা স্বতঃসিদ্ধ মনে ক'রে নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমার বন্ধু 'ক' আপনার কাছ থেকে যে-পত্র পেয়েছে তা প'ড়ে সত্যি কথা বলতে আমি অবাক হলাম। তাতে আপনি তাকে আশা রাখতে বলেছেন, কারণ নাকি 'আশা ব্যতিরেকে আত্মা জীর্ণ হয়, নির্জীব হয়ে পড়ে'।"

এখানে বলি, যে-যুবকের বিষয় এই পত্র-লেখক উল্লেখ করেছে তাকে আমি চিনতাম না। সে আরবী ভাষায় আমার সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছিল। তা আমি পড়তে পারিনি, তবু

আমার শুভেচ্ছা জানবার জন্যে তাকে আমি কিছু লিখি। স্বভাবতই আমার বক্তব্য তাতে স্পষ্ট হতে পারেনি।

অতঃপর পত্রলেখক বলেছে: "হে গুরু, আশা অবলম্বনের প্রস্তাব আপনি এখন আমাদের কাছে করতে পারেন না। এই যে যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার কাল সুরু হয়েছে তার মধ্যে আশা অবলম্বনের অর্থ হল পতিত হওয়া, কারণ আমাদের জীবনকালে যদি কখনো উৎকৃষ্টতর দিনের মুখ দেখতে পাই আমরা, তা নিশ্চয়ই আশায় তুষ্ট হওয়ার ফলে দেখতে পাব না। না, আশা করলে চলবে না; নিরন্তর উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। আমি মনে করি সেই আমাদের একমাত্র ন্যায্য মনোভাব এবং একমাত্র তাইতেই আমাদের সততা বজায় রাখা সম্ভব। আপনি আমায় বলুন এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি এবং আমি ঠিক বলেছি কিনা। আপনার রচনা যা কিছু আমি পড়েছি তা থেকে আমার ঐ ধারণাই হয়েছিল। সেই জন্যে আমার বন্ধুর কাছে লেখা আপনার চিঠি আমাকে সন্ত্রস্ত করেছে। আমার মনে হল, মহত্ত্বে আমাদের যে শেষ অধিকার তা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে ঐ চিঠিতে। সত্যি কিনা বলুন।"

অপূর্ব পত্র। কিন্তু কি উত্তর দেব এমন পত্রের? আমাকে তা আরো নাড়িয়েছে এই কারণে যে, পত্রটি এসেছে এমন এক দেশ থেকে যাকে আমি সুদূর মনে করেছি, মনে করেছি বিগত ঘটনাবলী তার গায়ে বিশেষ কোনো চোট রেখে যায়নি এবং আমাদের সংস্কৃতিকে তেমনভাবে অনুভব করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার উত্তর কিন্তু খুবই সহজ।

যে-কালে মানুষের মূল্য, সম্মান ও মর্যাদা এমন বিপন্ন, চারদিক থেকে এমন অবরুদ্ধ, সেইকালে আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা হল এই কথা জানা যে, যুবকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, সংখ্যায় যতই কম হোক এবং যে দেশেরই হোক, যারা সদা জাগ্রত, যারা তাদের নৈতিক ও মানসিক সততাকে অটুট রাখছে এবং সমস্ত ডিক্টেটরী হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, চিন্তাকে দাবিয়ে দিতে ও শৃঙ্খলিত করতে, আত্মাকে নষ্ট করতে উন্মুখ সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। এইসব যুবক রয়েছে বলেই আমরা অগ্রজেরা বিশ্বাস রাখতে পারছি। আমি খুব বৃদ্ধ হয়েছি। শীঘ্রিরই জীবন থেকে বিদায় নিতে হবে। তবু এই কারণেই আমি হতাশা নিয়ে মরব না।

আমি অল্প কিছু লোকের নিষ্ঠায় বিশ্বাস করি, আমি অল্প সংখ্যকের গুণে বিশ্বাস করি।

পৃথিবীকে বাঁচাবে কয়েকজন।

অনুবাদ : **অরুণ মিত্র**

ভাষার অর্থ লইয়া আলোচনা বাংলা ভাষায় কমই আছে। 'শিল্পতত্ত্বের' (sic) বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে (শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু—অমলেন্দু দাশগুপ্ত। 'চতুরঙ্গ', শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৩) দাশগুপ্ত মহাশয় ভাষার অর্থের আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস যে সাধারণতঃ শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় আমরা যে সমস্ত শব্দ পাইয়া থাকি তাহার "রহস্যলোকে একবার প্রবেশ করলে বোঝা যায় কেন জনৈক আধুনিক দার্শনিক শিল্পতত্ত্বের আলোচনাকে বলেছেন 'boring . . . and largely bogus'।" তিনি আরও মনে করেন যে, "শিল্পতত্ত্ব নিয়ে এ যাবৎ যত দীর্ঘ ও জটিল তর্ক হয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভাষার অর্থ সম্বন্ধে বোঝাপড়ার অভাবেই তর্কের মীমাংসা কঠিন হয়েছে।"

মনে হয় দাশগুপ্ত মহাশয় উইট্‌গেনষ্টাইনের মতবাদের পক্ষপাতী। তাঁহার মতে "শব্দের অর্থ তার ব্যবহারে।" অত্যাধুনিক চিন্তারাজ্যে ইহাকে ভাষার ব্যবহারিক অথবা প্রায়োগিক অর্থবাদ বলা যায়। কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরবর্তী আলোচনা এই উক্তির 'যথা যাথ্যে' (sic) সন্দেহের সৃষ্টি করে।

"শব্দের অর্থ তো শুধু তার অভিধানগত বস্তু বা ভাবসত্তাই নয়, তার সঙ্গে মিশে থাকে আলোচনা-রত ব্যক্তিবর্গের মনের আরো অনেক কিছু।" অভিধানে আমরা শব্দের অত্যন্ত সাধারণ প্রচলিত ব্যবহারই পাইয়া থাকি। অভিধান নির্দিষ্ট ব্যবহার ছাড়াও শব্দের অনেক প্রকারের ব্যবহার আছে। কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয়ের "মনের আরো অনেক কিছু" বস্তুটা কি? তাঁহাকেও কি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে এই "মনের আরো অনেক কিছু"-ই চিন্তারাজ্যে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি অন্যের মনের খবর কোথা হইতে পাইয়াছেন? তিনি নিজের মনের খবরই বা কি করিয়া পান? 'মন' শব্দের অর্থ কি? এইসব প্রশ্ন দাশগুপ্ত মহাশয় একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছেন। যদি না এড়াইতেন তাহা হইলে "প্রতীকধারীদের" (sic) কথা বলিতে পারিতেন না। প্রতীকধারী ও প্রতীকে কি তফাৎ তাহাও তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই। হয়ত এইরূপ বিশ্লেষণ তাঁহার মতের পরিপন্থী হইবে বলিয়াই তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার বিশ্লেষণী মনকে আরো একটু যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে তিনি মূরীয় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ অথবা বাহিরার্থবাদ আর উইট্‌গেনষ্টাইনীয় ভাষার প্রয়োগিক অর্থবাদের খিচুড়ী পরিবেশন করিতে পারিতেন না। মূরীয় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত উইট্‌গেনষ্টাইনের 'ট্রেক্‌টেটাস্ লজিকো ফিলসফিকাস্' পুস্তকের এক সমন্বয়ের চেষ্টা হয় ত করা যাইতে পারে। কিন্তু উইট্‌গেনষ্টাইন তাঁহার অর্থের ব্যবহারবাদ 'ট্রেক্‌টেটাস'-এ দেন নাই। দাশগুপ্ত মহাশয় নিশ্চয়ই উইট্‌গেনষ্টাইনের 'ট্রেকটেটাস্ লজিকো ফিলসফিকাস্' ও 'ফিলসফিক্যাল ইনভেষ্টিগেসনস্'-এর তফাৎ জানেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন 'প্রতীকধারী' তাঁহার আলোচ্য বিষয় নয়; প্রতীকই তাঁহার আলোচ্য বিষয়। তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"...অর্থের ব্যবহারিক ভিত্তির কথা স্মরণ করে প্রতীকের তথাকথিত 'আসল' অর্থ অন্বেষণ থেকে নিরস্ত থাকলে তত্ত্ব আলোচনার অনেক বিভ্রান্তি কমবে।"

তাঁহার 'প্রতীকধারীর' শ্রেণীবিভাগ এই 'আসল' অর্থেরই নামান্তর নয় কি? ইহাতে কি তিনি অর্থের প্রতিষঙ্গবাদের অথবা স্বারূপ্যবাদের গন্ধ পান নাই? তাহা হইলে তাঁহার অর্থের ব্যবহারিকবাদ কোথায় গেল?

দাশগুপ্ত মহাশয় 'নির্বস্তুক' গুণের (sic) কথা বলিয়াছেন। ইহা আবার কি বস্তু? মূর সাহেব নিজেই ত বলিয়াছেন যে—'বস্তুর গুণ' ও 'নির্বস্তুক গুণের' মধ্যে তিনি তাঁহার 'প্রিন্সিপিয়া এথিকা' পুস্তকে যে তফাৎ দেখাইয়াছিলেন তাহা "not only silly but preposterous." কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয় মূর সাহেবকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। মূর সাহেব

তাঁহার স্বীকৃতি সত্ত্বেও 'নির্বস্তুক গুণ'কে ভাবসত্তা বলিতে পারেন নাই। দাশগুপ্ত মহাশয় তাহাই বলিয়াছেন। যদি ইহা ভাবসত্তাই হয় তাহা হইলে ইহা কোন অর্থে 'গুণ'? ভাবসত্তা বলিতে দাশগুপ্ত মহাশয় হয়তো প্রক্ষোভকে বুঝাইতেছেন। প্রক্ষোভকে আমরা জানি না। প্রকাশ করি, আর সেই প্রকাশকে আমরা জানি। দাশগুপ্ত মহাশয় শব্দের যথাযথ প্রয়োগের পক্ষপাতী। তাঁহার এই চেষ্টার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। "জানা", "অনুভব" করা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার নির্ণয় করিলে তাঁহার ধারণা আরও স্পষ্ট হইত। তিনি উইট্‌গেনষ্টাইন, গিলবার্ট রাইলে, উইস্‌ডম্‌ প্রভৃতির মতবাদের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। তাঁহাকেও কি এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে?

তিনি উইট্‌গেনষ্টাইনের "the craving for generality" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "একটু বিচার করলে দেখা যাবে যে এই ধরনের উক্তির মধ্যে পরিহাস যতটা আছে, যুক্তি ততটা নেই।" কিন্তু ইহার পরেই তিনি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হয় ত উইট্‌গেনষ্টাইনীয় মতবাদকেই সমর্থন করে। দাশগুপ্ত মহাশয় যদি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করেন তাহা হইলে বলিব যে, আশা করি 'সার্বিক' সম্বন্ধে উইট্‌গেনষ্টাইনের মতবাদ তাঁহার ভালভাবেই জানা আছে। অবশ্য তিনি যদি মনে করেন সার্বিক-এরও একটা অস্তিত্ব আছে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। গিলবার্ট রাইলের মতবাদ তাঁর জানা আছে; আশা করি তিনি জাতি-ভ্রান্তি (category mistake) করিবেন না।

ইহার পরেই তিনি অধ্যাপক রিচার্ডস্‌-এর সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপের উল্লেখ করিয়াছেন। বুঝিতে পরিলাম না কেন তিনি মনে করেন "এই পত্রালাপ থেকে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যাঁরা আধুনিক অর্থতাত্ত্বিক বিচারপদ্ধতিতে আর্ট বা এস্‌থেটিক্‌স-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাঁরাও তাঁদের অস্বীকৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অথবা ফলাফল বিশ্লেষণ করতে নারাজ।" মনে হয় তাঁহার প্রধান যুক্তি "How can discussion on an *unreal* subject have *real* significance?" যদি আমি কোন কিছুকে অর্থহীন বলি, তাহা হইলে সেই অর্থহীন-এরও একটা অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। (ডায়েলেক্‌টিক্‌সের অপপ্রয়োগ!) ইহাই দাশগুপ্ত মহাশয়ের যুক্তি। Unreal subject-এর discussion কেন real significance পাইবে না, তাহা বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। আমি যদি বলি 'সোনার পাহাড়' অবাস্তব, তাহা হইলে সোনার পাহাড় সম্বন্ধে আমার উক্তি কেন *real* significance পাইবে না? আর সোনার পাহাড়ই বা তাতে কি করিয়া *real* হইয়া যাইবে? দাশগুপ্ত মহাশয় যতই অর্থের ব্যবহারবাদের কথা বলুন না কেন তাঁহার মন কিন্তু সেই অর্থের প্রতিষঙ্গবাদেই আটকাইয়া আছে।

ইহার পরবর্তী অংশেই তিনি "আর্ট বস্তুর মধ্যে......প্রকৃতিগত সাধারণ ক্ষেত্র" খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মনে হয় তিনি একপ্রকার বস্তু-সার্বিক-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু ইহাও জোর করিয়া বলা যায় না। একটু পরে তিনি নিজেই বলিতেছেন "আরেক ধরনের প্রশ্ন আছে। যথা, সৌন্দর্য বা শিল্পরসের স্বরূপ কী; ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস এই সব প্রশ্ন নিয়ে কোন যুক্তিগ্রাহ্য ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব নয়। কারণ এ-সব প্রশ্নের প্রাক্‌-স্বীকৃত অনির্দেশ্য মূল্য বোধ।" দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন যে শব্দের অর্থ তার ব্যবহারে। 'সৌন্দর্য,' 'শিল্প,' 'শিল্পরস' প্রভৃতি শব্দ এবং তাহাদের সমার্থক ও সহার্থক শব্দের ব্যবহার নির্ণয় করাই তাঁহার শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত ছিল। তাঁহাকে কি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে উইট্‌গেনষ্টাইন্‌ ও মুরের সমন্বয় চেষ্টা অপচেষ্টারই নামান্তর। দু'টি মতবাদকে একসূত্রে গাঁথা যায় না।

দাশগুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধের প্রারম্ভে অর্থের ব্যবহারবাদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোথা হইতে সেই পুরানো "বস্তু-সত্তা নির্ভরতা" (sic.), 'ভাব-সত্তা' (sic) ইত্যাদি আসিয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, এবং একপ্রকার অধিবিদ্যার পথে তাঁহাকে চালিত করিয়াছে।

শিল্পতত্ত্বের ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যবহারই শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু। (এই স্থলে 'শিল্প-তত্ত্ব' বলিতে কোন এক বিশেষ এবং সাধারণ তত্ত্বকে বুঝিতেছি না। শিল্প সম্বন্ধে কথা বলিতে আমরা যে শব্দসমষ্টির ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাই শিল্পতত্ত্বের উপাদান। এই উপাদানের ঊর্ধ্বে

কোন শিল্পতত্ত্ব নাই।) শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন আর শিল্প-তাত্ত্বিক সেই শিল্প সম্বন্ধে কথা বলেন। সেই কথার অর্থ নিহিত আছে তার ব্যবহারে। আমরা যাহা জানি তাহা প্রকাশ করিতে পারি। যাহা জানি না তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। সেই না জানার বিষয় আলোচনা নিরর্থক। যাহা প্রকাশ করি এবং যে ভাষায় প্রকাশ করি তার অর্থ ভাষার ব্যবহারে। এই ব্যবহার ভাষার ব্যাকরণের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। ব্যবহারের ঊর্ধ্বে কোন ভাষা নাই। যাহা ভাষায় প্রকাশ করি তাহাও ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করি।

পরিশেষে দাশগুপ্ত মহাশয়ের ইংরেজী শব্দের বাংলা করিবার প্রচেষ্টার উপরে কয়েকটি মন্তব্য করিব। তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু কয়েকটি শব্দ প্রসঙ্গে আমার কিছু আপত্তি আছে। Factএর বাংলা যদি 'বস্তু' হয় তাহা হইলে 'Thing', 'Object', ইত্যাদি শব্দের বাংলা কি হইবে? 'তথ্য' কি দোষ করিল বুঝিতে পারিলাম না। 'a priori' শব্দের বাংলা কেন 'প্রাকস্বীকৃত' হইল তাহাও বোধগম্য হইল না। কান্ট-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'a priori' শব্দের অর্থ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ (independent of experience)। যে তত্ত্ব, 'a priori' সেই তত্ত্বে আমাদের অভিজ্ঞতা কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। এই অর্থেই কান্টের 'a priori' অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। (কান্টীয় 'a priori'-এর অনেক রকম বিশ্লেষণ পরবর্তী পণ্ডিতরা করিয়াছেন, কিন্তু এইসব ব্যাখ্যানের মধ্যে যাহা মোটামুটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাই বলিলাম। ব্যাখ্যানের কূটতর্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করা নিষ্প্রয়োজন।) কান্টের পরে কোন চিন্তাবীর এই শব্দকে অন্য কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। 'সত্তা' কথাটার বহুল ব্যবহারে আমার আপত্তি আছে। 'সত্তা'র ইংরেজী মানে যদি existence হয় তাহা হইলে কথাটার ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের আরও সচেতন হইতে হইবে।

মোহিতকুমার হালদার

আলোচনার উত্তর

যেহেতু আমার প্রবন্ধে প্রসংগক্রমে উইটগেনস্টাইনের নাম উল্লেখ করেছিলাম এবং যেহেতু মোহিতবাবু নিজের পাণ্ডিত্য ও বিবেচনায় আমার কোনো বক্তব্যের সংগে উইটগেনস্টাইনের কোনো মতের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন, সেইহেতু তাঁর দাবি এই যে, উইটগেনস্টাইনের মত অনুসরণ না করে আমার গতি নেই। কিন্তু হঠাৎ আবার তিনি মুরের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন। এতে তিনি বিভ্রান্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। "মনে হয় দাশগুপ্ত মহাশয় উইটগেনস্টাইনের মতবাদের পক্ষপাতী।" মনে হওয়ার দায়িত্ব মোহিতবাবুর। তাঁর আরো মনে হয় এই মতবাদের সংগে "মুরীয় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ" মিশে গেছে, কারণ আমি *Tractatus* এবং *Philosophical Investigations*-এর তফাৎ ভুলে গিয়েছি। এও তাঁর প্রথম মনে হওয়ার ফল। আমার বিনীত নিবেদন এই মুর বা উইটগেনস্টাইন, রাইল বা উইজডম—কারুর সংগেই আমার মূল বক্তব্যের কোনো কারবার নেই। আমার বিচার-বুদ্ধিতে আমি যা স্থির করতে পেরেছি তাই আমার প্রবন্ধে পেশ করেছি। কোনো পণ্ডিতপ্রবরের মতবাদের চর্বিতচর্বণ করবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা কোনোটাই আমার নেই। সে কাজ তারাই করবেন যাদের, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প"। আমার বক্তব্যে যদি মুর ও উইটগেনস্টাইন অথবা *Tractatus* ও *Philosophical Investigations*-এর ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে গিয়ে থাকে তবে তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। কারণ যে খিচুড়ি মোহিতবাবু খুঁজে পেয়েছেন সেটা তাঁর-ই মস্তিষ্কপ্রসূত।

এই অর্থহীন ও অপ্রাসংগিক আক্ষেপের বাইরে মোহিতবাবুর কি বক্তব্য দেখা যাক। উনি বলছেন, "অভিধানে আমরা শব্দের অত্যন্ত সাধারণ প্রচলিত ব্যবহারই পাইয়া থাকি।" অভিধানে থাকে সমার্থক শব্দ, কোনো কোনো সময় দু'একটা প্রচলিত ব্যবহারের রূপ। ব্যবহার কী করে পাওয়া যায়? "মনের আরো অনেক কিছু" বলতে আমি প্রধানত অর্থের নিম্নোক্ত উপাদানগুলিকে

ধরেছি : (১) অভিব্যক্ত অবস্থা সম্বন্ধে বক্তার মনোভাব (feeling or attitude of the speaker about the state of affairs), (২) শ্রোতার প্রতি বক্তার মনোভাব (tone or attitude of the speaker to his listener) এবং (৩) বক্তার উদ্দেশ্য (the speaker's intention or the effect he seeks to promote)। অভিধানে যা থাকে তা থেকে আমরা বড়োজোর পেতে পারি a general conceptual equivalent of a state of affairs। এই সব কিছু নিয়েই বক্তার সম্পূর্ণ অর্থ।

"মন" শব্দের ব্যবহার নিয়ে মোহিতবাবু রসিকতা করবার চেষ্টা করেছেন। এটা আজকাল প্রায় পুরোনো, যদিও mind বা other minds নিয়ে সমস্যা মেটেনি। আমার নিজের মনের খবর কী করে পাই? বলতে পারতাম যে ঠিক একই উপায়ে যাতে মোহিতবাবুর "মনে হয়" যে আমি উইটগেনস্টাইনের মতবাদের পক্ষপাতী। অপরের মন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরেও বলা চলতো যে যেই প্রক্রিয়ায় মোহিতবাবু আমার মন সম্বন্ধে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত করে নিয়ে আলোচনা সুরু করেছেন আমারও সেই পথ। কিন্তু এই তুলনায় আমি নিজেই একটু অস্বস্তি বোধ করবো, কারণ প্রক্রিয়া মূলত একই প্রকৃতির হলেও ব্যক্তিবিশেষে ফলাফলের তারতম্য হয় দেখতে পাচ্ছি।

আর এক প্রশ্ন "নির্বস্তুক গুণ" নিয়ে। আমার প্রবন্ধেই আমি বলেছি নির্বস্তুক গুণ মানে non-natural quality or value। যেহেতু value, সেইহেতু মূল্যসত্তা বা ভাবসত্তা। অন্য কোনো বাংলা শব্দ যদি মোহিতবাবু ব্যবহার করতে চান আমার আপত্তি নেই। কিন্তু নির্বস্তুক গুণ যে কী বস্তু সে কথা আমার প্রবন্ধেই আমি বিশ্লেষণ করেছি। উইটগেনস্টাইন বা মুর নিয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রবন্ধটা মন দিয়ে পড়লে মোহিতবাবু বুঝতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সে চেষ্টা না করে তিনি গভীর তত্ত্বের প্রকাশে ব্যস্ত। "প্রক্ষোভকে আমরা জানি না। প্রকাশ করি, আর সেই প্রকাশকে আমরা জানি।" এর সংগে মোহিতবাবুর আর এক উক্তি তুলনীয় : "আমরা যাহা জানি তাহা প্রকাশ করিতে পারি। যাহা জানি না তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।" পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি শেষের উক্তিটা ছাড়া আজকাল কোনো পাণ্ডিত্য আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু উৎসাহের প্রাবল্যে মোহিতবাবু প্রথম উক্তির সংগে এর বিরোধটা বিস্মৃত হয়েছেন।

Craving for generality নিয়ে আমার আলোচনা সম্বন্ধে মোহিতবাবুর বক্তব্য বুঝতে পারলাম না, কারণ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা উনি করেননি। ধরে নিয়েছেন কোনো কোনো পণ্ডিতদের মতের সংগে আমি "সবিশেষ পরিচিত," কাজেই আমি বুঝতে পারবো। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মোহিতবাবু নিজের পাণ্ডিত্যের সামান্য অংশও আমার ওপরে আরোপ করে অবিচার করেছেন। বিবৃতি স্পষ্ট হলেই আমার বোঝা সম্ভব।

Discussion on an unreal subject বলতে denial of an unreal subject-ও discussion-এর অন্তর্গত একথা আমি ভাবিনি। এক অর্থে হয়তো তাই। কিন্তু রিচার্ডস আমার অর্থই বুঝেছিলেন। বিশ্বাস ছিলো পাঠকও তাই বুঝবেন। না বুঝলে অভিযোগ নেই। বিশ্বাস নিয়েই ভাষা-ব্যবহার। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে মোহিতবাবুর বেগ পেতে হয়নি—"তাঁহার মন কিন্তু সেই অর্থের প্রতিষঙ্গবাদেই আটকাইয়া আছে।" আবার সেই "মন"। মন নিয়ে মোহিতবাবু বড়োই বিপদে পড়েছেন।

প্রতিষঙ্গবাদ, ব্যবহারবাদ, বস্তুসার্বিকস্বাতন্ত্র্যবাদ, বাহিরার্থবাদ—ইত্যাদি নানা বাদের অরণ্যেই মোহিতবাবুর বিচরণ। কিন্তু এদের সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্য, আর এদের পারস্পরিক মিল বা গরমিল নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ বাদ-নিরপেক্ষ। কোনো বাদের সঙ্গে তার সংগতি বা বিরোধ নিয়ে মোহিতবাবু অযথা কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি প্রথমেই ধরে নিয়েছেন যে আমি বিশেষ একটা মতবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহ হয়েছে। আর এই সন্দেহের জ্বালায় ওঁর নিজের কিছু বক্তব্য আছে কিনা সে কথা প্রায় ভুলে গিয়েছেন।

যেটুকু বক্তব্য উদ্ধার করতে পারলাম তাতে দেখা যায় প্রতীক ও প্রতীকধারীর কোনো প্রভেদ মোহিতবাবুর পছন্দ নয়। প্রভেদের প্রকৃতি ও সীমা আমি আমার প্রবন্ধে নির্ধারিত করতে চেষ্টা

করেছি। ভাষার অর্থ তার ব্যবহারে—এ কথায় প্রতীকধারীর অস্তিত্ব লোপ পায় না। ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে প্রতীকধারীর পরিবর্তন হয়। "ভাষার অর্থ" কথাটাই দ্বৈতব্যঞ্জক। ভাষা ও তার অর্থ—এই দ্বৈতের মধ্যেই প্রতীক ও প্রতীকধারীর দ্বৈত নিহিত। ব্যবহারেই এই অর্থ নির্ধারিত এবং সেই জন্যেই ব্যবহারের ঊর্ধ্বে কোনো ভাষা নেই। নানা বাদের জালে জড়িয়ে না পড়লে এই সম্পর্কটা মোহিতবাবু সহজেই বুঝতে পারতেন। উনি নিজেই বলছেন: "যাহা ভাষায় প্রকাশ করি তাহাও ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করি।" কিসের প্রকাশ? "প্রকাশ" কথাটাতেই মোহিতবাবুর অদ্বৈতদর্শনের পরিসমাপ্তি। দ্বৈতের ধারণা ছাড়া মাধ্যমের কথা কী করে আসে? মোহিতবাবু বলছেন শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন আর শিল্পতাত্ত্বিক সেই শিল্প সম্বন্ধে কথা বলেন, এবং এই কথাই শিল্পতত্ত্বের বিষয়বস্তু। শিল্পী কী সৃষ্টি করেন? মোহিতবাবুর বিশ্লেষণে সেই সৃষ্টিও তো একটা কথা। তা হলে শিল্পীর কর্ম ও শিল্পতাত্ত্বিকের কর্মে এই প্রভেদ নির্ধারণের প্রয়াস কেন? কূটতার্কিক হলে বলতে পারতাম যে মোহিতবাবুর বক্তব্য যদি ঠিক হয় তবে তা অর্থহীন, আর যদি তার অর্থ থাকে তবে তার প্রতিপাদ্য ভুল।

মোহিতবাবুর শেষ আপত্তি আমার ব্যবহৃত কয়েকটা বাংলা শব্দ নিয়ে। তত্ত্বমূলক আলোচনায় যাকে fact বলে তাকে যদি তথ্য বলি তা হ'লে information বা facts of a case-এর বাংলা কী? অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষতায় অভিজ্ঞতার অভাবও অনেক সময় সূচিত হয়। অভিজ্ঞতার আগেই যাকে স্বীকার করে নেয়া হয় তাই a priori।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

আধুনিক সাহিত্য

ইতিহাস নিত্যই রচিত হচ্ছে। মিথ্যে ক'রে সাজিয়েও তা' লেখানো যায়। কিন্তু কিংবদন্তীর বেলা তা' পারা যায় না।

কেমন ক'রে যে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, তার জন্মের রহস্য যে কি, তা বিশ্লেষণ ক'রে বার করবার বোধ হয় নয়।

কিংবদন্তীর সত্যের ভিত্তি হয়তো সব সময় তেমন পাকা নয়, কিন্তু তবু সত্যের চেয়ে তা অনেক বেশি প্রবল।

সত্যের জমিতে কি বিশেষ অনুকূল আবহাওয়ায় কিংবদন্তী পল্লবিত হয়ে ওঠে জানতে পারলে, ভবভূতির বদলে কালিদাস, অশোকের বদলে বিক্রমাদিত্য কেন যে কিংবদন্তীর আধার তা আমরা বুঝতে পারতাম।

কিন্তু সে রহস্য অজ্ঞাত।

পত্রিকা আমাদের দেশে এর আগে অনেক বেরিয়েছে, সার্থকও হয়েছে তাদের অনেক-গুলি, কিন্তু তার মধ্যে 'কল্লোল'-ই কেন যে ইতিহাসের এলাকা ছাড়িয়ে কিংবদন্তীর রাজ্যে পেঁছিল তা তাই বলা কঠিন।

কিন্তু 'কল্লোল' যে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার বিরুদ্ধবাদীরাও বোধ হয় করবেন না।

'কল্লোল' ও তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত 'কালি-কলম' একদিন সাহিত্যে একটা আলোড়ন নিশ্চয় তুলেছিল। কিন্তু সে রকম আলোড়ন তোলার নজির সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা আগে-পরে দেখাতে পারেন। 'কল্লোল'-এর চেয়ে অন্য পত্রিকার আরো জোরালো দাবিও কেউ কেউ পেশ করতে প্রস্তুত।

কিন্তু তবু অন্য সমস্ত পত্রিকা যেখানে ইতিহাস মাত্র 'কল্লোল' সেখানে কিংবদন্তী।

কল্লোলের এ কিংবদন্তী বিশেষ একটি কোন প্রতিভাকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছিল এমন কয়েকটি লেখকের সমষ্টিগত সাধনাকে অবলম্বন ক'রে। রচনাশক্তি, ভঙ্গি, এমন কি সাহিত্যধর্মের দিক দিয়েও যাদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

তফাৎ তাঁদের মধ্যে যতখানিই থাক মিলও যে কোথাও ছিল তা সে যুগের 'কল্লোল'-এর যে কোন লেখকের লেখা পড়লে বোধ হয় কিছুটা বোঝা যায়।

বিশেষ ক'রে সে লেখা যদি 'পটলডাঙার পাঁচালী' হয় আর লেখক হয় যুবনাশ্ব।

'কল্লোল'-এর কিংবদন্তী গড়ে ওঠার মূলে যাঁরা ছিলেন যুবনাশ্ব তাঁদের মধ্যে অগ্র-গণ্যদের একজন। 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠাতেও এ লেখকের নাম খুব বেশি দেখা যায়নি, 'কল্লোল'-এর পর সাহিত্যজগতে সে নাম ছাপার অক্ষরে কখনো-সখনো চোখে পড়েছে কি না সন্দে। তবু 'কল্লোল'-এর মতো যুবনাশ্বও কতকটা কিংবদন্তী হয়ে আছেন। লেখার স্বল্পতা কি সুদীর্ঘ নীরবতাও তাঁর স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেনি।

কেন যে পারেনি, 'পটলডাঙার পাঁচালী'-র কয়েকটি পাতা ওল্টাতে না ওল্টাতে তা বোধ হয় অস্পষ্ট থাকবে না।

পুরানো মাসিক 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠাতেই 'পটলডাঙার পাঁচালী' এতদিন প্রায় অজ্ঞাত-বাস করছিল। তাকে পুস্তকাকারে এতদিন বাদে যে প্রকাশক বার ক'রে এনেছেন তাঁরা যে লুপ্তরত্ন উদ্ধারের কীর্তি দাবি করতে পারেন এ যুগের গুণগ্রাহী রসিক পাঠকেরা তা অস্বীকার করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রথম প্রকাশের যুগে 'পটলডাঙার পাঁচালী' যে সাড়া জাগিয়েছিল তার মূলে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই হয়তো ছিল প্রধান। আজ অনুসরণে ও অনুকরণে সে অভিনবত্ব অনেকখানি ফিকে হ'য়ে গেলেও এ বই-এর মূল্য ও আবেদন এতটুকু কমেনি বলেই আমার মনে হয় এবং তা থেকে বোঝা যায় যে সাময়িক হুজুগের চেয়ে আরো স্থায়ী ও গভীর কোনো ভিত্তি এ কাহিনীর আছে।

'পটলডাঙার পাঁচালী' যাদের জগত নিয়ে লেখা আমাদের নগরজীবনের সেই অন্ধকার পাতালপুরীতে সাহিত্যের প্রবেশ সেদিন ছিল নিষিদ্ধ। সেদিন সাহিত্যের জাত খুইয়ে যাঁরা দুঃসাহস ভরে এ জগতে প্রবেশ করেছেন তাঁদের এ স্পর্ধা কোনখানে কারো মার্জনা পায়নি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও বদলেছে। সেদিন যার জন্যে এক ঘরে হতে হয়েছে আজ তারই জোরে সাহিত্যের সদরে নির্বিচারে সমাদরের ব্যবস্থা। নগরের আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর দিকের উল্টো পিঠে কাহিনীর উপাদান খুঁজতে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তাই আর মোটেই বিরল নয়। কিন্তু তবু মনে হয় যুবনাশ্বের সে পটলডাঙাকে কেউ এখনো তেমন ক'রে আবিষ্কার করতে পারেনি। সে পটলডাঙা যুবনাশ্বের কলমের নিপুন নির্ভীক আঁচড়ে উদ্ঘাটিত হয়ে সেদিন বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তি ও অস্বস্তিই উৎপাদন করেছিল বেশী। আজ সে অস্বস্তি ও বিরক্তি অনুভব করবার মতো শুচিবায়ু কাটিয়ে উঠে পাঠকসমাজ তার মধ্যে বিস্ময়ের চেয়ে আরো বেশী কিছু পাবেন। সেই বেশী কিছুটি হ'ল চিরন্তন সাহিত্য-রস। লেখকের গভীর মানবতাবোধ যার উৎস।

যুবনাশ্বের সে পটলডাঙা এই নগরের কোথাও টিঁকে আছে কি নেই জানি না; সেখানকার নফর সদী, পটলা খেঁদি বিন্দি ফতিমা হয় ত সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছে, হয় ত তারা অন্য নামে অন্য চেহারায় জীবনের অন্য স্তরে উঠে এসেছে বা নেমে গেছে, কিন্তু সাহিত্যের কল্পলোকে তাদের পরমায়ু অক্ষয় হয়েই রইলো বলে আমার বিশ্বাস।

যত ঊর্ধ্বলোকেই বিচরণ করুক সব সাহিত্যকে এতদিন এই পটলডাঙা আবিষ্কার করতে হয় মোহাচ্ছন্ন অন্ধতা কাটিয়ে জীবনের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বোঝবার জন্যে। এ আবিষ্কারের অভিযানে প্রথম যারা এগিয়ে যায় কোনো উৎসাহ কারুর কাছে তারা পায় না, পুরস্কারের বদলে লাঞ্ছনা ও শাস্তিই তাদের ভাগ্যে সেদিন জোটে। কিন্তু সাহিত্যের বিবেক চিরকাল অসাড় হয়ে থাকে না, কালের মহাধর্মাধিকরণে সংকীর্ণ গোষ্ঠির সাময়িক রায় পাল্টে যায়। একদিন যা অশুচি বলে অস্পৃশ্য ছিলো পরম সম্মানের বরমাল্য তার জন্য গাঁথা হয়।

'পটলডাঙার পাঁচালী'র সেই বরমাল্য-ই প্রাপ্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পটলডাঙার পাঁচালী—যুবনাশ্ব। সেঞ্চুরী প্রেস। কলিকাতা। দাম ২৷৹।

সমালোচনা

The Century of Total War. *By* Raymond Aron. The Beacon Press. Boston. Price $1.50.

মার্কিন মনীষীদের বাস্তববোদ্ধা বলে সুনাম আছে। দুরূহ সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা স্বপ্নরাজ্যে পলায়ন করেন না, উত্তরণের পথ অন্বেষণ করেন। তাঁদের দর্শনে দূরাগত আদর্শ ও মূল্যপরীক্ষার স্থান গৌণ, মুখ্য হোল বর্তমান জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর।

আমাদের ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গী একটু স্বতন্ত্র। মহামারির আক্রমণের মুখে আমরা নাম কীর্তন করি, ভূমিকম্প হলে আমরা আকাশে মুখ তুলে শঙ্খ বাজাই। কারণ আমাদের ধরণা জীবনের প্রশ্নও মৌলিক, সমাধানও মৌলিক, বর্তমানের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে তার অনুসন্ধান চলে না।

সুতরাং বিশ শতকের মারমূর্তি জাতি-সংগ্রামের জন্য সাংবাদিক রেমন্ড আরোঁ যখন প্রস্তুতির আহবান পাঠিয়েছেন আমরা তখন খুঁজি নিষ্কৃতির নিশানা। মনে সন্দেহ জাগে সত্যই কি এই ধ্বংসযজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করাই বাঁচবার অনন্য পন্থা?

এ যুগের জাতি-সংগ্রাম সর্বভুক। যুদ্ধ কেবল সেনায় সেনায় হয় না, হয় দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে। দেশরক্ষা প্রতি নাগরিকের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব। অতএব সৈনিক ও নাগরিক এখন এক। সমরসম্ভার উৎপন্ন হয় বহুপ্রসবিনী যন্ত্রশালায়—তাতে সারা দেশের ধনবল ও জনবল নিয়োজিত। এই বিরাট নাশযজ্ঞে জাতীয়তার পুরাতন মন্ত্র এখন অচল, এযুগে উচ্চারণ করতে হয় উদাত্ত মানবতার মন্ত্র,—সাম্য, মুক্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মহত্তর আদর্শের কথা।

পাশ্চাত্য মানস এই সর্বভুক সংগ্রামের আতঙ্কে আচ্ছন্ন। চোখে নিদ্রা নেই, ক্লান্ত দেহে শয্যার আশ্রয় নেই, প্রতীচ্য জগত সমরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অতন্দ্র নয়নে দাঁড়িয়ে আছে। এই যুদ্ধসজ্জা ও আয়োজনের মূল্য তাকে দিতে হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তিকে কেন্দ্রায়িত করে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে।

কেন এই আত্মঘাতী উদ্বেগ? সেই পুরাতন কথা,—পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রমন্ডলীর ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়েছে। এক রাষ্ট্রের বল যদি অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় তা হলে তার অগ্রগতি হবে দুর্বার, তার পদতলে নিষ্পেষিত হবে স্বাধীনতা ও মানবমূল্য। নেপোলিয়েনের ফ্রান্স ও হিটলারের জার্মানী যেমন ধূমকেতুর মত ইয়োরোপের আকাশে উদিত হয়েছিল, স্টালিনের রুশ তেমনই এক নূতন বিভীষিকা। কম্যুনিজম্-এর মায়াবলে এর সাম্রাজ্য ও সামরিক শক্তি আজ প্রচন্ড হয়ে উঠেছে। নেপোলিয়ন ও হিটলারের এই মায়াবল ছিল না। অতিকায় রুশের দুই প্রান্তে ছিল জার্মানী ও জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপ ও এশিয়ার এই দুই দ্বাররক্ষী বিধ্বস্ত হয়েছে। এশিয়ায় মহাচীন

রুশের সঙ্গে শিবির সন্নিবেশ করেছে। তার পূর্বান্তে ইয়োরোপের শাসনে ও শোষণে বিক্ষুব্ধ এবং রুশের সাম্যবাদের বাণীতে বিমুগ্ধ এশিয়া। আর পশ্চিমান্তে বিভক্ত, ভূলুণ্ঠিত, হৃতগৌরব ইয়োরোপ। পাশ্চাত্ত্য জগতের সামনে আজ রুশ দানবের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্নটাই বিশ্বরাজনীতির গোড়াকার কথা।

এই প্রসঙ্গের ভণিতা ও বিস্তার করেছেন রেমন্ড আরোঁ আমেরিকান দৃষ্টিকোণ থেকে। যুগের ইতিহাস যুক্তরাষ্ট্রের উপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে,—সোভিয়েত সাম্রাজ্য-বাদের হাত হতে ইয়োরোপের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ। এই হোল তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম।

দুনিয়ায় এখন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্থান নেই। আজকের সর্বভুক সংগ্রামে যে পরিমাণ ট্যাঙ্ক ও বিমানবহরের প্রয়োজন তা চার পাঁচ কোটি জনসংখ্যার কোন রাষ্ট্রের সাধ্যাতীত। ফ্রান্স, ইটালী এমন কি ইংলণ্ডও নিজ নিজ উপনিবেশ হারিয়ে আজ দৈন্যদশায় উপনীত হয়েছে। ইয়োরোপের বলগর্ব ধনগর্ব এমন কি সভ্যতার গরিমাও আজ ম্রিয়মান। সোভিয়েত রুশ ও আমেরিকা দুই যুযুৎসু মহাশক্তির মাঝখানে পড়ে হতাশ আশঙ্কায় সে কালগণনা করছে।

অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে বুঝি বা ইয়োরোপের সূর্য অস্তমান। বুঝি বা বিশ্বের ভাগ্যাকাশে অভ্যুদয় হবে নূতন কোন শক্তি ও সভ্যতার। যে ঐতিহাসিক জাতির আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়েছে তাকে বিদায় দিতে হবে, অশ্রুপাত করে লাভ নেই। ইয়োরোপকে এক রাষ্ট্রে সংগঠিত করে উজ্জীবিত করবার চেষ্টাও নিরর্থক, কারণ একরাট্ ইয়োরোপ এক অসম্ভব কল্পনা। সোভিয়েত অথবা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মত ইয়োরোপ খাদ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে স্বাবলম্বী নয়। পরস্পরের অভাব পরিপূরণ করবার ক্ষমতা ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নেই। তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার ধরনও পৃথক্। সর্বোপরি তাদের পরস্পরের মধ্যে আছে অবিশ্বাস ও ঈর্ষা। ঐক্যবন্ধনের জন্যে অর্থস্বাচ্ছল্য ও রাষ্ট্রনিরাপত্তার তাগিদ যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন স্বাজাত্যবোধ অথবা কোন একটি আদর্শের প্রেরণা—ইয়োরোপে যার একান্ত অভাব।

সুতরাং ইয়োরোপের মুস্কিল-আসান আজ আমেরিকা। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির বীজমন্ত্র হবে অতলান্তিক চক্রকে সুদৃঢ় করা। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র তার চিরাচরিত ঔদাসীন্য বর্জন করে বিশ্বরাজনীতির কুরুক্ষেত্রে অবতরণ করেছে। সে দানসত্র খুলেছে দুর্গত ইয়োরোপের জন্য, দরিদ্র এশিয়ার জন্য। আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে আজ আর শোষণের সম্পর্ক নেই। এই ত্রয়ীর মধ্যে নূতন অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এশিয়া কাঁচামাল বেচবে ডলার অঞ্চলে আর শিল্পপণ্য কিনবে ইয়োরোপ থেকে। সকলে হবে সাধারণ উন্নতির অংশীদার।

মোটামুটি এই হোল বিশ শতকের সমস্যা ও সমাধান। সোভিয়েত নীতির বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য লেখক বহু তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছেন। মার্ক্‌স্‌বাদ ও লেনিনবাদের খণ্ডনকল্পে তিনি বহু তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করেছেন। তার অধিকাংশ পুরাতন ও বহুশ্রুত এবং প্রস্তাবের প্রতিষ্ঠায় অপ্রয়োজনীয়। সাম্প্রতিক বিশ্বযুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ব্যাখ্যানে মার্ক্‌স্‌বাদ অথবা লেনিনবাদের প্রয়োগ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি

করেন না, কম্যুনিস্টরাও না। রুশবিপ্লবে মাক্‌স্‌বাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি, প্রমাণিত হয়েছে লেনিনের বিপ্লবী কৌশলের কার্যকারিতা—লেখকের এ মন্তব্য অকাট্য। কিন্তু এ নজির সোভিয়েত ও আমেরিকার নীতিমূল্যের বিচারে অবান্তর। আপ্তবাক্যের প্রতি আনুগত্য উদ্দেশ্য বা সততার মানদণ্ড নয়, প্রগতির প্রমাণও নয়।

রুশ ও আমেরিকার মূল্যবিচারে লেখক যে সকল তথ্য ও যুক্তি উপস্থিত করেছেন তা সত্যসন্ধী নয়, প্রচারসুলভ। যথা, রুশের পঞ্চবার্ষিক যোজনায় জনগণের কোন উন্নতি হয়নি; রুশে কম্যুনিস্ট দল জনসমর্থন লাভ করেছে জার্মানদের অত্যাচারের ফলে; দুটি মহাসমরের দৌলতে আজ রুশে ও অন্যত্র কম্যুনিস্ট দল ক্ষমতালাভ করেছে, দেশের সংগঠন অথবা উন্নয়নের কৃতিত্বে নয়। স্টালিনবাদের মন্ত্র ও মর্ম ছিল বিভীষিকা। সম্প্রতি সোভিয়েত রুশে যে স্টালিনবিরোধী অভিযান শুরু হয়েছে তা কোন আদর্শের পরিবর্তন সূচনা করে না। আত্মবিস্তারের এ এক অভিনব কৌশল।

পক্ষান্তরে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র শান্তি ও স্বাধীনতার অনুসন্ধী,—তার শান্তিসাম্রাজ্য শোষণমুক্ত। দুর্গত দেশের অভাব মোচনে সে মুক্তহস্ত, আতঙ্কিত দেশের স্বাধীনতা রক্ষণে তার দণ্ড উদ্যত। গণতন্ত্রের আদর্শে নিবেদিত শুচিশুদ্ধ তার রাজনীতি স্বার্থলেশহীন।

এ ধরণের বিচার বিশ্লেষণ অবশ্য আমেরিকার দৃষ্টিতে বাস্তবধর্মী, কিন্তু আমাদের তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে প্রচারধর্মী। সোভিয়েত শিবিরের প্রচারকার্যের সমান্তরালে পাশ্চাত্য শিবিরের প্রচারকার্যও চলবে সমান উদ্যমে,—এ স্বাভাবিক ও অনিবার্য। এ হোল সর্বভুক সংগ্রামের নান্দীপাঠ, যার নাম 'শীতল সংগ্রাম'। এই বাদানুবাদে কোন পক্ষেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অথবা বৈদগ্ধ্য আশা করা যায় না। যেখানে বিরোধ পরম সত্য, সেখানে বিরোধিতাই বাস্তব ধর্ম। বৈজ্ঞানিক অপক্ষপাত সেখানে অপাংক্তেয়।

তথাপি স্বীকার করতে হবে যে লেখকের প্রচারকৌশল সংযত, তাতে বিরোধীদলের প্রচারপ্রণালীর ন্যায় উত্তাপ ও কটুবাক্য নেই। কোথাও কোথাও তাঁর উক্তি ও যুক্তি অবধানযোগ্য। আজ শান্তি-আন্দোলনের আওয়াজ হোল আণবিক অস্ত্রের নির্বাসন। এ আওয়াজে রুশ সুর মিলিয়েছে। আণবিক অস্ত্রে সে আমেরিকার পিছনে, ক্যানাডা ও ইংলণ্ডকে নিয়ে যে অতলান্তিক চক্র তার অনেক পিছনে। অন্যান্য অস্ত্রে ও উপকরণে প্রাচ্য শিবির পাশ্চাত্য জগতের সমকক্ষ, বরং ইয়োরোপে রুশ অভিযান রোধ করবার জন্য আমেরিকাই যথেষ্ট প্রস্তুত নয়। আণবিক অস্ত্র-নির্বাসনের আন্দোলনে রুশের অভিসন্ধি অতি স্পষ্ট। বস্তুত কোন মারণাস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ করে শান্তিরক্ষার কল্পনা আকাশ-কুসুম।

রাষ্ট্রীকরণকে লক্ষ্য করে লেখক বলছেন,—উৎপাদনযন্ত্রের কর্তৃত্ব ব্যক্তির হাতে রইল না রাষ্ট্রের হাতে রইল,—তার উপর মানুষের জীবনমান নির্ভর করে না, নির্ভর করে উৎপাদন-শক্তির উপর। অধিকন্তু রাষ্ট্রীকরণে ধনবল ও রাষ্ট্রবল একত্র হয়ে এক সর্বময় আমলাতন্ত্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। স্বীকার করতে হবে যে অন্তত আমাদের দেশে রাষ্ট্রীকরণে সমাজ-বৈষম্যের নিরসন হচ্ছে না। ব্যক্তি-মালিকানায় যদি মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে বেকারির উপশম হয়, ধনের অপচয় বন্ধ হয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আর পক্ষান্তরে কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে যদি তার বিপরীত ফল দেখা যায়, তা হলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণীয় হবে তার পুনর্বিচার করা দরকার। সমাজবাদের আসল কথা ধনসাম্য,— মালিকানা উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষ যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা হলে বর্জনীয়। ধনবৈষম্যের সমাধান যে কোন বাঁধাধরা ফর্মুলা দিয়ে হয় না,—অনেক পরীক্ষার ব্যর্থতা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

লেখকের বাস্তববোধ স্বীকার্য। দুঃখের কথা যে বাস্তবধর্মী আদর্শের বিজ্ঞাপন মানুষের অন্তর স্পর্শ করে না। মার্কিন মনীষীর যুক্তিজাল ছিন্ন করে যখন প্রলয়াস্ত্র গর্জন করে ওঠে, তখন অসহায় মানুষ রূঢ় বাস্তবের বাইরে স্বপ্নলোকে আশ্রয় খোঁজে, সন্ধান করে নূতন বাণীর, নূতন এক সমাধান ও সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতির। ইতিহাস আশ্বাস দেয়। কারণ বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তার পথযাত্রা, সামঞ্জস্যই তার ধর্ম। যে বাস্তবী বর্তমানের ঘূর্ণীচক্রে আবর্তিত তার কাছে ইতিহাসের বাণী পেঁছায় না। যে প্রজ্ঞানী বর্তমানের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তে কর্ণপাত করতে পারে সেই শুনতে পায় অনাগত কালের পদধ্বনি, তার বাণীতে ব্যক্ত হয় ইতিহাসের প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীঅরবিন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সোভিয়েত রুশে একদিন শিক্ষার প্রসারের ফলে তাদের ছাঁচ ফেটে চুরমার হবে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব আবার আত্মপ্রকাশ করবে। সেদিন হবে একতন্ত্রের সমাধি এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য। অরবিন্দ বলেছেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিবিরের বিরোধের ধার ক্রমশ সংঘর্ষে ক্ষয় হয়ে যাবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজবাদ ও ব্যক্তি-অধিকারে ক্রমমিলন ঘটবে। আজকের উগ্র বৈরিতা এই মন্ত্রসন্ধির ভূমিকা।

ইতিহাসের এই প্রতিশ্রুতি আজ বাস্তবের রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করছে। আফ্রো-এশিয়ার জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন অতলান্তিক দুর্গে ফাটল ধরিয়েছে, আজ তেমন পূর্ব ইয়োরোপের জনবিক্ষোভ সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলে কাঁপন লাগাচ্ছে।

ভারতীয় মনীষার এই দৃষ্টির পশ্চাতে একটি সুদৃঢ় প্রত্যয় আছে। সে প্রত্যয় এই যে মানবাত্মার বিনাশ নেই। অতীতে যেমন মানুষ নগ্ন নিঃসহায় বন্যদশা হতে বহু যুগসন্ধি অতিক্রম করে মানবতায় উপনীত হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতেও তার জয়যাত্রা হবে অবারিত, অব্যাহত, সে স্থাপন করবে আত্মার সাম্রাজ্য। মানুষের বিশ্ববোধ ও কল্যাণচেতনা শত সহস্র উৎকট বিভীষিকা উত্তরণ করে যুগযুগান্ত ধরে এই দুরায়ত্ত সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে।

অতীন্দ্রনাথ বসু

The Chatto Book of Modern Poetry. Edited *By* C. Day Lewis and John Lehmann. Chatto and Windus. London. 15*s*.

অল্প কথায় এই ধরনের বই-এর ভালোমন্দ বিচার করা কিংবা সংক্ষেপে এর সারমর্ম উদ্ধার ক'রে দেওয়া সহজ নয়, এই কারণে যে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত যে সব ইংরেজ কবিরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ৯৬ জনের দু'চারটি ক'রে কবিতা দিয়ে সঙ্কলনখানির কলেবর গড়ে উঠেছে।

সঙ্কলনে কোন ভূমিকা নেই। মলাটে প্রকাশকরা সংক্ষেপে বলেছেন যে ১৯১৫-৫৫ সালের মধ্যে রচিত এবং তাঁদের মতে ভাব, কাব্যগুণ ও আঙ্গিকের শ্রেষ্ঠত্বে বিশিষ্ট কবিতাই এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে, কোন একটা গোষ্ঠী অথবা উদ্দেশ্য দেখে বাছাই করা হয়নি।

এদেশী সাধারণ পাঠকের কাছে এ কবিদের অনেকেই অপরিচিত। কবে এবং কিরকম পরিবেশে তাঁদের সাহিত্যপ্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল সেদিকে কোন দৃকপাত না করার ফলে পরিপূর্ণ ভিক্টোরীয় হার্ডি কিপলিংদের সঙ্গে সঙ্গে অডেন ডিকিন্‌সনও রয়েছেন।

পাঠকমাত্রেরই মনে হবে ডে-লুই ও লেম্যানের মতো বিচক্ষণ সম্পাদক এবং সমালোচকরা কেন এই বিশেষ একচল্লিশটি বছর বেছে নিলেন? এর মধ্যে কোন একটা বিশেষ যুগের আরম্ভ ও অবসান ঘটেনি, যুগধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, যার প্রভাব কবির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে বলে শোনা যায়, তাও কিছু গড়ে ওঠেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যাঁরা কাব্যরচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও কাব্য-রচনা ছেড়ে দেননি। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের মন থেকে একটা আক্রমণাত্মক একগুঁয়ে আদর্শবাদ বিদায় নেয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এই আদর্শবাদের চিহ্নমাত্র নেই। কাজেই একাসনে বসালেও ঐকতান আশা করা যায় না।

তবে যদি শুধুমাত্র খেয়াল অনুসারে সন-তারিখ হিসাব ক'রে সংকলনটি করা হয়ে থাকে, তাহলে কারো কিছু বলবার থাকে না। কেউ কেউ হয়তো বাদ পড়ে গেছেন, কিন্তু যেখানে সকলের স্থান সংকুলান হবে না, সেখানে কাকে ছেড়ে কাকে রাখা হবে, সে বিচার সম্পাদকরাই করবেন। তবে এটুকু মনে হয় যে এইরকম পাঁচমিশেলী আয়োজনে কবিদের জন্মতারিখ ও পরিশেষে একটুখানি ব্যক্তিগত পরিচিতি দিয়ে দিলে বিদেশী পাঠকদের সুবিধা হত।

কবিতাগুলি রচিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসের সব চাইতে মর্মান্তিক একচল্লিশটি বছরের মধ্যে যখন একটা নিদারুণ আঘাতে পুরানো মামুলী আদর্শবাদগুলো ভেঙে গিয়ে যদি-বা একটা নতুন মানবিকতা গড়ে উঠছিল, ঠিক সেই সময়, সে-ধরনের মানবিকতারও যে আদৌ কোন ভিত্তি নেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সে কথা প্রমাণ ক'রে দিল। হয়তো তাতে ভালোই হল, অবলম্বন খসে যাওয়াতে একটা আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠবার অবকাশ পেল।

If, in that Syrian garden, ages slain
You sleep, and know not you are dead in vain, ...
Sleep well, and see no morning, son of man.
But if . . . . . .
You sit and sitting so, remember yet
Your tears, your agony and bloody sweat,
. . . . . . and the life you gave,
Bow hither out of heaven, and see and save!

—*Easter Hymn,* Housman.

ইয়েটস-এর মৃত্যুর পর অডেন লিখলেন :

Stares from every human face,
And the seas of piety lie.
Locked and frozen in each eye
Follow, poet, follow right
To the bottom of the night, ...
With the farming of a verse
Make a vineyard of the curse.
In the deserts of the heart

Let the healing fountain start
In the prison of his days
Teach the free man how to praise.

—*Intellectual Disgrace.*

যারা যুদ্ধ করে তাদের চাইতে যারা কাব্য-রচনা করে তারা অনেক বেশী প্রবল। নিদারুণ হতাশার মধ্য দিয়েও যে একটা প্রচণ্ড পৌরুষ গড়ে উঠতে পারে, স্টিফেন স্পেণ্ডারের Polar Expedition-এ তার একটু আভাস পাওয়া যায়।

বাইবেলে একটা কথা আছে, নুন যদি তার লবণত্ব হারায় তাহলে আর সে কোন কাজে লাগবে? আধুনিক কবিতার বিপক্ষেও এই অভিযোগ শোনা যায় যে তার বাক্‌চাতুরী আছে কিন্তু কাব্যগুণের একান্ত অভাব। যে কোন যুগের কাব্যের সমালোচনা করতে হলে সে সময়কার শ্রেষ্ঠ কাব্য নিয়ে বিচার করতে হয়। কিন্তু কাব্যের ভালোমন্দ বিচার হবে কি দিয়ে? ম্যাথু আর্নল্ড বলেছিলেন সব ভাষাতেই কাব্যের কষ্টিপাথর আছে, যার পাশে দাঁড় করালেই যে কোন কবিতার ভালোমন্দ প্রকট হয়ে পড়ে। ক্রিস্টিনা রসেটির Goblin Market যাঁরা পড়েছেন তাঁরা উইলিয়ম প্লুমারের The Caledonian Market-ও পড়ুন, ভিক্টোরীয় অবাস্তব রূপকথার সঙ্গে আধুনিক বাস্তবদর্শন তুলনা ক'রে দেখুন।

তাই বলে সব কি আর একরকম হয়? সেই প্রাচীন প্রসন্ন ঔদার্যকে খুঁজে পাওয়া শক্ত, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিঙ, টেনিসনের সেই সুগভীর সুবুদ্ধি, যা দিয়ে একটা মনের মতো অন্বয়ে উপনীত হওয়া যেত, যা পাবার নয় তাকে ছেড়ে দেওয়া হত, যা পাবার তাকে চিনে নেওয়া যেত, সব সমস্যার একটা সমাধানের নিদেন একটা সংকেতও পাওয়া যেত। তাকেই যদি কাব্যগুণ বলা হয়, তাহলে হয়তো আর কোনদিনও তাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু মনে হয় যে কাব্যের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে—আর উদ্দেশ্যও যে থাকতেই হবে এমনই বা কোন কথা আছে কি? তবু যদি থাকে,—সে তো তো সমাধান ক'রে দেওয়া নয়, বরং সে হল অন্বেষণ করা। সমাধানের মধ্যে একটা বিরতির চিহ্ন আছে যা কাব্যধর্মের বিরোধী। পিটার কুইনেলের While I have vision দ্রষ্টব্য।

আধুনিক কাব্য-সমালোচনা সম্পর্কে এ কথাও শোনা যায় যে জীবনকে ও জগতকে ঘৃণা করলে কাব্যরচনা কঠিন হয়ে ওঠে, কোথাও একটা প্রেমের বীজ লুকিয়ে না থাকলে কাব্য হয় না। তবে ঘৃণ্য জিনিসকে ঘৃণা করা ও জীবনকে ঘৃণা করা এক কথা নয়। অযোগ্য আদর্শে বিশ্বাস হারানোও যেমন বিশ্বাসঘাতকতা নয়। এন্, আর রজেসের White Christmas শ্লেষে ভরা, কিন্তু তার মূলে ঘৃণার চাইতে প্রেম বেশী।

আধুনিক কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আমার অভিপ্রেত নয়, আজকাল অকবিরা কবিতা লেখেন বলে সমস্যাটি অতিশয় জটিল রূপ নিয়েছে। কাব্য কোন একটা যুগের একচেটিয়া সম্পত্তি হতে পারে না, নদীর মতো ক্রমাগত সে সাগরের দিকেও প্রবাহিত হয় না, মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে যায়। অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্যের বিশাল বিমূঢ় প্রকৃতিবাদ, চসারের যুগের প্রবল প্রাণশক্তি, এলিজাবেথীয় ও ভিক্টোরীয় যুগের উদার সমৃদ্ধি, ক্যারোলাইন যুগের উদ্দাম-মধুর আবেগ এবং তৎপরবর্তী যুগের মর্মভেদী শ্লেষ—এসব প্রচণ্ড শক্তি যে পরিবেশে বিকশিত হয়ে ওঠে, আমাদের কবিরা তা পাবেন না। ঝড়-বাদলে কঠিন ভূমিতে যে ফুলকে ফুটতে হয়, সে তার উপযুক্ত রূপ নিয়েই ফোটে। কাব্যগুণশূন্য কোন যুগ হতে পারে না, পূর্বেই বলেছি যুগের সেরা রচনা দিয়ে যুগের অন্য লেখার মান বিচার করতে হয়। সেই দিক

দিয়ে এই সঙ্কলনখানির অনেক সার্থকতা আছে, যদিও দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে নাম-করা কবিদেরও যে-সকল কবিতা নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলি তাদের শ্রেষ্ঠ রচনা কিনা তাই নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। এই তালিকার মধ্যে ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার, ইয়েটস, ব্রিজেস, বিনিয়ন, মেসফিল্ড প্রমুখেরও নাম করা যেতে পারে।

লীলা মজুমদার

Cyprus Challenge. *By* Percy Arnold. Hogarth Press. London. 21*s*.

পার্সি আর্নল্ড একজন ইংরেজ সাংবাদিক; ১৯৪২-৪৫-এ তিনি ছিলেন 'সাইপ্রাস পোস্ট' কাগজের সম্পাদক। দশ বছর আগে সাইপ্রাসে তিনি যা দেখেছিলেন, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার কাহিনী বর্ণনায় আজকের সাইপ্রাসের দুরূহ দুঃখদীর্ণ সমস্যাটি সহানুভূতির সঙ্গে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর্নল্ডের নিজের চোখে দেখা ১৯৪২-৪৫-এর সাইপ্রাস আর ১৯৫৬-৫৭-র সাইপ্রাসে অবশ্য আকাশ-পাতাল তফাত। ১৯৪২-৪৫ ছিল যুদ্ধকালীন অবস্থা, সে সময়ে সাইপ্রাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীক অধিবাসীর দুর্ভাবনা ছিল প্রধানত গ্রীসের ভবিষ্যত নিয়ে; নাৎসী-ফ্যাসিস্টগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাইপ্রাসবাসীরা ছিল ইংরাজের পক্ষে, আর তাদের মনে আশা ছিল যুদ্ধের শেষে সাইপ্রাসকে তার নিজের ভবিষ্যত স্বাধীনভাবে স্থির করবার সুযোগ দেবে হোয়াইটহলের কর্তারা। সাইপ্রাসবাসীদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্তের ছোট এই দ্বীপটুকু দখলে রাখার জন্য হোয়াইটহলের কর্তারা ১৯৫৫ সনের অক্টোবর থেকে যে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' চালু করেছেন তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। সাইপ্রাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীক অধিবাসীদের (৩৬২,০০০) দুর্জয় সংকল্প এবং সংগ্রামেরও তুলনা বিরল। এইরকমেরই আর-একটি ছোট দ্বীপ কর্সিকায়, আঠারো শতকে স্বৈরাচারী ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সাইপ্রাসের সমস্যা আঠারো শতকের কর্সিকার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। প্রথমত, এই ছোট দ্বীপটুকুর মালিকানা নিয়ে বৃটেন, গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে দীর্ঘকালের বিবাদ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাইপ্রাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীক অধিবাসীরা কেবলমাত্র বৃটিশ শাসনের অবসানই চায় না, তারা চায়—সাইপ্রাস গ্রীসের সঙ্গে একীভূত হোক। সাইপ্রাসের এই গ্রীসভুক্তির দাবীর নাম ENOSIS, আর এই দাবী নতুন নয়, বহু বৎসর ধরে এর জন্য সাইপ্রাস-ও গ্রীসের অধিবাসীরা, গ্রীস-চার্চের প্রধানরা আন্দোলন ক'রে আসছেন। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে বৃটিশ যুদ্ধবিশারদগণের কাছে সাইপ্রাসের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে ইংরেজকে সরে আসতে হয়েছে, ভারতবর্ষ ছাড়তে হয়েছে, প্যালেস্টাইন থেকে বৃটিশ তদারকী বন্দোবস্ত তুলে নিতে হয়েছে; তারপর মিশর ও জর্ডান থেকেও পিছু হটতে হয়েছে। সাম্রাজ্যের সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় তাই গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে strategic island গুলির; জিব্রাল্টার থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যিক সামরিক স্বার্থের শেষ আশ্রয় তাই মাল্টা, সাইপ্রাস, এডেন, বুশায়ার, বাহেরিন ইত্যাদি

ঘাঁটিগুলি। অনেক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কথায় ও লেখায় প্রায়ই এখন কাতর আবেদন শোনা যাচ্ছে, "আমরা তো এতই ছেড়ে দিয়েছি, ভারতবর্ষ থেকে গোল্ড কোস্ট পর্যন্ত কত দেশের স্বাধীনতা দিয়েছি, ছোট এইটুকু সাইপ্রাস যদি আমাদের দরকারে হাতে রাখি, তার জন্য এত চিৎকার, এত প্রতিবাদ কেন?" এই আক্ষেপকে বিদ্রূপ ক'রে কোনো কোনো উদারপন্থী ইংরেজ স্মরণ করেছেন বিপথচারিণী তরুণী সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্প—আদালতে গিয়ে হতভাগিনী বলেছিল, "Such a little baby" -র জন্য এত ধিক্কার ও লাঞ্ছনা সইতে হবে কেন। সাইপ্রাস হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থ-প্রসূত "such a little baby."

আরও একটু পেছিয়ে গিয়ে প্রায় আশি বৎসর পূর্বের কাহিনী স্মরণ করা যাক। ১৮৭৮ সনে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমলে সাইপ্রাস অধিকার করে বৃটেন তুরস্কের কাছে থেকে। সে সময়টা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ, আর সাম্রাজ্যের স্বর্ণলংকা প্রতিষ্ঠায় ভিক্টোরিয়ার পরম আদরের প্রধান সচিব ডিজরেলীর ভূমিকা যে অসামান্য ছিল এ-কথা সকলেই জানেন। ডিজরেলী বলেছিলেন কূটনীতির চাপ দিয়ে যদি তুরস্কের কাছ থেকে সাইপ্রাস আদায় না করা যায় তাহলে বলপ্রয়োগেই আদায় করতে হবে। একমাত্র লর্ড ডার্বি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত কূটনীতির চাপেই ডিজরেলী সাইপ্রাসে বৃটিশ পতাকা উড়াতে পেরেছিলেন। ১৮৭৮ সনের এই ঘটনার পূর্বে ৩০০ বছর সাইপ্রাস ছিল তুরস্কের শাসনাধীন। সাইপ্রাসের ইতিহাস অবশ্য সুপ্রাচীন, প্রায় দুহাজার বৎসর কাল তার ইতিহাসের বিস্তৃতি এবং বহু শক্তির উত্থান-পতন।

সাইপ্রাস দখলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডিজরেলীর স্পষ্ট ভাষণ এখানে উল্লেখ করলে বোঝা যাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেই স্বর্ণযুগে ভারতবর্ষই ছিল সাম্রাজ্যিক সামরিক স্বার্থের চাবিকাঠি। ১৮৭৮ সনে সাইপ্রাস দখলে প্রধানত ভারতীয় ফৌজ পাঠানো হয়েছিল জেনারেল উলসনের অধিনায়কত্বে। সে সময়ে ডিজরেলী লিখছেন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে,

"If Cyprus be conceded to Your Majesty . . . . the power of England in the Mediterranean will be absolutely increased in that region, and Your Majesty's Indian Empire immensely strengthened. Cyprus is the key to Western Asia."

এর তিনমাস পরে ডিজরেলী (তখন লর্ড বিকন্‌সফীল্ড) হাউস অব্ লর্ডসে আরও স্পষ্ট-ভাষায় ঘোষণা করলেন :

"In taking Cyprus the movement is not Mediterranean, it is Indian. We have taken a step there which we think necessary for the maintenance of our Empire and for its preservation in peace."

ভারতসাম্রাজ্য নির্বিবাদে দখলে রাখার জন্যই সাইপ্রাস চাই—এই ছিল ৭৮ বছর পূর্বে সাম্রাজ্যিক বৃটেনের যুক্তি। ভারতসাম্রাজ্য আজ বিলীন হয়েছে, পশ্চিম এশিয়াতেও বৃটিশের সাম্রাজ্যিক গর্ব ধূলিসাৎপ্রায়। সাইপ্রাসের ঘাঁটি থেকেই ইংরেজ অতর্কিতভাবে আক্রমণ সুরু করেছিল মিশরে পোর্ট সৈয়দের উপরে। সে আক্রমণও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, যেমন ব্যর্থ হয়েছে বৃটেনের সাইপ্রাস-নীতি। আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সকে নির্বাসনে পাঠিয়েও সাইপ্রাসবাসীদের স্বাধীনতাসংগ্রাম রোধ করা যায়নি। সাইপ্রাসের বর্তমান শাসনকর্তা একজন যুদ্ধবিশারদ ফিল্ডমার্শাল, স্যার জন হার্ডিং; তিনিও সাইপ্রাসবাসীদের

বিদ্রোহী সংগঠন EOKA-র কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারেননি; যেমন কেনিয়া এবং মালয়ে তেমনি এখন সাইপ্রাসে বৃটিশ অভিভাবকেরা জরুরী সামরিক আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার করছেন, লক্ষ লক্ষ পাউন্ড পিটুনী ট্যাক্স, জরিমানা চাপিয়েছেন সাইপ্রাসের সহরে ও গ্রামাঞ্চলে। স্যার জন হার্ডিংও স্বীকার করছেন, সাইপ্রাসের সমস্যা কামান-বন্দুক দিয়ে সমাধান করা যাবে না, রাজনৈতিক সমাধানই জরুরী প্রয়োজন। কিন্তু সামরিক স্বার্থে strategic island দখলে রাখার নীতির সঙ্গে মিল রেখে সাইপ্রাসের গ্রীক অধিবাসীদের রাজনৈতিক দাবী পূরণের মতো সমাধান কোথায় পাওয়া যাবে? তাই এখানেও খুব সম্ভবত বৃটিশ সরকার 'Divide and Quit' ধরনের কোনও একটা পরিকল্পনা কাজে খাটানোর মতলব করছেন।

সাইপ্রাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো গ্রীক অধিবাসীরা—লোকসংখ্যার শতকরা ৮০·২ ভাগ। এদের দাবী, সাইপ্রাস গ্রীসের অঙ্গীভূত হোক। এদিকে তুরস্কের হলো পুরানো সত্বের দাবী সাইপ্রাস দ্বীপের উপরে এবং তা নিয়ে গ্রীসের সঙ্গে তার বিবাদ এখন আরও জটিল হয়েছে। সাইপ্রাসে তুর্কী জনসংখ্যা অবশ্য মাত্র ৮১০০০ অর্থাৎ শতকরা ১৭·৯ ভাগ। কিন্তু তাহলে কি হয়? সাইপ্রাস নিয়ে গ্রীস বনাম তুরস্কের বিবাদে 'নিরপেক্ষ' বৃটিশ সরকার এখন বলবার সুযোগ পাচ্ছেন, গোলমেলে এই সম্পত্তি কারো হাতেই একেবারে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া চলে না। এ-সব ব্যাপারে বৃটিশ অভিভাবকদের দায়িত্বজ্ঞান চিরকালই প্রখর, ভারতবর্ষে তা' আমরা দেখেছি। অতএব ভারতবর্ষ বিভাগের সীমানা-সরহদ্দ করতে যে ভদ্রলোকটির আগমন হয়েছিল সেই র‍্যাডক্লিফকে (বর্তমান লর্ড) পাঠানো হলো সাইপ্রাসে কথাবার্তা চালানোর জন্য। কিন্তু লর্ড র‍্যাডক্লিফ কথাবার্তা বলবেন কার সঙ্গে? সাইপ্রাস-বাসী গ্রীকদের নেতৃস্থানীয় আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স তো নির্বাসনে, আর বে-আইনী EOKA হলো ফিল্ডমার্শাল স্যার জন হার্ডিং-এর দৈনন্দিন শিকার আর রাত্রির দুঃস্বপ্ন। বাকী রইল সাইপ্রাসের তুর্কী এবং আর্মেনিয়ানরা, যারা জনসংখ্যার শতকরা ১৯ ভাগ মাত্র এবং তারা রাজনীতি বিষয়ে খুব সচেতন নয়। লর্ড র‍্যাডক্লিফের সাইপ্রাস-দৌত্য তাই সফল হয়নি, যেমনটি হতে পেরেছিল ভারতে 'Divide and Quit' মন্ত্রের জোরে। ভিকির কার্টুনে তাই দেখি, লর্ড র‍্যাডক্লিফ সাইপ্রাসে এক জনশূন্য প্রান্তরে মাটির ঢিবির উপরে রাজকীয় কায়দায় বসে আছেন, তাঁর চারদিকে বেশ শক্ত মোটা ক'রে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা আর সামনে ফলাও ক'রে নোটিশ—"আমি সকলের সঙ্গে দেখা করব!" ("I'll meet everybody!") সাইপ্রাস-নাটকের পঞ্চমাঙ্কের পরিস্থিতি এখন এইরকম; শেষ দৃশ্যে কি হবে তা' কল্পনা করা দুঃসাধ্য। Strategic island দখলে রাখলেই সাম্রাজ্যের সামরিক স্বার্থ নিরাপদ, এই ভ্রান্তধারণা বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এখনও ছাড়তে পারেননি। অথচ সাইপ্রাসের ঘাঁটি থেকে অতর্কিতভাবে মিশরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ায় বৃটেনের সামরিক কিংবা সাম্রাজ্যিক কোনও স্বার্থই শক্তিশালী হয়নি, নৈতিক পরাজয়ের কথা বাদ দিলেও এটা এখন সুস্পষ্ট।

পার্সি আর্নল্ডের সাইপ্রাস-অভিজ্ঞতার বিবরণে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ অবশ্য নেই, থাকা সম্ভব নয়। তবে আর্নল্ড একজন উদারচিত্ত স্পষ্টভাষী সত্যানুসন্ধানী সাংবাদিক। ১৯৪২-৪৫এ সইপ্রাসের একমাত্র ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে সাইপ্রাসের শাসনব্যবস্থা ও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিযোগগুলি তিনি বে-সরকারী চোখ দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, সহৃদয়তার সঙ্গে সাইপ্রাসের ভবিষ্যত বিচার করতে চেষ্টা

করেছিলেন। আর্নল্ডের সাইপ্রাস-দর্শনের অভিজ্ঞতা দশ-এগার বৎসর পূর্বের হলেও তাঁর বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা সাইপ্রাসের বর্তমান অবস্থাটি বুঝবার পক্ষে চমৎকারভাবে কার্যকরী। ইংরেজ সাংবাদিকের স্মৃতিকথা হিসাবেই বইখানি সরস, সুখপাঠ্য। সবচেয়ে আনন্দের এবং প্রশংসার হলো তাঁর স্পষ্টভাষণ। উপনিবেশবাদ কথা 'কলোনিয়ালিজমের' উপকারিতা সম্বন্ধে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ এবং বেলজিয়ান শাসক-অভিভাবকেরা চিরকালই প্রশংসায় পঞ্চমুখ—উপনিবেশের মালিকেরা নাকি তাঁদের অধীন নাবালক প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই উপনিবেশ চালিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষেও কোনও কোনও মহল বিভিন্ন বিদেশী 'এম্ব্যাসী'র কৃপায় উপনিবেশবাদের উপকারিতা বর্ণনায় প্রশংসাকীর্তনে উৎসাহী হয়েছেন সম্প্রতি। এঁদের মতে সুসভ্য ফরাসী উপনিবেশবাদ আলজেরিয়া, মরক্কোর অধিবাসীদের পক্ষে খুব খারাপ নয়, অকৃতজ্ঞ মিশর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক 'অবদান' অস্বীকার ক'রে বড়ই নির্বুদ্ধিতা করেছে। এই ধরনের অনেক ইঙ্গ-ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা উপনিবেশবাদের নতুন সহৃদয় মূল্যায়নের জন্য ওকালতি পর্যন্ত সুরু করেছেন। পার্সি আর্নল্ডের কয়েকটি মন্তব্য তাই এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উপনিবেশবাদ তথা 'কলোনিয়ালিজমের' পরম উপকারক ভূমিকার ছলনা ও কপটতা ইংরেজ সাংবাদিক পার্সি আর্নল্ড ভালোমতোই দেখেছেন সাইপ্রাসে। আর্নল্ডের কথা দিয়েই উপনিবেশবাদের নতুন দরদীদের জবাব দেওয়া যায়—

"Why then in 1955 and early 1956 were there camps of Cyproits detained without trial, and troops everywhere searching town and village, seashore and forest for subversive elements? . . . . Why is Britain there at all? Indeed, it is precisely because most Englishmen do their best to avoid first this question—why is Britain there at all? —that most of the misunderstanding arises about Cyprus and in Cyprus.

For my part, I find it first a little difficult to believe that Britain continues to occupy Cyprus, as I have heard it said, in order to build roads, which Britain has done moderately well; or to eliminate malaria, which she has done excellently; I can indeed, almost believe, having seen the zeal that can possess technical officers, that Britain is in Cyprus so that a forestry official can, before he dies or is transferred, repair the forestal ravages of the ancient Egyptians seeking timber for their ships, but even so, I find it hard to believe that this weighs heavily at British Cabinet discussions about the fate of Cyprus; I also doubt if Britain is in Cyprus in order to give to the island low-interest loans and free grants now totalling in all some £ 8,000,000 from the Colonial Welfare and Development and other Funds; and so I do not believe that Britain remains in Cyprus for any one of these reasons, or for the sum total of them.

I find it a decadent form of imperialism for Englishmen to parade

a dozen and more pretexts why Britain should remain in Cyprus. They are merely endeavouring to hide the real reason from themselves, because they certainly don't succeed in hiding it from anyone else—and particularly not from the Cypriots. Cypriots—whether they approve, acquiesce or disapprove—know perfectly well why Britain retains control of their homeland.

Britain is in Cyprus in her own interest, and that is her strategic interest. The strategy may be misguided—the Navy for long regarded Cyprus as a disadvantage rather than an advantage, and in 1878 it was the Army that recommended Cyprus as a British place of arms in the eastern Mediterranean; or in three quarters of a century strategy may have changed, but, just as it was the motive that led Britain into occupying the island in 1878, so it remains the overriding reason keeping Britain there till now."

সরোজ আচার্য

The Dragon and the Unicorn. *By* Kenneth Rexroth. New Directions. New York. $ 3.00.

আধুনিক মার্কিন কবিদের আমি যথেষ্ট সমীহ করি কিন্তু তাঁদের কাব্যকলার কোনো তৃপ্তিকর স্বাদ উপভোগে আমি প্রায়শঃই অপারগ। সমীহ করি কেননা অন্য যে অভাববোধ থেকেই তাঁরা কবিতার চর্চা করুন না কেন, আর্থিক অভাব বোধ হয় তার অন্তর্গত নয়। ভদ্রবেতনে কবিরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হয়ে থাকেন; প্রবেশমূল্যের হার উচ্চ হলেও স্বরচিত কবিতাপাঠের অধিবেশনে উৎসাহী শ্রোতার কখনো অভাব হয় না, এবং সংগৃহীত অর্থের সবটাই কবির প্রাপ্য হয়। কবিরা, মোটকথা, সেদেশে বিশিষ্ট নাগরিকদেরই অন্যতম। নানা আকারের, নানান সুরের কবিতা-পত্রিকাও সেদেশে অসংখ্য। মহিলা আর নববিবাহিতের পক্ষে 'অত্যাবশ্যক' বিলাসদ্রব্যের সচিত্র বাতায়ন স্বরূপ পত্রিকাদিতেও কবিতা ছাপার রেওয়াজ সেদেশে বিরল নয়; আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কবিরা যদিও কদাচ সেদিক ঘেঁষেন না, সে ধরনের কাগজে ছাপাতে পারলে মার্কিন দেশেও ঐ একটি পদ্যের আয়েই পুরোমাসের খরচা মোটামুটি উঠে যেতে পারে বলে শোনা যায়। এদিকে বিত্তবান সম্প্রদায়ের মহিলারাও উদারচিত্তে কবিতা-পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করে থাকেন।

কবিদের পক্ষে অবস্থাটা অতিশয় কাম্য সন্দেহ নেই। এবং এই জন্যেই সে দেশের কবিদের সমীহ করতে হয় যে তাঁরা কবিতার মতো একটা ভাষানির্ভর জিনিস রচনা করেই এহেন সভ্য ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছেন—যে কবিতা দিয়ে কোনো আশু কার্যসিদ্ধির কোনোই সম্ভাবনা নেই, এমনকি যে কবিতায় মার্কিন দেশের সমূহ নিন্দা এবং সমালোচনাও অবাধেই করা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক মার্কিন কবিতা বুদ্ধি আর বিদ্যার উপর অতিমাত্রায় নির্ভর বলেই আমার ধারণা, যার ফলে সেসব কবিতা পাঠ ক'রে মনের মধ্যে বিশেষ কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, যদিও সচেতন নৈপুণ্য দেখিয়ে যথোচিত প্রশংসার দাবী অনেকেই করতে পারেন। বলাবাহুল্য রবার্ট ফ্রস্ট, ডাঃ উইলিয়াম্‌স্‌, মারিয়ান মুর, কিংবা কামিংস-এর মতো কবিকে আমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত করছি না।

সমালোচনার ক্ষেত্রে মার্কিন দেশ অগ্রগণ্য। হয়তো মৌলিকরচনার তুলনায় সমালোচনারই সেদেশে অধিকমাত্রায় অনুশীলন করা হয়। এই সমালোচনার গুণেই রেক্সরথ্‌-দের নামের সঙ্গে পূর্বপরিচয় ছিল। বর্তমান কাব্যগ্রন্থেই তাঁর লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো। এবং তার ফল বিশেষ উৎসাহজনক হ'তে পারলো না বলে দুঃখিত। রেক্সরথের এই কাব্যের বিষয় হচ্ছে বৎসরকালব্যাপী ইউরোপ সফর এবং ইউরোপ-আমেরিকার বর্তমান 'অধোগতি' বিষয়ে তাঁর মনোভাব। যন্ত্রসভ্যতা এবং বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার তিনি যে ঘোরতর বিরোধী সে কথা দু'পাতা পড়লেই বোঝা যায় :

England is gone and London,
Sicker than New York, takes its place.

তাঁর চোখে দেখলে, পশ্চিমী পৃথিবীর কোথাও প্রেম নেই; যদি না বারাঙ্গনার আলিঙ্গনে : উদ্‌ভ্রান্ত এই অপসভ্যতা যেন কোন পৈশাচিক আলেয়ার পশ্চাতে ছুটে চলেছে। রেক্সরথের লেখা থেকেই তুলে দিই :

...'America is today a / Nation profoundly deranged, / Demented and sick, because / Americans with very few / Exceptions believe / .... that / Love is measured entirely / In an interchange of / commodities .... / ..... when they wish / To satisfy their passions, / They go to a movie..... / .....

... You will find more peace and more / communion, more love, in a hour / In the arms of a pick up in / Singapore or Reykjavik, / Than you will find in a lifetime / Married to a middle class / White American woman.....

প্রত্যেকের সঙ্গে কবির এ বিষয়ে মতের মিল হবে তা অবশ্য আশা করা যায় না; কবিও সে আশা করেননি। যেমন স্বদেশের, তেমনই পিতৃভূমি ইউরোপ বিষয়েও তিনি অনুরূপ বিচলিত। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে 'দুর্গত' ইউরোপের বর্ণনাই শুধু স্থান পায়নি, সেই সঙ্গে আছে কবির ব্যক্তিগত জীবন-দর্শনের বিবরণ। আট সিলেব্‌ল্‌-এর লাইনে সাজানো গদ্যেরই রকমফের হলেও বর্ণনা অংশের স্থানে স্থানে তবু উৎসাহ জাগে, বাকি অংশকে মনে হয় ওজনে ভারি, ঠিক যেন খাপ খায়নি। আদর্শবাদী এ্যানার্কিষ্ট দর্শন নিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলে, লেখাই উচিত। কিন্তু দর্শনের ভাষায় তাকে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত করলে বিরক্ত লাগতে পারে, বিশেষত কবি নিজেই যদি মনে ক'রে থাকেন যে :

'Some aspects of its subjects are coruptese and difficult, some are new, at least to those likely to read the book.'

মোটকথা ভ্রমণ বিষয়ের এই কাব্যগ্রন্থে সভ্যতার সংকট নিয়ে কবির যন্ত্রণা এবং সঙ্গত ক্রোধ, আর সমাজ-সভ্যতার কল্যাণ বিষয়ে তাঁর দার্শনিক চিন্তা যতই প্রকট কবিতার স্থান ততই

সঙ্কুচিত। মনে হতে পারে গুরুগম্ভীর এক আলোচনারই বই যেন, যার সবটা বুঝতে হলে দেশবিদেশের পুরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস সংক্রান্ত উল্লেখ এবং অসংখ্য পরিভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক।

সবচাইতে বড় কথা, রেক্সরথের কবিতায় তিক্ত বিদ্রূপ থাকলেও পরিহাসবোধ আদৌ নেই। ঠাট্টাতামাসা ক'রে বিষয়টা সাময়িকভাবেও হাল্‌কা করে দিতে তিনি জানেন না। তার ফলে সমস্ত বইটিকে মনে হয় যেন বক্তৃতা। Chile Herold's Pilgrimage লেখা হয়েছিল দেড়শো বছর আগে, পৃথিবী তখন অন্যরকমের ছিল। কাজেই বাইরনী কাব্যের কথা এই প্রসঙ্গে তুলতে চাই না। অডেন আর লুই ম্যাকনিস্‌ আইসল্যান্ড ভ্রমণের পর গদ্যপদ্য মিশিয়ে যে চমৎকার পত্রাবলী প্রকাশ করেছিলেন তার সঙ্গেও কি 'দি ড্রাগন এ্যান্ড দি ইউনিকর্ণের' কোনো তুলনা হয়? পাশ্চাত্য সভ্যতার ট্রাজেডি মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে—একথাই যদি বক্তব্য হয়, তবে তার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও সে বক্তব্যের যথোচিত ইঙ্গিত থাকা আবশ্যক। আধুনিক কাব্যে তার দৃষ্টান্ত নেই, তাও তো নয়।

নরেশ গুহ

ছবি-ছড়ার দেশে—বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী। কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

পাতায়-পাতায় রঙীন ছবি,—ছবিতে-ছবিতে রঙের আর রেখার জৌলুষ,—তারই মধ্যে মাঝে-মাঝে সংগত ফাঁক রেখে, এবং দু'একটি ক্ষেত্রে ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তরুণদল অবধি মোট ঊননব্বই জনের লেখা বাংলা ছড়া সংকলিত হয়েছে 'ছবি-ছড়ার দেশে'-তে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাঁর সংক্ষিপ্ত 'ভূমিকা'য় সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। স্বয়ং সম্পাদক বলেছেন, "শুধু ছড়া-সংকলন হলে এতোগুলি লেখককে একসঙ্গে পাওয়া যেতো না। কেননা রবীন্দ্রনাথ, যোগীন সরকার এবং আধুনিককালে অন্নদাশঙ্কর ছাড়া নির্ভেজাল ছড়া-লিখিয়ে হিসাবে খুব তাড়াতাড়ি কারো নাম মনে পড়ে না।" সম্পাদক মশাই এই কথাটি লিখে সমালোচককে ভাবিয়ে তুলেছেন, কারণ, 'নির্ভেজাল ছড়া'-র আদর্শ সত্যিই ভাববার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, সত্যেন্দ্রনাথ, সুখলতা, সুকুমার রায়,—এ'রা তো বাংলার কিশোরদলের সর্বপ্রিয় ছড়া-জাতীয় পদ্যের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। সুনির্মল বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে—এ'দের ছড়ারও প্রসিদ্ধি আছে। এইসব ছড়ার মধ্যে অনেক শাখা-প্রশাখা, স্তর, শ্রেণী, জাতির ভাবনা যে দেখা দিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ছড়ারও জাতিভেদ আছে। এবং ছড়ার এই জাতিভেদের তত্ত্ব প্রধানত প্রসঙ্গভেদের মধ্যেই নিহিত। কারণ ধ্বনির যে লঘু, চপল নৃত্যভঙ্গি অথবা ক্ষেত্রবিশেষে যে মন্থর অথচ ভারহীন মসৃণতা আমরা ছড়া-জাতীয় রচনার আবশ্যিক উপাদান বলেই ভেবে থাকি, সেই ধ্বনিগত বিশেষত্ব সবরকম ছড়াতেই স্বীকার করা হয়।

"হিং-টিং-ছট্‌ প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়োলোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায়"

—সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই প্রসঙ্গ-নির্বাচনের মধ্যে বৈষম্য-বিষাদের যতোই ক্ষুব্ধতা থাক্ না কেন, এ উক্তির ঢং যে ছড়ারই,—এ-উচ্চারণের বেগ যে ছড়ারই, তাতে সন্দেহ নেই। আদি যুগে ছড়াও সরল ছিল, জীবনও হয়তো এ-কালের চেয়ে সহজ ছিল। এ-কালে জীবন জটিল হয়ে উঠেছে,—নানান্ চিন্তাতে মানুষের মন সদাই ব্যস্ত। ছোটোদের মহলেও বড়োদের ভাবনা প্রবেশ করছে। কারণ, বয়স্ক লেখকরাই ছোটোদের জন্যে লেখেন। বয়স্ক লেখকদের মনে আজকাল অতীতকালের কিশোর-কিশোরীর অভ্যস্ত স্বপ্নের তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই, সেকথা যদিই-বা সত্য হয়, তাহলেও খেদ অনাবশ্যক। কালের গতি কে-ই বা রোধ করতে পারে?

"আকাশ সেথা সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল;
ডাঙায় চরে রুই কাত্‌লা
জলের মাঝে চিল!"

—যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সেই 'মজার মুল্লুকে'র মধ্যে একালের কবিকল্পনা আর যেন প্রবেশের উৎসাহ পায় না। তার চেয়ে অন্নদাশঙ্করের 'তেলের শিশি'র ছড়া বরং অনেক বেশি বাঞ্ছিত,—সে যেন অনেক বেশি সুখের ঢেউ! তাই বলে চারদিকের রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতির প্রবীণজনসাধ্য ভাবনাই যে একালের ছোটোদের প্রিয় ছড়ার একমাত্র বস্তু, সে-অনুমানও আদৌ সঙ্গত নয়। অন্নদাশঙ্করের এবং সুখলতা রাওয়ের যে-দুটি ছড়া এই বইখানিতে ছাপা হয়েছে, সে-দুটির তারিফ তো কিছু কম হয়নি। 'মুখে মুখে হবার' থেকে অন্নদাশঙ্করের কৃতিত্বের একটু নমুনা দেখা যেতে পারে—

"বল্ দেখি কোন্ জানোয়ার
লাফ দেয় গাছ থেকে গাছে?
মনে হয় ল্যাজ দেখে তার
সাপ যেন ডালে ডালে নাচে।
শুনি তোদের অনুমান!
হনুমান। হনুমান।"

ছড়াতে—কতকটা একই ধরনের স্বাদ পাওয়া গেল সুখলতা রাওয়ের লেখা 'ভজা গজা অজা'-র

"ভজা বল্‌ল—'সজারু এ'
গজা বল্‌ল—'না তো না'
অজা বল্‌ল—'খড়কে ঝাঁটা'
কাঠিগুলো দেখ্‌ছ না?"

পশু-পক্ষী নিয়ে একালেও ভালো ছড়ার সম্ভাবনা আছে বৈকি! তবে, মুস্কিল এই যে, স্বভাবের মধ্যে ছড়ার রুচিটা না থাক্‌লে ছড়ার পথ না মাড়ানোই ভালো,—একথাটা অনেক লেখকও বোঝেন না, সম্পাদকও এ-বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেন না। সুনীলচন্দ্র সরকার বাঘা-কুকুর সম্পর্কে যে ছড়াটি লিখেছেন তাতে বাঘা যে কেবলই 'শয্যাবীর'—তার সমস্ত প্রতাপের ঘোষণা যে নেপথ্যবর্তী 'শেয়াল কটাশ ভাম'-দের উদ্দিষ্ট এবং আসলে সেই বাঘা-বীর যে নিতান্তই শয্যাসীন গর্জনসর্বস্ব জানোয়ার, এই মজার খবরটি যথোচিত ধ্বনিগুণে সার্থক হয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'দর্শন'-এর মধ্যেও জন্তুর জায়গা হয়েছে এবং সে জন্তু-প্রসঙ্গ মোটেই বেমানান নয়।

"চামড়াই তার বাসা।
তার মধ্যেই থেকে গরু
হাত পা খেলায় খাসা
গরুতোয় গরু আবার!
চামড়াখানি খুলে নিলেই
শ্রীমান গরু কাবার।"

—ধন্য এই গো-তত্ত্বের ব্যাখ্যান! এতে রাষ্টচিন্তার তিলও নেই, অতি-কবিত্বের তালও নেই। গরুর চামড়া কোন্ কাজে লাগে?—মাষ্টারমশায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে গরু সম্বন্ধে নরুর এই মন্তব্যটি খাঁটি, নির্ভেজাল ছড়ামাত্র ! একেই বোধ হয় নির্ভেজাল ছড়া বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ছড়ার মধ্যে যেসব ভেজাল মাঝে-মাঝে বাজারে চল্‌তি দেখা যায়, সেসব পদার্থের বিশ্লেষণ করলে তাদের এই রকম বস্তুভেদ চোখে পড়ে—কোথাও অতি-কবিত্বের ঢলাঢলি, কোথাও বা অতি-গুরু তত্ত্বচিন্তা বা বিষয়বুদ্ধির উৎপাত। খাঁটি ছড়ার খাঁটি-ভাবটা যে কোন্-কোন্ উপাদানে আশ্রিত তারও একটা তালিকার খসড়া বানানো দুঃসাধ্য নয়। কৌতুক, ক্ষিপ্রতা,—ক্ষেত্রান্তরে অবসাদহীন আবেশও ছড়ার ধর্ম হতে পারে। ছন্দের ঝম্-ঝম্ বাজনা কিংবা টুক্-টাক্ চালটাও কাম্য।

"রংমশালের সম্পাদকের চম্পাবরণ কন্যা
ঘর করেছেন আলো;
সমস্ত তার ভালো।
দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরে ঘুমোন না।"

—বুদ্ধদেব বসুর এই বাদ্যিও থাকতে পারে,—আবার,

"বই তো পড়ো টই পড়ো কি?
তাইতো কাটি ছড়া।
বই পড়া সব মিছেই যদি
না হল টই পড়া॥"

—প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই বাদ্যিও বাঞ্ছিত। তবে, আপত্তি কোন্ বাজনায়? আপত্তি সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে বিয়ে-বাড়িতে শানাইয়ের বদলে ঢাক বাজে, অথবা পাঁঠাবলির হুজ্জতের মধ্যে হঠাৎ যখন কেউ বাঁশি বাজায়। এ-বইয়ে তেমন দু'একজনও আছেন। বাংলা কবিতা-সঙ্কলনের একটি নতুন পথ "ছবি-ছড়ার দেশে"র প্রকাশ থেকে শুরু হলো, এমন আশা করা অন্যায় হবে না।

হরপ্রসাদ মিত্র

অতিথি যদি আপনাকে এসে তার তৃষ্ণার কথা জানায়, আপনি তাকে এক পেয়ালা চা ক'রে দিন। —**কনফ্যুসিয়স**

প্রথম পেয়ালায় আমার ঠোঁট ও গলা ভেজে।
দ্বিতীয় পেয়ালায় নিঃসঙ্গতা কেটে যায়।
তৃতীয় পেয়ালায় পরিপূর্ণতা আসে।
চতুর্থ পেয়ালায় দেখা দেয় বিন্দু বিন্দু ঘাম।
পঞ্চম পেয়ালায় আমি পবিত্র।
ষষ্ঠ পেয়ালায় শুনতে পাই সুরলোকের আহ্বান।
সপ্তম, আঃ, কিন্তু আর পান করতে পারবো না। —**লো টুঙ**, টাঙ বংশের কবি

অর্থ এবং ক্ষমতার আসুরিক সংগ্রামে বর্তমান মানবতার আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ। অহংকার এবং বর্বরতার অন্ধ ছায়ায় পৃথিবী পথ হাতড়াচ্ছে। বিদ্যার্জন হচ্ছে, কিন্তু অসৎ বিবেকের মধ্য দিয়ে, দয়া-দাক্ষিণ্যও বিদ্যমান, কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত। জীবনের অমৃত লাভের জন্যে দু'টি মত্ত ড্রাগনের মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তোলপাড় করছে সমস্ত পৃথিবী, কিন্তু ব্যর্থ, ব্যর্থ তাদের চেষ্টা। আর ত্রাণকর্তা যুগাবতারের আবির্ভাব প্রতীক্ষায় বসে আছি আমরা।...আসুন, ইতিমধ্যে একপেয়ালা চায়ে চুমুক দেওয়া যাক। বিকেলের অস্তসূর্যের স্বর্ণাভায় বাঁশবনের মাথা রঙিন হ'য়ে উঠেছে, আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি তুলতে তুলতে চলেছে ঝর্ণাধারা, আর ঐ পাইনবনের মৃদুমর্মর শোনা যাচ্ছে আমাদের কেটলির ফুটন্ত জলে। —**ওকাকুরা,** উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জাপানী কবি

যেদিন থেকে চায়ের পাতার চল হলো, সেদিন থেকে কী বিশ্বস্ত বন্ধুর কাজই না করছে সামান্য ঐ চায়ের পাত্রটুকু। কত হাজার হাজার মেয়ে কেঁদেছে এই চায়ের জন্যে! কত অসুস্থের বিছানার পাশে ধোঁয়া উঠেছে এর! কত জ্বরে-পুড়ে-যাওয়া ঠোঁট শক্তিসঞ্চয় করেছে এর থেকে! মেয়েদের দিয়ে চায়ের চারা লাগিয়ে প্রকৃতি কত উপকারই না করেছে। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, কত ছবি গড়ে ওঠে, কত কল্পনা স্ফূর্তিলাভ করে এই চায়ের পেয়ালা আর পাত্রটিকে ঘিরে। —**থ্যাকারে**

আমি ভীষণ চা খাই, যাকে বলে নির্লজ্জ পাঁড় চা-খোর। চা খেয়ে, সন্ধেটা আনন্দে যায়... মাঝরাত্তির শান্তিতে কাটে...আর ভোরবেলাকে স্বাগত জানাই। —**ডক্টর জনসন**

আপনার শীত-শীত বোধ হ'লে চা আপনাকে উষ্ণ করবে।
খুব গরম বোধ হ'লে চা আপনাকে ঠান্ডা করবে।
বিমর্ষ হ'লে চা আপনাকে উৎফুল্ল করবে।
উত্তেজিত হ'লে চা আপনাকে শান্ত করবে। —**গ্ল্যাডস্টোন**

চা খেয়ে আমার মাথা হালকা মনে হলো, কোনরকম ভয়-ভ্রান্তি আর রইলো না। —**ডিউক অব ওয়েলিংটন**

চায়ের বাক্সে অনেকখানি কাব্য এবং মধুর অনুভূতি বর্তমান। —**এমার্সন**

চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
    চল চল হে।
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল-জল
    কল কল হে। —**রবীন্দ্রনাথ**

অষ্টাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

চতুরঙ্গ

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩

আমেরিকার চিঠি

হুমায়ুন কবির

আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর খানিকটা আলোচনা আগেই করেছি। সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে আমেরিকার বিষয়ে সাধারণভাবে বলতে গিয়ে শিক্ষা নিয়ে এত আলোচনার কি প্রয়োজন তবে তার উত্তরে বলব যে শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই আমেরিকার বর্তমান বৈভব ও শক্তি গড়ে উঠেছে, আবার শিক্ষাপ্রণালীর দুর্বলতার ফলেই আমেরিকার সমাজজীবনের প্রধান প্রধান গলদগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই দোষে-গুণে আমেরিকার সমাজকে বুঝতে হলে আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর বিশদ আলোচনা করতে হবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে বিজ্ঞানকে এ-ভাবে প্রয়োগ আর কোন দেশ করেনি এবং তারই ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যে আমেরিকা অর্থ, উদ্যোগ ও অস্ত্রশক্তিতে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করেছে। বস্তুতপক্ষে যন্ত্র-সভ্যতা যে ভাবে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও তার তুলনা মেলে না। তবে সম্প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্র এ বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমেরিকায় সমাজের সকল স্তরে সমতা ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকিরণে শিক্ষার যে দান সে কথার উল্লেখও আগেই করেছি। বস্তুতপক্ষে শিক্ষার মাধ্যমে আমেরিকাবাসী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যে উৎকর্ষ সাধন করেছে, তার তুলনা বোধ হয় আর কোথাও মিলবে না।

আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের কয়েকটি বড় দুর্বলতার জন্য যে সে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধানত দায়ী সে বিষয়েও খানিকটা আলোচনা পূর্বেই করেছি। আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা সুসংবদ্ধ ও ঐক্যীভূত নয় বলে জাতীয় চরিত্রগঠনে যথাযথ কার্যকরী হয়নি। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিক শিক্ষার মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত নয় বলে কিশোর-কিশোরীদের জীবনে বহু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিশোর বয়সের অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম শিক্ষার কাজে পুরোপুরি নিঃশেষ হয় না বলে নানা কাজে অকাজে তা ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়ন স্বদেশে যে শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করেছিলেন, তার ফলে ষোল সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীর বিষয় নির্বাচনে কোনই স্বাধীনতা থাকত না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই প্রত্যেকটি বিষয় প্রায় সমান মনোযোগ দিয়ে পড়তে হত বলে তাদের সমস্ত উদ্যম উৎসাহ শিক্ষাকার্যে

নিবিষ্ট থাকত। কেবল যে বিবিধ বিষয় পড়তে হত, তা নয়, শিক্ষার মানকেও এত উঁচু করা হয়েছিল যে শিক্ষার্থীর পক্ষে গাফিলতি করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। বর্তমানে রুশ দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাতেও নেপোলিয়নী শিক্ষাধারার অনুসরণে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাচুর্য এবং শিক্ষামানের কঠিনতার ফলে সোভিয়েট কিশোর-কিশোরী সারা মনপ্রাণ দিয়ে বিদ্যা অর্জন করতে বাধ্য হয়। সমস্ত সময় ও উদ্যম পড়ালেখার কাজে নিঃশেষ হয় বলে বিভিন্ন ধরনের দুষ্টামি, অনুশাসনহীনতা বা উচ্ছৃংখলতার অবকাশ বহুল পরিমাণে কমে যায়।

সে তুলনায় আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার মান অপেক্ষাকৃত অবনত ব'লে কিশোর-কিশোরীর সমস্ত সময় ও উদ্যম শিক্ষা-চেষ্টায় নিঃশেষ হয় না। আমেরিকার আবহাওয়ায় এমনিতেই সাফল্যের প্রতি ঝোঁক, তার উপরে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয় নির্বাচনে প্রায় অবাধ অধিকার এবং সর্বোপরি সে সমস্ত বিষয়ের যে মান, তা তাদের বুদ্ধি ও উদ্যমের তুলনায় সহজ বলে আমেরিকার কিশোর-কিশোরী স্কুল-কলেজের কার্যক্রমের বাইরে অপর্যাপ্ত সময় ও অব্যবহৃত উদ্যমের প্রকাশ খোঁজে। তার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক বা সমাজবিরোধী কার্যক্রমের মধ্যেও তারা জড়িয়ে পড়ে। বিদেশীর চোখে কখনো কখনো আমেরিকার মাধ্যমিক ছাত্রসমাজের আচরণ বিসদৃশ লাগে—মাধ্যমিক শিক্ষার অবনত মান তার অন্যতম প্রধান কারণ। তাই কেবল উচ্চশিক্ষার তাগিদে নয়, আমেরিকার সমাজজীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্যও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও তার মান বাড়াতে হবে এ-কথা আজকাল আমেরিকার প্রায় সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন। দশ এগারো বৎসর বয়স থেকে সতেরো আঠারো বৎসর পর্যন্ত স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের যে কার্যক্রম, তাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক উদ্যম ও শক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয় না। তাতে একপক্ষে বিদ্যালাভ বা জ্ঞানার্জনে আমেরিকার কিশোর-কিশোরীরা খানিকটা পিছিয়ে পড়ে এবং পরে কলেজে গিয়ে সে ঘাটতি পূরোবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। অব্যবহৃত শক্তি ও উদ্যম নানা অপ্রাসঙ্গিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এ-সব কথাই জাতির পক্ষে বড় লোকসান। কিন্তু তার চেয়েও বড় লোকসান এই যে কৈশোরের আদর্শ-উদ্বেল বৎসরগুলির অব্যবহার বা অপব্যবহার হয় বলে বহু ছাত্র-ছাত্রীর মনে জ্ঞানান্বেষা বিকাশ লাভ করে না। নিয়মিত পরিশ্রমের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে না। সাধনার ফলে চরিত্রে যে গভীরতা ও শক্তি আসে, তা আসে না। আমেরিকাবাসী সর্বদাই নতুনকে গ্রহণ করতে উন্মুখ। তার ফলে যেমন উন্নতির সম্ভাবনা বেড়ে যায়, অন্যদিকে চিত্ত ও চরিত্রে চপলতাও আসতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষার গলদের ফলে বহু-ক্ষেত্রে সে ধরনের চপলতা জাতির জীবনে হানিকর হ'য়ে উঠে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কঠিনতর সাধনা করতে হ'লে সে সম্ভাবনা কমে আসবে। তরুণ বয়সে জ্ঞানার্জনের জন্য যদি কঠোর সাধনা করতে হয়, তবে তার ফলে বহু অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হ'য়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুণ যুবক-যুবতীর চরিত্রে এক নতুন দৃঢ়তা ও সুসংবদ্ধ শক্তি আসবে।

আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় সকলরকমের শ্রমের যে মর্যাদা তার উল্লেখ আগেই করেছি। তার ফলে বহু লক্ষ কিশোর-কিশোরী নিজের পরিশ্রমে নিজের শিক্ষার আয়োজন করে। এ ব্যবস্থা যে কী বিপ্লবকারী পরিবর্তন, একশো বছর আগেকার বিলিতি শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। সেকালে বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুরু করে কলেজে স্কুলে প্রায় সর্বত্রই দু'ধরনের শিক্ষার্থীর পরিচয় মিলত। একদলকে বলা হত ভদ্রকুলজাত ছাত্র; তারা সাধারণত ধনী পরিবার থেকে আসত এবং পারতপক্ষে নিজের হাতে

কোন কাজই করত না। আজ আশ্চর্য শোনাবে কিন্তু তখনকার দিনের বিলাতি সমাজে যারা জীবনে কোন প্রয়োজনীয় কাজে কোনদিন হাত লাগায়নি, তাদেরই ভদ্রলোক বলা হ'ত। বাকি থাকত স্বপরিশ্রমনির্ভর ছাত্রছাত্রীদের দল কিন্তু স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই তাদের খানিকটা অবজ্ঞার চোখে দেখত। আজকাল অবশ্য বিলাতে এ-ব্যবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে এবং ধনী ও দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য প্রায় পুরোপুরি বিলুপ্ত হ'তে বসেছে। আমেরিকার ছাত্রসমাজে এ-রকম শ্রেণীবিভাগ কোনো কালেই দেখা দেয়নি। সে দেশেও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য রয়েছে এবং একশো বছর আগে সে তফাৎ ইউরোপের চেয়ে কম ছিল না। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমেরিকায় দরিদ্র ছাত্র সামাজিক কোন অমর্যাদা ভোগ করেনি। বরং স্বকীয় পরিশ্রমে নিজের শিক্ষা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করায় সমাজের চোখে সম্মানার্হ পরিগণিত হয়েছে।

শ্রমের মর্যাদাবোধের এটা হলো লাভের দিক কিন্তু দুনিয়ায় কোন জিনিষই অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ নয়। তাই শ্রমমর্যাদাবোধের একটা ক্ষতির দিকও আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে। স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়েরা নিজের পরিশ্রমে নিজের শিক্ষার অর্থ উপার্জন করবে, সমস্ত ব্যাপারে স্বাবলম্বী হতে শিখবে—প্রথম দৃষ্টিতে এ-ব্যবস্থা সবারই ভালো লাগবে, কিন্তু তার ফলে অত্যন্ত অল্প বয়সের শিশুরাও টাকা-পয়সা সম্বন্ধে যে ভাবে সচেতন হয়ে উঠে, তাকে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মনে করা চলে না। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সর্বব্যাপী এবং অবৈতনিক। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে লেখাপড়া শিখবার জন্য ছোট ছেলেমেয়ের অর্থ উপার্জনের কোন প্রয়োজন নেই। তখনো কিন্তু তারা পকেট-খরচা হিসাবে বাড়ি থেকে যা বরাদ্দ তার পরিমাণ বাড়াবার জন্য নানা ধরনের কাজ খোঁজে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খবরের কাগজ বিলি করে, বিক্রী করে, কখনো দোকান থেকে চকোলেট কিনে তা খুচরোভাবে সওদা করে, এবং এমনি নানা উপায়ে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবতে সুরু করে। ফলে বহুক্ষেত্রে অত্যন্ত অল্প বয়সে অর্থোপার্জনের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা দেয়, খুব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও মেতে উঠে যে কি ভাবে দু-পয়সা আয় করবে। বাইরের কাজে পয়সা কামানোর প্রবৃত্তি সব সময়ে সফল হয় না, তখন বাড়ির কাজের জন্যও তারা বাপ-মার কাছে পয়সা দাবি করতে সুরু করে। বহু পরিবারে দেখেছি যে মাকে ঘরকরনার কাজে সাহায্য করবার জন্য ছেলে-মেয়ে পয়সা পায়। বাড়ির বাগানে ফুলগাছের তদারক বা বাড়ির উঠোনে ঘাস কাটা, আগাছা পরিষ্কারের জন্যও বাঁধা হারে মজুরী দেবার রীতি রয়েছে। আমেরিকান দুয়েকজন বন্ধু এ-ব্যবস্থার সমর্থনে বলেছেন যে বাইরের লোক দিয়ে এ-রকম কাজ করাতে হলে যখন বাপ-মার পয়সা খরচ হত, তখন বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সে কাজ মুফতে কেন করবে? তাঁরা এ-কথাও বলেন যে এভাবে প্রথম জীবন থেকেই শিশুরা একপক্ষে শ্রমের মর্যাদা শেখে, অন্যপক্ষে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হয়। শুধু তাই নয়, তারা এ-কথাও শেখে যে আরাম বা আনন্দ করতে হ'লে যে অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ নিজের পরিশ্রমেই যোগাড় করতে হবে, বিনামূল্যে কোন জিনিষই জীবনে মিলবে না।

এ-সব কথা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু শিশুবয়সে টাকা-পয়সা সম্বন্ধে বেশি সচেতন হ'লে জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এ-কথাও স্বীকার করতে হবে। বিশেষ ক'রে বাড়িঘরের কাজকর্মে টাকা-পয়সার লেনদেনে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি টলে যায়। শিশুর জন্য মায়ের যে ভালোবাসা ও সেবা, টাকা-পয়সা দিয়ে তার মূল্য

নিরূপণ করা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনিভাবে বাপ-মার জন্য সন্তানের ভালোবাসা ও সেবাও অর্থনিরপেক্ষ। রান্নাঘরে মা যখন কাজ করে, তখন স্বামী-সন্তানের কল্যাণের জন্যই তার আগ্রহ। তার পরিশ্রমের আর্থিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে এবং ইচ্ছা করলে ঘণ্টা হিসাবে তার মেহনতের মূল্য নির্ণয়ও করা চলে, কিন্তু কোন পরিবারের গৃহিণীই খালি টাকা-পয়সার হিসাবে নিজের সংসার পরিচালনা করেন না। ছেলে-মেয়েরা বাড়ির কাজ করবে, বাপ-মাকে সাহায্য করবে, ছোট ভাই-বোনের দেখাশোনা করবে—এটা তাদের সহজ এবং স্বাভাবিক পারিবারিক দায়িত্ব। শিশুবয়স থেকেই এ-দায়িত্ব যদি তারা আনন্দে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করে, তবে স্বজনপ্রীতি কমে যায় এবং পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল হ'য়ে পড়ে। এমনিতেই বর্তমানের শিল্পপ্রধান সমাজে পারিবারিক সম্বন্ধ লোপ পেতে বসেছে। ব্যক্তি দিন দিন বেশিরকম আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠছে। তার উপর যদি শৈশব-বয়স থেকেই তারা পরিবারের স্বাভাবিক স্নেহবন্ধনের বদলে অর্থোপার্জনের ভিত্তিতে পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সুরু করে, তবে তার ফলে যে পরিবার ও সমাজ টলে উঠবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেবল আমেরিকা ব'লে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমান যুগে বিবাহ-বন্ধন সহজেই ভেঙে পড়ছে, যৌথপরিবার তো প্রায় অন্তর্হিত। ছোট ছোট পরিবারের মধ্যেও আগেকার মতো নিবিড় সংযোগ নেই। পারিবারিক জীবনের এ-সংকোচন ও বিলোপের ফলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমেরিকাতেই সেগুলি বেশি স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়, এবং শৈশবজীবনে পারিবারিক কর্তব্য-পালনের ক্ষেত্রেও অর্থের ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন যে তার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

বাড়ি-ঘরের কাজ-কর্মের জন্যও টাকা-পয়সার লেনদেনের ফলে যে কেবল পারিবারিক জীবনের হানি হয়েছে, তা নয়। মানবতার মূল্যবোধও তার ফলে খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রয়োজনের জগতে মানুষ এবং পশুর মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই। জীবনের দাবি মেটাবার পরে উদ্বৃত্ত উদ্যম এবং শক্তির ব্যবহারেই মানুষ সমস্ত পশু থেকে স্বতন্ত্র। মানুষের শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকাশও এই অপ্রয়োজনের ক্ষেত্রে। পাঠ্য-অপাঠ্য পুঁথিপত্রের মধ্যে অবাধ বিচরণ অথবা শিল্পকলা সাহিত্য সংগীতের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ তাই মানুষের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। বস্তুতপক্ষে প্রয়োজনের বাইরের জন্য যে জগৎ, সেই জগতকে চেনা এবং জানা মানুষের মনুষ্যত্বের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মানুষের সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান এবং আদর্শবাদ প্রয়োজনের জগতের তাগিদকে অস্বীকার ক'রে গড়ে উঠেছে। অন্যপক্ষে অর্থকরী বিদ্যা একান্তভাবে প্রয়োজনের জগতের সঙ্গে সংশিলষ্ট। তাই অর্থ-সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন হ'লে মানবজীবনের মূল্যবোধের হানি হ'তে বাধ্য। যে সমাজে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও অর্থ উপার্জনের জন্য আগ্রহী, সেখানে যে শৈশব থেকেই মূল্য-বোধের বিকৃতি ঘটতে পারে, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

অর্থোপার্জনের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে অধ্যয়ন অধ্যাপনার প্রকৃতিও বদলায়। শৈশব থেকে ছাত্র অর্থকরী বিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং যে সমস্ত বিষয়ের কোন সাক্ষাৎ অর্থকরী প্রতিশ্রুতি নেই, সেগুলিকে অবহেলা করতে চায়। অথচ জাতির জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এ-সমস্ত বিষয় বা বিদ্যাকে উপেক্ষা করা চলে না। অর্থসর্বস্ব সমাজে অন্যভাবেও বিদ্যাবত্তার প্রতি অনুরাগ খানিকটা কমে যায়। ইউরোপের বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য এই যে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে যে পড়াশুনা হয়, ছুটির সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তার

চেয়ে বেশি পড়বে। এক কথায় ছাত্রজীবনের মেয়াদ যতদিন থাকে, ততদিন ছুটি-অছুটির বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। ছাত্রদের জীবনের প্রধান করণীয় কাজ অধ্যয়ন। ভারতবর্ষের পুরাতন ঐতিহ্যেও অধ্যয়নকে তপস্যা ব'লে স্বীকার ক'রে ছাত্রদের অন্য সমস্ত কর্ম থেকে বিমুখ করবার চেষ্টা হয়েছে। আমেরিকায় কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়েছে। কলেজের শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, অনেক সময়ে তাদের উপরে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। কাজেই তারা যদি পড়া-লেখার চেয়ে অর্থোপার্জনের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবে তাতে আশ্চর্য হবার ততটা কারণ নেই। কিন্তু স্কুলে পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও যদি সমস্ত অবসর সময় অর্থের ভাবনায় কাটায়, সমস্ত উদ্যম দিয়ে অর্থোপার্জনকে এত বড় ক'রে দেখে, সেটা জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে ভয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রয়োজনের তাগিদে যে-সব কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী অবসর সময়ে টাকা রোজগার ক'রে নিজেদের পড়া-লেখার খরচ যোগায়, তাদের কথা আলাদা। সাধারণত তাদের চরিত্রবল এত বেশি, পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ও আগ্রহ এত প্রবল যে অর্থোপার্জন ক'রেও তারা ঠিকঠিক পড়া-লেখার কাজ চালিয়ে নিতে পারে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর বেলায় তা ঘটে না। সচ্ছল পরিবারের কিশোর-কিশোরী যখন খেয়ালের বশে বা কোন বিলাস-বাসনা পূর্ণ করবার জন্য সমস্ত অবসর অর্থোপার্জনে ব্যয় করে, তখন তাদের পাঠ্যজীবনের হানি হ'তে বাধ্য। দর্শনের বা পদার্থবিদ্যার ছাত্র ছুটির তিন চার মাস অধীত বিদ্যাকে অধিক আয়ত্ত করবার বদলে যদি হোটেলে গিয়ে রেকাবী বাসন ধোয়, তবে তার ব্যক্তিগত রুজি বেড়ে যায়, কিন্তু জাতীয় জীবনের দিক থেকে তাতে সমাজের ক্ষতি না লাভ সে বিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

শ্রমের মর্যাদাবোধ এবং সর্বব্যাপারে সাফল্যলাভের সাধনা আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের দুটি মহৎ গুণ, কিন্তু এ-দুটি গুণের বিকৃতির ফলেই শিক্ষাব্যবস্থায় এ নূতন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আবার শিক্ষাব্যবস্থায় এ-রকম বিকৃতি দেখা দিয়েছে ব'লেই জাতীয় চরিত্রে অবনতির লক্ষণ দেখা দেয়। বস্তুতপক্ষে যেন-তেন প্রকারে সাফল্যলাভ করবার সাধনা কোন কোন ক্ষেত্রে এত উগ্র হ'য়ে উঠেছে যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সাফল্য বিচারেও অর্থসম্পদের মানদণ্ড এসে পড়ে বলে সমস্যা আরো জটিল হ'য়ে উঠে। সবাই চায় যে বেশি অর্থ উপার্জন করবে—এ-রকম চাওয়াতে অন্যায় কিছু নেই—কিন্তু যখন সে আকাঙ্ক্ষা তীব্র হ'য়ে উঠে তখনই নানা বিসদৃশ ব্যাপার দেখা দেয়। মনে হয় যেন একজন অপরের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে অর্থোপার্জনে লেগেছে, প্রচুর অর্থ যদি আসে, তবে কি উপায়ে এল তা নিয়ে বেশি ভাবনার প্রয়োজন নেই।

যেমন ক'রেই হোক আর্থিক ব্যাপারে সাফল্যলাভ করতে হবে এই মনোবৃত্তি থেকেও নূতনের প্রতি মোহ জন্মে। সবাই যা করছে, তা-ই করলে সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে না। এবং তা করতে না পারলে আর্থিক সফলতা লাভ কঠিন হবে। তাই আমেরিকার বহু তরুণ-তরুণী নূতন কিছু করবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র। যাই করি না কেন, সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে—এ মনোভাব আমেরিকায় যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, বোধ হয় অন্যত্র তার এত বেশী পরিচয় মেলে না। বিজ্ঞাপনের যে বাহুল্য আমেরিকায় প্রায় সমস্ত আগন্তুকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কারণও এই মনোবৃত্তির মধ্যেই মিলবে। শুধু তাই নয়, তাক লাগাবার চেষ্টায় এ-সব বিজ্ঞাপন কোন কোন ক্ষেত্রে রুচি ও শালীনতার সীমা অতিক্রম ক'রে যায়। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তার জন্য যদি সমাজ,

নীতি ও কল্যাণের হানি হয়, তবে তা করতেও বহু লোক পরাঙ্মুখ নয়। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সকলের সমর্থন চাই, সমাজের কাছে সমাদর চাই। এই দোটানার ফলে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সবাই নূতন কিছু করতে চায়। বিজ্ঞাপনের আতিশয্য ও অতিশয়োক্তির মধ্যে একপক্ষে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য প্রকাশের তীব্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎকট আগ্রহ। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমেরিকায় জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিনিঃসঙ্গতার ভীতি যে-রকম প্রবল, একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোথাও তা দেখিনি।

কথাটা আরো একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। একপক্ষে আমেরিকায় প্রত্যেক নরনারী স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করতে চায়। নিজস্ব অধিকারে সফল ও সার্থক হ'তে চায়। অর্থোপার্জনে ও যশোলাভে বিশিষ্ট হ'তে চায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর এত ঝোঁক দেওয়ার ফলে আমেরিকায় পারিবারিক জীবনের বন্ধনও খানিকটা শিথিল হ'য়ে পড়েছে। অন্য-পক্ষে আমেরিকায় নরনারী যেভাবে সবাই মিলে-মিশে থাকতে চায়, কেউ অন্যের থেকে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পরিগণিত হ'তে ভয় করে, তা-ও না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। স্কুলের ছেলেরা একই ধরনে চুল কাটে—কদমছাঁট চুল দেখেই বোঝা যাবে যে এরা স্কুল-কলেজের ছাত্র। স্কুলের কোন বিশেষ উর্দি নেই। কিন্তু তবু সবাই প্রায় একই ধরনের পোষাক পরবে, একই ধরনের কথা বলবে, চিন্তার ক্ষেত্রেও সবাই একই ধরনের পথ অবলম্বন করতে চাইবে। সাধারণ আমেরিকানের পক্ষে একা থাকার মতন এত বড় শাস্তি বোধ হয় আর কিছুই নেই। ইংরেজ নিজের খবরের কাগজ, নিজের পাইপ, নিজের কুকুর বা নিজের বাগান নিয়ে থাকতে পারলেই তুষ্ট। আমেরিকান কিন্তু দশজনে মিলে গল্পগুজব, আড্ডা, হল্লা না করতে পারলে অস্বস্তি বোধ করে। বিদেশী যারা এসে আমেরিকায় প্রথম বসতি পাতে, তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বহুক্ষেত্রে বাঁচিয়ে রাখে, নিজেদের ঐতিহ্য সাগ্রহে আঁকড়ে ধরে থাকে। স্বতন্ত্র হ'তে তাদের কোন ভয় নেই। এক পুরুষেই পালা একেবারে উল্টে যায়। কিভাবে পিতৃপুরুষের দেশের স্মৃতি ভুলে মনে-প্রাণে আমেরিকান হবে এই হয় তাদের ছেলে-মেয়েদের একমাত্র সাধনা। বহু পুরুষ ধরে তারা আমেরিকান নয়, সে-কথা টের পায়, এই তাদের সবচেয়ে বড় ভয়। বস্তুতপক্ষে পোষাকে-আষাকে, পান-ভোজনে, কথাবার্তায়, চিন্তা-ভাবনায় আমেরিকান যেভাবে যূথধর্মী, পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশেও একমাত্র কৃষক-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তার নজির মিলবে না।

পূর্বেই বলেছি যে দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে এ-ধরনের সমীকরণ বা চরিত্র-সাদৃশ্য বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র ভিন্ন অন্য আর কোন দেশে দেখা যায় না। আমেরিকা এবং রুশদেশে যে এ-ধরনের চরিত্রসাদৃশ্য দেখা যায়, তার কারণ আছে। দুটি দেশেই যন্ত্রসভ্যতার চরম বিকাশ জাতীয় জীবনের লক্ষ্য। দুটি দেশেই সমস্ত মানুষকে প্রায় একই ছাঁচে ঢেলে গড়বার চেষ্টা। রুশদেশে মার্ক্সবাদের লৌহকাঠামোর মধ্যে সকলের মানসিক ছাঁচ গড়ে উঠে, তার ব্যতিক্রম করা ব্যক্তির পক্ষে বিপজ্জনক। আমেরিকায় রাষ্ট্র ভয় দেখায় না, বাধ্য করে না, কিন্তু সকলের জন্য প্রায় একই ধাঁচের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সকলের একই সামাজিক লক্ষ্য ব'লে সেখানেও বেশিরভাগ নরনারী সমাজধর্মের ব্যতিক্রম করতে চায় না। যন্ত্রসভ্যতার প্রবণতার ফলেও পরস্পরের সাদৃশ্য বেড়ে যায়। যন্ত্রের ধর্মই এই যে একই রকম বহু জিনিষ তৈরী করবে। সংখ্যায় তারা বহু, কিন্তু প্রকৃতিতে তারা এক। আমেরিকায় এবং আজকাল রুশদেশেও যন্ত্র মানুষের খোরাক জোগায়, পোষাক তৈরী করে, ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করে। ফলে একই ধরনের খোরাক খেয়ে সকলের একই ধরনের

রুচি গড়ে উঠে। সবাই একই রকম পোষাক পরে, একই রকম বাড়িতে থাকে। সমস্ত জীবনের ধাঁচ এক ব'লে তাদের মনের ধাঁচও যে এক হবে, চিন্তায় ঐক্য ও সাদৃশ্য আসবে, তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে?

[ক্রমশঃ]

উদ্যোগের ইতিহাস

মনীন্দ্র রায়

মাঘের সকালে তাজা রোদ
কাছিমের পিঠ মেলে আধোডোবা নৌকোর গলুইয়ে
প'ড়ে থাকে, পৃথিবীর ইচ্ছার ভিতর।

আমি তার ব্যাকরণ বুঝিনি এখনো।
সুখের মুহূর্তগুলি প্রায়-বোবা প্রেমিক-প্রেমিকা—
নিশ্বাসে, নীরবতায়, চোখে চোখে কথা বলে যায়,
বাঘের থাবায় আমি খুঁজিনি সে হরিণের স্বাদ।

বরং নিজেই কতো অবুঝ খাঁচায়
টিয়ার চীৎকারে দিন কাটিয়েছি, তার
পাখার ঝাপট মনে আসে।
স্মৃতির নদীতে আজো দেখি বারে বারে
যখনি জালের শব্দ ছেঁড়ে অন্ধকার,
লাফানো মাছের তীক্ষ্ম আতঙ্কের রেখা জ্বলে ওঠে।

তা-ব'লে আনন্দ কিছু পাইনি, তা নয়।
মাঘের সকালে আমি কাছিমের ব্যাকুলতা নিয়ে
এ জগৎ পান করি রৌদ্রের গেলাসে।
তবু সে রভস ভুলি প্রতিদিন। ঠিক যেন তুমি!
যতোক্ষণ কাছে পাই, হীরকের স্তব্ধ অনুভূতি—
দূরে গেলে সব শূন্য, আবার প্রস্তুতি॥

দেখব, কী বাণী

মণীন্দ্র রায়

বরং সহিষ্ণু হও—
বলেছিল রাত্রির আকাশ।
বরং প্রতীক্ষা কর—
গাছের আড়ালে পাখী, যুবতীর মন, শস্য, নদী
বারে বারে বলেছে জানি তা।

পতনের হিংস্র মজা পায়ে পায়ে রুখে
আমি তাই সার্কাসের দড়ির খেলায়
কাটালাম দীর্ঘ দিন।
চড়ুইয়ের শান্তি নিয়ে ধুলোর গোষ্পদে
সেজেছি পাখার ক্লান্তি।
গাধার চীৎকারে তবু কেন
শূন্য আজ ভেঙে পড়ে কাঁচের টুকরোয়?

জলের দু'হাত দূরে মাছরাঙার মতো
থরোথরো পাখা নেড়ে স্থির হ'তে চেয়ে
কবে আর লক্ষ্যে যাব?
রক্তে যে রোদের স্বপ্ন মুছে মুছে আসে!
ধৈর্য আজ কাপুরুষ, প্রতীক্ষা নির্বোধ।
সুপক্ক ফলের মতো জীবনকে মুঠি ভ'রে নিয়ে
দেখব, কী বাণী তার শাঁসে॥

কথার জন্যে

শামসুর রহমান

তা হ'লে কী করি?
একটি কথার জন্যে ভেবে মরি সারাক্ষণ, অথচ কথার
অন্ত নেই বিশাল ত্রিলোকে, প্রাণবন্ত শত কথা
—ব্যথার কান্নার জলে ভেজা,
অব্যক্ত আনন্দে আভাময়—
শুধু কথা ফোটে চিরকাল। এই মাটির সংসারে
নিতান্ত যে আটপৌরে লোক,
তারও চোখ দীপ্ত হয় কথার অনলে।
পথে-ঘাটে, গঞ্জে কি বাজারে
হাজারে হাজারে তারা ধ্বনিময়। শ্রুতির জানালা খুলে রাখি।

কথা,
গাছের পাতার মতো সহজ-সবুজ;
কথা,
রহস্যের মেঘে-ঢাকা;
কথা,
তত্ত্বের ঘোরালো
আবর্তের মতো
নিষ্ঠুর-কুটিল;
কুমারীর কণ্ঠে-জাগা কুহকিনী কথা আছে,
আছে অফুরন্ত সাধ; আর আছে কথা
কবির চৈতন্যলোকে সুপ্ত, স্তব্ধ প্রতীক্ষায়।

শুধু তাকে বলা যায়—এমন কথার সাড়া নেই
অসংখ্য কথার ভিড়ে, হাটে-মাঠে। যেখানেই থাক
আসে না সহজে তারা এই অন্তর্লোকে॥

খাদ

শামসুর রহমান

সেখানে গভীর খাদ আছে এক কুটিল, ভয়াল :
অতিকায় সিংহের হাঁ-য়ের মতো অদ্ভুত শূন্যতা
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত তা'র, আদিগন্ত বিভ্রমে বিহ্বল।
অতল গহ্বরে সেই আছে শুধু পাঁক, পুঞ্জীভূত
আবর্তিত রুদ্ধ স্ফীত ক্রূর অন্ধ পাঁক, শুধু পাঁক।
আকাঙ্খিত ফুল দল, লতাগুল্ম, পদ্মের মৃণাল
অথবা অপ্রতিরোধ্য পিচ্ছিল শৈবাল, এমনকি
গলিত শবের কীট, কৃমিপুঞ্জ—ঘৃণিত, জটিল—
কিছুই জন্মে না তা'তে, মৃত্যু ছাড়া জন্মে না কিছুই।

অপটু ডানার শীর্ণ পাখির শাবক, বুড়ো কাক,
মাঠের নিরীহ গরু, দিনান্তের তৃষিত মহিষ
অথবা চিকণ মৃগ, কিছুই হয়না প্রত্যাখ্যাত
অতল গহ্বরে সেই। অতর্কিতে হয়তো কখনো
বিভ্রান্ত পথিক কোনো রাত্রির মোহিনী অন্ধকারে
পাঁকের আবর্তে ডোবে নিরুপায়, ব্যর্থ আর্তনাদ,
তিলে তিলে নিমজ্জন, যথারীতি অন্তিমে বিলোপ।

এবং আমিও আজ নিমজ্জিত অন্তহীন খাদে।
দুর্গন্ধের সুতীব্র পীড়নে রাত্রিদিন বিভীষিকা
সমপরিমাণে; ক্রমাগত কেবলি জড়াই পাঁকে।
নিঃশ্বাসে নরক ফোঁসে, আমার অধীর আত্মা সে-ও
গরলের বিন্দু হ'য়ে ঝরে সারাক্ষণ, আর দেখি
আকাশে নক্ষত্রগুচ্ছ, আমি শুধু মরালের মতো
অন্তিম গানের ধ্যানে প্রজ্জ্বলিত, গুঞ্জরিত খাদ॥

কবিতার বোঝাপড়া

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক কবিতা পড়ে কেউ যখন বলেন 'বুঝি না', ঠাট্টা ক'রে বলা যায়— পাঠকের গায়েও আধুনিক কবিদের হাওয়া লেগেছে! নইলে বুঝিয়ে না ব'লে 'বুঝি না' ব'লে হেঁয়ালি করার কী মানে?

'বুঝি না' কথাটার তো অনেক রকম মানে হয়।

'স্পষ্ট নয়'; 'পছন্দ নয়'; 'স্পষ্টও নয়, পছন্দও নয়'; 'স্পষ্ট বটে, তবে পছন্দ নয়'; 'পছন্দ বটে, তবে স্পষ্ট নয়'—'বুঝি না' ব'লে এর যে কোন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে।

কেউ যখন বলে, 'অমুককে আমি দেখতে পারি না'—বক্তা যে নিজের দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে আপশোস করছে না তা বিলক্ষণ বোঝা যায়। 'দেখতে চাই না' ব'লেই 'দেখতে পারি না'। তা'হলে কি পাঠকের 'বুঝি না' বলা থেকে 'বুঝতে চাই না' এই অর্থটাই ধরতে হবে?

কথায় আছে, যে চালাক সে চোখ টিপলেই বুঝতে পারে, আহাম্মক বোঝে ঠেলা দিলে।

'বুঝি না' ব'লে পাঠক চোখ টিপছেন। ঠেলায় পড়বার আগেই আধুনিক কবিকে বুঝে নিতে হবে।

আসলে আজকের লেখক আর পাঠকের মধ্যে বিস্তর ভুল বোঝাবুঝি আছে। দুপক্ষকে একটা বোঝাপড়ার মধ্যে আসা দরকার। মাঝখানে মান অভিমান যেন বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায়।

কবিতার দু দিকে দুটো ডানা। একদিকে লেখক, অন্যদিকে পাঠক। কোন একটা ডানা কাটা গেলে কবিতার আর ওড়া হয় না।

কী লেখক কী পাঠক, একের অন্যকে না হ'লে চলে না। লেখা মানেই কথা বলা। কবিতাও কথা বলারই একটা ধরন। না বললে যেমন কথা হয় না, তেমনি না শুনলেও কথা হয় না।

যখন মুখে কথা হয় তখন বক্তা আর শ্রোতা থাকেন মুখোমুখী। দু'জনেই দু'জনকে দেখতে পান। কিন্তু লেখার বেলায় ব্যাপারটা উল্টে যায়। লিখতে লিখতে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সামনে না দেখতে পেয়ে লেখক ভেবে বসেন বুঝি শুধু নিজের জন্যেই তিনি লিখছেন। তেমনি পাঠকের কাছেও মনে হয় লেখাটা বুঝি আকাশ থেকে পড়েছে।

আসলে বলবার সময় বক্তা আর শ্রোতা মুখোমুখী সম্পর্কে আসেন। কিন্তু লিখবার সময় তাঁদের পিঠোপিঠি সম্পর্ক। লেখক আর পাঠক পরস্পরের পেছনে পড়ে যান। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সম্পর্কটা ঘোচে না।

কিন্তু সম্পর্কটা শুধু লেখক 'আর' পাঠকের নয়, লেখক 'বনাম' পাঠকের। সম্পর্কটা শুধু সহযোগিতার নয়, প্রতিযোগিতারও বটে।

দুটো দল খেলতে নেমে একদল হ'য়ে যায় না। কেন না, তা হ'লে খেলা আর খেলা থাকে না। পরস্পরের প্রতিপক্ষ হ'লে তবেই খেলা হয়। এ ওকে বাধা দেয়। বাধা দেওয়া আর বাধা ঠেলে ফেলা এরই ভেতর খেলা জমে ওঠে।

খেলার নিয়ম থাকে। সেই নিয়ম মেনে নিয়ে নিয়মের মধ্যে থেকে দু'দলকে পরস্পরের সঙ্গে যুঝতে হয়। এ ওর সঙ্গে যুঝবে, গোড়া থেকেই দু'দলের মধ্যে এই রকমের একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া থাকে। প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে দু'দল পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে, সহযোগিতার ভেতর দিয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। দু'দল একই খেলার অংশীদার হয়।

সব খেলারই একটা আরম্ভ আর শেষ থাকে। পুরো সময় খেলতে হয়। পুরো সময় বলতে একটানা বেদম খেলে যাওয়া নয়। খেলা চলতে চলতে মাঝে মাঝে থমকে থমকে দাঁড়ায়। একচালে আগাগোড়া চলে না, চাল বদ্‌লে বদ্‌লে যায়। খেলা তাতে ঝিমিয়ে পড়ে না। বেগ বাড়ে।

নিয়ম মেনে খেলা। কিন্তু নিয়মের কাজ শুধু বেঁধে দেওয়া নয়। বেঁধে ছেড়ে দেওয়া। ছেড়ে দিয়ে বাঁধা। 'না'র সঙ্গে যেন 'হাঁ' থাকে। তা নইলে খেলা আর না-খেলা সমান হ'য়ে যায়।

নিয়ম ভাঙবার পণ ক'রে কেউ খেলতে নামে না। খেলতে খেলতে নিয়ম ভেঙে গেলেও তেমনি খেলা চটে যায় না। নিয়ম ভাঙলে কমবেশি শাস্তি পেতে হয়। নিয়ম ভাঙা যদি রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়ায়, তা'হলে খেলাই ভেস্তে যায়।

লেখার ভেতরেও নিরন্তর এই টানাপোড়েনের খেলা চলে। কিভাবে চলে একটু উঁকি দিয়ে দেখা যাক।

লেখাও একরকমের কথা বলা।

যখন আমি নিঃশব্দে মনে মনে কথা বলি, সেই কথার নাম ভাবনা। যখন মনের কথাটা মুখ ফুটে বলি তখনই সেটা অন্যের কানে যায়।

আরেকভাবেও কথাটা কানে তোলা যায়—মুখে বলার বদলে যদি লিখি। লিখে কোন কথা সরাসরি কানে তোলা যায় না। আগে চোখের কাছে হাজির করতে হয়। চোখ দিয়ে ধরে তারপর কানে তুলতে হয়।

আপনমনে যখন আমি কথা বলি, তখনও পুরোপুরি আমি একা নই। একটা মন দুটো হ'য়ে, শুধু একের হ'য়ে নয় অন্যের হ'য়েও, পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে লেগে যায়। যখন আমি নিঃশব্দে মনে মনে কথা বলি, আমার মন তখন বক্তাও বটে, শ্রোতাও বটে। শুধু বলে না, শোনেও। শুধু শোনে না, বলেও। তাই একা বসে যখন আমি ভাবি, বাকি মানুষদের তখনও আমি ছেড়ে থাকি না। আমার ভাবনাটা শুধু একতরফা বলা হয় না—তার মধ্যে শোনা থাকে, বিচার থাকে, আলোচনা থাকে। মনের মধ্যে তোলপাড় হয়।

মনের অন্য নাম বিবেক। 'বিবেক' মানেই হলো বাদ-বিসম্বাদের ভেতর দিয়ে সত্যে পেঁছুনো। গ্রীক 'ডায়ালেগো' শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত 'বিবেক' শব্দের এদিক থেকে আশ্চর্য মিল। এ-ওর প্রতিধ্বনি নয়, প্রতিবেশী।

যখন আমরা দু'জনে কথা বলি, তখন বক্তা আর শ্রোতা দু'জন লোক। শোনাতে শোনাতে আর শুনতে শুনতে নিজের কথাগুলোকে বোঝাবার মতো ক'রে নিই। ভাবি আর বলি, বলি আর ভাবি। শ্রোতাকে মনের ভেতরে নিয়ে ভাবি। শ্রোতাকে মনের বাইরে রেখে বলি। পরস্পরকে এমন একটা জগতের মধ্যে বেঁধে ফেলি, যে জগৎটা দু'জনেরই

চেনা-জানা। যা আছে তাই শুধু মনে করিয়ে দিই না, যা আছে তাই দিয়ে যা সম্ভবপর তা গড়ে নিতেও বলি। শুধু পুরনো কথা নয়, নতুন কথাও বলি।

লিখতে গিয়েও মনের কথা বাইরে আনি। যখন লিখি তখনও আসলে কথা বলি। হরফের আকারে মুখের কথাগুলো সাজাই।

শব্দ চোখে দেখা যায় না, কান দিয়ে শুনতে হয়। অথচ হরফের সাজ পরিয়ে শব্দ-গুলোকে আমরা চোখেরই সামনে ধরি। চিনতে পেরে চোখ তাড়াতাড়ি কানকে ডেকে দেয়। পড়া ব্যাপারটা এমন পড়ি-মরি ক'রে হয় যে দেখে মনে হয় চোখকে দিয়েই বুঝি কানের কাজটাও করিয়ে নেওয়া হলো। আসলে চোখের কাজ চোখ করে, কানের কাজ কান করে। যার যে কাজ তাকেই সেটা করতে হয়।

লেখায় শব্দগুলো আসে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে। চেনা দেখলে তবেই তারা ধরা দেয়। মুখ খোলে।

'ক' একটা চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। তবু মনে মনে পড়লেও তার ভেতর 'ক'-এর আওয়াজ পাই।

'ক'-এর আওয়াজ 'ক' দাগটার মধ্যে আছে কি? তা যদি থাকত তা'হলে চোখ বুজে লেখাটা সোজা কানের কাছে ধরলেই হতো। আর তা'হলে হরফ চেনবারও দরকার পড়তো না।

গ্রামোফোনে পিন দিয়ে না বাজালে রেকর্ড থেকে যেমন আওয়াজ বেরোয় না, তেমনি চেনা চোখ দিয়ে বাজিয়ে নিলে তবেই হরফ থেকে শব্দ বেরোয়।

শব্দ ধরবার আরও উপায় আছে। যেমন অন্ধেরা ফুটকিওয়ালা লেখা পড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে।

হরফের সঙ্গে আওয়াজের, দেখা বা ছোঁয়ার সঙ্গে কানে শোনার নেহাৎই পাতানো সম্পর্ক। প্রকৃতির মধ্যে এই সম্পর্ক নেই। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে মানুষ এই সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

লেখার সমস্ত মাল-মশলা মানুষ নিরক্ষর প্রকৃতির কাছ থেকেই পেয়েছে। মানুষ শুধু তাকে নিজের ছাঁচে ঢেলেছে। ছাঁচগুলো সবই মানুষের মন-গড়া। 'ক' চিহ্নের সঙ্গে 'ক'য়ের আওয়াজ কোন স্বাভাবিক সূত্রে বাঁধা নয়। সূত্রটা সামাজিক।

সামাজিক সূত্রে বাঁধা প'ড়ে তবেই লেখার হরফ চোখে-কানে কথা বলে। চিহ্নের সঙ্গে শব্দের তখন এমন ভাব হ'য়ে যায়, নিজেদের তারা এক ব'লে ভুল করে। কখনও কখনও তারা এমন ভাব করে যেন প্রকৃতির কাছ থেকেই তারা এসেছে, যেন লেখার পেছনে মানুষের কোন হাত নেই।

চাক্ষুষ লেখার ভেতর দিয়ে শব্দ আসার ফলে শব্দ আর শুধু কানে শোনার জিনিস হ'য়ে থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে তাতে চোখও ভাগ বসাতে চায়। লেখা পড়বার সময় পাঠক আর শুধু কথা বলার শ্রোতা নয়, শ্রোতাকে সঙ্গে সঙ্গে দর্শকও হ'তে হয়। লেখার জগৎ আর কথা বলার জগৎ এক থাকে না।

কথা বলার মধ্যেও শ্রোতা শুধু শ্রোতা থাকেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দর্শকও হ'তে হয়। বক্তা তো শুধু কথা বলেন না, হাত মুখ নেড়ে সেই সঙ্গে ইশারাও করেন। তাঁর সব কথা শুনে ধরা যায় না, দেখেও ধরতে হয়।

কিন্তু লেখায় হাত-মুখ নেড়ে ইশারা করা যায় না। আবার একেবারে ইশারা না ক'রেও পারা যায় না। ছেদ, মাত্রা, দাঁড়ি, কমা দিয়ে পাঠককে নিছক দেখাই। শোনা বন্ধ রেখে তখন দেখতে হয়। পাঠক তখন শ্রোতার বদলে হন নিছক দর্শক।

এইভাবে দেখা আর শোনার মধ্যে যেমন কথা বলায়, তেমনি লেখায় একটা বোঝা-পড়া থাকে। এক সঙ্গে চোখ-কান খাড়া রেখে যেমন পড়তে তেমনি শুনতে হয়।

লেখার রাজ্যে এসে একটা মুস্কিল বাধে। লেখায় শব্দগুলো আওয়াজ হিসেবেই আসে সত্যি, কিন্তু শব্দকে আসতে হয় হরফের মূর্তি ধরে। লেখায় শব্দ নিরাকার নয়, শব্দ সাকার। তাই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ছবি হওয়ার দিকে শব্দগুলোর ঝোঁক দেখা যায়। শব্দগুলো সবাক ছবি হ'তে চায়।

কিন্তু এ মুস্কিল কথা বলার মধ্যেও থাকে। কথা শুধু আওয়াজ নয়, সুর তোলে। বলতে গিয়ে কথা গেয়ে ওঠে।

বক্তা আর শ্রোতা হ'য়ে দু'জন যখন কাছাকাছি আসেন তখন কথা বলায় দু'জনেরই সায় থাকা দরকার। কারো শোনবার দুটো কান আছে ব'লেই যখন-তখন যে সে তাকে যা-তা কথা শোনাবে তা চলে না। বললেও তা কানে ঢুকবে না। কানে ঢুকলেও কথা হবে তখন কতকগুলো ফাঁকা আওয়াজ।

কথার মধ্যে কিছু পদার্থ থাকা দরকার। কথা জিনিসটা নেহাৎ অপদার্থ হ'লে চলে না। বক্তা যে জিনিস শ্রোতাকে কথার ভেতর দিয়ে দেবেন তা শ্রোতার কাছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জিনিস হ'লে চলবে না। তাই ব'লে শ্রোতা যে শুধু ইঁট-কাঠ-জল-মাটি, শুধু আকাট বস্তুকেই ধরা-ছোঁয়ার জিনিস ব'লে মনে করেন—তা নয়। ভালো-খারাপ, ছোট-বড়, কম-বেশি, স্থান-কাল, ভূত-ভগবান, সুখ-দুঃখ—এইসব মাপ, মায়া, আন্দাজগুলোও শ্রোতার ধরা-ছোঁয়ার জিনিস হ'য়েই থাকে।

মানচিত্রের ভেতর দিয়ে ছোট্ট জায়গার মধ্যে গোটা পৃথিবীকে যেমন ধরে দেওয়া যায়, তেমনি শব্দের মধ্যে গোটা পৃথিবীটাকে আঁটিয়ে দেওয়া যায়।

পৃথিবীকে মানচিত্রের মধ্যে ধরা যায় ব'লে মানচিত্রকে সত্যিকার পৃথিবী ব'লে ভুল করা ঠিক নয়। সত্যিকার পৃথিবীটা মানচিত্রের বাইরে। কেউ যদি পৃথিবীর জল-মাটিতে হাত ঠেকাতে চায় তা'হলে তাকে মানচিত্রের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

মানচিত্র শুধু কাগজে এঁকে পৃথিবীর একটা ধারণা দেয়। ছোটোর মধ্যে পৃথিবীকে মেপে দেয়।

ক্যামেরায় যদি আমি পাহাড়ের একটা ছবি তুলি সেটা হবে এইটুকু। অতটুকু পাহাড় দেখে কেউ যদি ব'লে বসে, 'ওটা পাহাড়-ই নয়, কেন না পাহাড় হ'লে ছবিটা তো পাহাড়ের সমান হতো'।

কিন্তু সমান মানে কখনই দুটো এক হওয়া নয়।

আপনার পকেটে টেক্কা-মার্কা দেশলাই আছে, আমার পকেটেও টেক্কা-মার্কা দেশলাই আছে। মার্কা দুটো সমান। তাই ব'লে বলা যাবে না আপনার দেশলাইটা আমার পকেটে আছে, কিংবা আমারটা আপনার পকেটে আছে। আপনার পকেটের দেশলাই আমার পকেটের দেশলাইয়ের সঙ্গে মিলে গিয়ে দুটো এক দেশলাই হ'য়ে গেল, তাও সম্ভব নয়।

দু'জনের দুটো দেশলাই; শুধু মার্কার দিক থেকে এক।

এক টাকার নোট দিয়ে আমি চার আনা দামের চারটে সন্দেশ পেতে পারি। এক টাকায় চারটে সন্দেশ মিলছে ব'লে এ কথা বলা যাবে না—এক টাকার একটা নোটও যা, চারটে সন্দেশও তাই। ময়রার দোকানে টাকা দিলে তবে চারটে সন্দেশ মিলবে। সন্দেশটা পেতে গেলে টাকাটা ছাড়তে হবে।

টাকা দিয়ে শুধু সন্দেশ কেন আরও পাঁচটা জিনিস কেনা যায়। একটা টাকার মধ্যে এতগুলো জিনিস তাদের মান খুঁজে পাচ্ছে। টাকাটাই তাদের মান-সম্মান দিচ্ছে। যত বেশি জিনিস ধরতে পারছে টাকারও ততই মান বাড়ছে।

মান বা মাপ জিনিসটা মনের। মনের বাইরে না এলে তা দিয়ে কোন কাজ হাসিল করা যায় না। কাঠির গায়ে যখন মাপটা ধরে দিই, তখনই সেটা হয় মাপকাঠি। সেই একই মাপ যখন ফিতের মধ্যে ধরি সেটাও মাপকাঠিই হয়।

মাপের কোন নিজস্ব আকার নেই। অনেকটা জলের মতো। যখন যার মধ্যে রাখা যায়, তখন তারই গড়ন নেয়। মাপটা যে যার খুশিমতো ধরলে চলবে না। সবাই একই মাপকাঠি দিয়ে মাপবে। কেউ পাঁচ কড়ায় গণ্ডা গুণবে, কেউ গুণবে তিন কড়ায়—তা চলবে না।

শব্দ তেমনি মনের মাপ। টাকার মতোই শব্দটাকে বাইরে এনে ফেলা যায়। তখন সেটা পড়া কিংবা শোনা যায়। ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে বলতে পারলে শব্দ দিয়ে আমি জিনিসও পেতে পারি। 'এক গ্লাস জল দাও' বললে এক গ্লাস জল মেলে।

কাজটা কথার জোরে হচ্ছে বটে, কিন্তু শুধু কথার জোরে নয়। কথা ছুটে গিয়ে জল গড়িয়ে আনছে না। কথা আসলে জিনিস নয়, কাজ বাগিয়ে আনছে। যাকে বলছি, কথাটা তার কানে যাচ্ছে। 'জল' শব্দটা থেকে জল জিনিসটা সে ভাঙিয়ে নিচ্ছে। তারপর জল গড়িয়ে দিচ্ছে। জল পাবার আগে কথা ব'লে শ্রোতার মন পেতে হলো।

শব্দগুলো রকমারি জিনিসে বোঝাই হ'য়ে থাকে। যাকে দেওয়া হচ্ছে সে শব্দটাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে যখন যে জিনিসটা দরকার বাছাই ক'রে বুঝে নেয়।

শব্দগুলোর সঙ্গে পরস্পরের চেনা-জানা থাকলে তবেই কথা ব'লে পরস্পরের মন জানাজানি সম্ভব। শব্দগুলো ভারি মুখচোরা। তাদের তাড়িয়ে বড় জোর শ্রোতার কান পর্যন্ত পাঠানো যায়। কিন্তু মন পর্যন্ত পাঠানো যায় না।

প্রেমিক প্রেমিকারা ভ্রূকুটি করবেন জেনেও একথা না ব'লে উপায় নেই যে, মন-দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা একেবারেই একটা মিছে কথা।

একজনের মন, একজনের ভাব আরেকজনকে দেওয়া যায় না।

শব্দটা আমার নিজের নয় কিন্তু শব্দের সঙ্গে যে বিশেষ ভাবগুলো লেগে থাকে সেগুলো আমার নিজের দেখে-শুনে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া।

'মানুষ' বললে আমি গরু বুঝি না; সেটুকু হুঁশ আমার আছে। 'মানুষ' বলতে মানুষ জাতটাকেই আমি বুঝি।

কিন্তু 'মানুষ' বলতেই একটা বিশেষ মানুষ আমার মনের সামনে ভেসে ওঠে। 'মানুষটার গোঁফ আছে, শার্টের হাতা গোটানো—হাতে একটা শক্ত লাঠিও আছে'। জানি এইটুকু শুনেই রাজ্যের মেয়েরা আর তার সঙ্গে পাঞ্জাবী-পরা গোঁফ-দাড়ি কামানো পুরুষরা দল পাকিয়ে হৈ-হৈ ক'রে তেড়ে আসবে। তারা ধমক দিয়ে বলবে, 'কী? আমরা মানুষ

নই?' এ রকম একটা কঠিন পাল্লায় পড়তে হবে তা বলতে বলতেই আঁচ করেছিলাম। তাই মনের মানুষটার নিরস্ত্র হাতে ভয়েভয়ে তাড়াতাড়ি একটা শক্ত লাঠি গুঁজে দিয়েছিলাম।

কিন্তু 'মানুষ' ভাবতে গিয়ে টেকো আর বাবড়ি চুল, খালি চোখ আর চশমা-পরা চোখ, কালো আর ফরসা, উদো আর বুধো সব যদি একাকার হ'য়ে যায়—সেটাই বা কী জাতের মানুষ হবে?

যখন কবিতা লেখা হয়, নিরাকার নির্গুণ মানুষে কাজ হয় না। কবিতার জন্যে চাই গুণধর মানুষ। সে মানুষ এমন হবে যাকে ধরা-ছোঁয়া যাবে। নিদেনপক্ষে একটা ঠুঁটো জগন্নাথ কিংবা তালপাতার সেপাই হ'লেও চলবে।

জীবাণু আমার কাছে থেকেও নেই। কিন্তু সূর্য ঠায় মাঝখানে থাকলেও আমি যে দেখতে পাই পুব দরজা খুলে সূর্য রোজ ওঠে।

আমি যেমন পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে দেখি, তেমনি অন্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষভাবেই দেখাতে চাই। কবিতার জগতে সব কিছুরই হয় গড়ন নয় স্বাদ, হয় রং নয় গন্ধ, আছে—সব কিছুই ধরা ছোঁয়া যায় ব'লেই পৃথিবী শুধু পৃথিবী নয়, পৃথিবী ধরণী।

পৃথিবীকে ধরি, পৃথিবীকে ছুঁই শুধু ধরা-ছোঁয়ার জন্যে নয়। বাসনার হাতে ধ'রে-ছুঁয়ে পৃথিবীকে বদলাই। সব কিছু আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সরিয়ে নড়িয়ে দিই। তোলপাড় করি। পৃথিবীর কাছে শুধু চাই না—পৃথিবীকেও দিই একটি স্পন্দমান হৃদয়।

জীবনের ডালে কবি নাড়া বাঁধে। আকাঙ্ক্ষাগুলোকে উঁচুতে টাঙিয়ে গান গেয়ে গেয়ে দোল দেয়।

কবি কেমন ক'রে দেখে? যেমন ক'রে সবাই দেখে।

বনের ভয়-পাওয়া পশুরাও জানে—না নড়লে কিছু দেখা যায় না। তাই হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে মড়ার মতো চুপচাপ পড়ে থাকে। নড়ে না; পাছে দেখা যায়।

এক জায়গায় ঠায় থাকলে দেখা যায় না। ঠাঁই নাড়া হ'লে তবেই দেখা যায়। পাঁচটা জিনিসের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকলে বাঁধনটা খুলতে হয়। তুলে আনতে হয়। ছাড়াতে হয়। আল্‌গা ক'রে আলাদা ক'রে দেখতে হয়।

কিন্তু শুধু বাঁধন খোলা নয়, নতুন ক'রে বাঁধা। শুধু পাঁচটা জিনিসের মধ্যে থেকে তোলা নয়, পাঁচটা জিনিসের মধ্যে ফেলে দেখা। শুধু একা করা নয়, এক করা। তফাৎ ক'রে মেলানো।

কবি তোলপাড় ক'রে দেখে। সব কিছুই তাকে নেড়েচেড়ে দেখতে হয়।

পৃথিবীতে কিছুই এক জায়গায় বসে নেই। সমস্ত পৃথিবী আনচান করছে নিজেকে দেখাবার জন্যে। সমস্তই বদ্‌লে বদ্‌লে নিজেকে দেখাচ্ছে।

বস্তু যখন নিজেকে ছেড়ে বাঁধে, আর বেঁধে ছাড়ে,—তখন টান লাগে। সেই টানই হলো মন। তখন্ নিজের মুকুরে নিজেকে দেখতে পায়। মুচড়ে মুচড়ে ওঠা। ব্যথায় টনটন করা। সেই হলো দেখা। মনের কাজই হলো দেখা। টান না থাকলে দেখা হয় না। মন তাই নিরন্তর টানে।

নদী যেতে যেতে নিজেকে দেখায়। শুধু দেখায় না, শব্দ ক'রে ক'রে দেখায়। মাটির সঙ্গে নিজেকে বাধিয়ে বাধিয়ে, বাজিয়ে বাজিয়ে দেখায়।

বাঁধা থাকলে তাতে আওয়াজ থাকে না। দীঘির বাঁধা জল নিস্তব্ধ নিথর। থেমে

থাকলে আওয়াজ নেই। চললে তবেই নদী গেয়ে ওঠে।

নদী নড়ে নড়ে নিজেকে দেখায়। নিনাদিত হ'য়ে নিজেকে দেখায়। দেখানো আর শোনানো একই সঙ্গে চলে।

আলো তরঙ্গিত হয় ব'লেই আমরা দেখি। ধ্বনি তরঙ্গিত হয় ব'লেই আমরা শুনি।

একই গতির মধ্যে দৃশ্য আর শব্দ এ ওকে ধ'রে ধ'রে এগোয়। কখনও একা হয়। কখনও এক হয়। ঝোঁকে ঝোঁকে চলে। এ ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে এ ওকে টানে।

সব কিছুই এমনি এক অস্থির উচাটনের মধ্যে নিজেকে টান ক'রে দেখায়। ওঠা আর পড়ার মাঝখানে উত্তাল হ'য়ে ঢেউ নিজেকে ফুটিয়ে তোলে। ঠায় থাকে না, ঠাঁই-নাড়া হ'য়ে সরে সরে থাকে। থেকে থেকে ওঠে, থেকে থেকে পড়ে। ওঠা আর পড়ায় দ্বিধা হ'য়ে ঢেউ দুলে দুলে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চলে।

থাকা বলতে থাক-থাক হ'য়ে, একের পর এক হ'য়ে থাকা। নিজেকে কেবলি নয়-নয় ক'রে বারে-বারে নতুন হওয়া। নিজেকে 'না' 'না' ক'রে একই ঢেউ নিজেকে নানানখানা ক'রে তোলে।

ঢেউ পড়বে ব'লেই ওঠে। পড়ে গিয়ে ফের ঠেলে ওঠে। বার-বার একই জায়গায় উঠে-পড়ে ঢেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল ঠোকে না। তালে তালে চলে। চরকির মতো পাক দিয়ে দিয়ে ফেরে।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ছকে সব কিছু বাঁধা। ছকই হলো গতি। তাই কোন বস্তুই নিছক নয়।

এই ছকটারই অন্য নাম ছন্দ। সারা পৃথিবীটাই ছন্দে বাঁধা। সূর্যের চারপাশে, নিজেকে বেড় দিয়ে নিপুণ হ'য়ে ঘোরে ব'লেই পৃথিবীতে বসন্ত আসে, পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। ছন্দের জোরেই পৃথিবী প্রাণ পায়।

বস্তু সব সময় নিজেকে চালাচালি করে। বীজ ফাটিয়ে, অঙ্কুর হ'য়ে, ডালপালা মেলে আকাশে মাথা তুলে, পাতার আড়ালে ফুল ফুটিয়ে—এমনিভাবে গাছ নিজেকে নেড়ে নেড়ে দেখায়। তারপর একটা সময় আসে, গাছ নিজেকে ফুরিয়ে ফেলে। বাড়তে বাড়তে বাড়ন্ত হ'য়ে যায়। তার আগে আশে-পাশে বীজ ছড়িয়ে দেয়। একটি বীজ বেড়ে অনেকগুলো বীজ হয়। একটি গাছ থেকে অনেক গাছ। একসঙ্গে অনেক হলে গাছ আর নিছক গাছ থাকে না—নতুন সম্বন্ধের মধ্যে নিজেদের মিলিয়ে দিয়ে গাছের দল তখন অরণ্য হ'য়ে ওঠে।

বিষম নাড়া খেয়ে খেয়ে সমুদ্রের গর্ভে হয়েছে প্রাণের জন্ম। বস্তু যখন বাইরের নাড়াটাকে ভেতরে আনে, তখনই বস্তুর মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগে। পৃথিবীতে দেখা দেয় স্পন্দমান প্রাণ।

প্রাণ পাবার মধ্যে মানুষের কোন হাত ছিল না। কিন্তু প্রাণে যে মন লেগেছে, তাতে পুরোপুরি মানুষেরই হাত। 'মানুষ' তাই একটা নেহাৎ নাম নয়। 'মানুষের' মধ্যে 'মন'—এই কৃতিত্বটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে রাজা-রাজড়ার মতোই 'মানুষ' আমাদের খেতাব হ'য়ে উঠেছে।

প্রাণ যেমন বস্তু-ছাড়া নয়, মনও তেমনি বস্তু-ছাড়া নয়। আসলে মন জিনিসটা বস্তুরই একটা বড় রকমের চাল।

যখন বস্তু প্রাণ পায়, পৃথিবীর সঙ্গে বাঁচার সম্বন্ধে আসে। বাঁচার মধ্যে থাকে চাওয়া। প্রাণীর সঙ্গে প্রকৃতির তখন চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক।

পৃথিবী এতদিন শুধু চরাচরের মধ্যে ভাগ হয়ে ছিল। প্রাণ এসে জড়বস্তু থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে পৃথিবীকে নতুন ক'রে ভাগ করলো।

গোড়ায় ছিল গাছ হ'য়ে শুধু এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে চাওয়া। আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে, জল-মাটিতে শেকড় চালিয়ে বাঁচার জন্যে উসখুস করা।

তারপর পোকা-মাকড় পশু-পাখি হ'য়ে সুরু হলো চেয়ে-চিনে বেড়ানো। ঠাঁই-নাড়া হয়ে প্রকৃতির গায়ে গা ঠেকিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় নেওয়া।

চাওয়া-পাওয়ার এই সম্পর্ক নিয়ে মানুষও পৃথিবীতে এল। কিন্তু নিছক চেয়ে থেকে কিংবা নেহাৎ চেয়ে-চিনে বেড়িয়ে মানুষের বাঁচা চললো না। প্রকৃতিকে মানিয়ে নিতে হলো। প্রকৃতির সঙ্গে চাওয়া-পাওয়ার নতুন সম্বন্ধ পাতিয়ে মানুষ পৃথিবীকে নতুন ক'রে ভাগ ক'রে নিল।

খালি হাত প্রকৃতির গায়ে সোজাসুজি ঠেকানো নয়, হাতিয়ার লাগিয়ে পৃথিবীকে ঠিকঠাক করা। হাতিয়ারটা হলো হাতের ঠেকো। বলা যায়, বাড়তি হাত।

পৃথিবীকে ঠিক করতে গিয়ে মানুষ নিজেরও ঠিক পেল। প্রকৃতিকে বাগ মানাতে গিয়ে মানুষ নিজেকেও বাগ মানালো।

বাঁচতে গেলে চাওয়া আর পাওয়াকে এক করতে হয়। চাহিদা আর জোগান মিলে গেলে তবেই লেন-দেন চালু থাকে। ঘরে কুঁজোভর্তি জল আছে; তেষ্টা পেলে তখনই জলের খোঁজ পড়ে। বাকি সময়টা জল যেন থেকেও থাকে না।

বাঁচার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের অনবরত লেন-দেন হচ্ছে। চাওয়া আর পাওয়া দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে তার একটানা বোঝাপড়া চলেছে। প্রকৃতিকে দিয়ে মানুষ তার অভাব মিটিয়ে নেয়।

প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর ভাব, আমার মধ্যে বস্তুর অভাব। হাত বাড়িয়ে হাতিয়ার দিয়ে প্রকৃতির মধ্যে অভাবটাকে ফেলতে হয়। তার ফল হিসেবে প্রকৃতির ভাবটুকু আমার মধ্যে আসে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এমনি একটা লেন-দেনের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে যেমন প্রকৃতিকে তেমনি মানুষকে কিছুটা ছাড়তে-নিতে হয়। তখন আগের অবস্থাটা বদলে যায়।

আগে ছিল : প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর ভাব, মানুষের মধ্যে বস্তুর অভাব। এবার হয় : মানুষের মধ্যে বস্তুর ভাব, প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর অভাব।

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে : গাছে ফুল ফুটে আছে, ফুলটা আমার চাই। তখন গাছের মধ্যে ফুলের ভাব, আমার মধ্যে ফুলের অভাব। গাছ থেকে ফুলটা তুলে আনতেই আগের অবস্থাটা বদলে গেল। তখন আমার মধ্যে ফুলের ভাব, গাছের মধ্যে ফুলের অভাব।

যা—চাই, তাই দিয়েই মানুষ পৃথিবীকে যাচাই করে। মানুষের চাওয়াটাই হলো মানুষের মাপকাঠি।

গোড়ায় বস্তুই ছিল বস্তুর ভাব। ফুল হ'য়ে থাকাটাই ফুলের ভাব।

মানুষের হাত ধরে যখন মন এল, তখন পৃথিবী শুধুই মানুষে-অমানুষে ভাগ হলো না। একটা পৃথিবী মনের গুণে দুটো হলো।

বস্তু আর ভাব আলাদা হ'য়ে গেল। একই বস্তু তখন 'বস্তু' আর 'বস্তু'র ভাব হ'য়ে দু'জায়গায় থাকল। মনের বাইরে আর মনের ভেতরে। বাইরের জগতে হাতের ধরা-ছোঁয়ার

মধ্যে যে প্রত্যক্ষ বস্তুটা ধরা থাকল, মন সেই বস্তুটাকেই আবার মুখের কথা দিয়ে বেঁধে ভাব হিসেবে নিজের জগতে ধ'রে রাখল।

কিন্তু ভাব আর অভাবের সম্পর্কটা ঘোচে না। 'জল' শব্দটা যখন জলের ভাব নিয়ে আমার মনে থাকে, তখন জলের ভাবটা হয় জল বস্তুটার অভাব। আবার জল বস্তুটা 'জল' শব্দের মধ্যে ধরা না পড়ে যখন প্রকৃতির কোলে থাকে তার মধ্যে মনের ভাবের অভাব ঘটে।

ভাব আর অভাব এ ওকে আঁকড়ে ধরে থাকে। একই জিনিস একাধারে ভাব, একাধারে অভাব হয়; একবার ভাব, একবার অভাব হয়। ভাবের মধ্যেই থাকে অভাব; অভাবের মধ্যে ভাব। ভাব থেকে অভাবের, অভাব থেকে ভাবের দিশে পাওয়া যায়।

মনের সঙ্গে বস্তুর এই চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক নিয়েই মানুষ প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ায়। শুধু চোখ মেললে চলে না; তাক ক'রে তাকিয়ে দেখতে হয়। চেয়ে দেখলে, দেখার সঙ্গে চাওয়া মেলালে, তবেই ঠিক ক'রে দেখা হয়।

চোখ দেখে জাল ফেলে' ফেলে'। একটা গণ্ডি দিয়ে আগে ঘিরে নেয়। তারপর জালটাকে যত গুটিয়ে আনে গণ্ডিটা ছোট হয়। চোখ যত বিঁধিয়ে বিঁধিয়েই দেখুক, ছোট্ট একটা গণ্ডি থেকেই যায়।

আশপাশসুদ্ধ আকাশটাকে বাদ দিয়ে নির্ভেজাল চাঁদ দেখাতে হলে অর্জুনের মত টিপ হওয়া দরকার। চাঁদ যদি কাঠের পাখি হতো, তা-ও না হয় কথা ছিল।

কিন্তু চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি আকাশটাকেও দেখি। চাঁদকে আমিও টিপ করি। কিন্তু অন্য রকমের টিপ। এ টিপ কপালে থাকে। আকাশটা কপালের মতো মনে হয়।

কিন্তু চাঁদকে আমি সেই একবারের দেখা অচেনা চাঁদ ক'রে রাখি না। আকাশ থেকে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনি। ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি না। আমার ছোট্ট মেয়েটার শিয়রে ব'সে সকাল-সন্ধ্যে ডাক দিই—

আয় চাঁদ আয়—
খুকুর কপালে টিপ দিয়ে যা॥

টিপ দিতে ব'লে খোদ চাঁদটাকেই খুকুর কপালে বসিয়ে দিই। সেই সঙ্গে খুকুর কপালে এক টুকরো আকাশও ঠেকিয়ে দিতে ভুলি না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রথম যে কে কার কপালের টিপ দেখেছিল, এখন আর সে খবরই কেউ রাখে না। কপালটা যে মানুষের তাতেও সন্দেহ নেই। টিপটা হয়তো সিঁদুরের কিংবা কাঁচপোকার। কোন না কোন টিপ কারো না কারো কপালে। সেই দেখাটা ছড়ার মধ্যে ধরা পড়ে সমানে নিজেকে নেড়ে নেড়ে যাচ্ছে।

হাতে যা ঠেকে তাই যেমন আমরা হাতে তুলে নিই না, চোখে যা ঠেকে তাই তেমনি আমরা আদেখ্‌লের মতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিই না। দেখার মধ্যেও থাকে বাদছাদ। গুচ্ছের মধ্যে দেখলেও একটি একটি ক'রে তুলে বেছে দেখি।

চোখ চুপচাপ দেখে। মনই তার কানে কানে কথা ব'লে চিনিয়ে দেয়। ওটা মেঘ, এটা মাটি, ওটা চলছে, এটা থেমে আছে। ওটা ছায়া, এটা আলো। ওটা শক্ত, এটা নরম। ওটা দূর, এটা নিকট। ওটাতে আওয়াজ আছে, এটা স্তব্ধ। ওখানে গন্ধ আছে, এখানে গন্ধ নেই।

শুধু দেখা নয়, কান পেতে, হাতে-পায়ে ধরে ছুঁয়ে, জিভ ঠেকিয়ে, নাকের কাছে এনে দেখা। শুধু চোখ দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে দেখা। চোখের যা অভাব মনই তা মিটিয়ে দেয়।

চোখ যেমন ইশারায় শুনে নেয়, কানও তেমনি আড়ি পেতে দেখে নেয়। পায়ের শব্দে বুঝি, মানুষ না জন্তু। শুধু রূপ নয়, স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শও শব্দের মধ্যে ধরে দিই। আকার বুঝিয়ে দিই 'প্র-কা-ণ্ড' আর 'ছোট্ট' ব'লে। 'টক-টক', 'ভ্যাপসা-ভ্যাপসা', 'খশখশে' ব'লে স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শের আদল দিই।

মুখের কথা তাই সশব্দও বটে, সচিত্রও বটে। চেনা মানুষ হ'লে ডেকে ডেকে চেনা পৃথিবীটাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেয়।

কবির কোন আলাদা সৃষ্টিছাড়া জগৎ নেই। যে জগতের সঙ্গে চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কে এসে মানুষ জীবনকে ফুটিয়ে তোলে, সকলের সেই চাওয়া-পাওয়ার জগৎটা নিয়েই কবিরও ব্যস্ততা। মুখের যে কথাগুলো পৃথিবীকে মেপে মেপে দেখায়-শোনায় সেই কথা নিয়েই কবির কারবার। প্রকৃতির সঙ্গে দলবদ্ধ মানুষের অবিরাম যে যোঝাযুঝি চলেছে, কবি দলছাড়া হ'য়ে সেই লড়াই থেকে স'রে থাকে না।

পৃথিবীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যেই মানুষে-মানুষে বোঝাপড়া ক'রে নিতে হয়। কথা তাই শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়ে শেষ হয় না, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পাতায়।

এই বোঝাপড়াটা হলো চাওয়া-পাওয়া নিয়ে। প্রকৃতি যা হাতে তুলে দেয় তা দিয়ে মানুষের চলে না। তাই জোর ক'রে কেড়ে-কুড়ে নিতে হয়। তাতেও চলে না। তখন মানুষ বসে প্রকৃতির ওপর কারিকুরি ফলাতে।

বাঁচাটা আর নিছক বাঁচা থাকে না। যেমন তেমন বস্তু হ'লে চলে না। মনের মতো জিনিস হওয়া চাই। বস্তুর মধ্যেও মানুষ মনটাকে ঢুকিয়ে দেয়। মানুষের হাতে পড়ে আসল বস্তু হ'য়ে ওঠে বানানো জিনিস। জিনিসটাকে দু'বার ক'রে হ'তে হয়। একবার মনের মধ্যে। একবার মনের বাইরে। একবার চাওয়া হ'য়ে, একবার পাওয়া হ'য়ে। যে জিনিসটা হয়, তাতে শুধু হাতেরই কারিকুরি থাকে না, মনেরও কারিকুরি থাকে।

যা আছে তাতে চলে না। প্রকৃতিকে মানুষ ঢেলে সাজে। সাজ বদলে প্রকৃতিকে নতুন হ'তে হয়।

মানুষের মনের সাজঘরে প্রকৃতিকে আগে সাজিয়ে নেওয়া। হাতে পাবার আগেই মনের মধ্যে পাওয়া চাই।

মনের নিজের কোন মাল-মশলা নেই। প্রকৃতির ভাঁড়ার থেকেই সব কিছু ধার করতে হয়। মন পাকা রাঁধুনি বটে, কিন্তু তরিতরকারী মশলাপাতি হাতাখুন্তি সবই বস্তুজগৎ থেকেই নিতে হয়। সব তুলে-বেছে এক জায়গায় ক'রে যে রান্নাটা সে ধরে দেয়, তার স্বাদ মাথা কুটলেও প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যাবে না।

হাত-ই শুধু কাজ করে তা নয়। মনও কাজ করে। কিন্তু মনের কাজটা সরাসরি হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না। হাত চালিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়। মন কাজ ক'রে ভাবনার ভেতর দিয়ে। ভাবনা মানেই হওয়ানো। মন করে কাজের কাজ। হাতের কাজের আগে মনের কাজ।

কবিতাও কাজ ছাড়া কিছু নয়। সটান কাজ নয়, কাজের জন্যে কাজ। হাতের কাছে নক্‌শা ফেলে দেওয়া। যাতে সেই মতো কাজ হয়।

মানুষের কাছে জীবন বলতে চাওয়া আর পাওয়া। কিন্তু পাওয়াতেই শেষ নয়। পাওয়ার পর আবার চাওয়া। কেবল চেয়ে চেয়ে পাওয়া আর পেয়ে পেয়ে চাওয়া।

কিন্তু জীবনটা সোজা রাস্তায় চলে না। চাওয়া আর পাওয়া বারবার একই জায়গায় ফিরে আসে না। আগের চাওয়া আর পরের চাওয়া হুবহু এক হয় না। লতিয়ে লতিয়ে উঠে, চাওয়া আর পাওয়া কেবলি বেড়ে বেড়ে যায়।

বাঁচা বলতে মানুষের মতো বাঁচা। মানুষ দিয়েই আমরা চাওয়া-পাওয়া যাচাই করি।

কিন্তু মাপকাঠিটা কি বরাবর একই থাকে? মানুষ কি চিরদিন একই মানুষ থাকে?

পৃথিবীর সব কিছুর মতোই মানুষ-বস্তুটারও বদল হয়। প্রকৃতিকে বদল ক'রে মানুষ নিজেকেও বদলায়। তাই 'মানুষ' বলতে আমার মনে যে মানুষটা ভেসে থাকে, সেটা আমারই চেনা-জানা দেশকালের মানুষ। সে উলঙ্গ নয়, গুহায় থাকে না, প্রেম-ভালোবাসা বোঝে। তার সঙ্গে দেখা হ'লে সে মাথার টুপি সরিয়ে ঘাড়টা নুইয়ে দেয় না, হাত দুটো জোড় ক'রে নমস্কার করে। সে যখন ব্যথা পেয়ে কাঁদে, আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে ষাট-ষাট করি। যখন কাউকে যন্ত্রণা দেয়, অনায়াসে বলতে পারি—'তুমি মানুষ নও'।

নানা দেশের নানা কালের নানা রকমের চাওয়া-পাওয়া দিয়ে আমি আলাদা আলাদা জগৎকে বুঝে পড়ে নিই। রক্তমাংসের মানুষটার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে আমি একাধারে নিজেকে সহস্র ক'রে দেখি। আমার দেখাটা মানুষেরই দেখা হয়। মাটির সঙ্গে মাটি হ'য়ে গিয়ে, গাছের সঙ্গে গাছ হ'য়ে গিয়ে আমি পৃথিবীকে দেখি না। নিজেকে মানুষ ছাড়া আর কিছু বানাতে পারি না। তাই মানুষের চোখেই গাছ-মাটি-জল-বাতাস সব কিছু দেখি। যখন বলি, গাছটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে—গাছ তা না বুঝলেও, মানুষ তা বোঝে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে হ'লেও নিজেকে একেবারে আমি মিশিয়ে দিতে পারি না। যেটা মেশাবো সেটা বজায় থাকা চাই। যার মধ্যে মেশাবো তার মধ্যে তাকে থাকতে হবে।

পুকুরে বৃষ্টির জল পড়লে তা পুকুরের জলে মিলিয়ে যায়। পুকুর টইটম্বুর হ'লে তখনই বুঝতে পারি পুকুরটা বৃষ্টির জলে বেড়ে উঠেছে।

আমি তেমনি ক'রে নিজেকে মেলাতে চাই—গাছ যেমন ক'রে অরণ্যের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেয়, আবার নিজের মধ্যে অরণ্যকে ধ'রে রাখে।

কবিতায় আমি কখনও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দিই না। নিজেকে একেবারে পর ক'রে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার নামটা আর কারও সঙ্গে মিললেও আমারই থাকে; আমি আমার চটিটা ফট্‌ফট্‌ করতে করতে, চশমাটা মুছতে মুছতে, চেনা লোকদের 'কী-খবর' বলতে বলতে মিছিলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াই। মিছিলের ঠিক যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে থাকি, সেখানে আমি একক। ঠিক একই জায়গায় দু'জনের ঠাঁই হয় না। সকলের সঙ্গে থেকেও এক জায়গায় আমি নির্জন, আমি নিঃসঙ্গ।

আমি যখন আখ খাই, দাঁত দিয়ে আখের ছিবড়েটা ফেলে দিয়ে শুধু রসটুকুই খাই। কাউকে আখ খেতে বললে সে যদি আখটাকে ছেঁচে নিয়ে আখের রস বার ক'রে বাটিতে চুমুক দিয়ে খায়—তা'হলে সেটা আখ খাওয়া হয় না। আখের রস খাওয়া হয়। আখের

রস আর আখ খাওয়ার রস—দুটোই রস বটে, কিন্তু দুটো দু'রকমের রস।

কবিতার ভেতর দিয়ে কবি পাঠককে বলেন আস্ত আখটা তুলে নিতে। আখটা ছাড়িয়ে নিতে হয়। ছিবড়ে থেকে আলাদা ক'রে রসটা বার করতে হয়। কিন্তু পাঠক তাতে দাঁত লাগাবেন, না নোড়া দিয়ে ছেঁচে নেবেন—তারই ওপর নির্ভর করবে সেটা শুধু আখের রসই হবে, না তাতে আখ খাওয়ার রসও থাকবে। কবিতার ভেতরে রস থাকে, কায়দা ক'রে সে-রস বার করতে হয়।

তাঁতীর মনের চাওয়াটা কাপড়ের মধ্যে পেতে হয়। তবেই কাপড় পাওয়া যায়।

কিন্তু পাওয়াতে শেষ হ'লে চলে না।

তাঁতী নিজের জন্যে কাপড় বানাচ্ছে না। তাই তখন তার কাপড়-পাওয়াকে কাপড় চাওয়ার মধ্যে ফেলতে হয়। কেউ যেন সে কাপড় চায়। শুধু চাওয়ার মধ্যে শেষ হ'লে চলে না। পাওয়া চাই। চাওয়া আর পাওয়াকে মেলাতে হয়। কিন্তু কাপড়টা ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত তার মধ্যে সমানে চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কটা বিনুনি ক'রে জড়ানো থাকে।

কবির কাজ সটান বস্তুকে পাইয়ে দেওয়া নয়। বস্তুকে চাওয়ানো। অভাব জাগানো। ব্যথায় কাতর ক'রে তোলা। কবিতায় আসল বস্তুকে ধ'রে দেওয়া যায় না। চোখে কানে কথা ব'লে শুধু একটা নকল তোলা হয়।

চাওয়াটা শুধু চাওয়াতেই শেষ থাকে না। পাইয়েও দিতে হয়। চোখে কানে কথা ব'লে বস্তুটাকে মনের মধ্যে পাইয়ে দিতে হয়। কবিতার কাজই হলো ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা।

কবিতার কারবারও এই বস্তুর জগৎটাকে নিয়েই। বস্তুকে মনের মধ্যে নিলে 'বস্তু' হয় 'বাসনা'। বস্তুর জগৎ থেকে বাসনার জগতে, বাসনার জগৎ থেকে বস্তুর জগতে - কবিকে বারেবারে চক্রাকারে ফেরাফেরি করতে হয়। কবিতা মনের মধ্যে উঠে বলে 'চলো চলো'। বাসনা থেকে বস্তুতে। বস্তু থেকে বাসনায়।

কবিতার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গেই বোঝাপড়া। বাসনার ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে বদ্‌লে বদ্‌লে নতুন করা।

যা আর পাঁচজনকে করতে হয়, বিচিত্র রকমের কাজ আর কাজের কাজ—কবি তার চেয়ে কমবেশি কিছু করে না।

কবিতায় থাকে ছন্দ। ছন্দ বলতে একটাই মানে নয়। ছন্দ মানে বাঁধা, এক জায়গায় করা, ফুটিয়ে তোলা। ছন্দ মানে আনন্দ, নেচে নেচে ওঠা, নেড়ে নেড়ে দেওয়া। ছন্দ মানে উদ্দেশ্য, ভাব, বস্তু।

সবটা মেলালে কী হয়?

কবিতায় থাকে উদ্দেশ্য। কিছু চাওয়া। বস্তুরই বাসনা। তারপর তাকে একটা আদি-অন্তে বেঁধে, বইয়ে দিতে হয়। এমন ক'রে বওয়াতে হয় আগাগোড়া যেন টানের মধ্যে থাকে। শুধু বাসনা থাকলে হবে না, তাকে বজায় রেখে কথার জালে একটানা বুনে যেতে হবে। বাসনার বুনুনিটাই হলো ছন্দ। ছন্দই ছক। ছন্দই গতি।

কবিতার চালই হলো ছন্দ। ছন্দ শুধু পদ্যে নেই, শুধু গদ্যেও নেই। পদ্য আর গদ্যে শুধু চালের তফাৎ। কবিতাকে ছন্দে ফেলতে হয়, ছকে বাঁধতে হয়। নি-ছক হ'লে চলে না।

কবিতার যা 'বস্তু', সেই 'বাসনা'র মধ্যেই ছন্দ থাকে। বাসনার ভেতর থেকেই ছন্দ তুলে আনতে হয়। সচিত্র সশব্দ বাসনা ছন্দে বাঁধা প'ড়ে কবিতা হয়।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে বোঝাপড়া, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বোঝাপড়া— চাওয়া-পাওয়ার সেই সম্পর্কটাই কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়।

এর বাইরে কবির সঙ্গে পাঠকের অন্য কোন রকমের বোঝাপড়া থাকতে পারে না।

এই সম্পর্কটা কবিতায় বজায় থাকলেও পাঠক যেখানে অবুঝ হন, কবিকেও সেখানে 'বুঝি না' বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

কবি হাল ছাড়েন না। পাঠকের মত 'বুঝি না' ব'লে লেখকও শুধু চোখ টেপেন।

লেখকের মত পাঠককেও যেন শেষকালে ঠেলতে না হয়!

আসলে কবিতাকে দু'চোখ চেয়ে চলতে হয়। একটি চোখ কবির। একটি চোখ পাঠকের। কবিকেও যেমন নিছক কবি হ'য়ে এক চোখে দেখলে চলে না। পাঠককেও তেমনি নিছক পাঠক হিসেবে একচোখো হ'য়ে থাকা চলে না।

কবি আর পাঠকের চোখোচোখি হওয়ার মধ্যেই থাকে কবিতার বোঝাপড়া।

ছন্দিত বাসনাকে বোঝবার এই পথটা সরল নয়, ঘোরালো। যাঁরা এই ছকটা মানতে রাজী নন, পৃথিবীতে বোঝাপড়ার কোন রাস্তাই তাঁদের কাছে খোলা নয়। মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়া ছাড়া তাঁদের কোন গতি থাকে না।

নটি

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রাজ্য পরকরতলগত। রুক্ষ দেশ, নিরুত্তর প্রকৃতি।

তবু দিন চলে যায়। মহাসমারোহে ঋতু পরিবর্তন হয়। বসন্ত আনে বেদনা ও আকুলতা। পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ও কেঁদফুল ফুটে ওঠে উত্তাপে। চঞ্চল বাতাস আনে মন-উদাস-করা মধ্যাহ্ন। চন্দ্রালোকে উৎসবময়ী রজনীতে বিরহী পাপিয়া ডেকে ডেকে রাত জাগে। বকুল ও অশোক ফুল মঞ্জরিত হয়ে আনে সৌরভ, আনে সৌন্দর্য। সব আছে, তবু যেন কিছু নেই, কেউ নেই।

মোতির মনের ব্যথা বসন্তের মনে নেই। তার বরণে হোলির উৎসব হয়। আবীর খেলা হয়, গান, নাচ ও আনন্দ চলে। এই দিনে জানালায় পর্দা টেনে দিয়ে নিজের ঘরে বসে মোতি। প্রিয়তমের স্মরণে বিনা ফাগে হোলি খেলে তার মন—হোলি খেল মনা রে, বিন করতাল পখাওজ বাজৈ, অনহদকী ঝংকার রে। যখন মনে পড়ে এইরকম হোলির দিনে তার সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল খুদাবক্সের, তখন মনে হয় পাপিয়াও তার শত্রু। বারবার ডেকে তাকে তার দুঃখের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,

> পপইয়া প্যারে, কবকে বৈর চিতারো
> ম্যয় সুতীছী অপনে ভবনমেঁ পিয় পিয় করত পুকারো॥

ঘোসের কাছে লেখা চিঠিখানা বারবার পড়ে মোতি। অপেক্ষা করতে লিখেছে খুদাবক্স, ধৈর্য রাখতে বলেছে। সে ত' জানে না মোতি কত দুর্বল! বারবার পড়ে পড়ে মলিন হয়েছিল চিঠিখানা। ভাগ্যে একপৃষ্ঠায় লেখা, তাই মোতি তাকে একটি রেশমের কাপড়ে জুড়ে, শাদা পাথরের বাক্সে কর্পূর দিয়ে রেখেছে।

মন উদাস হলে রানীমহালে গিয়ে গান শোনায় মোতি। শ্রোতারা উপলক্ষ্য মাত্র, গান গায় সে নিজের জন্য। গানে গানে মুক্তি পায় অনুধ্যানে।

বড় ঘনঘটা করে বর্ষা আসে গ্রীষ্মের তাপদাহনের পরে। দিগন্তের শেষ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ উঠে আসে—আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘাশ্লিষ্ট আকাশ দেখে ভ্রম জাগে। মেঘলোকে পাগলা হাতীর দল যেন বপ্রক্রীড়া করতে বেরিয়েছে।

মেঘের গুরু গুরু সজ্জার দিনে মহলের অংগনে একখানি নীল চিকণের সাড়ী পরে অযত্নে করবী সংবন্ধ করে তানপুরা নিয়ে বসে মোতি। শোনে, "আবনকী আওয়াজ। মহলান চঢ়ি চঢ়ি জোউঁ মোরী সজনী, কব আয়ে মহারাজ......উমগ্যো ইন্দ্র চহুঁ দিস বরষে, দামিনী ছোড়ী লাজ।"

তার মন এক প্রান্তর, সেখানে উন্মুখ মেঘ চারদিকে বর্ষণ করে ও দামিনী লজ্জা ত্যাগ করে।

গানে গানে কত কথাই যে বলে বিরহিণী—মত্ত বাদল এসেছে, কিন্তু প্রিয়ের সন্দেশ ত' আনলো না। কালো আঁধারে বিজলী চমকাচ্ছে, বিরহিন অতি ডর পায়োরে। ভয় করছে বিরহিণীর।

তারপর ঘনঘোরে বর্ষণ নামে। ছোট ছোট শ্যামল ঘাসের আস্তরণ পড়ে

সর্বত্র। প্রকৃতির চোখে লাগে শ্যাম অঞ্জন। পরিপূর্ণ দুর্যোগে শূন্য মন্দিরে বসে গান গায় মোতি। অস্থির বিদ্যুতের পত্রলিপি দেখে মন চঞ্চল হয়। বর্ষার নিশীথ একা যাপন করে মোতি—জগতে সকলেই নিদ্রামগ্ন শুধু আমি জেগে আছি...ময়্ঁ বিরহিন বৈঠি জাগুঁ। অন্য রঙ্গমহলের বিরহিণী হয় ত' মুক্তার মালা গাঁথে। কিন্তু মোতির অশ্রুই আজ মুক্তা। অন্তরের বেদনায় তার জন্ম। তাই সে আঁসুবনকী মালা গাঁথে।

শরতের প্রসন্ন দিনে, বুন্দেলা মেয়েরা ডালি মাথায় পদ্মফুল ফেরি করে পথে পথে, মন্দিরে মন্দিরে শরতের মাঙ্গলিক পূজার আয়োজন হয়। তাদের আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করে মোতি।

জল বিনা কমল, চন্দ্র বিনা রজনী, তেমনি প্রিয়তম বিহনে দুখিয়ারি মোতি। আকুল ও ব্যাকুল হয়ে সে রাত্রিদিন যাপন করছে—বিরহ কলেজো খায়—তুম বিন রহো ন জায়॥

কখনো আসে অভিমান। কেন এমন করে লগন বিচার ক'রে খুদাবক্স? লগন দিয়ে কি হবে? প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে সে যদি শেষ হয়ে গেল, তবে আর কি করবে খুদাবক্স। তোমার কথা স্বীকার করেছি, প্রতীক্ষা করে বসে আছি,—তুমি যদি বা বন্ধন ত্যাগ কর আমি ত' পারব না—

জো তুম তোড়ো পিয়া ময়্ঁ নহিঁ তোড়ুঁ।
তোরী প্রীত তোড়ি কিণ সংগ জোড়ুঁ॥
তুম ভয়ে তরুবর ময়্ঁ ভঈ পঁখিয়া।
তুম ভয়ে সরবর ময়্ঁ তেরী মছিঁয়া॥
তুম ভয়ে মোতি প্রভু হম ভয়ে ধাগা।
তুম ভয়ে সুনা হম ভয়ে সুহাগা॥

তারপরে কি কোন কথা থাকে? হয়'ত থাকে। ইতিমধ্যে আরো চিঠি এসেছে ঘোসের নামে। সবই'ত তাকে লেখা। এত প্রতীক্ষা, এত ধৈর্য আর প্রেমের কথা জানে খুদাবক্স। এত সহ্য করতে পারে সে।

তুমি যদি পারো ত' আমিও পারি খুদাবক্স। সেই চেষ্টা করতে যদি নয়ন বিশ্বাস হারিয়ে অশ্রুবর্ষণ করে, হৃদয় উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়তে চায়, তাহ'লে বল আমি কি করি?

তবু প্রতীক্ষা করে মোতি। পৃথিবীতে আসে রিক্ততার ঋতু বৈরাগী শীত। রুক্ষকেশ, সাধারণ বেশ, একখানি মোটা চাদরে শীত নিবারণ করে মোতি। তানপুরা হাতে মহলের পথ ধ'রে চলে। দেখে পথচারীর দৃষ্টিতে সংবেদনা ও শ্রদ্ধা জাগে মোতির ওপর।

শীতের মলিন সন্ধ্যায় মোটা তুলোর চাদর জড়িয়ে এসে বসে মোতি রাজ-অন্তঃপুরে। রানী সোৎসুক আগ্রহে বসে থাকেন। মোতি সেদিন গান করছিল—দরশ বিনা দুখন লাগে নৈনা। তোমার দর্শন বিনা নয়ন আমার ব্যথিত—। গানের সময়ে চেয়ে ছিলেন রানী পরে বললেন—মোতি, কার জন্যে তুমি গান গাও? শুধু আমার জন্যে ত' নয়!

এই প্রশ্নেই যেন খুব প্রশংসা হ'ল, এমনি ভাবে মোতি স্মিত হেসে অভিবাদন জানাল। তারপর বলল,—ঔর গানাকে লিয়ে।

এইটুকু কথাতেই সব বলা হয়ে গেল। আপনার জন্যে ত' নিশ্চয়ই—এই কথা উহ্য রেখে মোতি বলল, আর গানের জন্য। শ্রোত্রী শুনলেন। তারপর সেই প্রসঙ্গে কথা না বলে বললেন,—মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে তোমাকে কিছু দিই, আমার যে ভালো লেগেছে তার নিশানা হিসেবে। কিন্তু তোমার ত' অলঙ্কার বা বস্ত্রে আসক্তি নেই মোতি—তবে কি দেব?

বয়ঃকনিষ্ঠা তবু শ্রদ্ধেয়া এই রমণীকে পুনর্বার অভিবাদন জানাল মোতি। বলল, সরকার, এইরকম মাঝে মাঝে স্মরণ রাখবেন, আর দূরে সরিয়ে দেবেন না। এই দরজা যেন আমার কপালে বন্ধ হয়ে না যায়।

মোতির তাঞ্জাম চলে গেলে ঈষৎ শীত বোধ হলেও শালখানা এমনই হাতের উপর রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন রানী। চোখের গম্ভীর দৃষ্টি ছুঁয়ে রইল দিগন্ত। নির্মল তরুণ ললাটে কয়টি রেখার আভাস প্রতিভাত হল। সহরে অনেক কিছু ঘটে চলেছে যার প্রতিকার বারবার চেয়েও তিনি পাননি। তাতে শঙ্কা এবং ক্রোধ হয়েছে মনে। কাশী যেতে চেয়েছিলেন, তার অনুমতিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নানা কারণে অশান্ত হয়েছে তাঁর মন। শেষ পর্যন্ত অসম্মান নিয়ে বাঁচতে হবে কি না, এই হয়েছে আশঙ্কা। মনের ভেতরে সেই অশান্তি পর্দায় পর্দায় বাড়ছে। পূজো ও জপে আশ্রয় মিলছে না, সঙ্গীতে আসছে না শান্তি।

আজ প্রভাতের কথা স্মরণ হল। ইংরেজের ফৌজ শহর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল। তাঁর শিবিকা অপেক্ষমান জেনেও তারা এতটুকু সরে গিয়ে পথ দিল না। অতি সামান্য ঘটনা। হয় ত' ঔদ্ধত্য নয়, হয়তো ফৌজী কানুন। তবু এরই মধ্যে এমনি ঘটনা যতগুলো ঘটেছে, সেগুলোকে মিলিয়ে দেখলে শঙ্কাই জাগবে। যেন কোন একটা ছবির প্রাথমিক রেখামাত্র ফুটে উঠেছে। একপাশে রঙ-ও পড়েছে। ছবিখানা কল্পনা ক'রে মনে আশঙ্কা জাগছে।

চোদ্দ

নতুন খবরের দূত আসে দশ দিক থেকে। শাহীসড়ক ধরে যে ক্লান্ত ফৌজের অক্লান্ত মিছিল চলে, তারা মুঠো মুঠো খবর ছড়িয়ে যায়। উৎকর্ণ হয়ে শোনে চুণারকি রিসালা হল্‌ট।

রাতের পর রাত হল্‌টের ওপর কোঠায় লণ্ঠন জ্বলে। বসে কথা কয় কত রকমের মানুষ। কত রকমের বেশভূষা তাদের। পরন্তপ ও খুদাবক্স শোনে। খবর পাওয়া যাবে ফৌজী ছাউনীতে। ছাউনীতে যাওয়া আসা নিয়ে সাহেবরা বড় কড়াকড়ি করছে।

খুদাবক্সকে চেনে সবাই। বিন্দ্‌কীর রিসালা-মেজর সাহেবকে ভেট লাগিয়ে খুদাবক্স তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। রঘুবর সিংয়ের চোখে একটা ছায়া নেমেছে। খুদাবক্সকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

—কেন এই কাজ নিয়েছ?

—কিছু ত' করতেই হবে মেজর সাহেব—

—ছাউনী থেকে ছাউনী, খুব খবর পাও, না?

—কি খবর পাব বলুন?

তখন নিরীখ ক'রে দেখে রঘুবর হাসেন। বলেন,—বড় হুঁশিয়ার মানুষ তুমি খাঁ সাহেব। খুব খেয়াল রেখে কথা বল।

খুদাবক্স হাসে। বলে,—কিছু ডাক আছে কি?

—রিসালাতে খোঁজ নিয়ে যাও খাঁ সাহেব।

রিসালাতে অনেক কথা হয়। খুদাবক্সকে এগিয়ে দিতে দিতে চম্মন ও জৌন খাঁ নীচু গলায় জানায়,—হ্যাঁ, জানিয়ে দিতে পারো চৌথা রিসালায় যে আমাদের এখানে নিশানার খবর

পেঁছে গিয়েছে।

—কি নিশানা?

—চাপাটি আর লাল কমল।

—এমনি চাপাটি?

হ্যাঁ। এই নিশানার সঙ্গে কিষাণরা খুব পরিচিত। পঙ্গপাল বা ফসলের মৌতের সময়ে কিষাণরা এই নিশানা ছড়িয়ে দিয়ে জানায় যে কোন দুর্যোগ আসছে।

খবর নিয়ে খুদাবক্স ফিরতে ফিরতে গাছতলায় বিশ্রাম করে। তার সহিসরা চাপাটি সেঁকে। দেখতে দেখতে কি যে বিস্ময় মানে খুদাবক্সের মন! একখানা রুটি, যা ঘরে ঘরে কত মানুষের জন্য নিত্য তৈরী হচ্ছে, তাই নাকি নিশানা! কার নিশানা? কে এর মধ্যে আছে? সবচেয়ে ব্যস্ততা ফৌজী ছাউনীতেই বা কেন?

চৌথা রিসালায় ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা খায় একটা। সাহেবের কড়াহুকুমে তল্লাস না ক'রে কাউকে ছাড়ছে না শান্ত্রী। খুদাবক্সকে দেখে ছোকরা কমাণ্ড্যাণ্ট মেলেন্‌সাবি এগিয়ে আসে। তার ফরমায়েস ছিল একটা বাদামী আরবী ঘোড়ীর। শান্ত্রীকে হাত নেড়ে সে হুকুম জানায়, ঢুকতে গিয়ে খুদাবক্স শান্ত্রীর পকেটে টুপ্‌ করে একটা টাকা ফেলে দেয়।

ঘোড়ীও পছন্দ করবার মতই। বাদামী রঙের কোমল লোমে ঢাকা চিকণ গা, ছোট ছোট খাড়া কান, খুরের ওপরে শাদা দাগ, চারটে পায়েই। মেলেন্‌সাবি তারিফ না করে পারে না খুদাবক্সকে। বলে,—কিছু শিখিয়েছ কি?

—হ্যাঁ সাহেব, ট্রেন্‌ড ঘোড়ী।

—কে ট্রেনিং দিয়েছে?

—আমি।

—ক্যায়সা তালিম দিয়া?

—যাতে আপনি খুশী হবেন।

—তুমিও ট্রেন্‌ড লোক মনে হচ্ছে।

—আপনার মেহেরবানিতে।

—দাম কত চাইছ?

—পাঁচ'শ।

দাম শুনে একটা শীষ্‌ দেয় মেলেন্‌সাবি। ডাকে রিসালা মেজরকে। নহল সিং সত্তাল ধীর পদক্ষেপে আসেন। বড় গোঁফ দাড়ির প্রান্ত সুকৌশলে মুচড়ে কানের পাশে তুলে দিয়ে বড় কায়দায় পাষাণ দিয়ে মুরেঠা বাঁধেন মেজর সাহেব। যোধপুরীর ওপরের ফৌজী কুর্তার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে তীক্ষ্ম চোখে ঘোড়ীকে দেখেন। তারপর বলেন, ঠিক আছে, বেশী চায়নি।

মেলেন্‌সাবি আশ্বস্ত হয়। ভারতে আসবার আগে তাকে তার বাবা, এবং আসবার পর বুড়ো ডাক্তার ফরেষ্টার তাকে বারবার তালিম দিয়েছে। নেটিভরা সুযোগ পেলেই তাকে ঠকাবে। নহল সিং-এর আশ্বাস পেয়ে সে হাল্কা পায়ে চলে যায়।

চোখে চোখে তাকিয়ে রিসালা মেজর বলেন, খাবার সময়ে ডাক নিয়ে যাবে আমার ঘর থেকে।

মেলেন্‌সাবি টাকা গুণে গুণে দেয় খুদাবক্সকে। টাকা পকেটে রেখে খুদাবক্স ঘোড়ীর পাশে দাঁড়ায়। লাগামটা বাতাসে আস্ফালন করে হুকুম করে—সেলাম লাগাও! খেলওয়ালার

ঘোড়ার মত ভংগীতে ঘোড়ী সামনের পা দুখানা উঠিয়ে সেলাম জানায়। বড় খুসী হয় মেলেন্‌সাব।

রিসালা মেজর সাহেব খুদাবক্সকে ডেকে বসতে বলেন চৌকিতে। খুদাবক্স বসে। নহল সিং তাকে একখানা চিঠি দেন। বলেন, ফয়জাবাদ থেকে কুচ্ আসছে, তাদের তুমি পাবে চার গম্বুজ মসজিদ ছাড়িয়ে। সেখানে রিসালদার সাহেব স্বরূপ সিংকে এই চিঠি দেবে। এ-ও খেয়াল রাখবে কি যে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

—আমাকে আপনি বিশ্বাস করছেন?

—বিশ্বাস করবার ভরসা পেয়েছি পরন্তপ চৌহান আর বিন্দ্‌কীর রঘুবরের কাছে। বিশ্বাস ভাঙলে তুমিই খতম্ হয়ে যাবে। আর খত্ খুব সোজা—তাতে গোলমালের কিছু নেই। যা বুঝবার তা স্বরূপ সিং বুঝবে। তুমিও শোন : প্রাথমিক শিষ্টাচার অন্তে—স্বরূপ ভাই, যে মেলা বসাবার কথা ছিল, তার কিছু কিছু ঠিক হয়ে গেছে। পুরো বন্দোবস্ত হবার পরে তারিখ জানলে যাবে। তার আগে তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তৈরী হতে পার। খবর নেওয়া-দেওয়ার মুস্কিল। তবু বলছি চারটে হাতী, দুশো ঘোড়া আর পাঁচশো ভেড়া আমরাই যোগাড় করব। তুমি কিছু হাতী যোগাড় করবার ব্যবস্থা করো।

—মেলা খুব জমবে বলে মনে হচ্ছে।

—আশা করছি।

—তবে আমি চলি।

—তোমার কারবার হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। তবে একটা কথা—

—কি?

—বিন্দ্‌কীত রঘুবরজী খুব ছবি আঁকছেন।

—কি রকম?

—দেখাচ্ছি। বলে, লালচে তুলোট কাগজের ওপর লাল কালি দিয়ে একটা ছবি আঁকে খুদাবক্স। একটা গোল চক্র, তার মাঝখানে একটা ডাঁটার ওপর আধফোটা পদ্মফুল, চক্রটার পাশে উর্দুতে লেখে 'চাপাটি', নিরীখ করে দেখেন নহল সিং। কিছুক্ষণ দু'জনে দু'জনকে দেখেন। তারপর খুদাবক্স বলে—রিসালা মেজর সাহেবের এ খেয়াল এমন কিছু চমৎকার নয়, এ ছবি রাখলে তাঁর বদনাম। কি বলেন?

ছিঁড়ে ফেলে কাগজখানা খুদাবক্স। কুচিগুলো মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে ঠুকে ঠুকে বসিয়ে দেয়। নহল সিং তার সংগে সংগে উঠে দাঁড়ান। বলেন—তোমার সংগে আমি একমত। তবে ফুলটা সাদা না লাল? কি এঁকেছিলেন রঘুবরজী?

—খেয়াল হয় লাল কমল।

দু'জনে দু'জনের চোখে চোখে দেখেন। খুদাবক্স ও নহল সিং নীরবে বিদায় জানান। নহল সিং বলেন, আমি গেটপাশ দিয়ে দিচ্ছি তুমি চলে যাও। সামনে এখন কমাণ্ড্যান্ট সাহেব থাকবে। কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে।

—জবাব দেওয়া যাবে।

—আচ্ছা।

বেরিয়ে আসতে আসতে খুদাবক্স কমাণ্ড্যান্ট সাহেবকে সেলাম জানায়। সাহেব

বলেন—তুমি মেলেন্‌সাবকে ঘোড়ী দিয়েছ?

—হ্যাঁ সাহেব।

—আমাকে একটি এনে দিতে পারবে?

—খুব চেষ্টা করব।

—হ্যাঁ, চেষ্টা ক'রো। আমার পছন্দ হয়েছে।

রুটি আর কমলের নিশানা ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। ফৌজ থেকে ফৌজ, ছাউনী থেকে ছাউনী। একখানা হাতে গড়া চাপাটি এনে ছাউনীতে পেঁছে দেয় কোন অজানা বাহক। চাপাটিখানা হাতে হাতে ফেরে। সাহেব অবাক হয়ে জানতে চান—কি ক'রে এই চাপাটি এল? কি হবে এ দিয়ে?

সসম্ভ্রম জবাব আসে—জানি না হুজুর। কেউ পেঁছে দিয়েছে।

সাহেবের তাড়নাতে শশব্যস্ত হয়ে প্রহরী শান্ত্রীরা বাহককে খোঁজে। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় না। সাহেব ঘরে এসে রিপোর্ট লেখেন—নেটিভরা কোনো তামাশার কারণে চাপাটি বিলি করছে মনে হয়। এ-ও শুনেছি, যে রঙের কারবারে মন্দা পড়লে রং-রেজীরা এই সংকেত চালু ক'রে সকলকে জানিয়ে দেয়। যাই হোক, চাপাটির ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোন মানেই হয় না। আমি বারবার দেখেছি চাপাটিগুলো একেবারেই মামুলী, কোন নতুনত্ব নেই।

এদিকে রাত জেগে চাপাটি গড়ে সেই ছাউনীরই ফৌজ ও রিসালা। সেই চাপাটি নিয়ে তারা পাঠিয়ে দেয় অন্য ছাউনীতে, পাশের গ্রামে।

কমল ও রুটির নিশানার কথা খুব তাড়াতাড়ি চলাফেরা করে। সময়ের প্রয়োজনে কত যে দূত সৃষ্টি হয়েছে। গাঁয়ের দফাদার বা চৌকিদারের হাতে একখানা চাপাটি তুলে দেয় বাহক। চাপাটিখানা চার টুকরো ক'রে ভেঙে ফেলা হয়। তাতে বোঝা যায় সেই গ্রাম থেকে পুব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে এই রকম চাপাটির নিশানা চালু হয়ে যাবে। আশ্বস্ত হয়ে বাহক আরো কয়খানা চাপাটি নিয়ে চলে যায়। এই সংকেত সরকারের ডাক ব্যবস্থার চেয়ে অনেক দ্রুতগামী। অতি সহজে ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে খবর।

প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে গ্রামীণ ভারতের মেলামেশার জায়গা হাটগুলো।

চোদ্দ লাখ মানুষের স্বপ্ন সফল ক'রে এগিয়ে আসে ব্যারাকপুর কাওয়াজ ময়দানের এক সকাল—২৯শে মার্চ, ১৮৫৭।

সব খবর চেপে যায় সরকার। ব্যারাকপুরের খবর কলকাতায় পেঁছয় না। ফোর্ট উইলিয়ামের দফতর থেকে খবরগুলোকে রংপোঁচ্ লাগিয়ে ভোল পালটে ছাড়া হয় বাজারে। হ্যাঁ, একটা পাগলা সিপাহী আর পাগলা জমাদার। কি ক্ষ্যাপামি করেছিল কে জানে! এমন কিছু ব্যাপার নয়।

বন্যার স্রোতের মত পাথর কেটে পথ তৈরী ক'রে নেয় আসল খবর। মঙ্গল পাণ্ডে আর ঈশ্বর পাণ্ডে ফাঁসীতে ঝুলে গিয়েছে ব্যারাকপুরে।

রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে হিন্দুস্তান। একমাস...দেড়মাস...পিঙ্গল জটাজাল রুদ্রমূর্তি বৈশাখের খরতাপ উত্তর ভারতের বুকে ধুলো ওড়ায়। তারপরে তৃষ্ণাদীর্ণ আকাশে নামে রক্তসন্ধ্যা।

সহসা অশ্বারোহী ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে ঝাণ্ডা নাচিয়ে এক হুঙ্কারে জানিয়ে

যায় প্রতীক্ষমান জনতাকে, ১০ই মে মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্ট। ফৌজ রুখে দাঁড়িয়েছে। বাঘী-সিপাহীর হাতে খুন হয়ে গিয়েছে ইংরেজ অফিসার। সেই ফৌজের দৃষ্টান্তে লড়াই সুরু করবার নিশানা মিলে গিয়েছে।

সুরু হয়ে যায় মহান এক সংগ্রাম।

পনরো

মোকাবিলা করবার এক মৌকা একদিন আসবে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু যখন সত্যিই এসে পড়ল তখন টালমাটাল হয়ে গেল সব। মীরাটের খবরের পরেই দিল্লীতে বাহাদুরশাহী কায়েম ক'রে সেদিকে চলেছিল ফৌজ। খুদাবক্স আর পরন্তপও ভীড়ে পড়েছিল সেই মিছিলে। আতঙ্কিত ইংরাজ নরনারী শিশু দিল্লী ছেড়ে পালাচ্ছিল। তাদের হত্যা করাকে যুদ্ধ মনে করেনি খুদাবক্স। তাই পথে তাদের গাড়ী আটক ক'রে দেখেশুনে ছেড়ে দিতেই চেয়েছিল। এক ছোকরা সাহেব রুখে উঠেছিল বন্দুক উঁচিয়ে। তার বন্দুকটা টেনে নিয়েছিল খুদাবক্স। বলেছিল, বন্দুক দেখিয়ে একজনকে খতম্ করেছ কি তোমাদের একজনেরও জান বাঁচবে না। খুব সাবধানে চলে যাবে। জবান্ সামলাতে চেষ্টা করবে। সবাই আমার মত ঠাণ্ডামাথা নাও হতে পারে।

আতঙ্কিত মহিলা যাত্রীরা মিনতি ক'রে সেই উদ্ধত যুবকের হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন। পরন্তপ বলেছিল, হিন্দুস্তানের মানুষ তোমাদের মতন নয়, মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে টানা-টানি করবে না। জানের মায়া থাকে হাঁটু ভেঙে বসে দয়া চাইতে চেষ্টা করো, বেঁচে যাবে।

হঠাৎ অবস্থা উল্টে গেছে। শাসিতই হয়েছে আজ শাসক। সাহেব এতবড় ঔদ্ধত্যের কথা মানতে পারেনি। ইতর গালাগালি দিয়েছিল পরন্তপকে। তখন তার সামনে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে মুখের ওপর সহসা চাবুক মেরেছিল খুদাবক্স। ফর্সামুখ কেটে রক্ত পড়েছিল। তার মা তাকে টেনে নিয়েছিলেন ভেতরে। খুদাবক্স বলেছিল, যদি এই দিন কাবার করতে পারো সাহেব, আয়নায় মুখ দেখে খেয়াল করো কথা কি ভাবে বলতে হয়।

তারপরের কয়টা মাসের ইতিহাস নাগরদোলার ঘূর্ণীপাকে জড়ানো। দিল্লীতে মোগলশাহী কায়েম করে রাখবার কোন ইচ্ছে ছিল না ইংরেজের। প্রথম চোটের বিভ্রান্তিটা কাটতেই, ব্রিটিশ ফৌজ সঙ্গীন তুলে মার্চ ক'রে এল। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইংরেজ ফৌজ গোটা সাতান্ন আটান্ন সালটার ওপরেই হিন্দুস্থানের মানুষের তাজা খুন ঝলকে ঝলকে ঢেলে দিল।

ঝাঁসীর খবরও কানে এল। যত ইংরেজ ছিল তাদের সব খুন ক'রে রানীর হাতে নগর ছেড়ে দিয়ে দিল্লীর দিকে আসছে ফৌজ। দুইদিনের মাথাতে তারা এসে পড়বে। সগর্বে একজন সিপাহী খুদাবক্সকে বলল—আসল বাদশাহী ফৌজের মত কাজ করেছে তারা। বাই-সাহেবের হাতে রাজপাট তুলে দিয়েছে। আর যত বেইমান ইংরেজ ছিল, তাদের সব খতম্ করেছে।

খবর শুনে প্রথমটা থতমত খেয়ে যায় খুদাবক্স। প্রশ্ন করে,—বিবি, বাচ্চা, বুড়া, সব?

—তাই ত' শুনেছি।

—তাহলে সত্যিই অন্যায় করেছে বল?

—এরই নাম লড়াই খাঁ সাহেব।

—লড়াইয়ের ঠিক বে-ঠিক কি অমনি আন্দাজ করা যায়?

—তুমি বলছ বটে কিন্তু আমার চুল সাদা হয়ে গেছে অংরেজের গোলামী ক'রে, তুমি জানো, বিনা কারণে, বিনা দোষে তারা কতবার হাসতে হাসতে গুলী চালিয়েছে, ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মেরেছে কত হিন্দুস্তানের মানুষ? আমি আপন আঁখ দিয়ে দেখেছি; দেখেছি আর ভেবেছি, খোদা আঁখ দিয়েছিল কি এইসব দেখবার জন্যে? আজকের দিনে জমানা বদলে গেছে, আর তাই বদলা নিতে নেমেছি আমরা সবাই। এখন অনেক পুরোনো আমলের ঠিক সব বে-ঠিক হয়ে যাবে, আর নতুন কথা বয়ান করব আমরা।

প্রতিবাদ করল না খুদাবক্স। প্রবীনের কথার মধ্যে কিছু সত্যি ছিল। বুড়ো আবার বলল,—তা বলে মনে ক'রো না বিবি আর বাচ্ছাদের খুন করা ঠিক হয়েছে। আমি তা বলছি না। মনে হয় সিপাহীদের মাথার ঠিক ছিল না। লড়াই কি না?

দিল্লীর পরেই খবর মিলল কানপুরে খুব লড়াই হবে। কানপুরের নানা সাহেব আর তাঁতিয়ার দলে অনেক ফৌজ গিয়ে নাম লেখাচ্ছে।

ছাউনি থেকে ফৌজ দলে দলে আসছিল দিল্লীর দিকে। দিল্লী সহরে ইংরেজশাহী পুরো খতম হয়ে গিয়েছিল কতদিন ধরে। সেই সময়টা যদি যুদ্ধের প্রস্তুতি করা যেত! চেষ্টা যে চলেনি তা নয়, কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটল খুব তাড়াতাড়ি। ঠিক তাল রাখা গেল না।

মাথার ওপর ইংরেজ নেই। বাহাদুর শাহ্ দিল্লীতে লাল কেল্লায় গদীতে বসেছেন। তিনিই এখন স্বাধীন হিন্দুস্তানের বাদশাহ। এই খবর পেয়ে গ্রাম, সহর ও ছাউনী থেকে দলে দলে লোক এসে ভীড় জমাল দিল্লীতে। নতুন শাহীর কর্মচারীরা ঘোড়া চড়ে টগ্‌বগিয়ে মোগলশাহীর রাজধানীর পাথর বাঁধানো পথে পথে টহল দিয়ে ফিরতে লাগলেন। মনের আনন্দে মুখে মুখে গান ফিরতে লাগল পথে-ঘাটে। সন্ধ্যার পর চাঁদনীচক কোতোয়ালী বা কেল্লার ময়দানে ফৌজ ও জনতার জমায়েতে গান জমে উঠল,

'দরিয়া মে' তুফান
বড়ি দূর ইংলিস্তান
জল্‌দি যাও জল্‌দি যাও
ফিরিঙ্গি বেইমান॥'

এসব গানে সুর ও কথার কারুকাজ নেই। সময়ের প্রয়োজনে ও প্রাণের তাগিদে এই সব গানের সৃষ্টি। প্রাণ দেওয়া নেওয়ার খেলায় যাদু আছে এই গানে।

'হাণ্টার গোলী খুব চলায়া এক শও সাল পুরা
আর চুহাকে তরাহ্ ছুপ্‌ছুপ্ ভাগো পল্টনওয়ালা গোরা
যিত্তা পরেড্ দিল্ চাহে লাগাও লণ্ডন পে' মৈদান
হমারা মুলুক হাম্‌কো ছোড়ো ফিরিঙ্গী শয়তান॥'

সকাল থেকে রাত অবধি বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্টের ফৌজ ইংরেজদের কখনো হত্যা করে, কখনো বা হটিয়ে দিয়ে দিল্লীতে ফিরে আসে। একদিন খবর পেল খুদাবক্স, ঝাঁসী থেকে ফৌজ আসছে। ঝাঁসীতে যত ইংরেজ ছিল সব খুন হয়ে গিয়েছে। সিপাহীরা রানীর হাতে শহর তুলে দিয়ে আসছে দিল্লীর দিকে।

লড়াইয়ের তুফানে পড়ে খুদাবক্স যতবারই চেষ্টা করল ঝাঁসীর পথে একবারও এগিয়ে যেতে পারল না। লক্ষ্ণৌ-এর প্রান্তে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর ফিল্ড্ সাহেব বলেছিল, —এ লোকটাকে দেখলেই ত' ফাঁসীর হুকুম দেওয়া যায়। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এর হাড়ে হাড়ে রয়েছে শয়তানী। কিন্তু ফতেপুরের পাঁচ নম্বর রিসালা এসে পড়াতে পালাতে হলো সব সাহেবদের। সাহেবরা জিতলে যে খুদাবক্সকে নির্ঘাত ফাঁসীতে ঝুলতে হতো তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। গাছে মজবুত ডাল আছে, বিলিতী কারখানার শক্ত দড়ি আছে, কিছু নেটিভ মিললেই ঝুলিয়ে দেওয়া চলে। গরুর গাড়ীর ওপর দাঁড় করিয়ে, ফাঁস পরিয়ে গাড়ীটা টেনে দেবার পর যখন জোয়ান দেহটা যন্ত্রণায় মোচড় খায় শূন্যে, তখন হাসতে হাসতে বলা চলে, এবার তোমার কোন বাহাদুর শাহ বাঁচাবে?

লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়ে কাণপুরের পথে প্রচুর ফৌজ মিলল। নানা সাহেবের কম্যাণ্ডার হয়েছে তাঁতিয়া। তার ফৌজের জম্‌জমাট অতুলনীয়। গোয়ালিয়র থেকে বাছাইকরা ফৌজ এসেছে।

কাণপুরের পথে যারা জুটল তাদের মধ্যে ছিল চম্মনলাল। ছোটখাটো চেহারা, ছিপছিপে গড়ন, বয়স চল্লিশের কাছে। তার সংগে খুব ভাব জমিয়ে ফেলল পরন্তপ! এদিককার পথ, ঘাট, ক্ষেত সব চম্মনলালের নখদর্পণে। পথপ্রদর্শক অতএব সে-ই হল।

ওদিকে বিবিঘরের খুনজখমের প্রতিশোধ নিতে ইংরেজ আসছে, তাই সাবধান হয়ে চলবার প্রয়োজন ছিল। আড়াই শ' সিপাহী, চল্লিশজন রিসালা, সকলেই পুরোন পল্টনের লোক। বন্দুক ছিল দুইশ'র ওপরে।

কাণপুরের এগারো মাইল দূরে যখন হল্ট করেছে খুদাবক্সদের দল, তখন চম্মনলালকে পরন্তপ ডাকল। বলল,—আমি মনে করি তুমি একটু এগিয়ে যাও। দেখ খেয়াল করে সামনে দুশ্‌মনের ফৌজ মেলে কি না মেলে।

চম্মনলাল দুপুরের পর রওনা হয়ে গেল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তার চেহারা যখন মিলিয়ে গেল, তখন তার পিছু নিল পরন্তপ। রামনেহাল আর কিশোরী গাছের মাথায় উঠে দূরে দূরে নজর রাখছিল।

দুই ঘণ্টার মাথায় ফিরে এল চম্মনলাল। বলল,—সব ঠিক আছে। এখন যাওয়া চলে।

খুদাবক্স বলল,—দাঁড়াও পরন্তপকে আসতে দাও। তুমি এইখানে বস চম্মন, থকে গিয়েছ। এত পরেশান্ হয়ে পড়েছ চলবে কি করে?

—চলবে না! বলে আঁধার থেকে বেরিয়ে এল পরন্তপ। চম্মনলালের ঘাড়ে তার থাবার মত হাতখানা রাখল। বলল,—তোমাকে আমরা দশদিন ধরে নজরে রাখছি চম্মন। বড় চাল দিয়েছিলে। কিন্তু বাজীমাৎ করতে পারলে না। কত দিন থেকে ইংরেজের নিমক খেয়েছ হারামী? ট্রেনিং ত' কাঁচা রয়ে গিয়েছে দেখছি। চম্মনলালের মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। পরন্তপের পায়ের ওপর পড়ে হাউ হাউ ক'রে সে কেঁদে উঠল। তাকে তুলে ধরল খুদাবক্স। পরন্তপের কাছ থেকে চিঠিখানা নিয়ে সকলকে শুনিয়ে পড়ল—

লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রফোর্ডের কাছে দাসানুদাস অর্জুন সিং ওরফে চম্মনলাল ওরফে গুলজারীর নিবেদন এই যে, এখানে দুই শ' তিপ্পান্নজন সিপাহী, নওগঞ্জ-এর চোদ্দ নম্বর রিসালার চল্লিশজন এবং দুই শ' তিন বন্দুক আছে। আর পেছনে যে পাঁচনম্বর বেঙ্গল ইন্‌ফ্যান্ট্রির ফৌজ আছে......

চিঠি শেষ করল খুদাবক্স চরম নীরবতার মধ্যে। জমায়েতের মুখে যে ঘৃণা ও প্রতি-হিংসা ফুটে উঠেছে তার দিকে চাইতে পারল না চম্মন। এবার কি হবে? এই প্রশ্ন যখন

চোখে চোখে খেলে গেল, কণ্ঠগুলো একসঙ্গে ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করল—মৌত!

চম্মনলাল কাঁদতে লাগল, ভয়ে ও আতঙ্কে তার গলা চিরে যেতে লাগল—ভাইসব, আমার বিবি আছে, বাচ্চা আছে,......

—ঠিকানা মেলে ত' তাদেরও খতম ক'রে আসব। বেইমানের ঝাড় কমে যাবে দুনিয়া থেকে। নিশানা ঠিক করতে করতে বলল খুদাবক্স। গুলির আঘাতে চম্মন দৌড়ে গেল দুই-পা। তারপর ভেঙেচুরে পড়ল মাটিতে। পিঠে আর একটা গুলী করল খুদাবক্স।

রামনেহাল নেমে এল। বলল—মাইল দুই পূব থেকে অংরেজের ফৌজ আসছে।

—তবে?

—তবে তৈরী হয়ে যাও। পশ্চিম দিকে চলতে থাক।

কিশোরী নেমে এল। বলল—পশ্চিম দিকে যাওয়া চলবে না। অংরেজ ফৌজ মার্চ ক'রে যাচ্ছে মনে হয়, মাইল চারেক দূরে। অন্য ফৌজও হতে পারে। তবে ওদিকে যাওয়া নিরাপদ কি?

একমাত্র পন্থা খোলা আছে, যুদ্ধ।

—ইংরেজ ফৌজ কত হবে?

—বোঝা যায় না। মনে হয় সবই রিসালা।

গাছপালার আড়ালে ছড়িয়ে পড়ল দলটা। আধঘণ্টা বাদেই ইংরেজ সৈন্যদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ কাছে এল। গর্জে উঠল বিপক্ষের বন্দুক। ঘনসন্নিবিষ্ট আমবাগানের গাছের ফাঁকে ফাঁকে গুলি তেমন চলল না। ইংরেজদের ঘোড়সওয়ার বড়জোর একশো কুড়িজন। বৃথা গুলী খরচ না করে তারা ঢুকে পড়ল সামনের ফাঁকা জায়গাটায়। বন্দুকে বন্দুকে আর চলে না। ঝলসে উঠল তরবারি।

দাঁতে ঠোঁট চিপে লড়তে লাগল খুদাবক্স। সাহেবের ঘোড়া যখন ভয়ে দুই পা তুলে সোয়ারীকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে, তখন পেছন থেকে গুলী বিঁধল তার ডান কাঁধে। ঘুরে পড়ে গেল খুদাবক্স। পেছন থেকে সওয়ার ও সিপাহীরা ঘিরে আসছে দেখে ইংরেজ সওয়াররা বুঝল বোকামি হয়েছে। বাগানের গাছপালার আড়ালে কতজন আছে বিশ্বাস কি? এই ভাবে ফাঁদের মধ্যে পড়াও মূর্খতা হবে। বেরিয়ে গেল তারা।

খুদাবক্সের যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দশটা দিন কেটে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণার বোধ নিয়েই জাগল খুদাবক্স। বোধ হল একটা শিবমন্দিরে শুয়ে আছে সে। পরন্তপ তাকে তুলে ধরে বসাল। উদ্বেগে তার চেহারা হয়েছে পাগলের মত। চুলগুলো রুক্ষ, চোখ লাল। খুদাবক্সকে বসিয়ে দিয়ে সে বলল,—আমি ভাবিনি খুদাবক্স যে তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে পারব। দশদিন হুঁশ ছিল না তোমার।

খুদাবক্স ব্যথার জায়গাটায় হাত দিয়ে যন্ত্রণায় মুখখানা কুঁচকে চেষ্টা করে একটু হাসল। পরন্তপকে বলল, তোমার কি চেহারা হয়েছে পরন্তপ?

—আর তোমার সুরৎ দেখেছ? মোতি দেখলেও চিনতে পারবে না।

—কি বললে? খুদাবক্সের গলায় বিস্ময়। পরন্তপ বলল, আমি আর কি বললাম খুদাবক্স, দশদিন ধরে তুমি কি বলেছ তা' ত জান না।...মোতি কে খুদাবক্স?

এক মুহূর্তে কেমন যেন একটু বেদিশা হয়ে পড়ে খুদাবক্স। কি দেখে আর কি বললে, ঠিক বোঝা যায় না। একটু পরে ঢোক গিলে বলে, বলব পরন্তপ।

—এতদিন বলনি তাই জানতেও পারিনি। অথচ বেহোঁসীর মধ্যে তুমি শুধু তাকেই ডেকেছ।

—আমরা কোথায় রয়েছি পরন্তপ?

—নিরাপদ জায়গা। যমুনার ধারে একটা শিবমন্দিরে। এখানে আর দুইদিন থাকব। তারপর চলে যাব লাল্‌থাগড়। সেখানে একটা হল্‌ট আছে। সেখান থেকে আমরা চল্‌ব ঝাঁসী।

—ঝাঁসী কেন পরন্তপ?

—কেন না, আর সব জায়গায় লড়াই ভেঙে গেছে খুদাবক্স, সেখানে বড় জোশের সঙ্গে লড়াই জমে উঠেছে। কাণপুরে আর লড়াই হবে না। কাণপুর অংরেজের হাতে। কাল্পীতে চুরানগম্বুজে তাঁতিয়া মস্ত ছাউনী ফেলেছে কিন্তু সেখানে কেন যাব খুদাবক্স? লড়তে চেয়েছি আর লড়াই ভেঙে ভেঙে গেল সর্বত্র। তবে যেখানে লড়াই-এর ময়দান মিলবে সেখানেই যাব।

—ঝাঁসীর খবর আরো বল পরন্তপ।

—ঝাঁসীতে যে রকম লড়াই-এর ইন্তেজাম জমেছে সে রকম আর কোথাও হয়নি। আশপাশের চারশো মাইল জুড়ে লোক তৈরী হয়েছে লড়াই-এর জন্যে। বাইসাহেবের নাম পেঁছে গেছে অংরেজ দফ্‌তরে। বিলেত থেকে কোন জবর সাহেব এসেছে বাইসাহেবের সঙ্গে লড়তে। আরো খবর, যে ঝাঁসীওয়ালীর ঝাণ্ডার তলায় যত মেয়ে, পুরুষ সবাই একসঙ্গে জুটেছে। আর কি খবর চাও খুদাবক্স?

পরন্তপের কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। সযত্নে গরমজল দিয়ে খুদাবক্সের ক্ষতস্থান পরিষ্কার ক'রে সে। মলম লাগায় ধীরে ধীরে। বলে, ভাগ্যে অজ্ঞান হয়ে ছিলে। ছোরা দিয়ে গুলীটা বের করেছিলাম। ঘোড়ার পিঠে ক'রে এখানে আনবার সময় মনে হয়নি আর তোমার গলা শুনতে পাব, কি তোমার সঙ্গে কথা কইব এমনি বসে বসে। যত রক্ত পড়েছে তত কি বোখার! কপাল পুড়ে গিয়েছে, শুধু জল খেয়েছ আর মোতিকে ডেকেছ।

মোতির কথা বলতে গিয়ে কথা খুঁজে পায় না খুদাবক্স। লজ্জা ও সঙ্কোচে বিব্রত হয়ে পড়ে। পরন্তপের চোখে কৌতূহল। সে এক নতুন খুদাবক্সকে দেখছে। লাগসই কথা খুঁজতে অনেক সময় লাগে খুদাবক্সের। বলে, সাতবছর আগে...

সশ্রদ্ধ মনোযোগে শোনে পরন্তপ। মাটির দিকে চেয়ে, লজ্জা ও আনন্দের সঙ্গে জীবনের প্রিয়তম প্রসঙ্গে কথা কইতে গিয়ে খুদাবক্সকে সলজ্জ কিশোরের মত দেখায়। লাজুক হেসে বলে,—সেই জন্যেই ত' ঝাঁসী ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলাম।

—কিন্তু সে অপেক্ষা ক'রে আছে তুমি জান?

—নিশ্চয়।

—কেমন ক'রে?

—সে তুমি বুঝবে না পরন্তপ।

—কি রকম দেখতে সে তা'ত বলনি।

—তাই'ত! বলে আবার কথা হারিয়ে যায় খুদাবক্সের।

পরন্তপ সস্নেহে বলে,—আমি আন্দাজ করেছি খুদাবক্স।

খুব আশ্বস্ত হয় খুদাবক্স। বলে,—সব কথা বলা যায় না পরন্তপ।

খুদাবক্সের কাঁধের ব্যথা আরাম হতে আরো দিন দশেক লাগে। লাল্‌খাগড়ের হল্‌টে বসে খুদাবক্সের কাঁধে জোর মালিশ ক'রে পরন্তপ। বলে, মনে জোর ক'রে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ খুদাবক্স।

দুধ জোগাড় ক'রে খুদাবক্সকে ধমক দিয়ে খাওয়ায় পরন্তপ। বলে, তাগদ্‌ বাড়িয়ে নাও। কোন হাতে বন্দুক ধরবে?

এই হাতে। আস্ফালন করে খুদাবক্স। পরন্তপ বলে, এবার তুমি আমার জাত মারলে খুদাবক্স। কিছু আর রাখলে না। খুদাবক্স বলে, তোমার জাত ছিল না কি পরন্তপ?

—ছিল না? বলে গোঁফে চাড়া দেয় পরন্তপ। বলে, চার বাঁশ চল্লিশ গজ, অংগুল অষ্ট প্রমাণ, মার মার মোটা তাওয়া মৎ চুকো রে চৌহান! আমি হলাম চৌহান—শ্রেষ্ঠ রাজপুত। এমন দিন ছিল, যে চৌহান পায়ের আঙুল দিয়ে সর্দারদের গদীতে বসবার সময়ে টিকা পরাত কপালে। জাত নেই তোমার! তুমি যেমন গোঁয়ার, তেমনি একরোখা! কখনো বলে, তুমি নিষ্ঠুরও আছ একটু। না নিজেকে দয়া কর, না পরকে।

—তোমাকে কি করেছি পরন্তপ?

—আবার কি করবে? জান খেয়ে দিয়েছ। না আখেরের কথা ভাব্‌লাম, না অন্য কিছু, তোমার সংগে এখন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। একবার চল না তুমি ঝাঁসী!

—কি করবে?

—কয়েদ করিয়ে দেব। সাদী দিয়ে দেব। বড় তেজ হয়েছে তোমার, খুব টক্কর নিয়ে বেড়াচ্ছ।

—এই কি সাদীর সময় পরন্তপ?

—তুমি বড় উজ্‌বুক খুদাবক্স! আমি কি বলছি এই আজকেই? না, এই রকম বেহিসাবের দিনে?

বলে আর জোর জোর মালিশ লাগায় তার কাঁধে। বড় অধৈর্য হয়ে গেছে সে। বলে, বসে বসে আমার রক্ত রেগে গেছে। আর সহ্য হচ্ছে না।

খুদাবক্স বলে, উঠ বস করো, ছুটে বেড়াও!...

—তোমাকে দেখে দেখে মনে হয় তুমি ঘোড়া হলে ঠিক হত। এই রকম মোটাবুদ্ধি আর গোঁয়ার তেজ, ঘোড়া হলে দেখতেও ভালো হত। কি দেখে যে সেই মেয়ে ভুলেছে...

চোট লাগবার ঠিক একমাস বাদে রওনা হয় খুদাবক্স।

অরছারাজ্যের ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে চেনা ভূ-প্রকৃতি দেখে বড় খুসী হয় দু'জনেই। শীত শেষ হয়েছে, বসন্ত আসতে সামান্য বাকি। পথের পাশে ক্ষেত ভরে অড়হরের ফুল ফুটেছে, বুনো কুল পেকে ঝরে পড়েছে। এইখানে যেন এখনো জীবনটা নিরুপদ্রব রয়েছে। খুদাবক্স কুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। ঘোড়াটাকে চুরি ক'রে ক্ষেত থেকে ফসল খাইয়ে দেয়। পথে অনেক যাত্রী মিলে যায়। বাঘী সিপাহী ও রিসালা, যাদের আর কোথাও ঠাঁই হবে না ফাঁসীর দড়ি ছাড়া, বাইসাহেবের ফৌজে নাম লেখাবার জন্যে তারাও চলেছে। হত্যা, অত্যাচার, এবং লুঠতরাজের বিভীষিকা পেছনে ফেলে এসেছে তারা। খুদাবক্স, পরন্তপ ও তাদের চোখে একই কথা। জীবনপণ ক'রে লড়াইয়ে নেমেছিলো, সেই লড়াই ভেঙে-চুরে গেছে। আজ শেষ লড়াই-এর জন্যে চলেছে তারা। এই উপলব্ধিই যেন সখাওতের রাখী। পরস্পরের সংগে একটা দৃঢ় বন্ধন আজ অনুভব

করে সবাই। কেউ আহত, কারো ঘোড়া জখম, কারো পোষাক ছেঁড়া, কতজনের ঘরবাড়ী আত্মীয়-স্বজনের কোন ঠিকানা নেই, কেউ খবর পেয়েছে ফাঁসীতে ঝুলে গেছে তার বাপ ভাই। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ হতাশা বা দুঃখের কথা বলে না। খুব হাসিঠাট্টা চলে। মৃত্যুকেই ভয় ছিল। মৃত্যু কি তাও জানা হয়ে গেছে। আর কি রইল? রইল জীবন। তবে সেই জীবনটুকু হাসি দিয়ে ভরে দেব না কেন? যে যার অভিজ্ঞতার কথা বলে। এমনভাবে হাসে ধুলোভরা ভুরু কুঁচকে যেন পরম কৌতুকের ব্যাপার।

—ফাঁসিতে ঝুলে গিয়েছিলাম, বিষুণ সিংয়ের দল এসে দাড়ি খুলে দিল। গলাটা জখম হয়ে গেছে।

—গ্রামটা জ্বালিয়ে দিল, সে আগুন দূর থেকে দেখছি, তখনো জানি না, সেই আগুনে পুড়ে মরে গেল আমার বোন আর কচি ভাইটা।

—সাহেবকে খতম করলাম, তখন তার খিদ্‌মৎগার, আমারই জাত ভাই, আমার ডান-চোখে চালিয়ে দিল ছুরি।

—আর আমার বাঁ হাতখানাই উড়ে গেল। বলে বৃদ্ধ সিপাহী, বাঁ দিকের ফাঁকা আস্তিনটা নাচিয়ে হাসে।

পরন্তপ লঘু করে এই পরিবেশ। বেসুরো গলায় গান ক'রে, আজেবাজে গল্প ক'রে আর খুদাবক্সকে সাবধান ক'রে ক'রে চলে। সকলকে বলে, এই শালাকে বে-জখম আস্ত নিয়ে যেতে হবে। ফরমায়েসী মাল। তবে বড় বেয়াড়া মানুষ। ভাইসব, তোমরা এর কোন বে-চাল দেখলেই পিটে দিও, আমি হুকুম দিচ্ছি।

খুদাবক্সকে দেখে তারিফ্ করে সবাই। হাতকাটা বুড়ো বলে, খুব খাশা মাল। কার ফরমায়েশ?

পরন্তপ বলে, নাম জানালে মেরে ফেলে দেবে, গাঁওয়ার পাঠান'ত?

ধীরে ধীরে কাছে আসে বড়োয়াসাগর। আস্তে আস্তে দৃশ্যপটে আসে লুঠতরাজের ছাপ। খাদ্য সংগ্রহ করতে মুস্কিল হয়। এক এক জায়গায় থেমে গ্রামবাসীদের মারফতে কত কথাই যে জানা যায়! খাদ্য ও সাহায্যের বদলে টাকা দেয় খুদাবক্সরা। সহজেই কৃতজ্ঞ ও আকৃষ্ট হয় গ্রামবাসীরা। মৌকা বুঝে কিছু পুরোনো পাওয়ার সর্দার আবার লুঠতরাজ কায়েম করেছে। সানুনয়ে তারা অনুরোধ করে দুই একদিন থেকে যেতে। দুই একদিনের মধ্যেই ঝাঁসী থেকে কিছু ফৌজ এসে পড়বে বলে তারা বিশ্বাস করে। পরন্তপ খুদাবক্সকে বলে, বড়োয়াসাগরের কাছে এসে পড়েছি মনে হয়। থেকে গেলেও পারি দিন দুই। চাই কি কিছু পুরোনো দোস্ত্ মিলতে পারে। কি খুদাবক্স, মনে পড়ে দশ বছর আগেকার কথা?

—হাঁ চৌহান সাহেব, খুব মনে পড়ে, গর্জন সিংহের সংগে দেখা হয় যদি বদ্‌লাটা নিয়ে নিই।

—বদ্‌লা ছাড়া কোন কথা মনে পড়ে না তোমার?

পরন্তপ একটা স্যের আওড়ায়। তারপর বলে, পুরোনো দোস্ত, তার সংগে আমোদ আহ্লাদ করবে, একটু ফূর্তি করবে—তা নয়, শুধু খুন, জখম! ছো ছো, তোমার মত দোস্তের জন্যে আমার জীবনটাও গেল নষ্ট হয়ে।

—তবে যাও না ছেড়ে। নয় তো, আমিই যাচ্ছি।

পরন্তপ বলে,—আরে পাঠান, তোমাকে আমি একলা ছাড়ব না কি? আমি আগে

পৌঁছব, ভেট করব সেই যাদুগরীকে যার জন্যে নাকি পাঁচবছর ধরে ঝুরে ঝুরে তোমার মত একটা উজবুক দিন কাটাচ্ছে। নিশ্চয় সেও এক বাঘুনী, তোমার আর নইলে মনে ধরেছে?

খুদাবক্স হেসে ফেলে। বলে,—অন্য লোকের কথা তুলে ঝগড়া করছ কেন?

সাব্যস্ত হয় সেখানেই তারা থাকবে। সহযাত্রীদেরও বোঝায় পরন্তপ। বলে, আমরা ত' বাইসাহেবেরই লোক, তাঁরই রাজত্ব লুঠপাঠ হতে দেওয়া অন্যায় হবে। একদিন থেকে যাই, কি বল?

গ্রামের কাছারীতে থাকবার বন্দোবস্ত হয় তাদের। এখনো তেমন গরম পড়েনি। গ্রামের একান্তে বড়োয়া নদীর একটি ছোট্ট শাখা। সেখানে স্নান ক'রে শ্রান্ত সৈনিকরা। খোলা আঙিনায় আগুন জেবলে রান্নার উদ্যোগ করে। তহশীলদারের তৎপরতায় কিছু ভাল চাল আর ঘি মিলেছে, একটা খাসীও পেঁৗছে দিয়েছে সে। দীর্ঘদিন বাদে রান্নার প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুজব চলেছে। গাঁয়ের কয়জনকেও ডেকেছে পরন্তপ।

স্নান করতে গিয়ে খুদাবক্স স্বল্প জলের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা দেখে। গ্রাম থেকে ছোট ছেলের কান্না শোনা যায়। কোন ছোট মেয়ের গলায়—'ভাই! ভাই!' ডাক কানে আসে। চোখে না দেখেও খুদাবক্স মনে করতে পারে মেয়েটার পরনে ধূলি-মলিন লাল খস্‌খসে কাপড়ের ছাপা ঘাঘরা, গায়ে গাঁয়ের দর্জির বানানো সেই কাপড়েরই আঙিয়া। পায়ে তার মল থাকলেও থাকতে পারে, তবে কানে যে রুপোর লবঙ্গ গোঁজা আছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই।

গ্রামের শান্ত পরিবেশ তাকে মুগ্ধ করে। ধুলো, বন্দুকের গর্জন, কামানের ধোঁয়া, আহত মানুষের আর্তনাদ, ক্ষুধার যন্ত্রণা এবং রক্তের গন্ধ এইসব ছাড়া তার কিছু মনে পড়ে না। তারই পরে এই শান্ত পরিবেশ, নদীর ওপরে তারার ছায়া, বাতাসে ফুলের গন্ধ, তার মনে এনে দেয় বিরাম।

একদিন সে কথা দিয়েছিল সময় হলে ফিরবে। আজ সেই সময় হয়েছে।

বড়োয়াসাগর থেকে ঝাঁসী। কতদিন পরে ফিরছে খুদাবক্স? হিসেব থাক, ফিরছে যে এটাই বড় কথা। মাঝখানের বছরগুলোকে গুণে কি হবে? আসলে সময় এসেছে বলেই তাগিদ এসেছে তার মনে।

স্নান সমাপনে যখন ফেরে খুদাবক্স, তাকে দেখে পরন্তপ মুখে চুক্‌চুক্‌ ক'রে শব্দ করে। বলে, বড় আফ্‌শোষ, এত এত দেশ ঘুরিয়ে আনলাম ঘোড়া, আর আসল ঠিকানায় পেঁৗছেই বিগড়ে যাবে ঠান্ডা লেগে, বড় আফ্‌শোষ। আরে বুদ্ধু, একটা কুর্তা ত' পরো। চুলগুলো মোছ। আরে উজবুক, ঠান্ডা লেগে এই খানেই মাটি নিতে হবে। খেয়াল আছে কি?

খুদাবক্স বলে,—পরন্তপ, তুমি স্নান করলে না? পরন্তপ বলে, ছো ছো, আমি কি তোমার মত অপবিত্র মানুষ, যে স্নান করতে হবে? পরন্তপ চৌহান স্নান করবে কেন? আরে শের কখনো স্নান করে?

সে রাতে কোন হানাদার আসবে না জেনে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল তারা। সহসা গ্রামবাসীদের আর্ত কোলাহলে ঘুম ভাঙে। খুদাবক্সরা ষোলজন। তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখা যায় আগুন লেগে গেছে পূর্বদিকে। গোলমালটা সেদিকেই বেশী।

পরন্তপ মহাবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনের কয়জনের ওপর।—লুঠতরাজের আর সময় পেলে না? বলে বে-পরোয়া তরোয়াল চালায় হানাদারদের মধ্যে।

গ্রামবাসীদের লুঠ ক'রে ক'রে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল হানাদারদের। এই রকম প্রতিরোধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। সেই সাময়িক বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে খুদাবক্সরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েকটা মিনিটের হিসেব হারিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা আগুন নিভাতে থাকে। হানাদাররা জন দশেককে রেখেই পালায়। তাদের তাড়া করে পরন্তপ। কিছুদূর গিয়েই ফিরে আসে।

সকালবেলা যাত্রার মুখে বৃদ্ধ তহশীলদার ধন্যবাদ দিতে দিতে আসে। বলে, গ্রামের জোয়ানরা সব ঝাঁসী বা আশেপাশে গিয়েছে। গ্রামে রয়েছে যারা, তারা কি হানাদারদের বাধা দিতে পারে?

বড়েয়াসাগরের প্রান্তে এসে খুদাবক্সরা বিশ্রাম করে। রাতে আগুন জ্বালায় বেতোয়ার তীরে, আজ রাতেই যাত্রা করতে হবে ঝাঁসী।

আগুন জ্বালিয়ে তারা রান্নাবান্না করছে, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ ঝড়ের মতো দুর্বার হয়ে এগিয়ে আসছে বলে বোধ হয়। সতর্ক হয়ে অস্ত্র নিয়ে, যে যার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। একপাশে সরে অপেক্ষা করে। শত্রু না মিত্র, না হানাদার, কে আসছে বিশ্বাস কি? পরন্তপ স্থির চোখে অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা ক'রে, আর রাঙা আলু তরোয়ালের ডগায় বিঁধিয়ে ঝলসে খায়।

প্রায় একশ' ঘোড়াসওয়ার। বেতোয়ার অপর প্রান্তে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে আঁধার দিয়ে গড়া মূর্তির মতন। ওপার থেকে প্রশ্ন আসে গম্ভীর কণ্ঠে, কৌন্?

—বাইসাহেব কী ফৌজ।

—তব্ ঠাহ্‌র যাও।

জল পেরিয়ে চড়া পেরিয়ে তারা এগিয়ে আসে। পুরোধা ব্যক্তির দিকে দেখে উত্তেজনায় খুদাবক্সের কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। পুনর্বার আদেশ আসে : লাইনে দাঁড়াও, দেখ্‌ব।.. নাম কি?

খুদাবক্স ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে যায়। বলে, গোলামকে শমসের পেস করতে হুকুম দিন ওস্তাদ, আমি খুদাবক্স।

—কোন্ খুদাবক্স?

—যেমন আমার একই ওস্তাদ, তেমনি আমি আপনার একই খুদাবক্স, দোছরা কেমন ক'রে হবে?

ঘোস নামেন ঘোড়া থেকে। খুদাবক্সও নামে। ঘোস তাকে টেনে আনেন বজ্র মুঠে ধরে আগুনের সামনে। পা দিয়ে ঠেলে দেন কাঠ। দাউদাউ ক'রে জ্বলে ওঠে আগুন। কথাগুলো রুদ্ধ হয়ে যায় ঘোসের মুখে, স্বেদাক্ত হাতে তার চিবুক তুলে বলেন, খুদাবক্স!

—ওস্তাদ!

আগুনের ধিকি ধিকি শিখাতে দু'জনে দু'জনকে দেখেন। সহসা গর্বিত খুদাবক্স, দুঃসাহসী বীর, কষ্টসহিষ্ণু পাঠান, বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে জড়িয়ে ধরে ঘোসকে। ঘোসও জড়িয়ে ধরেন এই প্রিয় শিষ্যকে। অন্ধ আবেগে হাত দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে মুবারক করেন খুদাবক্সকে। এতজনের সামনে অশ্রুবর্ষণ করতে এতটুকু লজ্জা বোধ হয় না দু'জনের।

তখন এগিয়ে আসে পরন্তপ। এতক্ষণ ধরে সে নিস্পৃহভাবে রাঙা আলু খাচ্ছিল। গম্ভীর কণ্ঠে বলে, খাঁ সাহেব, আমি পরন্তপ চৌহান, আমার শমসেরও পেশ করতে

অনুমতি দিন, আর এও পেশ করি যে এতদিনে এই বেওকুফ্ না-লায়েক খুদাবক্সকে আপনার হাতে পেঁৗছে দিয়ে আমার ছুটি মিলল।

সাগ্রহে তাকে আলিঙ্গন করেন ঘোস। বলেন, চৌহান সাহেব, আপনার সঙ্গে আমার ছুটির কোন কথা নেই। এতদিনে আপনি ঠিক জায়গায় এসে পেঁৗচিয়েছেন। এখানে আপনার ঠিক কদর পাবেন, আর ছুটি কখনো মিলবে না।

অপেক্ষমান সওয়াররা ঘোড়া থেকে নেমে একে একে এগিয়ে আসে। একটু সঙ্কোচ আর আনন্দের সঙ্গে সকলকে আলিঙ্গন করে খুদাবক্স। বাহ্‌রাম, সাগর, দুলীচাঁদ, জওহর—উদ্বেলিত হয়ে ওঠে হৃদয়।

খুদাবক্স পরন্তপকে দেখে স্পষ্ট বোঝে একটা নাটকীয় কিছু করবার জন্যে সে ছট্‌ফট্ করছে। পরন্তপ তার আশঙ্কা অনুমান করে ধমক দেয়—এই আমাকে রুখ্‌বে না মোটেই! তারপর বলে, ভাইসব, এই আনন্দের জমায়েতে এস আমরা তরমুজ খাই।

—তরমুজ কোথায় পাবেন?

—কেন চরে? বলে পরন্তপ চট্‌পট্ চলে যায়। একটু পরেই দু'জন সওয়ারকে নিয়ে গোটা আষ্টেক তরমুজ নিয়ে আসে।

বালির ওপর বসে তরমুজ ভেঙে সবাই মিলেমিশে খায়। ঘোস খুদাবক্সের সঙ্গে বেশী কথা বলেন না। শুধু চোখ দিয়ে দেখে দেখে আনন্দ জানান। কথা যা বলেন তা পরন্তপের সঙ্গে। বলেন, সমানে ডাকু লুঠেরার উপদ্রব হচ্ছে এখানে জেনে বাই সাহেব একবার নিজে এসেছিলেন। গর্জন সিং আর ভানুকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে, কিছু ডাকুকে কয়েদ দেওয়া হয়েছে। আবার লুঠেরার উৎপাত হয়েছে জেনে আমরা এসেছি। এখানে কিছু রিসালা রেখে আজই ফিরব। কারণ ঝাঁসী ছেড়ে থাকলে আমার চলবে না।

ঘোসের কথাবার্তায় প্রবীণ যোদ্ধার গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য। চমৎকার মানানসই পোষাকে ঝাঁসীরাজের চিহ্ন, ছুঁচের কাজে বসানো। মুরেঠায় একটা সোনার ঝক্‌ঝকে চক্র পদমর্যাদার জানান দেয়। রিসালার ঘোড়া আর পোষাক দেখে বড় তারিফ আসে পরন্তপের মনে।

ঘোস কথাবার্তার জবাব দেন বুঝে বুঝে—হ্যাঁ, ফৌজ অন্ততঃ এগারো হাজার থাকবে। কামান আছে পঁয়ত্রিশটা। বাইশটা আমাদেরই ছিল, আর দু'টো এনেছিল ইংরেজ খুনের সময়ে পল্টন, নয়টা মিলেছে অরছার নথে খাঁর কাছ থেকে, দু'টো দিয়েছেন ঠাকুর মর্দন সিং। রসদ, টাকা, তোফাখানা, সব কায়েম বন্দোবস্ত। ফৌজ যে খুব তৈরী তা' নয়, তবু মন্দ নয়, রিসালাও ভাল। একটু কমজোরী হয়েছে আমার তোফাখানা। রিসালাতে রয়েছেন বাঈসাহেবা নিজে। আর তোফাখানাতে কিছু বহিনকেও পেয়েছি।

পরন্তপ প্রশ্ন ক'রে, তবে কি এই কথা সত্যি, যে ঝাঁসীতে লড়াই করছে মেয়েরাও?

একটু ভেবে ঘোস বলেন, প্রথমে সবাই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু এখন দেখেছি কি বড় কাজে লেগেছে মেয়েরা।

জবাব দেয় না পরন্তপ, তবু বোধ হয় তার চোখের কোণে জেগে থাকে সন্দেহ।

ভোর-রাতের মুখে তারা রওনা হয় ঝাঁসী। পথে দেখা যায় ক্ষেত-কে-ক্ষেত খালি হয়ে গেছে, গাছে পাতা নেই। একেবারে রিক্ত হয়ে গেছে ভূপ্রকৃতি।

পরন্তপ, ঘোস আর খুদাবক্স পাশাপাশি চলেন। খুদাবক্সকে দেখে দেখে অবাক মানেন ঘোস। এই লোকটি তাঁর একান্ত অপরিচিত। বিদায় নিয়ে যে চলে গিয়েছিল, সে

এক তরুণ যুবক। আজকের খুদাবক্সের রঙ অনেক জ্বলে গিয়েছে, শারীরিক পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য জীবনযাত্রা তার শরীরটাকে পিটিয়ে দিয়েছে, দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায় অনেক স্থির ও একাগ্র হয়েছে খুদাবক্স।

ঝাঁসীর কেল্লা দূর থেকে প্রতিভাত হয় বিকেলে। আকাশের গায়ে বোধ হয় যেন কালি দিয়ে লেখা কেল্লার বহিঃরেখা। দেখে খুদাবক্সের অদ্ভুত ভাবান্তর হয়। ঘোস বাহ্‌রামকে ডাকেন। ঘোসের আজ্ঞা কানে কানে শুনে বাহ্‌রাম তার ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। মোতিকে খবর দিতে হবে।

ঝাঁসীর কাছে এসেই, ঘোড়া সংযত ক'রে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন সবাই। একটু পরেই দূত এগিয়ে এল, ঘোসকে কি বলল, ঘোস বললেন, আমরা উনাও গেট দিয়ে ঢুকব। অংরেজের ফৌজ রয়েছে বিশ মাইল দূরে।

সতর্ক দৃষ্টিতে আঁধার দেখে দেখে সহরে ঢুকলেন তাঁরা—রাত আটটা হবে।

ঘোস খুদাবক্সকে একান্ত করে বলেন, আগে রানীকে'ত ভেট কর।

স্বীকার ক'রে খুদাবক্স।

রানীমহালে প্রবেশ ক'রে সোজা দরবার ঘরের দিকে চলেন ঘোস। উত্তেজনায় স্বেদাক্ত হয়ে ওঠে খুদাবক্স। দরবার ঘরের সামনে স্মিত হেসে পথ দেখায় দুইজন পাঠান রমণীর পোশাকে সজ্জিতা তরুণী। আজ তারাও যোদ্ধার সাজে সজ্জিত।

পাঠান যুবকের সজ্জায় সজ্জিতা রানী দ্রুত এগিয়ে আসেন, ঘোসকে দেখে বড় আশ্বস্ত হয়েছেন বলে বোধ হয়। ঘরের মেঝেতে আলো জ্বলছে, একটি মানচিত্র এবং কিছু চিঠিপত্র পড়ে আছে। ঘোস বলেন, সরকার, সঁইয়ার দরোজায় 'অর্জুন' কামান চালাবার লোক পেয়ে গেছি।

খুদাবক্স তরবারি পেশ করে। রানী সবিস্ময়ে দেখেন এই শালপ্রাংশু বীরদেহ যুবককে, ভাল লাগে তাঁর। এই রকম না হলে পুরুষ! যে প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি বলেন, বহুৎ খুব, কিন্তু বড়োয়াসাগরে পেলেন কি?

—জী সরকার। তারপর বলেন, এখন একে বিশ্রাম করতে হুকুম দিন, আমি আপনাকে সব বলছি।

রানী স্মিত হেসে তাকে যেতে অনুমতি দেন। তখন কথা বলেন ঘোস : ধীরে ধীরে খুদাবক্সের সম্বন্ধে সব কথা বলে যান। সহানুভূতি ও ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন রানী। বলেন, ঠিক আছে। কিছু ভাববেন না আপনি। আপনার বিশ্বাস থাকলেই হল। জানেন কি, চন্দন সিং যে গুপ্তচর সেই খবর বেরিয়েছে! কিছু চিঠি মিলেছে, সে কোন্ পহেলা ব্রিগেডওয়ালা ষ্টুয়ার্টকে খবর দিচ্ছে আমার কামান ও বন্দোবস্তি সম্বন্ধে। চিঠি বাজেয়াপ্ত ক'রে কয়েদখানায় রেখেছি। বড় হুঁশিয়ারীর দরকার।

দু'জনে দু'পাশে বসে পড়ে মানচিত্রে ইংরেজ সৈন্যের অগ্রগতি দেখেন। অভিজ্ঞ হাতে লাল পেনসিলে দাগ দিয়ে টেনে আনেন রানী।

এইবার মোতি! পথ দিয়ে চলতে চলতে পথকে দৃষ্টি দিয়ে ছুঁয়ে অভিনন্দন ক'রে খুদাবক্স। এই পথ নিত্য মোতির চরণের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে অপর হাতে চিবুক ছুঁয়ে থাকে খুদাবক্স। তীক্ষ্ণ নীল চোখ ধূসর হয়ে গেছে কোমল মমতায়।

খবর পেয়ে গেছে মোতি বাহ্‌রামের মুখে। শুধু ত' তাই নয়, প্রতিনিয়ত সে যে খবর পাঠিয়েছে মোতিকে পলে পলে, অনুপলে, সে খবরও কি মোতি পায়নি?

লগ্ন চেয়েছিল খুদাবক্স, তাই সমস্ত সময়টা হয়ে গেল লগ্ন, এই নগরী হয়ে গেল উৎসবের ঘর, সেই গৃহে চলেছে খুদাবক্স। আর অল্প পথ তারপর সেই বাড়ী।

পথে সংগ্রামের প্রস্তুতি, জনকোলাহল, আলো, কিছুই চোখে পড়ে না খুদাবক্সের। এ সমস্তই যেন স্বপ্ন। সত্যি শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ, আর সত্যি হচ্ছে ক্রমক্ষীয়মান দূরত্ব।

একটু ফাঁকা পেয়েই জোরে ঘোড়া চালায় খুদাবক্স, মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ে সেই অতি পরিচিত নীচু দোতলা বাড়ী। সদর দরওয়াজা খোলা, পাশে কুলুঙ্গীতে একটি প্রদীপ জ্বলছে।

ঘোড়া থেকে নামে খুদাবক্স। পা ভারী ও অবশ বোধ হয়, অদ্ভুত দুর্বল মনে হয় নিজেকে। কানপুরে ইংরেজ সাহেবের হাতের গুলী লেগেছিল তার কাঁধে। মুহূর্তের জন্য সে মৃত্যুকেই দেখেছিল। তখন'ত এ রকম বোধ হয়নি। মনে হয় কারো সাহায্য পেলে হ'ত।

একেবারে নিস্তব্ধ বাড়ী। সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকে খুদাবক্স। ঘরে ঘরে বড় জোর একটি ক'রে প্রদীপ আছে, তাতে আলো আর আঁধার মেশানো একটা সুন্দর পরিবেশ হয়েছে।

নিরাভরণ কক্ষগুলি পেরিয়ে সে বড় ঘরে প্রবেশ করে। আবছা আলোতে চিত্রার্পিতা রমণীকে বোধ হয় এমনিই কিছু মৃদু আলো দিয়ে গড়া। শুভ্রবসনা, রুক্ষ বেণীধরা, নিরাভরণা, শুধু ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দু'টি কথা বলে। কথা বলে, স্বাগত জানায়, ঠোঁট এত কাঁপে যে কথা আসে না।

যাত্রা সমাপ্ত হয়েছে। আকুল বাহুবিস্তারে এগিয়ে আসে খুদাবক্স। সব কথা, সব স্বপ্ন এক হয়ে তার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয় শুধু একটি শব্দ—মোতি!

বিশ্বাসঘাতকতা করে মোতির চরণ। টলে পড়ে যেতে চায়। তখন বলিষ্ঠ দুই হাতে তাকে টেনে নেয় খুদাবক্স। বুকের কাছে ধরে ক্ষুধিত পিপাসায় বলে—মোতি, মোতি, মোতি। গলা ভেঙে যায়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, তবু বলে মোতি, মোতি, মোতি—হাজার-বার উচ্চারণেও যেন হবে না। রেশমের মত কোমল, সুরভিত কেশে মুখ গুঁজে সেই নামই বলে, উষ্ণ শুভ্র-সুন্দর গ্রীবাকেও সেই কথা বলে। তৃষিত ওষ্ঠাধর শুধু নামই উচ্চারণ করে, যতক্ষণ না মোতির তপ্ত অধরে এসে বিলীন হয়ে যায় একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চুম্বন। তৃষিতের মত পান করে খুদাবক্স আর মোতির অশ্রুর লবণাক্ত স্বাদ সেই সঙ্গে মিশে মিশে যায়।

জগৎ সংসারের দিশা ঠিকানা হারিয়ে যায়। কথা, অভিমান, অভিযোগ, এতদিনের তিলে তিলে রচা কত স্বপ্ন আর কল্পনা, সবই মিথ্যা হয়ে যায়। চরম সত্য হয়ে ওঠে শুধু তারা দুইজন।

যুদ্ধ, আশাভঙ্গ, মৃত্যু মিথ্যে হয়ে যায়, নগরীর দ্বারে যে মৃত্যু অপেক্ষমান, তার কথা মনে হয়ে প্রেম আসে আরো আকুল হয়ে। বড় শুভলগ্ন, বড় সুন্দর সময়। সহসা দেশ, কাল, বিধিনিষেধের ক্ষুদ্র সংস্কার চৈতী বাতাসে উড়ে বে-পাত্তা হয়ে যায়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামে পটভূমিকায় আকাশকে আরো বিশাল মনে হচ্ছে, নিজেকে মনে হচ্ছে

একেবারেই মুক্ত, স্বাধীন। এই সময় প্রেমও সমস্ত তুচ্ছতার শৃংখল থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই ত' পরমলগ্ন।

নিজেকে মুক্ত ক'রে খুদাবক্সকে হাত ধরে খাটে বসায় মোতি। গানে গানে কতবার সে এই আসন কামনা করেছে, আজ সত্যিই বসে মাটিতে নতজানু হয়ে। পা থেকে উন্মোচন করে নাগরা। তারপর হাঁটুগেড়ে বসে খুদাবক্সের কোলে মাথা রেখে কাঁদে। তাকে বাধা দেয় না খুদাবক্স। মোতির মধ্যে তার মা-কে এবং আরো অনেকজনকে যেন চেনে খুদাবক্স। মেয়েদের ভালোবাসাই হয়তো এমনি, অনেক অশ্রুমোচনে হয়তো গ্লানি কেটে যায়, নির্মল হয় প্রেম। শুধু আসংগ বাসনায় মদির ও লোভনীয় নয়, মেয়েদের কামনায় প্রেম হতে চায় নির্মল, পবিত্র ও সুন্দর। সেই জন্যই কি অশ্রুমোচনের প্রয়োজন হয়? আঘাত না পেলে যেমন পৃথিবী ফুল ফলের ভাষায় কথা কইতে চায় না, উৎসারিত ক'রে দিতে চায় না জলের গোপন উৎস, মেয়েরাও হয়তো তেমনই সুন্দরতম হয় দুঃখ জানলে। চরম অনুভূতি প্রেম, সেও বেদনার পেয়ালাতেই ভরে পান করতে হয়।

মোতিকে তুলে ধরে খুদাবক্স। পাশে বসায়। কথা হয় না। চেয়ে দেখে অনিমিখ। সেই ললাট, সেই ঈষৎ উন্নীত গ্রীবা, সেই ওষ্ঠ, অধর, সেই চোখ। অযত্নে বেণী সংবদ্ধ কেশ, নিরাভরণ দেহ, অনামিকায় একটি প্রবালের অংগুরী। মনে পড়ে এই অংগুরী সে একদিন অধরে স্পর্শ করেছিল।

মোতির কমল নয়ন থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ে। বলে, কতদিন দেরী করেছ খুদাবক্স?

সান্ত্বনা দেয় খুদাবক্স। গভীর প্রেমে ধীরে ধীরে হাত বুলোয় মাথায়, পিঠে, কপালে। বলে, খত্ পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—লিখেছিলাম ত' সময় হলেই আসব মোতি।

—আর ত' চলে যাবে না?

প্রিয়তমকে দেখে আর দুইচোখের দৃষ্টি দিয়ে বরণ ক'রে মোতি। কত শান্ত, স্থির, একাগ্র এক পুরুষ। কোমল মমতায় খুদাবক্সের হাতে হাত বুলোয় মোতি। নিরাভরণা প্রিয়া। মোতির খালি হাত, কান, আর গলা দেখে মনে ব্যথা পায় খুদাবক্স। মোতি বোঝে। হেসে বলে, কি এনেছ আমার জন্যে?

—নিজেকেই এনেছি মোতি।

মোতি মাথা নীচু ক'রে এ সৌভাগ্য স্বীকার করে। খুদাবক্স একটু হেসে বলে, আর একটা জিনিষ কবে থেকে যে বয়ে বেড়াচ্ছি। এক দুখিয়ারীর জিনিষ। তোমার নাম করে দিয়ে গেছে সে।

—দাও। অঞ্জলি পাতে মোতি।

জামার ভেতরে হাত চালিয়ে দেয় খুদাবক্স। বের করে একটা ময়লা রুমাল। বাঁধন খুলে মোতির চোখের সামনে তুলে ধরে একজোড়া কানফুল। লবংগফুলের মতো ছাঁদ। মাঝখানে একটু লাল মীনার কাজ। সংগে সরু সোনার চেন। এমনি গহনা পরে গাঁয়ের ছোট ছোট বৌ-রা। বৌ-এর কান ছিঁড়ে যাবে তাই এই শিকলি।

মোতির হাতে তুলে দেয় গয়না খুদাবক্স। বলে, মা দিয়ে গেছেন তোমাকে। শ্রদ্ধায় মাথায় হাত তুলে নতি জানায় মোতি।

তারপর আয়না সামনে ধরে কানে পরে। ঋজু হয়ে দাঁড়ায় খুদাবক্সের সামনে। আর একখানা মুখ মুহূর্তের জন্যে মোতির মুখখানা আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। সেই মুখ ঈষৎ শীর্ণ, পান্ডুর, কপালে একটা উল্কীর টিপ, চুলগুলি কাঁচা পাকায় মেশানো রুক্ষ। এই কানফুলের সঙ্গে সেই মুখের স্মৃতি জড়ানো। মায়ের মুখ। তারপর সেই মুখ মিলে যায় মোতির মুখে। সুন্দরতর ক'রে তাকে। সলাজ হাসে মোতি। খুদাবক্সও একটু হাসে। তারপর দু'জনে এসে পাশাপাশি দাঁড়ায় জানলায়। ব্যস্ত রাজপথ দেখতে দেখতে খুদাবক্স বলে, মা দেখলে আজ বড় খুসী হতেন মোতি।

দু'জনেই চুপ ক'রে যায়। সেই মধুর ও করুণ নীরবতার ওপর নক্ষত্রের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যেন অ-দেহী আত্মার কল্যাণ কামনা ঝরে ঝরে পড়ে।

নীচে কার সাড়া পাওয়া যায়। অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রেখেই হাজির হয় বাহ্‌রাম।

সলাজ হাসে মোতি। বাহ্‌রাম একখানা চিঠি দেয় তাকে। বলে, জোরে পড়ো বহিন্‌। পড়তে গিয়ে মুখে হাত চাপা দেয় মোতি। ঘোস লিখেছেন : মোতি, যে বেওকুফ না-লায়েককে তোমার কাছে পাঠিয়েছি, তাকে আজ রাতে আর কেল্লায় আসতে হবে না। কয়েদে রাখো।

খুদাবক্সও চিঠি পড়ে খুব লজ্জা পায়। মোতি তাড়াতাড়ি একটু দাঁড়াও বাহ্‌রাম ভাই, ব'লে চলে যায় ঘরে। বাহ্‌রাম বলে, ওস্তাদের ত' পুরো খেয়াল নেই, নিজেই আসছিলেন, পরন্তপ খুব ঠেকিয়েছে। এখন দু'জনে কেল্লাতে দক্ষিণ বুরুজের পিছনে নিশান চৌকিতে বসেছেন 'ঘনগর্জ্‌'-এর সামনে, আর যে সব গল্প হচ্ছে, তা শুনে আমরাই ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছি। হাসির হর্‌রা ছুট্‌ছে। ভীড় জমাতে ভয় পাচ্ছে তবু আশেপাশে ফিরছে সব। পরন্তপ ওস্তাদের গোঁফ মেপে দেখছে আর চিৎকার ক'রে চব্বিশ বাঁও, চল্লিশ গজের গল্প শোনাচ্ছে। রঘুনাথজী পুরী মিঠাই আর রাবড়ী চালান দিচ্ছেন।

দু'জনেই হাসে। তারপর বাহ্‌রাম বলে, না জানি এই লড়াইয়ে কি হবে, কাল থেকে আর দিনরাতের নিশানা থাকবে না। তোমাকে আরাম করতে হুকুম দিয়েছেন বাঈসাহেব নিজে! তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, না খুদাবক্স, যা করেছ, করেছ, আর কষ্ট দিওনা। কেন কি, খুব ভালো মেয়ে না হলে তোমার মত একটা উজ্‌বুক গাঁওয়ারের জন্যে জীবনটা সদ্‌কা ক'রে বসে থাকত না এতদিন।

মোতি একটা ছোট থলিতে কিছু মেওয়া ও ফল নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'রে, কি কথা হচ্ছে?

—কিছু নয়। বলে বাহ্‌রাম ফলগুলো ভরে নেয় পকেটে। বলে, এখনি কিছু বুন্দেলা কিষাণ এল, তাদের বন্দোবস্ত করব। এরা রাজপুত ত', মোটেই পরোয়া করে না। যে যার কাস্তে বল, ছোরা বল, যা মিলেছে নিয়ে, মাথায় কম্বল চাপিয়ে চলে এসেছে হৈ হৈ করে। কেউ হচ্ছে বুড়ো, কারো নাগরা জোড়া নৌকোর মতন, খুব হয়েছে বটে কারবার! তারপর ওদের ভাষাতে কোন 'আপনি' নেই—কুঁয়ার রঘুনাথ সিংকে বলছে—তুম্‌ জরা ইধার আও, দিলীপ সিং পওয়ারকে বলছে—তুম্‌ পানি পিলাও—বোঝ!

এইসব উচ্চ পদস্থ সামন্ত সর্দারদের কথা মনে ক'রে খুব হাসে মোতি। বলে—ঠিক হয়েছে। যা আপনি আপনি আর দরবারী কথাবার্তা দিলীপজী'র!

সকলেই হাসে। বিদায় নেবার আগে বাহ্‌রাম বলে,—এই গাঁওয়ারটাকে কাল ধোবি-খানায় পাঠিয়ে দিও মোতি, ভালো ধোলাই ক'রে সাফা করতে হবে। ঝাঁসী আসবে বলে আর স্নান করেনি এরা। পরন্তপ কথা কইছে ত' গোঁফ থেকে ধুলো উড়ছে। তাই দেখে

চৌহানদের ওপরে চটে যাচ্ছেন রঘুনাথজী বোধ হচ্ছে। একটা স্নান করাবার মৎলব করছেন মনে হয়। বাহ্‌রাম চলে গেলে মোতি খুদাবক্সকে গোসল্‌খানায় নিয়ে যায়। জামা কাপড় নিয়ে যায়, সুগন্ধি উষ্ণ জলের গন্ধ আসে। মোতির মুখের দিকে চেয়ে খুদাবক্স বলে, আমার জামাকাপড় কেমন ক'রে পেলে মোতি?

একটু হেসে মোতি বলে, তোমার পেটি'ত আমার কাছে রেখেছিলেন ওস্তাদ, তাতে যে মাপ ছিল, তা' থেকে কিছু বানিয়েছিলাম।

—কবে?

—সেই ছ'মাস আগে ওস্তাদকে লিখেছিলে, আসতে পার, মনে নেই? তখন। কেন ঠিক হবে না?

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে কেন দিলেন ওস্তাদ? কি বা ছিল পেটিতে!

—কেন, তুমিই ত' লিখেছিলে কোন কাঙালকে দিতে। তাই আমি নিয়েছি।

ওস্তাদকে লেখা সেই প্রথম খত্‌। মনে করে খুদাবক্স গভীর প্রেমে মুখ তুলে দেখে মোতিকে। বলে, তুমি কাঙাল মোতি?

মোতি বলে,—এখন'ত নই।

সুরভিত উষ্ণ জলে স্নান করে ক্লান্তি ধুয়ে যায়। তারপর সাদা চিপা পরে খুদাবক্স খাস্‌ পাঠানী কায়দায় লম্বা কুর্তা পরে, গলার পাশে জরির ঘুনসি বসানো। পায়ে কিছু পরে না। হাল্কা লালরঙের চন্দেরীর মুরেঠা বাঁধে খুব কায়দা ক'রে। পাশের ঘরে বসে পোষাক খুঁজে পায় না মোতি। রঙ, জরি, রেশম, কিছুই পছন্দ হয় না তার। তারপর বেছে নেয় চাঁপাফুল রঙের পেশোয়াজ ও ওড়নী। আয়না সামনে ধরে বেণী বাঁধে। মুখখানা ঘসে ঘসে লাল করে তোলে। সুর্মা টানে চোখের কোলে। ওড়নীটা টেনে গায়ে জড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আয়নায় দেখে। আয়না ঢেকে খুদাবক্সের ছায়া পড়ে। হাত ধরে তাকে নিয়ে আসে খুদাবক্স। কুর্শীতে বসিয়ে মুখখানা তুলে দেখে। চূর্ণকুন্তল দু'টো একটা চিরুনী দিয়ে ছড়িয়ে দেয় কপালে। ওড়নীটা মাথায় তুলে দেয়। একটু কৌতুক, আর অনেকখানি একাগ্রতা ফুটে ওঠে তার মুখে চোখে।

মোতি ঈষৎ অস্ফুট স্বরে বলে, মনে পড়ে খুদাবক্স?

—হ্যাঁ মোতি।

একপলকে দু'জনের চোখে ভেসে ওঠে সেই হোলির দিন। প্রথম সাক্ষাতের শুভলগ্ন। সেদিন আকাশ, বাতাস, পলাশ, শিমুল আকুল হয়ে রচনা করেছিল বসন্তের উৎসব। সে ছিল প্রথম যৌবন। ফুলওয়ালীর ডালার চাঁপাফুলের গন্ধটা অবধি অনুভবে আসে খুদাবক্সের। সেদিন এই পোষাক পরেছিল মোতি।

খুদাবক্স বলে, সেদিন কিন্তু চুল খোলা ছিল মোতি। আর গলায় ছিল এক মুক্তার হার। মনে পড়ে মোতি? বল তো—

তার একাগ্র দৃষ্টির সামনে মোতি যেন গলে গলে যায়। থরথর ক'রে কাঁপে তার মন। খুদাবক্স দুই হাতে মোতির মুখ তুলে ধরে একাগ্র পিপাসায়। বিভ্রান্ত হয়ে যায় মোতি। তখন একটু হেসে আশ্বস্ত করে খুদাবক্স। বলে, আরো একটা কথা বলি। মোতি বলে, বল। তীক্ষ্ম নীল চোখে কৌতুকের সামান্য ঝিলিক দিয়ে খুদাবক্স বলে, আপনার কি আর এক কথা স্মরণ হয়?

—কোন কথা?

—যে এক নজরের আঘাতেই ঘায়েল করেছিলেন? সেইদিন থেকেই ত' বান্দা আপনার অধীন।

—জী। বলে বন্দীকে স্বীকার ক'রে মোতি মধুর হেসে কাঠের কারুকার্য খচিত কাশ্মিরী পেটি খুলে এনে দেয় লাল মখমলের ওপর সোনালী জরির কল্কা, আর নক্সা বসানো একটি হাতকাটা আঙিয়া। বলে, ছয়মাস ধরে কাজটা করেছি নিজে হাতে, জান?

পরিয়ে দেয় খুদাবক্সকে। সত্যই চমৎকার দেখায়। মোতিকে টেনে কাছে আনে খুদাবক্স। আয়নার ওপরের জালিকাজের ঢাকনা তুলে দেয়। দু'জনের ছায়া পড়ে। যৌবন ও প্রেম দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। সেই সমুগ্ধ ছায়া বুকে ধরে ধন্য হয় কাঁচের আয়না। দু'খানা মুখেই সুখ স্বপ্ন কম্প্র আনন্দে বিরাজ করে। মোতি বলে, কাল, এই সময় কোথায় ছিলে?

—নদীর জলে। পাথরে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম। কিন্তু গত কাল, আর আগামী কালের কথা ছাড়। আজ, এখন, এই সময়টাই সত্য। কতবার শেখালাম মোতি, তবু শিখলে না?

—মাপ কর খুদাবক্স।

—এত সহজে নয় মোতি, পরে।

খুদাবক্সের মুখের দিকেও চায় না মোতি। পাশের ঘরে নিয়ে যায়।

গালিচার দুইপাশে দু'টি মোমবাতি জেবলেছে মোতি, মাঝখানে রেখেছে সাদা রেশমী সুতোর জালিকাজের রুমাল ঢাকা কয়েকখানা রেকাবী। পাশে রুপোর সোহ্‌রাইয়ে সরবৎ। দেখে অবাক মানে খুদাবক্স। একটু হাসিও পায়। বলে, গত কয়মাস আমরা কি খেয়েছি জান? কিছু আলু মিলেছে ত' খুব ভাগ্য মেনেছি। রুটির আটা মিলেছে ত' আলু মেলেনি। শিকার মিলেছে'ত রান্নার বাসন মেলেনি। আবার তিনদিন বাদে প্রথম কয়টা রাঙাআলু মিলল'ত খাবার সময় মিলল না। দুষ্মণের ফৌজ আসছে শুনে, ফেলে রেখেই পালিয়ে গেলাম। কিন্তু এ কি করেছ মোতি? এত কি আয়োজন করেছ?

—কি করেছি? মনে মনে মোতি ভাবে তোমার জন্যে কোন আয়োজনই যথেষ্ট নয় খুদাবক্স। আমার আর কি ক্ষমতা? সমস্ত দুনিয়ার ভাণ্ডারও যদি এনে দেয় কেউ, তবু ত' আমার মন মানবে না যে যথেষ্ট হয়েছে!

বড় যত্ন করে মোতি। এই সংগীন সময়ে কত কষ্ট ক'রে এইসব জোগাড় করেছে সে, ভেবে কষ্ট হয় খুদাবক্সের। মমতা জাগে মনে। মোতি সযত্নে সরবৎ ঢেলে এগিয়ে দেয় পেয়ালা। ফল ও বাদামের রেকাবির ঢাকনা তুলে নেয়। গরমজলের বাটি এগিয়ে দেয় হাত ধোবার জন্যে। মোতির যত্নে, তাদের গ্রামের ঘরের সামান্য আয়োজন নিয়ে মায়ের যত্নের কথা স্মরণ ক'রে খুদাবক্স। মনে হয় এমনি ক'রে মোতি তাকে যত্ন করবে জানলে কত নিশ্চিন্ত হতে পারত তার মা।

মোতির ঘরের জানলা খুলে দিতে হু হু ক'রে পাহাড় প্রান্তর ধোয়া চৈতালী বাতাস আসে। প্রদীপ নিভে যায়।

নীচু জানলার পাশেই শয্যা। খুদাবক্স শোয় হেলান দিয়ে। তার পাশেই বসে মোতি। বাতাসে মোতির চুল ও পোশাকের আতর সুবাস ছড়ায়। মোতি অনুমতি চায়। বলে, এতটুকু আরাম ক'রে দেব? বারণ করে খুদাবক্স। একটু পরে আস্তে মোতি বলে, একটা কথা বলব?

—বল।

সকরুণ মিনতি ভরা কণ্ঠে মোতি বলে, দেখ, এই কথা আজ না বললে আমার মুক্তি নেই। কেননা তুমি'ত জান এইরকম সময় আর মিলবে কিনা জানা নেই।

—বল মোতি।

—আচ্ছা তুমি আমায় মাফ করেছ তো?

খুদাবক্সের পায়ের ওপর হাত রাখে মোতি। কণ্ঠস্বরে মনে হয় অশ্রুর আভাস আছে নয়নে।

মাথার নীচে দুই হাত দিয়ে হেলান দিয়ে শুয়েছিল খুদাবক্স। বলে, এদিকে তাকাও মোতি।

মোতি তাকায়। স্বল্প জ্যোৎস্নার আলোতে দেখা যায় ওর আঁখিপল্লব সিক্ত। ধীর, গম্ভীর, ঈষৎ উদাস, অথচ কোমল মমতা ভরা কণ্ঠে খুদাবক্স বলে, কিছু কথা তোমাকেও বলি মোতি, সময়ের কথা ভাবি না, কিন্তু এই হচ্ছে ওয়াক্‌ত। তুমি কি বিশ্বাস করো মোতি, আমি সেই কথা মনে ক'রে রেখেছি? হ্যাঁ, তখন বড় ঘা লেগেছিল, মনে হয়েছিল সহ্য করতে পারব না। কিন্তু কি জানো মোতি, তোমাকে আমার বাপের কথা অনেক বলেছি। রক্তে রক্তে আমি কিষাণ। জমি বছরের পর বছর মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাকে স্নিগ্ধ করি, সে ফৈলাদ্‌ করে, ফুলফল দেয়, নয়তো ছাড়ি না। তুমি আঘাত দিয়েছিলে, তবু তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না আমি। ওস্তাদের খত্‌ মিলবার আগেই আমার মন তৈরী হয়েছিল মোতি, আর কাউকে তোমার জায়গা দিতে পারতাম না। তোমাকে একবার ভালবেসে সেই মন নিয়ে কোন খেলাও খেলতে পারতাম না।

অনেক কথা আমি বলতে পারি না তুমি জান, আমি সব সময় ভাবতাম তুমি আমাকে ঠিক বুঝবে, বুঝে ক্ষমা করবে, অপেক্ষা করবে। কোথা থেকে এত বিশ্বাস আসত বল। সে বিশ্বাস'ত তুমিই দিয়েছিলে।...বড় অদ্ভুত মন আমার, একবারই ভালবাসতে পারি, আর সেই কথাই ধেয়ান হয়ে থাকে জীবনে। তাতেই সময় কেটে গেল, অনেক প্রেম, অনেক অভিজ্ঞতা যারা সঞ্চয় করতে পারে, তাদের সময় কেমন করে মেলে জানি না। তুমি ভাব, আমি কালকের কথা ভাবি না। কি ভবিষ্যত ভাবব বল। গত কয় বছর কত মৃত্যু, দুঃখ, শোক আর অনাহার দেখলাম। মানুষের জীবনের কথা কি বলব, আমার জীবনেই দেখলাম কত উঠ্‌তি পড়্‌তি। হিসেব ক'রে বাঁচলেই দেখি সব বে-হিসেব হয়ে যায়, আর যেখানে কোন প্রত্যাশা ছিল না, সেখানে সব আশা ছাপিয়ে সৌভাগ্যের পিয়ালা উছ্‌লে পড়ে, এই দেখে শিখেছি যে সবই জীবনের মুবারক, সবই কৃতজ্ঞ হয়ে নিতে হবে।

খুদাবক্সের কথায় তার সমস্ত জীবনের অরমাঁ যেন খুঁজে পায় মোতি। অরমাঁ বা মরমের কথাও'ত সেই কথাই বলে। খুদাবক্স আরো কথা বলে। ব্যাকুলতা ভরা তার কণ্ঠ। যেন এই কথাগুলি এই রাতে বলতে হবে, তাই চাঁদ উঠেছে এতক্ষণ পরে মেঘের ওড়নী সরিয়ে রেখে, তাই ঝোড়ো বাতাস মুঠো মুঠো জুঁই ফুলের গন্ধ আনছে মেহ্‌দীবাগের মালঞ্চ থেকে। সে বলে, আজ রাতে যে ইংরেজ ফৌজ কুড়ি মাইল দূরে আছে, কালই হয় ত' সে এসে পড়বে কেল্লার সামনে। তখন এই সব কথা বলতে যাব না মোতি। তাই বলি, তুমি সে কথা আর বোল না।

—আচ্ছা খুদাবক্স। একটু ভেবে মোতি বলে, তুমি কিছু অংরেজ ফৌজ নিশ্চয় দেখেছ? একটু হাসে খুদাবক্স। বলে, পহেলা দেখেছিলাম ছোট বেলায়।

তার মুখে হাত চাপা দেয় মোতি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে তার। খুদাবক্স তার সেই হাতখানা ডান কাঁধের ওপর রাখে। বলে, আঁধারে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, এইখানে একটা মস্ত চোট আছে। কানপুরে গুলী খেয়েছিলাম খুব জোর।

হাত বুলিয়ে দেয় মোতি। খুদাবক্স বলে, খুব দেখেছি গত কয় মাসে। হিম্মৎদার তারা, মানতেই হবে। আর খুব নিয়ম মানে। নইলে এইভাবে একটার পর একটা লড়াই জিতে নিচ্ছে?

—শুনেছি যে বড় খুনজখম করছে?

—সে কথা থাক মোতি। এখন কি সেই কথা বলবার সময়? খুদাবক্সের বাহুতে হেলান দেয় মোতি। মোতিকে বাহুতে বন্দী ক'রে কাছে টেনে আনে খুদাবক্স। একেবারে বক্ষলীন ক'রে তার হৃৎস্পন্দন শোনে। একের বুকের দোলা লেগে অপরের হৃৎপিন্ড চঞ্চল হয়। কেল্লা থেকে কামান পাল্লা ঠিক করছে, সেই ফাঁকা আওয়াজ আসে। রাতে যারা চৌকি দেবে, সেই সব রিসালা, সিপাহী ও তোফাখানার লোকরা চলাচল করে সদর রাস্তা দিয়ে। ঘণ্টা বেজে ঘোষণা করে রাত—বাজল দুটো।

সমস্ত দুনিয়াটাকে দূরে সরিয়ে দেয় খুদাবক্স। বুকের ভেতর থেকে মহাবুভুক্ষায় তরঙ্গায়িত হয় প্রেম। হাজারটা হাতে খুদাবক্সকে আঘাত করে। অভূতপূর্ব বেদনা ও আবেগের এক মিশ্র তরঙ্গ উম্বেল হয়। রক্ত চঞ্চল হয়। তার বহুদিনের প্রতীক্ষা এই চরম আনন্দ ও বেদনার মুহূর্তে সার্থক হয়। আসন্ন যুদ্ধের পটভূমিকায় প্রিয়াকে আপন ক'রে নিতে চায় পুরুষ। পরম সময়। চরম শুভলগ্ন। দুরন্ত আবেগে খুদাবক্স বলে, মোতি, মোতি, মোতি। ফুলের মালার মতই বক্ষলগ্ন হয়ে থাকে মোতি, কথা বলে না।

ভাষাহারা হয়ে যায় রাত।

ঈষৎ হেলে পড়ে চাঁদ। বড় যত্নে খুদাবক্সের কপাল থেকে চূর্ণ কুন্তল সরিয়ে দেয় মোতি। খুদাবক্স সপ্রেম দৃষ্টিতে চায়। বলে, কি ভাবছ?

—কিছু নয়।

—মোতি?

—কি?

—তুমি গান গাইতে!

—হ্যাঁ।

—কোন গান?

—আমি বলতে পারব না। লজ্জা করে।

—আমি শুনতে চাই।

—বড় না-ছোড় তুমি খুদাবক্স, বড় তোমার জেদ।

—হ্যাঁ জী, কম জেদী হ'লে ত' তোমার সঙ্গে পারতাম না, তুমিই কি কম?

একটু হাসে মোতি। চোখে মুখে অপরূপ লাবণ্য।

খুদাবক্স বলে, গান কর।

—এক গান তোমার মনে আছে খুদাবক্স?

—বুল্‌বুল্‌ মত্‌ রোঁ ইহাঁ—? নিশ্চয়।

—সেই গান গাই।

—না মোতি।

—বেশ। তবে সেই গান গাইব, আমার গুরুজী আমাকে যে গান দিয়েছিলেন।

—সেই অন্ধমেয়ের গান? যাকে ইনাম দিয়েছিলে?

—কেমন ক'রে জানলে?

—বড়োয়াসাগর ছেড়ে আসতে ওস্তাদ বলেছেন।...বড় অন্যায় করেছি আমিও মোতি, আর একবার মাফ চেয়েছিলাম মনে পড়ে? সেই চাঁদনী রাত, হোলিতে হল্লা হচ্ছে!

সব মনে পড়ে মোতির। মানুষ ত' ছিল না কাছে, স্মৃতি ধরেই বসেছিল সে। তসবীর মালার মত সেই স্মৃতির মালা আঙুলে ক'রে গুণত। জবাব না দিয়ে গান ধরে মোতি গুরুজীকে স্মরণ ক'রে—তেরে কারণ ম্যয় সজন্ যোগান বন্ জাউ'। মনে হয় স্মিত হাস্যে তাকে আশীর্বাদ করছেন গুরু চন্দ্রভাণ।

খুদাবক্স বলে, এই গান তুমি গাইতে? সম্মতি জানায় মোতি।

—কেন মোতি? যোগান্ কেন হবে তুমি? আমি'ত তোমারই ছিলাম মোতি, এক-দিনের জন্যেও বিস্মৃত হইনি, বিশ্বাস করো।

বিশ্বাস ক'রে মোতি। প্রিয়তমের বাহুকে উপাধান ক'রে পরম সুখে লীন হয়ে থাকে।

আঁধার তরল হতে থাকে পূব গগনে। খুদাবক্স বলে, একটু ঘুমোও মোতি। রাত শেষ হলো!

বাধ্য বালিকার মতন কথা শোনে মোতি। চোখ বুঁজে থাকে। জানলায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা মুখে চোখে নিতে নিতে খুদাবক্স কৃতজ্ঞতা জানায় পরম করুণাময়ের কাছে। কৃতজ্ঞতা বোধ করে সে, মন বারবার নতি স্বীকার করতে চায় সকলের কাছে।

এতক্ষণে বোধহয় মোতি ঘুমিয়েছে। নিঃশ্বাস পড়ে। নির্মল সুন্দর মুখে প্রশান্তি জেগে থাকে। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিয়ে খুদাবক্স তার কানে কানে বলে, মোতি, এবার আমি আর তুমি চলে যাব রিসালা হল্‌ট ছাড়িয়ে আমার গাঁয়ে। সেখানে তোমার জন্যে ক্ষেতে গিয়ে চাষ করব আমি, আর ঠিক দুপুর বেলা কালো কামিজ ওড়নী পরে রূপোর বালা হাতে তুমি মাথায় ক'রে খাবার বয়ে আনবে আমার জন্যে। সন্ধ্যে বেলা যখন ঘরে ফিরব, তখন চেরাগ জেবলে দিয়েছ, চুলা ধরিয়েছ কাঠকুঠো জেবলে। কিন্তু এখন নয়, পরে।

ঘুমের ঘোরে একটু সাড়া দিল মোতি। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। তার পাশেই শুয়ে পড়ল খুদাবক্স। ভোরের হাওয়ায় ঘুম এল না চোখে, কান পেতে শুনতে লাগল ভোরের শানাই।

ষোল

প্রভাত হলে দু'জনেই পথে বেরুল। মোতির পরনে পাঠান রমণীর পোষাক, কোমরে তরবারি, পায়ে নাগরা। খুদাবক্স ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চলল, তার পাশে পাশে চলল মোতি। পথচারী সবিস্ময়ে তাকাতে লাগল তাদের দিকে। বড় সুন্দর জোড়ী হয়েছে, একথাও তাদের চোখে চোখে ফুটল। ঈষৎ সলাজ হেসে মোতি স্বীকার করতে লাগল পরিচিত পথচারীদের। স্মিত হাসতে লাগল খুদাবক্স। বড় ভাল লাগছে তার। তাদের পাশাপাশি চলাটাও সকলের চোখে সপ্রশংস স্বীকৃতি পাক। তাতে তাদেরই ভাল হবে।

কেল্লাতে পৌঁছে প্রথমেই খুদাবক্স খোঁজ করল পরন্তপের। মোতিকে বলল, আগে তার সঙ্গে দেখা করো।

একরাতেই চেহারা বদলে গেছে পরন্তপের। স্নান করেছে, গোঁফ চুমরে তুলেছে কানের ওপর। মুরেঠা বেঁধেছে কায়দা করে। কুর্তা, চিপা যা পরেছে সবই নতুন। পেতলের ফুল বসানো একজোড়া নতুন নাগরাও জোগাড় করেছে ইতিমধ্যে। খুদাবক্স বলে, পরন্তপ, এ-ই মোতি।

মোতি মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন জানায়। ঝাঁকড়া ভুরুর নীচে বড় বড় চোখ দু'টোতে প্রশংসা ফোটে। পরন্তপ বিব্রত হচ্ছে জেনে মোতি বলে, রাতে আরাম করেছেন? কিছু মুস্কিল হয়নি?

--না বহিন্, কিছু মুস্কিল হয়নি। পরন্তপের বিব্রত অবস্থা সকৌতুকে দেখে খুদাবক্স। বলে, পরন্তপ, কথা বল কিছু।

পরন্তপও টক্কর নেয়। বলে, কথা ত' ওঁর সঙ্গেই বলব। সে আমরা সময় ক'রে নেব। সেখানে তুমি থাকবে না। বহিন্‌জী কি বলেন?

—জরুর চৌহানজী।...লজ্জাও পায় মোতি একটু, আবার ভালোও লাগে তার। পরন্তপ বলে, অংরেজ ফৌজ ত' এসে পড়েছে। আমরা দেখতে যাচ্ছি।

মান্দার, কাশী, জুহী, ঝলকারী, হীরা ও গঙ্গা একে একে এগিয়ে আসে। সকলেরই পাঠান যুবকের বেশ, কোমরে তরোয়াল, মান্দার ও কাশী দু'খানা ছোট পিস্তল বহন ক'রে। জুহীর চোখটা নাচতে থাকে। মোতিকে বলে, আমরাও একটু পরিচয় করতে চাই খাঁ সাহেবের সঙ্গে মোতি!

মোতি বলে, নিশ্চয়।...সম্মান ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে সহজ ভাবে মান্দার বলে, পরিচয় করিয়ে দিই আমি। আমি মান্দার, এ কাশী, ও ঝলকারী,...খুদাবক্স সম্মানের সঙ্গে তাদের স্বীকার করে। তারপর খুদাবক্স, পরন্তপ ও মোতি দক্ষিণ বুরুজের দিকে যায়। পরন্তপের চোখের দিকে খুদাবক্স তাকায়, মেয়েদের এই অকুণ্ঠ ব্যবহার ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে সে কি ভাবে নিয়েছে তা-ই দেখে। বিস্মিত সে নিজেও কম হয়নি। পরন্তপ মাথা নেড়ে জানায়,—হ্যাঁ ঠিক আছে। বলে, তাজ্জব কিন্তু বেশী তাজ্জব নয়। এই রকমই ত' হওয়া উচিত ছিল, অন্য কোথাও ত' হ'ল না।

বুরুজে দাঁড়িয়ে দূরবীণ চোখে দিয়ে দেখছেন ঘোস, রঘুনাথ সিং এবং লালা ভাও। খুদাবক্স ও পরন্তপও দেখে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে। জোকানবাগের অনেক পেছনে, ক্যাণ্টনমেণ্ট ও দগ্ধ ষ্টার ফোর্ট ছাড়িয়ে ইংরেজ সৈন্য আসছে। উঁচুনীচু জমিতে কখনো তাদের দেখা যাচ্ছে, কখনো দেখা যাচ্ছে না। দূরবীণ দিয়ে পরন্তপ ও খুদাবক্স দেখে। ঘোস বলেন, মাঝখানে যে প্রৌঢ় পুরুষকে দেখছ, তিনিই সার হিউ রোজ। তাঁর চোখেও দূরবীণ, খুব নজর করছেন কেল্লার দিকে। দেখতে চেষ্টা করছেন।

দূরবীণ নামিয়ে ঘোস বলেন,—ঝাণ্ডা উঁচু ক'রে দাও!

টকটকে লাল রেশমের ঝাণ্ডা উঁচু ক'রে বাঁধা হয়। সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে সেই ঝাণ্ডা উড়তে থাকে নীল আকাশে। ঘোস বলেন, দেখতে হয় ত' ভাল ক'রে দেখুক।

—ফৌজ কত হবে ওস্তাদজী?

রানীর প্রশ্নে সচকিত হয় সকলে। প্রভাতে পূজা অন্তে, পাড়বিহীন লাল রেশমের শাড়ী মরাঠি পদ্ধতিতে পরেছেন রানী। সিক্ত কেশ কবরীবদ্ধ, কপালে চন্দন, কণ্ঠে মুক্তার

একাবলী, হাতে হীরার কঙ্কণ, পায়ে নাগরা। দূরবীণ নিয়ে নজর করেন। বলেন, কত হবে বলে মনে করেন?

ঘোস বলেন, রোজের সঙ্গে শুধু দুই নম্বর ব্রিগেড আছে। এক নম্বর ব্রিগেড আসছে চন্দেরী ঘুরে। ভূপালের বেগম শিকান্দারের সাতশো ধরলে পুরা ফৌজ নয় হাজারের কাছাকাছি যাবে।

—আমারও তাই আন্দাজ। কিন্তু জানেন ওস্তাদ, আমি যেমন ওদের খবর পাচ্ছি, ওরাও ত' আমাদের পুরা খবর পেয়ে গিয়েছে!

—এ আফ্‌শোষের কিনারা কোথায় সরকার! গোপালরাওকে'ত কয়েদে রাখব?

—হাঁ জরুর। ঠাকুরমর্দন সিং না আসা পর্যন্ত গোপালরাও-এর গোস্তাকি আর হারামির কিনারা মিলবে না।

—আর চন্দন সিং?

—তার কিনারা এখনই করব। লড়াই সামনে নিয়েও যে বেইমান এইরকম হারামী করতে পারে ফিরিঙ্গীর জন্যে, তার এক ফোঁটা খুন না রেখে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারেন ওস্তাদ? ভয় হয়, সেই খুন যেখানে পড়বে সেখানেই মাটি অবধি হয়ে যাবে বেইমান। ধরণীমাতার গা জ্বলে যাবে! কড়াকড়ি কমতে দিলে ত' হবে না!

ঘৃণা ও আবেগে রানীর মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বলেন, কত চেষ্টা ক'রে কত কষ্টে এই লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করেছি, কত সাচ্চা জান আমার সঙ্গে বে-পরোয়া হয়ে নেমেছে, বলুন ওস্তাদ সেই লড়াই যদি কেউ ভেঙে দিতে চায়, তাকে কি করা উচিত?

সবাই চুপ করে থাকে। ওদিকে ইংরেজের ফৌজ কেল্লার তিন মাইল দূরে থামে। ছাউনী বাঁধে। ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ অফিসাররা টহল দিয়ে কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করেন। প্রশংসনীয় তাঁদের নিয়ম ও শৃঙ্খলা।

প্রস্তুতি সমাপ্ত করতে বেলা গড়িয়ে যায় ইংরেজের। তিনটের সময় থেকে ইংরেজের কামান গর্জন ক'রে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কেল্লা থেকে জবাব দেয় ঘোসের কামান।

দক্ষিণবুরুজের ভার কারো ওপর ছাড়েন না ঘোস। 'ঘনগর্জ' বসিয়ে পাল্লা ঠিক ক'রে নিতেই যা দেরী হয়েছিল। তারপর বড় নৈপুণ্যে কামান চালান ঘোস। মোতি তাঁর পেছনে থাকে। বারুদ ও গোলা সরবরাহ ক'রে। সঁইয়ার দরওয়াজায় 'অর্জুন' কামানের সামনে রয়েছে খুদাবক্স। সহসা যেন তার মনের কথা ধরে ঘোস বলেন, ও খুব লড়ে এসেছে, ঠিক জান বাঁচিয়ে চলবে। লজ্জিত হয় মোতি। চোখটা পরন্তপের দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে কাজ ক'রে যায়। ভীমগর্জনে ফেটে পড়ে ঘনগর্জ। আকাশে তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যায়।

সঁইয়ার দরওয়াজায় বসেছিল খুদাবক্স। কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল ইংরেজ ব্যাটারী বেঁধেছে সাগর দরওয়াজার সামনে। ঘোসের হুকুমে মরাঠা মেয়ে সুন্দর ও পীরআলিকে সঁইয়ার দরওয়াজা ছেড়ে দিয়ে সাগর দরওয়াজায় চলে যায় খুদাবক্স।

সন্ধ্যার মুখে পথের ধারের বাতিদানে জ্বলন্ত মশাল গুঁজে দিয়ে যায় আসাবরদাররা। পুরোরাত লড়াই চলবে বলে বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় যখন লড়াইরত সৈনিক ও গোলন্দাজদের খাবার পেঁাছে যাচ্ছে তখন খুদাবক্সের জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসে মোতি। খুদাবক্স হাসে। বলে, চুলগুলো কি করেছ?

—কি করেছি? খুব টান ক'রে তুলে বেণী বেঁধে, মুরেঠা পরেছে মোতি।

—গাঁয়ের মানুষের মত দেখাচ্ছে যে? জলের পাত্রটা কাছে আনে মোতি। পাশে বসে বলে, আমি ত' গাঁয়েরই মানুষ। তোমার মত শহরওয়ালা নই।

—কোন্ গাঁয়ের মানুষ?

—যে গাঁয়ের মালিক তুমি। দু'জনেই হাসে। ভাগ ক'রে খায় একসঙ্গে। কামানের লোহাটে গন্ধের সঙ্গে তেল ও বারুদের গন্ধ মিশে এক অদ্ভুত পরিবেশ রচনা করে।

ইংরেজ ব্যাটারীতে বাতি নেই। তাই নিশানা ঠিক করবার সুবিধে হয় না। তবু ঠিক জায়গাতে বসে থাকে খুদাবক্স। চোখ্‌খুপি দিয়ে দেখে আর নিশানা ঠিক করে। বারুদ আর পলতে থাকে হাতের কাছে। মোতিকে পরম অধিকারবোধে বারবার দেখে খুদাবক্স। বলে, সেই সকালের পর এই দেখলাম তোমাকে জান?

—হাঁ জী।

—কেমন লাগছে মোতি?

—ভাল। বলে মোতি উঠে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে কম্বল এনে খুদাবক্সের পায়ের কাছে রাখে। তারপর ঘোড়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একজন ছোকরা সিপাহীকে ডেকে ঘোড়াটাকে জল খাওয়াতে দিয়ে দেয়।

একটি বালক সৈনিকের মতো বোধ হয় মোতিকে। দেখে দেখে খুদাবক্সের মনে হয়, এই প্রেমই সে কামনা করেছিল। যখন যুদ্ধক্ষেত্র বাসর হল, তখন প্রিয়াকে নির্ভয়ে কাছে পেল। কত সহজ, আর সুন্দর। আজ রাত্রি প্রভাত হলে—। কামানের ঠাণ্ডা গায়ে মাথা রাখল খুদাবক্স, আগামী কালের কথা আর ভাববে না সে। সে সময় চলে গেছে।

পাশে ব'সে মোতি বলল, সারাদিন পরন্তপ চৌহানের সঙ্গে অনেক কথা হল।

—আমাকে বলেছে পরন্তপ।

—কি বলেছে?

খুদাবক্সের ঠোঁটে কৌতুক ঝিলিক দিল। পরন্তপ বলেছে—এই মেয়ে তোমার পথ চেয়ে বসেছিল, আর তুমি এত বড় বুদ্ধু যে কয়বছর ধরে আমার গোঁফ ধরে বসে আছ? আহা-হা হা খুদাবক্স, বড় আফশোষ হচ্ছে, কি রকম ক'রে যে নাশ করেছি জওয়ানীর দিনগুলো! কি কথা, কি আদর! কি মেয়ে! তোমার আছে শুধু চেহারাখানা, আর গোঁয়ারের মত এক লক্ষ জেদ! কি দেখে যে মোতি...মুখে সে বলল, আমার সৌভাগ্যকে প্রশংসা করছিল। জানেনা ত' কি বাঘ্‌নী একজন!

—খুব যে বলছ!

—না, কিছু বলছি না।

দু'জনে বসে দেখে জাগ্রত নগরীর কর্মচাঞ্চল্য। খুদাবক্স বলে, কেউ কিছু বলেছে তোমাকে মোতি?

—আমি শুনিনি। তবে হ্যাঁ, জুহীরা ঠাট্টা করেছে একটু। ও কিছু নয়। তোমাকে কিছু বলেছে কেউ?

মনে পড়তেই হাসে খুদাবক্স। বাহ্‌রামের কাছে শুনেছে ঘোস খুব নাকি ফুর্তি করছেন আজ। হৈ-চৈ লাগিয়েছেন। মোতি যতক্ষণ না গিয়েছিল, ততক্ষণ পরন্তপের সঙ্গে খুব তামাসা করেছেন তাদের নিয়ে। মুখে বলে, না বলেছে তুমি আমাকে আদর যত্ন করোনি। আর জামাটা দেখিয়ে তামাসা করেছে।

মোতি লজ্জা পায়। বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব কথা থাক্।

দুজনে বসে থাকে। রাত গভীর হয়। একটা বাজলে রঘুনাথ সিংহ রিসালদার আসেন দুলহাজুকে নিয়ে। খুদাবক্স ও মোতিকে ছুটি দিয়ে দেন। দুলহাজু বসে খুদাবক্সের জায়গায়। রঘুনাথ সিং বলেন, কাল সকালে জোর লড়াই লাগবে। প্রথম ব্রিগেড এসে পৌঁছবে ভোরে। আজ রাতে কোন আক্রমণ হবে না। ঘরে যাও, আরাম করো খুদাবক্স, কাল থেকে আর ছুটি পাবে না।

ঘরের দিকে রওনা হয় খুদাবক্স ও মোতি। ফটকে ফটকে মিস্ত্রী কাজ করছে, রমণীরা পুরুষের পোষাকে যে যার ঘরে চলেছে। বড় বড় বালির বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়া। সেগুলি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে প্রাচীরের কোল দিয়ে। সহসা ঘোড়া থামায় মোতি। ইসারায় আসতে বলে খুদাবক্সকে। দেখে প্রায়ান্ধকার পথ দিয়ে আসছেন বাঈসাহেব। অন্যমনস্ক বোধ হয় তাঁকে। মোতিকে ও খুদাবক্সকে দেখে একটু অপ্রতিভ হাসি খেলে যায় তাঁর মুখে। বলেন,—খুদাবক্স খাঁ, আপনি শুনেছেন ত' আগামী কাল থেকে আসল লড়াই শুরু হবে।

—হাঁ সরকার।

—শুনলাম আপনি কানপুর, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ-এ লড়েছেন।

—জী।

—আমার সহরের কথা কি জানে লোকে?

—সূর্য উঠলে যেমন তার কিরণ প্রকাশ পায়, তেমনই আপনার নাম ছড়িয়ে গেছে সরকার।

খুদাবক্সের কণ্ঠের অকুণ্ঠ সত্যভাষণ রানীকে কৃতজ্ঞ ক'রে। ঘোড়ায় একটু লাগাম ঝাঁকিয়ে তিনি চলতে চলতে বলেন, বড় মহৎ এইসব সাধারণ মানুষ খাঁ সাহেব। আমার সুকৃতির চেয়ে তাদের মন অনেক বড়।

তারপর সহসা বলেন, অরছা দরওয়াজায় আমাদের এক বুড়ো নকীবের ছেলে মরে গেল মোতি গুলী লেগে। বড় দুঃখ লাগল বাপের কান্না দেখে। সামনে থাকতে পারলাম না। সন্ধেবেলা লেগেছিল চোট, মরল এখন। তাকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি মোতি...বালক বয়স থেকে!

সশ্রদ্ধ কণ্ঠে খুদাবক্স বলল, এখন'ত আরো অনেক হবে এইরকম সরকার।

—নিশ্চয়। তবু যুদ্ধ বড় কঠিন, অনেক জান নিয়ে যায়। জান ফিরে দেয়া'ত চলে না।

চলে যান বাঈ সাহেব। নগরীর অন্যদিক দেখাশুনা করতে। ছায়ার মতো অনুসরণ ক'রে কিছু ভীমমূর্তি পাঠান এবং আফঘান সওয়ার, রানীর একান্ত অনুগত তারা।

ঘরে এসে মোতি পুরোনো ধাঁচের একখানা হাল্কা লাল চন্দেরী পরে। সবুজ রেশমের চোলী পরে সঙ্গে। বেণী ঝুলিয়ে দেয়।

চিপার ওপর লক্ষ্ণৌ-এর চিকণের কুর্তা পরে খুদাবক্স। মুরেঠা ফেলে দেয়। চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুণীটা ভেঙে যায়। মোতি হেসে ফেলে। বলে, কি ছেলেমানুষী করছ?

মোতি যতক্ষণ সুর্মা পরে খুদাবক্স গালিচার ওপর পায়চারী ক'রে অধৈর্য হয়ে। বলে, কেন এত সাজছ মোতি, আমি ত' কবুল করেছি, আমি ঘায়েল হয়ে গিয়েছি।

অমনি অভিমান স্ফুরিত হয় অধরে নয়নে। মোতি বলে, কত যে কষ্ট দিয়েছ?

মোতির সামনে নতজানু হয়ে বসে খুদাবক্স। বলে, শাস্তি দাও।

কি বলবে মোতি। সুখ ও আনন্দে ছলছল ক'রে চোখ। বলে, তোমাকে শাস্তি দেব, আর নিজে সেই জ্বালা বুকে নিয়ে জ্বলে জ্বলে যাব? আর নয় খুদাবক্স।

ক্লান্তিতে পিঠ টান ক'রে খুদাবক্স। সন্ত্রস্ত হয়ে মোতি উঠে দাঁড়ায়। বালিশটা টেনে দেয়। বাতি দেয় নিভিয়ে। শুয়ে পড়ে খুদাবক্স। পাশে বসে তার চুলে আঙুল বুলিয়ে দেয় মোতি। খুদাবক্স হাত দু'খানা ধরে। বলে, তোমাকে সেই বাগানে কত কি বলেছিলাম, মনে পড়ে? সেই ছেড়ে যাবার সময়ে?

না, মোতির মনে পড়ে না। খুদাবক্স বলে, সেদিন যত কথা বলেছিলাম আমি, পরে ভেবে দেখেছি, তোমাকেই বলেছি। লেগেছিল, জ্বলে গিয়েছিল, তাই বলেছি। তুমি বলেই সব ক্ষমা করেছ মোতি।

—তোমার কোন আফশোষ নেই'ত খুদাবক্স?

—না। থাকলে তুমি শুনতে পেতে মোতি। খুদাবক্সের উষ্ণ বুকের শব্দ শুনতে পায় মোতি। বলে, দেখ খুদাবক্স, কত কেঁদেছি এক সময়ে, কত দুঃখ করেছি। না খোদা মানতাম, না কোন বিশ্বাস ছিল। এমন করেই পেলাম তোমাকে, এখন সবই ভালো মনে হয়, সবই বিশ্বাস করি।

—বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে জীবন মোতি—

—বড় ভাল লাগছে বাঁচতে।

—এমন সময় আর কখনো মিলবে না মোতি—

—না খুদাবক্স।

—এমন রাতে ঘুমোবে?

—না।

—কষ্ট হবে না?

—দিনে'ত আরাম করেছি।

—আমিও। দেখি এদিকে তাকাও'ত মোতি।

মুখ তোলে মোতি। স্থির আর শান্ত তার মুখ। গভীর তার চোখ। খুদাবক্স বলে, আগেকার মন হলে কত কথা বলতাম মোতি, এখন কামান সামনে নিয়ে সে কথা কি মানাবে?

—হাঁ খুদাবক্স, কেন কি পরে'ত সময় না-ও মিলতে পারে। তুমি আর আমি এক-সঙ্গে'ত না-ও থাকতে পারি।

—না মোতি, আর কখনো তুমি আর আমি দূরে থাকতে পারবো না। তোমার মধ্যে আমি রইলাম, আমার মধ্যে তুমি রইলে।

—আরো বল খুদাবক্স।

—তুমি বল মোতি।

—তুম ভয়ে মোতি, ময়ঁ ভয়ে ধাগা
তুম ভয়ে সোনা, হম ভয়ে সুহগা—
পিয়া মৈঁ নহীঁ তোড়ুঁ
তোরী প্রীত তোড়ী কিণ সংগ জোড়ুঁ॥

—নিজের কথায় বল মোতি—

—আমার সব কথা তুমি জান খুদাবক্স, কি বলব।

—কিছু বোল না মোতি, এখানে থাক চুপ ক'রে, আমার কাছে।

আঁধার ঘর। অনিশ্চিত আগামী কাল। তবু প্রেম মুখর হয়ে ওঠে। অশ্রুত রাগরাগিণী বেজে ওঠে, প্রিয়াকে বুকের কাছে ধরে রাখে খুদাবক্স। আনত মুখ তুলে সস্নেহে আদর করে চোখে, মুখে, কপালে। ঝঞ্ঝার মত বাতাস বয়ে আনে ধুলোর গন্ধ। খুদাবক্স বলে, পাগলা রাত!

হয় ত' তাই-ই। তবু বড় মধুর আর সুন্দর। মোতি বালিশে হেলান দেয়। খুদাবক্স বলে, একি অপমান মোতি? এমন একখানা বুক পেতে দিয়েছি, চওড়া বাহু দিয়েছি বিছিয়ে, তাতেও হল না?

মোতিকে বাহুবন্ধনে কাছে টানে খুদাবক্স। বলে, দূরে থেকো না মোতি। তুমি'ত জানো না এ আমাদের বিয়ের রাত।

—কবে হ'ল?

—অনেকদিন আগে। সে তোমার মনে নেই। তুমি তখন খুব ছোট। নাকে নথ পরতে, আর মল বাজিয়ে ছুটে পালাতে আমাকে দেখে।

—সত্যি খুদাবক্স, কতগুলো দিন হারিয়ে গেছে বল'ত? এমন সময় খুঁজলে তুমি, যে সময় মিলল আখরী সময়ে।

—বারে! ভাল সময় না হলে কি হয় মোতি? ঠিকানা'ত তুমিও জানতে, এলে না কেন আমার রিসালা হল্‌টে? কত রাতে তোমার পায়ের মলের বাজনা শুনেছি মোতি, তোমার কথা পেয়েছি বাতাসে।

খুদাবক্সের গলায় কোন অভিযোগ নেই। মোতি মুখ লুকিয়ে বলে, মল পরব খুদাবক্স, এইদিন কেটে যেতে দাও, যেমন ক'রে রাখবে তুমি, তেমনি থাকব, যা পরতে বলবে, তাই পরব। শুধু আমি কি করেছি সে কথা বোল না। আমি সহ্য করতে পারি না।

খুদাবক্সও সে কথা বলে না। মোতিকে বুকের কাছে রেখে তার হৃৎস্পন্দন শোনে আর অবাক মানে। এত পূর্ণ তার প্রেম, তবু এই বুভুক্ষা? কোন্‌ পূর্ণতা চায় সে? কোন্‌ স্বর্গ কামনা ক'রে? তার রক্তকণিকা আহ্বান ক'রে মোতিকে। মোতির উষ্ণ ও কোমল দেহ, চঞ্চল ক'রে খুদাবক্সকে। ক্ষুধিত, ও পিপাসিত প্রেম জাগে।

মদির হয়েছে মোতির সুরভিত কেশ, গ্রীবা, কপোল, অধর। আত্মসমর্পণের বাসনায় আকুল হয়েছে তার দেহ। প্রিয়তমের বক্ষে লীন হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে মোতি, শত শত পাঁপড়িতে ফুটে উঠতে চায়।

খুদাবক্স বড় সম্মান দেয় তার প্রেমকে। বড় মর্যাদায় গ্রহণ ক'রে তাকে।

সপ্রেমে চেয়ে থাকে মোতি। অতল রহস্যের সরোবর যেন তার কালো চোখ। মন বলে, আমার দেহ আজ দেহ বলে মানলাম, গৃহ হল ধন্য। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে বুকে রেখে তৃপ্তি নেই জন্ম জন্ম ধরে দেখে আঁখির পিপাসা মেটে না, একি অবাধ্য, অনায়ত্ত, পিপাসিত প্রেম?

খুদাবক্স অল্প হাসে। তার হাতখানা নিজের কপালে রাখে। তার নয়নই জানায় যে ধন্য হয়েছে সে।

যুগ্মহৃদয়ের তালে তালে কোন সঙ্গীত রচনা হয়। এ যদি কথা ত' ও সুর। এ আলাপ ত' ও বিস্তার।

শেষ প্রহর উত্তীর্ণ হলে উঠে পড়ে মোতি। খুদাবক্সকে স্নানের সাহায্য ক'রে। পায়ে পরায় নাগরা। কোমরে কোমরবন্ধ বেঁধে দেয়।

ইংরেজ শিবির থেকে বিউগ্‌ল শোনা যায়। ঘোড়া দুটোকে ঘাস দেয় খুদাবক্স। অধৈর্য হয়ে ডাকে মোতিকে।

—আই জনাব! বলে হাসতে হাসতে নেমে আসে মোতি। বলে, বাদশাহী মেজাজ হয়েছে দেখ্‌ছি।

—আর কি দেখছ?

—দেখ্‌ছি বাহার দেবার সখ। বলে লাফিয়ে ঘোড়ায় ওঠে মোতি। রাস্তায় বেরিয়ে নিজের নিশানায় চলে যায়। হাত নেড়ে হাসিমুখে বিদায় জানায়।

প্রত্যুষ তখনো কাটেনি, সাগর দরওয়াজায় গিয়ে বসে খুদাবক্স। চৌখুপি দিয়ে দেখে, তার দরওয়াজার সামনেই অনতিদূরে সুউচ্চ ইংরেজ ব্যাটারী। যতদূর চোখে পড়ে, ব্যাটারী আর মোর্চা। কাতারে কাতারে সুসন্নিবেশিত ইংরেজ ফৌজ।

কামানের পাল্লা ঠিক ক'রে খুদাবক্স। সারি সারি সৈন্য প্রাচীরের চৌখুপিগুলোতে বন্দুক সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সামান্য আলো ফুটতে না ফুটতেই কেল্লা থেকে ঘোসের হাতে গর্জন ক'রে ঘনগর্জ। সঙ্কেত মেনে খুদাবক্স পলতেতে অগ্নি সংযোগ ক'রে। গর্জন ক'রে ওঠে নলদার। ইংরেজ ব্যাটারীকে গোলার আঘাতে আঘাতে এমন বিপর্যস্ত ক'রে খুদাবক্স যে সন্ধ্যা নাগাদ থেমে যায় ব্যাটারী। গোলার টুকরো লেগে খুদাবক্সের বাঁ হাত একটু জখম হয়। চৌকি ছেড়ে উঠে আসে। বাহ্‌রাম হাতখানা বেঁধে দেয়। শত্রু-পক্ষের কামান গর্জন ক'রে ওঠে অতর্কিতে। দ্রুত ছুটে নিজের চৌকিতে চলে যায় খুদাবক্স। আগুনের মত লাল গোলা এসে পড়ে সহরে। আগুন জ্বলে যায়। ঘোড়ার হ্রেষা ও আহত নরনারীর আর্তনাদ শোনা যায়। তার চৌকিতে কামানের কাছে কেউ নেই। সহকারী পাশে পড়ে আছে।

চৌকিতে বসে নিশানা ঠিক ক'রে খুদাবক্স। বাহ্‌রাম হাতে হাতে গোলা ও বারুদ তুলে দেয়। সাগর দরওয়াজার কামানের হিম্মৎ দেখে লছ্‌মী ও স'ইয়ার দরওয়াজার সাময়িক বিভ্রান্তি কেটে যায়। কেল্লা থেকে ঘনগর্জ, গরনালা ও কড়কবিজলীর ভীমগর্জনে আকাশ কাঁপতে থাকে। স্থির লক্ষ্য হয়ে খুদাবক্স মশাল জ্বালিয়ে অগ্নি সংযোগ ক'রে। ইংরেজ পক্ষের কামানের হাল্কা গোলা শূন্যে উড়ে এসে পড়ে। আগুন জ্বলে ওঠে। সাগর দরওয়াজার সামনের ইংরেজ ব্যাটারী ক্রমে নিরুত্তর হয়ে আসে।

এই সুযোগ। খুদাবক্স হিংস্র একাগ্রতায় গোলা ছুঁড়তে থাকে একটার পর একটা। ওদিকে কেল্লা থেকে এল উল্লাসের চিৎকার। ঘোসের গোলার আঘাতে শঙ্কর মন্দিরের ব্যাটারী ভেঙে গেছে। এবার পিছু হটতে লাগল ইংরেজ ফৌজ।

তপ্ত কামান। ধোঁয়া বের হচ্ছে মুখ দিয়ে। সে রাতে নিজের চৌকি ত্যাগ করল না কেউ। চারিপাশে তাকিয়ে নিজেদের অসুবিধা বুঝতে পারল খুদাবক্স। ইংরেজরা বাইরে, তারা ভেতরে। ঘনবসতি সহর। ওদের গোলাতে এ পক্ষে আগুন লাগছে যত, মানুষও মরছে তত। ঘাসে আগুন লাগলেই মুস্কিল। তা' ছাড়া জলের প্রশ্ন আছে। আর

অভাব দেখছে সে সুনিপুণ গোলন্দাজের।

রাত বারোটা বাজলে চৌকিতে চৌকিতে খাবার পেঁছতে লাগল। তার চৌকিতে এল মোতি। বলল, আজ রাতে তুমি সঁইয়ার দরওয়াজায় চলে যাবে খুদাবক্স, সেখানে নতুন ব্যাটারী পড়েছে। এখুনি শুনে এলাম।

চৌখুপীর মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে কামানের নল। কামান বসাবার চৌকিটাতে উঠবার কয়ধাপ সিঁড়ি। সেখানে পাশাপাশি বসে মোতি আর খুদাবক্স। খুদাবক্স বলে, আজ কোথায় ছিলে মোতি?

—কেন? আমি'ত বরাবরই দক্ষিণবুরুজে থাকি। ওস্তাদের কাছে।

—কিরকম লাগছে মোতি?

—ভাল।

—আজ রাতেও কি কেল্লায় যাবে?

—না, আমি'ত সকাল থেকেই ছিলাম, এখন ছুটি নিয়ে এলাম। বাহ্‌রাম ভাই কোথায় গেল? কেল্লায়?

—তাই হবে।

—বড় ভালো লাগে মোতি তোমার মুখে ভাই শুনতে।

—আমার ভাইয়ের মতই কাজ করেছে বাহ্‌রাম, তুমি চলে যাবার কয়দিন পর থেকেই। বড় ভালো ছেলে। আর, সকলেই'ত ভাই আর বহিন হ'য়ে গেছে, দেখেছ'ত?

—হাঁ মোতি। বড় চমৎকার পরিবেশ। সবাই একই ধেয়ানে ব্যস্ত, একই জমিতে লড়ছে, বড় সুন্দর এই ভাব।

—কোন আফশোষ আর রইল না খুদাবক্স।

—না মোতি। যখন ভাবি, কোথায় কোন্ কিষাণ ঘরের ছেলে ছিলাম, কি জীবন কেটে যেত বল। আমার জীবন আর জওয়ানী থাকতে থাকতেই কত পেলাম দেখ। দেশকাল হয়ে গেল অন্য রকম। লড়বার সুযোগ পেলাম, বাপের কাছে কথা দিয়েছিলাম বদলা নেব, সে সুযোগও এমন ক'রে মিলে গেল, এই লড়াইটাই আমার কাছে সেই বদলা হয়ে গেল। কত দেশ দেখলাম, কত মানুষকে জানলাম, আবার দেখ, সবচেয়ে বড় ক'রে পেলাম তোমাকে। জীবন আমাকে অনেক দিল মোতি। এক জীবনে কি এত কেউ পায়? যদি এই দিন কাটাতে পার মোতি, তবে খুব কৃতজ্ঞ থাকবে।

মুখে কিছু বলে না মোতি। মনে মনে বলে—আমার নতি স্বীকার আর কৃতজ্ঞতা সবই তোমার কাছে। এক জীবনে আর অন্য কোন চরণে নত হব বল। জীবনের কাছে! সে একশোবার কিন্তু আমার দুই চোখে যে তোমাকে ছাড়িয়ে আর কিছু চোখে পড়ে না খুদাবক্স।

একবার চুরি ক'রে দেখে নেয় মোতি। অন্যদিকে চেয়ে আছে খুদাবক্স। চওড়া কাঁধ, গৌরবর্ণের ওপর একটা রোদে পোড়া তামাটে ভাব, লোহার জালের ওপর পাতলা কাপড়ের মুরেঠা বাঁধা, কপালে ঈষৎ ঘাম, পাতলা দাড়ি হয়েছে দুইদিন অবহেলার ফলে। নীল কুর্তা, তার ওপর তার হাতের কাজকরা বান্দি। হাতে, গলায়, মুখে, যথেষ্ট তেল, কালি, ও ময়লা লেগেছে। খুদাবক্সের চোখ আর ভুরু খুব সুন্দর, আর কি চমৎকার মুখ—সহসা খুদাবক্স বলে, হ্যাঁ, আমার বাবা খুব সুন্দর ছিল।

খুব লজ্জা পায় মোতি। তার দু'খানা হাতই ধরে ফেলে খুদাবক্স। বলে, এবার

লজ্জায় কোথায় মুখ লুকোবে মোতি?

বিব্রত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয় মোতি। লজ্জিত হেসে বলে, খুব লোক ত' তুমি?

—আর তুমিও'ত খুব নিলাজ মোতি।

—তা' বলতে পার। বলে একটু গম্ভীর হয় মোতি। বলে, তা' বলতে পার খুদাবক্স। কিন্তু এই সময় কি লজ্জা আর ভয় করবার? কি জন্যে আমি লজ্জা করব খুদাবক্স, আমি'ত কোন অন্যায় করিনি। লোকলজ্জা আর ভয় করেছিলাম একবার। তাতে তোমাকেই ছাড়তে হল। লোকলজ্জা আর সম্মান দিয়ে আমি কি করব বল। এখানে? সবাই জেনেছে আমার কথা। অন্য কেউ কিছু মনে করে না খুদাবক্স, কি সময় দেখ, বাতাসে বারুদের গন্ধ, ঘরে ঘরে হাহাকার, আর আমাদের এই লড়াই!

আবেগে নয় ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে মোতি। তার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানায় খুদাবক্স। বলে, বাঙালী ডাক্তার গাঙ্গুলীবাবুর কথা তোমাকে বলেছি মোতি?

—পরিচয়ের কথা বলেছ।

—ডাক্তারবাবুকে শেষ আমি দেখলাম আগ্রাতে। তাঁর রেজিমেণ্টের খবর নেই, কিছু আহত ফৌজ ফেলে রেখে তারা পালিয়েছে। সহরের বাঘী পল্‌টন, বাঙালীদের ওপর ক্ষেপে গেছে। ডাক্তারবাবু রেজিমেণ্টের লোক, তবু তিনি তাঁর হাসপাতাল ছেড়ে এলেন না। বললেন, আমি ডাক্তার আমার কাজ রোগীর সেবা করা, দুই পক্ষের রোগীদের নিয়েই তিনি হাসপাতাল করলেন, প্রাণের পরোয়া করলেন না। বড় শ্রদ্ধা হয় তাঁর কথা ভাবলে। শেষ পর্যন্ত তাঁর পুরোনো রেজিমেণ্টের ছোট সাহেবই মারল তাঁকে বিশ্বাঘাতক বলে। কম কথা বলতেন, খুব হিম্মৎ রাখতেন, আর মন ছিল উঁচু। এরকম মানুষ আমি খুব বেশী দেখিনি মোতি। খুব সাঁচ্চা ইস্পাত ছিল তাঁর মধ্যে।

—বড় ভাল লাগে খুদাবক্স ভালো মানুষের কথা শুনলে। মনটা ভালো লাগে।

--আর কি ভালো লাগে মোতি?

জবাব দিতে গিয়ে মোতির গলার স্বর নীচু হয়ে যায়। বলে, আর ভালো লাগে প্রত্যেকটা মুহূর্ত জেগে থাকতে। ঘুমিয়ে পড়তে মন চায় না, পাছে হিসেব হারিয়ে ফেলি কোনো মুহূর্তের।

খুদাবক্স তার কাঁধে হাত রাখে। বলে, তুমি যখন ঘুমিয়েছ মোতি, তখনকার হিসেব জেন আমার কাছে পাবে। আমি কিন্তু একটা মুহূর্তও হারাইনি। গত কয় বছরের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর তা'হলে দেখবে সবগুলো মুহূর্ত ধরা আছে আমার মনে। দেহ ঘুমিয়েছে ত' মন ঘুমোয়নি। ধ্যানে তোমার কথা ধরে রেখেছি আর কতবারে কত সজ্জায় যে সাজিয়েছি মুখখানা। কখনো ঐ নাকে হীরের ফুল বসিয়ে দেখেছি, কখনো পরিয়েছি কালো জামাকাপড়, রুপোর গহনা পরে তোমাকে জল আনতে দেখেছি আমার ঘরের পেছনের চুণারকি নদীতে। একদিন এক বিয়ের যাত্রী দেখে মনে হয়েছিল, হলুদকাপড় পরে কোনদিন পালকীতে বসে যদি আমার ঘর চিনে চিনে এসো, তা'হলে বেশ হয়।

মোতি প্রিয়তমের মুখের দিকে সপ্রেমে চায়। বলে, তুমি'ত আমার মহারাজ, আমাকে যেমন রাখবে আমি তেমনি থাকব।

—আর তুমি কি মোতি?

—তুমি যা বলবে তাই খুদাবক্স।

খুদাবক্স হাসে। বলে, মনে হয় কি তামাম দুনিয়াকে জানান্ দিয়ে দেই মোতি।

নকীব দিয়ে পুকার লাগিয়ে দিই কি আমার সৌভাগ্যের কথা জেনে যাক সবাই।

—তুমি পাগল।

—হাঁ জী হাঁ, সবাই জানুক পাগল খুদাবক্স আর তাকে পাগল করেছে মোতি। তখন তোমাকেই দোষ দেবে সবাই।

—বলবে আমি নাচওয়ালী, তাই'ত? মোতির কথায় কিন্তু সেই পুরানো দিনের ঘটনার প্রতি কোন কটাক্ষ থাকে না। খুদাবক্স বলে, হ্যাঁ মোতি। তুমি যদি নাচওয়ালী হও তোমার নাট আমি, তোমার পায়ের আওয়াজও আমার বুকে বাজবে, আর তোমার কদরবান দর্শকও আমি। আমার চোখে তোমার তারিফ থাকবে। জীবন দিয়ে নামওয়ারী ক'রে যাব মোতি, আর কারো তারিফের অপেক্ষা রাখব না।

মোতির সুখ পলকে থরথর ক'রে কাঁপিয়ে তোলে নিশীথকে। রাত কথা কয়ে ওঠে তারার ভাষায়। মোতি বলে, কিছু চাইব না খুদাবক্স, শুধু চাইব যে তোমার ধ্যান ধরে যেন দুনিয়া দেখতে দেখতে তোমার ধ্যানেই চলে যেতে পারি। বল আর কি চায় মানুষ?

—আমি ত' আর কিছু চাই না মোতি। যা মিলল, তা' পিয়াসা ভরিয়ে দিল, তবু পিয়াসা রয়ে গেল, তাই আরো মিলবার সম্ভাবনাও রয়ে গেল। মনে মনে মালা গেঁথে তোমার গলায় পরালাম, আর সেই মালা দেখ জানি না কখন আমারি গলায় দুলছে। তাই ভাবি তবে কেন এই কথা ভেবে মরব।

বীণা হয়ে কথাগুলো বুকে ধরে মোতি। রাত কেটে যায় সেই আসরে বাসর জাগিয়ে।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ক'রে সংগ্রামের আর একদিন সুরু হল। ভোরের মুখে চৌকিতে চৌকিতে দেখে সজাগ ক'রে দিয়ে চলে যান রিসালাদার সর্দাররা। উঠে দাঁড়ায় মোতি। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়। স্মিত হাসিতে বিদায় জানায়। খুদাবক্স বলে, লড়াই চৌথা দিনে পড়ল।

—জী হাঁ।

—উমীদ করি যে সন্ধ্যায় দেখা হবে। আর যদি কোন বেওকুফ্ ফিরিঙ্গীর অবাধ্য গোলা এসে স'ইয়ার দরওয়াজায় পড়ে, চাই ওস্তাদের পাহারা কাটিয়ে তোমাকেই নিয়ে নেয়, তবে কি করবে মোতি?

—খুশী মনে চলে যাব।

—তাই এস, বিদায় জানাই মোতি, যে সময় হলে যেন কোন আফ্‌শোষ না জানাই।

—খুদা হাফিজ, যখন মিলব খুসীর সঙ্গে মিলব।

—খুদা হাফিজ—

বালক সেনানীর মত আরবী ঘোড়ার পিঠে চলে যায় মোতি। যেতে যেতে মাথা ফিরিয়ে মিষ্টি হেসে একবার হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে যায়। জবাব দেয় খুদাবক্স। তারপর পথ ধরে স'ইয়ার দরওয়াজার। ততক্ষণে কেল্লা থেকে ঘনগর্জ-এর গম্ভীর নিনাদ আসছে। গরনালার গোলা তীব্র শীৎকারে গিয়ে পড়ছে ইংরেজ ব্যাটারীতে। বিপক্ষের মর্টার ও হাউইৎজারের গর্জনও আসছে।

সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত। প্রতিরোধ সংগ্রাম অষ্টম দিবস উত্তীর্ণ হয়ে নবম দিবসে এল। মনে হয় যুদ্ধ এবার তার চক্র আবর্তন শেষ করবে।

শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। হতাহতের সংখ্যাও প্রচুর। এখন যেন বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধের ফল কি হবে না হবে।

সুমহান প্রতিরোধ সংগ্রামের ভাগ্য পশ্চিম দিগন্তেই হেলে পড়ে। জ্বলন্ত দেশপ্রেম, নরনারীর অপূর্ব আত্মত্যাগ, মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে প্রাণপণ সংগ্রাম, সব ব্যর্থ হতে চলেছে। বিদেশী প্রতিপক্ষের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। নগরের পাষাণ প্রাকারে ফাটল ধরেছে। ঘনবসতি বাড়ীগুলি জ্বলে যাচ্ছে। সহস্রাধিক নরনারী নিহত।

আসন্ন পরাজয়ের প্রায়ান্ধকার পটভূমিকায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে সংগ্রামী নরনারী। মৃত্যু দ্বারে অপেক্ষমান। জীবনের তুচ্ছ প্রশ্নগুলি বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তাই হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিগুলিই জেগে থাকে। জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি নিবিড় বন্ধন অনুভব করে। গভীর সখ্যতাৎ নিয়ে সম্ভাষণ করে প্রভাতে। সন্ধ্যাবেলাও যে সকলকেই দেখতে পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়। সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানকেই আঁকড়ে ধরে সবাই প্রতি মুহূর্তে বাঁচবার চেষ্টা করে। একনগরীতে একসঙ্গে এতদিন কাটিয়েছে তারা, তবু যেন বাঁচার মতো ক'রে বাঁচা হয়নি। আজকে তাই ক্ষমা, প্রীতি, প্রেম ও সহানুভূতি নিয়ে একে অপরকে দেখে।

সময় বুঝে গরম পড়েছে, ভরা ফাল্গুনের ডালায় বসন্ত সাজিয়েছে তার সওগাত। যুদ্ধ, মৃত্যু ও হত্যার পরোয়া না করেই প্রাণবন্যার শত স্বাক্ষর বহন ক'রে ফুটে উঠেছে পলাশ। শান্তির সময় হলে এমন দিনেই হোলির উৎসব হত। আবীরে কুঙ্কুমে আঙিয়া রাঙিয়ে হোলি খেলত নরনারী। আজ হোলি খেলতে নেমেছে মৃত্যু। লালে লাল ক'রে দিয়েছে দিনগুলো, তবু সে হোলি খেলার বিরাম নেই। এ উৎসবের নহবৎখানায় আজ ললিতবসন্ত বাজছে না। অশ্রুত কোন নাটে বিসর্জনের বিদায়ী সঙ্গীতের সুর পুকার দিয়ে উঠছে থেকে থেকে। আবাহন হতে না হতেই বিসর্জনের সময় হয়ে গেল এবারকার মতো। আজ সংগ্রামের নবম দিবস। মনে হচ্ছে এ যেন তিথি নবমী। এবারকার মতো বাতি নিভিয়ে আসর ভাঙার খেলাই খেলতে হবে। জম্‌জমা ক'রে উৎসব আর জম্‌বে না। নাট বন্ধ করবার এত্তেলা যেন পেঁছে গিয়েছে।

প্রভাত হল। সূর্য উঠল পূর্বগগন প্রতিভাত ক'রে। অবরুদ্ধ নগরীর বুকে ধ্বংসের ছবিখানাই ফুটে উঠল সূর্য কিরণ সম্পাতে। ইঁট, কাঠ ও পাথরের ভগ্নস্তূপের পাশে মৃত দেহের স্তূপ, ক্ষত বিক্ষত আহত নরনারীর আর্তনাদ, ভয়ঙ্কর নীরবতার মাঝখানে সৈনিকদের স্ব-কর্তব্যে অবিচল থাকবার প্রস্তুতি শুধু চোখে পড়ে। গোলাবারুদের ভাণ্ডার ফুরিয়ে এসেছে। পানীয় জলের সঞ্চয়ও শুষ্কপ্রায়। নগরীর আকাশে চক্রাকারে পাক দিচ্ছে গৃধিনী শকুনী। বিপক্ষের কামান আজ একেবারে নীরব। নগরীর দুর্বল অবস্থা তারা জেনেছে। পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। এই নগরী ও তার প্রত্যেকটি নরনারীর ওপরে মৃত্যুর পরওয়ানা জারী হয়েছে। শুধু প্রবেশ করবার অপেক্ষা।

আশা নিরাশার অতীত কোন পাথুরে সংকল্পে বুক বাঁধল সংগ্রামী নগর। প্রত্যূষ থেকেই যে যার চৌকি গ্রহণ করতে ব্যস্ত হল। স্নান করল প্রত্যেকে, মন্দির ও মসজিদে বীরহৃদয়ের প্রণতি পাঠাল, তারপর স্ব স্ব স্থানে আসন গ্রহণ করল। বিপক্ষ তেমনই নীরব।

প্রভাতে স্নানান্তে নতুন পোশাক পরে চৌকিতে এলেন ঘোস। মোতিকে বললেন, ঘরে যাও বেটি, খুদাবক্সকেও ডেকে নিয়ে যাও। তৈরী হয়ে এসো।

সঁইয়ার দরওয়াজায় কামান সামনে নিয়ে বসেছিল খুদাবক্স। জবাহির সিংকে চৌকি ছেড়ে দিয়ে নেমে এল।

পরাজয়ের সম্ভাবনাতে থম্‌থমে আবহাওয়া। শ্মশানের মত নীরব। সৈনিকরা কম্বলে

জড়ানো মৃতদেহ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের চোখেও আশঙ্কার ছাপ সুস্পষ্ট।

বাড়ীতে পেঁছে খুদাবক্স অন্যমনস্ক গম্ভীর ভাবটা সরিয়ে দেয়। কুয়ো থেকে জল তুলে তামা ও পিতলের পাত্রগুলি ভরে বলল, নতুন কাপড় আনো মোতি। আজ খুব সাজব।

স্নান ক'রে ঘরে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স। বলল, স্নান ক'রে এসো মোতি, আজ তোমাকেও শিঙার করাবো।

নতুন পোষাক বেছে নিয়ে খুদাবক্স পরে। সাদা রেশমের যোধপুরী ও কুর্তা পরে। কপাল থেকে চুলগুলো আঁচড়ে পিছনে সরিয়ে দেয়। প্রশস্ত সুন্দর ললাটের ও কেশের মধ্যবর্তী রেখাটি সুস্পষ্ট হয়। মোতি বলে, কোন পোশাক পরব বল। খুদাবক্স বলে, লাল কিছু নেই মোতি?

লাল মেলে না। জর্দা রঙের ওপর সোনালী সুতোয় হংসমিথুন উত্তকীর্ণ করা বহুমূল্য কুর্তা ও সাল্ওয়ার বেছে দেয় খুদাবক্স। সোনালী, সবুজ, লাল ও পীলা রঙে কারুকাজ করা একজোড়া মুরেঠা বেছে রাখে।

মাটিতে আয়না দাঁড় করানো। তার সামনে বসে মোতি। খুদাবক্স সুর্মা পরিয়ে দেয়। মেহেদীর আরকে তুলি ডুবিয়ে রাঙিয়ে দেয় আঙুল। মোতি বলে, আতর আনব খুদাবক্স?

—কিঁউ নহীঁ?

শ্বেতমর্মরের কারুকার্য খচিত বহুমূল্য আতরের আধার। উজাড় ক'রে মোতির চুলে ও পোশাকে দেয় খুদাবক্স। নিজেও লাগায় সযত্নে। বলে, কিছু ফুল—

একমুঠো জুঁইফুল আনে মোতি তার বাগান থেকে।

বিছানায় মোতির বেনারসী বিছিয়ে দিয়েছে খুদাবক্স। ফুলগুলো তার ওপর ছড়িয়ে দেয়। মোতির হাত ধরে বসায় তার সামনে।

জাফরির ফাঁক দিয়ে যে সকালের রোদ আসে তার চিত্রবিচিত্র আলপনা পড়ে তাদের ওপর। অনিমিখ দেখে মোতিকে খুদাবক্স। ভাষার অতীত কোন্ অনুভূতিতে আছড়ে পড়ে মোতির হৃৎপিন্ড। গলায় স্বর ফোটে না। কোন মতে বলে, কেন এত সাজলে?

আঁখি অনিমিখ। স্বর নীচু, ওষ্ঠ উচ্চারণ ক'রে, আজ হোলি মোতি।

—কোন হোলি

—আমার আর তোমার হোলি। এমন ক'রে হোলিতে শানাই বাজছে মোতি শুনতে পাচ্ছ না? ভ্রমর আঁখিতে মুক্তা সঞ্চার হয় নিমেষে। খুদাবক্স বলে, আজকের দিনের বুকে কোন তাল বাজছে মোতি কান পেতে শোন। আমি'ত আখ্‌রী এক লগনের বাজনা শুনছি মোতি। চারিপাশে মৌতের কোনো পরওয়ানা আমার কানে নেই। এ দিন আমার কাছে সেই দিন, যেদিন আমার তোমার প্রথম দেখা হয়। আজকের হোলিতেও রঙ ঢেলে দিয়েছে মালিক, নহবতে পুকার দিয়েছে—আমাকে আর তোমাকে পাত্তা পাঠিয়ে দিয়েছে যে এবার খেলে নিতে হবে। বল মোতি, আজকের দিনেই'ত তোমাকে সাজাব।

ধুপের ধোঁয়ার চেয়েও ক্ষীণ সুরভি মোতির কণ্ঠে,—আরো বল।

—বলব মোতি, সব কথা আজ পুরা ক'রে দেব। এক ইনাম তুমি শুধু মঞ্জুর কর মোতি, হুকুম দিয়ে দাও, তোমার খুদাবক্স যেন শেষ অবধি তোমার নামকেই পুকার দিয়ে যেতে পারে।

বিন্দু বিন্দু মুক্তা ঝরে। খুদাবক্স বলে, এমন দিনে কাঁদবে তুমি মোতি? এখনো'ত সব কথা তোমাকে বলিনি।

—বল।

কোন গভীর আবেগে মন্ত্রোচ্চারণ করে খুদাবক্সের গম্ভীর কণ্ঠ, কোন কাজী এসে মঞ্জুর করাবে না, আমার তোমার সাদীতে, যত কথা তবে আমিই বলি—

—বল।

—তবে বল মোতি, আমার কথা শুনে বল, আর কোন আফশোষ নেই মনে,

—আফশোষ নেই মনে—

—যা মিলল তা' সেলাম জানিয়ে নিলাম, আর কোন পিয়াস রইল না।

—পিয়াস—

—বল বল মোতি!

—পিয়াস রইল না।

—তবে আর দেরী কিসের মোতি...।

মোতিকে কাছে আনে খুদাবক্স। বলে, কে আয়না ধরে আমাদের নজর করাবে মোতি, আমার চোখে তুমি দেখ।

অশ্রু-টলটল চোখে তাকায় মোতি। খুদাবক্স সমুদ্রের মত টানে তাকে। ঢেউ হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে মোতি। দেহে নয়, রক্তে নয়, সমস্ত সত্তায় গভীর যন্ত্রণা ও আনন্দের এক সুমহান মিশ্র অনুভূতি জাগে। আকাশ হয়ে ভালবাসে খুদাবক্স, ছোট পাখী হয়ে আশ্রয় নেয় মোতি। মোতি, মোতি, তার নাম তাকেই শোনায় খুদাবক্স।

তারপর সযত্নে তুলে ধরে প্রিয়াকে। গভীর ও একাগ্র যত্নে বিস্রস্ত প্রসাধন ঠিক ক'রে দেয়। চুল আঁচড়ে দেয়। অশ্রুলাঞ্ছিত চোখ মুছে সুর্মা পরায়, বেঁধে দেয় মুরেঠা।

তাকে সাজিয়ে দেয় মোতি, মুখ মুছিয়ে দেয়। পায়ে নাগরা পরায়, কোমরে কোমরবন্ধ বাঁধে, তার হাতের কাজ করা আঙিয়া পরায়, উষ্ণীষ বেঁধে দেয় লোহার জালের ওপর।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে খুদাবক্স বলে, আজ সারাদিন ধরে এক কথা স্মরণ রাখবে মোতি।...চিন্তা করবার কিছু নেই, না আমার জন্যে, না তোমার জন্যে। যেমন এক জিন্দিগী মিলেছিল, লাখো জিন্দিগীর সমান ক'রে দিলাম তাকে।...ভুলবে না।

—কভি নহীঁ।

অংগনে এসে ঘোড়ায় চড়ে দু'জনে। পথ যেখানে দ্বিধা হয়ে গেছে, সেখানে এসে স্বল্প উষ্ণীষ হেলনে অভিবাদন জানায় খুদাবক্স। মোতি চলে যায়, যতদূর তাকে দেখা যায়, খুদাবক্স দেখে। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পেঁছে যায় তার চৌকিতে।

তাকে দেখে নেমে দাঁড়ান জবাহির জী। বলেন, হুঁসিয়ার বেটা, দূরবীণ দিয়ে দেখলাম যত কামান সব তৈরী, ওদের ফৌজও তৈরী। কখন আক্রমণ করে ঠিক কি?

—জী। ব'লে নিজের চৌকিতে বসে খুদাবক্স। সহকারী দুইজনকে দেখে নেয়। দুইজনই ছোকরা। একজন একটু ভয় পেয়েছে বোধহয়। প্রায় নীরস কণ্ঠে বলে, কখনো চলে যেওনা চৌকি ছেড়ে।

—হ্যাঁ খাঁ সাহেব।

কামানের পাল্লা ঠিক আছে। গোলাবারুদ ঠিক আছে। বাঁ হাতটা বড় ব্যথা করছে। প্রয়োজনের সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা ত' করবে না?

নীরব, চুপচাপ শত্রু পক্ষ। তার অর্থই হুঁসিয়ারীর দরকার এই পক্ষে। বেশ, সে

হুঁশিয়ার আছে। খুদাবক্স জানে সঁইয়ার দরওয়াজার বাইরে ফাটল ধরেছে। মিস্ত্রীরা গতরাত্রিতে কাজ করতে পারেনি।

খুব ঠান্ডা মনে হচ্ছে তার নিজেকে। বুদ্ধি ঠিক আছে, মাথা ঠান্ডা আছে। খেয়াল ঠিক থাকবারই'ত দরকার বেশী।

বেলা কত হবে? দশটার বেশী নয়। কেল্লার দিকে একবারও তাকায় না খুদাবক্স। জানে মোতি তার চৌকিতে অবিচল থাকবে।

এইরকমই ছিল সেই হোলির সকাল। কি আশ্চর্য সেই লগ্ন যখন মোতিকে প্রথম দেখেছিল খুদাবক্স। দুই করপুটে তুলে ধরে একটি মুখ নিরীক্ষণ করবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। পরে কতদিন কত কবিতায় আর শ্যেরে সাজিয়েছিল সেই নাম খুদাবক্স, আজ সে কথার কিছুই মনে পড়ে না। জাগে শুধু দুই অক্ষরের একটি নাম—মোতি। দীর্ঘ বিচ্ছেদ ব্যবধানের সুদূর প্রান্তে যে প্রিয়নাম এক প্রিয়ার মতোই আঙিনার দুয়ারে নিশিভোর প্রতীক্ষা ক'রে থাকে।

আঠাশ বছরের জীবনের গত সাতটা বছর—যেদিন থেকে সে মোতিকে দেখেছিল · সমস্তটা পরিক্রমা ক'রে তার মন। কই, একটা দিন, একটা ক্ষণেও'ত মোতিকে হারায়নি সে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তার কাছে ছিল মোতি, তাকে ধরে রেখেছিল প্রেম দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে। সাদী আবার কেমন ক'রে হয়?

মোতি আর মোতি, দুই অক্ষরের এই একটি নাম ঘিরেই সে কত না গান রচনা করল। কোনো অবিচার কি সে করেছে মোতির ওপরে? কষ্ট দিয়েছে কি তাকে? কষ্ট দিয়েছে বা যত, পেয়েছেও তো তার চেয়ে বেশী। তাই সেখানে কোন ঋণ নেই। আর মোতির কাছে তার ঋণ কেমন ক'রে থাকবে? থাকলেও সে ঋণ শোধ করবে কি দিয়ে? হৃদয় মন দিয়ে? কিন্তু মোতি'ত আলাদা নয় তার থেকে। তা'হলে সেই হৃদয় মনের পুষ্পাঞ্জলি ফিরে এসে তো তার নিজের পায়েই পড়বে। সে কি কখনও হয়? নিজের কাছে কি ঋণ শোধ ক'রে কেউ? ক্ষমা চায়? সে সময়ই বা মিলবে কখন? তারচেয়ে কিছু অপরাধ তার থেকে যাক মোতির কাছে। ক্ষমা চাইবার একটা চির অবকাশ রয়ে যাক, সেই ভাল।

মোতি, মোতি আর মোতি! কত সুন্দর করেছ এই পৃথিবী ভগবান, কত প্রেম দিয়েছ মানুষের মনে, শিশুকে দিয়েছ পবিত্র সৌন্দর্য, কত মাধুরীতে সঞ্জীবিত করেছ তোমার আকাশ বাতাস মাটি। তোমার নাম ক'রে তোমাকে কি নতি জানাবে খুদাবক্স? মানুষকে সে বলে—খোদার রহমত তোমার ওপর বর্ষিত হোক। খোদাকে তবে মানুষের কথাতে নতি জানাচ্ছে খুদাবক্স। জানাচ্ছে তার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নতি! তোমার দিনান্তিক প্রাপ্য অর্ঘ ও নির্মাল্যের স্তূপে তাকেও তুমি চিনে নিও।

তার বাবা আর মা-র কথাও স্মরণ করল খুদাবক্স। আজ এই মুহূর্তে যখন তার বোধ হচ্ছে মন পূর্ণতম হয়ে উছ্‌লে উছ্‌লে পড়ছে, তখনই'ত প্রিয়জনকে স্মরণে আসে। আনোয়ারের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখের হাসি, পরীর মমতা মাখানো চোখের স্নেহদৃষ্টি মনে পড়ে খুদাবক্সের। আর মনে পড়ে একগোছা রুক্ষ চুল, যা কোনদিন বেণীর বাঁধন মানত না। মা আর বাবা'ত দেখল না মোতিকে। দেখল না যে, খুদাবক্সের যে জীবনের জন্যে তাদের ভাবনাচিন্তার অন্ত ছিল না, সেই জীবনকেই ভালবাসা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, বেদনা দিয়ে একেবারে ভরে দিল মোতি।

পিতার কাছে শপথ সে ভোলেনি, তাই এই সুযোগ এসেছে তার জীবনে। এক জীবনে সে মোতিকে পেল, আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পেল, এমন ক'রে ক'জন পায়? দুই পাওয়াই এক হয়ে গেল। পূর্ণ হয়ে গেল তার মন। অমৃতের আস্বাদ জানল সে।

আর ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, আফ্‌শোষ নেই।

বেলা বারোটা বাজে। এমনি সময় নেটিভরা যাবে স্নানে ও আহারে। এই আক্রমণের ক্ষণ। দূরবীণ নামিয়ে রাখলেন লেফটেনাণ্ট স্ট্রাট। গত আধঘণ্টা ধরে তিনি সঁইয়ার দরওয়াজায় নজর করছেন। চৌখুপির আড়াল দিয়ে স্পষ্ট চোখে পড়ছে গৌরবর্ণ সেই যুবক একাগ্র হয়ে নিশানা ঠিক ক'রে বসে আছে। গত আটদিন বড় জ্বালিয়েছে ছোকরা। এই কামানটা, আর কেল্লার কামান কটা যদি থামিয়ে দেওয়া যেত!

বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষের বিয়াল্লিশটা কামান একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠল। প্রথমে একুশটা, এবং পরে একুশটা, এই নিয়মে তারা অবিরত গোলাবর্ষণ করতে লাগল।

আশেপাশে গোলা পড়ছে, টুকরো টুকরো হয়ে মৃত্যু ছড়াচ্ছে, এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করে না খুদাবক্স। গোলার জবাবে গোলা ছোঁড়ে।

সঁইয়ার দরওয়াজার গোলা চালনা দেখে কেল্লাতে ঘনগর্জের পাশে দাঁড়িয়ে ঘোসের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মোতির দিকে গর্বের সঙ্গে তাকান তিনি। স্বীকৃতিতে মোতিও হাসে। ঘোস মহানন্দে কামান চালান আর বলেন, আমার বেটা আমার কিরকম নামওয়ারী করছে শুনছ মোতি?

—শুনছি ওস্তাদ।

—এই তো বেটার কাজ। বলেন আর অভিনিবেশ সহকারে ধূলিসাৎ করেন শঙ্কর মন্দির। বিপক্ষ বিপর্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে অন্য ব্যাটারীতে চলে যায়। মহাল্লাসে পুনর্বার গোলাবর্ষণ করেন ঘোস। এগিয়ে চলে যুদ্ধ।

বিকেলের সূর্য হেলে পড়ে। খুদাবক্সের মনে হয় সহসা শত্রুর ব্যাটারী থেকে একাধিক কামান তার দিকে গোলা ছুঁড়ছে। তাহলে ত' মুস্কিল। গোলার আঘাতে তার পঞ্চাশ হাত দক্ষিণে একটা চৌখুপি ভেঙে বড় ফাটল হয়ে যায়। এমনি সময় সেখানে একটা ছোট কামান এনে বসায় বাহ্‌রাম। কোন কথা না বলে পলতেতে আগুন ধরায়।

একজোড়া কামানের পালটা জবাবে সাময়িক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইংরেজ ব্যাটারী।

ঠিক সন্ধ্যার আগের মুহূর্ত। সহসা ছুটতে ছুটতে আসেন দেওয়ান রত্নকরণ। বাহ্‌রামকে বলেন, শীঘ্র কেল্লায় যাও বাহ্‌রাম। যাকে হয় নিয়ে এসো অরছা দরওয়াজায়। পায়ে চোট লেগেছে রহমৎ খাঁ সাহেবের। আমি এখানে থাকছি।

বাঁ হাতখানা টনটন ক'রে। পাল্লা ঠিক করতে অসুবিধা হয় খুদাবক্সের। সহসা গোলা এসে পড়ে পেছনে। ধোঁয়া আর গরম কাটলে দেখা যায় তার সহকারী ছোকরাদের মধ্যে একজন জখম হয়েছে। কিন্তু আর একজন কোথায় গেল? স্তম্ভিত খুদাবক্স দেখল নীচু হয়ে পাঁচিল ধরে ধরে সে পালাচ্ছে। বেওয়াকুফ্‌! খুদাবক্সের ধমকে সে কেঁদে ফেলল। বলল, হুজুর আমি পারব না! আমি পারব না!

সম্ভবত নতুন সৈনিক। কিন্তু দয়া দেখাবার সময় নেই। পিস্তল তুলে নিশানা করল খুদাবক্স। ভয়ে ভয়ে ফিরে এল সে। আতঙ্কে কাঁদতে লাগল আর কম্পিত হাতে গোলা

তুলে ধরল।

এমনি সময়ে তার পাশে এল মোতি। ঘোড়া মুখ ফিরিয়ে হ্রেষা করে ফিরে যেতে চাইছে। কথা ডুবে যাচ্ছে কলরোলে।—হুঁসিয়ার খুদাবক্স! ব'লে মোতি মাথা নীচু ক'রে ছুটে কাছে আসে। বলে, অরছা দরওয়াজায় যাচ্ছি।

—কোথায় যাবে মোতি? এখানে উঠে এসো। আমার ছোকরা ভয় পেয়েছে। এর হাতেই বে-কায়দায় গোলা ফেটে খুন হয়ে যাব! ওপাশে যাও। তাড়াতাড়ি করো...

মোতি গোলা তুলে দেয় হাতে। গোলা ছুঁড়েই মাথা নীচু করে। কামানের নীচে দু'জনে একটু হাসে। ইংরেজের গোলা এসে ফাটে কিছুদূরে একটা ঘাসের স্তূপে। নেচে ওঠে আগুন। ফাল্গুনের বাতাস তাকে ছড়িয়ে দেয়। পেছনের বাড়ীগুলো থেকে আর্তনাদ ওঠে। মৃত সওয়ার রেকাবে পা রেখে মাটিতে আছাড় খাচ্ছে। তাকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে আতঙ্কিত ঘোড়া।

—মোতি, ভয় করছে না ত'?

—না খুদাবক্স!

আবার ফেটে পড়ে গোলা। ভিজে বালির বস্তায় পড়ে বিকল হয়ে যায়। আগুনের আভার চেয়েও দীপ্ত হয় খুদাবক্সের মুখ কোনো অন্তরের আগুনে। বলে আর কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না মোতি!

আগুন জ্বলবার শব্দে কারা হাজার কণ্ঠে মোতির হ'য়ে পুকার দেয়, না—না—না!

তপ্তকামানে গোলা ভরে মশাল লাগায় খুদাবক্স। পাণ্ডুর দেখায় তার মুখ। দুই পাশের পাথর কাঁপে। গোলাগুলো অগ্নিপিণ্ডের মতো আকাশ দিয়ে আসে যায়। মাতাল আনন্দে হাসে খুদাবক্স। বলে, এর চেয়ে ভাল সময় আর কি মিলত মোতি?

—নহীঁ খুদাবক্স।

—মনে কর আখ্‌রী দিনে আমাদের সাদী হচ্ছে।

—হাঁ, জরুর।

নৈপুণ্যের সাথে লড়ে খুদাবক্স। মুগ্ধ হতে সময় পায় না। মোতি গোলা দেয়, বারুদের গুঁড়ো তোলে কাঠের চামচে, নতুন পলতে দেয়।

রক্তাক্ত সন্ধ্যা। কামান গর্জন ও মৃত্যু কলরোলে যেন পৃথিবীর অন্তিম দিবস সূচিত হয়েছে। খুদাবক্স আবার হাসে—কত আলো দেখেছ মোতি?

হঠাৎ ভীমনিনাদে যে গোলাটা সঁইয়ার দরওয়াজার নীচে ফেটে পড়ে, তার গর্জনে ডুবে যায় খুদাবক্সের কণ্ঠ—

ধোঁয়া কমতে মোতি দেখে সিঁড়িতে বসে পড়েছে খুদাবক্স। রক্তাক্ত তার দেহ। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলে, চালিয়ে যাও মোতি, বন্ধ কোর না।

অধর দংশন ক'রে মোতি পলতেয় আগুন দেয়। গর্জন করে কামান। এই ধোঁয়া ও মৃত্যুর ভেতর থেকে ছুটে আসে বাহ্‌রাম। খুদাবক্স বলে, একবার হাত বাড়াও বাহ্‌রাম!

কামান ছাড়তে পারে না মোতি। বলে, কোথায় লেগেছে খুদাবক্স? যন্ত্রণায় পাংশু মুখে খুদাবক্স বলে, ডান হাতে মোতি।

রক্তাক্ত ডান হাতখানা ঝুলছে। বাঁ হাত কামড়ে খুদাবক্স একটা চীৎকার বন্ধ করে। রক্তশূন্য মুখে নীল চোখ দুটো জ্বলে। বলে, এ-ও আখ্‌রী চোট্ নয়।

মোতি মশাল দেয়। খুদাবক্স পলতেটা লাগায়। গর্জে ওঠে কামান। কামানের পাশে ঝরে পড়ে খুদাবক্সের রক্ত। বাহ্‌রাম বলে, মোতি, আমি যাব আর আসব। কাউকে না আনলে কে খুদাবক্সকে কেল্লায় নিয়ে যাবে? তুমি পারবে'ত?

—পারব।...মোতি কামান চালায়। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কামানের গায়ে মাথা রাখে খুদাবক্স। অধর দংশন ক'রে। ঠোঁটে রক্ত ফুটে ওঠে। একটু হাসে। বলে, অনেক কথা দিয়েছ মোতি। ভুলবে না।

—কভি নহীঁ।

এবার মোতির কামানের জবাবে ক্রুদ্ধ প্রতিপক্ষ মরিয়া হয়ে ওঠে। বিপক্ষ পরাজিত হচ্ছে। কেল্লার জলের আধার দুপুরে উড়িয়ে দিয়েছেন স্ট্রাট। এখনো কি এই ধৃষ্টতা সহ্য হয়? তাদের গোলা এসে ফাটে ঠিক আগের নিশানায়। ধোঁয়া ও আগুনে জ্বলে যায় পরিবেশ। সংগে সংগে চলে আসে পরন্তপ ও বাহ্‌রাম। এবার গোলার টুকরো বিঁধেছে বুকে। তাজা রক্ত কলিজা ছিঁড়ে উঠ্‌ছে ঝলকে ঝলকে। অসহ্য যন্ত্রণায় জড়িয়ে যায় খুদাবক্সের গলা—মোতি!

কথা কইতে বুক ভেঙে যায় মোতির—কোথায় লেগেছে খুদাবক্স।

—মোতি! ব্যথার কথা বলে না, জখমের নিশানা দেয় না। শুধু মোতিকেই ডাকে খুদাবক্স। গলা জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, যেন মদ খেয়েছে সে!

—খুদাবক্স, ভাই...! পরন্তপ অসীম শক্তিতে তাকে তুলে ধরে ঘোড়ার পিঠে। পাশের ঘোড়ায় বসে মোতি তার বাঁ হাত ধরে। বাহ্‌রাম খুদাবক্সের চৌকি নিয়ে নেয়।

প্রত্যেকটা ঝাঁকুনীতে খুদাবক্স যন্ত্রণায় মাতাল কণ্ঠে বারবার ডাকে—মোতি, মোতি! বুকের ভেতরটা ভেঙে যায় মোতির। হৃৎপিন্ডটা কে যেন লোহার আঙুল দিয়ে ধরেছে, কাঁদতে দেবে না তাকে। পরন্তপের আঙুল ছাপিয়ে খুদাবক্সের রক্ত ঝরতে থাকে খুদাবক্সেরই কোলে।

কেল্লায় চূড়ান্ত কোলাহল ও বিভ্রান্তি। কামানের শব্দ এলোমেলো হাজারটা মানুষের ছুটোছুটি। বাগিচা বুরুজের নীচের ছোট কামরাতে খুদাবক্সকে একজন রিসালার সাহায্যে নামায় পরন্তপ। জল চাই, সাহায্য চাই, ছুটে চলে যায় সে। তার জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায় পাথরের দালানে।

রক্তে মাটি ভিজে যাচ্ছে। যতবার মোছে মোতি, ততবারই রক্ত ওঠে ফিনকী দিয়ে। এত রক্ত কোনখানে ছিল? মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মোতি। ডাকে,—খুদাবক্স!

মর দেহের চেতনার শেষ বাঁধনে সেই আহ্বান পেঁৗছে যায়। চোখ খোলে খুদাবক্স। অস্ফুটে বলে,—মোতি!

—এই ত' আমি খুদাবক্স!

—হাঁ মোতি। বলে কম্পিত বাঁ হাত দিয়ে বাতাস ছুঁয়ে আসে খুদাবক্স। মৃত্যুজয় ক'রে একটু নিমীলিত হাসে। বলে, মোতি...পুরা হো গিয়া।

সব পূর্ণ হয়ে গেল।

মৃত্যু খুদাবক্সের মুখে ঢেলে দিল প্রশান্তি। স্থির ক'রে দিল দেহ। বন্ধ ক'রে দিল চোখ। মাথা থেকে রক্তাক্ত উষ্ণীষ খুলে নিল মোতি। গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ছড়িয়ে পড়ল।

তার মুরেঠা ও খুদাবক্সের উষ্ণীষ খুলে ঢেকে দিল দেহ। স্নেহ, প্রেম ও বেদনার

অতীত গভীরতম কোন মূক অনুভূতিতে খুদাবক্সের উষ্ণ ললাট চুম্বন করল মোতি। মুখ ঢেকে দিল। তারপর বলল, খুদাহাফিজ খুদাবক্স।

সব শোধ। এবারকার মত সব শোধ হয়ে গেছে। তারপরে আরো কিছু রইল কি? বিভ্রান্ত, দিশেহারা প্রায় লঘু পদক্ষেপে মোতি এগিয়ে গেল। মাথার ভেতরটা তার একেবারে হাল্কা বোধ হচ্ছে, দেহে কোন অনুভূতি নেই। হ্যাঁ, আর একটা কাজ আছে। কি কাজ, কি কাজ? হ্যাঁ, ঘোসকে খবরটা পেঁছতে হবে। ঘোস রয়েছেন ঘনগর্জ-এর কাছে। কিন্তু ঘনগর্জ নীরব কেন?

ঘনগর্জ নীরব কেন? মোতির প্রশ্ন আর্ত চীৎকারে ফেটে পড়ল। তার জবাবে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন কঠোর হৃদয় প্রৌঢ় সৈনিক রঘুনাথ সিং রিসালাদার। ঘনগর্জ আর গর্জন করবে না। ঘনগর্জের গর্জন শেষ হয়ে গেছে। ছুটে চলল মোতি। ঠিক এই সময়েই চলে গেলেন ঘোস? হায় খোদা, এই কি তোমার ধ্যান ছিল?

ঘনগর্জ-এর পাশে বসেছিলেন রানী। রক্তবর্ণ পতাকায় ঘোসের দেহ আচ্ছাদিত। ঘোসের মাথা কোল থেকে নামিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর প্রাচীরে মাথা রেখে শিশুর মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন—

—আপ্ রোঁ রহী হ্যায় সরকার? বড় বিস্মিত হ'ল মোতি। কাঁদছেন রানী? রঘুনাথজী, দিলীপজী, জবাহির সিং, পরন্তপ, সবাই কাঁদছে? চুপ ক'রে আছে সবাই? এমনি ক'রে কি শোক করে? এই কি শোকের আদত? তাকে এত শেখালেন রানী, আর আজ তিনিই আসল আদত ভুলে গেলেন? মূর্খ সবাই, এরা বধির, এরা মূক! মোতি যা দেখতে পাচ্ছে এরা তা দেখছে না কেন? কেন এরা শুনছে না যা সে শুনতে পাচ্ছে? মেঘমন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে নির্দেশ, তবু ত' কেউ এগিয়ে আসছে না?

তুমি কি বলছ খুদাবক্স? এই রকম শোক কি চেয়েছিলে তুমি? এই আদত দিয়ে কি তোমার মর্যাদা করব!—কভি নহীঁ মোতি।

ওস্তাদ ঘোস খাঁ, আপনার আমার সম্পর্ক ত' হৃদয়ের গভীরে বাঁধা। বলুন আপনার ঋণ কি অশ্রুজলে শোধ দেব?—কভি নহীঁ বেটি।

এগিয়ে গেল মোতি। স্পষ্টকণ্ঠে বলল,—আপনারা পিছে যান। কিশোরজী আমার পিছনে যান। গোলা দিন, বারুদ দিন!

শ্রদ্ধা ও চেতনা যুগপৎ কশাঘাত ক'রে ফিরিয়ে আনল সম্বিৎ। এগিয়ে এলেন কিশোর সিং পরবার। গর্জন ক'রে উঠল ঘনগর্জ। স্তম্ভিত হল প্রতিপক্ষ। রজনী প্রথম যামা। শত্রুপক্ষকে আজ অন্তিম্ চোট্ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তবু কেমন ক'রে জবাব আসে? তারাও কামানের পাল্লা ঠিক করল।

গম্ভীর নিনাদে কাঁপতে থাকে আকাশ। আঁধার চিরে চিরে অগ্নিপিণ্ডের মত গোলা এসে পড়ে কেল্লায়। অশ্রুহীন চোখে লড়ে চলে মোতি। এই'ত ভাল হল খুদাবক্স। এতদিনে আমি তোমার খুব কাছে এলাম। আর কোন বিচ্ছেদ রইল না। কত গভীর আর সুন্দর তোমার প্রেম খুদাবক্স!

ইংরেজের গোলা এসে ফেটে পড়ে। স্থির সংকল্পের অগ্নিশিখা হয়ে মোতি যুদ্ধ ক'রে। কাপুটেকরীর ওপর ইংরেজের ব্যাটারী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

কত প্রেম দিলে খুদাবক্স, প্রেম দিলে আর আশ্রয় দিলে তোমার বুকের মধ্যে। এখন ত' তুমি আমার পাশে আছ। পাশে আছ, ঘিরে আছ, বাতাসে তোমার সৌরভ পাচ্ছি, তোমার

স্পর্শ পাচ্ছি আমার ললাটে, কপোলে, অধরে, তবে আর কোন্ আফশোষ খুদাবক্স!

কোন্ ভীমগর্জন শুনছি খুদাবক্স? অথবা এ কোন্ সংগীত? এত আলো আর এত শব্দ? কত উৎসব সজ্জায় সেজেছ খুদাবক্স? কত আগ্রহে উৎসাহ দিচ্ছ আমাকে?

আলো, আলো, আর আলো। এত আলো কোথায় ছিল? এই আলোর মন্ত্রে তুমি আর তুমি রইলে না খুদাবক্স, আমার হয়ে গেলে, একেবারে আমার মধ্যে মিলে গেলে।

দিনের আলোর মত ক'রে যে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হল, তার ধোঁয়া কমতে দেখা গেল মোতিকে। কামানের চাকার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। লালে লাল হয়ে গেছে চারিপাশ। ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল সবাই। রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন গ্রীবা ঢেকে দিল একজন।

মনে হল কোন কথা বলতে চাইছে মোতি। থর থর ক'রে কাঁপছে ওষ্ঠাধর। ঝুঁকে পড়ে পরন্তপ। জল দিয়ে ভিজিয়ে দেয় তার ওষ্ঠ। মোতি ফিস ফিস ক'রে বলল, বাহ্‌রাম, বাহ্‌রাম! পরন্তপের আদেশে একজন চলে গেল। অধরের পাশ দিয়ে ক্ষীণ ধারায় গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। মুছে নিল পরন্তপ। ছুট্‌তে ছুট্‌তে এল বাহ্‌রাম। ঝুঁকে পড়ে বলল—মোতি! মোতি!

—বাহ্‌রাম, বাগিচা বুরুজে ছোট কুঠরীতে খুদাবক্স আছে...

—হাঁ মোতি!

—তার পাশে রেখ...কথা দাও!

—হাঁ মোতি—

মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে বাহ্‌রাম। মোতি প্রায় শূন্য দৃষ্টিতে কাকে খোঁজে। সকলের মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার চোখ ফিরে আসে। তারপর চোখ বন্ধ ক'রে, একটু লজ্জা ও মধুর হাসি ফোটে ঠোঁটে। বলে,—আভি আঈ খুদাবক্স...

লগ্নপুরে গেল। আর কোন বাধা রইল না। এত বাধা, এত বিচ্ছেদ, এত প্রতীক্ষা সব পূর্ণ হয়ে গেল এই লগ্নে। খুদাবক্স আর মোতি, দুইনাম এক হয়ে গেল, দুই প্রাণ এক হয়ে গেল, বড় সমারোহে এই শেষ উৎসবে তারা মিলে গেল। মৃত্যু পরাজিত হয়ে অমৃতের রূপ নিল, আর কোন মহাচেতনায় সেই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করল মোতি আর খুদাবক্স।

মোতির অনিন্দ্য-শুভ্র মুখে, ঘনকৃষ্ণ আঁখি-পল্লবে, প্রবালরক্ত ওষ্ঠাধরে, নির্মল ললাটে এমন গভীর হয়ে ছড়িয়ে গেল সেই অমৃতের উপলব্ধি, যে দেখে ধন্য হল সবাই। অশ্রু মুছে ফেলল তারা।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পাশাপাশি কবর বানিয়ে নতুন ক'রে বাসর সাজাল বন্ধু সৈনিকরা। মহাল থেকে রানীর আদেশে বহুমূল্য রক্তবর্ণ জরী ও রেশমের আস্তরণ আনলেন রঘুনাথজী। শিবমন্দিরের বাগান থেকে উজাড় ক'রে পলাশ, বকুল ও জুঁইফুল এনে ছড়িয়ে দিল বাহ্‌রাম। তারপর সন্তর্পণ শ্রদ্ধায় বহন ক'রে আনা হ'ল দুইটি কাফন। পাশাপাশি দুইজন—খুদাবক্স ও মোতি।

লাল রেশমের আস্তরণে মুড়ে তরবারি ও পাশখুব সংগে দিয়ে দেওয়া হল। তারপর মুঠো মুঠো মাটি।

মাটির ওপর মাটি দিয়ে যখন সমাপ্ত হল সমাধি, তখন উঠে দাঁড়াল বাহ্‌রাম ও

পরন্তপ। মুরেঠা উন্মোচন করল। সঙ্গে সঙ্গে নগ্নমস্তকে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ালেন রঘুনাথ সিং, জবাহির, কিশোর, দিলীপ, জুহী। সকলের সম্মিলিত অশ্রুধারায় নিষিক্ত হল মৃত্তিকা।

নক্ষত্রখচিত নিশিথিনী, পুষ্পগন্ধে উত্তাল বাতাস, সকলে অশ্রুত এক মহান সঙ্গীতে শেষ প্রণতি জানাল।

শুধু স্থির হয়ে পরম মমতায় গ্রহণ করল মৃত্তিকা।

সেই চরম লগ্নে মৃত্যু আর বিচ্ছেদ রইল না। মৃত্যুকে জয় করল প্রেম। তাই মৃত্যু হয়ে গেল মিলনক্ষণ। মহামিলনের সেই শুভলগ্নে মৃত্যুকে কত তুচ্ছ ক'রে দিল জীবন। জীবনের জয়গান রচনা করে চলে গেল খুদাবক্স ও মোতি। সেই গান পরে অন্য অধরে স্ফুরিত হবে, অন্য কণ্ঠে ধ্বনিত হবে, আর দেশ, কাল ও সময়ের বাধা তুচ্ছ ক'রে দুর্নিবার ঝনঝনায় অনাদি অখণ্ডকাল বেজে চলবে। সেই সার্থকতাতেই সার্থক হল তাদের প্রেম। চরম পূর্ণতার বোধে বিলীন হল যে প্রেম তা'র কোন্ আফশোষ?

॥ সমাপ্ত ॥

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা

অশোক মিত্র

অজ-পাড়াগাঁ থেকে ধ'রে এনে একটা হাবা ছেলেকে ব্যস্তমুখর নগরের ভিড়ে ছেড়ে দাও; লেখাপড়া শেখানোর দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারেও না ভাবলে চলবে; শুধু সে ঘুরে বেড়াক নগরের রাস্তায় ঘাটে, দেখুক গাড়ি বাড়ি বিদ্যুতের ঝলক; এক মাসের মধ্যে অন্য মানুষ হ'য়ে যাবে সে, তার চলনে-বলনে-বুদ্ধিতে উজ্জ্বলতা ছুঁয়ে যাবে, তার দক্ষতা বাড়বে অনেকগুণ।

অত্যন্ত মেঠো কথা এটা, সাধারণ ভাবনাতেই যা ধরা পড়ে। এই প্রায়-তুচ্ছ সিদ্ধান্তটিকে ব্যবহার ক'রেই আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে মার্কিন ধনবিজ্ঞানী এ্যালীন ইয়ং অর্থনীতির একটি চমৎকার সূত্র বাতলেছিলেন। কোন দেশে যখন শিল্প-আলোড়ন দানা বেঁধে ওঠে, একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক কলকারখানার গোড়াপত্তন হয়, চারদিকে উৎপাদন আর বিনিয়োগবৃদ্ধির সমারোহ, তখন যে শুধু বিভিন্ন শিল্পের পারস্পরিক বিনিময়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মোড় ফিরে যায় তা নয়। এমন তীব্র কর্মব্যস্ততার ফলে আবহাওয়াই অন্যরকম হ'য়ে যায়; কারখানার নিশ্বাসে আকাশ আরক্ত হ'য়ে আসে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের প্রয়াসে প্রতি দিগন্তে একটি চকিত ভাব ছড়িয়ে পড়ে। লোকের মুখে মুখে অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে চিন্তা, বৈজ্ঞানিক সূত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক প্রণালী নিয়ে আলোচনা, হঠাৎ এক ধাপে সমাজের সামগ্রিক জ্ঞানের পরিমাপ অনেক উঁচুতে উঠে যায়। সাধারণ লোকের দক্ষতা বাড়ে, সাহসও সেই সঙ্গে; যা শুরুতে ছিল বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শিল্পের পত্তন, তা' রূপ নেয় এক বিরাট আশাবাদের মহীরুহে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রগতির বেগ ও বিস্তার দুটোই লাভবান হয়। জাতীয় উন্নতির এই যে গোপন কাঠি, ইয়ং তার নাম রেখেছিলেন potential indivisibility, যেহেতু এই সম্ভাব্য শক্তিকে জাগিয়ে তোলা যায় একমাত্র যদি একটি অখণ্ড, সমগ্র চেষ্টা হয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য।

অর্থনীতিকে বলা হ'য়ে থাকে 'হতাশার বিজ্ঞান'। কিন্তু আসলে জাতীয় চেতনায় সুদৃঢ় আশাবাদ সঞ্চার করতে না পারলে দেশের ধনসম্পদ, দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান, শিল্পবাণিজ্যের সম্ভার, সমস্ত কিছুই অসম্ভব। বিনিয়োগের প্রসার সর্ববিধ আর্থিক উন্নতির মূল সূত্র। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সাহস, ঝুঁকি নেবার মানসিক প্রস্তুতি, সংগঠনপ্রতিভা, এবং, অন্য সব কিছু ছাপিয়ে, দেশের লোকের ত্যাগস্বীকার করবার মতো প্রবণতা। এই প্রবণতা থাকতে পারে যদি লোকের মনে আশা থাকে, ভবিষ্যতের স্বপ্নে যদি তাদের বিশ্বাস থাকে। যেখানে অনীহা বা অনাস্থা, কর্মকর্তাদের হাজার উপরোধও সেখানে অসফল হ'তে বাধ্য। এ-উক্তির মানে অবশ্য এই নয় যে, যে-মুহূর্তে অনীহা এসে জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে, সঙ্গে-সঙ্গে হাল ছেড়ে দিয়ে শুভতর সংযোগের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। বরঞ্চ এ রকম অবস্থায় সমস্ত প্রাথমিক অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার লক্ষ্য হবে এ অনীহাকে জয় করা, জাতির সামগ্রিক চেষ্টার ফলে শতাব্দীর দৈন্যকে যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে লাঘব করা চলে এই সত্য সম্বন্ধে লোক-মানসকে নির্দ্বন্দ্ব করা।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে, স্বীকার করতেই হয়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমান্তরালতায় এ ধরনের লোকশিক্ষা বিস্তারের প্রচুর চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে, যদিও, সাম্প্রতিক কিছু কিছু ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, কোথাও কোথাও সে সাযুজ্য নিটোল হয়নি, অতএব অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটেছে।

এ রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমাদের দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিচার করা শ্রেয়। এই শতাব্দীর গোড়ায়, স্বদেশী আন্দোলনের সময়, গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ সত্যাগ্রহের মধ্যে, তিরিশ সালের সন্ত্রাসবাদ ও আইন-বিরোধী আন্দোলনের শীর্ষে, সবশেষে অগাস্ট বিপ্লবের সময় পর্যন্ত, একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ও আলোড়নের তীব্র প্রবাহ জাতির মেরুদণ্ড সদাশিহরিত রেখেছে। খবর-কাগজের ভাষায় এই উদ্দীপ্তিকে বলা হতো 'জাতীয়তাবোধ' এবং সন্দেহ নেই অনেক ধরনের খাদ মেশানো ছিল তাতে। তা'হলেও যে আশাবাদ বাদ দিয়ে জাতি উঠতে পারে না, তীক্ষ্ণ সংঘর্ষের আরক্ততার মধ্যে বাঁচতে পারে না, এগিয়ে যেতে পারে না, সেই আশার আবহাওয়া সে রকম বোধ থেকে জন্ম নিয়েছিল। স্বাধীনতালাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে উদ্দীপ্তি ফিকে হ'য়ে যায়, কিছুটা বিষাদ, কিছুটা অবসাদ, এমন কি কখনো-কখনো সর্বাঙ্গকম নাস্তিকতা সমাজের অনেক স্তরে ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে আচ্ছন্ন ক'রে আসে। কারণ অবশ্য অনেকগুলোই : যে-উৎসাহ জাতিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, তা রাজনৈতিক মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মধ্যে ঝিমিয়ে আসে; সে বিশেষ রূপ নিয়ে রাজনৈতিক মুক্তি এলো, অনেকের কাছে তা মেকি ব'লে মনে হলো, তাঁরা তাই নিজেদের বিযুক্ত ক'রে নিলেন; স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের শ্রী-সম্পদ সহস্রগুণ এমনিতেই বৃদ্ধি পাবে, এ রকম বাষ্পসর্বস্ব ধারণা নিয়ে যাঁরা এতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁদেরও উত্তেজনায় ছন্দপতন ঘটল। প্রাক্-স্বাধীনতা জাতীয় আন্দোলনের সম্ভবত জাদু ছিল এটাই যে যেহেতু তার কল্পনা খুব অস্পষ্ট ছিল, সকলেই নিজের মনের মাধুরী দিয়ে তা পূরণ ক'রে নিতে পারত, পূরণ ক'রে নিয়ে সুখী থাকত, উৎসাহে তদ্গত হ'তে বাধা পড়ত না তাই। যে মুহূর্তে সে কল্পনাশ্রিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ক্রান্তিসময় এলো, ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল জাতির সামগ্রিক উৎসাহবোধ।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক হ'য়ে থেকেছে, অন্তত গত দশ বছরের কথা বলা চলে, লোকমানসের এই নিরুৎসাহবোধ। ধনবিজ্ঞানের সাধারণতম সূত্র এগুলো যে জাতীয় বিনিয়োগের হার বাড়াতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে হবে, অন্যথা জাতীয় উপার্জনের হার একই রকম থেকে যাবে, উন্নতির সব রাস্তা বন্ধ। বিনিয়োগবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হলো নিবৃত্তি, নিবৃত্তি থেকেই কৃষিতে-শিল্পে-বাণিজ্যে অধিকতর নিযুক্ত করা চলে এমন সম্পদের সংস্থান হওয়া সম্ভব, তা থেকেই গড়পড়তি উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি। দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির গোড়ার কথা তাই নিবৃত্তি-দর্শন। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ এই দর্শনে সমাহিতির সঙ্গে কান পেতেছে। কিন্তু সে সমাহিতি যখন আর নেই, নতুনভাবে কী ক'রে তাহলে নিবৃত্তির ধর্ম প্রচার করা চলে?

এটা তাই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। নেতারা যতই শ্রদ্ধা পেয়ে থাকুন না কেন, সে আশ্চর্য যুগ আর নেই যখন তাঁদের নিছক আহ্বানেই কাতারে কাতারে লোক প্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়ে আসত; লোকের বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা কমেছে, যে লক্ষ্যের কথা বলা হচ্ছে তার সম্বন্ধে

স্পষ্ট কোন ধারণাও তেমন নেই। অতএব প্রতীক্ষা প্রয়োজন; যে মানসিকতা না থাকলে দ্রুত প্রগতি সম্ভাব্যতার বাইরে তাকে সন্তর্পণে লালন করতে হবে, তাকে বাদ দিয়ে এগোতে গেলে পা পিছলে বিপর্যয় বাধবারই আশঙ্কা।

এই মুখবন্ধটি স্বীকার ক'রে নিলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্রিয়াক্রমের অনেক কিছুই সহানুভূতির সঙ্গে দেখা চলে। সম্প্রতি অবশ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাবিষয়ক লেখালেখি ও বইপত্রের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে, কিন্তু কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এ বিষয় সম্বন্ধে লোকের মনে মাত্র ভাসা-ভাসা ধারণা ছিল। সোভিয়েট দেশে এ ধরনের পরিকল্পনা কেমন অদ্ভুত রূপান্তর এনে দিয়েছে, তা নিয়ে রূপকথাপ্রতিম জল্পনা অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনার প্রত্যয়, গঠন, প্রণালী, ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে সামান্য চিন্তার সূত্রপাতও হয়নি। তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামগুলো বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকাতেও যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি বিশেষ বিবর্তন সম্ভব, সে সম্বন্ধেও ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। সবশেষে, দেশভাগের ফলে যে বিশৃঙ্খলা যাচ্ছিল, সব ছাপিয়ে খাদ্যদ্রব্যের অনটন, তা প্রায় অনুশাসন উচ্চারণ ক'রে গেল ঐ মুহূর্তে অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে আগে-পরের ব্যাপার কী ক'রে ঘোচাতে হবে, এবং প্রথম পরিকল্পনায় কোন্-কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম পরিকল্পনায় যা তাই প্রধান লক্ষণীয় বিষয় ছিল তা একটা অনুচ্চারিত বিনয়, পরিমিতিবোধ। দু'দিক দিয়েই বিনয় : লক্ষ্যের বিষয়ে, সেই সঙ্গে প্রকরণের ব্যাপারেও। লক্ষ্য ছিল খুবই সীমিত : পাঁচ বছরে জাতীয় উপার্জন শতকরা এগারো বিন্দু এগোবে, বিশেষ ক'রে চাল, গম, কার্পাস, পাট, চিনি এ রকম কৃষিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট কতগুলো হারে বাড়াতেই হবে; তা ছাড়া কয়েকটা বহু-উদ্দেশ্যিক বিদ্যুৎ-উদ্যোগের পত্তন, রেল এঞ্জিন ও চাষের সারের কারখানা, ছোটখাট নানা এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে উৎসাহদান, একটা ইস্পাতের কারখানা শুরু করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে প্রস্তাব। সেই সঙ্গে অবশ্য পল্লী উন্নয়নের জন্য অনেকপ্রকার ব্যবস্থা। প্রকরণের দিক থেকেও বলা চলে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার গঠন খুবই ঋজু, সহজ: জাতির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সব-কিছু প্রভাবান্বিত করার কোন অভিলাষ নেই, ধনবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম সাম্প্রতিকতম সূত্রের মারফৎ জ্ঞান-কপচানো নেই, কার্যক্রমের তালিকাগুলোকে সামান্য একটু বিশ্লেষণের মালা পরিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, শুধুমাত্র যোগ করা হয়েছে পাঁচবছর শেষ হ'লে জাতীয় আয়ের চেহারা কেমন দাঁড়াবে, এবং সে অবস্থায় বিনিয়োগের হারই বা কেমন রূপ নেবে।

যেখানে লক্ষ্য উঁচু নয়, আশাভঙ্গের সম্ভাবনাও সেখানে কম। প্রথম পরিকল্পনা তাই মোটের উপর সফলই হয়েছে : কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে, তা সে পরিকল্পনা-ভুক্ত বহুবিধ উদ্যমের জন্যই হোক, কি সুমিত বৃষ্টির জন্যই হোক; শিল্পোৎপাদনও চমৎকার গতিতে অগ্রসর হয়েছে; এবং সব মিলিয়ে জাতীয় আয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে শতকরা এগারোর কিছু বেশিই বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যপক্ষে যেটা উদ্বেগের কথা, বিনিয়োগের হার আপেক্ষিকভাবে বাড়েনি, এবং এ হার যথাশীঘ্র বাড়াতে না পারলে অচিরে প্রগতি রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। বিভিন্ন শিল্পে পূর্ববর্তী বিনিয়োগের ফলে যেহেতু বাড়তি উৎপাদনক্ষমতা ছিল, সমকালীন বিনিয়োগ সুবিধাজনক না হওয়া সত্ত্বেও তাই প্রথম পরকল্পনায় জাতীয় আয় ব্যাহত হয়নি। কিন্তু নতুন পুঁজি খাটানো না হ'লে প্রাক্তন ক্ষমতার উপর নির্ভর ক'রে এ ধরনের উৎপাদন সম্প্রসারণ খুব বেশিদিন সম্ভব নয়। বিনিয়োগের হার অনড় হ'য়ে

দাঁড়িয়ে থেকেছে কারণ জাতীয় করের হার বাড়ানো যায়নি, অতএব প্রতিশ্রুত অনেক সরকারী উদ্যোগ হয় আরম্ভ করাই হয়নি নয়তো ঢিমে তালে এগিয়েছে; ঘাটতি অর্থনীতি প্রয়োগ করার যে প্রস্তাব প্রথম দিকে হয়েছিল তাও শেষ পর্যন্ত প্রায় অনারব্ধ থেকেছে; এবং বেসরকারি মহলেও উদ্যোগের বিস্তার বাড়ানোর জন্য তেমন কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। শেষোক্ত শ্রেণীর মানসিকতা বুঝে ওঠা অবশ্য কঠিন নয়, জনমনে সাধারণত পরিকল্পনা বিষয়টির সমীকরণ হ'য়ে থাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে; গণ্যমান্য অনেক ব্যবসায়ী সমর্থিত বোম্বাই পরিকল্পনার খসড়া সত্ত্বেও, অনেকে তাই নতুন উদ্যমে অঙ্গীকার করার আগে কয়েকটা বছর প্রতীক্ষারত থাকাই বুদ্ধিমত্তা ব'লে মনে করেছেন।

তা'হলেও প্রথম পরিকল্পনার পরোক্ষ শুভফল হয়েছে অনেকগুলো। উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতির আতঙ্ক ঘুচে গেছে, কৃষির শ্রীবৃদ্ধির ফলে দুর্ভিক্ষের ছায়াও সরে গেছে। সর্বসাধারণের মনে একটা প্রত্যয় ও আস্থাশীলতার ভাব এসেছে। পল্লী উন্নয়নের হরেক-রকম কার্যক্রম থেকে গ্রামাঞ্চলের লোকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তাৎক্ষণিক কোন উন্নতি যেখানে-যেখানে না-ও হয়েছে, সংযোগের সেতু অন্তত একটি স্থাপিত হয়েছে, পল্লীবাসীদের ঐতিহ্যগত অনীহা ও হতাশা দূরীকরণের জন্য অনেক নিরীক্ষা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। যৌথবদ্ধতার জাদুকরী ক্ষমতা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপকারিতা, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার পরিমণ্ডল গড়ে তোলা থেকেই পরিণামে অনেক লাভের সম্ভাবনা।

আসলে প্রথম পরিকল্পনার পাঁচবছরে এটাই হয়েছে সবচেয়ে মস্ত লাভ : যে আবহের কথা প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে, যাকে বাদ দিয়ে জাতীয় অগ্রগতি আদৌ সম্ভব নয়, আস্তে আস্তে সেই পরিবেশ দেশে যেন গড়ে উঠছে। লোকসভা ও বিধানসভার আলোচনায়, সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায়, নেতা ও মনীষীদের ভাষণে ফল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও যা বড়, লোকমানসে পরিকল্পনার শুভংকারিতা সম্বন্ধে প্রতীতি অভিজ্ঞতার উৎস থেকেই এসেছে। ছোট উদাহরণেও চমৎকার উপকার পাওয়া যায়, যদি তা সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে হরণ করতে পারে। প্রথম পরিকল্পনার সীমা খুব স্বল্প হ'লেও লোকে তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় তার শুভতা অনুভব করছে, সেখানেই তাই সফলতা।

আর এক দিক দিয়েও মহৎ সমৃদ্ধি হয়েছে। লোকে ঠেকে শেখে, দেখে শেখে; অভিজ্ঞতা ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নেয়। গেলো পাঁচ-ছ বছরে পরিকল্পনার রূপ, গঠন, প্রকরণ ও বিবিধ সমস্যা নিয়ে দেশে এত বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে যে অনেক অস্পষ্টতা সরল হ'য়ে এসেছে। অনেক কুসংস্কার ঘুচেছে, সাধ্য ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে ধারণা আবেগের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হ'য়ে শুদ্ধ অন্বীক্ষার ঋজুতা পেয়েছে। চিন্তার এই বিস্তার ও ব্যাপ্তি শুধু যে পেশাদারী ধনবিজ্ঞানী ও সরকারী পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ছড়িয়েছে তা নয়, ব্যবসায়ীমহল, সাধারণ কর্মজীবী, ছাত্র, শ্রমিক, এমনকি সাধারণ চাষী—সর্বশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, সাধ্য, সিদ্ধি, প্রণালী প্রভৃতি ব্যাপারে পরিমিতিমতো জ্ঞানপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিশেষ করে এ জ্ঞান যে উপর থেকে জোর ক'রে চাপানো হচ্ছে না, অন্তঃশীল আগ্রহেই—এবং নিজের নিজের অভিজ্ঞতার কষ্ঠিপাথরে যাচাই ক'রে নিয়ে—যে লোকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূত্রগুলো শিখে নিচ্ছে, সে-লাভের তুলনা নেই।

অতএব এটা জোয়ারের সময়। যে উত্তাল উৎসাহবোধ জাতীয় অগ্রগতিকে এক ঝাপটায় অনেক যোজন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার সূচনা নিঃসন্দেহে দেখা দিয়েছে। এই চেতনার সুযোগ না নিলে আরো হয়তো অনেক বছর ধ'রে নতুন ক'রে অপেক্ষায় থাকতে

হবে। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জাতীয় আয় এক দশমাংশের কিছু বেশি বেড়েছে, কিন্তু আমরা যে দৈন্যদশায় আছি, তা ঘোচাতে হ'লে এই বৃদ্ধির হার কিছুই নয়। পশ্চিমের সমৃদ্ধিশীল সব ক'টি দেশেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এর চেয়ে বেশি, সুতরাং আমাদের প্রগতি আরো দ্রুত না করতে পারলে আমরা তুলনায় ক্রমশ পিছিয়েই পড়বো। তজ্জনিত যে সমাজবিক্ষোভ একদিন অবশেষে বিস্ফোরণ হ'য়ে দেখা দেবার আশঙ্কা, তা এড়াতে হ'লে তাই যে ক'রেই হোক বর্তমান মুহূর্তে বিনিয়োগের হার টেনে উপরে তুলতে হবে। এখানেই ত্যাগস্বীকারের প্রশ্ন আসছে : সরকারকে কর এবং ধার দুটোই অনেক বেশি ক'রে লোককে দিতে হবে, নইলে দ্রুত অবস্থা-পরিবর্তন সম্ভব নয়; তা ছাড়া কিছু পরিমাণ ঘাটতি অর্থনীতি প্রয়োগ করলে মুদ্রামূল্যে হ্রাসের ফলে সাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র যে একটু মহার্ঘ হ'য়ে উঠবে, সে ত্যাগও প্রসন্নহৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। সরল বিবৃতির সাহায্যে লোকমনে এ-সত্যগুলো অনুপ্রবেশ করানো প্রয়োজন। প্রত্যেক জিনিসেরই জন্য একটা মূল্য দিতে হ'য়ে থাকে, জাতির দ্রুত শ্রীসম্পদবৃদ্ধি করতে হ'লে তার জন্য আপাতত যে দাম দেওয়ার তা-ও তাই দিতেই হবে। অধুনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়ে দেশে যে আগ্রহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তা থেকে মনে হয় কল্পনা ও কুশলতার সঙ্গে দেশবাসীকে এ আহ্বান জানানো হ'লে প্রয়োজনানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবেই।

এই সিদ্ধান্তই দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভূমিকা। পরিকল্পনাটির যাঁরা খসড়া করেছেন, প্রথম পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের সাহস বেড়েছে, আশা বেড়েছে, প্রাকরণিক দক্ষতাও অনেকখানি এগিয়েছে। এবার লক্ষ্য আগামী পঞ্চবর্ষে জাতীয় আয়ের পরিমাণ আরো এক চতুর্থাংশ বাড়িয়ে তোলা। যদিও কৃষির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট, শিল্পের ক্ষেত্রে—বিশেষ ক'রে বড় বড় কল-কব্জা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সিমেণ্ট, সমস্ত কিছু খনিজ—বিনিয়োগ বহুগুণ বৃদ্ধির উপর প্রধান ঝোঁক গিয়ে পড়েছে। জাতীয় প্রগতির হার যেহেতু মূলত শিল্পের প্রসারের উপরেই বিশেষ ক'রে নির্ভরশীল, তাই এই ঝোঁক খুবই স্বাভাবিক ও সময়ানুগ। সেই সঙ্গে বড় বড় কারখানায় যেহেতু বেশি লোক খাটানো সম্ভব নয়, যাতে বেকার সমস্যা বেড়ে না চলে সেজন্য কুটিরশিল্প বিস্তারের জন্যও ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হয়েছে। লোকমানসে আগ্রহ, এবার শুধু যদি প্রয়াস ক'রে একসঙ্গে অনেকগুলো কল-কারখানার শুরু ক'রে দেশে শিল্পসাধনার একটি ঘন আবহাওয়া সৃষ্টি করা চলে, তাহ'লে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দেশের সম্পদ বেড়ে যাবে, ইয়ং-কথিত সেই potential indivisibility-র প্রসাদে আমরা বহুল লাভের অংশভাগী হবো।

ঘুরে-ফিরে একই কথাতে ফেরা তাহ'লে : সমস্যা হলো বিনিয়োগ বাড়ানো নিয়ে, লোকে ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি হবে কিনা তা নিয়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রে বলা হয়েছে জাতীয় বিনিময়ের হার এ পাঁচবছরে শতকরা সাত থেকে শতকরা এগারোতে তুলতে হবে। সে সাফল্য নির্ভর করছে সম্মিলিতভাবে ধার, কর ও ঘাটতি অর্থনীতি প্রয়োগের কুশলতার উপর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকসম্মতি ছাড়া কোন কিছু সম্ভব নয়; বিনিয়োগের হার-বৃদ্ধিও তাই শেষ পর্যন্ত সাধারণের ছাড়পত্রের উপর নির্ভর করছে।

অনেকেই অবশ্য অসহিষ্ণু হ'য়ে ঘাড় নাড়বেন, এমন উক্তিও করা হবে যে প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই পরিকল্পনাতেই ঝিমোনো-ঝিমোনো ভাব, জাতীয় আয় বাড়ার হার অপ্রতুল; উদাহরণ হয়তো দেওয়া হবে সোভিয়েট ইউনিয়ন কিংবা পূর্ব ইউরোপের পরিকল্পনাগুলো থেকে উদ্ধৃত ক'রে : আমাদের প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জাতীয় আয়ের যে উন্নতি

হয়েছে, এ সমস্ত কোনো কোনো দেশে সে হারে উন্নতি মাত্র একবছরে সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনারচয়িতা যাঁরা, তাঁরা অতএব ভীরু, ভুবনের ভার তাঁদের হাতে নেই।

এ যুক্তির খণ্ডনে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ধনবিজ্ঞানীদের কতগুলো শর্তের সীমায় সম্পাদ্যের খসড়া তৈরি করতে হয়, তাদের মধ্যে প্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামো। রাজনৈতিক সংস্থার বাইরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে দাঁড় করানো অসম্ভব। পূর্ব ইউরোপে যে হারে জাতীয় আয়ের উন্নতি হয়েছে, তার জন্য প্রয়োজন হয়েছে শতকরা ২০ থেকে ৩০ পর্যন্ত বিনিয়োগ হার, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান হারের তিন-চারগুণ বেশি। নিবৃত্তির পরিমাণের সঙ্গে তাই জাতীয় আয়ের অগ্রগতির হার অঙ্গাঙ্গী বাঁধা। উল্লিখিত দেশগুলোতে যে-যে প্রকরণের সাহায্যে এই উঁচু মানের নিবৃত্তি নির্ধারণ ও নিয়োগ করা হয়েছে, তা আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তিতায় সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সংস্থার অতএব পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন কিনা সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া পরিকল্পনার যাঁরা খসড়া করেছেন, তাঁদের দায়িত্বের বাইরে। তাছাড়াও অবশ্য বলা চলে, জাতীয় আয়বৃদ্ধি এসমস্ত দেশে যে-বিশেষ রূপ নিয়েছে, সে-সম্বন্ধে অনেকের মনে আপত্তি ওঠা সম্ভব।

চলচ্চিত্র

কাবুলীওয়ালা—তপন সিংহ

শিক্ষিত লোকের মুখে চলচ্চিত্রের আলোচনায় 'বক্স অফিস'-এর প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রায় অবধারিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এতে দেশপ্রাণতা বা আর্টপ্রাণতার সবিশেষ প্রমাণ থাকতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে চলচ্চিত্রের চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং জনসাধারণের প্রতি একটি হিতাকাঙ্ক্ষী অবজ্ঞা। কেননা জনপ্রিয়তা ছাড়া চলচ্চিত্রের গতি নেই, তার প্রকান্ড প্রকরণ বক্স-অফিসের নির্ভরেই চলে—শুধু মার্কিণ দেশে বা এদেশে নয়, সব দেশেই। এমন কি কোন সাম্যবাদী সরকারও চিরকাল বক্স-অফিস সম্বন্ধে বেপরোয়া হ'য়ে চলচ্চিত্রের মন্ত্রীত্ব চালিয়ে যেতে পারে না। তা' ছাড়া কোন ছবি, তা' যতই গর্হিত শিল্পকর্ম হোক না কেন—যদি জনপ্রিয় হয় তা'হলে বুঝতে হবে যে তাতে জন-সাধারণের কোন না কোন পিপাসা মিটছে। পিপাসা সর্বদাই স্বাস্থ্যকর, যদিও তাকে মেটাবার উপায়ের ভেদ আছে। অনেক ধরনের পানীয় বিশেষ ক্ষতিকর। চলচ্চিত্রের উৎপত্তি থেকে আজ পর্যন্ত তার সবচেয়ে বড় সমস্যা—লোকে কী চায়। ষাট বছরের মধ্যে এর কোন নির্ভরযোগ্য উত্তর পাওয়া যায়নি। কোন ফর্মুলাতে বক্স-অফিস এখনো বাঁধা পড়েনি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই চলচ্চিত্রের সব চেয়ে বড় উৎসাহ, বৃহত্তম সম্ভাবনা। বক্স-অফিসকে (অর্থাৎ জনসাধারণকে) এড়িয়ে চলচ্চিত্রের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তার চৌকাঠ পেরিয়ে তবেই চলচ্চিত্রের রাজপথ আরম্ভ, বৃহৎ শিল্প-কর্মের গোড়াপত্তন। চ্যাপলিন, যাঁকে বার্নার্ড শ বলেছেন 'চলচ্চিত্রের একমাত্র শিল্পী'—তাঁর সমস্ত শিল্পরীতিকে জনপ্রিয়তার ভিত্তিতেই দাঁড় করিয়েছেন। এই স্তরে পৌঁছে জনপ্রিয়তাকে বলা যেতে পারে বিশ্বজনীনতা। আরো অনেকে বিভিন্ন স্তরে এই মহৎ জনপ্রিয়তাকে আয়ত্ত করেছেন। আজকের যুগে চলচ্চিত্রই একমাত্র শিল্প যা এই জনপ্রিয়তা বা বিশ্বজনীনতা অর্জন করতে পারে। এই সমস্ত স্তরে পৌঁছবার ক্ষমতা যাঁরা রাখেন না তাঁরাই চলচ্চিত্রকেও মুষ্টিমেয়ের শিল্পে পরিণত করতে চান। তাঁদের মতে যা জনসাধারণের বোধগম্য নয় তাই শিল্প। আমাদের দেশেও মহৎ জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত আছে—যেমন 'পথের পাঁচালী'। কাজেই চলচ্চিত্রের যাঁরা অনুরাগী, বক্স-অফিসের প্রতি তাঁদের একটি আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব থাকা দরকার।

একই সঙ্গে 'কাবুলীওয়ালা'র নাম-ডাক ও ব্যবসায়িক সাফল্য দেখে আশা হয়েছিল এখানেও বুঝি উন্নত ধরনের জনপ্রিয়তার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাবে। কিন্তু দেখা গেল ক্ষমতাবান কুশলী শিল্পী হয়েও নবাগত তপন সিংহ বাংলার বক্স-অফিসের শেষ ভরসা অর্থাৎ আঁখিজলকেই আশ্রয় করেছেন। কাতুকুতু দিয়ে হাসানো আর বেঁধে মার দিয়ে কাঁদানো একই কথা। 'কাবুলীওয়ালা' দেখে চোখে জল আসে, এটা শারীরিক সত্যও হ'তে পারে, কিন্তু তার কোন শিল্পগত অর্থ নেই। কাঁদাতে পারা বা হাসাতে পারা শিল্পেও হ'তে পারে, আবার সার্কাসের বাহাদুরীও হ'তে পারে।

এই বাহাদুরীতে তপন সিংহকে বাহবা দিতে হয়, কেননা অতি যত্নে এবং কৌশলে তিনি কান্নাকে যে-ভাবে দমকে দমকে তৈরী করেছেন, তার নিপুণতার তুলনা ইদানীং দেখা যায়নি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে একটা একনিষ্ঠ অনন্যমনতা আছে। তা'ছাড়া তিনি চিত্রনাট্য, দৃশ্য-রচনা ও সংলাপে, অভিনয়ের পরিচালনায়, ক্যামেরার কোণ নির্ণয়ে, বাস্তবতার অনুকরণে নবাগত হ'য়েও যা ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাতে বহু প্রবীণ বাঙালী পরিচালককে লজ্জা দেবে। রহমৎ-এর কলকাতার আস্তানাটি রীতিমতো বাস্তব এবং আমার মনে হয় সেখানকার ঘটনাবলীতেই তপন সিংহের ক্ষমতার সব চেয়ে ভালো পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তা' ছাড়াও মিনির বাড়ি, মুদির দোকান, ধারের খদ্দেরের বাড়ি ইত্যাদিতে ভুগোলজ্ঞান দেখতে পাওয়া যায়। একমাত্র মিনির বিয়ের দিন স্বামী-স্ত্রীর বসে কাঁদুনি গাওয়ার বিসদৃশ্যতা ছাড়া অন্যান্য দৃশ্যে সংলাপও জোরালো। প্রস্তাবনার অধ্যায় অতি দীর্ঘ হ'লেও তার বাঁধুনি ভালো, আর এত সুদৃশ্য নাটকীয় স্বীকৃতিপর্যায় (title-sequence)-ও বোধ হয় আজ পর্যন্ত বাংলা ছবিতে দেখা যায়নি। জেলের দৃশ্যের অন্য যত দোষই থাক, খানিকটা বাস্তবতা আছে। মোটামুটি ছবির কোন পর্যায়েই দৃশ্য রচনার দিক থেকে অবিশ্বাস্য নয়। ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্ণয় পরিচালনার অন্যতম কঠিন কাজ, তাতেও মহৎ কল্পনা যেমন নেই, তেমনি কষ্টকল্পনা নেই, বিসদৃশ্যতা বা অর্থহীনতা নেই। জেলের অন্ধকার থেকে

রহমৎ যখন প্রখর রোদে বেরিয়ে আসে তখন তাকে দেখার ভঙ্গিতে যথাযথতা আছে, যদিও আরো বহুদূর থেকে দেখলে দৃশ্যের ব্যঞ্জনা আরো বেশি পাওয়া যেত।

টিঙ্কু ঠাকুরের ও ছবি বিশ্বাসের অভিনয় এই ছবির মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। টিঙ্কুর নির্লিপ্ত মুখের সঙ্গে তার চমকপ্রদ কথার বেশ একটি টানাপোড়েন আছে, যদিও কোথাও কোথাও কথাগুলি অতি বিজ্ঞতার পর্যায়ে পড়ে। কিছু কম কথা, কিছু নীরবতা থাকলে কাবুলীওয়ালার সঙ্গে তার মনের মিলটা আরো বাস্তব হত। ছবি বিশ্বাসকে কোথাও সেই কাবুলীওয়ালা ব'লে ভুল হয় না যাকে দেখে ঝি ব'লে ওঠে 'সব্বনাশ হয়েচে, সেই কাবলেটা আবার এয়েচে'। এ 'কাবুলে'র মুখে সর্বদাই একটি স্বর্গীয় ভাব লেগে রয়েছে, হিং-এর ব্যবসাটা তার একটি মুদ্রাদোষ মাত্র। হাঁটা-চলার মধ্যে বেশ বাঙালী 'সাহেব-বিবি-গোলাম'-এর মেজবাবু উঁকি দেয়। এ কাবুলী কাবুলী নয়, মেজবাবু নিশ্চয়! কিন্তু বলতেই হবে যে হাঁটা-চলায় একেবারে কাবুলী না বনে গেলেও ছবি বিশ্বাস একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যার অঙ্গভঙ্গী, কথাবার্তা, হাবভাবের মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা ও বিশ্বাস্যতা আছে।

কিন্তু এই সব গুণ নির্গুণ হ'য়ে যায় পরিচালকের অবাস্তব একপেশেমির জন্য। ঘটনা যাই হোক, জীবনের চরিত্র দেখানোই যে কোন শিল্পের উদ্দেশ্য। জীবনের সব ঘটনাই যদি একপথে চলতে সুরু করে তবে তার বাস্তবরূপ লোপ পায়। কাবুলীওয়ালার জীবনে তার মেয়ে ছাড়া যেন কেউ নেই, স্ত্রী নেই, বন্ধু নেই, অন্য কোন স্মৃতি নেই। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু তার কোন পরিণতি হয় না, কেবল মেয়ের বুকের ছাপ আঁকড়ে সে পড়ে থাকে। মিনি খুকী থেকে বিয়ের কনে হ'য়ে যায়, কিন্তু কাবুলীওয়ালা যেমন ছিল তেমনই থাকে। আট বছরের ঘটনাকে আটদিনের অনন্যতার স্তরে এনে ফেলে তাকে বাস্তবতার মুখোস পরিয়ে লাভ কী? জেলে কাবুলীওয়ালার সঙ্গী ডুকরে কেঁদে ওঠে, কারণ তার ছোট মেয়ে মারা গেছে (ছেলে মারা গেলে কাবুলীর প্রাণে দুঃখ হতো না), জেলের কর্তাব্যক্তিরও এক মেয়ে, একই বয়সী। এই রকম একটা অবিশ্বাস্য, প্রায় পৌরাণিক একনিষ্ঠতা কেবল মেলোড্রামা ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। জীবনের ভরাট, ত্রিমাত্রিক, চারিদিককার রূপ হারিয়ে যায়। জীবনের যে একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ অমোঘ ও নিজস্ব গতি এবং চরিত্র আছে তাতেই ব্যক্তির অবস্থাকে ট্র্যাজিক বা কমিক ক'রে তোলে। শুধু সেই ব্যক্তি এবং তার দুঃখকষ্টের অপেক্ষায়ই যদি জীবনকে বিবৃত করা হয়, তাহলে তাতে বেঁধে মার দেওয়ার কান্না জুড়তে আপত্তি নেই, কিন্তু সে কান্না দর্শক প্রেক্ষাগৃহেই রেখে আসে, সঙ্গে নিয়ে যায় না, যেমন নিয়ে যায় না কাতুকুতু-দেওয়া হাসিকে।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা'র রস একান্তভাবে ছোটগল্পের, তা থেকে এপিক বা মেলোড্রামা হয় না। তার করুণরসের একটুখানি মধুর আমেজ বাস্তব-অবাস্তবের মাঝখানের ক্ষুরধার পথ দিয়ে অবলীলাক্রমে নিয়ে আসে, মনে রেশ রেখে যায়, কিন্তু প্রলয় বাধায় না। সেই গল্পকে কান্নার গ্রন্থি হিসাবে ব্যবহার ক'রে সিদ্ধহস্তে সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরা মোটেই শিল্পকর্ম নয়।

অতএব জনপ্রিয়তা দু'রকমের—একটি সহজলভ্য, আরেকটির পথ অতি ক্ষুরধার।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

আধুনিক সাহিত্য

'অভিমন্যু এ যৌবন সপ্তরথী চিন্তা দিয়ে ঘেরা'—এই ছত্রটিতে এ যুগের তরুণ যৌবনের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত। সেই রূপটির স্বরূপ স্বীকার না করিয়া লইলে এ যুগের নবীন কবিদের কাব্য বুঝিয়া ওঠা বোধ করি সম্ভব নয়। সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মনে উত্তরার মূর্তি নিশ্চয় বারংবার অন্তিম চেতনার বিদ্যুতবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতকার বলেন যে অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া বীর যুবক মাতুল কৃষ্ণ ও পিতা ধনঞ্জয়কে স্মরণ করিয়াছিল। কিন্তু মহাভারতকারের সাক্ষ্য ছাড়াও বিশ্বাস করিতে বাধা নাই যে মাতুল ও পিতার চেয়ে কম মনে পড়ে নাই জনশূন্য প্রাসাদের অলিন্দ সংলগ্না প্রতীক্ষমানা উত্তরাকে। আর সেই শেষ মুহূর্তের পরমবেদনার শিখায় উত্তরার মূর্তিতে এমন কিছু অভিমন্যুর চোখে পড়িয়াছিল নর্ম রজনীর সহস্র দীপালোক যাহা ধরা পড়ে নাই। মহাভারতকার সে কাহিনী না লিখিয়া থাকুন, এ যুগের তরুণ কবিরা প্রেম অভিজ্ঞতা মন্থন করিয়া সেই বিস্মৃত বেদনা কাব্যে লিখিতেছেন। এ যুগের তরুণ কবি সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যু, উত্তরা তাহার মানস প্রতিমা, প্রেম কাব্য সেই অন্তিম মুহূর্তের অভিজ্ঞতা।

সম্প্রতিকালে লিখিত নবীন কবিদের প্রেমের কবিতা পড়িয়া এইরূপ একটি অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে একজন নবীন কবির কাব্যে ঐ ছত্রটি পাইলাম, মনে মনে বলিলাম যাঁহাদের ব্যথা তাঁহারাই ভাষা দিয়াছেন, আমার দায় অনেক কমিয়া গেল।*

গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত নবীন কবিদের কাব্য পড়িবার সুযোগ আমার হইয়াছে। এই সব কবিতায় অধিকাংশই আমার কাছে হৃদ্য মনে হইয়াছে আর সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে গত ২৫।৩০ বছর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে আধুনিক বা সাম্প্রতিক কাব্য নামে যে কুজ্ঝটিকা জমিয়া উঠিতেছিল নবীন কবিগণ অনেকাংশে সেই অকাব্যের কুহেলিকা হইতে মুক্ত। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ইঁহাদের কাব্যের মৌলিক প্রেরণা ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা, সমাজ ও সংসার মানুষের চারিদিকে যে দুর্মোচ্য জাল বুনিয়া তুলিতেছে তাহার কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াস; কোন রাজনৈতিক মতবাদ বা কোন আলঙ্কারিক প্যাটার্ন বা ছাঁচের কৃত্রিম প্রেরণা এই সব কাব্যকে উদ্বোধিত করে নাই। কি বিষয় নির্বাচনে, কি শব্দ চয়নে, কি প্রকাশের বাহন সংগ্রহে ইঁহারা অন্তরের প্রেরণার কর্তৃত্বকে

* অমৃত-যন্ত্রণা—সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা। প্রণব ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী, শীতল চৌধুরী, শিশিরকুমার দাশ, সুকুমার ঘোষ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, পরিমল সরকার, প্রণয়-কুমার কুণ্ডু, নির্মলেন্দু বিষ্ণু, অতন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুধীর চক্রবর্তী-র প্রেমের কবিতার সংকলন।

জন্মলগ্ন—শিশিরকুমার দাশ। সিগনেট বুক শপ। মূল্য দু টাকা।

স্বীকার করিয়াছেন, বাহিরের কোন প্রেরণার ইঙ্গিতকে নয়। আর সেইজন্যই এসব কাব্য অনর্থক দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই শিল্পকলার আধুনিকতম পরিণতি বলিয়া ঘোষণা করে নাই। আরও একটি কথা। এইসব কবি গোষ্ঠীমৈত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইয়াও ভাবের একটি অখণ্ড আবহাওয়ার মধ্যে যেন সঞ্চরণ করিতেছেন। বর্তমান কাব্য সঙ্কলনগ্রন্থ "অমৃত যন্ত্রণা" এই সব গুণের ও লক্ষণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২

"অমৃত যন্ত্রণা"র প্রায় সকল কবিই এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—দু' একজন মাত্র সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। কাজেই ইঁহাদের গড় বয়স ২০।২২ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সুতরুণ বয়সে কাব্য প্রেরণার কাছে আত্মসমর্পন যথার্থ কবি প্রকৃতির পরিচায়ক। পূর্বতন কালে যে-সব গুণ (দোষও একটা গুণ) শিল্প কৌশলের চরম বলিয়া করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হইত তেমনি একটিও 'ব্যাসকুট' বা প্যাঁচ কাব্যখানিতে চোখে পড়িল না। কবিতা কুণ্ডলের মতো কর্ণগ্রাহী—শ্রুতি মাত্রে কানে লাগিয়া থাকে।

(১) অরণ্য তোমার মন, বৃষ্টি হোক আমার হৃদয়
(২) যন্ত্রণাও যূথী হয়
(৩) রেখে যাবো বয়সের বুক ভরা বাসন্তী প্রণাম
(৪) সে বুঝি মেঘের মেয়ে, রোজ তাই মেঘ দেখে তার
ব্যথার অসহ্য ছায়া মুখে পড়ে।

কিম্বা প্রবন্ধারম্ভে যে ছত্রটি উদ্ধার করিয়াছি—

অভিমন্যু এ যৌবন সপ্তরথী চিন্তা দিয়ে ঘেরা।

এ সব মোহময়, ধ্বনিময় ছত্র মনে রাখিবার পক্ষে একবার শোনাই যথেষ্ট।

২৫।৩০ বছরের পূর্বতন কবিরা অকৃপণ হাতে কাব্যের মাঝে মাঝে বিদেশী শব্দের পাথরের টুকরা ছড়াইয়া দিতেন; পাঠকের মনোরথ হুঁচোট খাইয়া উচ্চকিত হইয়া উঠিত; শুনিত সেটাই নাকি আধুনিক কাব্য শিল্পের বাহাদুরি। সে-সব কবি স্বীকার না করিলেও কথাটা সর্বজনস্বীকৃত যে শব্দ তাহার অদৃশ্য ভাবমণ্ডলের দ্বারা রসোদ্বোধনে সাহায্য করে, কেবল অর্থের দ্বারা নয়। উর্বশী শব্দকে ঘিরিয়া দীর্ঘকালে যে ভাবমণ্ডল জমিয়া উঠিয়াছে, উর্বশীর সৌন্দর্যের চেয়েও কাব্যের পক্ষে তাহার মূল্য বেশি। কিন্তু 'আর্টেমিস' শব্দটির সঙ্গে ভারতীয় তথা বাঙালী পাঠকের তেমন রসের অনিবার্য যোগ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া কাব্যে শব্দটি নিরর্থক। কিন্তু, না, ঐখানেই নাকি কবিতা ভাবমার্গ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে। সুখের বিষয় "অমৃত যন্ত্রণা"য় ঐ রকম একটি মাত্র শব্দের প্রয়োগ দেখিলাম। কবি বলিতেছেন—"সমুদ্র-নীল মিশরীয় চোখ তুলে।" 'মিশরীয়' চোখ বলিতে কবি কি দেখাইতে চান তাঁহার কাছে বোধ করি তাহা স্পষ্ট নয়—পাঠকের কাছে তো নয়ই। কেন না, মিশরীয় সাহিত্য বা জীবনের সঙ্গে যে সুদীর্ঘ আত্মীয়তার যোগ স্থাপিত হইলে—মিশর সংক্রান্ত একটি শব্দ পাঠকের মনের উপরে জাদুদণ্ডের ক্রিয়া করে—এখানে সেই অনিবার্য আত্মার যোগ কোথায়? ইংরেজ কবি যখন বলেন—O Attic shape! তখন শব্দটি পাঠকের মনে জাদুরাজ্য গড়িয়া তোলে, কারণ প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কাব্য সমস্ত ইউরোপীয় চিত্তে বহুকাল ধরিয়া একটি মোহময় সৌন্দর্যময় ভূমিকা গড়িয়া

রাখিয়াছে। একটি মাত্র শব্দের টোকা মারিয়া কবি সেই পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া তোলেন। আবার বাঙালী কবি যখন বলেন, 'মালবিকা অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে' তখন শ্রুতিমাত্রে আমাদের মনে বর্ষণঘন নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরের একটি ব্যাকুল মূর্তি জাগিয়া ওঠে। কালিদাস, উজ্জয়িনী, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ভূমিকা তৈরি করিয়া রাখিয়াছে, বাঙালী কবি তাহার সাহায্য লইলেন মাত্র। কিন্তু মিশরীয় চোখ বলিতে তেমন কোন অনিবার্য ভাবোদয় বাঙালী পাঠকের মনে হয় না।

৩

"অমৃত যন্ত্রণা"র কবিতাগুলিকে একটি অখণ্ড কবিতাগুচ্ছরূপে পড়িলে অন্যায় হয় না, কারণ এগুলির ভাবপরিমণ্ডল ও বিষয় এক। তরুণ প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাহন এই কবিতাগুলি।

প্রণব ঘোষের 'অরণ্য তোমার মন, বৃষ্টি হোক আমার হৃদয়' কবিতাটি উচ্চাঙ্গের শিল্প। এখানে দেখি প্রণয়িনীর স্মৃতির টানে মনোরম নিসর্গ দৃশ্যের স্মৃতি কবির জাগিয়াছে। প্রেমের সহিত প্রকৃতির রহস্যময় এই যোগাযোগ—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'ঘর' কবিতাটিতে, তরুণ সান্যালের 'নদী সমুদ্রের কথা'য়, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়ের 'বিপ্রলম্ভে', দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সে বুঝি মেঘের মেয়ে' কবিতায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'এই বাদাম গাছের ছায়ায়', তারাপদ রায়ের 'কশ্চিৎ কান্তা'য়, পরিমল সরকারের 'সূর্যমুখী শিখা' ও প্রণয়কুমার কুণ্ডুর 'ভূমিকা' কবিতায় আছে। কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সমস্ত মহাকবির প্রেম-কাব্যেই এই অভিনব যোগাযোগ বর্তমান। কিন্তু কারণটা কি? 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।' মনে তো পড়িল, কিন্তু এমন বিচিত্র সাম্য মনে পড়ে কেন? প্রেম ও প্রকৃতির মধ্যে পূর্বস্থাপিত একটা গোপন চলাচলের পথ আছে কি? কারণ যাহাই হোক এ যোগাযোগ যে কেবল উপমা সৃষ্টির খাতিরে বা সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। নবীন কবিগণ সেই চিরন্তন যোগটি অনুভব করিয়াছেন—উহা বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ আশার কথা।

প্রেমের চিরন্তন রহস্য কবিদের অনেককে জিজ্ঞাসাকাতর করিয়া তুলিয়াছে—

'দেহ মনের গোঁজামিলে
বিরোধী দুই চাওয়ায়, তুই কী দিবি তবু নারী।'

প্রেমানুভূতি একাধারে বিচিত্র অনুভূতি টানিয়া আনে, খেদ, শঙ্কা, ও ভীরুতা প্রেমের চিরসঙ্গী।

'ভয় পাই, যখন ভাবি, সে আমার জীবনে আসবে না।'

আবার—

'যে কাছে আসবে না কভু, সে কেন আমারে ভালবাসে।'

'এই বাদাম গাছের ছায়ায়' এবং 'তাকে' কবিতা দুটিতে প্রেমের এই শঙ্কাময় অনির্বচনীয়তা পরিস্ফুট।

প্রেমের ছলনার একটি মনোরম অভিব্যক্তি 'তুমি চলে গেছ বলে' কবিতাটিতে। আর প্রেমের প্রশান্ত বিষাদ অল্প বিস্তর অনেক কবিতাতে থাকিলেও, 'বাংলা দেশ' কবিতাটিতে তার অনবদ্য প্রকাশ।

কবিতাগুচ্ছটি পর্যবেক্ষণ করিয়া আমার ধারণা হইল যে তরুণ প্রেমের অনেক অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ, কেবল একটি ছাড়া। তরুণ প্রেমে দেহ মনের যে উল্লাস অনুভূত হয়, যে উল্লাস ছন্দ, ভাব ও ভাষার কোটালের বন্যায় আত্মপ্রকাশ করে তাহার যেন অভাব দেখিলাম। "অমৃত যন্ত্রণা"র কবিতাগুলি যদি কবিদের প্রেম কবিতার সাকুল্য সূচী হয় তবে এই অভাব লক্ষণীয়। তরুণ প্রেমে উল্লাসের অভাবের কারণ কি,? প্রারম্ভে ঐ যে ছত্রটি উদ্ধার করিয়া দিয়াছি—

'অভিমন্যু এ যৌবন সপ্তরথী-চিন্তা দিয়ে ঘেরা'

—তাহাই কি কারণ? যুগচিন্তার ভারে তারুণ্য স্বধর্ম হারাইয়াছে—ইহাই কি ধরিয়া লইতে হইবে? এ বিচারের ক্ষেত্র বিস্তৃত, কয়েকটি মাত্র কবিতার সূত্রে বিচারে নামিলে ভুল করিবার আশঙ্কা। তবে একথা সত্য—সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মনে উত্তরার যে ছবি জাগিয়াছিল তাহা বিলাসিনী উত্তরার ছবি নয়, প্রশান্ত বিষাদিনী উত্তরার ছবি—সে ছবি আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথা ও দুর্লভ মিলনের স্মৃতির পটে দৃষ্ট, কাজেই তাহাতে আর যাহাই থাকুক উল্লাস ছিল না নিশ্চয়। অনুরূপ অবস্থায় এ যুগেই বা থাকিবে কিরূপে?

এই সঙ্কলনগ্রন্থের শীতল চৌধুরীর 'ঝিনুকের দেশে' কবিতাটি বিস্ময়কর শিল্প-সৃষ্টি, যে-কোন সঙ্কলনগ্রন্থের গৌরব।

সারাদিন সমুদ্দুরের পারে
ঝিনুক খুঁজেছি তোমারি জন্যে,
সমুদ্র দেখার সময় তো পাইনি কোনদিন।

প্রেমের অপার রহস্যের কাছে সমুদ্র এখানে অকিঞ্চিৎকর, এমন অকিঞ্চিৎকর যে তাহা চোখেই পড়িল না।

নবীন কবিগণ এখানে নিতান্ত তরুণ—কাব্যজীবনের প্রারম্ভে বলিলে ভুল হয় না। তাঁহাদের কাব্য দু'দশ বছর পরে কোন্ মূর্তি গ্রহণ করিবে এখন ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের ভরসায় বর্তমান হারাইতে রাজি নই, তাই তাঁহাদের কাব্যের প্রাতঃসূর্য রুচিকে অভিনন্দিত করিয়াই এখানকার মতো ক্ষান্ত হইলাম।

"জন্মলগ্ন" কাব্যের কবি শিশিরকুমার দাশ বয়সে তরুণ, এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। (ইঁহার কবিতা অমৃত যন্ত্রণা সঙ্কলনে আছে।) কিন্তু বয়সে তরুণ হইলেও "জন্মলগ্নে"র কবিতাগুলিতে এমন একটা চিন্তাগূঢ় রহস্য আছে যাহা সত্যই বিস্ময়কর। ইহার ভালোর দিকও আছে মন্দর দিকও আছে। ভালোর দিক, এই যে intellect কাব্য শিল্পের ছাঁচে ঢালাই হইয়া যথার্থ intellectual কাব্যসৃষ্টি করিতে পারে। মন্দর দিক এই যে অল্প বয়সে অনুভূত ধীর গাম্ভীর্য শেষ পর্যন্ত কবিকে morbid করিয়া তুলিতে পারে। তবে সে আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়, কেননা ঐ সম্ভাবিত morbidity-র প্রতিষেধক "জন্মলগ্ন" কাব্যগ্রন্থখানিতেই বর্তমান।

একটি প্রতিষেধক কবিমনের লিরিক উচ্ছ্বাস—

কে আমাকে সন্ধ্যাবেলা মধুর চুম্বনে
বাজাবি, বাজাবি বল, কে আমাকে
গোধূলির ছায়ানীলে কে তার অঙ্গনে
বাজাবি, বাজাবি বল, কে আমাকে
নিয়ে যাবি, চাবি ভেঙে তোদের কুটিরে

শঙ্খকন্যা কেঁদে মরে সমুদ্রের তীরে॥

কিম্বা—

পাখি শুধু কেঁদে বলে : চোখ গেল চোখ গেল
আমি শুধু শুনে ভাবি তারপর।
আকাশে হিমেল হাওয়া ভেসে যায়
সারারাত, সারাদিন কান্নায়
পাখি শুধু ভরে দেয় সারা ঘর।

আর একটি প্রতিষেধক—সৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটির প্রতি কবির আকর্ষণ ও আসক্তি—

আমার মৃত্যুর শেষে তোমার শ্রাবণ-মেঘময়
চুলের আঁধার ঘন ঘিরে দেবে পথের দু'পার,
তোমার কাজল চোখ, আকাশের অপার বিস্তার
ব্যর্থ কি হবে না বলো;

কিম্বা—

চম্পকের গন্ধে পূর্ণ উদ্বেলিত দক্ষিণ সমীর

আবার কোন কোন কবিতায় ঐ দু'টি প্রতিষেধক মিলিতরূপে প্রকাশিত—

হৃদয় ভরা উছল নদীর চারপাশে আজ বাঁধ
দেখতে পেলাম, হায়রে তাকে, দেখতে পেলাম না তো
সে আকাশে উঠ্‌ল হয়ে প্রতিপদের চাঁদ
একটি করুণ গানের মতো আমার হৃদয়জাত।

আশা করা যায় যে এই দু'টি গুণ, যাহা morbidity-র প্রতিষেধক আখ্যাত হইয়াছে কবির প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। আর শেষ পর্যন্ত ইহারাই যে কবি প্রতিভার নিয়ামক হইয়া উঠিবে না তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। বর্তমান কাব্যে কবির শক্তির দুই কোটিতে টানাটানি চলিতেছে—একদিকে মৃত্যুলগ্ন, জন্মলগ্ন, লগ্নশেষ প্রভৃতি কবিতা, আর একদিকে—শঙ্খকন্যা, দিন আর রাত্রি, নানা রঙের দিনগুলি, জলাঙ্গী প্রভৃতির মতো কবিতা। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির টানাটানির ফল—"জন্মলগ্ন" কাব্য। এখন, ভবিষ্যতে কোনটি প্রবলতর হইবে বা দু'টিতে মিলিয়া তৃতীয় একটি অভিনব ধারার সৃষ্টি হইবে তাহা বলা সহজ নয়।

প্রমথনাথ বিশী

সমালোচনা

Syamali—Rabindranath Tagore. Translated from the original Bengali *By* Sheila Chatterjee. Visva-Bharati. Calcutta. Rs. 5/-.

রবীন্দ্ররচনার যে সব সাম্প্রতিক অনুবাদ বিশ্বভারতীর তরফ থেকে প্রকাশিত হয় তার বেশির-ভাগই নৈরাশ্যজনক। এর জন্যে বিশ্বভারতীকে নির্বিচারে দোষ দেয়া অন্যায় হবে। কবিতার যথার্থ অনুবাদ এমনিতেই প্রায় অসম্ভব। যে ভাষায় অনুবাদ তার সঙ্গে যদি মূল ভাষার চরিত্রগত মিল না থাকে তা হলে অনুবাদে মূলের অর্থ ও ব্যঞ্জনা প্রায়শঃই বিকৃত হয়ে যায়। বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের এই প্রধান সমস্যা। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনার সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি কবিতায় অভ্যস্ত পাঠকের ব্যবধান এত বেড়ে গিয়েছে যে রবীন্দ্রকাব্যের অনুবাদ আরো দুরূহ হ'য়ে উঠেছে।

স্থানকালনির্ভর রুচি ও মূল্যবোধের প্রভেদ সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি যে বৃহত্তর রসিকসমাজে রবীন্দ্রনাথের কবিতার গভীরতর উপলব্ধি সম্ভব। সেই বিশ্বাস থেকেই অনুবাদের প্রেরণা। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে সফল করতে হলে প্রথমত অনুবাদের বিষয়বস্তু বিশেষ বিচার করে নির্বাচন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার আবেদন secondary graces-এর সঙ্গে জড়িত। Secondary graces ভাবেরও হতে পারে, কারুশিল্পেরও হতে পারে। এই ধরনের আবেদন স্থানকাল দ্বারা এমনভাবে সীমাবদ্ধ যে বিদেশী ভাষার জগতে একে অনেক সময় হাস্যকর লাগে। দ্বিতীয় সমস্যা অনুবাদের যোগ্যতা নিয়ে। মূল অর্থ বা ভাব বিকৃত হবে না, অথচ ভাষান্তরেও তাকে খাপছাড়া, অস্বাভাবিক বা তুচ্ছ মনে হবে না—কবিতার অনুবাদে এই দুদিক বাঁচানো যে কী দুরূহ সে কথা যিনি এ চেষ্টা করেছেন তিনিই জানেন।

"শ্যামলী"র অনুবাদে এই সব বিবেচনা স্থান পেয়েছে এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমত "শ্যামলী"-র অধিকাংশ কবিতার আবেদন বাঙালী পাঠকের বিশেষভাবে অভ্যস্ত পরিবেশ ও অনুভবের সঙ্গে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতার যে অলঙ্কারশূন্য শক্তি ও তীব্রতা তা এদের নেই—অথচ পূর্বপর্যায়ের দ্বিধাহীন আবেগ-ও অনুপস্থিত। এরা শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি—অন্তত আঙ্গিকের দিক থেকে। কাজেই এদের নিজেদের ভার কম।

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপ্‌সা-হ'য়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হ'য়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া,

সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

অনুবাদে এই অল্পমধুর, অল্পকরুণ ভাবটিকে ধরে রাখা কঠিন। রাখতে পারলেও নতুন পরিবেশে তার মূল্য বেশি হবে না। ধরুন অভিমানের এই মৃদু অভিযোগ—

"এটুকু দরদের সরু বুনানিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে
তাও কি সইত না তোমার।"

বাংলাভাষায় এমন অভিযোগে বাঙালী পাঠকের প্রায় চোখ ভিজে উঠবে। কিন্তু ইংরেজিতে যখন পড়ি,

"The tiny knot tied by the fine web of that much consideration,
Would even that have been too much for you to bear?"

তখন বিন্দুমাত্র ভাবোদ্রেকের সম্ভাবনা-ও দেখি না। এর চেয়ে ভালো অনুবাদ নিশ্চয়ই করা সম্ভব ছিলো, কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু ফল হতো না।

যে সব কবিতা অনুবাদেও মূল্যবান মনে হ'তে পারতো অনুবাদের অক্ষমতার ফলে তাদেরও দুর্বল বা অদ্ভুত মনে হয়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুগ, কিন্তু কবিতার কান বা ইংরেজিভাষার কান কোনোটাই তাঁর নেই। "শেষ পহরে" কবিতাটাই ধরুন।

"Silence everywhere
Like that of a bird's nest bereft of birds
On the bough of a songless tree."

এটা কবিতা নয়, ইংরেজি কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। অথবা ধরুন,

"Today my light consciousness has spread itself
Like a nebula in a dark moonless sky."

কিংবা

"The shot silk of memory and oblivion, both without anguish,
Forming all together a dream picture with face turned away
Like a piqued woman with a veil drawn over her."

এই ধরনের অনুবাদ বিশেষ পীড়াদায়ক। অনুবাদকে "কাব্য" করার চেষ্টায় শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় "vigil", "hapless me", "the eternal knots of wedded love", "portals of beauty" জাতীয় যে ধরনের কথা মাঝে মাঝে প্রয়োগ করেছেন সেগুলি প্রায় অসহ্য। বিবৃতিমূলক বা হাল্‌কা দু'একটি কবিতার অনুবাদ মোটামুটি সুখপাঠ্য।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

বাংলার স্ত্রী-আচার—ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সংকলিত। বিশ্বভারতী। দাম ১৷৹।

ডীন ইং নামে একজন বিখ্যাত ইংরেজ বহুদিন আগে, অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে হিন্দুদের বাঁচা, মরা ও পাপকর্ম সবই ধর্মমতে হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ হিন্দুদের গোটা জীবনযাত্রাটাই

ধর্মের অনুশাসন দিয়ে বাঁধা। আসল ব্যাপারটা ডীন ইং-এর সম্যক উপলব্ধিই হয়নি। হিন্দুদের জীবনযাত্রার মধ্যে ধর্মের চাইতে লোকাচারের অংশই বেশি। এ কথাও আমাদের মনে হয় যে ধর্ম ও লোকাচার দুটি আলাদা জিনিস তো বটেই, এমন কি তাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এতদূর পর্যন্তও সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য নয় যে সেই সর্বজন-বিদিত নব্য খীষ্টান যে বলেছিল 'খীষ্টান হইছি তো হইছি, তাই বইল্যা বাপ-পিতেমোর ধম্ম ছাড়ুম ক্যান?'—তারই মতো আমাদের পিতৃপুরুষদের মনেও একসময় এই সংশয় উপস্থিত হয়েছিল যে আর্যদের এই মন-গড়া ধর্ম, যেটাকে ঠিক ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা যাচ্ছে না, এরই জন্য হাতের পাঁচ পুরোন লোকাচারগুলোকে একেবারে ছেড়ে দেওয়াটা কি বুদ্ধির কাজ হবে? পিতামহরা পারিবারিক মঙ্গলের জন্য চিরকাল যে-সব বিধি-ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন, থাকুক না সেগুলিও। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বা সম্পর্ক না থাকায় বিরোধেরও কোনো কারণ ঘটল না। থেকে গেল কতক কতক।

ফলে এই দাঁড়াল যে পাঁচসাত শ' বছর কেটে গেলে, আনকোরা নতুন আর্যধর্মটাও যখন গা-সওয়া হ'য়ে এল, তখন সাধারণ লোকের মনে কোনটা যে ধর্মের অনুশাসন, আর কোনটা যে প্রাক্-আর্য যুগের নিয়মাবলীর ধ্বংসাবশেষ, সে বিষয় কোন স্পষ্ট ধারণা রইল না। হিন্দুমতের বিয়ে ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম এক-একটা বিরাট অনুষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়াল। আর বিয়ের সময় দেখা গেল হোমানলের সামনে মন্ত্রোচ্চারণের চাইতে, সম্প্রদানের আরো যে-সব মনোহর স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিকেই আত্মীয়কুটুম্বদের ঝোঁক বেশি।

বিয়ে-বাড়িতে পুরুতঠাকুর এসে কি মন্ত্র পড়ালেন না পড়ালেন, তাতে মহিলাদের বড় একটা এসে যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, ও-সব সংস্কৃত মন্ত্রের মানেও কেউ বোঝে না, আর ভুলচুক দু'একটা যদি হ'য়েই যায়, সেটুকুকে সবাই মার্জনা করতে প্রস্তুত।

কিন্তু স্ত্রী-আচারের বেলা অন্য কথা। সেখানে এতটুকু ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রীতির প্রচলন থাকাতে, বিয়ে-বাড়িতে পান্ডাশ্রেণীর গৃহিণীদের মধ্যে মতভেদেরও প্রচুর সুযোগ থাকে। ফলে, আধা-বয়সীদের মান-অভিমানে বিয়ে-বাড়ির অন্দরমহল সরগরম হ'য়ে ওঠে। লাখ কথার কমে কি কখনো বিয়ে হয়?

বর্তমান পুস্তিকাখানি এক্ষেত্রে বিয়ে-বাড়ির কর্মকর্ত্রীদের অশেষ সহায়তা করবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন আশঙ্কাও হয় যে পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত নিয়মাবলী, উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার নিয়মাবলী, পূর্ববঙ্গের ঢাকার নিয়মাবলী আর ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা অঞ্চলের নিয়মাবলী, এই চারি শ্রেণীর স্ত্রী-আচার পুংখানুপুংখ-রূপে বর্ণিত থাকায় বিরোধেরও যথেষ্ট অবকাশ আছে।

তবে বিরোধের অবকাশ থাকলেও ভুলের সুযোগ নেই। চারজন অভিজ্ঞা গৃহিণী, তাঁদের নিজেদের বাড়িতে স্ত্রী-আচার যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়, স্পষ্ট ভাষায় তার হুবহু বিবরণী দিয়েছেন।

স্ত্রী-আচারের কারণ খুঁজতে হয় না, কাজেই কোনো ক্ষেত্রেই কোনো অনুষ্ঠানের কারণ দেখানো হয়নি। কারণ নেই বটে, কিন্তু তাই ব'লে যে অর্থও নেই, একথা যেন কেউ মনে না করেন। আসলে অর্থের দিক থেকে গেলে মঙ্গল-অনুষ্ঠান মাত্রেরই একটিমাত্র অর্থ ও একটি মাত্র উদ্দেশ্য, সে ধর্মানুষ্ঠানই হোক কি স্ত্রী-আচারই হোক, এবং সেটি হলো পাত্র-পাত্রীর অনন্ত সুখের বিধান। তার জন্য স্নেহানুগত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব দেবতাদের তুষ্ট

করতে, বিঘ্নশীল 'দানো'দের পরাস্ত করতে ও যাবতীয় মানুষ-শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করতে, যা কিছু করণীয়, তার কোনোটাই বাকি রাখতে ইচ্ছুক নন।

এই সব কারণে বইখানি আকর্ষণীয়। মুখপত্রে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর অননুকরণীয় রসালাপ থেকে শুরু ক'রে, পরিশেষের বিয়ের গানগুলি পর্যন্ত প্রত্যেকটি পংক্তি উপভোগ্য। আরেকটা কথা আছে। কুসংস্কার ব'লে অনেকে স্ত্রী-আচারকে অবজ্ঞা ক'রে থাকেন। এই বই পড়েই জানা যায় যে এসব অনুষ্ঠানের কার্যকরী দিকটা বাদ দিলেও, আরেকটি মনোহর দিকও আছে, সেটি হলো শিল্পের দিক। যে জন্য কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে মানুষ ঘরদোর সাজায়, নিজেরা সাজগোজ করে, সেই কারণেই বিয়ে-বাড়িতে মেয়েরা ঘট বসিয়ে, আলপনা দিয়ে, প্রদীপ জেলে, শাঁখ বাজিয়ে, বরণডালা গুছিয়ে, নিজেরা সেজে-গুজে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

স্ত্রী-আচারের মধ্যে কতরকম মজার কথাই না আছে, পুরুষ-পাঠক তার কতটুকু রসোপলব্ধি করবেন জানি না। আনন্দ-নাড়ু কোটা, শ্রী গড়া, মোনামুনি ভাসানো, শরকাঠি দিয়ে বর মাপা, নিদ্রা-কলস ভরা, বই ফিরা ইত্যাদি আচারের কথা শুনলেও মন খুশি না হ'য়ে পারে না। বাস্তবিক স্ত্রী-আচার সম্পর্কিত এমন একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ বই আদ্যোপান্ত সোৎসাহে পাঠ না ক'রে থাকা যায় না। আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' থেকে নেওয়া ছোট ছোট নক্‌শাগুলি বইখানিকে আরো আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

লীলা মজুমদার

কন্যা—দীপক চৌধুরী। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

ধুলোমাটি—ননী ভৌমিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম দু' টাকা।

বেগমবাহার লেন—বারীন্দ্রনাথ দাশ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

উপন্যাস রচনায় কোনো বিকল্প রীতি আজও অননুসৃত। যদিও পরিবেশন পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন অধুনা উল্লেখযোগ্য, তবু মৌল বিষয়ে তা' কেন্দ্রচ্যুত হয়নি। একথা সর্বজনস্বীকৃত, উপন্যাসে চরিত্র-বিস্তার কেবলমাত্র অনুষঙ্গ নয়। প্রধান। তত্ত্বগত আলোচনায় অবশ্যই উপন্যাস-এর যাথার্থ্য পরিমাপ অসম্ভব। কিন্তু মোটা একটি ফ্রেম যেখানে আছে, তার বাইরে যাওয়াও কেমন বেমানান। বিশেষত উপন্যাসের ক্যানভাস যেখানে বড়, সেখানে অবশ্য-দ্রষ্টব্য যে হাল্কা রঙ-এর সঙ্গে গাঢ় রঙ ঠিক মিলেছে কি-না।

"কুমারী কন্যা" দীপক চৌধুরীর সাম্প্রতিক উপন্যাস। গ্রন্থটিতে তিনি একটি অত্যন্ত সাবেকী সমস্যা তুলে ধরেছেন। এবং যেহেতু এমনতরো সমস্যার সঙ্গে সমাজের যোগ নেই, সে-কারণে তা' ব্যক্তিজীবনের মানসিকতায় সীমাবদ্ধ। ফলে এবিষয়ে লেখক সাহিত্যকর্মের চেয়ে মনঃসমীক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বেশী।

আদিনাথ মল্লিকের কন্যা সুলতা। যার জন্ম-বৃত্তান্তর খোঁজ পাওয়া যায় বাঁকা

রাস্তার অন্ধকারে। উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করার পর তার বিয়ে হল সনতের সঙ্গে। কিন্তু তা' স্থায়ী হয় না। অথচ সনৎ বা সুলতা মনের দিক থেকে কেউ কারো দূরবর্তী নয়। এর পর স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে আদিনাথবাবু ও সুলতা দার্জিলিং-এ এলেন। সেখানে তাদের সঙ্গে আলাপ হল ডাক্তার দাশের। এবার নতুন করে আবার নিজের দিকে তাকাল সুলতা। দেখল কখন যেন ডাক্তার দাশের আসন সেখানে পাকা হয়ে গেছে। কিন্তু ডাক্তার দাশ আর অগ্রসর হতে পারলেন না। কারণ সনৎ ততদিনে অস্বাস্থ্য ও শীর্ণতা নিয়ে দার্জিলিং-এ এসে পেঁীছেছে।

এই ঘটনা, যা-কে নানাভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন দীপক চৌধুরী। কিন্তু কোথাও যেন তিনি মূল সূত্রটি খুঁজে পাননি। তাই অবশেষে বিবাহ-সম্পর্ক তাঁর কাছে 'স্যাক্রামেণ্ট।' ফলে উপন্যাসের কোথাও পরিপাট্য দেখা গেল না। মনে হল, শুধু ভঙ্গী দিয়েই বুঝি তিনি পাঠকের মনোহরণে সচেষ্ট। আর, ভাষা-বিন্যাসে ত্রুটি ও শব্দযোজনায় ভ্রান্তির ফলে বইখানি আগাগোড়া পড়ে শেষ করা অত্যন্ত ধৈর্যসাপেক্ষ।

যতদূর স্মরণ করতে পারি, "ধুলোমাটি" ননী ভৌমিকের প্রথম উপন্যাস। দীপক চৌধুরীর মত ননী ভৌমিক সমাজবিমুখ নন। বাঙলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যে-সময় দানা বাঁধে, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু তার উপন্যাসের সুরু ফিরিঙ্গী পুকুর দিয়ে সুরু করা হয় কেন? সম্প্রতি এক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়, যে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক-ই তাঁদের ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় দিতে তৎপর। এর কারণ অনুধাবন ব্যর্থ শ্রম মাত্র। ইতিহাসের এই সুদূরবর্তী প্রেক্ষিত অবশ্যই ক্ষয়িষ্ণু মনের পরিচায়ক। এ-ছাড়া ননী ভৌমিকের লেখায় সর্বত্র এক শ্লথ কল্পনা ছড়িয়ে। যে-শৈথিল্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভাষায় কোনমতেই সংহত করা সম্ভব হয়নি। শিবু, বীরু, অরুণ এমনকি প্রাণ কারও চরিত্রই বিস্তার লাভ করেনি। মনে হয় একটি শীর্ণ বিন্দুকে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলি বারে বারে আবর্তিত হয়েছে। এমন কি রামচন্দ্রবাবুর চরিত্রও সুস্পষ্ট নয়।

ভাষা ব্যবহারে সাম্প্রতিক অন্যান্য অনেক লেখকের মত ননী ভৌমিকও যথেষ্ট অনবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,......যেন কোনো দ্রুতচ্চারণ মন্ত্র (পৃঃ ৬)। এমন ভুল অনেক আছে।

তবু প্রতিমার চরিত্র ভাল লাগে। প্রতিমাকে মনে হয় আমাদের চেনা এবং জানা। ইয়াসিনের কথা-ও বই পড়ার পরেও আমাদের মনে উঁকি দেয়। কিন্তু লেখায় সংযমের অভাব এত স্পষ্ট যে, এই সুন্দর বিষয়গুলিও চোখ এড়িয়ে যায়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশের যে সংক্ষিপ্ত জনসমাজের ওপর দুর্গতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে নেমে এল, তারা আমাদের দেশের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ। মনে মনে এই সমাজ কুলীন। কারণ তারা জব চার্নক-এর বংশধর বলে পরিচয় দেন। এবং যেহেতু দেহের বর্ণ গৌর (যদিও এর ব্যতিক্রম অধুনা অনায়াস দৃষ্ট), এদেশের কৃষ্ণ সমাজ অপাংক্তেয়। অথচ এখন সর্বক্ষেত্রে ওদের প্রতিযোগিতা। বিশেষ করে চাকুরীর ক্ষেত্রে। যেখানে এক সময় এই বর্ণগুণেই তাদের পথ নিরঙ্কুশ ছিল।

ফলত অনিবার্য ভাবে এই সমাজের অভ্যন্তরের ছিদ্রগুলি গুহার আকার ধারণ করেছে।

বারীন দাশের "বেগম বাহার লেন" এই সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত। আশা করেছিলাম,

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের এই ক্ষয়ে সমাজভুক্ত মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া কি আকার ধারণ করেছে, তার একটা ছবি পাওয়া যাবে। এই আশা বইখানি পাঠ করবার সময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বারীন দাশ যে-সকল চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, হঠাৎ তাদের জীবনের দু' একটা কথা যা' শুনিয়েছেন, তাতে মনে হয়েছে একটি সার্থক, সুন্দর উপন্যাসের এগুলি দুর্লভ উপকরণ। কিন্তু শ্রীযুক্ত দাশ আমাদের আশাভঙ্গের কারণ হয়েছেন। বস্তুত তার লেখকমনের শৃঙ্খলার অভাবে, গ্রন্থটি একটি অপরিণত জার্নাল-এর রূপ নিয়েছে। উপন্যাস হয়নি। আর একেবারে শেষ অধ্যায়ে ঈভার ওই বৃষ্টিভেজা সুন্দর এক ইচ্ছাপূরণের কাহিনী তৈরী করে লেখক প্রমাণ করলেন, চোখটা কেবল তার বাইরেই নিবদ্ধ। ফটক পার হয়ে আর অন্তঃপুরবাসী হতে পারল না।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

পথের সন্ধানে—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। দাম পাঁচ টাকা।
বি কেলাস—অতীন্দ্রনাথ বসু। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী। দাম তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ দু'খানির লেখকদ্বয় বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে বহুদিন যাবৎ বিশেষভাবে বিজড়িত। স্বভাবতঃই বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞ। এ-অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থ দু'খানির আখ্যানভাগ এগিয়ে নিতে উভয় লেখক সচেষ্ট।

রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় জাগ্রতোন্মুখ কতকগুলি চরিত্র অবলম্বনে 'পথের সন্ধানে'র মূল আখ্যায়িকা এগিয়ে চলেছে। এর পটভূমিকা বাংলাদেশের বিবর্তনশীল একটি পল্লী। পল্লী উন্নয়ন, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, জমির মালিকানা এ-গুলি আখ্যানবস্তুর উপলক্ষ্য মাত্র—এ-উপলক্ষ্যগুলিকে কেন্দ্র করে আখ্যানবস্তু যে-দু'টি বিপরীত-মুখী শক্তির মুখোমুখি হয়েছে তা হ'লো সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামি আর ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থ ও খ্যাতিলোলুপতার সংগে মোটামুটি উদারপন্থী মানবতাবাদ ও সংগঠনধারার সংঘর্ষ। এ-সংঘর্ষের ঢেউ পল্লীর গণ্ডি ডিঙিয়ে শেষপর্যন্ত শ্রমিক-মালিক সমস্যার মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খানবাহাদুর, আহেদ, বনমালী আর তাঁর সম্প্রদায় এবং গোবর্ধন, ব্রজমোহন, সঞ্জীব, রহিম, রেবা, নলিনী, দরিয়ার প্রভৃতি এই বিপরীতধর্মী দ্বিস্রোতের প্রতীকমাত্র। এমনি বহুতর চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঘটনা-সংকুল কাহিনীটিকে নির্দিষ্ট একটি পরিণতিতে লেখক পৌঁছে দিয়েছেন। যদিচ চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে ও সমগ্র কাহিনীটি পাঠান্তে লেখকের যে-জীবনবোধের আভাস পেলাম তা কাহিনী-আশ্রয়ী হ'য়ে উপন্যাসটির সাহিত্য-রস অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে কিনা এ-সন্দেহে স্বতঃই পীড়িত হ'তে হয়।

তৎসত্ত্বেও লেখকের সাহিত্যনিষ্ঠা প্রকৃতই প্রশংসাযোগ্য। পেশাদার সৃষ্টিধর্মী লেখক না হ'য়েও তিনি কাহিনীটিকে গতিশীল ঝরঝরে ভাষায় এগিয়ে নিয়ে যেতে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং আবেগজড়িত হ'লেও যে-জীবনবোধের সন্ধান দিয়েছেন তা' বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যেও বিরলদৃষ্ট।

"বি কেলাস"-এর লেখক কিন্তু হৃদয়ধর্মে বিশ্বাসী হ'য়েও বুদ্ধিজীবী লেখক।

ইতিপূর্বে তাঁর সৃষ্টিধর্মী কোন লেখার সংগে পরিচিত হবার সুযোগ না ঘটলেও তাঁর বিশ্লেষণধর্মী একাধিক প্রবন্ধের সংগে আমরা পরিচিত। এবং তাঁর প্রবন্ধ সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হ'লেও বাংলাদেশের স্বল্পসংখ্যক সুচিন্তিত প্রাবন্ধিক ও সমালোচকদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

'বি কেলাস' প্রচলিত একটি ধারাবাহিক কাহিনী নয়। কয়েদী-জীবনের খণ্ডবিচ্ছিন্ন কতকগুলি বেদনা-আর্দ্র ছবির গ্রন্থন। ছবিগুলি লেখকের আন্তরিকতায় ও সংযত রেখা-বিন্যাসে আশ্চর্য জীবন্ত। ছবিগুলি যাদের নিয়ে আঁকা হ'য়েছে তারা নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তাদের জীবন তিনি শুধুমাত্র স্পর্শই করেননি, নতুন আলোয় জীবনের নিভৃততম প্রদেশের আলোছায়ার জটিল জটলার মধ্য থেকে বিলীয়মান ছবিটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। কোন এক দুর্বল মুহূর্তের মনোবিকলন, সবসময় শুধুমাত্র মনোবিকলনও নয় পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতায় যারা অপরাধী, কারাগৃহের দূষিত ও সংকীর্ণ আবহাওয়ায় সাময়িক বিকৃত মনোভংগী অপসারিত তো হয়ই না উপরন্তু তাদের অবশিষ্ট মনুষ্যত্ব ও সুকুমার জীবনবিশ্বাসও কী ক'রে বেদনাহতভাবে নিঃশেষিত হয় তাই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। তারই সংগে লেখকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি অপরাধের মূল সন্ধানে একান্তভাবে সক্রিয়—দার্শনিক চিন্তালোকের ছায়া ধীরে ধীরে অপরাধী থেকে সরে গিয়ে অপরাধের চড়াই-উৎরাইএর ওপর গিয়ে পড়েছে। তাঁর সহানুভূতিশীল অথচ তীক্ষ্ন দৃষ্টিকোণে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অপরাধের জন্যে যথাযথ দায়িত্ব অপরাধীর পরোক্ষ হ'য়ে গিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের অসুস্থতা ও অবক্ষয়ের রূপটি বিশেষভাবে প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও বিচিত্রতর চরিত্রের পাশাপাশি লেখকের আলোচনাধর্মী চিন্তাও প্রকাশভংগীর পরিচ্ছন্নতায় সুখপাঠ্য ও সাবলীল।

সুনীলকুমার নন্দী

অন্তঃশীলা— ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাক্‌। দাম সাড়ে তিন টাকা।

আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে 'অন্তঃশীলা'র প্রথম আত্মপ্রকাশ। 'অন্তঃশীলা' এবং তার অনুসৃতিদ্বয় 'আবর্ত' এবং 'মোহানা', খুব সীমাবদ্ধ মহলে নতুনত্বের জন্য সেদিন আলোড়ন তুলেছিল। এবং 'অন্তঃশীলা'র বর্তমান সংস্করণের ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'বিষয়বস্তুর আপেক্ষিক নূতনত্ব' সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন। ভূমিকায় উল্লিখিত এই নতুনত্বের কথা আক্ষরিক অর্থেই সত্য। এই নতুনত্ব সহজ-সুন্দর ব'লেই নব সংস্করণের 'অন্তঃশীলা' আবার যখন পড়লাম তখনো তার স্বাদ নতুন ব'লে মনে হলো।

'অন্তঃশীলা'র ভাষা ও আঙ্গিকও তাই স্বভাবতঃই নতুন। এর ভাষাকে বীরবলী ও ভঙ্গীকে প্রুস্তীয়ান বলতে আপত্তি করেছেন লেখক। কিন্তু খুব প্রকট না হলেও বীরবল এবং প্রুস্ত উভয়েই যে তাঁর মনে কাজ করেছেন, তাতে নিঃসন্দেহ।

বর্তমান উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবু। নায়িকা রমলা দেবী, খগেনবাবুর পত্নীবন্ধু। আরো দুটি গৌণ চরিত্র আছে সুজন ও বিজন। একটি উপন্যাসের পক্ষে চরিত্রের এই সংখ্যাল্পতাও লক্ষণীয়।

উপন্যাসের উপলক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। নিছক গল্প আজ আর আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। আজকের বুদ্ধিমান উপন্যাস-পাঠক ঘটনাপ্রবাহের চাইতে প্রবহমান ব্যক্তিচৈতন্যের স্বরূপ এবং মানবসম্বন্ধের বিভিন্ন রূপের রূপায়ন দেখতেই অধিকতর আগ্রহী। এবং এই কারণেই উপন্যাস-লেখককে আশ্রয় নিতে হয়েছে নতুন আঙ্গিকের, যে আঙ্গিকে ঘটনার চেয়ে ব্যক্তিকে, ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করা সম্ভব হয়।

খগেনবাবু তথা লেখকের তাই ধারণা : 'সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে; তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেঙে যায়, ঘটনাটি তেমনি বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যাবে। অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হলো pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়।'

এই ধারণাবিশিষ্ট আঙ্গিকেই সহস্রদল শ্বেতপদ্মের উন্মীলনের মতো খগেনবাবুর ব্যক্তিস্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্লেষণমার্গী ব্যক্তিত্ববিশ্বাসী খগেনবাবু পত্নী সাবিত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। এই নিঃসঙ্গতায় সদ্য-ফোটা ফুলের সৌগন্ধের মতো আসেন স্বামী-পরিত্যক্তা রমলা দেবী। রমলা দেবীর সেবা-শুশ্রূষা ও স্নিগ্ধ সাহচর্য খগেনবাবুর বুদ্ধিখর মনে অজ্ঞাতসারে বিপ্লবের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। খগেনবাবু আসক্তি বোধ করতে থাকেন রমলা দেবীর প্রতি। আসক্তির লৌকিক হাত থেকে দূরে থাকার জন্যে কাশী চলে যান। কাশী থেকে চিঠি লেখেন রমলা দেবীকে। নিজের ডায়েরী পাঠিয়ে দেন তাঁর কাছে। চিঠি এবং ডায়েরীর মাধ্যমে রমলা দেবী আবিষ্কার করেন খগেনবাবুকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও। অনুভব করেন 'অন্তরের বিরোধের' তীব্রতা। অবশেষে সেই বিরোধ দূরীকরণের ইচ্ছার তাড়নায় কাশীর পথে পাড়ি দেন বন্ধু সুজনের সঙ্গে।

'অন্তঃশীলা'র এই গল্পে কাহিনী-অংশ স্পষ্টতঃই গৌণ। খগেনবাবুর ব্যক্তিচৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং রমলা দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বাহ্যিক রূপ উন্মোচনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্‌ঘাটন-উন্মোচন প্রক্রিয়ায় মৃত পত্নী সাবিত্রীর স্মৃতিও কতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল, তারও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্মৃতির মাধ্যমে খগেনবাবু আবিষ্কার করেন যে সাবিত্রীর পক্ষে তিনি ছিলেন বৈদান্তিক, সাবিত্রীর বিশেষ অস্তিত্বকে তিনি গ্রহণ করেননি, সাবিত্রীতে বড় করতে চেষ্টা করেছিলেন ভালোবেসে নয়, মাপকাঠি দিয়ে। সাবিত্রীর প্রতি এই অন্যায় তাঁকে বিদ্ধ করতে থাকে। তাই তিনি স্থির করেন : 'এবার যাকে ভালোবাসব তার বিশেষ অস্তিত্ব আমি গ্রাহ্য করব। প্রথমেই গ্রাহ্য করব তার কাছে, কিছু দাবী না ক'রে। দাবী করলেই নিজের ক'রে নেওয়া হলো। দাবী না ক'রে ভালোবাসব। আমার ভালোবাসার জোরেই সে নিজে থেকে পূর্ণ হবে।' 'সমধর্মী' রমলা দেবীর মধ্যে খগেনবাবু আবিষ্কার করেন শান্তি আর সান্ত্বনার শীতল-স্নিগ্ধ উৎস। 'রমলা দেবীর সম্পর্ক সদর্থক'রূপে প্রতিভাত হয় তাঁর কাছে।

স্মৃতিও যে জীবন্ত চরিত্রের মতোই প্রয়োজন হ'তে পারে তার একটি অনন্য প্রমাণ সমালোচ্য উপন্যাসে প্রমূর্ত। বস্তুত সাবিত্রীর স্মৃতি বা স্মৃতির সাবিত্রীও এখানে একটি উল্লেখ্য চরিত্র।

খগেনবাবু, পূর্বেই বলেছি, বিশ্লেষণমার্গী বিদগ্ধ বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ববিশেষ। কিন্তু

তাঁর বুদ্ধিখর মনও শেষে বোধি-ভাত হৃদয়ের কাছে হার মানে। বোধির যে প্রত্যুষে বুদ্ধির প্রদীপ জ্বলে না, জীবনের সেই শুভ্র-শান্ত প্রহরে খগেনবাবুর বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠ শোনা যায় : 'বুদ্ধির মুখে শতেক উনুনের ছাই পড়ুক। বুভুক্ষু উপবাসক্লিষ্ট হৃদয়ের প্রতিশোধের চাপ আমার কৃত্রিম শুষ্কবুদ্ধি সহ্য করতে না পেরে ভেঙে চৌচির হ'য়ে গেল।...মেকীবুদ্ধির ফেরী করতে আর প্রাণ চাইছে না।' এবং যার সংস্পর্শে এসে খগেনবাবুর এই অনুভূতি হলো, সেই রমলা দেবীর কাছে তিনি তাঁর সত্যমূর্তি ধরতে আকুল হ'য়ে ওঠেন।

খগেনবাবু-রমলা দেবীর আসক্তি তথা প্রেম সোচ্চার নয়; নম্র, শান্ত, স্নিগ্ধ। এই আসক্তি উভয়ের কাছেই পূর্ণায়তনে উদ্‌ঘাটিত হয় পারস্পরিক পত্রবিনিময়ে এবং খগেন-বাবুর ডায়েরির মাধ্যমে। এই প্রেমের অনুগ্র-সহজ সৌগন্ধ ডায়েরি এবং পত্রগুচ্ছের সর্বত্র সমাকীর্ণ। এবং এই প্রেম সম্ভব হলো কারণ তাঁরা উভয়েই সমব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আত্ম-সামঞ্জস্যে সুন্দর। উভয়ের ধর্ম আছে, একই চরিত্রের ধর্ম, উভয়েই অভিজ্ঞতা-ধারণে উত্তম-রকমের ক্ষমতাবিশিষ্ট। মনের মৌল গঠন উভয়েরই এক, মনের এই মিল তাই শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মিলনের পথে অগ্রসর হয়।

'অন্তঃশীলা'র আঙ্গিক প্রথাসিদ্ধ নয়, তাই তার ভাষাও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। প্রাণধর্মে বীরবলের প্রতিবেশী। সংলাপ ও স্বগতোক্তিগুলি শাণিত ও ব্যক্তিত্বভাস্বর, কিন্তু 'তাঁকে বীজন করতে লাগলাম'-জাতীয় সংলাপ একটু বেশি সুশ্লীল ও অসহজ ব'লে মনে হয়; কিংবা 'দুজনে যখন বাক্যালাপ করে তখন তৃতীয় ব্যক্তির দেহহীন অস্তিত্ব বাক্যবিন্যাসের ব্যাকরণ হয়ে ওঠে। কেবল মৌখিক ভাষারই নয়, অব্যক্ত সম্বন্ধের গোপন রীতিও সেই অনস্তিত্বের দ্বারা নিরূপিত হয়'—জাতীয় গদ্য-প্রকরণ অবাঞ্ছনীয়।

এ-জাতীয় ত্রুটি অবশ্য এ উপন্যাসের পক্ষে এমন কিছু নয়। বাংলা উপন্যাস রচনার বাঁধা সড়ক ছেড়ে ধূর্জটিবাবু পাশ্চাত্যপ্রচলিত নতুন যে আঙ্গিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর সাধনা সার্থকতর সিদ্ধির সামীপ্য হয়তো পায়নি, কিন্তু উপন্যাসের হাওয়া-বদলের জন্যও অন্তত সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিকরা যদি এই আঙ্গিকে উপন্যাস রচনা করতে চেষ্টা করেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যের উপকার হবে।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

চতুরঙ্গ

—ত্রৈমাসিক পত্রিকা—

নিয়মাবলী—বৈশাখ হইতে বর্ষ সুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসে অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র মাসে "চতুরঙ্গ" প্রকাশিত হয়। মূল্য বার্ষিক সডাক (ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান) ৪.৭৫ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.১২ টাকা। বৈদেশিক ১০ শিলিং।

"চতুরঙ্গ"-এ প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটওয়ালা লেফাফা থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে।

১০ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য ১৲ টাকা আগে পাঠানো প্রয়োজন। শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

বিনামূল্যে নমুনা সংখ্যা পাঠানো হয় না। নমুনার জন্যে ১.৫০ টাকা পাঠাতে হয়।

বিজ্ঞাপনের হার :

সাধারণ পৃষ্ঠা ২২৫৲ টাকা ; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১২৫৲ টাকা

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

বিনিময় পত্রিকাদি, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, চেক ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা :

৫৪, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা, ১৩

পাকিস্তানে পত্রিকা পাইবার ঠিকানা :

মজলিস বুক স্টল, সদরঘাট, ঢাকা। পূর্ব পাকিস্তান।

মার্কসবাদ

হুমায়ুন কবির

বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও শিক্ষাবিদের মার্কসীয় মতবাদের সহজ ও সরল সারানুবাদ।

মূল্য আড়াই টাকা

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

The statement in compliance with Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956.

1. Place of publication :
   54, Ganesh Chandra Avenue.
2. Periodicity of its publication :
   Quarterly.
3. Printer's Name :
   Ataur Rahman.
   Nationality :
   Indian.
   Address :
   54, Ganesh Chandra Avenue.
4. Publisher's Name :
   Ataur Rahman.
   Nationality :
   Indian.
   Address :
   54, Ganesh Chandra Avenue.
5. Editor's Name :
   Humayun Kabir.
   Nationality :
   Indian.
   Address :
   54, Ganesh Chandra Avenue.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper.
   Humayun Kabir, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta, 13.

I, Ataur Rahman, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- ATAUR RAHMAN
Signature of Publisher